অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (দুই খণ্ড) ও
পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি সংযোজিত

পঞ্চম খণ্ড

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত —

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭৩

Achintyakumar Rachanavali (Vol—V)

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬১ (রথযাত্রা)

সম্পাদনা :
নিরঞ্জন চক্রবর্তী

প্রকাশক :
আনন্দরূপ চক্রবর্তী
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

মুদ্রক :
দুলাল চন্দ্র ভূঞ্যা
সন্দীপ প্রিন্টার্স
৪/১এ সনাতন শীল লেন
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
আনন্দরূপ চক্রবর্তী
শৈলেন শীল
সমরেশ বসু

সূচীপত্র

জীবনী-সাহিত্য

জীবনী-সাহিত্য

পরমপুরুষ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম খণ্ড

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

—শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

"যে রাম যে কৃষ্ণ, ইদানীং সেই রামকৃষ্ণরূপে ভক্তের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

"নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ করতে হয়—তাই চিনতে পারা কঠিন। মানুষ হয়েছেন তো ঠিক মানুষ। সেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, কখনো বা ভয়—ঠিক মানুষের মত। পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

॥ ওঁ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ ॥

* ভূমিকা *

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণরূপে মর্তধামে লীলা করতে এসেছিলেন। সে লীলা-কাহিনী অনেক ভক্ত ও সাধক লিপিবন্ধ করেছেন। আমি অযোগ্য আমি অকিঞ্চন আমি কামকাঞ্চনকীট। ভগবানের সেই নরলীলা বর্ণনা করতে পারি আমার সে ক্ষমতা নেই, পবিত্রতাও নেই। তবে দস্যু রত্নাকরেরও রাম নাম নেবার অধিকার ছিল—মরা-মরা বলতে-বলতে সেও একদিন পৌঁচেছিল রাম-নামে। আর, ভগবান কৃপা করলে মূকও বাচাল হয়, পঙ্গুও যায় গিরিলঙ্ঘনে। তাই ভগবানের কৃপাবলম্বন করেই আমি অগ্রসর হয়েছি। আমার তত্ত্ব নেই, শাস্ত্র নেই, তন্ত্র-মন্ত্র কিছু নেই, আছে কিঞ্চিৎ সাহিত্য। এই সাহিত্যের উপচারেই অর্চনা করতে চেয়েছি ভগবানকে। গীতায় ভগবান বলেছেন :

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

ভক্তিভরে ভগবানকে যাই দেওয়া যায় তাই তিনি গ্রহণ করেন। বিদুরের স্ত্রী কলা না দিয়ে কলার খোসা দিয়েছিলেন ভগবানকে। আমি নিবেদন করলাম আমার সাহিত্য, আমার কথাশিল্প। এর মধ্যে এক বিন্দুও ভক্তি আছে কিনা, যিনি সকল মনের স্বাদ গ্রহণ করে বেড়ান তিনিই জানেন।

আমি গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা করতে চেয়েছি। কিন্তু সেই গঙ্গাজলের সঙ্গে অনেক ঘোলা জল মিশে গিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথার সঙ্গে আমার নিজের অনেক কথা চলে এসেছে, ফুলের মাঝে কাঁটার মত, কিংবা বলি, কীটের মত। তাতে ফুলের সৌরভ কখনো ম্লান হবার নয়। ঘোলা জল মিশলেও গঙ্গাজলের শুচিতা কখনো নষ্ট হয় না। আমরা ভাষা দেখি ভগবান ভাব দেখেন। এক স্ত্রীলোকের ভাসুরের নাম হরি, শ্বশুরের নাম কৃষ্ণ। শ্বশুর-ভাসুরের নাম মুখে উচ্চারণ করতে পারে না বলে সেই স্ত্রীলোক জপ করছে—'ফরে ফৃষ্ট ফরে ফৃষ্ট ফৃষ্ট ফৃষ্ট ফরে ফরে'। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ও ঠিক বলছে, ওর ডাক শুনছেন ভগবান। আসলে, মনই মন্ত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'মন তোর মন্তর।' ভগবান ভাষার ত্রুটি ধরেন না, নিজে অনির্বচনীয় বলে বচনের অন্তরালে মনের মৌনেরই খবর নেন। সে মৌন সমস্ত প্রকাশের পরপারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ করতে হয়—তাই চিনতে পারা কঠিন। মানুষ হয়েছেন তো ঠিক মানুষ।' আমার লেখার ত্রুটিতে হয়তো কখনো তাঁর নরত্বের মধ্যে তাঁর দেবত্ব ঢাকা পড়েছে। কিন্তু নারায়ণরূপী নরও যা নররূপী নারায়ণও তাই। যিনি জীবোদ্ধার করতে এসেছিলেন তাঁর পরম-পাবনী ক্ষমা কাউকে বঞ্চনা করে না কখনো।

দিয়াশলাই জেবলে সূর্যকে দেখানো যায় না, কিন্তু গৃহকোণে পূজার প্রদীপটি হয়তো জ্বালানো যায়। আমার এ বই শুধু সেই দীপ-জ্বালানো পূজা, দীপ-জ্বালানো আরতি।

অচিন্ত্যকুমার

৬ই ফাল্গুন ১৩৫৮

* ১ *

'তোকে কলকাতায় নিয়ে এলাম। দেখছিস ?'

মস্ত শহর কলকাতা। চোখের সামনে জবলজবল করছে। না দেখে উপায় কি ? এ কি আমাদের কামারপকুরের মত নিঝঝুম ? নিরিবিলি ?

রামকুমার চিন্তিত মখে বললেন, 'কলকাতায় এসে টোল খললাম—'

তাও দেখতে পাচ্ছি বৈকি। তা ছাড়া কামাপকুরে কারু-কারু বাড়িতে দাদা তো পরোতগিরিও করছেন। সব পেরে উঠছেন না। সময় কই ? টোলে টোল খেতে খেতেই দিন যায়।

'তাই তোকে নিয়ে এলাম এখানে।' বললেন রামকুমার, 'এবার একটু লেখাপড়া কর্।'

লেখাপড়া ? গদাধর সরল-বিশাল চোখ তুলে তাকিয়ে রইল দাদার দিকে।

'হ্যাঁ, এবার বাড়ি গিয়ে দেখলাম লেখাপড়ায় তোর একেবারে মন নেই। পাড়ার ছোঁড়াদের সংগে গাঁ-ময় ঘরে বেড়াস, নয়তো যাত্রা দলে গিয়ে শিব সাজিস। ও সবে পেট ভরবে না—' রামকুমারের কণ্ঠস্বরে একটু ঝাজ ফুটল।

'তবে কি করতে হবে ?'

'মন দিয়ে লেখাপড়া করতে হবে। ষোলো-সতেরো বছর বয়স হলো তোর। ছিটে-ফোঁটা বিদ্যেও তোর পেটে নেই। আমার আয় দেখতে পাচ্ছিস তো ? ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না—'

'তা আর অজানা নেই। কিন্তু শিখতে হবে কি ?'

'শাস্ত্র—ব্যাকরণ—' গম্ভীর হলেন রামকুমার : 'একটু মন-লাগা। মা'র কাছ-ছাড়া করে নিয়ে এসেছি তোকে। মা'র মখ প্রসন্ন কর্।'

মা'র মখ প্রসন্ন কর্। মা'র বিষন্ন মখখানি মনেমনে ধ্যান করল গদাধর। সে কি শধ চন্দ্রমণির মখ ? সে মখে অভয়প্রদা প্রসন্নতা। "সব্য হস্তে মক্ত খড়্গ দক্ষিণে অভয়।"

'দাদা, চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যে শিখে আমার কি হবে ? তা দিয়ে আমি কি করব ?'

'তার মানে ?' বিরক্ত হলেন রামকুমার।

'তার মানে অর্থকরী বিদ্যে আমি চাই না। ঘর-সাজানো বিদ্যে।'

'তবে তুই কি চাস ?'

'আমি চাই জ্ঞান।'

এ আবার কোন দিশি কথা ? কোন দিশি জ্ঞান ? এ জ্ঞানের অর্থ কি ? এ জ্ঞানের অর্থ নেতি। নেতি-নেতি করে-করে একেবারে শেষকালে যা বাকি থাকে তাই। সেই এক জানাই জ্ঞান, আর অনেক জানা অজ্ঞান—

বঝতে পারলেন না রামকুমার। কি করেই বা বঝবেন ? সংসারের সখভোগকে তুচ্ছ করে কেউ স্বপ্নবিলাসে মত্ত থাকতে পারে এ তাঁর কল্পনার অতীত। দরিদ্রের

পক্ষে অভাবমোচনের চেষ্টার বাইরে আবার ব্যাকুলতা কী! ছোট ভাইকে বকতে লাগলেন রামকুমার। কিন্তু গদাধর চুপ। অবিচল।

যখন সত্যিকারের জ্ঞান হয় তখন স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। সত্যিকারের জ্ঞান মানেই ব্রহ্মজ্ঞান। যেমন ধরো, একটি মেয়ের স্বামী এসেছে, সংগে এসেছে তার সমবয়স্ক বন্ধুরা। সবাই বাইরের ঘরে বসে গল্পতানি করছে। এদিকে ঐ মেয়েটি আর তার সমবয়সী সখীরা জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। মেয়েটির স্বামীকে চেনে না সখীরা। একজনকে দেখিয়ে জিগগেস করছে, ঐটি তোর বর? মেয়েটি অল্প হেসে বলছে, না। ঐটি? উঁহুঃ। ঐটি? তাও না। এমনি চলেছে নেতি-নেতি। শেষকালে ঠিক-ঠিক যখন স্বামীকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, তবে ঐটিই তোর বর? তখন সে মেয়ে হাঁ-ও করে না, না-ও করে না, শুধু একটু ফিক করে হেসে চুপ করে থাকে। সখীরাও তখন বুঝতে পারে, কে বর। তেমনি যেখানেই ব্রহ্মজ্ঞান সেখানেই মৌন।

এ মৌনের ভুল মানে করলেন রামকুমার। ভাবলেন ছেলেটার মাথা বোধ হয় বিগড়েছে। লেখাপড়া যখন শিখবে না তখন যা হয় একটু কিছু কাজ করুক। অন্তত দেব-সেবার কাজ। বাড়িতে রঘুবীর আছেন, সেবা-পূজার কাজ তো সে জানে। তাই সেদিকে মন দিক। কিছু দক্ষিণার সাশ্রয় হোক।

ঝামাপুকুরে দিগম্বর মিত্রের বাড়িতে গৃহদেবতার নিত্যপূজা। সেখানে গদাধরকে ঢুকিয়ে দিলেন রামকুমার। গদাধর মহাখুশি। মনের মতন কাজ মিলেছে তার। যেন মনের মানুষ চলে এসেছে তার হাতের নাগালের মধ্যে।

যেমন দেখতে মনোহর তেমনি কণ্ঠস্বরে মধুঢালা। ভজন গায় গদাধর। যে দেখে যে শোনে সেই তদ্গত হয়ে যায়। মনে হয় কোথাকার কবেকার কে আপন লোক যেন পথ ভুলে চলে এসেছে। অভিজাত বাড়ির মেয়েদের পর্যন্ত বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই। সূর্যকে মুখ দেখাতে সংকোচ, কিন্তু এ যেন-অন্ধকার ঘরের অন্তরঙ্গ আলো। সকলের বস্ত্রাঞ্চলের নিধি। উদাসীন অথচ আনন্দময়। দেবতার সামনে যখন বসে সবাই চমকে ওঠে, দেবতাই এসে বসেছেন না কি সামনে? কিন্তু এদিকে যার যখন দরকার ফুট-ফরমাজ খেটে দিচ্ছে গদাধর। আড্ডা দিচ্ছে অন্দরে-বাইরে। ছেলে-ছোকরার দল পাকিয়ে হৈ-হল্লা করছে। লেখাপড়ার নামে ঠনঠন। কি হবে ও সব অবিদ্যায়?

অমৃত-সাগরে যাবার পথ খুঁজছি। যেমন করে হোক সাগরে গিয়ে পৌঁছুতে পারলেই হলো। শুধু পৌঁছুলে চলবে না, ডুবতে হবে। কেউ তোমাকে ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক বা নিজেই ঝাঁপ দিয়ে পড়। ডুবতে হবে। যা ডোবায় না ভাসিয়ে রাখে, তা দিয়ে আমি কি করব?

ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীও এ কথা বলেছিলেন। ধনধারিণী বসুন্ধরার যত সম্পদ হতে পারে সব এনে তাকে উপহার দিলেন যাজ্ঞবল্ক্য। মৈত্রেয়ী মমতাশূন্যের মত বললেন, 'যা দিয়ে আমি অমৃত হতে পারব না তা নিয়ে আমি কি করব? 'যেনাহং নামৃতা স্যাম কিমহং তেন কুর্যাম?'

শুধু পুঁথি পড়লে কি চৈতন্য হবে? চৈতন্য কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে

দেহের মধ্যে। তাকে জাগানো চাই। কি করে জাগাবে? যোগে ব'সে। যোগ কি? যোগ মানে যুক্ত হয়ে থাকা। দীপশিখা দেখেছ? হাওয়া নেই যেখানে, সেই নিষ্কম্প দীপশিখা? সেই স্থির স্থিতি? তারই নাম যোগ। ঊর্ধ্বের সঙ্গে সংস্পর্শ। তারই প্রথম আসন এই দিগম্বর মিত্রের বাড়িতে।

রামকুমার কি করেন? কার সাহায্যে স্বচ্ছল হবে তাঁর সংসার? কে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবে?

'তুমি যা করো—' রঘুবীরকে স্মরণ করলেন রামকুমার। শ্যামল-শান্ত রঘুবীর।

* ২ '

রঘুবীর আছেন দেরে গ্রামে মানিকরাম চাটুজ্জের বাড়িতে। যে গ্রামের জমিদার প্রতাপপ্রবল রামানন্দ রায়। দৌরাত্ম্যই যার একমাত্র মাহাত্ম্য। ক্ষুদিরাম মানিকরামের বড় ছেলে। বাপের মৃত্যুর পর বিষয়-সম্পত্তি দেখেন আর রঘুবীরের সেবা করেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা যান অল্প বয়সেই। দ্বিতীয় বার বিয়ে করেছেন চন্দ্রমণিকে। যখন চন্দ্রমণির বয়স আট আর তাঁর নিজের বয়স পঁচিশ। বিয়ের ছ' বছর পরে জন্ম হল রামকুমারের। আর তার পাঁচ বছর পরে প্রথম মেয়ে কাত্যায়নীর।

'আপনাকে রাজা ডেকেছেন—' ক্ষুদিরামের ঘরের দরজায় জমিদারের পেয়াদা।

'কি আর্জি হুজুরের?' চোখ তুলে চাইলেন ক্ষুদিরাম।

'আর্জি নয়, হুকুম। রাজার তরফ থেকে একনম্বর মামলা রুজু আছে আদালতে। আপনাকে সাক্ষী দিতে হবে। আপনি একজন ধার্মিক লোক। আপনার জবানবন্দির দাম আছে।'

ব্যাপারটা শুনলেন বিশদ করে। বুঝলেন, মামলাটি মিথ্যে, তঞ্চকী।

'মিথ্যে মামলায় সাক্ষী হতে পারব না।' একবাক্যে না করলেন ক্ষুদিরাম।

পেয়াদা তো অবাক। ভাবতেও পারে না এ আদেশ প্রত্যাখ্যান করা যায়। এর পরিণাম কি হবে তা কি চাটুজ্জে মশায় জানেন না? জানেন। কোপে পড়বেন জমিদারের। কিন্তু জমিদারের প্রশ্রয়ের চাইতে সত্যের আশ্রয়ে বেশি শান্তি। অন্তরের মধ্যে একবার দেখলেন তাঁর রঘুবীরকে। সত্যে আর ন্যায়ে যিনি প্রতিষ্ঠিত সেই করুণাঘন রামচন্দ্রকে।

যা হবার তাই হল। রামানন্দ রায় উলটে ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধেই মিথ্যে নালিশ করলেন। যার পক্ষে আমলা তার পক্ষেই মামলা। ডিক্রি পেয়ে গেলেন রামানন্দ। জারিতে ক্ষুদিরামের স্থাবর-অস্থাবর সব নিলেম হয়ে গেল। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে পথে এসে দাঁড়ালেন। দেড়শো বিঘে মতন জমি ছিল। সব একটা রঙচঙে তামাশার মত শূন্যে মিলিয়ে গেল। কিছুই কি রইল না আর পৃথিবীতে? আছেন, রঘুবীর আছেন। অভয় আশ্রয়ের স্নিগ্ধ আতপচ্ছদ মেলে ধরেছেন

আকাশে। যার কেউ নেই কিছু নেই তারো স্থান আছে। অন্তরে স্থান আছে। অনন্তে স্থান আছে।

ক্ষুদিরাম দেখলেন হঠাৎ একজন বন্ধু এসে উপস্থিত।

'আমি কামারপুকুরের সুখলাল গোস্বামী। চিনতে পার?'

'তোমায়-চিনি না? তুমি আমার কত কালের বন্ধু।'

'তুমি চলো কামারপুকুর। আমার বাড়ির একটেরে তুমি থাকবে। তোমায় জমি দিচ্ছি বিঘেটাক। কাটা ঘুড়ির সুতো ধরো আবার।'

কামারপুকুরে গোস্বামীদের লাখেরাজী স্বত্ব। হৃদয়ও তেমনি নিষ্কর। নিষ্কন্টক। সপরিবারে ক্ষুদিরাম চলে এলেন কামারপুকুর। গোস্বামীদের বাড়ির একাংশে কয়েকখানি চালাঘরে বাস করতে লাগলেন। লক্ষ্মীজলায় ধানী জমি পেলেন এক বিঘে দশ ছটাক। চিরকালের অর্পণ। বর্তে গেলেন ক্ষুদিরাম। যিনি নেন তিনিই আবার ফিরিয়ে দেন। এক দোর দিয়ে যান হাজার দোর দিয়ে আসেন। নিত্যেও তিনি লীলায়ও তিনি।

মনে পড়ে, একদিন নিরুপায় কণ্ঠে বলেছিলেন চন্দ্রমণি: 'ঘরে আজ চাল নেই—' তবু বিচলিত হননি ক্ষুদিরাম। বলেছিলেন, 'তাতে কি? রঘুবীর যদি উপোস করেন আমরাও উপোস করব।'

সৌম্যোজ্জ্বল চোখে হাসলেন রঘুবীর। বা, উপোস করব কেন? লক্ষ্মীজলার মাঠে ধানী জমি সোনার ধানে ঝলমল করে উঠল। ক্ষুন্নিবৃত্তির তৃপ্তিতে যেন প্রসন্ন হাসি হাসছেন দেবতা।

দুপুর বেলা। গ্রামান্তরে গিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম। ফেরবার সময় গাছের তলায় বিশ্রাম করতে বসেছেন। হঠাৎ কেমন যেন তন্দ্রার ঘোর লাগল। এলিয়ে পড়লেন। স্বপ্ন দেখলেন শ্রীরামচন্দ্র বালকের বেশে দাঁড়িয়ে আছেন সামনে। চন্দ্রের মত রমণীয় বলেই তো রামচন্দ্র। নবদূর্বাদলের মতই শ্যামল-স্নেহল। কিন্তু মুখখানি ম্লান কেন?

'আমি বড় অযত্নে আছি। অনেক দিন কিছু খাইনি।' বললে বালক, 'তোমার বাড়িতে আমাকে নিয়ে চলো। বড় সাধ তোমার হাতের একটু সেবা পাই।'

অস্থির হয়ে উঠলেন ক্ষুদিরাম। বললেন, 'আমি অধম, আমার সাধ্য কি তোমার সেবা করি?'

'কোনো ভয় নেই। নিয়ে চল আমাকে। যার হৃদয়ে ভক্তি আছে তার আমি ত্রুটি ধরি না।'

ঘুম ভেঙে গেল ক্ষুদিরামের। চার পাশে তাকিয়ে দেখলেন কেউ নেই। কিন্তু স্বপ্নে যে ধানখেত দেখেছিলেন ঐ তো সেই ধানখেত। নিশ্চয়ই ঐখানে লুকিয়েছেন। এগোলেন ক্ষুদিরাম। দেখলেন এক টুকরো পাথরের উপর এক বিষধর সাপ ফণা মেলে আছে। ঠাহর করে দেখলেন সামান্য পাথর নয়, শালগ্রাম শিলা। মনে হল স্বপ্ন মিথ্যা নয়, ঐ শিলাই তাঁর রামচন্দ্র, নইলে সাপ সহসা অন্তর্হিত হবে কেন? কিন্তু সাপ তো একেবারে হাওয়া হয়ে যায়নি, পাথরের মুখে যে গর্ত তারই মধ্যে গিয়ে লুকিয়েছে। পাথর তুলে আনবার সময় হাতে

যদি দংশন করে! ইতস্তত করতে লাগলেন ক্ষুদিরাম। কিন্তু যিনি রাম তিনি কি বিষহরণ নন? 'জয় রঘুবীর' বলে ত্বরিতভঙ্গিতে তুলে নিলেন শিলা। সাপ কোথায় তা কে জানে।

লক্ষণ থেকে বুঝলেন এ 'রঘুবীর' শিলা। তবে, আর সন্দেহ কি, এই শিলাই তাঁর জাগ্রত গৃহদেবতা। শুধু জাগ্রত নয়, স্বয়মাগত।

একদিন পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন মেদিনীপুর, কামারপুকুর থেকে কম-সে-কম চল্লিশ মাইল দূরে। অনুদয়ে বেরিয়েছেন, হেঁটেছেন প্রায় দশটা পর্যন্ত। হঠাৎ দেখলেন রাস্তার ধারে এক বেলগাছ। ফাল্গুনের রাশি-রাশি নতুন পাতায় সারা গাছ ঝলমল করছে। দেখে ক্ষুদিরামের মন ঐ কচি পাতার মতই নেচে উঠল। পাশের গাঁয়ে ঢুকে একটা ঝুড়ি আর গামছা কিনলেন তাড়াতাড়ি। সামনের পুকুরের জলে ধুয়ে নিলেন বেশ করে। পাতা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ঝুড়ি বোঝাই করলেন। ভিজে গামছাখানি চাপিয়ে দিলেন উপরে। মেদিনীপুর পড়ে রইল, পাতা নিয়ে বিকেল তিনটের সময় বাড়ি পেঁছিুলেন। চন্দ্রমণি তো অবাক।

'অনেক—অনেক বেলপাতা পেয়েছি আজ। নতুন বেলপাতা। আজ প্রাণভবে শিবপুজো করব।'

'মেদিনীপুর? মেদিনীপুর গেলে না?'

'বেলপাতা দেখে সব ভুল হয়ে গেল। আবার যাব না-হয় একদিন মেদিনীপুর। কিন্তু এমন বেলপাতা পাব কোথায়?'

এই ক্ষুদিরাম!

এবার চলেছেন—মেদিনীপুর নয়—সেতুবন্ধ-রামেশ্বর। চলেছেন তেমনি পায়ে হেঁটে। পদব্রজে না হলে তীর্থ কি! ক্লেশ না করলে ক্লেশমোচনের স্পর্শ পাব কি করে? ফিরলেন পরের বছর। সঙ্গে নিয়ে এলেন বাণলিঙ্গ শিব। বসালেন রঘুবীরের পাশে। হরির পাশে হর। সীতাপতির পাশে উমাপতি।

প্রায় ষোলো বছর পরে ফের ছেলে হল চন্দ্রমণির। দ্বিতীয় ছেলে। ক্ষুদিরাম তার নাম রাখলেন রামেশ্বর। রামকুমার তখন বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে, পুজো-আচ্চা করছে যজমান-বাড়িতে। লক্ষ্মীপুজোর রাত। দিন থাকতে ভুরসুবো গিয়েছে, মাঝ রাতেও ফেরবার নাম নেই। ছেলের জন্যে চন্দ্রমণি ঘর-বার করছেন। মন বড় উচাটন। এখনো ফিরছে না কেন রামকুমার?

ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। পথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন চন্দ্রমণি। অনেকক্ষণ পর দেখলেন কে একজন যেন মাঠ পেরিয়ে ভুরসুবোর দিক থেকে আসছে। রামকুমারই বোধ হয়—দু পা এগিয়ে গেলেন চন্দ্রমণি। কিন্তু, ছেলে কোথায়, এ তো একজন মেয়ে! আশ্চর্য রূপ সেই মেয়ের। এক গা গয়না। এই নির্জন মধ্যরাত্রে এখানে তার কি দরকার?

'কোত্থেকে আসছ মা তুমি?' চন্দ্রমণি গায়ে পড়ে জিগগেস করলেন।

'ভুরসুবো থেকে।'

'আমার ছেলে রামকুমারের কোনো খবর জানো?'

জিগগেস করেই লজ্জিত হলেন চন্দ্রমণি। অজানা ভদ্রঘরের মেয়ে, কোনো

বিশেষ কারণেই না-হয় বাইরে বেরিয়েছে—তাঁর ছেলের খবর সে পাবে কোথায় ? ছেলের জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন বলেই বোধ হয় তাঁর আর বোধজ্ঞান নেই ।

'যে বাড়িতে তোমার ছেলে পুজো করতে গিয়েছে আমি সেই বাড়ি থেকেই আসছি ।' মেয়েটি বললে চোখ তুলে : 'ভয় নেই এখুনি ফিরবে—'

কেমন যেন বিশ্বাস হল চন্দ্রমণির । বুকের ভার নেমে গেল ।

জিগ্গেস করলেন, 'এত রাত্রে এত গয়না-গাটি পরে কোথায় যাচ্ছ তুমি মা ?'

মেয়েটি হাসল । বললে, 'অনেক দূর ।'

'তোমার কানে ও কি গয়না ?'

'ওর নাম কুন্ডল—'

'মা, তোমার বয়স অল্প । এই অসময়ে এত গয়না-টয়না পরে তোমার একা-একা যাওয়া ঠিক হবে না ।' চন্দ্রমণির কণ্ঠে আকুলতা ঝরে পড়ল : 'তুমি আমাদের ঘরে এস । রাতটা বিশ্রাম করে কাল ভোর হ'লে চলে যেও ।'

'না মা, আমায় এখুনি যেতে হবে । আরেক সময় আসব তোমাদের বাড়িতে ।' বলে মেয়েটি চলে গেল ।

চলে গেল কিন্তু রাস্তা বা মাঠ দিয়ে নয় । ভারি আশ্চর্য তো ! তাঁদের বাড়ির পাশেই নতুন জমিদার লাহাবাবুদের সার-সার ধানের মরাই । যেন সেদিক পানে চলে গেল । ওদিকে পথ কোথায় ? বিদেশী মেয়ে পথ হারালো না কি ? চন্দ্রমণি বাইরে বেরিয়ে এলেন । এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগলেন চঞ্চল হয়ে । কোথায় গেল সে চঞ্চলা ? এ আমি তবে কাকে দেখলাম ? কোজাগরী রাত্রিকে জিগ্গেস করলেন চন্দ্রমণি । স্বামীকে গিয়ে তুললেন । বলো, এ আমি কাকে দেখলাম ? সর্বাবয়বান-বদ্যা নানালঙ্কারভূষিতা এ কে ?

সব শুনলেন ক্ষুদিরাম । বললেন, 'শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীকে দেখেছ ।'

এই চন্দ্রমণি !

পিতৃদেব আর মাতৃদেবী । দুই-ই দিব্যভাবের ভাবুক ।

* ৩ *

এমন বাপ-মা না হলে এমন ছেলে জন্মাবে কি করে ?

কাত্যায়নীর বড় অসুখ । আনুড়ে তার শ্বশুর-বাড়িতে তাকে দেখতে গিয়েছেন ক্ষুদিরাম । মেয়ের হাবভাব কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হল । মনে হল ভূতাবেশ হয়েছে । চিত্ত সমাহিত করে দেহে দিব্যযোনিকে আহ্বান করলেন ক্ষুদিরাম । প্রেতযোনিকে সম্বোধন করে বললেন, 'কেন আমার মেয়েকে অকারণে কষ্ট দিচ্ছ ? চলে যাও বলছি ।

কাত্যায়নীর জবানিতে বললে সেই প্রেতাত্মা : 'চলে যাব যদি আমার একটা কথা রাখো ।'

'কি কথা ?'

'যদি গয়া গিয়ে আমাকে পিণ্ড দিতে রাজি হও। আমার বড় কষ্ট—'

ক্ষুদিরাম তিলমাত্র দ্বিধা করলেন না। বললেন, 'দেব পিণ্ড। কিন্তু তাতেই কি তুমি উদ্ধার পাবে ?'

'পাব।'

'তার প্রমাণ কি ?'

'তার প্রমাণ আমি এখুনি দিয়ে যাচ্ছি। যাবার সময় সামনের ঐ নিম গাছের বড় ডালটা আমি ভেঙে দেব।'

মুহূর্তে নিম গাছের বড় ডালটা ভেঙে পড়ল। আর কাত্যায়নীর অসুখও মিলিয়ে গেল বাতাসে।

ক্ষুদিরাম গয়া রওনা হলেন। সেটা শীতকাল, ১২৪১ সাল। পৌঁছুলেন চৈত্রের শুরুতে। মধুমাসেই পিণ্ডদান প্রশস্ত। বিষ্ণুপদে পিণ্ড দিলেন ক্ষুদিরাম। রাতে বিচিত্র স্বপ্ন দেখলেন। যেন তাঁর সামনে গদাধর এসে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন, 'তোমার পুত্র হয়ে তোমার বাড়িতে গিয়ে জন্মাব। সেবা নেব তোমার হাতে।'

ক্ষুদিরাম কাঁদতে লাগলেন। বললেন, 'আমি গরিব, আমার সাধ্য কি তোমার সেবা করি ?'

'ভয় নেই।' বললেন গদাধর, 'যা জুটবে তাই খাওয়াবে আমাকে। আমি উপচার চাই না, ভক্তি চাই।'

একমাস পরে বাড়ি ফিরলেন ক্ষুদিরাম। স্বপ্নের কথা পুষে রাখলেন মনে-মনে। এদিকে চন্দ্রমণি কী দেখছেন ? দেখছেন, রাতে তাঁর বিছানায় তাঁরই পাশে কে একজন শুয়ে আছে। স্বামী বিদেশে, অথচ এ কী অভাবনীয় ! তা ছাড়া, কই, মানুষ তো এত সুন্দর হয় না। ধড়মড় করে উঠে বসলেন চন্দ্রমণি। প্রদীপ জ্বালালেন। কই, কেউ কোথাও নেই। দরজার খিল তেমনি অটুট আছে। কৌশলে খিল খুলে কেউ ঘরে ঢুকে তেমনি কৌশলে আবার পালিয়ে গেল না কি ? এত স্পষ্ট যে স্বপ্ন বলে বিশ্বাস হয় না। ভোর হতেই ধনী কামারনীকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'হ্যাঁ লো, কাল রাতে কেউ আমার ঘরে ঢুকেছিল বলতে পারিস ?'

সব কথা শুনে ধনী হেসেই অস্থির। বললে 'মর মাগী, লোকে শুনলে অপবাদ দেবে যে ! বুড়ো বয়সে আর ঢলাসনি ! স্বপ্ন দেখেছিস লো, স্বপ্ন দেখেছিস।'

তাই মনে-মনে মেনে নিলেন চন্দ্রমণি। স্বপ্নই হবে হয়তো। কিন্তু, আশ্চর্য, রাত কি কখনো দিনের মতো স্পষ্ট হয় ?

আরেক দিন। যুগীদের শিবমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন চন্দ্রমণি, দেখতে পেলেন মহাদেবের গা থেকে একটা আলো বেরিয়ে এসে ঘুরতে লাগল হাওয়ার মতো। ঘুরতে-ঘুরতে ছেয়ে ফেলল চন্দ্রমণিকে, তার শরীরের মধ্যে ঢুকতে লাগল প্রবল স্রোতে। টলে পড়ে যাচ্ছিলেন, কাছেই ধনী ছিল, ধরে ফেললে। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ধনীকে সব বললেন চন্দ্রমণি। ধনী বললে, 'তোর বায়ুরোগ হয়েছে।'

গয়া থেকে ফিরে এসে শুনলেন সব ক্ষুদিরাম।

'আমার পেটে যেন কেউ এসেছে—এমনি মনে হচ্ছে সত্যি—' চন্দ্রমণি বললেন স্বামীকে।

'গদাধর আসছেন—'

এবারের গর্ভধারণে চন্দ্রমণির রূপ যেন আর বাঁধ মানছে না। যেন লাবণ্য-বারিধি উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। সে-রূপ বুঝি সূর্যোদয়ের আগেকার আরক্তিম আকাশের রূপ।

'বুড়ো বয়সে গর্ভ হয়ে রূপ যেন ফেটে পড়ছে—' বলাবলি করে পড়শিনিরা।

কেউ বলে, 'পেটে ওর ব্রহ্মদৈত্য ঢুকেছে—বাঁচলে হয় এবার।'

নানা রকম দিব্যদর্শন হচ্ছে চন্দ্রমণির। কখনো ত্রাস, কখনো উল্লাস, কখনো বা ঔদাসীন্য। কখনো বলেন, 'আমার এ গর্ভ পতিস্পর্শে ঘটেনি' ; কখনো বলেন, 'আমার মধ্যে পুরুষোত্তম এসেছেন'। কখনো বা নিতান্ত অসহায়ের মত বলেন, 'আমাকে বুঝি গোঁসাইয়ে পেল।'

গোঁসাইয়ে পাওয়া মানে ভুতে পাওয়া। সুখলাল গোস্বামীর মারা যাবার পর নানা রকম দৈব উৎপাত দেখা দিয়েছিল গ্রামের মধ্যে। লোকের বিশ্বাস হয়েছিল সুখলাল গোঁসাই মরে ভুত হয়েছে, আর আছে তাদের বাড়ির সামনেকার বকুল গাছের মগ ডালে। সেই থেকে কাউকে কখনো ভাবে পেলে লোকে বলত, গোঁসাইয়ে পেয়েছে। কিন্তু ক্ষুদিরাম তাঁর মন খাঁটি করে রেখেছেন, তাঁর ঘরে পুত্ররূপে নারায়ণ আসছেন।

ঘরের দরজা বন্ধ করে বাইরে দোর-গোড়ায় শুয়ে আছেন চন্দ্রমণি, হঠাৎ শুনতে পেলেন কোথায় যেন নূপুর বাজছে। কান খাড়া করলেন, আওয়াজ তো তাঁর বন্ধ ঘরের মধ্যে। ঘর শূন্য দেখে বন্ধ করেছি দরজা, কেউ অগোচরে ঢুকে পড়ল না কি? ঢুকে পড়ল তো নূপুর পেল কোথায়? ত্রস্ত হাতে বন্ধ দরজা খুলে ফেললেন চন্দ্রমণি। কেউ কোথাও নেই। যেমনি শূন্য ছিল তেমনি আছে। কি আশ্চর্য, চোখের মত কানও কি ভুল করবে?

স্বামীকে বললেন এই নূপুর-গুঞ্জনের কথা। ক্ষুদিরাম বললেন, 'গোকুলচন্দ্র আসছেন।'

একদিন মনে হল চন্দনের গাঢ় গন্ধ পাচ্ছেন চারদিকে। ঘরের মধ্যে যেন বিদ্যুতের খেলা দেখছেন। বুকের উপর উঠে কে এক শিশু গলা জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে, আর পিছলে পড়ে যাচ্ছে গড়িয়ে, দু'বাহু দিয়ে চেপে ধরে রাখতে পারছেন না।

রঘুবীরের ভোগ রাঁধছেন চন্দ্রমণি, হঠাৎ যেন প্রসব-বেদনা টের পেলেন। বললেন, 'উপায়? এখন যদি হয়, ঠাকুরের সেবা হবে কি করে?'

'যিনি আসছেন তিনি রঘুবীরের সেবায় ব্যাঘাত ঘটাতে আসবেন না।' বললেন ক্ষুদিরাম, 'তুমি স্থির থাক। যাঁর পূজা তিনিই তার ব্যবস্থা করবেন।'

ঠাকুরের মধ্যাহ্ন-ভোগ আর শীতল শেষ হল নির্বিঘ্নে। রাতও প্রায় যায়-যায়। ধনী এসে শুয়েছে চন্দ্রমণির কাছে। বাড়িতে থাকবার মত দু'খানি চালা ঘর,

তাছাড়া, রান্না-ঘর, ঠাকুর-ঘর, আর ঢেঁকি-ঘর। ঢেঁকি-ঘরেই আঁতুড় পড়বে বলে ঠিক হয়েছে। ঘরে এক দিকে ধান ভানবার ঢেঁকি আর ধান সিদ্ধ করবার একটা উনুন। রাত ফুরুতে তখনো আধঘণ্টা বাকি, চন্দ্রমণির ব্যথা উঠল। ধনী তাঁকে নিয়ে এল ঢেঁকসেলে, শুইয়ে দিলে মাটির উপর। দেখতে দেখতে প্রসব হয়ে গেল। যা অনুমান করা গিয়েছিল, পুত্র, নরবেশে পরম পুরুষই এসেছেন। প্রতিশ্রুত প্রতিমূর্তি।

'এসেছেন ? দেখেছিস তুই ?'

'হ্যাঁ লো, দেখেছি। তুই চুপ কর। ঠাণ্ডা হ। দেখবি, তুইও দেখবি। এখন তোকেই আগে দেখা দরকার।'

ধনী সাহায্য করতে গেল প্রসূতিকে। কিন্তু এ কী সর্বনাশ, ছেলে কই ? কই সেই নর-কলেবর ? চকা-হরিণের মত ছট্‌ফট্ করে উঠল ধনী। কাঁপা হাতে বাতির সলতে বাড়িয়ে দিলে। ছেলে কই ? দেখা দিয়েই অন্তর্হিত হয়ে গেল না কি ? ও মা, দেখেছ ! পিছল মাটিতে হড়কে-হড়কে ধানসেদ্ধর উনুনের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। উনুনে আগুন নেই এখন, কিন্তু ছাই আছে গাদি করা। আলগোছে ধনী ছেলেকে টেনে নিলে কোলে। ছাই-মাখা ছেলে। ভাস্বর ভস্মভূষণ।

'ও মা, কত বড় ছেলে ! প্রায় ছ'মাসের ছেলের মত !' ধনী নাড়ে-চাড়ে আর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। খালি গা, অথচ মনে হয় যেন কত মণি-রত্ন পরে আছে। দ্বিতীয়া তিথি কিন্তু মনে হয় যেন অদ্বিতীয় চাঁদ।

বাংলা ১২৪২ সালের ছয়ুই ফাল্গুন—ইংরিজি ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের সতেরোই ফেব্রুয়ারি। শুক্লপক্ষ, বুধবার। ব্রাহ্ম মুহূর্ত।

ছেলে কোলে নিয়ে বসে একদিন রোদ পোয়াচ্ছেন চন্দ্রমণি। হঠাৎ মনে হল কোল জুড়ে যেন তাঁর পাথর পড়ে আছে। ভার যেন বইতে পারছেন না। এ কী হলো বলো দেখি ? কী আবার হবে। বিশ্বম্ভরের ভর হয়েছে ছেলের উপর।

অসহ্য ! কোল থেকে ছেলে নামিয়ে নিয়ে কুলোর উপর শুইয়ে দিলেন চন্দ্রমণি। শিশুর ভারে কুলো চড়চড় করে উঠল। কুলো ভেঙে যাবে না কি ? ব্যাকুল হাতে চন্দ্রমণি ছেলেকে আবার কোলে তুলতে গেলেন। ছেলে নিশ্চল—পাষাণ। দু'হাতে এমন শক্তি নেই যে টেনে তোলেন। যিনি গিরি ধরেছিলেন তিনিই যে শুয়ে আছেন কুলোর উপর তা কে জানে। চন্দ্রমণি কাঁদতে লাগলেন। যে যেখানে ছিল ছুটে এল। কি হলো ? হলো কি ?

'ছেলেকে কোলে তুলতে পারছি না—'

'কেন ?'

'নিশ্চয় ঐ নিম গাছের ব্রহ্মদত্যি ভর করেছে বাছার উপর—'

'কি যে বলিস তার ঠিক নেই। দাঁড়া, গা ঝেড়ে দিচ্ছি—' ধনী কামারনী কুলোর কাছে বসে মন্ত্র পড়তে লাগল। নিমেষে শিশু হালকা হয়ে গেল। যেমন-কে-তেমন। তেমনি নবীন-ও নিরীহ।

আরো একদিন।

সংসারের কাজে গৃহান্তরে গিয়েছেন চন্দ্রমণি। মশারি ফেলা, পাঁচ মাসের

শিশু ঘুমুচ্ছে বিছানায়। ঘরে ফিরে এসে দেখেন ছেলে নেই। তার বদলে মশারি-প্রমাণ কে-এক দীর্ঘকায় মানুষ শুয়ে আছে। নবোদ্গত গাছের বদলে বিরাট বনস্পতি। চেঁচিয়ে উঠলেন চন্দ্রমণি : 'ওগো দেখে যাও, বিছানায় ছেলে নেই—'

'কি বলছ ?' ত্রস্ত পায়ে ছুটে এলেন ক্ষুদিরাম।

'দেখ এসে। বিছানায় বাছার বদলে কে শুয়ে আছে।'

দু'জনেই তাকালেন মশারির দিকে। কই, তাঁদের সেই শিশুই তো শান্তিতে শুয়ে আছে। হাত-পা নেড়ে খেলা করছে আপন-মনে। এ কী খেলা ! এই যে দেখলাম মহাকায় মানুষ। আবার এই দুধের ছেলে। সব শুনে গম্ভীর হলেন ক্ষুদিরাম। বললেন, 'কাউকে কিছু বোলো না।'

ছ'মাসে পা দিল শিশু। ছেলের মুখে-ভাতের যোগাড় করতে হয় এবার। বেশি জাঁক-জমক করবার অবস্থা কই ? কোনো রকমে রঘুবীরের প্রসাদী ভাত মুখে দিয়েই নিয়মরক্ষা করতে হবে। কিন্তু পাড়ার লোকেরা নাছোড়বান্দা। এমন রাজেশ্বর ছেলে, ভোজ দাও। কারবারী ধর্মদাস লাহা ক্ষুদিরামের বন্ধু। এক পাড়ার বাসিন্দে। তাঁকে গিয়ে ধরলেন ক্ষুদিরাম। বললেন, 'বন্ধু, এখন উপায় ?'

ঈশ্বরই উপায়, আবার ঈশ্বরই উপেয়। যা তাঁর কৃপা তাই তাঁর শক্তি।

'ভয় কি, লাগিয়ে দাও। রঘুবীর উদ্ধার করে দেবেন।' বললেন ধর্মদাস।

ধর্মদাসই ব্যবস্থা করলেন সব। তাঁর টাকার থলের মুখ খুলে দিলেন। পাড়ার লোককে তিনিই প্ররোচনা দিয়েছিলেন ক্ষুদিরামের থেকে নেমন্তন্ন আদায় করার জন্যে। আবার তিনিই সব জোটপাট করলেন। এ-পাড়া ও-পাড়া কাকে ছেড়ে কাকে বলবেন—গাঁ-কে-গাঁ ষোলো আনারই আসন পড়ল। জীবের মধ্যে যে শিব আছে, নিঃস্ব-নির্ধনের মধ্যে যে নারায়ণ, সেও তো আরাধনীয়। সেও তো সেব্য-পূজ্য।

'কি নাম রাখবে শিশুর ?'

'এ আবার জিজ্ঞাসা কর কেন ? গয়াধামে গিয়ে গদাধর পেলাম। এ সেই গদাধর। গয়াবিষ্ণু।'

'ডাক-নাম ?'

আদর করে গদাই বলে ডাকেন বাপ-মা। ডাকে ধনী কামারনী। দিনে-দিনে বাড়ছে গদাধর। বড়-সড় হয়ে উঠছে। চন্দ্রমণি তাকে মাঝে-মাঝে ধুতি পরিয়ে দিচ্ছেন।

লাহাবাবুদের অতিথিশালায় সাধু-সন্ন্যাসীর নানান আনাগোনা। গদাধরের মন পড়ে আছে সেই সন্নেসীদের মাঝখানে। শুধু প্রসাদের লোভে নয়, হয়তো বা আর কিছুর আকর্ষণে। হয়তো বা কোনো জ্ঞাতিত্বের প্রতিশ্রুতিতে। আত্মভোলা শিশুর মাঝে বাসা বেঁধেছেন শিশু-ভোলানাথ।

মা নতুন বস্ত্র পরিয়ে দিয়েছেন গদাধরকে। কতক্ষণ পরেই এ তার কি পরিণতি ! ফালা-ফালা করে ছিঁড়ে ফেলেছে গদাধর। এক ফালা নিয়ে দিব্যি ডোরকপিনি করে পরেছে !

'ও মা, এ কি ? এ তুই কী হয়েছিস ?'

'অতিথি হয়েছি।'

'অতিথি ? সে আবার কী ?'

বুঝিয়ে দিল গদাধর। লাহাবাবুদের অতিথিশালায় যারা আসে তাদেরকে অতিথি বলে না ?

'তারা তো সব সন্ন্যাসী। সেই সন্ন্যাসীর বেশই তুই পছন্দ করলি ?'

মা'র মন হু-হু করে উঠল। 'আস্ত কাপড় দিলাম, তা ছিঁড়ে তুই কোপীন বানালি ?'

গদাধর হাসল। অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর বুঝি এইটুকু একটু খণ্ড নিয়েই খুশি। ছোট-ছোট তিনখানি খোড়ো ঘর, তার মধ্যে একখানি আবার ঢেঁকিশাল। আশে-পাশে গাছপালা, ঝোপ-জঙ্গল। দেখলেই মনে হয় গরিবের সামান্য কুটির। তবু কে জানে কেন, ছবিতে এমন একটি ভাব, চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় কী যেন এখানে আছে ! কত না জানি শান্তি ! কত না জানি দয়া ! কত না জানি আশ্রয় !

পথ দিয়ে যেতে-যেতেও দাঁড়িয়ে যায় লোকেরা। ভাবে, কেন ভাবে কে বলবে, ঐখানে গেলে যেন তৃষ্ণার জল মিলবে, মিলবে যেন সমস্ত অসুখের আরোগ্য ! ঐখানে আছে কে ? ও কার বাড়ি ? ও কি কোনো মুনি-ঋষির আশ্রম ?

* ৪ *

লাহাবাবুদের বাড়ির সামনে ঢালাও নাটমন্দিরে পাঠশালা। পাঁচ বছরের ছেলে তখন গদাধর, পাততাড়ি বগলে করে ঢুকল এসে সে পাঠশালায়। সকালে-বিকেলে দু'বার করে পড়া হয়। সকালে দু'তিন ঘণ্টা পড়ে স্নানাহারের ছুটি, বিকেলে এসে আবার সন্ধে পর্যন্ত। ইস্কুলের আর কিছুই ভালো লাগে না গদাধরের, শুধু আর কতগুলো ছেলে এসে যে জমেছে এইটেই মস্ত মজা। খুব করে খেলা করা যাবে। যেখানে যত বেশি প্রাণ সেখানেই তত বেশি লীলা। যদি ঐ শুভঙ্করীটা না থাকত ! ও দেখলেই কেমন ধাঁধা লেগে যায় গদাধরের। কষ্টে-সৃষ্টে যোগ যদি বা হল, বিয়োগ আর কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারল না। কি করেই বা পারবে ? যোগে আছে সর্বক্ষণ, তাই যোগ করায়ত্ত। কিন্তু বিয়োগ আবার কি ! কোথাও লয়-ক্ষয় নেই, বিয়োগ-বিচ্ছেদ নেই। এখানে পূর্ণ থেকে পূর্ণ গেলেও থেকে যায় পূর্ণ।

পড়া বলতে বললেই মুস্কিল। তার চেয়ে স্তোত্র-প্রণাম দাও মুখস্থ বলে দিচ্ছে। বর্ণ-পরিচয় করে পড়তে যাওয়াটাই ঠিক, কিন্তু গদাধরের উল্টো—তার পড়তে পড়তে বর্ণ-পরিচয়। অঙ্ক দিলেই আতঙ্ক। অঙ্ক ফেলে তালপাতায় ঠাকুরের নাম লেখা অনেক আরামের। যা রাম তাই নাম।

পাঠশালের ছুটির পর মধু যুগীর বাড়িতে গদাধর প্রহ্লাদ-চরিত পড়ছে।

ভিড় জমেছে চার পাশে। এমন শিশুর মুখে এমন মনোহরণ পড়া কেউ আর শোনেনি কোনো দিন। কাছাকাছি আমগাছের ডালে বসে এক হনুমানও শুনছে সেই পড়া, সেই স্বরলহরী। হঠাৎ সেই হনুমান এক লাফে নেমে এল গাছ থেকে, শিশুর কাছাকাছি এসে তার পা ধরে বসে পড়ল। গদাধর বিন্দুমাত্র ভয় পেল না, বরং হনুমানের মাথায় দিব্যি হাত ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করলে। হনুমান যেন চিনতে পেরেছে রামচন্দ্রকে। প্রণামের বিনিময়ে আশীর্বাদ নিয়ে এক লাফে আবার নিজের জায়গায় চলে গেল।

তেমনি গোচারণের মাঠে গিয়ে গদাধর ব্রজের রাখাল হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে জুটছে সব সেথোরা। কেউ হচ্ছে সুবল কেউ শ্রীদাম—কেউ কেউ বা দাম-বসুদাম। আর যে গদাধর সেই তো বংশীধর। চরে-চরে কাছে আসে গোধন, আপন হাতে ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়ায়। কখনো বা লাফিয়ে লাফিয়ে দোল খায় গাছের ডালে। কখনো বা পাড়ে কাপড় ছেড়ে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুকুরে। কোঁচড়ে করে মুড়ি খায়। খেতে খেতে নাচে। হাসে।

একদিন তেমনি বাঁড়ুয্যে-বাগানের মাঠে গরু চরাচ্ছে সকলে। হঠাৎ গদাধর বললে, 'আয় সবাই মিলে আজ মাথুর গান গাই। গাইবি ?'

সবাই একবাক্যে রাজি। গাছের তলায় যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল। আজ কৃষ্ণ নেই। আজ রাধিকা। আজ কৃষ্ণকান্ত-বিরহিণী। কৃষ্ণ দেখেছিস এত দিন, আজ দেখ রাই-কমলিনীকে।

মাথুর-বিরহের গান ধরল গদাধর। সৃষ্টির মহামৌনের মাঝে যে শাশ্বত কান্না প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, আপন হৃদয় নিঙড়ে তা উৎসারিত করে দিল। কোথায়—কোথায় তুমি কৃষ্ণ, কোথায় হে তুমি পরমতম আকর্ষণীয় ! কবে আমার এই ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ মিলবে গিয়ে তোমার নির্বিকল্প নির্বাণহীনতায় ?

গাইতে গাইতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল গদাধর। বাহ্যচৈতন্য রইল না। সেথোরা অস্থির হয়ে পড়ল : 'ওরে গদাই, কি হ'ল তোর ? কেন এমন করছিস ? চোখ চা।' কেউ গায়ে ঠেলা দেয়, কেউ চোখে-মুখে জল ছিটোয়, কেউ বা কি করবে বুঝতে না পেরে কাঁদে।

কে একজন হঠাৎ কানের কাছে মুখ এনে বলে : 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ। হরেকৃষ্ণ—'

যে নামে অজ্ঞান সেই নামেই আবার জ্ঞান। যে নামে বৈরাগ্য সেই নামেই আবার প্রেম। প্রাণকর কৃষ্ণনাম শুনে উঠে বসল গদাধর। কোথায় কৃষ্ণ ? চার পাশে সব বালক-বন্ধুর দল। এই তো ! তোরাই কৃষ্ণ। সমস্ত সংসারই কৃষ্ণময়। এই সব খেলা-ধুলোতেই গদাধরের কেরামতি। লেখাপড়ায় মন যেন থা পাতে না, আর অঙ্ক তো ডাঙোশ উঁচিয়ে আছে। তার চেয়ে গাঁয়ের কুমোরেরা যেমন মাটির তাল ছেনে মূর্তি গড়ছে, তাদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দাও, গদাধর পয়লা নম্বরের কারিগর। যদি বলো তো পট এঁকে দিতে পারে ওস্তাদ পটুয়ার মত। বেশ, ছবি-টবি চাও না, তবে গান শুনবে ? কী গান গাইব ? হরিনাম ছাড়া আবার গান আছে না কি ? ভক্তি ছাড়া আর কিছু আস্বাদন আছে ?

পুজায় বসেছেন ক্ষুদিরাম। সামনে শান্ত-সৌম্য রঘুবীরের মূর্তি। পাশে

নানান রকম উপকরণ—তার মধ্যে একগাছি ফুলের মালা। ঠাকুরকে স্নান করিয়ে রেখে চোখ বুজে তাঁর ধ্যান করছেন ক্ষুদিরাম। সেই স্নাত অংগের পুণ্য স্পর্শের স্বাদ কল্পনা করছেন, ধ্যানে ক্রমশই অতলায়িত হয়ে যাচ্ছেন। সাড়া নেই স্পন্দন নেই। সে এক সীমাহীন সমাধি।

গদাধরের বড় সাধ ঐ চিকণ-গাঁথন ফুলের মালাটি গলায় পরে। অমনি তুলে নিয়ে গলায় দিয়ে পালিয়ে গেলে চলবে না। নয়নরোচন রঘুবীর সাজতে হবে। শিলামূর্তির পাশে বসে পড়ল গদাধর। চন্দনের বাটি থেকে চন্দন নিয়ে মাখলে সারা গায়। থালার থেকে মালা তুলে নিয়ে নিজের গলায় দুলিয়ে দিলে। বললে বাবাকে উদ্দেশ করে: 'চোখ মেল। রঘুবীরকে দেখ। দেখ কেমন সেজেছে আজ রঘুবীর—'

ধ্যান ভেঙে গেল ক্ষুদিরামের। চোখ মেলে দেখলেন, সামনে গদাধর ব'সে।

সেই দিন কি পুত্রবন্দনা করেছিলেন ক্ষুদিরাম? শিশুপুত্রের মাঝে কি লুকিয়ে আছে বালগোপাল?

রামশীলা দেবী ক্ষুদিরামের ছোট বোন। কামারপুকুরের কাছে ছিলিমপুরে তাঁর শ্বশুরবাড়ি। তিনি শীতলা দেবীর-ভক্ত। মাঝে মাঝে তাঁর উপরে শীতলা দেবীর আবেশ হত। তখন তিনি একেবারে অন্য রকম হয়ে যেতেন। একদিন ভাইয়ের বাড়িতে এসেছেন রামশীলা। এসেই আবার অমনি শীতলা দেবীর আবেশ হয়েছে। সবাই ভয়ে তটস্থ, কি করে কি হবে কিছু বুঝতে পাচ্ছেন না। কিন্তু গদাধরের একরতি ভয় নেই। খুঁটে খুঁটে দেখছে পিসিমার ভাব, যাকে এঁরা বলছেন, ভাবান্তর। চমৎকার অবস্থা তো—যেন অন্য কোথাও দেশে বেড়াতে যাওয়া। কে যেন দিব্যি ঘাড়ে ধরে তিন ভুবন ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। সবাই ত্রস্ত-ব্যস্ত, কিন্তু গদাধর প্রসন্নমুখে বলছে, 'পিসিমার ঘাড়ে যে আছে সে যদি আমার ঘাড়ে চাপে তো বেশ হয়—'

সেদিন কি সে-ই তবে প্রথম ঘাড়ে চাপল গদাধরের?

ছ'বছরের ছেলে ধান খেতের সরু আল ধরে-ধরে চলেছে নিরুদ্দেশের মত। কোঁচড়ে মুড়ি, তাই তুলে তুলে চিবুচ্ছে থেকে থেকে। হঠাৎ কী মনে হল, আকাশের দিকে তাকাল একবার গদাধর। আকাশ তো আকাশই, শুধু তাকানোর মাঝেই তাৎপর্য। গদাধর দেখল এক বিশালকায় কালো মেঘ আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে, ছড়িয়ে পড়ছে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। কি দিব্য মহিমা এই মেঘমণ্ডিত আকাশে। চোখ আর ফেরে না গদাধরের। হঠাৎ এক ঝাঁক শাদা বক সেই কালো মেঘের গা ঘেঁষে উড়ে গেল দূরান্তরে। গদাধরের সারা গায়ে শিহরণ লাগল। এই অপূর্ব, অনির্বাচ্য সৌন্দর্য কে পরিবেশন করল? কৃষ্ণিমার সংগে এই শুভ্রতার যোগাযোগ? এই দিব্য কাব্য কার রচনা? হঠাৎ তার প্রতি গদাধরের প্রাণ-মন উড়ে চলল পাখা মেলে। দেহ-পিঞ্জর লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। চোখ মেলে চেয়ে দেখল বাড়িতে শুয়ে আছে। কে তাকে কখন কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে মাঠ থেকে কে জানে?

গদাধরের মোটে সাত বছর বয়েস, ক্ষুদিরাম মারা গেলেন।

গিয়েছিলেন ভাগ্নে রামচাঁদের বাড়িতে, ছিলিমপুরে। মহাপুজোর কাছাকাছি। কিন্তু মনে সুখ নেই। মনে সুখ নেই কেন না সঙ্গে গদাধর নেই। ইচ্ছে ছিল সঙ্গে নিয়ে আসেন। কিন্তু ছেলেকে দূরে পাঠিয়ে চন্দ্রমণিই বা কি করে থাকবে? ও যে কটাক্ষে স্থিতি আবার কটাক্ষেই প্রলয়!

ছিলিমপুরে এসে দিন কয়েক পরেই অসুখে পড়লেন ক্ষুদিরাম। বাড়াবাড়ি অসুখ, তবু পুজোর আনন্দ ম্লান হতে দেবেন না। ষষ্ঠী গেল, সপ্তমী গেল, অষ্টমী গেল—নবমী বুঝি আর যায় না! কাতর চোখে তাকালেন একবার প্রতিমার আয়ত চোখের কোমল করুণার দিকে। নবমীও কেটে গেল। দশমী? দশমীর সন্ধেয় প্রতিমা-বিসর্জনের পর রামচাঁদ দেখলেন ক্ষুদিরাম তখনো বেঁচে আছেন, কিন্তু সময় বড় সংক্ষিপ্ত। চোখের দৃষ্টি যেন প্রতিমারই পথ ধরেছে। ডাকলেন: 'মামা!'

সাড়া নেই, শব্দ নেই। ক্ষুদিরাম নির্বাক।

সে কি! মৃত্যুকালে নাম করবেন না? জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যাবে? নামবে বিস্মৃতির বিভ্রান্তি? এতদিনের অভ্যাস-যোগ আজ কোনো কাজে আসবে না? সমস্ত যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ হচ্ছে জপ-যজ্ঞ। তাই, ঠাকুর বললেন, রাত-দিন জপ করবি। তা হলেই অভ্যাসবশে মৃত্যুকালে ঈশ্বর-চিন্তা আসবে। মৃত্যুকালে যা ভাববি তাই হবি। ভরত রাজা হরিণ-হরিণ করে শোকে প্রাণত্যাগ করেছিল। তাই তার হরিণ হয়ে জন্মাতে হল। মৃত্যুকালে যদি হরিনাম করতে পারিস তা হলেই সন্ধান পাবি ঈশ্বরের।

'মামা, রঘুবীরকে ভুলে গেলেন?' রামচাঁদের চোখ জলে ভরে এল: 'এত যার নাম করতেন সে আপনাকে আজ পরিত্যাগ করল?'

'কে? রামচাঁদ?' আচ্ছন্ন চোখ মেলে তাকালেন ক্ষুদিরাম: 'বিসর্জন হয়ে গেছে? আমাকে একবার তবে বসিয়ে দাও ধরাধরি করে।'

বসিয়ে দেওয়া হল। শুয়ে-শুয়ে নাম করব না, পুজোর ভঙ্গিতে বসে নাম করব। সে নাম কি ভুলে যেতে পারি? সে আমার কণ্ঠের মধ্যে স্বর, মস্তিষ্কের মধ্যে স্মৃতি, রক্তের মধ্যে চেতনা। সে আমার নিশ্বাসবায়ু। আমার নিস্তার-নৌকা। জ্ঞানে গাঢ়, গম্ভীর সে স্বর—ক্ষুদিরাম রঘুবীরের নাম করলেন তিন বার। নাম করার সঙ্গে-সঙ্গেই চলে গেলেন স্বধামে।

ভূতির খালের শ্মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছে গদাধর। বাবা নেই, কোথায় গেলেন, মনটা কেমন উড়ু-উড়ু, ফাঁকা-ফাঁকা—কোনো কিছুতে মন বসে না। মার কাছাকাছিই মন ঘুরঘুর করে—এটা-ওটা আবদার করতে সাধ হয়। কিন্তু অভাবের জন্যে মা যদি সে-আবদার রাখতে না পারেন, তা হলে তো বাবার জন্যে শোক আরো উথলে উঠবে। সুতরাং চুপ করে রইল গদাধর। কোথায় গেলে অভাব থাকবে

না সংসারে, শূন্যতার ভার উড়ে যাবে মেঘের মত, অন্তরের অন্ধকারে তাঁরই ঠিকানা খুঁজতে লাগল।

এবারে পৈতে দিতে হয়। সাত পেরিয়ে আটে পড়েছে। দাদারা কোমর বেঁধেছেন। পৈতে তো হল, কিন্তু ভিক্ষে দেবে কে? গদাধর গোঁ ধরল, ধনী কামারণী ছাড়া আর কারু হাতে ভিক্ষে নেব না। সে কি প্রথা? ধনী ছোট জাতের মেয়ে, ব্রাহ্মণ-কন্যা নয়। সে কি ক'রে ভিক্ষে দেবে? কুল-প্রথা লঙ্ঘন হয়ে যাবে যে।

'কিসের কুলাচার? কিসের জাত-বেজাত? প্রাণ চাইছে ধনীকে মা বলব, যে ধনী কোলে করে আমাকে মুক্ত করেছে মা'র জঠর থেকে—সেই মা-নামের কাছে কোনো বিধি-নিষেধ মানব না। তোমরা তোমাদের বামুনাই নিয়ে থাকো, আমি না খেয়ে উপোস করে থাকব। এই দরজায় খিল দিলাম।'

কত জনের কত কাকুতি-মিনতি, তবু দরজা খোলে না গদাধর। বালক অথচ বিপ্লবী গদাধর!

শেষ কালে রামকুমার বললেন, 'বেশ, ধনী কামারণীই ভিক্ষে দেবে। খোলু দরজা। কুলাচার নষ্ট হয় হোক, তবু তোকে উপোসী দেখতে পারব না।'

প্রসন্ন সূর্যের মত দরজা খুলে দিল গদাধর। ধনী কামারণী ভিক্ষে দিল। কড়ে রাঁড়ি, নিঃসন্তান, কিন্তু মহা ভাগ্যবতী। ত্রিভুবনে যিনি ভিক্ষে দিয়ে বেড়ান তাঁকেই কি না সে ভিক্ষে দিলে!

আনুড়ে বিশালাক্ষী বা বিষলক্ষ্মীর থান। কামারপুকুর থেকে মাইল দুই দূরে আনুড়। মাঝখানে খোলা মাঠ। ধর্মদাস লাহার বিধবা মেয়ে প্রসন্ন পূজোয় চলেছে। সঙ্গে গ্রামের আরো অনেক মেয়ে।

হঠাৎ কোত্থেকে গদাধর এসে বললে, 'আমিও যাব।'

তুই যাবি কি রে! এতটা মাঠভাঙা পথ হাঁটবি কি করে? কিন্তু গদাধরের মুখের দিকে চেয়ে মুখের কথা মুখের মধ্যেই আটকে রইল। মন্দ কি, যাক না সঙ্গে! ফেরবার সময় যদি ক্ষিদে পায়, সঙ্গে দেবীর প্রসাদ থাকবে, দুধ থাকবে, তাই খাবে আর কি! তা ছাড়া, মিষ্টি গলায় খাসা গান গাইতে পারে ছেলেটা, বললে দু'চারটে গানই বা কোন্ না গাইবে! নে, চল, গান গাইতে হবে কিন্তু।

'সত্যি, গদাইয়ের গান শুনে অবধি আর কারু গান কানে লাগে না।' বললে প্রসন্ন। 'গদাই কান খারাপ করে দিয়েছে।'

ফাঁকা মাঠের মধ্যে গদাধর খোলা গলায় গান ধরলে। দেবী বিশালাক্ষীর মহিমা-কীর্তনের গান। গান গাইতে-গাইতে হঠাৎ থেমে গেল গদাধর। মেয়ের দল তাকিয়ে দেখল—এ কি ব্যাপার! গদাধরের দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে, তার শরীর আড়ষ্ট অসাড়, দাঁড়িয়ে আছে নিস্পন্দের মত। কি, কি হল তোর? কে কার প্রশ্নের জবাব দেয়? গদাধরের জ্ঞান নেই। ও মা, এখন কি হবে? মেয়ের দল ভয়ে বিশীর্ণ হয়ে গেল। রোদে নিশ্চয়ই ভিরমি গিয়েছে ছেলে, খুব করে জলধারানি দে। হাওয়া কর্, হাত বুলিয়ে দে সারা গায়ে।

কিন্তু গদাধরের সাড়া নেই, সঙ্কেত নেই।

'গদাধর—গদাই !' ব্যাকুল কণ্ঠে কত ডাক, কত কাতরতা ! কি করে মা'র কোলে ফিরিয়ে দেব এই ছেলেকে !

হঠাৎ প্রসন্নর মনে ডাক দিয়ে উঠল—যে বিশালাক্ষীকে দেখতে চলেছি সেই আগ বাড়িয়ে আসেনি তো পথ দেখাতে ?

'ওলো, দেবীর ভর হয়নি তো ?' প্রসন্ন অস্থির হয়ে উঠল : 'মিছিমিছি তবে গদাইকে ডেকে কী হবে ? বিশালাক্ষীকে ডাক। যিনি এসেছেন আগ বাড়িয়ে। আধার পেয়ে অধিষ্ঠিত হয়েছেন আনন্দে।'

সবাই দেবী-স্তব শুরু করলে। গদাধরের কর্ণমূলে রাখলে দেবী-নাম। গদাধরের মুখে হাসি ফুটল। সংজ্ঞাব লাবণ্য তরল হয়ে এল সর্বাঙ্গে। কেউ আর তাকে গদাই বলছে না, সবাই মা বলে ডাকছে। নৈবেদ্যের ডালি কি হবে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে ? ওলো, গদাইকেই সবাই খেতে দে এখানে। সব তবে মাকেই খেতে দেওয়া হবে।

এই গদাধরের দ্বিতীয় ভাবাবেশ। কালো মেঘের কোলে সিতপক্ষ বক-বলাকার যে রূপ, বিশালাক্ষীরও সেই রূপ। দুইয়ের একই উদ্ভাস, একই তাৎপর্য। একই দিব্য কাব্যের দু'টি শ্লোক।

কামারপুকুরের পাইনদের অবস্থা বেশ শাঁসালো। শিবরাত্রির সময় তাদের বাড়িতে যাত্রা হবে। পালা-ও শিবদুর্গা নিয়ে। ধুমুল পড়েছে, কিন্তু শিব যে সাজবে সে ছোঁড়ার দেখা নেই। অসুখ করেছে না কি, আসতে পারবে না। আর যে কেউ সাজবে তেমন লোক নেই। সুতরাং যাত্রা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি ? এদিকে, যাত্রা বন্ধ হলে রাত্রি-জাগরণ কি করে হয় ? সবাই ধরে পড়ল অধিকারীকে। অধিকারী বললে, 'আপনারা একজন শিব যোগাড় করুন, বাকিটা আমি চালিয়ে নিতে পারব।'

একবাক্যে সবাই বলে উঠল—গদাধরকে শিব সাজালে কেমন হয় ? চমৎকার হয়। বয়েস অল্প হোক, শিবের গান জানে সে অনেক। তাই দিয়ে সে চালিয়ে নিতে পারবে। তারপর শিবের পোশাকে তাকে যা মানাবে, আর দেখতে হবে না। কী যে ঠিক দাঁড়াবে বুঝতে পাচ্ছে না গদাধর। তবু সকলের ধরাধরিতে সে রাজি হয়ে গেল।

আসরে এসে দাঁড়াল সে শিবের মূর্তিতে। একেবারে সেই স্বভাবস্বচ্ছধবল সচ্চিদানন্দ শিব ! মাথায় রুক্ষবর্ণ জটাভার, গায়ে বিভূতির আচ্ছাদন। এক হাতে শিঙা, অন্য হাতে ত্রিশূল। কণ্ঠে ও বাহুতে অনন্ত নাগ খেলা করছে ফণা তুলে, শেখরে খেলা করছে সুধা-ময়ূখ শশধর। পদপাতে ধৈর্য, অবস্থিতিতে শান্তি। চোখে সেই অনিমেষ দৃষ্টি যা তৃতীয় নয়নের দীপ্ততা। যেন মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব নেমে এসেছেন নরদেহে। সেই তপযোগগম্য শূলপাণি বিশ্বনাথ। যিনি প্রচণ্ড-তাণ্ডব অথচ প্রাণপালক। অভাবনীয় আনন্দের ঢেউ খেলে গেল চারিদিকে। মেয়েরা যারা আসরে ছিল, হঠাৎ উলু দিয়ে উঠল, কেউ কেউ বা শাঁখ বাজালে। হরিধ্বনি করে উঠল পুরুষেরা। স্বয়ং অধিকারী শিবস্তুতি শুরু করলেন।

'মাইরি, কি সুন্দর মানিয়েছে গদাইকে !'

'শিবের পার্ট যে এত ভালো উতরোবে কেউ ভাবিনি।'

'ওকে বাগিয়ে নিয়ে আমাদের একটা দল করতে হবে দেখছি—'

এমনি বলাবলি করছিল পাড়া-বেপাড়ার ছোকরারা। কিন্তু, ও কি, গদাধর কিছু বলছে না কেন, নড়ছে না কেন? শুধু চেহারা দেখিয়েই কি পার্ট হয়? বলতে-কইতে চলতে-ফিরতে হয় যে। ও কি? দেখছিস? গদাধর কাঁদছে। শিব আবার কাঁদল কখন? কেউ কেউ ছুটে গেল গদাধরের কাছে। গদাধরের বাহ্যজ্ঞান নেই। গদাধর তৎস্বরূপ! জল দাও। হাওয়া করো। শিবের ভর হয়েছে, কানে শিবমন্ত্র দাও।

'ছোঁড়াটা রসভংগ করলে মাইরি। এমন পালাটা শুনতে দিলে না।' আপশোষ করলে কেউ কেউ।

যাত্রা ভেঙে গেল। কাঁধে করে গদাধরকে কারা বাড়ি পোঁছে দিলে। গদাধর তখনো দেহসংজ্ঞাহীন। তখনো শিবময়। সারা রাত বাড়িতে কান্নাকাটি—গদাধরের জ্ঞান হচ্ছে না। কাকে বলে জ্ঞান, আর কাকেই বা অজ্ঞান। কে বা জাগ্রত, কে বা সুষুপ্ত!

সকালে চোখ মেলল গদাধর। আকাশে চোখ মেলল দিনমণি।

এই আমাদের গদাধর। দুটি আয়ত-উজ্জ্বল চোখ—যে চোখে শান্তি আর সরলতা—মাথাভরা এলোমেলো চুল—যে-চুলে আনন্দময় ঔদাসীন্য। মুখে অমিয়-মধুর হাসি, যে হাসিতে অহেতুকী করুণা। কণ্ঠস্বরে অমৃতনির্ঝর প্রসন্নতা, যে প্রসাদে অশেষ আশ্বাস। যে দেখে সে-ই তাকে ভালোবাসে। যে একবার চোখ রাখে সে-ই আর চোখ ফেরায় না। যদি ভালো কিছু আহার্য পায়, ইচ্ছে করে গদাধরকে খাওয়াই। ইচ্ছে করে তার একটু কথা শুনি। যেখানে সে গিয়েছে সেখানে গিয়ে বসি।

এদিকে লেখাপড়ায় এক ফোঁটা মন নেই গদাধরের। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারত পড়তে দাও, মন মাতিয়ে পড়বে সে অনর্গল। ধ্রুব-প্রহ্লাদের কথা শুনতে চাও, সবাইকে সে ব্যাকুল করে ছাড়বে। মামুলি পাঠশালায় যেতে তার মন ওঠে না। তার চেয়ে মাঠে-মাঠে তাকে মুক্ত হাওয়ার মত ঘুরে বেড়াতে দাও, সে মহা খুশি। যা কিছু সুন্দর, তারই উপর তার মনের টান। মনে হয় কি করে এই সুন্দরকে নিজের সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ করা যায়! গদাধর তাই কাদা নিয়ে মূর্তি গড়ে, গলা ছেড়ে গান গায়, দু' হাত তুলে নাচে। শিল্পে, সঙ্গীতে আর নৃত্যে সে সে-এক অনির্বচনীয়কে উদ্ঘাটিত করতে চায়। আর যা সে কথা বলে তাই সাহিত্য, সাহিত্যের সারবিন্দু। 'আমাকে রসে-বশে রাখিস মা, আমাকে শুকনো সন্ন্যেসী করিস নে' এই প্রার্থনাই একদিন করেছিল গদাধর। আমাকে 'রস' দিস, কিন্তু সেই সংগে 'বশে' রাখিস। আমাকে উচ্ছাস দে, সংগে সংগে সংযমও দে। ভাবের সংগে-সংগে রূপকেও বিকশিত কর্। আমি তোর কবি হব। তুই যদি মা আদি দেবী, আমিও তোর আদি কবি। কত আর মূর্তি গড়ব, মা, আমি নিজেই এখন নিজেকেই মূর্তি বানাই!

প্রায়ই আজকাল ভাবসমাধি হয় গদাধরের। হরিবাসরে, শিবের গাজনে, মনসা-ভাসানে কোথাও একটু দেব-দেবীর নাম-গান হলেই হয়! শুনতে শুনতে গদাধর একেবারে বিহ্বল-তন্ময়। সেই তন্ময়তা একটু গাঢ় হলেই ভাবসমাধি। চন্দ্রমণি আগে-আগে ভয় পেতেন, ছেলেকে বুঝি দানোতে পেয়েছে। এখন দেখেন নিজের ভাবে যেমন ডুবে যায় তেমনি আবার নিজের ভাবে উঠে আসে। রোগের চিহ্ন নেই শরীরে। দর্পণের আভা যেন তার সারা গায়ে চমক দিচ্ছে। সেই দর্পণে যেন দেখা যাচ্ছে আরেক মূর্তি—আরেক দেহ! চিন্ময় মূর্তি, চিন্ময় দেহ।

কিন্তু দাদারা ধরে নিয়েছেন বায়ুরোগ হয়েছে। তাই তার উপর আর পড়া-শোনার তাড়া নেই, যেমন ইচ্ছে ঘুরে বেড়াও। তবু গদাধরের পাঠশালাতে একবার যাওয়া চাই। সংসার চলে না দেখে রামকুমার কলকাতায় গেলেন, সেখানে গিয়ে টোল খুললেন—গদাধরের তখন বারো-তেরো বছর বয়েস, তখনো সে পাঠশালায় যাচ্ছে। পড়তে নয়, ছোকরাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে, দল বাঁধতে। যারা প'ড়ে জ্ঞানী-গুণী হবে তাদেরকে চিনে রাখতে। যতই কেন না আড্ডা দিক, রঘুবীরের পূজা ঠিক সেরে রাখে, মা'র ঘরকন্নার কাজে যোগান দেয়। রামেশ্বরের উপর সংসারের ভার, কিন্তু সেও রঘুবীরের উপর বরাত দিয়ে বসে আছে চুপ করে। মনে-মনে বিশ্বাস, গদাইয়ের যখন অত তুকতাক, তখন একটা কিছু হবেই। যিনি চিন্তামনি তিনিই যখন নিশ্চিন্ত, তখন চিন্তা করে লাভ কি!

বাড়িতে কাজ-ছুট বসে আছে গদাধর—গাঁয়ের মেয়েদের সঙ্গে তার বড় বনিবনা। দুপুর বেলা সবাই জোট বেঁধে চন্দ্রমণির কাছে আসে, আর গদাধরকে হরিনাম গাইতে ফরমাস করে। কিংবা কোনো দিন বায়না ধরে, ধর্মের কোনো উপাখ্যান বলো। এর চেয়ে আর মনোগত বিষয় কী আছে গদাধরের? গদাধর তখুনি তৈরি! 'মা গো, তুমিও বসে যাও—' 'না রে, বাবা, আমার হাতের কাজ এখনো শেষ হয়নি!' 'সে কি কথা, আমরা আপনার কাজ সেরে দিচ্ছি।' সমাগত মেয়েরা চন্দ্রমণির হাতের কাজ চটপট সেরে দিলে। চন্দ্রমণি বসলেন স্থির হয়ে। গদাধর গান ধরলে, কোনো দিন বা পাঠ। গাঁয়ে যত ভাগবত পাঠ বা গান-কীর্তন হয়, সব শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে গদাধরের। তারপর যা কখনো সে শোনেনি সে সব কথাও তার মুখে এসে জোটে। মেয়েরা তন্ময় হয়ে শোনে। সময়ের হুঁস থাকে না। বিকেলে যে আরেক কিস্তি কাজ আছে বাড়িতে তা ভুল হয়ে যায়। গদাধরের সঙ্গে-সঙ্গে তারাও নাম করে।

নাম কি কম? যা নাম তাই তো রাম। সত্যভামা যখন তুলাযন্ত্রে সোনাদানা দিয়ে ঠাকুরকে ওজন করেছিলেন তখন হল না। কিন্তু রুক্মিণী যখন এক দিকে তুলসী আর কৃষ্ণনাম লিখে দিলেন তখন ঠিক ওজন হল। নামের এমনি গুণ। তবু নামের সঙ্গে অনুরাগ চাই। যে প্রিয় তাকে শুধু নাম ধরে ডাকলেই চলে না, তার সঙ্গে চাই একটু প্রেম। যদি নাম করতে করতে দিন-দিন অনুরাগ বাড়ে,

আর অনুরাগের সঙ্গে আনন্দ, তা হলে আর ভয় নেই। বিকার কাটবেই কাটবে। তার পরেই তিনি আকারিত হবেন।

ধর্মদাসের মেয়ে প্রসন্ন গদাধরকে ভাবে গোপাল। আর, মেয়েদের মতন এমন হাব-ভাব করে গদাধর, আর-আর মেয়েরা তাকে বলে রাধারাণী।

সীতানাথ পাইনের প্রকান্ড সংসার। আট ছেলে সাত মেয়ে। তা ছাড়া জ্ঞাতি-গুষ্টিও অনেক। তার ঘরে রোজ দশটা শিলে বাটনা বাটা হয়। এত লোকের জায়গা কার আঙিনায় হবে? তাই গদাধরকে ডেকে নিত সীতানাথ। বলত, আমার বাড়িতে কীর্তন করবে এসো। সীতানাথের বাড়ির মেয়ে-বউরা ঘোরতর পর্দানশিন, সূর্যের সঙ্গে মুখ-দেখাদেখি হয় না। তারা কি করে তবে এই স্বরতরঙ্গ শোনে! কি করে দেখে সেই অনিন্দ্যসুন্দরকে! তারা চন্দ্রমণির সামনে পর্যন্ত বেরোয় না—অথচ গদাধরকে তাদের সংকোচ নেই। গদাধর যেন তাদের অন্তরের মানুষ। ইহকাল-পরকাল সকল কালের চেনা লোক।

কিন্তু দুর্গাদাস পাইনের এটুকুতেও আপত্তি। দুর্গাদাস এই বেনে-পাড়ারই লোক, সীতানাথের প্রতিবেশী। এত বড় ছেলে কেন বাড়ির ভিতরে এসে মেয়েদের সঙ্গে বসে গান করবে এতে তার প্রবল আপত্তি। হোক হরিনাম, হোক গদাধর হীরের টুকরো ছেলে, তবু সমাজ-সংসারে মেয়েদের সম্ভ্রমরক্ষার যে নিয়ম তা মানতে হবে বৈ কি। আমার সংসারে মেয়েদের এমন বেচাল নেই—এমন উটকো লোক কেউ ঢুকতে পারে না আমার বাড়িতে। খুব বরফট্টাই করতে লাগল দুর্গাদাস। কই একটা কাকপক্ষী গিয়ে তার বাড়ির ভিতরের খবর জেনে আসুক তো, দেখে আসুক তো তার মেয়েদের মুখ! আটঘাট বাঁধতে জানা চাই বুঝলে? হরিনামের পথে ধুলোট হতে দিতে নেই।

সন্ধের দিকে বৈঠকখানায় বসে বন্ধুদের সামনে এমনি তম্বি করছেন দুর্গাদাস। এমনি সময় ঘরের দরজায় একটি মেয়ে এসে উপস্থিত। বেশভূষা দেখেই চিনতে পারলেন দুর্গাদাস। তাঁতিদের কারু মেয়ে হয়তো। পরনে হাতে-বোনা মোটা ময়লা শাড়ি, হাতে রুপোর ভারি পৈঁছা, কাঁখে চুবড়ি—তাতে কয়েক লাছি সুতো।

'কোত্থেকে আসছ?' দুর্গাদাস প্রশ্ন করলেন।

'হাট থেকে।' লজ্জায় জড়সড় হয়ে-মুখে ঘোমটা টানল মেয়ে।

'কি হয়েছে? চাও কি?'

সংক্ষেপে মেয়েটি যা বললে তাতে বিশেষ বিচলিত হবার কিছু নেই। পাশের গাঁয়ে মেয়েটির বাড়ি, সঙ্গিনীদের সঙ্গে হাটে গিয়েছিল সুতো বেচতে। হাটের পর বাড়ি ফেরার পথে মেয়েটি দেখলে সঙ্গিনীরা তাকে ফেলেই চলে গিয়েছে। এখন এই ভর-সন্ধের সময় একা-একা বাড়ি ফিরতে তার ভয় করছে। যদি আজকের রাতের মত একটু আশ্রয় পায় তো বেঁচে যায়।

'বেশ তো, ভেতরে যাও, মেয়েদের গিয়ে বলো, থেকে যাবেখন রাতটা। এ আর বেশি কথা কি!' দুর্গাদাস উদারতায় প্রসারিত হলেন।

শরণাগতা প্রণাম করল দুর্গাদাসকে। অন্তঃপুরে গিয়ে বললে সব মেয়েদের।

আগন্তুকাকে ঘিরে ধরল সবাই। অল্প বয়স, মিষ্টি কথা, আতান্তরে পড়েছে, সবাই সহানুভূতিতে নরম হল। বললে, থাকবে বৈ কি, একশো বার থাকবে, তার আগে হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খাও। কি যেন একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে মেয়েটির। যে তাকে দেখে তারই মনে মমতা লেগে থাকে। থাকবার জায়গা ঠিক হল এক ধারে, মুড়ি-মুড়কি দিয়ে দিব্যি জলযোগ করলে। তন্ন-তন্ন করে দেখে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়াতে লাগল মেয়েটি, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করলে, ভাব করলে, জেনে নিলে সুখ-দুঃখের ইতিহাস! যেন কি জাদু জানে, এক মুহূর্তে অন্তরের অংগ হয়ে উঠল।

অন্ধকারে রামেশ্বর চলেছে হনহন করে।

'এ কি, কোথায় চলেছেন এত রাতে?'

'সীতানাথের বাড়িতে।'

'সেখানে কি?'

'গদাইকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এত রাত হ'ল, এখনো তার ফেরবার নাম নেই। মা ঘর-বার করছেন। কোথাও মুচ্ছো গেল কি না কে জানে।'

'ঐ সীতানাথের বাড়িতেই আছে ঠিক। সারা দিন-রাত ঐখানেই পাঠ-কীর্তন করে। ঐখানে গিয়েই হাঁক দিন।'

না, সীতানাথের বাড়িতে যায়নি আজ গদাধর। রামেশ্বর চোখে অন্ধকার দেখল। রাত করে কোথায় এখন তাকে খুঁজবে ভেবে পেল না। পাইন-পাড়ার ঘরে-ঘরে অসহায়েব মত সে হাঁক দিয়ে ফিরতে লাগল—'গদাই, গদাই,—গদাই আছিস্?'

তাঁতি-মেয়ে পা ছড়িয়ে বসে মেয়েদের সঙ্গে খোস-গল্প করছে, এমন সময় শুনতে পেল, কে উঁচু গলায় হাঁক পাড়ছে বাইরে থেকে। কার নাম ধরে ডাকছে? কান খাড়া করল তাঁতিনী। লাফিয়ে উঠল।

'যাচ্ছি গো দাদা—এই যে আমি এইখানে।' বলে সেই তাঁতিনী এক ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল।

বাড়ির মেয়েরা সব বললে গিয়ে দুর্গাদাসকে। দুর্গাদাস চুপ করে রইলেন। খানিক পরে বললেন, 'প্রভু আমার অহঙ্কার চূর্ণ করেছেন।'

তাই ঠাকুর বলেছেন উত্তর কালে: 'আপনাতে মেয়ের ভাব আরোপ করলে কামাদি-রিপু নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক মেয়েদের মতন ব্যবহার হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমি অনেক দিন মেয়েদের মত কাপড়-গয়না পরে ওড়না গায়ে দিয়ে সখীভাবে ছিলুম। আবার ঐ ভাবেই আরতি করতুম। তা না হলে পরিবারকে আট মাস কাছে এনে রাখতে পারতুম? দু'জনেই মা'র সখী। আমি আপনাকে শুধু পুরুষ বলতে পারি কই। একদিন আমার ভাবাবস্থায় পরিবার জিগ্গেস করলে: আমি তোমার কে? আমি বললুম: আনন্দময়ী!'

গ্রামে কিছুই হচ্ছে না গদাধরের। তাই তাকে কলকাতায় নিয়ে এলেন রামকুমার। কিন্তু গদাধরের মন গ্রামের মাঠে-ঘাটে ঘুরঘুর করে। কত চেনা মুখ, কত মন-কাড়া ভালোবাসা। এই ইট-কাঠের জটিলতার মধ্যে পাওয়া যাবে কি সেই সরল মমতা? সেই নিঃসংগ থাকার শান্তি?

নির্জনে না হলে ভক্তি লাভ হবে কি করে? তাকে ভাববো কোথায়? চাল কাঁড়ছো, একলা বসে কাঁড়তে হয়। একেক বার চাল হাতে করে তুলে দেখতে হয়, সাফ হল কেমন। তা কাঁড়বার সময় যদি পাঁচ বার ডাকে, ভালো কাঁড়া কেমন করে হবে?

কত জনাকেই মনে পড়ে। মনে পড়ে বৃন্দার মাকে। বৃন্দার মা জেতে বামুন, গদাইকে নিজ হাতে হামেসা রান্না করে খাওয়ায়। কিন্তু খেতির মা জেতে ছুতোর, ইচ্ছে থাকলেও ঘরে ডেকে এনে খাওয়াতে পারে না। মনটা কেবল আঁটুবাঁটু করে। মনের কথা মুখে ফোটে না। ধনী কামারণীর বোন শঙ্করী কাছে-পিঠেই থাকে। তাকে একদিন জিগ্‌গেস করলে গদাধর: 'আচ্ছা বলতে পারো, খেতির মা আমাকে কি বলতে চাইছে, অথচ যেন বলতে পাচ্ছে না?'

শঙ্করী তো থ! 'মনের কথাও জানতে পেরেছ তা হলে? বেশ, তবে বলো, কি খাবে, আমি নিয়ে আসছি।'

'খাবো তো, এখানে এই পথের মাঝখানে খাব না কি? তার ঘরে যাব, ঘরে গিয়ে মেঝের উপর আসন পেড়ে বসে খাব। যা সে নিজের হাতে রেঁধে দেবে—সমস্ত। তার মনের সাধ পূর্ণ করব ষোলো আনা।'

তাই গেল ঠিক ছুতোর-বাড়ি। খেতির মা'র হাতের রান্না খেল সে তৃপ্তি করে। খেতির বাপ কিন্তু স্ত্রীর অনাচার সহ্য করতে পারল না। অনাচার বৈ কি। ছোট জাতের মেয়ে, উচ্চবর্ণের জাত মেরে দিলি? দেবতা খেতে চাইবে বলে তুই তার অন্ন যোগাবি? রাগে দিশেহারা হয়ে গেল খেতির বাপ। পায়ের খড়ম তুলে শক্ত কয়েক ঘা বসিয়ে দিল স্ত্রীর পিঠের উপর।

খেতির মা টলল না একচুল। বললে, 'যতই কেন না মারো আর ধরো, আমার আর কিছুতেই দুঃখ নেই। ঠাকুরের প্রসাদ খেয়েছি আমি।'

আর মনে পড়ে চিনু শাঁখারিকে।

বয়েস হয়েছে, ছোট দোকান, কষ্টে দিন গুজরায়। কিন্তু গদাধর যখনই দোকানে এসে বসে, মনে হয় কোথাও যেন আর কষ্ট নেই। রাত যতই অন্ধকার হোক, গদাধর যেন চিরন্তন সুপ্রভাত। যাই একটু বাড়তি রোজগার হয় তাই দিয়ে মিষ্টি কিনে গদাধরকে খাওয়ায়। গদাধর খায় আর চিনু দেখে। ওদিকে খদ্দের এসেছে দোকানে, সেদিকে খেয়াল নেই। গদাধরকে যেন চিনতে পেরেছে চিনু। তার নাম যখন চিনু তখন সে-ই তো প্রথমে চিনতে পারবে।

একদিন হলো কি, চিনু ফুল তুলে পরিপাটি করে মালা গাঁথলে। কোঁচড়ে করে লুকিয়ে মিষ্টি কিনে আনলে বাজার থেকে। গদাধরকে বললে, 'চলো।'

'কোথায় ?'

'মাঠে। যেখানে কেউ কোথাও নেই। যেখানে কেবল তুমি আর আমি।'

চিনিবাস গদাধরকে নিয়ে মাঠের মধ্যে এসে দাঁড়াল। দৃষ্টির গোচরে নেই কোথাও জনমানুষ। উপরে আকাশ-ভরা শান্তির নীলিমা। মালা-মিষ্টি পাশে রেখে হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে বসে রইল চিনিবাস। সামনে গদাধর। কৃষ্ণকিশোর।

'এ কি চিনিবাসদা, এ কি করছ ? তার চেয়ে মিষ্টির ঠোঙাটা হাতে দাও।'

'দিচ্ছি গো দিচ্ছি—'

আগে মালা দিলে গলায়। কৃষ্ণের গলায় অতসী ফুলের মালা। পরে হাতে করে খাওয়াতে লাগল গদাধরকে। ব্রজের ননীগোপালকে। জলে চোখ ভেসে যাচ্ছে চিনিবাসের। মিষ্টিভরা হাত কখনো পড়ছে গিয়ে গদাধরের নাকে, কখনো চোখে, কখনো কপালে। গদাধর হাসছে আর খাচ্ছে। খাওয়ানোর পর আবার স্তব করতে বসল চিনিবাস। বললে, 'বুড়ো হয়েছি, বাঁচব না বেশি দিন। মর্তধামে তোমার কত লীলা-খেলা হবে, কিছুই দেখতে পাব না। তবু আজ যে আমাকে একটু চিনতে দিলে দয়া করে, তাই আমার পারের কড়ি হয়ে রইল।'

মস্ত অসুরের মত স্বাস্থ্য ছিল চিনিবাসের। দু'হাতে তুলে গদাধরকে কাঁধে চড়িয়ে বীরবিক্রমে নৃত্য করত। বলত, 'তুমি আমাকে দাদা বলো—চিনিবাস দাদা। আমি যদি তোমার দাদা হই, তবে আমি তো বলরাম।' বলে আবার নৃত্য।

তুমি সমুদ্র আর আমি সামান্য শঙ্খকার।

একবার, মনে পড়ে, চিনু শাঁখারির পায়ে পড়েছিল গদাধর। শুধু চিনুর নয় আর-আর সমবয়সীদেরও। কি খেয়াল হল, সবার পায়ে ধরে ধরে গদাধর মিনতি করতে লাগল, 'ওরে তোদের পায়ে পড়ি, একবার হরিবোল বল—'

সকলে তো অবাক। যত ছোটজাতের লোক, নুয়ে পড়ে সকলের পায়ে ধরা !

আসল কথা বুঝেছিল চিনিবাস। বলেছিল, 'তোমার এখন প্রথম অনুরাগ, তাই সব সমান দেখছ। জাত-বেজাত স্তর-পঙ্‌ক্তি দেখছ না। প্রথম যখন ঝড় ওঠে তখন আম-গাছ, তেঁতুল-গাছ সব এক বোধ হয়। এটা আম, এটা তেঁতুল—চেনা যায় না।'

নবানুরাগের বর্ষা। নবানুরাগে মান-আপমান থাকে না। ছায়া-কায়া থাকে না। সব তুমি-ময়। মরে যাবে চিনিবাস—এই তার দুঃখ। বয়সে সে জীর্ণ হয়ে এসেছে। মরে গেলে দেখতে পাবে না এই নিত্যলীলা।

রাবণ-বধের পর রাম-লক্ষ্মণ যখন লঙ্কার প্রাসাদে গিয়ে ঢুকলেন, দেখলেন, রাবণের বুড়ি মা নিকষা পালিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্মণ বিদ্রূপ করে উঠল—যার ছেলে-নাতি-পুতি সব গেল, বংশে যার বাতি দেবার কেউ নেই, তার কিনা নিজের প্রাণের উপর এত টান ! নিকষাকে রাম কাছে ডাকিয়ে আনলেন, জিগ্‌গেস করলেন, তুমি পালিয়ে যাচ্ছ কেন ? তোমার কিসের ভয় ? নিকষা বললে, আমার আর কিছু ভয় নেই, ভয়, যদি মরে গিয়ে তোমার এত লীলা না আর দেখতে পাই। বেঁচে ছিলাম বলেই তো দেখলাম তোমাকে। তাই এখনো বাঁচবার সাধ যেতে চায় না।

কিন্তু কলকাতায় এসে গদাধরের কি চুপচাপ করে বসে থাকলে চলবে ? কত সাধ করে তাকে নিয়ে এসেছেন রামকুমার। অক্ষয়কে জন্ম দিয়েই রামকুমারের স্ত্রী মারা গেল আঁতুড়ে—সেই থেকেই সংসারে অনটন। ছেলে গর্ভে আসতেই কেমন হয়ে গিয়েছিল বৌদি, কাঁধে অলক্ষ্মী চেপেছিল। সংসারে নিয়ম ছিল, যে-ছেলের এখনো পৈতে হয়নি সেই ছেলে কিংবা রুগী ছাড়া আর কেউ রঘুবীরের পুজোর আগে জলস্পর্শ করতে পারবে না। রামকুমারের স্ত্রী সেই নিয়ম অমান্য করতে লাগল। বাধার উত্তরে করতে লাগল অবাধ্যতা। রামকুমার বুঝলেন, স্ত্রীর মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, আর সেই সংগে বা অমংগলের দিন। হলও তাই। স্ত্রী চলে গেল। সংসারে এল কঠিন দুর্ভাগ্য।

গদাধরের পরে আরেকটি বোন ছিল, সর্বমংগলা। গৌরহাটির রামসদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে তার বিয়ে দিলে, যখন আট পেরিয়ে নয়ে পড়েছে। আর রামসদয়ের বোনের সংগে বিয়ে দিলে রামেশ্বরের। রামেশ্বর গৃহস্থালি দেখুক, তুই, গদাধর, কলকাতা চল্। ওখানে টোল খুলেছি, একটা কিছু হিল্লে তোর হবেই। অন্তত শান্তি-স্বস্ত্যয়নটা তো শিখবি। কলকাতায় অনেক বড় লোকের বাসা, যদি মানুষ হতে পারিস, টাকার জন্যে ভাবতে হবে না। সংসার স্বচ্ছন্দ হবে।

টাকা ? টাকা দিয়ে আমার কী হবে ? আমি তো অবিদ্যার সংসার করতে আসিনি। আমি কি ঐশ্বর্যভোগ চাই, না, দেহের সুখ চাই ? না, চাই 'লোকমান্য' ?

আর, তুমিই বা অত ভাবছ কেন ? যে ঠিক ভক্ত, সে চেষ্টা না করলেও ঈশ্বর তার সব জুটিয়ে দেবেন। যে ঠিক রাজার বেটা সে মাসোয়ারা পায়। যে সদ্-ব্রাহ্মণ, যার কোনো কামনা নেই, হাড়ির বাড়ি থেকে হলেও তার সিধে আসে। যেমনি আসে তেমনি যায়। এই যদৃচ্ছা লাভই ভালো। সাঁকোর তলা দিয়েই জল বেরিয়ে যায় সহজে। সঞ্চয় করে কি হবে ? কত কষ্ট করে মৌমাছি চাক তৈরি করে, কে আরেক জন এসে ভেঙে দিয়ে যায়। উপার্জন করাই কি জীবনের উদ্দেশ্য ? নরজন্ম পেয়েছি, ঈশ্বর দর্শন করব না ?

লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারি প্রায়ই আসত দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরের বিছানা ময়লা দেখে তার বড় ক্ষোভ। বললে, 'আমি তোমাকে দশ হাজার টাকা লিখে দিচ্ছি—তা দিয়ে তোমার সেবা হবে।'

যেই এ কথা শোনা, ঠাকুর অমনি বাহ্যজ্ঞানহীন হয়ে পড়লেন। কে যেন মাথায় লাঠি মারলে! বাহ্যজ্ঞান পাবার পর বললেন বিমর্ষ কণ্ঠে: 'অমন কথা মুখে এনো না। অমন কথা যদি আর বলো, তোমার এখানে এসে তবে কাজ নেই।'

'কেন, কি হল ?'

'তুমি জানো না, আমার টাকা ছোঁবার জো নেই—কাছেও রাখবার জো নেই।'

লক্ষ্মীনারায়ণও ছাড়বার পাত্র নয়। সে বেদান্তবাদী। তর্কপটু। 'তা হলে এখনো আপনার ত্যাজ্য-গ্রাহ্য আছে ?' লক্ষ্মীনারায়ণ হাসল: 'তবে তো জ্ঞান হয়নি আপনার!'

'না বাপু, অত দূর হয়নি এখনো।'

যারা-যারা কাছে বসে ছিল, হেসে উঠল। তবু লক্ষ্মীনারায়ণ দমবে না। সে ধরল হৃদয়কে। হৃদয় মানে হৃদয়রামকে, ঠাকুর যাকে ডাকতেন হৃদে বলে। ক্ষুদিরামের বোন রামশীলার মেয়ে হেমাঙ্গিনী। তারই ছেলে এই হৃদয়।

হৃদয়কে দিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ গছাতে চাইল টাকা। বললে, 'আমি হৃদয়কে দিচ্ছি।' 'তা হলে আমাকেই বলতে হবে, একে দে, ওকে দে। না দিলে রাগ হবে মনে মনে, অভিমান হবে। টাকা কাছে থাকাই খারাপ। আরশির কাছে জিনিস রাখতে নেই। জিনিস থাকলেই প্রতিবিম্ব হবে। বুঝলে, ও সব হবে না এখানে—যে ঠিক রাজার বেটা সে মাসোয়ারা পায়।'

গদাধর কি রাজার বেটা নয়? বাবাকে মনে পড়ে গদাধরের। স্নান করবার সময় জলে দাঁড়িয়ে "রক্তবর্ণং চতুর্মুখং" বলে ধ্যান করতেন, আর তাঁর চোখ জলে ভেসে যেত। খড়ম পায়ে দিয়ে যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন, গাঁয়ের দোকানিরা দাঁড়িয়ে পড়ত। বলত, ঐ তিনি আসছেন। যখন উনি স্নান করতেন তখন আর কেউ সাহস করে নাইতে যেত না। খোঁজ নিত—তিনি কি স্নান করে গেছেন? রঘুবীর-রঘুবীর বলতেন আর তাঁর বুক লাল হয়ে যেত।

সেই বাপের ছেলে গদাধর।

শুধু এইটুকুই তার পরিচয়? কে বলে! সে জগৎপিতার ছেলে। সে পড়াশোনা জানে না। শাস্ত্র-সংহিতা সে কিছু ছোঁয়নি। সে হয়তো পুরো 'বাবা' বলে ডাকতে পারে না, উচ্চারণ জানে না সবটার, সে হয়তো আধো-আধো ভাষায় শুধু 'পা' বলে। বাপের টান কি শুধু 'বাবা' বলা ছেলের উপর বেশি হবে, 'পা' বলা ছেলের চেয়ে? না, বাবা বলবেন, এ আমার কাঁচা ছেলে, বাবা ঠিক বলতে না পারলেও ডাকছে ঠিক আকুল হয়ে, অতএব একেই আগে কোলে নিই হাত বাড়িয়ে! কিন্তু সেই যে বাবা স্বপ্ন দেখলেন গয়াধামে গিয়ে, রঘুবীর বলছেন তোমার ঘরে আমি ছেলে হয়ে জন্মাব, তার কি হবে? তবে, আসলে, তার কি কেউ পিতা নেই? সে তবে কে?

এই আত্মদর্শনই তো ঈশ্বরদর্শন।

* ৮ *

রানি রাসমণি কাশী যাবেন। কৈবর্তের মেয়ে, কিন্তু আসলে অষ্ট সখীর এক সখী। কলকাতার জানবাজারের জমিদার রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রী। কিন্তু মন রয়েছে কালিকার পাদপদ্মে। চার কন্যার মা। আর, তৃতীয় কন্যা করুণাময়ীর স্বামী মথুরামোহন বিশ্বাস। আমাদের সেজবাবু। বিয়ের অল্প কাল পরেই মারা যায় করুণাময়ী। রাসমণি চতুর্থ কন্যা জগদম্বার সঙ্গে মথুরামোহনের বিয়ে দেন। কিন্তু নাম তার সেই সেজবাবুই থেকে গেল।

স্বামী রাজচন্দ্র তখন গত হয়েছেন। বাড়ির পাশেই গোরা সৈন্যদের ব্যারাক।

একদিন মাতাল হয়ে এক দল সৈন্য ঢুকে পড়ে বাড়ির মধ্যে। আত্মীয়-পুরুষেরা কেউ বাড়িতে নেই, রুখতে গিয়ে ঘায়েল হয়েছে দারোয়ানেরা। সৈন্যরা বাড়ি লুঠ করতে শুরু করেছে। এখন কি করেন রাসমণি? রাসমণি অস্ত্র ধরলেন। ছিলেন লক্ষ্মী, হয়ে দাঁড়ালেন রুদ্রচণ্ডী চামুণ্ডা।

রাজেন্দ্রাণী রাসমণি। রাজেন্দ্রাণী হয়েও অন্তরে ভিখারিণী। তেজস্বিনী হয়েও মমতার গঙ্গা-মৃত্তিকা। সংসারে কিছুই চান না, শুধু সেই মহাযোগেশ্বরী মহাডামরী সাট্টহাসা মহাকালীর রাঙা পা দুখানি কামনা করেন। শেরেস্তায় যে শিলমোহর চলতি, তাতে তাঁর নাম লেখা—"কালীপদ-অভিলাষী শ্রীমতী রাসমণি দাসী।" ঐশ্বর্যের শয়নে শুয়েছেন, কিন্তু উপাধান হয়েছে বিশ্বেশ্বরীর উৎসঙ্গ।

বারো শো পঞ্চান্ন সাল। রানি কাশী যাবেন মনস্থ করেছেন। দর্শন করবেন অন্নপূর্ণাকে, মহাভিক্ষুক বিশ্বনাথকে। অঢেল টাকা এ জন্যে আলাদা করা আছে। অজস্র হাতেই তা ব্যয় করবেন। ঘাটে বাঁধা হয়েছে নৌকো, সারি-সারি প্রায় একশোখানি। থরে-থরে সম্ভার সাজানো হয়েছে। কত দাস-দাসী আত্মীয়-পরিজন। সবাই বিশ্রাম করছে নৌকোতে। শুধু একজন জেগে আছে। সে স্বয়ং কুবের। রানির কোষাগারের দ্বারপাল।

রাত। নৌকোর বহর ছেড়ে দিয়েছে। রানি ঘুমিয়ে পড়েছেন। উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম পর্যন্ত এসেছেন, স্বপ্ন দেখলেন রাসমণি। দেখলেন দেবী ভবতারিণী নিজে এসে দাঁড়িয়েছেন। বলছেন, 'কাশী যাবার দরকার নেই। এই ভাগীরথীর পারেই আমাকে প্রতিষ্ঠা কর্। আমাকে অন্নভোগ দে।'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন রাসমণি। ওরে, নৌকো ফিরিয়ে নিয়ে চল্। আর কাশী যেতে হবে না। স্বয়ং কাশীশ্বরী এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে।

প্রথমে ভেবেছিলেন গঙ্গার পশ্চিম কূলে বালি-উত্তরপাড়ায় জমি নেবেন। কথায় আছে, গঙ্গার পশ্চিম কূল, বারাণসী সমতুল। কিন্তু ও-অঞ্চলের জমিদারের বুদ্ধি-শুদ্ধি আজগুবি। টাকার লোভে জমি দিতে তাঁদের আপত্তি নেই, কিন্তু সেই জমিতে পরের টাকায় যে ঘাট তৈরি হবে সে ঘাট দিয়ে তাঁরা গঙ্গায় নাইতে যাবেন না। না যাবেন তো না যাবেন—এমন কথা বলতে পারলেন না রাসমণি। তিনি পূর্ব কূলে উপস্থিত হলেন।

পূর্ব কূলে দক্ষিণেশ্বর। এক লপ্তে ষাট বিঘে জমি কিনলেন রাসমণি। জমির কতক অংশের মালিক ছিল হেস্টি নামে এক সাহেব, আর বাকি অংশে মুসলমানদের কবরখানা আর গাজী পীরের থান। জমির গড়ন খানিকটা কচ্ছপের পিঠের মত। তন্ত্রমতে অমন জমিই শক্তিসাধনার অনুকূল। তাই, সন্দেহ কি, ঐ পূর্ব কূল দেবীই নির্বাচিত করেছেন পূর্ব থেকে।

নয় লাখ টাকায় মন্দির আর মূর্তি তৈরি হল। নবরত্নবিশিষ্ট কালীমন্দির, উত্তরে রাধাগোবিন্দের মন্দির, পশ্চিমে দ্বাদশ শিবমন্দির আর দক্ষিণে নাটমণ্ডপ। মধ্যস্থলে প্রশস্ত চত্বর। উত্তরে-দক্ষিণে-পূবে আরো তিন সার দালান—সব মিলে অতিকায় দেবায়তন। সম্পূর্ণ হতে লেগেছিল প্রায় দশ বছর।

এই দশ বছর—উদ্যোগ থেকে উদ্‌যাপন পর্যন্ত—রাসমণি ব্রতধারিণী হয়ে

ছিলেন, ছিলেন কঠোর নিয়মে-সংযমে। ত্রিসন্ধ্যা স্নান করেছেন, হবিষ্যান্ন খেয়েছেন, শুয়েছেন শুকনো মেঝের উপর। আর জপ করেছেন অবিশ্রান্ত। কিসের জন্যে এত অনুষ্ঠান? এই দেহ-মনকে যদি তাঁর উপযুক্ত বাহন করতে না পারি, তবে দেবী শুনবেন কেন আবাহন? হয় আসবেন না, নয় তো এসে ফিরে যাবেন।

তৈরি হল মন্দির। তৈরি হল দেবীমূর্তি। পণ্ডিতেরা পাঁজি দেখতে লাগলেন মন্দিরপ্রতিষ্ঠার শুভদিন কবে ঠিক করা যায়! মূর্তি ছিল বাক্সের মধ্যে বন্দী হয়ে। দেখা গেল, মূর্তি ঘামছে। রাত্রিযোগে স্বপ্ন দেখলেন রাসমণি। ক্লান্ত-কাতর কণ্ঠে ভবতারিণী বলছেন, 'আমাকে আর কত দিন কষ্ট দিবি এমনি বন্ধ করে রেখে। শিগ্‌গির আমাকে মুক্তি দে—'

রানি অধীর হয়ে উঠলেন। আর দেরি করা যায় না। আসন্ন যে কোনো শুভ দিনেই প্রতিষ্ঠিত করতে হয় দেবীকে। স্নানযাত্রার দিনই নিকটতম শুভদিন। কিন্তু এ দেবী শক্তিস্বরূপিণী—একে বিষ্ণু-পর্বাহে প্রতিষ্ঠিত করা যায় কি করে? হোক বিষ্ণু-পর্বাহ, তবু আর অপেক্ষা করা যায় না—মা আকুল হয়ে উঠেছেন। যা শক্তি তাই মাধুরী—তাই "পরমাসি মায়া"। যিনি কালী, তিনিই লক্ষ্মী, তিনিই লজ্জা। যিনি মুণ্ড-মালিনী, তিনিই পদ্মালয়া। সর্বার্থসাধিকা।

বারো শো বাষট্টি সালের বারোই জ্যৈষ্ঠ স্নানযাত্রার দিনে মন্দির প্রতিষ্ঠা হ'ল। দেবী ভবতারিণী। পাষাণময়ী অথচ করুণাদ্রবা। মৃত্যুবর্জিতা শিবসুন্দরী। ত্রিনয়নী, তেজোরূপোজ্জ্বলা। পুরাতনী, পরমার্থা। কাললোকবাসিনী কালী কপালিনী। রূপার সহস্রদল পদ্ম, তার উপর দক্ষিণ শিয়রে শবীভূত শিব শুয়ে আছেন। তারই হৃদয়ের উপর পা রেখে দাঁড়িয়েছেন ভবতারিণী। পরনে লাল বেনারসি, মাথায় মুকুট, গলায় সোনার মুণ্ডমালা। নানা অলঙ্কারে ঝলমল করছেন সর্বাঙ্গে। কটিতটে সারে-সারে খণ্ডিত নরকর। দেবী চতুর্ভুজা—দুই বাম করে নৃমুণ্ড আর অসি, আর দক্ষিণ দুই হাতে বর ও অভয়মুদ্রা। দেবী দক্ষিণাস্যা।

এততেও যেন সম্পূর্ণ হল না। সোয়া দু'লাখ টাকায় দিনাজপুর জেলার শালবাড়ি পরগনা কিনলেন। মা'র সেবায় দান করলেন শালবাড়ি। তবুও হল না পুরোপুরি। মা অন্নভোগ চেয়েছেন, তার ব্যবস্থা কি? পণ্ডিতেরা বললেন, তার বিধি নেই।

মাকে চাট্টি খেতে দেব ভক্তি করে, তার বিধি নেই?

না, নেই। তুমি রানি হলে কি হবে, তুমি শূদ্রাণী। শূদ্রাণীর অধিকার নেই দেবতাকে ভোগ দেবার। ব্যথায় চমকে উঠলেন রাসমণি। এ কিছুতেই হতে পারে না। বিধিতে আর ভক্তিতে এত প্রভেদ কি করে সম্ভব? নিচু ঘরে জন্মেছি বলে কি আমি মা'র সন্তান নই? মা কি নিচু হয়ে অন্ন খান না? না। প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম করবেন রাসমণি। এ বিধি নয়, বিধি-বিড়ম্বনা। এ কিছুতেই মানতে পারব না। অভুক্ত থাকতে দেব না মাকে। তাঁর নিত্য ভোগের ব্যবস্থা করব।

সাবধান! অমন যদি কিছু করো, ব্রাহ্মণেরা মন্দিরে এসে প্রসাদ নেবে না। তোমার দেবালয় অধর্মাশ্রিত হবে।

তবে উপায় ? রানি দিকে-দিকে লোক পাঠালেন। টোলে বা চতুষ্পাঠীতে, কোথাও কেউ কোনো ব্যবস্থা দিতে পারে কি না। সবাই একবাক্যে বললে, কৈবর্তের মেয়ে দেবীকে অন্নভোগ দেবার অধিকারী নয়।

রানি আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। এতে কাঁদবার কি আছে ? এত বড় একটা কীর্তি স্থাপন করলে, দেশে-দেশে তোমার নাম ছড়িয়ে পড়ল—এ কি কম কথা ? কী হবে অন্নভোগে ? অন্নপূর্ণার কি অন্নের অভাব আছে সংসারে ? তবু মেয়ের সংসারে মা এলে কি মেয়ে তাঁকে উপবাসী রাখে ? আমি নাম-কাম চাই না। আমি চাই ভক্তি। আমি চাই সন্তোষ। মাকে অন্নভোগ দিতে না পেলে আমার সন্তোষ নেই। আবার কাঁদতে বসলেন রাসমণি।

হঠাৎ রামকুমারের টোল থেকে নতুন বিধান এসে পৌঁছুল। প্রতিষ্ঠার আগে রানি যদি দক্ষিণেশ্বরের যাবতীয় সম্পত্তি কোনো ব্রাহ্মণকে দান করেন তবে অন্নভোগ চলতে পারে। সে ক্ষেত্রে মন্দিরে ব্রাহ্মণদের প্রসাদ নিতে কোনো বাধা নেই।

অন্ধকারে রাসমণি দেখতে পেলেন মা'র আনন্দ চক্ষু। অভয় চক্ষু।

কিন্তু এ ব্যবস্থা পণ্ডিতদের মনঃপূত হল না। তবু, উপায় কি। স্বয়ং রামকুমার ভট্টাচার্য এ-পাঁতি দিয়েছেন, এ কে খণ্ডায় ? সাধ্য নেই কেউ এ নিয়ে বিতণ্ডা করে।

রাসমণি ঠিক করলেন তাঁর গুরুর নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু পূজক-পুরোহিত কে হবে ? গুরুবংশের কেউ পূজা-অর্চনা করে এ রানির অভিপ্রেত নয়। তারা সবাই অশাস্ত্রজ্ঞ, আচারসর্বস্ব। তাদেরকে ডাকতে তাই তাঁর মন উঠল না। তবে কাকে ডাকেন ? যাকেই ডাকেন সে-ই মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। বলে পাঠায়, পুজো করা দূরস্থান, যে-দেবতাকে শূদ্রাণী প্রতিষ্ঠিত করবে তার পায়ের গোড়ায় মাথা পর্যন্ত নোয়াব না। পারব না ব্রাত্য হতে।

এখন তবে কি করা যায় ! এই মহা দুস্তরে পথ কোথায় ?

শেষ পর্যন্ত রানি রামকুমারকেই লিখলেন উদ্ধার করতে। রামকুমার বললেন, 'পূজকের অভাবে মন্দির যখন প্রতিষ্ঠা হয় না, তখন, বেশ, আমিই পূজক হব।' মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন গদাধর এসেছে কালীবাড়িতে। বিরাট উৎসব। যাত্রা, কালী-কীর্তন, ভাগবত, রামায়ণ পাঠ—কত কি হচ্ছে চার পাশে। কত দিক থেকে কত লোক এসেছে, সংখ্যায় লেখা-জোখা হয় না। সদাব্রত অন্নসত্র বসে গেছে। আহূত-অনাহূতের ভেদ নেই—শুধু দাও আর খাও, নাও আর ধরো। চলেছে চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়র ঢালাঢালি।

গদাধরের মনে হল ভগবতী যেন কৈলাস শূন্য করে চলে এসেছেন মন্দিরে। কিংবা গোটা রজতগিরিই যেন রানি রাসমণি তুলে এনে দক্ষিণেশ্বরে বসিয়ে দিয়েছেন। এত আয়োজন এত অজস্রতা, তবু গদাধর মন্দিরের অন্নভোগের অংশ নিল না। বাজার থেকে এক পয়সার মুড়ি-মুড়কি কিনে খেল, আর তাই খেয়ে কাটাল সমস্ত দিন। বেলা পড়লে হেঁটে চলে গেল ঝামাপুকুর।

'কিছু খেলি নে কেন রে গদাই ?' জিগ্গেস করেছিলেন রামকুমার।

'কৈবর্তের অন্ন খেতে পারি না দাদা।'

গদাধর এখন বড় হয়েছে, পণ্ডিত হয়েছে। ভাবলেন রামকুমার। নইলে ছেলেবেলায় ধনী কামারণীর হাতে কি করে সে ভিক্ষে নিয়েছিল? পরদিন সকালে উঠেও গদাধর দেখলে দাদা ফেরেননি। তার মানে কি? দাদা কি কায়েমী হয়ে থেকে যাবেন না কি মন্দিরে? এ কি অভাবনীয়? একের পর এক সাত-সাত দিন কেটে গেল, তবু দাদার দেখা নেই। আর অপেক্ষা করা যায় না, গদাধর চলল দক্ষিণেশ্বর।

'এ কি বাড়ি যাবেন না?'

'না রে—ভাবছি, জীবনের ক'টা দিন এখানেই কাটিয়ে দেব।'

গদাধর অবাক হয়ে রইল। বললে, 'তবে কি—'

'হ্যাঁ, মন্দিরের পূজার ভার নিয়েছি। টোল এবার তুলে দেব। তুইও চলে আয় আমার সঙ্গে।'

প্রবল আপত্তি তুলল গদাধর। 'তা কি করে হতে পারে? বাবা কোনো দিন শূদ্রযাজী হননি, তাঁর ছেলে হয়ে কোন যুক্তিতে তাঁর প্রথার প্রতিকূলতা করবেন? ও সব ছাড়ুন।'

রামকুমার অনেক বোঝালেন। অনেক তর্ক ফাঁদলেন। গদাধর নির্বিচল। নিষ্ঠায় নিয়তস্থিত।

'তা হলে ধর্মপত্র করা যাক।' বললেন রামকুমার। যা ধর্মপত্র তাই দৈবাদেশ। একটা ঘটিতে কতগুলি কাগজের টুকরো। তাতে কোনোটায় 'হাঁ' বা কোনোটায় 'না' লেখা। অনপেক্ষ কোনো শিশুকে ডেকে আনো, সে যে কোনো একটা টুকরো তুলুক হাতে করে। সেই টুকরোতে যদি 'হাঁ' থাকে, তবে করো; আর যদি 'না' থাকে, তবে কোরো না। জানবে তাই তোমার দেবতার ইঙ্গিত।

ধর্মপত্রে হাঁ উঠল।

তার মানে রামকুমার করুক যেমন করছে পূজকের কাজ।

এখন গদাধরের কাজ কী? ঝামাপুকুরের টোল তো পটল তুলল, সে খায় কি, থাকে কোথায়?

রামকুমার বললেন, 'মন্দিরের প্রসাদ খাবি নে?'

'না।'

'কেন গঙ্গাজলে রান্না, মাকে নিবেদন করা, খেতে দোষ কি?'

'আমি স্বপাকে খাই।'

'বেশ তো, তবে সিধা নিয়ে যা না গঙ্গাপারে, নিজের হাতে রান্না করে খা গে। গঙ্গাকূলে সবই পবিত্র—এ তো মানতেই হবে।'

গঙ্গার নাম শুনে গদাধর গলে গেল। সকল-কলুষভঙ্গা গঙ্গা। "তব তট-নিকটে যস্য নিবাসঃ খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ।" সেই ভবভয়দ্রাবিনী ভাগীরথী। তাকে গদাধর ফেরায় কি করে? তবে তাই। গদাধর থাকবে দক্ষিণেশ্বরে। গঙ্গাতীরে স্বপাকে রান্না করে খাবে। গঙ্গাজলের রান্না।

কেন, কেন এই নিষ্ঠার কাঠিন্য?

ঠাকুর বললেন, 'পায়ে একটি কাঁটা ফুটলে আরেকটি কাঁটা যোগাড় করে পায়ের কাঁটাটি বের করতে হয়। তার পরই ফেলে দিতে হয় দুটো কাঁটাই। তেমনি অজ্ঞান কাঁটা তোলবার জন্যে জ্ঞান কাঁটা যোগাড় করো। তার পর জ্ঞান অজ্ঞান দুটো কাঁটাই ফেলে দাও। তখন বিজ্ঞান অবস্থা। ত্রিগুণাতীত অবস্থা।'

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বললেন অর্জুনকে, নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।

নিষ্ঠা না থাকলে সত্যে পেঁছুবে কি করে? নিয়মে না থাকলে কি করে হবে নিয়মাতীত? আগে শাসন চাই, শম-দম-সাধন চাই, তবে তো নির্বাণে পেঁছুবে। আগে কঠিন হও, তবে তো সরল হবে। আগে ডুব দিতে শিখবে তবেই তো খুঁজে পাবে গভীরতা।

চণ্ডাল মাংসের ভার নিয়ে চলেছে। শঙ্করাচার্যকে সে ছুঁয়ে দিলে। 'আমায় ছুঁলি?' শঙ্করাচার্য চমকে উঠলেন। চণ্ডাল বললে, 'ঠাকুর, আমিও তোমায় ছুঁইনি, তুমিও আমাকে ছোঁওনি। শুদ্ধ আত্মা যে নির্লিপ্ত।'

এই হচ্ছে বিজ্ঞানীর ভাব। সে কখনো বালক, কখনো জড়, কখনো উন্মাদ, কখনো পিশাচ। সে তখন নিয়মাতীত। তার সর্বত্র ব্রহ্মময়। তার লজ্জা ঘৃণা ভয় ভাবনা নেই—কোনো গুণেরই আঁট নেই। সে কখনো বা জড়ের মত চুপ করে বসে থাকে। কখনো হাসে কখনো কাঁদে। এই বাবুর মত সাজে-গোজে, খানিক পরে আবার বগলের নিচে কাপড়ের পুঁটলি পাকিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ডোবার জল আর গঙ্গাজল সমান দেখে। এই যে নিত্যসত্ত্বস্থ অবস্থা—এতে আসতে হলে কত নিষ্ঠা-নিয়ম কত শাসন-বন্ধন দরকার তার কি ঠিক আছে?

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-প্রতিষ্ঠার কিছু দিন পরে এক পাগল এসে উপস্থিত। এক হাতে একটা কঞ্চি, অন্য হাতে একটা ভাঁড়, পায়ে ছেঁড়া জুতো। গঙ্গায় ডুব দিয়ে উঠে, কোঁচড়ে কি ছিল তাই খেল। তার পরে মন্দিরে গিয়ে স্তব করতে বসল। গমগম শব্দে কেঁপে-কেঁপে উঠল মন্দির। ভাত জোটেনি, অতিথিশালার পাত কুড়িয়ে খেতে লাগল ভাত। পথের কুকুরের মত। এমন কি পথের কুকুরদের সরিয়ে-সরিয়ে কাড়াকাড়ি করে। হলধারী ছুটে এল মন্দির থেকে। লোকটার পিছু-পিছু ধাওয়া করলে। বললে, 'তুমি কে?'

পাগল বললে, 'চুপ। কাউকে বলিসনি। আমি পূর্ণজ্ঞানী।'

'পূর্ণজ্ঞানী?'

'হ্যাঁ, তোকে বলে যাই। যেদিন এই ডোবার জল আর গঙ্গাজলে কোনো ভেদবুদ্ধি থাকবে না, তখনই বুঝবি পূর্ণজ্ঞান হয়েছে।' বলেই পাগল চলে গেল কোন দিকে।

ঠাকুর সব শুনলেন। ভয়ে জড়িয়ে ধরলেন হৃদয়কে। মাকে বললেন, 'মা, আমারো কি তবে এমনি হবে?'

ভয় কি। মা'র মুখে সেই অভয়ঙ্কর প্রসন্নতা। চুম্বকের পাহাড়ের কাছ দিয়ে জাহাজ চলে গেলে জাহাজের আর কী থাকে? তার কলকব্জা ইস্ক্রুপ-বল্টু লোহা-লক্কড় সব আলাদা হয়ে খুলে যায়। তেমনি তোর যখন ঈশ্বরদর্শন হবে তখন তুই

আর তুই থাকবি না। তুই তো কাঠ নস যে পোড়ালে ছাই থাকবি। তুই কর্পূর, পোড়ালে তোর কিছুই বাকি থাকবে না। শেষ বিচারের পর তোর সমাধি হয়ে যাবে। নুনের পুতুল হয়ে নামবি তুই লবণের সমুদ্রে। তোর ভয় কি। তোর তো আমিই আছি। মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ী মা।

* ৯ *

'এ ছেলেটি কে?' খানিকটা তন্ময়ের মতই জিগগেস করলেন মথুরবাবু।

উদারদর্শন, নবীন ব্রহ্মচারী। কুমার-কোমল। এ কে? একে কি আগে কোথাও দেখেছি? কোথায় দেখব? কত দিন আগে? কিছুতেই মনে করতে পারছেন না মথুরবাবু। তবে কি পূর্বজন্মে দেখেছি? কিংবা, জন্ম-মৃত্যুর পরপারে?

'কে এই ছেলেটি?' না, স্বগতোক্তি নয়, প্রশ্ন করছেন রামকুমারকে।

'আমার ভাই।' স্নিগ্ধ-বিনয়ে বললেন রামকুমার।

কিন্তু মথুরামোহনের কে? কেউ যদি না-ই হবে তবে তার দিকে মন ছুটে চলেছে কেন?

'এখানে, এই মন্দিরে, কাজ করবে?'

'দেখব জিগগেস করে।'

বললেন বটে রামকুমার, কিন্তু জিগগেস করতে সাহস পেলেন না। তিনি জানেন তো তাঁর ভাইকে। দক্ষিণা নিয়ে ঠাকুর-পুজো করবার সে ছেলে নয়।

এমন সময় দক্ষিণেশ্বরে হৃদয়রাম এসে হাজির।

'এ কি, তুই এখানে কোত্থেকে?' অবাক হলেন রামকুমার।

'বর্ধমানে গিয়েছিলাম চাকরির সন্ধানে। চাকরির নামে লবডঙ্কা। শুনলাম মামারা এখন মস্ত হয়েছেন, রানি রাসমণির কালীমন্দিরে আছেন পুজুরী হয়ে। ভাবলাম যদি তাঁদের ধরলে একটা হিল্লে হয়।'

ষোলো বছরের বলবান ছেলে। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে দৃঢ়কায়। সুপুরুষ। সদানন্দ। 'ওরে, হৃদে এসেছিস?' আনন্দে ছুটে এল গদাধর। যদিও বছর চারেকের ছোট, সম্পর্কে ভাগনে, তবু একেবারে নিকটতম বন্ধু। ছেলেবেলার খেলুড়েদের একজন। সহজ স্নেহে জড়িয়ে ধরল বুকের মধ্যে। বললে, 'তুই কী মনে করে?' হৃদয় কিছু বলল না, চুপ করে রইল। কিন্তু অন্তরে বসে অন্তরবাসিনী বললেন, 'তোরই জন্যে হৃদয়কে পাঠিয়ে দিলাম তোর কাছে। ও না হলে তোকে দেখবে-শুনবে কে? সামলাবে কে? সাধনায় বসে যখন সব ভুলে যাবি তখন তোর শরীর কে বাঁচিয়ে রাখবে? তুই যদি শিব, ও তোর নন্দী। তুই যদি রাম, ও তোর লক্ষ্মণ।'

গাছের যেমন ছায়া, গদাধরের তেমনি হৃদে। দুটিতে কাছছাড়া নেই। সর্বক্ষণ সমভাব। শুধু খাবার সময় আলাদা। হৃদয় মন্দিরে প্রসাদ নেয়, গদাধর গঙ্গাতীরে রান্না করে।

সেজবাবুকে এড়িয়ে চলে গদাধর। কালী-ঘরে কোনো একটা চাকরিতে তাকে ঢুকিয়ে দেবেন, তাঁর মনের কথা চোখের ভাষায় যেন ধরা পড়েছে। চাকরি-বাকরির মধ্যে আমি নেই, ধরা-বাঁধার মানুষ নই আমি। তার চেয়ে নিজের মনে শিব গড়ি, পুজো করি নিজের মনে। সেই আমার ভালো। আমার ধ্যানের আরাম।

এমনি মূর্তি গড়ছে গদাধর। মূর্তি গড়ে পুজোয় বসেছে একদিন। পুজোয় বসে আবিষ্ট হয়ে রয়েছে। সেই সুযোগে চুপিসারে কখন কাছে এসে পড়েছেন সেজবাবু। তন্ময় হয়ে দেখছেন সেই শিবমূর্তি। তার গঠনলাবণ্য। শুধু ভাস্কর্য নয়, ভাস্কর্যের চেয়েও যা বড় জিনিস তাই যেন ফুটে উঠেছে সর্বাঙ্গে। তা ভক্তি। তা মনোমাধুরী। হাতের পেলবতায় গলে-গলে পড়ছে যেন অন্তরের অনুরাগ।

'এ মূর্তি কে করেছে ?'

'গদাধর।' হৃদয় কাছাকাছিই ছিল, বললে।

এক মুহূর্ত কি ভাবলেন মথুরবাবু। বললেন, 'পুজো হয়ে গেলে আমাকে দেবে এই মূর্তি ?'

আপত্তি কি! চক্ষের নিমেষে এমনি কত-শত মূর্তি গড়তে পারবে গদাধর। হৃদয় সম্মতি দিল।

মূর্তি হাতে পেয়ে আরো ব্যাকুল হলেন মথুরবাবু। যার চকিত কল্পনার এই রূপ, তার অতলতল ধ্যানের না-জানি কেমন চেহারা! ডেকে পাঠালেন রামকুমারকে। গদাধরকে রাজি করান, তাকে কাজ দেন মন্দিরে। অসম্ভব—মুখ গম্ভীর করলেন রামকুমার। গদাধরের চাকরিতে রুচি নেই।

জেদ চাপল মথুরবাবুর। যে করেই হোক গদাধরকে কালীর কোলের কাছে টেনে আনতেই হবে।

'বাবু আপনাকে ডাকছেন।'

গদাধর চেয়ে দেখল, সেজবাবুর চাকর। আর পালাবার জো নেই। সেজবাবু একেবারে চোখের উপর দাঁড়িয়ে।

'ডাকছেন, যাও না!' হৃদয় তাড়া দিল: 'এত ভয় কিসের ?'

'গেলেই বলবে, এখানে থাকো, চাকরি করো। ও আমি পারব না।'

'দোষ কি! করলেই বা চাকরি! লোক কত সৎ আর মহৎ। এমন লোকের আশ্রয়ে চাকরি করা তো সুখের কথা।'

'তুই কত বুঝিস! চাকরি নিলেই চিরকাল বাঁধা পড়ে যেতে হবে। আমার তা পোষাবে না। তাছাড়া—' গলা নামাল গদাধর: 'তাছাড়া কালীপুজোর ভার নেওয়া চারটিখানি কথা নয়। দেবীর গায়ের অত গয়নার কে ভার নেবে ?'

'আমি নেব।'

'তুই নিবি ? সত্যি বলছিস ?'

'চাকরি খুঁজতে এসেছি আমি এখানে। আমার একটা কিছু জুটে গেলেই হল।'

'তবে যাই, বলি গে সেজবাবুকে।'

হাতে চাঁদ পেলেন মথুরবাবু। গদাধরকে বললেন, 'তুমি মাকে রোজ সাজাবে,

মা'র 'বেশকারী' হলে তুমি।' আর হৃদয়কে বললেন, 'তুমি হলে ওর সাগরেদ।' এ সময় একটা কাণ্ড ঘটল।

ক্ষেত্রনাথ চাটুজ্জে রাধাগোবিন্দের পূজারী। রোজ সকালে রাধারাণী আর কৃষ্ণকে মন্দিরের সিংহাসনে এনে বসান আর বিকেল হলে নিয়ে যান শয়নঘরে। জন্মাষ্টমীর পরের দিন। দুপুরে ভোগরাগ অনেক হয়ে গিয়েছে, এখন বিরাম-পর্ব। কক্ষান্তরে রাধারাণীকে আগে শুইয়ে দিয়ে এসেছেন, এখন গোবিন্দকে নিয়ে চলেছেন ক্ষেত্রনাথ। হঠাৎ পড়ে গেলেন পা পিছলে। নিজে সামলেছেন কিন্তু বিগ্রহের একটি পা গিয়েছে ভেঙে।

তুমুল সোরগোল উঠল মন্দিরে। এ কি অঘটন! এ কি অশুভ সূচনা!

ক্ষেত্রনাথকে বরখাস্ত করে দেওয়া হ'ল সরাসরি। কিন্তু তাতে কী হবে? বিগ্রহ তো তাতে অভংগ হয়ে উঠবে না! তা উঠবে না, কিন্তু উপায় কী বলো। রানি রাসমণি অস্থির হয়ে উঠলেন। মথুরবাবুকে বললেন, সভা বসাও, ডাকাও পণ্ডিতদের, বিধি নাও।

বসল পণ্ডিতসভা। সব ন্যায়চঞ্চু তর্কচূড়ামণির দল। অনেক শাস্ত্র ঘেঁটে আর সংস্কৃত আওড়ে তাঁরা পাঁতি দিলেন—ভাঙা বিগ্রহকে গঙ্গায় ফেলে দিতে হবে, আর তার জায়গায় বসাতে হবে নতুন দেবমূর্তি।

সংগে-সংগে নতুন দেবমূর্তির ফরমায়েস গেল।

কিন্তু রানির মনে সুখ নেই। অন্তরের অন্ধকারে কাঁদতে লাগলেন। বলতে লাগলেন গোবিন্দকে, তুমি কি আমার কাছে শুধু পাথর না তামা-পেতল যে, তোমাকে জলে ফেলে দেব? তার চেয়ে তুমি আমাকে চোখের জলে ফেলে রাখো।

মথুর বুঝলেন রানির অস্থিরতা। বললেন, 'গদাধরকে গিয়ে জিগ্গেস করি।' মনে হ'ল যেন কোথাও একটা সহজ সমাধান আছে। যিনি সরলের মধ্যে সরল তিনিই তরল করে দেবেন। গদাধরকে বললেন সব মথুরবাবু। এখন তুমি কী বলো। তোমার মন কী বলে!

'যেমন পণ্ডিত তেমনি তাদের পাঁতি। ঝলসে উঠল গদাধর: 'রানির জামাইয়ের যদি আজ ঠ্যাং ভাঙত, তবে রানি কী করতেন? গঙ্গায় জামাইকে ফেলে দিতেন আর তার জায়গায় বসাতেন এনে নতুন জামাই?'

সবাই স্তব্ধ হয়ে রইল।

'কখনো না। জামাইকে রানি চিকিৎসা করাতেন। চিকিৎসা করিয়ে ভালো করে তুলতেন। এখানেও সে-ব্যবস্থা করলেই হয়।'

সবাই বাক্যহীন।

'হ্যাঁ গো, ভাঙা পা জোড়া দেয়ার কথা বলছি। ভাঙা পা জুড়ে দিলেই ঠাকুর আবার আস্ত-সুস্থ হয়ে উঠবেন। আবার চলবে তাঁর সেবা-পূজা।'

একেবারে সোজাসুজি অন্তরের কথা। মন যেমনটি চায় তেমনি। যা মন থেকে আসে, বিবেক থেকে আসে, তাই ঈশ্বর থেকে আসে। যেখানে সরল-স্বচ্ছ সেখানেই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব।

এমন যে সহজ মীমাংসা হতে পারে—শুনে পণ্ডিতেরা হতভম্ব হয়ে গেল।

অনেকে শাস্ত্র পেড়ে আপত্তি তুললে, কিন্তু মনের কাছে আবার শাস্ত্র কি ! মনের জোরের কাছে কার জোর খাটবে !

রানির বুক ভরে গেল আনন্দে। দু'চোখে ধারা নেমে এল। কত সহজের মধ্যে তুমি আছ ! কত সহজের মধ্যেই ধরা দিলে ! মনে-মনে বললেন গোবিন্দকে। গদাধরকে বললেন, 'তুমিই তবে ভাঙা পা জুড়ে দাও। তুমি ওস্তাদ কারিকর, তুমিই বৈদ্যনাথ।'

ভাঙা পা জুড়ে দিল গদাধর। একেবারে নিখুঁত করে দিল। কারুর সাধ্যি নেই চোখে দেখে বার করে দেয় জোড়ার দাগ। কারুর সাধ্যি নেই বার করে দেয় এই জাদুকরের জারিজুরি।

ফরমায়েসি মূর্তি এসে পেঁছুল। মথুরবাবু বললেন, 'দেখ তো, ও আগের মতন হল কি না।'

চোখ মেলে নয়, চোখ বুজে দেখল গদাধর। দেখল অন্তরের মধ্যে ডুবে গিয়ে। না, তেমনটি হয়নি। তেমনটি আর হয় না। দরকার নেই নতুন বিগ্রহে। পুরোনো বিগ্রহেই ভালো। কত প্রীতি-ভক্তির কোমলতা তার গায়ে মাখা। কত অশ্রুতে তাকে স্নান করানো। কত প্রার্থনায় তার ঘুম ভাঙানো। তাকে কি আর বিদায় দেওয়া চলে ? না কি বিদায় দিলেই তার দায় যাবে ?

কিন্তু যাই বলো খুঁতে হয়ে রইল যে। অংগহীন বিগ্রহে কি পূজা সিদ্ধ হয় ? খুব হয়। প্রিয়জন যদি খুঁতে হয় তবে সেই খুঁতের জন্যেই সে প্রিয়তর।

বরানগরে কুটিঘাটার কাছে রতন রায়ের ঘাটে গদাধর বেড়াতে এসেছে। সেখানে ডাকসাইটে জমিদার জয়নারায়ণ বাঁড়ুয্যের সংগে দেখা। কথায়-কথায় রানি রাসমণির কালী-বাড়ির কথা উঠল। রাধাগোবিন্দের কথা।

'হাঁ হে মশাই, ওখানকার গোবিন্দ কি ভাঙা ?'

'তোমার বুদ্ধি কি গো !' গদাধর হেসে উঠল : 'যিনি অখণ্ডমণ্ডলাকার তিনি কি কখনো ভাঙা হন ?'

জয়নারায়ণ চুপ। ভাবাবস্থায় পড়ে গিয়ে ঠাকুরের দাঁত ভেঙে গিয়েছিল। সেবার পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে গেল।

'হাত ভাঙলো কেন জানিস ?' ভক্তদের সম্বোধন করে প্রশ্ন করলেন ঠাকুর।

কে কি বলবে ! ঠাকুরের হাত ভেঙে গিয়েছে এ একটা দৈব-বিপাক ছাড়া আর কি। কিন্তু ঠাকুর বললেন, 'হাত ভাঙলো—সব অহঙ্কার নির্মূল করবার জন্যে। এখন আর এই খোলের ভিতরে আমি খুঁজে পাচ্ছি না। খুঁজতে গিয়ে দেখি তিনি রয়েছেন।'

রানি রাসমণি খুঁজতে গিয়ে দেখলেন ভাঙা বিগ্রহের মধ্যেই গোবিন্দ রয়েছেন। জ্ঞানে যিনি সত্তায় যিনি প্রাপ্তিতে যিনি তিনিই গোবিন্দ।

* ১০ *

রাধাগোবিন্দের মন্দিরে গদাধর এবার পূজারী হল। আর হৃদয় হল কালীর সাজনদার।

কিন্তু এ কেমনতরো পূজা! সমস্ত বিশ্বসংসার থেকে চক্ষের পলকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানবিলীন হয়ে বসে থাকা। মূর্তিকে প্রতীক না ভেবে প্রাণধারী বলে ব্যবহার করা। এমন পূজা দেখেননি কোনো দিন মথুরবাবু।

এমন তন্ময়, পূজা দেখবার জন্যে কারা ভিড় করেছে তাদের দিকে লক্ষ্য নেই। সে তো অল্প কথা, স্বয়ং মথুরবাবুকে পর্যন্ত দেখছে না।

দেখছে, মন্ত্র বলবার সময় মন্ত্রের উজ্জ্বল বর্ণ কি করে তার দেহের সংগে মিশে-মিশে যাচ্ছে। কি করে সর্পিণী কুণ্ডলিনী সুষুম্না দিয়ে সহস্রারে উঠছে ধীরে-ধীরে। শরীরের যে-যে অংশ ত্যাগ করে যাচ্ছে তাই অসাড় হয়ে যাচ্ছে, আর যে-যে অংশ ভেদ করে যাচ্ছে তাতে ফুটে উঠছে বিকচ পদ্ম। পূজার জায়গায় চারদিকে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে আর বহ্নিপ্রাকার তৈরি হয়ে যাচ্ছে সংগে-সংগে। তন্মনস্ক হয়ে মন্ত্র পড়ছে আর সমস্ত শরীর হয়ে উঠছে জ্বলিত-তেজস্বান।

যে দেখছে সেও তন্ময় হয়ে যাচ্ছে।

ধ্যানের অবস্থা কি রকম জানো? মন হবে ঠিক তেলের ধারার মত। এক ঈশ্বর-চিন্তা ছাড়া আর কোনো চিন্তা নেই। পাখি মারবার জন্যে ব্যাধ তাগ করছে। সামনে দিয়ে বর চলে গেল মিছিল করে, কত গাড়ি-ঘোড়া কত বাজনা কত হট্টগোল। ব্যাধের হুঁস নেই। জানতেও পেল না বর গেল চতুর্দোলায়।

বুঝলে, স্পর্শবোধ পর্যন্ত থাকে না। গায়ের উপর দিয়ে সাপ হেঁটে যাবে, সাপও বুঝতে পারবে না কিসের উপর দিয়ে হেঁটে গেল। মনের বা'র-বাড়িতে কপাট দিয়ে বোসো। কপাটের বাইরে পড়ে থাকবে তোমায় রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ আর স্পর্শ—তোমার পঞ্চেন্দ্রিয়ের পাঁচ উপচার। বন্ধ ঘরে তুমি আর তোমার মন। প্রতীক্ষা আর অন্ধকার। বিশ্বাস আর ব্যাকুলতা। বারুদ আর বহ্নিকণা।

প্রথম প্রথম সব ভোগের থালা আসবে ভারে-ভারে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের পাঁচ প্রবঞ্চনা। বিচলিত হবি না, তলিয়ে যাবি, তলিয়ে যাবি। অন্ধকার থেকে চলে আসবি শুভ্রতায়। দেখবি, আর ওরা আসবে না। আর কার কাছে আসবে?

'ধ্যান করতে-করতে প্রথম-প্রথম আমার কি দর্শন হতো জানিস?' বললেন এক দিন ঠাকুর, 'স্পষ্ট দেখলুম, সামনে টাকার কাঁড়ি, শাল-দোশালা, এক থালা সন্দেশ, দুটো মেয়ে আর তাঁদের ফাঁদী নথ। মনকে শুধোলুম, মন তুই কি চাস, কোনটা চাস? মন বললে কোনোটাই চাই না। ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আমার আর কিছুই চাইবার নেই।'

রামকুমার খুশি। মন্দিরে এবার মন দিয়েছে গদাধর। কিন্তু যার জন্যে পুজো সেই রোজগার হচ্ছে কই? ফিরছে কই সংসারের অবস্থা? চাকরি করতে বসে টাকার প্রতি টান না হলে চলবে কেন? টাকা ছাড়া উপায়ান্তর কি?

'আচ্ছা, এটা তোমার কী মনে হয় বলতে পারো ?' ঠাকুর জিগ্গেস করলেন ডাক্তারকে—নাম ভগবান রুদ্র। 'টাকা ছুঁলেই হাত আমার এঁকে-বেঁকে যায়। নিশ্বাস পড়ে না।'

বলেন কি। ডাক্তার একটা টাকা বের করে ঠাকুরের হাতে রাখলেন। কি আশ্চর্য, দেখতে-দেখতে ঠাকুরের হাত বেঁকে গেল। রুদ্ধ হয়ে গেল নিশ্বাস।

তা ছাড়া—চিন্তিত মনে ভাবছেন রামকুমার—ছেলেটার কেমন উদাস-উদাস ভাব। পঞ্চবটীর জঙ্গলে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকে একলা। কখনো বা সকাল-সন্ধেয় গঙ্গার পার ধরে দীর্ঘ পথ হেঁটে বেড়ায় আপন-মনে। কারুর সঙ্গে মেশে না, হাসে না, কি চায় কি ভাবে, কে জানে। বাড়িতে মা'র জন্যে মন কেমন করছে হয়তো। একদিন ডেকে প্রশ্ন করলেন। 'মা'র জন্যে মন কেমন করছে রে গদাই ? বাড়ি যাবি ?'

'মা'র জন্যে ?' কি বলবে ঠিক করতে পারল না গদাধর। বললে, 'না, বাড়ি যাব কেন ?'

'তবে এমনি ঘুরে বেড়াস কেন বনে-বাদাড়ে ? কেন নির্জনে গিয়ে বসে থাকিস ? কী হয়েছে ?'

নির্জন না হলে ভগবানচিন্তা হয় কই। সোনা গলিয়ে গয়না গড়াব, তা যদি গলাবার সময় পাঁচ বার ডাকে, তা হলে গয়না গড়াবো কি দিয়ে ? ধ্যান করবো মনে বনে কোণে। ঈশ্বরচিন্তা যত লোকে টের না পায় ততই ভালো।

হয়তো এ মেজাজ চলে যাবে গদাধরের। এ একটা ক্ষণিক ঔদাস্য ছাড়া কিছু নয়। তেমনি ভাবলেন রামকুমার। কালীকে বললেন, মা, গদাধরকে সুমতি দাও। শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়ছে রামকুমারের। চলে যাবার আগে ছেলেটাকে মানুষ করে দিতে হয়। যাতে দাঁড়াতে পারে নিজের পায়ে। যাতে দু'পয়সা ঘরে এনে খাবার যোগাড় করতে পারে সংসারের। অন্তত তাঁর চাকরিটা সে ধরতে পারে সহজে।

তাই ভেবে গদাধরকে তিনি চণ্ডীপাঠ শেখাতে লাগলেন। শেখাতে লাগলেন কালীপুজোর বিধি-নিয়ম। বিস্তীর্ণ অনুশাসনের রীতি-নীতি। কিন্তু শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা না নিয়ে পুজো করা যাবে না কালীকে। দীক্ষা নেব তো শক্তিসাধক কোথায় ? আছে—বৈঠকখানার কেনারাম ভট্চাজ। দক্ষিণেশ্বরে আসে যায়, রামকুমারের জানা-শোনা। একজন নামজাদা তান্ত্রিক। গদাধরের পছন্দ হল। বললে, এঁকেই তবে গুরু করি।

শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিল গদাধর। যেই তার কানে মন্ত্র পড়ল, চীৎকার করে উঠল গদাধর, ডুবে গেল গভীর সমাধিতে। গুরু তো হতবুদ্ধি। তাঁর নিজের মন্ত্রের এত শক্তি তা তাঁর নিজেরই অজানা।

'এক কাজ কর এখন থেকে।' বললেন রামকুমার : 'তুই কালীঘরে আয়, আমি রাধাগোবিন্দের ভার নিই।'

মথুরবাবুও পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

'আমি শাস্ত্রের কি জানি ? না জানি তন্ত্রমন্ত্র, না জানি আইনকানুন। কোথায় কি ত্রুটি করে ফেলব তার ঠিক নেই।'

'তোমাকে মানতে হবে না শাস্ত্র। দরকার নেই জেনে।' বললেন মথুরবাবু: 'তোমার ভক্তি আর আন্তরিকতাই শাস্ত্র হয়ে দাঁড়াবে। ভক্তিভরে যাই তুমি দেবে দেবীকে তাই তিনি গ্রহণ করবেন।'

বুকের ভিতরটা নড়ে উঠল গদাধরের। এক কথায় রাজি হয়ে গেল।

একটা বড় মানুষ জুটিয়ে দাও—মা'র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন ঠাকুর। বড়লোক নয় শুধু, বড়'মানুষ। মা মথুরবাবুকে জুটিয়ে দিলেন।

'মাকে বললুম, মা, এ দেহরক্ষা কেমন করে হবে? সাধুভক্ত নিয়েই বা কেমন করে থাকব? একটা বড় মানুষ জুটিয়ে দাও। মা সেজবাবুকে পাঠিয়ে দিলেন। চোদ্দ বছর ধরে সেবা করলে সেজবাবু।'

রামকুমার বললেন, 'এবার একটু বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।' হৃদয় এল রামকুমারের জায়গায়। ছুটি পেল রামকুমার। বাড়ি যাবার আগে মুলাজোড় গিয়েছিল কি কাজে, সেখানেই চোখ বুজলে।

বাবার স্থলে দাদা—দাদার মৃত্যুতে বিহ্বল হয়ে পড়ল গদাধর। তখন তাকে ঈশ্বরতৃষ্ণা পেয়ে বসেছে। পেয়ে বসেছে মৃত্যুর রহস্য ছেদন করবার আকুলতা। তাই দাদার জন্যে শোক মিশে গেল ঈশ্বরাকাঙ্ক্ষার তীব্রতায়। যদি ঈশ্বর বুঝি তা হলে মৃত্যুতেও বুঝব। থাকেন যদি ঈশ্বর, তাহলে আর মৃত্যু নেই।

কচ নির্বিকল্প সমাধিতে রয়েছেন। সমাধি ভাঙবার পর একজন প্রশ্ন করলে, এখন কী দেখছ? কচ বললেন, তখন যা দেখেছি, এখনো তাই। দেখছি, জগৎ যেন তাঁতে জ'রে রয়েছে। তিনিই পরিপূর্ণ, তিনিই সর্বময়। যা কিছু হয়েছে, তিনিই হয়েছেন। কিছু নেবার কিছু ফেলবার এমন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। মা যেন আলো করে বসে আছেন!

মা'র পুজোর ভার নিয়েছে গদাধর। ভার নিয়েই নিজেকে ঢেলে দিয়েছে, বিকিয়ে দিয়েছে। মা'র কোলে চড়ে বসেছে। নিজে মা'র হাত ধরেনি—বলছে, তুই আমার হাত ধরে নিয়ে চল। আমি যদি তোর হাত ধরি, পড়ে যেতে পারি হাত ফসকে। কিন্তু তুই যদি একবার আমার হাত ধরিস আমার আর ভয় নেই।

ভগবানকে কে জানবে? জানবার চেষ্টাও করি না। আমি মাকে জানি, তাই মা বলে ডাকি। যা ভালো বুঝবেন, করবেন। বেড়াল-ছানার মত হেঁসেলে রাখলে তিনিই রাখবেন, আবার বাবুদের বিছানায় এনে শোয়ালে তিনিই শোয়াবেন। আমি কেন বলতে যাব? ইচ্ছা হয় জানাবেন, না-হয় নাই জানাবেন। মা হয়ে বুঝবেন না তিনি সন্তানের ব্যাকুলতা? ছোট ছেলে, মা'র ঐশ্বর্যের সে কী বোঝে? তার মা আছে এই তার পরম ঐশ্বর্য। মা গো, তুই যেন-তিন-ভুবন আলো করে বসেছিস।

মা'র মূর্তি রোজ ফুলে আর চন্দনে সাজায় গদাধর। মূর্তির গায়ে হাত লাগে আর চমকে-চমকে ওঠে। মনে হয় এ যেন নিশ্চল পাষাণ নয়, প্রাণময়ী জননী। পাথরে শৈত্য নেই, এ যেন প্রফুল্ল প্রাণতাপ। যেন এখুনি চোখের পালক নড়ে উঠবে, কথা কয়ে উঠবেন, হাত বাড়িয়ে টেনে নেবেন কোলের কাছে।

কই, অনুভবে-অনুমানে নয়, সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হবি কবে?

রাতে, সবাই যখন ঘুমিয়েছে, তখন শয্যা ছেড়ে একা-একা বেরিয়ে পড়ে গদাধর। সকাল হলে ফেরে। দু চোখ ফোলা, জবাফুলের মত লাল। যেন সমস্ত রাত নির্জনে বসে সে কেঁদেছে, দুচোখের পাতা মুহূর্তের জন্যেও এক করেনি। কেমন উদ্‌ভ্রান্ত, উন্মাদের মত চেহারা।

'কোথায় যাও রোজ রাত্তিরে?' হৃদয় ধরে পড়ল একদিন।

'ঘুম আসে না। তাই ঠাণ্ডায় ঘুরে বেড়াই।' পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইল গদাধর।

'ঘুম আসে না মানে? না ঘুমুলে শরীর যে ভেঙে পড়বে একেবারে।'

শুষ্ক-শুভ্র চোখে তাকিয়ে রইল গদাধর: 'ঘুম না এলে আমি করব কি!'

তখনকার মত চেপে গেল হৃদয়। নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে। হৃদয় ঘুঘু ছেলে, ঠিক বার করে ফেলবে।

অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, ধাত্রী বা আমলকী আর অশোক এই পাঁচ বৃক্ষের সমাহারের নাম পঞ্চবটী। তখন পঞ্চবটীর চার পাশে ঘোর জংগল, ঘোরালো অন্ধকার। দিনের বেলায়ও ওদিকে মাড়াতে গা ছমছম করে। একে গোরস্থান তাই অন্ধকারের জড়ি-পটিতে গাছপালার গোলকধাঁধা—রাত্রে সেখানে ভূত-প্রেতের মাতামাতি চলে। কারুর সাহস নেই ওদিকে পা বাড়ায়।

যেমন-কে-তেমন রাত নিবিড় হয়ে আসতেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে গদাধর। পিছু-পিছু হৃদয়ও বেরিয়ে পড়েছে সন্তর্পণে। দেখি কি করে। কোথায় যায়। কি সর্বনাশ! সেই সর্বগ্রাসী জংগলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে গদাধর।

মা গো, মন্দির এখন বন্ধ, কিন্তু তোর এই আকাশ-ভুবন-জোড়া চিরসুন্দরের মন্দিরে তো দরজা পড়ে না। আমি চুপি-চুপি তাই চলে এসেছি তোর কোলের কাছে। এই অন্ধকারে তোর হাতের স্পর্শ, এই স্তব্ধতায় তোর নিশ্বাস, এই প্রতীক্ষায় তোর পদধ্বনি। আমাকে দেখা দে।

বাইরে হৃদয় দাঁড়িয়ে রইল কাঠ হয়ে। হাঁকডাক দিলে শুনতে পাবে না গদাধর, হয়তো গ্রাহ্যও করবে না। তবে কি উপায়ে তাকে নিরস্ত করা যায়। টেনে আনা যায় ঐ জংগল থেকে। শেষকালে সর্পাঘাতে মারা যাবে বুঝি। একের পর এক ঢিল ছুঁড়তে লাগল হৃদয়। ভূতের আস্তানা, নিশ্চয় ভূতেই ঢেলা মারছে। যদি হুঁস হয়, যদি বা একটু ভয় পায়! কাকস্য পরিবেদনা! একটি পাতারও চাঞ্চল্য নেই। যেমন নিরেট স্তব্ধতা তেমনি নীরন্ধ্র অন্ধকার। ভয় পেয়ে হৃদয়ই পিছু হটল। ফিরে এল বিছানায়। ঘুমুতে পারল না।

পরদিন ফাঁকায় পেয়ে পাকড়াল গদাধরকে। বললে, 'রাত্রে জংগলে ঢুকে কর কী?'

'ধ্যান করি।'

'ধ্যান কর? কার?'

'আমার মাঁর। মা'র মন্দির বন্ধ হয় না দিনে-রাত্রে।'

'কিন্তু, জংগলে কেন?'

'নির্জনে না হলে ধ্যান করবার জোর আসে না মনের মধ্যে। ঐ আমলকী

গাছের তলায় বসে ধ্যান করি। আমলকী গাছের তলায় বসে ধ্যান করলে কামনা সিদ্ধ হয়।'

'তোমার আবার কামনা কী ?'

'একমাত্র কামনা—মাকে দেখব, মাকে পাব, মা'তে মিশে থাকব।'

'কিন্তু এ সব কাজ ঠিক হচ্ছে না। মন্দিরে সেবা-পূজার পরিশ্রমেই তুমি যথেষ্ট কাহিল হয়ে পড়েছ। তার উপর আহারে তোমার রুচি নেই, দেহের কোনো আরাম নেই। শেষ কালে রাতের ঘুমটুকুও যদি বিসর্জন দাও তুমি পাগল হয়ে যাবে। এ সব ছাড়ো।'

'মাকে তো তাই বলি—আমাকে পাগল করে দে।' 'আমায় দে মা পাগল করে, আমার কাজ নেই জ্ঞানবিচারে।'

'কিন্তু জায়গাটা তুমি ভালো বাছোনি। ওখানে ভূতের আড্ডা। রাতদিন দাপাদাপি করে। লোফালুফি করে ঢিল নিয়ে। টের পাও না ?'

'গায়ের উপর দিয়ে সাপ হেঁটে গেলেও টের পাই না।'

ঢিল ছুঁড়ে নিরস্ত করা গেল না গদাধরকে। একদিন শেষ কালে সাহস সঞ্চয় করল হৃদয়। মামার ভাগ্নে সে—কিসের ভয় ? গভীর রাত্রে অন্ধকারে ঢুকে পড়ল সে বনের মধ্যে। চলে এল আমলকী গাছের কাছাকাছি। কিন্তু গাছের তলায় সে কী দেখছে ? সর্বাঙ্গে শিউরে উঠল হৃদয়। মামা সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছে না কি ? দেখছে নিরবকাশ নগ্ন হয়ে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে গদাধর। নিবাত দীপ-শিখার মত নিষ্কম্প। গিরিশৃঙ্গের মত সমাহিত। ধ্যান করবে তো করো, কিন্তু এ কী পাগলামি ! শুধু পরনের ধুতিই ত্যাগ করেনি, গলার পৈতে পর্যন্ত খুলে রেখেছে।

হৃদয়ের সহ্য হল না। এগিয়ে এসে ধমকে উঠল : 'এ কি হচ্ছে ? পৈতে-কাপড় ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে বসেছ যে ?'

'ও, তুই ! হৃদে ? এ সব ফেলে দিয়েছি কেন জিগ্গেস করছিস ? এরা হচ্ছে ছেলের মুখের চুষি-কাঠির মত। ছেলে চুষি নিয়ে যতক্ষণ চোষে মা আসে না। যখন চুষি ফেলে চীৎকার করে তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে ছুটে আসে। অহং-এর মায়ার রং-চং আমি মুছে ফেলে দিয়েছি, অন্তরের অরণ্যে বসে ডাকছি মাকে চেঁচিয়ে। 'মা, ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে ছুটে আয় আমাকে কোলে নিতে।' উত্তর মনের মত হল না হৃদয়ের। যত খুশি ডাকো, কিন্তু দিগ্বসন হবার কী হয়েছে !

'তুই কী জানিস !' ঝলসে উঠল গদাধর : 'অষ্ট পাশে বদ্ধ হয়ে আছে মানুষ। ঘৃণা লজ্জা ভয় কুল শীল মান জাতি আর অভিমান—এই অষ্ট পাশ। মাকে ডাকতে হলে পাশমুক্ত হয়ে ডাকতে হয়। অহং-এর আঁশটি থাকলেও তিনি আসেন না। তাই ও-সব খুলে রেখেছি। ধ্যানের পর ফিরব যখন আবার অজ্ঞানের মেলায়, তখন আবার ও-সব পরে নেব।'

'গোপীদের বস্ত্রহরণ হয়েছিল জানিস্ ? তার মানে কি ? তার মানে আর কিছুই নয়—গোপীদের সব পাশই গিয়েছিল, শুধু লজ্জা বাকি ছিল। তাই তিনি ও-পাশটাও ঘুচিয়ে দিলেন।'

পরিধেয় আর পৈতে—এ দুটো উপাধি ছাড়া কিছু নয়। অভিমানের চিহ্ন। আমি বামুন, জাতে-জন্মে সকলের চেয়ে বড়, এই অহংকার। এই অহংকার বর্জন না করলে দীনতা আসে না। দীনতা না এলে সরলতা আসে না। আমার মা'র আরেক নাম সরলতা।

আমি কী? আমি কি বস্ত্র না উপবীত? আমি কি হাড় না মাংস? রক্ত না নাড়ীভুঁড়ি? খোঁজো। খুঁজে কী পাচ্ছ দেখতে? দেখছ, আমি নেই, শুধু তিনি। আমার কিছুই উপাধি নেই, শুধু তাঁর ঐশ্বর্য।

রামচন্দ্রকে বললেন হনুমান, 'রাম, কখনো ভাবি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ। কখনো ভাবি তুমি সেব্য, আমি সেবক। কখনো ভাবি তুমি প্রভু, আমি দাস। কিন্তু রাম, যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি তুমিও যা আমিও তাই। তুমিই আমি, আমিই তুমি।'

যা সোহহং তাই তত্ত্বমসি।

হৃদয় মামাকে বকতে এসেছিল, সব অন্য রকম হয়ে গেল। বললে, 'অহংকার যায় কই? এই যায় আবার এই আসে।'

তাই তো বলি, আমি যখন যাবে না, তখন থাক শালা দাস-আমি হয়ে। আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের ভক্ত, আমি ঈশ্বরের ছেলে এ অহংকার ভালো।

হাজার বিচার করো, আমি যায় না, চায় না যেতে। ভাবো একবার, চারদিকে অনন্ত জল, উপরে-নিচে সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে জলে জলময়। সেই জলের মধ্যে একটি কুম্ভ আছে। কুম্ভের বাইরে যেমন জল তেমনি ভিতরেও জল। জলে জল। তবু কুম্ভটি তো তখনো আছে। ঐটি হচ্ছে আমিরূপী কুম্ভ। যতক্ষণ কুম্ভ আছে ততক্ষণ আমি-তুমি আছে। তুমি ঠাকুর আমি ভক্ত। তুমি প্রভু আমি দাস। তুমি আকাশ আমি পৃথিবী।

'কিন্তু কুম্ভ যখন থাকবে না? ভেঙে যাবে?'

গদাধর আবার ধ্যানস্থ হল।

তখন রাম আর হনুমান এক। তখন সে এক অন্য কথা। তখনকার কথা তখন।

* ১১ *

'মা গো, তুই কই? আমাকে কৃপা কর্। আমাকে দেখা দে। রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমায় তবে কেন দেখা দিবিনে? আমি কি দোষ করেছি জানিয়ে যা। এত কান্নায়ও কি সব দোষ ধুয়ে গেল না? আমি ধন জন ভোগ বিভব কিছুই চাই না, মা। শুধু তোকে চাই। তুই দয়া কর্। দেখা দে।'

চোখের জলে বুক ভেসে যায় গদাধরের। অশ্রুভরা গলাতেই ফের গান ধরে:

আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশীভালী
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যবে মুণ্ডমালা কোথা পেলি!

পরের দিন আবার কান্না : 'মা গো, আরেক দিন চলে গেল। বৃথাই গেল। তুই এলি না। এই তো সামান্য আয়ু, তার মধ্যে আরো একদিন নিয়ে নিলি, মা। আমার কান্না কি তুই শুনিস না ? আমার কান্নার কি জোর নেই ? আমি কি পারছি না কাঁদতে ?'

নুয়ে পড়ে ঘাসের মধ্যে মুখ ঘষে গদাধর। বলে : 'মা তুই কোথায় ? তুই কি সত্যি আছিস ? না, সব মায়া, মিথ্যা, সব মনের ভুল ? যদি তুই আছিস, তোর জন্যে যখন এত আলো এত অন্ধকার, তখন তোকে আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন ? রামপ্রসাদ তো তোকে দেখেছে। তোকে তবে ছলনা বলি কি করে ? তুই আয়। দেখা দে। চোখের সামনে দাঁড়া।' মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে গদাধর। চুল ছিঁড়ছে। মাটিতে মুখ ঘষছে। চোখের জলে কাদা করে ফেলছে।

'আহা, ছোকরার মা মরেছে বুঝি।' পথ-চলতি লোক দাঁড়িয়ে পড়ে কৌতূহলে।

'কিসে ম'ল ? কবে ? মাকে খুব ভালোবাসত, তাই না ?'

চার পাশে ভিড়, তবু গদাধরের লজ্জা নেই, লৌকিকতা নেই। এক বিন্দু বিরতি নেই কান্নার।

'এক-এক করে দিন চলে যাচ্ছে, মা। এক-পা এক-পা করে এগুচ্ছি মৃত্যুর দিকে। আর দেরি সহ্য হচ্ছে না ! নরজন্ম যে ফুরিয়ে যাচ্ছে। শাস্ত্রে বলে, তুই-ই সত্য, তুই-ই একমাত্র অধিগম্য। শাস্ত্র কি সব গাঁজাখুরি ? তুই কি ভাঁওতা ? সমস্ত একটা ভেল্কিবাজি ? সমস্ত জগতের কি কেউ জননী নেই ? যদি থাকে তবে সে কি আমারো জননী নয় ?'

যন্ত্রণায় ছটফট করছে গদাধর। মনে হচ্ছে এক ঘরে আছে একতাল সোনা, অন্য ঘরে ঢুকেছে এক চোর। মাঝখানে শুধু একটা পাৎলা যবনিকা। সোনা নেবার জন্যে চোর কি পাগল হয়ে ফিরবে না ? চাইবে না সে পর্দাটা দুই হাতে ছিঁড়ে ফেলতে ? টুকরো-টুকরো করে ফেলতে ?

গুরু নেই, সাধু বা সিদ্ধ পুরুষ কেউ নেই যে, রীতি-নীতি বা পদ্ধতি-প্রকরণ শেখায়। এমন কেউ স্বজন বন্ধু নেই যে অভিজ্ঞতার কথা বলে। শাস্ত্রপুঁথি তো চিরকালের জন্যে শিকেয় তোলা। কোনোই সহায়-সম্বল নেই গদাধরের। শুধু আছে উত্তুঙ্গ বিশ্বাস আর উদ্দাম ব্যাকুলতা।

পুজোয় নিয়ম মত আর বসতে পারে না গদাধর। কেমন যেন সে হয়ে গিয়েছে। মূর্তির সামনে নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। কখনো কখনো, ঘুমের মধ্যে, শিশু যেমন কাঁদে তেমনি করে কেঁদে ওঠে। পুজো করতে-করতে হঠাৎ কখনো ফুল নিয়ে নিজের মাথার উপর রাখে আর পুজা ভুলে ডুবে যায় সমাধিতে। ফুল দিয়ে দেবীকে সাজাচ্ছে তো সাজাচ্ছেই, শেষ আর হচ্ছে না। আরতি করছে তো করছেই, দীপ থেকে ঘণ্টায়, আবার ঘণ্টা থেকে দীপেই ফিরে আসছে। দেরি করছে, প্রতীক্ষা করছে। এই বুঝি মা জেগে উঠবেন।

'আমার কথা তুই কেন শুনছিস না মা ? আমি তোর অযোগ্য ছেলে বলে কি তোর স্নেহেরও অযোগ্য ? আমি বেদ-বেদান্ত কিছু জানি না বলে কি তোর স্নেহও জানব না ?'

সবাই বিদ্রূপ করছে। বলছে, আহা মরি! কী পুজোই না হচ্ছে! গদাধরের ভ্রূক্ষেপ নেই। লোকের মুখের দিকে সে চাইবে না। সে চেয়ে আছে মা'র মুখের দিকে। ঘুম নেই। খাবার গলছে না গলা দিয়ে। সমস্ত মুখ আর বুক লাল।

তবু, কোথায় মা! কোথায় জগদীশ্বরী!

যেমন করে ভেজা গামছা নিংড়োয় তেমনি করে কে বুকের মধ্যিখানটা নিংড়োচ্ছে গদাধরের। মনে ভয় ঢুকেছে, হয়তো ইহজীবনে মা'র দর্শনলাভ হবেই না। মা থাকতেও মাকে যদি না পাই তবে কী হবে বেঁচে থেকে? জীবনের আর তবে মূল্য কি?

হঠাৎ কালী-ঘরে যে খাঁড়া ঝুলছিল তার উপরে নজর পড়ল। গদাধর শিশুর মতন ছুটে গিয়ে পেড়ে আনলে সেই খড়্গ। এই মুহূর্তেই জীবনের সে অবসান করে দেবে। আত্ম-রক্তপাতে জননীর নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ নেবে।

গলায় আঘাত করতে যাচ্ছে, অমনি সামনে মা এসে দাঁড়ালেন।

মা! তুই মা? তুই এলি এত দিনে?

মেঝের উপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল গদাধর।

'দেখলুম—কী দেখলুম—যেন ঘর-বাড়ি ছাদ-দেয়াল জানলা-দরজা আড়াল-আবডাল সব এক নিমেষে কোথায় উড়ে গেল, মিশে গেল। কোথাও কিছু নেই। শুধু এক সীমাহীন উজ্জ্বল সমুদ্র। চৈতন্য-সমুদ্র। যেদিকে তাকাই, দেখি তার জ্বলন্ত ঢেউ আমাকে গ্রাস করবার জন্যে ছুটে আসছে। চার দিক থেকে ছুটে আসছে। চোখের পলকে আমাকে আচ্ছাদন করে ফেলল, ভেঙে গুঁড়িয়ে মিশিয়ে দিল একাকার করে। কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে তলিয়ে গেলুম।'

কিন্তু ঐ কি তোমার মা? ঐ তোমার মাতৃরূপ? শুধু চৈতন্যময়ী জ্যোতি? তোমার মা হাসে না, কথা বলে না, খায় না, হাঁটে না?

কি জানি। ঢেউয়ে-ঢেউয়ে আমাকে ডুবিয়ে নিয়ে গেল অতলে। আমি আনন্দে 'মা' 'মা' বলে কেঁদে উঠলুম। মনে হল ও তো ঢেউ নয়, মা-ই আমাকে টেনে নিলেন কোলের মধ্যে।

জল আর বরফ, বরফ আর জল। যাই জল তাই বরফ, যাই বরফ তাই জল। নির্জনে গোপনে বসে কাঁদতে লাগল গদাধর: 'মা গো, তুই যে কেমন তাই আমাকে দেখিয়ে দে। তুই সাকার কি নিরাকার বুঝতে পারি না। তুই কালী না ব্রহ্ম তা তুই-ই জানিস। তুই যা হ, আমায় কৃপা কর্, দেখা দে।'

পরে আবার বলতে লাগল আকুল হয়ে: 'ভক্তের কাছে একবার ব্যক্তি হয়ে দেখা দে মা! একবার বরফ হয়ে ওঠ। তারপর যখন জ্ঞানসূর্য উদয় হবে তখন না-হয় বরফ গলে আগেকার যেমন জল তেমনি জল হয়ে যাবি। আমি তোর মা-রূপটি ভালোবাসি। আমায় তুই মা হয়েই দেখা দে। আমি তোর সন্তান, আমায় সন্তান ভাব।'

একবার দেখে কি তৃপ্তি আছে গদাধরের? সে বহুবার, অনন্ত বার দেখতে চায়। মায়ে পূর্ণ হয়ে থাকতে চায়, লীন হয়ে থাকতে চায়। যা পূর্ণ তাই লীন। চাই সেই অবিরাম যোগ। অবিচ্ছিন্ন আনন্দ।

লোক দাঁড়িয়ে থাকে চার দিকে, কত কি মন্তব্য করে, গদাধর কান পাতে না,

চোখে দেখে না। মনে হয় সব পটে-আঁকা ছায়ামূর্তি। অবস্তু, অসত্য। মনে হয় সংসারে শুধু মা আর মা'র জন্যে এই কাতর-কাকুতি ছাড়া আর কিছু নেই। তাই কে কি বলবে বা ভাববে কিছু আসে-যায় না গদাধরের। শুধু আসে-যায়, মা কবে আবার দেখা দেবেন, কবে থাকবেন চিরদ্যুতি হয়ে! একমাত্র হৃদয়ের দুশ্চিন্তা। এ যে কঠিন রোগ হয়ে পড়ল মামার। কাজের বার হয়ে পড়ল ক্রমে ক্রমে। সাধনা করতে বসে স্নায়ুবিকার হল। চিকিৎসা করতে হয়। ভূকৈলাসের রাজার যে কবরেজ ছিল, নামজাদা বদ্যি, তাকে খবর পাঠাল। কবরেজ এসে নাড়ী টিপলে। ওষুধ দিলে। এ রোগের ওষুধ নেই। এ রোগের ওষুধ মাতৃদর্শন। মাতৃস্পর্শন!

হৃদয় ভাবলে, কামারপুকুরে খবর পাঠাই। মা'র ছেলে ফিরে যাক মা'র কাছে।

* ১২ *

শুধু একবার দেখা দিয়েই পালিয়ে গেলে চলবে না। চোখের সামনে দাঁড়াতে হবে স্থির হয়ে। শুধু একটু হাত বাড়িয়ে দিলি, বা দু'টি চোখ নাচালি, বা ছুটে পালিয়ে গেলি চুল এলিয়ে, তাতে হবে না। শান্ত হয়ে সর্বসম্পূর্ণ হয়ে দাঁড়াতে হবে। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে থাকতে হবে সংগে-সংগে। পায়ে-পায়ে, চোখে-চোখে, নিশ্বাসে-নিশ্বাসে। পৃথিবীকে ঘিরে যেমন বাতাসের প্রাণ-স্পর্শ তেমনি আমাকে ঘিরে তোর অচঞ্চল অঞ্চল।

'মন রে, ঐ দ্যাখ।'

কি দেখব?

ভৈরবকে দ্যাখ, মা'র নাটমন্দিরের ছাদের আলসেয় ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছে। অমনি নিশ্চল ষড়্ভাবশূন্য হয়ে বসবি, চোখ রাখবি মা'র পদ্মপদের উপরে। শরীরে ঝড় বয়ে যাবে, ভেঙে পড়বে সব ছাদ-দেয়াল। তুই নড়বি না। তুই নড়বি কেন? যার নাড়ীর টান সে নড়ুক।

আমার কি হচ্ছে, কিছুই বুঝছি না। কিংবা কিছুই হচ্ছে না মাথামুণ্ডু। মন রে, মাকে তাই তুই বল কেঁদে-কেঁদে। বল, আমাকে শিখিয়ে দে মা, কি করে তোকে দেখতে পাব। আমি একেবারে নিরেট, আমি না জানি তন্ত্রমন্ত্র, না জানি যাগযজ্ঞ, তুই না বলে দিলে কে বলে দেবে? তুই-ই বল, তুই ছাড়া আমার কি আর কেউ আছে?

মনকে এ কথা বলতে বলে দিয়ে চোখ বুজল গদাধর। ধ্যানে নিশ্চিহ্নচেতন হয়ে গেল। মনে হল কে যেন শরীরের হাড়ে-হাড়ে জোড় খাইয়ে তালা মেরে দিচ্ছে। একটু যে নড়বে-চড়বে, বা আসন বদলাবে তার সাধ্য নেই। আবার যতক্ষণ না গ্রন্থিগুলি খুলে দিচ্ছে ততক্ষণ এমনি স্থাণু হয়ে বসে থাকো জড়পুত্তলির মত। মন রে, বসে থাক। ভালোই তো, থাক বসে। যে তোকে বসিয়ে রেখেছে, সে কতক্ষণ বসে থাকতে পারে দেখি।

কি দেখছিস ?

জ্যোতির্বিন্দু দেখছি।

সর্ষেফুল দেখছিস। তার মানে কিছুই দেখছিস না।

না। এখন আর বিন্দু নেই। পুঞ্জ-পুঞ্জ হয়ে উঠেছে।

তার পর ?

গলানো রুপোর স্রোত চলেছে পৃথিবীতে। সব কিছু জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। উঠেছে ? তবে ধৈর্য ধর্। এবার দেখা দেবেন জ্যোতির্ময়ী। জগদ্ভাসিনী।

ঘরে স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে গদাধর। সমাধি হয়েছে। সম্যক প্রকারে ধারণ করার ভাবই তো সমাধি। মা আগে আংশিক ছিলেন, কখনো প্রসারিত একখানি হাত, কখনো স্থির-স্থিত দুটি পা, কখনো বা হাসির ঝিলিক দেওয়া একটি ক্ষণচকিত চাহনি—এখন মা সম্যকসম্পূর্ণ হয়ে উঠছেন। সমগ্র, সর্বাঙ্গসম্পন্ন। অষ্টৈশ্বর্যে সৌষ্ঠবান্বিত।

ঝম্‌ঝম্ শব্দে পাঁয়জোর বাজিয়ে কে উঠছে রে মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে ? গভীর রাতে নির্জন মন্দিরের চাতালে কে এমন ছুটোছুটি করছে ? ক্ষিপ্র পায়ে বেরিয়ে এল গদাধর। দেখল, চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেল, মা মহামায়া মুক্তকেশে মন্দিরের দোতলার বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রলয়-ঘনঘটা ঘোররূপা প্রচণ্ডা। দিগ্‌বস্ত্রা নবনীল-ঘনশ্যামা। পুবে একবার কলকাতার দিকে তাকাচ্ছেন, আরেক বার তাকাচ্ছেন গঙ্গার দিকে, পশ্চিমে। সর্ববর্ণময়ী, পরব্রহ্মস্বরূপিণী। মা আমার কালো কেন বলতে পারিস ? যার আদিও নেই অন্তও নেই তাকে তুই কোন রং দিয়ে বোঝাবি ? যার কোনো রং-ই নেই, সে কালো ছাড়া আর কি ?

মা আমার উলঙ্গিনী কেন ? মা যে অদ্বিতীয়া। যেখানে দ্বিতীয় বলে কেউ নেই, সেখানে আবরণের কথা ওঠে না ! যে অন্তহীন তাকে তুই আবরণ দিয়ে ঢাকবি কি করে ?

মন্দিরে ঢুকল গদাধর। মন্দিরে মূর্তি নেই, তার বদলে সশরীরে মা আছেন বসে। গদাধর তাঁর নাকের নিচে হাত রাখল, হাতে স্পষ্ট নিশ্বাসের স্পর্শ। মন্দিরে ভোগ সাজিয়ে রেখেছে, দেখল, গায়ের রঙে ঘর আলো করে মা খেতে বসেছেন। এক-এক দিন মন্ত্র বলবার পর্যন্ত ফুরসৎ দেন না, নৈবেদ্যের জন্যে হাত বাড়িয়ে বসেন।

'দাঁড়া, আগে মন্ত্রটা বলি, তার পর খাস।' চেঁচিয়ে উঠল গদাধর।

হৃদয় ছুটে এল। দেখল, জবা-বেলপাতা নিবেদন করবার আগেই মামা নৈবেদ্যের থালা নিবেদন করছে মাকে। 'এ কি মামা, এ কি করছ ?'

'কি করব ! রাক্ষুসির যে তর সইছে না। খিদের জ্বালায় নোলা সকসক করছে।' শুধু তাই নয়। নৈবেদ্যের থালা থেকে এক গ্রাস ভাত নিয়ে মামা সিংহাসনে উঠে মা'র মুখে ঠেকিয়ে বলছে, 'খা, খা, বেশ করে খা—'

'হঠাৎ সুর বদলে বলছে, 'কি, আমাকে খেতে হবে ? আমি না খেলে খাবি নে ? বেশ, খাচ্ছি—' বলে গ্রাসের খানিকটা নিজের মুখের মধ্যে পুরে দিলে। পরে উচ্ছিষ্টাংশ মা'র মুখে দিয়ে বললে, 'নে, এবার খা। আমি তো খেলাম—'

হৃদয় স্তম্ভিত। নিঃসন্দেহ, বদ্ধ পাগল হয়েছে মামা। ফুল-বেলপাতা মায়ের

পায়ে না দিয়ে নিজের পায়ে রাখছে। মাকে পূজা না করে নিজেকে পূজা করছে। সর্বনাশ! সেজবাবু দেখতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না। এক ধমকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেবেন। হৃদয়েরও অন্ন উঠবে সঙ্গে-সঙ্গে।

শুধু পাগল নয়, কাঁধে ভূত চেপেছে মামার। নইলে দেবতাকে নিয়ে এ কী শুরু করেছে ছেলে-খেলা! মা'র চিবুক ধরে আদর করছে, কথা কইছে, ঠাট্টা-তামাশা করছে। মা যেন সসম্ভ্রম দূরত্বের জিনিস নয়, একেবারে কোলে চড়ে বসবার জিনিস। যেন অনম্য প্রণম্য নয়, আদর-ভালোবাসার কাঙাল। যেন বিধির বাঁধনে দরকার নেই, যেন গুটি-গুটি পায়ে আর এগুতে হবে না ভয়ে-ভয়ে, মাকে সিংহাসনে বসিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে লুটোতে হবে না আর চৌকাঠের বাইরে। সটান সিংহাসনে উঠে তাব কোলে চড়ে বসতে হবে। সেই মা—যে ত্রিজগৎ-প্রসবিনী—সেই মা'র কোলে কোলের শিশু হয়ে চড়ে বসব। আমি উঠবন্দী রায়ত না হয়ে ক্ষেমংকরীর খাস তালুকের প্রজা হব। এই যে মা'র কোলে চেপে বসেছি—এ হচ্ছে "ক্ষেমার খাসে আছি বসে, আমার মহালে নাই শুখা-হাজা।" যিনি জগৎরঙ্গিণী তাঁর সঙ্গে ঘরের ভাষায় রঙ্গ-রহস্য করব। মা যে আমার সহজ মানুষ। সহজ না হলে সহজ মানুষকে চিনব কি করে?

গদাধরের মুখ-চোখ লাল। যেন মদ খেয়েছে আকণ্ঠ। টলে-টলে নাচছে আর গান গাইছে: 'সুরাপান করি নে রে, সুধা খাই রে কুতূহলে। আমার মন মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে॥' সরাসরি গান শোনাচ্ছে মাকে। মা'র হাত ধরে নেচে বেড়াচ্ছে:

> "আর ভুলালে ভুলব না গো,
> ভয়ে হেলব না গো দুলব না গো—
> প্রসাদ বলে, দুধ খেয়েছি
> ঘোলে মিশে ঘুলব না গো॥"

রাত্রে ঘুম নেই। ভাবের ঘোরে কার সঙ্গে কথা কয়। কখনো বা গান শোনায়। 'ঘুমুবে না মামা?'

দুই চোখে ধারা, গান ধরে গদাধর:

> "ঘুম ছুটেছে, আর কি ঘুমাই,
> যোগে যাগে জেগে আছি।
> এবার যার ঘুম তারে দিয়ে
> ঘুমেরে ঘুম পাড়িয়েছি।
> যে দেশে রজনী নাই,
> সেই দেশের এক লোক পেয়েছি॥"

কোনো দিন বা মন্দিরে মাকে শয়ন দিচ্ছে, হঠাৎ সেই শূন্যরূপাকে উদ্দেশ করে বলে উঠল গদাধর: 'আমাকে তোর কাছে শুতে বলছিস? আচ্ছা, শুচ্ছি তোর বুকের কাছে।' মা'র সর্ব অঙ্গে বাৎসল্য, দুই চোখে স্নেহসিঞ্চিত লাবণী। হাত-পা গুটিয়ে ছোট্টটি হয়ে মা'র রুপোর খাটে শুয়ে পড়ল গদাধর। নীল-নিবিড় মেঘমণ্ডলের কোলে ক্ষীণ শশিকলা।

*

ভোগ নিবেদন করছে, কালীঘরে এক বেড়াল এসে উপস্থিত। ঘুরছে আর মিউ-মিউ করছে। ওমা, মা এসেছিস? খাবি মা? খা। ভোগের অন্ন বেড়ালকে খাওয়াতে বসল গদাধর।

গণেশ একবার মেরেছিল একটা বেড়ালকে। ভগবতী বললেন, তুই আমাকে মেরেছিস। আমার সর্ব অঙ্গে যন্ত্রণা। সে কি কথা? গণেশ তো হতবুদ্ধি। মাকে সে মারবে? এই দ্যাখ, তোর মারের দাগ আমার গায়ে ফুটে রয়েছে। লজ্জায়, অনুশোচনায় মাটির সঙ্গে মিশে গেল গণেশ। যা মার্জারী তাই ভগবতী।

রাত্রিতে তো মন্দিরে আলো-জ্বলে। মা যদি আসেন, ঘরের মধ্যে চলাফেরা করেন, তবে দেয়ালে তাঁর ছায়া পড়ে না কেন? ভাবে হৃদয়। মাকে দেখার পুণ্য করিনি কিন্তু দেয়ালে তাঁর ছায়া দেখতে দোষ কি! দিব্য অঙ্গের ছায়া থাকবে কি? সে অচক্ষু হয়েও দেখে, অকর্ণ হয়েও শোনে। অস্পর্শ হয়েও কোলে নেয়।

বিশুদ্ধ পাগলামো। তাই বলে হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে না এ কেলেঙ্কারী। দেব-দেবী নিয়ে এই চপল ছেলেমানুষি। আগে নিজের পায়ে ঠেকিয়ে পরে মায়ের পায়ে ফুল দেওয়া। আগে নিজে খেয়ে মাকে এঁটো খাওয়ানো। খাটের উপর মা'র পাশেই শুয়ে পড়া। মা'র চিবুক ধরে ফস্টি-নস্টি করা। অসম্ভব এই অনার্যতা। একটা বিহিত করতে হয়। জানাতে হয় সেজবাবুকে।

কালীঘরের দোড়গোড়ায় দাঁড়ায় এসে সব মন্দিরের আমলারা। খাজাঞ্চি আর গোমস্তা, নায়েব আর আটপ্রহরী। কি-রকম যেন আবিষ্টের মতন চেয়ে থাকে। গদাধরের ধরন-ধারণ সব কিম্ভূত তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আন্তরিকতায় ভরা। যা কিছু করছে যেন অকপটে করছে। বিশ্বাস বেশি বলেই যেন এত সাহস। আর ঐ যে উন্মনা ভাব ও যেন ঠিক উন্মাদের ভাব নয়।

সবাই শাসন-বারণ করতে এসেছিল। মুখস্ফুট করতে পেল না। দপ্তরে ফিরে পরামর্শে বসল—কি করা! আর কি করা! জানবাজারে খোদ মালিকের দরবারে দরখাস্ত দিতে হয়। যাই বলো, না হচ্ছে বিধিমত পুজা, না হচ্ছে ভোগরাগ। অশাস্ত্রীয় অকাণ্ডের জন্যে শেষকালে না কোনো অঘটন ঘটে!

মথুরবাবু লিখে পাঠালেন, দাঁড়াও, আমি নিজে গিয়ে সব ব্যবস্থা করছি।

এবার তল্পি বাঁধো। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। অনাচারের দণ্ড নাও।

কাউকে কিছু না বলে পুজোর মধ্যে মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন মথুরবাবু। সটান ঢুকে পড়লেন কালীঘরে। ঢুকে যা দেখলেন, তা নরদেহে দেখবেন বলে কল্পনা করেননি। গদাধর তন্মনোময় হয়ে পুজা করছে। কোনো দিকে লক্ষ্য নেই, লজ্জা নেই। যে মথুরবাবুর নিশ্বাসের আভাসে আর সবাই শশব্যস্ত, সে মন্দিরে এল বা চলে গেল, ভ্রূক্ষেপ করে না গদাধর। তার সমস্ত নিবেশ-নিক্ষেপ মা'র উপরে। কখনো কাঁদছে আকুল হয়ে, কখনো বা চেঁচিয়ে উঠছে আনন্দে। তন্ময় হয়ে গান গাইছে কখনো, কখনো বা ধ্যানে নিঃসংজ্ঞ হয়ে যাচ্ছে। মা'র সঙ্গে কথা কইছে নির্ভয়ে। অভিমান করছে, আবদারে ছেলের মত আখুটেপনা করছে। এ কি দেখছেন মথুরবাবু!

তাঁর দুই হাতে কি কোনো শাসনের উদ্যতি ছিল ? হঠাৎ সেই দুই হাত তাঁর অঞ্জলিবন্ধ হল কেন ?

ঘুমঘোর ভাঙবে এবার মা'র। পাষাণী এবার প্রাণময়ী হয়ে উঠবে। আর ভাবনা নেই। মিলেছে ওস্তাদ বাজীকর। ঘুম-ভাঙানে বাঁশিওয়ালা। যেমন এসেছিলেন তেমনি ফিরে গেলেন চুপি-চুপি। জানবাজার থেকে ফরমান পাঠালেন, গদাধরকে যেন বাধা দেওয়া না হয়। যেমন তার খুশি তেমনি ভাবেই পুজো করুক মাকে।

সীমা ছেড়ে চলে এসেছে সে অসীমায়। মাটির উপরকার বাঁধা-ধরা লাইন-ফেলা রাস্তা ছেড়ে সে চলে এসেছে আকাশের অনাবৃতিতে। ক্রিয়াকর্মের শাস্ত্র থেকে সর্বার্পণের অশাসনে। বৈধীভক্তি থেকে পরমপ্রেমরূপা ভক্তিতে। শুধু সন্তরণে নয়, নিমজ্জনে। ইন্দ্রিয়বিষয়ে অবিবেকীর যেমন আগ্রহ সেই "পরানুরক্তিরীশ্বরে।" সর্ববন্ধনবিমোচনে।

'মা-মা যে করো, মাকে দেখতে পাও তুমি ?' নরেন্দ্রনাথ জিগগেস করল ঠাকুরকে। জিজ্ঞাসার মধ্যে যেন বা একটু অবিশ্বাসের রহস্য।

'দেখতে পাই কি রে ! মা'র সংগে বসে কথা কই, খাই, মা'র পাশটিতে শুয়ে ঘুমুই—'

নরেন্দ্রের স্বরে তখনো প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ : 'ঈশ্বরকে দেখা যায় কখনো ? কোথায় সে ?' নিচে, উপরে, পিছনে, সামনে, দক্ষিণে, উত্তরে—স এবেদং সর্বমিতি। ভিতরে বাইরে—বহিরন্তশ্চ ভূতানাম্। আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত তিনি। অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষু অবস্থিতং। দেখবি বৈ কি, নিশ্চয়ই দেখবি। তোর এমন চক্ষু, তুই দেখবি নে ?

প্রতাপ হাজরা দক্ষিণেশ্বরে আস্তানা গেড়েছে। সে হচ্ছে নগদ-বিদায়ের সাধু। তার মানে, ধর্ম-কর্ম করে কিন্তু সব সময়েই প্রত্যাশা করে কিছু চাল-কলা। যদি কিছু পার্থিব উপকার না হয় তবে কি হবে এ-সব জপতপে ? সব খাটুনিরই মুনাফা আছে আর এর বেলায়ই শুধু লবডঙ্কা ! যদি জপতপ করে কিছু সিদ্ধাই হয় তবে হয়তো সংসারের অবস্থাটা ফেরানো চলে। মনে-মনে এই কামনা নিয়েই বসেছে পুজার্চনায়।

'হাজরা শালার ভারি পাটোয়ারি বুদ্ধি।' ঠাকুর সাবধান করে দিতেন ভক্তদের, 'ওর কথা শুনিস নে তোরা কেউ।'

কিন্তু হাজরার কথা নরেনের মন্দ লাগে না। এই লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখার কথা। যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে স্পর্শসহ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুনো। স্তবের সংগে-সংগে বাস্তবেরও হিসেব নেওয়া। দেহ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সন্দেহ তো থাকবেই। হাজরার কথা তাই একেবারে ফেলনা নয়।

'যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়—এ গানটা গা তো রে নরেন।' ঠাকুর ফরমাস করলেন।

নরেন গান ধরল। তাকে দিয়ে গান গাইয়ে ছাড়লেন ঠাকুর।

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। যা কিছু তুই দেখছিস তোর চোখের সামনে, সব তিনি।

গাছ পাখি মানুষ পশু,-সব। আকাশ মাটি বাতাস আগুন জড় চেতন—সমস্ত। নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্। তিনি সর্বব্যাপী। সর্বাতীত। স্বয়ংপ্রকাশ। কে ঈশ্বর ?

কে ঈশ্বর ! অল্পতার শেষ সীমা পরমাণু আর বৃহতের শেষ সীমা আকাশ। তেমনি জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তির অল্পতার পরাকাষ্ঠা ক্ষুদ্র জীব আর তার আতিশয্যের পরাকাষ্ঠা—ঈশ্বর।

সহজ করে বলুন।

সহজ করে বলব ! ঈশ্বর কে তাই জানতে চেয়েছিস ? সহজ করেই বলি। "তত্ত্বমসি"। অর্থাৎ তুই-ই সেই। হাসতে লাগলেন ঠাকুর।

তবু সংশয় যায় না নরেনের। সংশয় থাকলেই মীমাংসা। নির্ণয় তো সংশয়সাপেক্ষ। সংশয় আছে বলেই সংসারবিচার। আত্মবিচার। থাক, থাক তুই সংশয়ে।

নরেন বারান্দায় এসে বসল হাজরার কাছে। তামাক সাজছে হাজরা। হুঁকোটা বাড়িয়ে দিল নরেনের হাতে। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে নরেন বললে, 'বলে কি অসম্ভব কথা ! এ কখনো হতে পারে ?'

'কি বলে ?' হাজরা কটাক্ষ করল।

'বলে কি না, ঘটি বাটি থালা গ্লাশ সব কিছু ঈশ্বর। যা কিছু দেখছি চোখ মেলে তাই না কি তাই। এমন কি আপনি আমি—আমরাও না কি—'

হাসির রোল তুলল হাজরা। পাগল আর কাকে বলে ! সে ব্যঙ্গের হাসিতে নরেনও যোগ দিলে।

ঘরের মধ্যে ঠাকুরের তখনো অর্ধবাহ্যদশা। সে সব্যঙ্গ হাসির শব্দ তার কানে এল। তিনি নিমেষে বালকের মতন হয়ে গেলেন। পরনের কাপড়খানি বগলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়।

'কি বলছিস রে, নরেন ?' হাসতে হাসতে কাছে এসে নরেনকে ছুঁয়ে দিলেন ঠাকুর। ছুঁয়েই সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

আর নরেন ? নরেনের কি হল ?

কি যে হল কে বলবে। চোখের সমুখ থেকে একটা পর্দা উঠে গেল। যেন চেতনান্তর হল। নিদ্রিত দুই চোখ বুজে গিয়ে জেগে উঠল ললাটোর্ধ্ব তৃতীয় নয়ন। চেয়ে দেখল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। ধূলিকণা থেকে আকাশ-বিকাশ সূর্য পর্যন্ত সব কিছু ঈশ্বর।

এ কি, চোখে ঘোর লাগল না কি ? চোখ বুজল নরেন। অন্ধকারেও সেই ঈশ্বর। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল নরেন।

বাড়িতে এসেও সেই ভাব। ইট কাঠ দরজা চৌকাঠ সব প্রাণময়। খেতে বসল, মনে হল, থালা-বাটি, ভাত-ডাল সব কিছুর মধ্যে ঈশ্বর বসে আছেন। যিনি পরিবেশন করছেন আর যে খাচ্ছে দুই-ই তিনি। ভাতের থালার সামনে নিস্পন্দের মত বসে রইল নরেন। 'কি রে, বসে আছিস কেন ? খা।' মা মনে করিয়ে দিলেন। খেতে শুরু করল নরেন। কিন্তু যে খাচ্ছে সে কে ! যাকে খাচ্ছে তাই বা কি !

ভোর হল তবুও ঘোর গেল না। কলেজে চলেছে, রাস্তায় বেরিয়েও সেই বিচিত্র অনুভূতি। সর্বানন্দপ্রদাতা ঈশ্বর সমস্ত কিছুর মধ্যে জাগ্রত হয়ে আছেন। প্রায় গায়ের উপর গাড়ি এসে পড়ছে, তবু সরবার প্রবৃত্তি হয় না, মনে হয় গাড়িও যা সেও তাই, দুই-ই ঈশ্বরপূর্ণ। বিকেলে হেদোর ধারে বেড়াতে বেরিয়ে লোহার রেলিঙে মাথা ঠুকছে নরেন : বল্, তুই কে ? তুই কি ঈশ্বর ?

কোথাও কি রন্ধ্র নেই, অন্ত নেই ? জাগরণে যে আছে সে কি স্বপ্নেও আছে ? সুষুপ্তিতেও কি সেই ? আর সব কিছুর অন্তরালেও কি সেই এক অখণ্ড-স্বরূপ ? সব সেই এক। সাপ চুপ করে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ, আবার তির্যক্-গতি হয়ে এঁকে-বেঁকে চললেও সাপ। নিত্যেও যিনি লীলায়ও তিনি। সব একাকার।

শুধু ঈশ্বর দেখছি এ হলেই চলবে না। তাঁকে ঘরে আনতে হবে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে হবে। রাজাকে তো অনেকেই দেখে পথে দাঁড়িয়ে। কিন্তু বাড়িতে এনে খাওয়াতে-দাওয়াতে পারে দু'-এক জন। নরেন আকুল হয়ে উঠল। আমি কি পথে দাঁড়িয়ে রাজা দেখব ? আমি কি তাকে টেনে আনতে পারব না ঘরের মধ্যে ?

* ১৩ *

গদাধরের সমস্ত শরীরে ভীষণ জ্বালা। প্রায় ছ'মাস ধরে ভুগছে। নানান ধরনের কবরেজি তৈল এনে দিলে হৃদয়। গায়ে-মাথায় মাখিয়ে দিলে। কিছুতেই কিছু হল না।

পঞ্চবটীতে বসে ধ্যান করছে গদাধর, হঠাৎ তার শরীর থেকে কে একজন বেরিয়ে এল। ঘুটঘুটে কালো, চোখ দু'টো লাল, ভয় পাওয়াবার মতন চেহারা। নেশাখোরের মত টলে-টলে পড়ছে। আরো একজন বেরিয়ে এল পিছু-পিছু। পরনে গেরুয়া, হাতে ত্রিশূল, প্রশান্ত মূর্তি। সেই ঘোরদর্শন কদাকারকে সে আক্রমণ করলে, নিপাত করলে। পাপ-পুরুষ ভস্ম হয়ে গেল।

মথুরের কাছে রানি শুনলেন সব কাণ্ড-কারখানা। ঠিক করলেন একদিন গদাধরকে দেখে আসবেন নিজের চোখে। তাই এসেছেন।

গঙ্গায় স্নান করে ঢুকেছেন মন্দিরে। মা'র মূর্তির কাছে বসেছেন শান্ত হয়ে। গদাধরের গান বড় ভালো লাগে। তাই বললেন, 'একটা গান ধরো।'

গান ধরল গদাধর। রানি ধ্যানে চোখ বুজলেন।

হঠাৎ, বলা-কওয়া নেই, গদাধর রানির গায়ে এক চড় বসিয়ে দিল। ধমকে উঠল, 'এখানেও ঐ চিন্তা ?'

রানি হকচকিয়ে উঠলেন। এস্টেট নিয়ে একটা কঠিন মামলা চলছে, তারই কথা ভাবছিলেন ধ্যানে বসে। কিন্তু, তাই বলে সামান্য একজন মন্দিরের পুরোত

তাঁর গায়ে হাত তুলবে না কি? মন্দিরের খাজাঞ্চি-গোমস্তারা উৎসুক হয়ে উঠল। এবার নির্ঘাৎ বরখাস্ত হবেন বাছাধন।

হৃদয় ছুটে এল মামার কাছে। ভীতকণ্ঠে বললে, 'এ তুমি কি করেছ!'

গদাধরের মুখে নির্মল প্রশান্তি। 'আমি তার কি জানি! মা বললেন, এখানে এসেও বিষয়সম্পত্তি ভাবছে, এক ঘা বসিয়ে দে পিঠের উপর। তাই বসিয়ে দিলাম। মা'র কথা অমান্য করি কি করে?'

মথুরবাবুকে ডেকে পাঠালেন রাসমণি। বললেন, 'ঠিকই করেছে গদাধর। ওর হাত দিয়ে মা আমাকে শাসন করেছেন।'

সত্যি?

'হ্যাঁ, আর সেই আঘাতে হৃদয় আলো করে দিয়েছেন।'

ভক্তি-ভাবের পাঁচটি প্রদীপ। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর মধুর। পঞ্চভাবেই সাধনা করছে গদাধর।

শান্ত হচ্ছে ঐকাত্মজ্ঞান। নির্গুণ সাধন। স্বস্থ, নির্লিপ্ত, ব্রহ্মনিষ্পন্ন হয়ে বসে থাকো। আরগুলো গুণাত্মক, রাগরঞ্জিত। দাস্য হচ্ছে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি হনুমানের ভাব। সখ্য হচ্ছে বাসুদেবের প্রতি অর্জুনের। বাৎসল্য হচ্ছে গোপালের প্রতি যশোদার। আর মধুর হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপিনীর।

যার যেমন ভাব সে তেমনি দেখে। তমোগুণী ভক্ত নিজে মাংস খায়, তাই ভাবে মা-ও পাঁঠা খাবে—তাই বলিদান দেয়। রজোগুণীব বিস্তারে-বিলাসে বিশ্বাস, তাই সে নানান ব্যঞ্জনে ভোগ সাজায়। সত্ত্বগুণীর জাঁক নেই জোলুস নেই। তার পুজো লোকে জানতেও পারে না। ফুল নেই তো বেলপাতায় আর গঙ্গাজলে পুজো করে। শীতল দেয় দু'টি মুড়কি কি বাতাসা দিয়ে। আর আছে ত্রিগুণাতীত ভক্ত। যে শুধু নাম করে। ঈশ্বরের নাম করাই তাঁকে পুজো করা।

শান্ত হচ্ছে ঋষিদের ভাব। স্বানন্দভাবে পরিতুষ্ট। ভিক্ষান্নমাত্রে খুশি, ছেঁড়া কাঁথাই যেন লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য। শুধু মূল তরুতে আশ্রয়। শুধু আদি নিয়ে আছে, অন্ত-মধ্যের ধার ধারে না। "অহর্নিশং ব্রহ্মণি যে রমন্তঃ"—সেই যোগীর ভাব।

আর দাস্য হচ্ছে বলবানের ভাব। রামের কাজ করছে হনুমান, শত সিংহের শক্তি তার শরীরে। কে অত বাছ-বিচার করে, গোটা গন্ধমাদনই নিয়ে এল। দ্বারকায় এসে হনুমান বললে, আমি সীতারাম দেখব। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, এখানে সীতা পাবে কোথায়? তা জানি না। তুমি যখন আছ তখন সীতাকেও চাই। শ্রীকৃষ্ণ তখন রুক্মিণীকে বললেন, 'তুমি সীতা হয়ে বোস, তা না হলে হনুমানের কাছে রক্ষে নেই।' সীতার পাতালপ্রবেশের সময় এমন অবস্থা, রামকেই প্রায় মারতে যায়।

ধনমান দেহসুখ কিছুই চায় না, শুধু ঈশ্বরকে চায়। স্ফটিক স্তম্ভ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে পালাচ্ছে, মন্দোদরী অনেক রকম ফল দেখিয়ে লোভ দেখাতে লাগল। ভাবলে ফলের লোভে যদি অস্ত্রটা ফেলে দেয়। কিন্তু হনুমান কি ভোলবার ছেলে? বললে, আমার শ্রীরামই কল্পতরু, আমার কি ফলের অভাব? লঙ্কাজয়ের পরে অযোধ্যায় ফিরেছেন রাম-সীতা। কত মিলন-উৎসব, কত আনন্দ-কোলাহল,

পরিত্যক্তের মত এক কোণে পড়ে আছেন কৈকেয়ী। কই কই, আমার কৈকেয়ী-মা কই ? হনুমান এসে তাঁকে সংবর্ধনা করলে। ভাগ্যিস তুমি রামকে পাঠিয়েছিলে! বনের মানুষ হয়ে তাই মনের মানুষকে পেলাম।

ঈশ্বরের আনন্দে মগ্ন হলে ভক্তের আর হিসেব থাকে না। একজন এসে হনুমানকে জিগগেস করলে, 'আজ কোন্ তিথি ?' হনুমান বললে, 'কে তোমার বার-তিথির খোঁজ রাখে। রাম ছাড়া আর কিছু জানি না।'

আর সখ্যভাব কেমন জানো ? এই—এসো ভাই এসো, কাছে এসে বোসো। অনেক দূর থেকে এলে বুঝি, বোসো, পাখার হাওয়া করি। হাত-মুখ ধোও, খাও পেট ভরে। গল্প করো।

বাৎসল্য ভাবে যশোদা ননী হাতে করে বেড়াতেন কখন গোপাল খেতে চাইবে। বলতেন, আমি না দেখলে গোপালকে দেখবে কে ? তার অসুখ করবে। উদ্ধব বললে, 'মা, তোমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান, জগৎচিন্তামণি।' যশোদা বললেন, 'ওরে, তোদের চিন্তামণিকে চিনি না, আমার গোপাল কেমন আছে তাই বল।' কার কি জানি না, আমার গোপাল !

আর মধুর ভাব শ্রীমতীর ভাব, গোপিনীর ভাব। মেঘ কি ময়ূরকণ্ঠ দেখছেন আর কৃষ্ণময় হয়ে যাচ্ছেন। চৈতন্যদেব মেড়গাঁ দিয়ে চলেছেন, শুনলেন এ গাঁয়ের মাটিতে খোল হয়। যেমনি শোনা অমনি ভাবাবেশ। এ ভাব মহাভাব।

কি নিষ্ঠা গোপিনীদের ! মথুরায় দ্বারীকে অনেক কাকুতি-মিনতি করে তো সভায় ঢুকল। কিন্তু কৃষ্ণ কোথায় ? দ্বারী নিয়ে গেল কৃষ্ণের কাছে। কৃষ্ণ পাগড়ি মাথায় দিয়ে বসে আছে। গোপিনীরা মুখ নামিয়ে রইল—এ আবার কে ! এর সংগে কথা কয়ে আমরা কি শেষে দ্বিচারিণী হব ? চল ফিরে যাই। আমাদের সেই পীতধড়া মোহনচূড়া-পরা কৃষ্ণ কোথায় ? আমরা তাকে চাই।

দক্ষিণেশ্বরে প্রায়ই আসত এক পাগলি। কি নাম কোথায় থাকে কেউ জানে না। এসে ঠাকুরকে শুধু গান শোনাবে। বাধা দিলে বড় জ্বালাতন করে। ভক্তরা তাই ত্রস্ত থাকে সব সময়। একদিন কাছে এসে কান্না শুরু করল। সে কি কান্না! ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'কাঁদছিস কেন ?'

পাগলি বললে, 'মাথা ধরেছে।' এই ওজুহাতে কাছটিতে বসে রইল।

আরেক দিন, ঠাকুর খেতে বসেছেন, কোত্থেকে হঠাৎ পাগলি এসে হাজির। বললে, 'দয়া করলেন না ? মনে ঠেললেন কেন ?'

ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'তোর কি ভাব ?'

পাগলি বললে, 'মধুর ভাব।'

'ওরে, আমার যে সন্তান ভাব। আমার যে সব মেয়েরা মা হয়।'

'তা আমি জানি না। সে খবরে আমার কাজ নেই।'

গিরীশ ঘোষ শুনছিলেন ঠাকুরের মুখে। বললেন, 'পাগলি ধন্য, কৃতার্থজন্ম। পাগলই হোক আর মারই খাক ভক্তদের হাতে, সর্বক্ষণ তো আপনাকেই চিন্তা করছে। আপনাকে চিন্তা করে—আমিই বা কি ছিলাম আর কি হলাম !'

গদাধরের এখন দাস্য ভাব। হনুমানের ভাব। রঘুবীরের সেবক মহাবীর।

অহং তো যাবে না সহজে। তাই বলি, থাক, দাস-আমি হয়ে থাক। তুমি প্রভু আমি দাস। তুমি সেব্য আমি সেবক। তুমি রাজাধিরাজ আমি অকিঞ্চন। হনুমানের ধ্যানে ডুবে গিয়ে হনুমানের মতই হয়ে গেল গদাধর। পরনের কাপড়টা কোমরে বেঁধেছে আর পিছনের দিকে লেজ দিয়েছে ঝুলিয়ে। হাঁটে না, লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। বেশির ভাগ সময়ই গাছে উঠে বসে থাকে। খোসা না ছাড়িয়ে না কেটে আস্ত-আস্ত ফল খায়। আর আওয়াজ করে, রঘুবীর, রঘুবীর।

হনুমানের সাধনায় মেরুদণ্ডের প্রান্তভাগটা এক ইঞ্চি বেড়ে গিয়েছিল গদাধরের। সে ভাব চলে যাবার পর আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়।

পঞ্চবটীতে শূন্যমনে চুপচাপ বসে আছে গদাধর, হঠাৎ জায়গাটা আলো হয়ে গেল। চেয়ে দেখল এক অপূর্বসুন্দরী নারী সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে অপরূপ লাবণ্য, বেদনা করুণা ক্ষমা ও ধৃতির স্নিগ্ধতা। কে তুমি? উত্তরদিক হতে গদাধরের দিকে এগিয়ে আসছে দক্ষিণে। চোখে সেই প্রসন্ন দাক্ষিণ্য। কে তুমি?

সহসা কোত্থেকে এক হনুমান উপ করে লাফিয়ে পড়ল সেখানে।

চিনতে আর দেরি হল না। রামময়জীবিতা সীতা-দেবী এসেছেন।

'মা' 'মা' বলে পায়ে লুটিয়ে পড়তে যাচ্ছে গদাধর, অমনি সেই মূর্তি তার দেহের মধ্যে ঢুকে পড়ল। গদাধর লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

পঞ্চবটীর কাছেই হাঁসপুকুর। সে পুকুর ঝালাতে গিয়ে বাড়তি মাটি ফেলা হয়েছে এই পঞ্চবটীর গর্ভে। ফলে আমলকী গাছটা আর রইল না। মারা পড়ল।

ওরে হৃদে, আমার বসবার জায়গার একটা বন্দোবস্ত কর।

গদাধর নিজেই অশ্বত্থের চারা লাগাল। হৃদয় নিয়ে এল বট অশোক বেল আর আমলকী। তুলসী আর অপরাজিতার চারা পুঁতে জায়গাটা ঘিরে দিলে। ক'দিনেই ঘন ঝোপ হয়ে উঠল। ভিতরে ধ্যানে বসলে কেউ দেখতে পায় না বাইরে থেকে।

ওরে হৃদে, ছাগলে-গরুতে ঝোপঝাড় সব খেয়ে ফেললে যে। নতুন লাগানো গাছের চারাতেও দাঁত বসিয়েছে। ওরে, কাঠ-বাঁশ দিয়ে শক্ত করে বেড়া লাগা— কাঠ-বাঁশ কই? হৃদয় ফাঁপরে পড়ল। দড়ি-পেরেক কই?

কোথা থেকে কি হয়ে গেল কেউ টের পেল না। প্রবল জোয়ারের জলে গঙ্গার এ-পারে ঠিক মন্দিরের ঘাটের সামনে এক বোঝা কাঠ-বাঁশ আর দড়ি-পেরেক ভেসে এসেছে। যে ঠিক রাজার বেটা সে মাসোয়ারা পায়।

তবে, যদি মুখে রাম নাম বলতে বলতে হাত দিয়ে ফের কাপড় সামলাস, তাহলে হবে না। জানিস নে গল্পটা?

চারদিক অন্ধকার করে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। বুড়ি গয়লানির নদী পার হয়ে দুধ যোগাতে যেতে হয়। সেদিন দুর্যোগে পারাপারের নৌকো পেল না। রাম-নামের কথা মনে পড়ল। ভাবলে, রাম-নামে ভবসমুদ্র পার হয়, আর আমি এই ছোট্ট নদীটা পার হতে পারব না? নিশ্চয় পারব। রাম-নাম করতে করতে নদী পার হয়ে গেল বুড়ি। যে বাড়িতে দুধ দেয় সে এক পণ্ডিত। সে তো অবাক, এ দুর্যোগে বুড়ি নদী পার হল কি করে? কেন বাবা ঠাকুর, রাম-রাম করে পার

হয়ে এলুম। ওপারে কি কাজ ছিল পণ্ডিতের। বললে, বলিস কি রে? আমিও অমনি রাম-রাম করে পার হতে পারব? কেন পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। দু'জন এল নদীর ধারে। বুড়ি রাম-রাম করে পার হতে লাগল। পণ্ডিতও রাম-রাম করে এগুতে লাগল, কিন্তু জলে নেমেই কাপড় গুটিয়ে নিলে। বুড়ি বললে, ঠাকুর রাম-রামও করবে আবার কাপড়ও সামলাবে—তা হবে না। পণ্ডিত পড়ে রইল পিছনে। দিব্যি পার হয়ে গেল বুড়ি।

যদি ধরবি তো এমনি আঁকড়ে ধরবি। বিশ্বাস চাই। সরল বিশ্বাস। অন্ধ বিশ্বাস।

হাজরা টিপ্পনি কাটল : অন্ধ বিশ্বাস ?

নিশ্চয়ই। বিশ্বাসের তো সবটাই অন্ধ। বিশ্বাসের আবার চোখ কি! ছিদ্র কি! হয় বল, বিশ্বাস; নয় বল, জ্ঞান। জ্ঞান দুরূহ, বিশ্বাস সোজা। মা'র কাছে কেঁদে কেঁদে বল, মা, আমাকে ভক্তি দে, বিশ্বাস দে।

* ১৪ *

দিনে-দিনে পাগলামি বেড়েই চলেছে গদাধরের। মথুরবাবু পর্যন্ত বিচলিত হলেন। নিশ্চয়ই কিছু স্নায়ুবিকার ঘটেছে। কলকাতার সেরা কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনকে ডেকে আনালেন।

কা কস্য পরিবেদনা। গঙ্গাপ্রসাদ বিফল হল। তবু গঙ্গাপ্রসাদকে ধন্বন্তরি বলেই মানতেন ঠাকুর। ঈশ্বরের বিভূতি না থাকলে কি অত বড় চিকিৎসক হয়? যেখানেই গুণের বিকাশ, সেখানেই ঈশ্বরের বিভূতি। সেখানেই নত হবি।

'গঙ্গাপ্রসাদ বললে, আপনি রাতে জল খাবেন না। আমি ঐ কথা বেদবাক্য বলে ধরে রেখেছি। আমি জানি ও সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।'

ধন্বন্তরিতে যখন কিছু হল না তখন নিজেই নিজেকে সামলে চলুন। আইন-কানুনের মধ্যে নিয়ে আসুন নিজেকে। ছাড়ুন এ সব খেয়ালিপনা।

'ঈশ্বর যে ঈশ্বর—সে পর্যন্ত তার নিজের আইন মেনে চলে।' বললেন মথুরবাবু। 'নিজের নিয়মকে লঙ্ঘন করার তাঁর ক্ষমতা নেই।'

গদাধর থমকে গেল। সে কি কথা? যে আইন তৈরি করেছে সে ইচ্ছে করলে তা রদ-বদল করতে পারে না? সে কি স্বাধীন নয়?

কি করে হবে? নিজে নিয়ম করে নিজেই আবার তা ভাঙলে নিজের কাছে কি জবাবদিহি দেবেন?

বা, সব তাঁর খেলা যে। ভাঙা-গড়ার খেলা। তাঁর কাছে আবার নিয়ম কি! তিনি সমস্ত নিয়মের বাইরে।

কিছুতেই মানলেন না মথুরবাবু। বললেন, 'লাল ফুলের গাছে লাল ফুলই হয়, শাদা ফুল হয় না। কই ফুটুক দেখি তো শাদা ফুল।'

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হলে হতে পারে না এটুকু ? অখিললোকনাথের হাত-পা কি নিয়মের নিগড়ে বাঁধা ? তিনি কি খর্ব না পংগু ?

পরদিন সকালে মন্দিরের বাগানে লাল জবাফুলের গাছে এ কী দেখছে গদাধর ! একই ডালে দু'টো ফেঁকড়িতে দু'টি ফুল রয়েছে ফুটে—একটি টুকটুকে লাল, আরেকটি ধবধবে শাদা ।

উল্লাসে অধীর হয়ে গদাধর ডালটা ভেঙে ফেলল হাত বাড়িয়ে । চলল মথুরের কাছে । এই দেখ । ঈশ্বর কি অল্প না অক্ষম না আবন্ধ ? কৃপানিধি কি কখনো কৃপণ হতে পারেন ?

মথুরবাবু হার স্বীকার করলেন । চেয়ে দেখলেন তাঁর চোখের সামনে তাঁর গুরু দাঁড়িয়ে । যিনি অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যান তিনিও গুরু । যিনি অন্ধকার দেশে আলোর সংবাদ নিয়ে আসেন তিনিও । যদি তাপ বা আলো চাও, উদ্দীপিত আলোর আশ্রয় নিতেই হবে । যে আধারে জ্ঞান উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে সেই গুরু । গদাধর প্রজ্বলিত অগ্নি ।

কিন্তু, যাই বলো, একটু পরীক্ষা করে দেখা যাক ।

শরীর ভেঙে পড়ছে গদাধরের, এর কারণ হয়তো ইন্দ্রিয়নিগ্রহ । নিবৃত্তির কাঠিন্য থেকে যদি ক্ষণিক মুক্তি পায় তাহলে হয়তো সে একটু স্বস্থ-সুস্থ হতে পারে । কিন্তু সরাসরি প্রস্তাব করতে গেলে মুখের উপর প্রত্যাখ্যান করে দেবে গদাধর । এ একেবারে দিবালোকের মত স্পষ্ট । তাই গোপনে ফাঁদ পেতে তাকে বাঁধতে চাইলেন মথুরবাবু । শহর থেকে দু'টি পতিতা মেয়ে নিয়ে এসে দক্ষিণেশ্বরে গদাধরের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন চুপি-চুপি ।

গদাধর মুগ্ধের মতন তাকিয়ে রইল তাদের দিকে । সরল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল : 'মা, মা, এসেছিস ?' বলেই তাদের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল ।

ওরা তখন পালাতে পারলে বাঁচে !

আরো একদিন চেষ্টা করলেন মথুরবাবু । গদাধরকে নিয়ে কলকাতায় বেড়াতে গেলেন । মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে থামলেন এক বাড়ির কাছে । দোরগোড়ায় অনেক-গুলি সাজগোজ-করা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে । একটা ঘরে তাদের মাঝখানে গদাধরকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেলেন মথুরবাবু । পালিয়ে গেলেন মানে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন ।

আর গদাধর ?

"স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু—" সকল স্ত্রীলোকের মধ্যেই তিনি, জগজ্জননী । গদাধর মাতৃস্তব শুরু করল । শিশুর মত হয়ে গেল । লোপ পেল বাহ্যসংজ্ঞা । কোলাহল শুরু করল মেয়েগুলো । কান্নার কোলাহল । আত্ম-তিরস্কার । পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে কাতর কণ্ঠে বলতে লাগল : আমাদের ক্ষমা করো । আমরা অভাজন, অকিঞ্চন—

গদাধরের মুখে শুধু মাতৃনাম । মা-ই সব হয়েছেন । রাজেশ্বরী হয়েছেন আবার পণ্যাঙ্গনাও হয়েছেন ।

গোলমাল শুনে উঁকি মারলেন মথুরবাবু । দেখলেন, শম-দম শৌচ-মৌনের

সৌম্য প্রতিমূর্তি গদাধর। সেদিন তিনি যা একবার দেখেছিলেন, তাই। ধূমস্পর্শ-হীন প্রজ্বলিত বহ্নি।

মেয়ের দল মথুরবাবুর উপর ঝাঁজিয়ে উঠল : 'আপনি বাবাকে এইখানে নিয়ে এসেছেন, এই আঁস্তাকুড়ের মাঝখানে ? আপনার কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই ?' লজ্জায় ম্লান হয়ে গেলেন মথুরবাবু। গুরুপ্রাপ্তির গরিমায় অন্তরে লাল হয়ে উঠলেন।

পানিহাটিতে ফি-বছর মহোৎসব হয়। বাইশ বছর বয়েস, সেখানে গিয়েছে গদাধর। সেবার সেখানে বৈষ্ণবচরণ গোস্বামীর সঙ্গে তার প্রথম দেখা। বৈষ্ণব-চরণ যেমন পণ্ডিত তেমনি সাধক। ঠাকুরবাটিতে বসে আছে গদাধর, বৈষ্ণবচরণ তাকে দেখে লাফিয়ে উঠলেন। চিনে নিলেন এক নিমেষে। অলোকসুন্দর দিব্যপুরুষ। পাঁচটা টাকা হঠাৎ দিতে চাইলেন গদাধরকে। কি করে আনন্দ জানাবেন যেন বুঝতে পারছেন না। বললেন, 'আম কিনে খাও।'

না, না, টাকা দিয়ে কি হবে ? আম না খেলে কি হয় !

বৈষ্ণবচরণ ছাড়বার পাত্র নন। হৃদয়কে গছালেন। আম কেনালেন। বললেন, ভোগ হবে।

তারপর গদাধরকে মাঝখানে বসিয়ে কীর্তন শুরু করলেন। দেখতে-দেখতে সমাধি হয়ে গেল গদাধরের। সমাধিভঙ্গের পর ভোগের দ্রব্য খেতে দেওয়া হল তাকে। আশ্চর্য, গলা দিয়ে কিছুই গলে না।

এক হাতে মাটি আরেক হাতে কটা টাকা নিয়ে গঙ্গাতীরে বসেছে গদাধর। মনে-মনে ওজন নেবার চেষ্টা করছে, কোনটা ভারি ! কোনটার বেশি দাম ! টাকা না মাটি, মাটি না টাকা ! বিচার করতে-করতে উন্মেষ হল মনের মধ্যে, দুই-ই তুল্যমূল্য, দুই-ই সমান অসার। মাটি আর টাকা দুই-ই একসঙ্গে ছুঁড়ে ফেলল গঙ্গায়। নিঃশেষে নির্মুক্ত হয়ে গেল। তাঁকে যদি একবার পাই তবে সব কিছুই পেয়ে যাব।

'সব কিছুই পেয়ে যাব।' বললেন ঠাকুর . 'টাকা মাটি, মাটিই টাকা—সোনা মাটি, মাটিই সোনা—এই বলে গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম। তখন ভয় হল মা লক্ষ্মী যদি রাগ করেন ! লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য অবজ্ঞা করলুম। যদি খ্যাঁট বন্ধ করে দেন ! অমনি বললুম, মা, খোদ তোমায় চাই, আর কিছুই চাই না। তোমাকে পেলেই সব কিছু পেয়ে যাব।'

ভবনাথ চাটুজ্জে কাছেই বসে ছিল। হাসতে-হাসতে বললে, 'এ পাটোয়ারি।'

'হ্যাঁ, ঐটুকু পাটোয়ারি।' ঠাকুরও হাসলেন। 'ঈশ্বরানন্দ পেলে কোথায় বা বিষয়ানন্দ, কোথায় বা রমণানন্দ !' বললেন, 'ভক্তের তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে ভগবান দেখা দিলেন। বললেন, বর নাও। ভক্ত বললে, বর দিন যেন সোনার থালায় বসে নাতির সঙ্গে ভাত খাই। পাটোয়ার ভক্ত—এক বরে অনেকগুলি মেরে দিলে। ঐশ্বর্য হল, ছেলে হল, নাতি হল—আয়ুও পেল মন্দ নয়।'

তাই তেমন জিনিস সন্ধান করো যা চরম বা চূড়ান্ত, যার আর পরতর নেই। নারাণ বড়-ঘরের ছেলে। অল্প বয়স, ছাত্র, কিন্তু ভগবানে অর্পিতচিত্ত।

দক্ষিণেশ্বরে লুকিয়ে-লুকিয়ে আসে। দক্ষিণেশ্বরে আসে বলে অভিভাবকেরা মারে। তবু না এসে পারে না। ঠাকুরের কোলের কাছটিতে তার স্থান।

'মাস্টার', মহেন্দ্র গুপ্তকে জিগগেস করলেন ঠাকুর : 'একটি টাকা দেবে ?'

'কাকে ?'

'নারাণকে। দেবে ? না কালীকে বলব ?'

'আজ্ঞে বেশ তো, দেব।'

'ঈশ্বরে যাদের অনুরাগ আছে তাদের দেওয়া ভালো। তাহলে টাকার সদ্ব্যবহার হয়। সব সংসারে দিলে কি হবে ?'

অধরচন্দ্র সেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট—মাইনে তিনশো টাকা। কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান হবার জন্যে দরখাস্ত করেছে—মাইনে হাজার টাকা। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করছে যাতে চাকরিটি হয়। সই-সুপারিশ যোগাড় করেছে অনেক। তবু যেন এগোয় না। প্রতাপ হাজরা এসে বললে ঠাকুরকে, 'অধরের কাজটি হবে, তুমি মাকে একটু বলো।'

অধরও বললে, 'একবারটি বলুন।'

ঠাকুর রাখলেন ওদের অনুরোধ। মাকে একটি বার, একটুখানি বললেন। বললেন, 'মা, অধর তোমার কাছে আনাগোনা করছে, যদি হয় তো হোক না।' বলেই সে সংগে-সংগেই আবার বললেন, 'কী হীনবুদ্ধি মা! জ্ঞান ভক্তি না চেয়ে তোমার কাছে এই সব চাচ্ছে!'

টাকা গংগায় ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেল গদাধর। "সমলোষ্ট্রাশ্ম-কাঞ্চন" হয়ে গেল। আরো কত অভিমান না জানি আছে! কাঙালীরা খেয়ে গেছে, মাথায় করে তাদের পাত ফেলে নিজে ঝাঁটা ধরে জায়গা পরিষ্কার করে দিলে। মেথরের কাজ করতে লাগল স্বচ্ছন্দে। শুধু তাই? কাঙালীদের উচ্ছিষ্টান্ন গ্রহণ করলে প্রসাদজ্ঞানে। শুধু তাই? জিভ দিয়ে চন্দন আর বিষ্ঠা স্পর্শ করলে! সর্বত্র ব্রহ্মাস্বাদ।

ভাবাবেশে সর্বদা বিভোর গদাধর। পুজো-সেবার রীতিনীতি দূরস্থান, কালা-কালই ঠিক থাকছে না। পুজো না করেই ভোগ দিয়ে দিলে। পুজোর ফুল-চন্দন দিয়ে নিজেকেই সাজিয়ে রাখলে! বেলা বয়ে যাচ্ছে, হয়তো ধ্যানই ভাঙল না!

ক্রমে ক্রমে কর্মত্যাগ হয়ে যাচ্ছে গদাধরের। আসন্নপ্রসবা গর্ভিণীর মত।

একদিন ভাবাবেশে গদাধর বলে উঠল মথুরবাবুকে : 'আজ থেকে হৃদে পুজো করবে।'

মথুরবাবুর কাছে দৈবাদেশের মত শোনাল। হৃদয় বসল পুজোর আসনে।

গদাধরের ছুটি। ছুটি মানে মা'র জন্যে ছুটোছুটি। মা'র জন্যে কান্না। মাকে দেখতে যদি কখনো একটু দেরি হয় আথাল-পাথাল করে গদাধর। আছাড় খেয়ে পড়ে যায়। কোথায় পড়ল, আগুনে না জলে, তার জ্ঞান নেই। দম আটকে-আটকে আসে, কাটা ছাগলের মত ছটফট করে। সমস্ত গা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়, ভ্রুক্ষেপ করে না। মাটিতে মুখ ঘষতে-ঘষতে কাঁদে আর চেঁচায় : মা, মা গো—

পথ-চলতি লোক বলে, 'আহা শূলব্যথা উঠেছে বুঝি—'

এ আবার কে এল দক্ষিণেশ্বরে ?

গদাধরের খুড়তুতো দাদা, রামতারক চাটুজ্জে। গদাধর নাম রেখেছিল হলধারী। হৃদয়ের মত চাকরির খোঁজে এসেছে। তবে হৃদয়ের মত সে মাঠো নয়। পণ্ডিত-প্রধান। ভাগবত আর গীতা, বেদান্ত আর অধ্যাত্ম রামায়ণ তার নখমুকুরে। মস্ত বড় বৈষ্ণব।

'একটা কাজকর্ম যদি কিছু দেন—' হলধারীর মধ্যে লুকোছাপা কিছু নেই, সরাসরি দাঁড়াল গিয়ে মথুরবাবুর দরবারে।

পরিচয় পেয়ে মোহিত হয়ে গেলেন মথুরবাবু। এ তো চাওয়ার মতই পাওয়া হয়ে গেল দেখছি। ঈশ্বরের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে গদাধর। পুজো-আচ্চার আর ধার ধারে না আজকাল। কি যে করে আর কি যে করে না সে জানে আর তার মা-ই জানে। 'ভালোই হল।' মথুরবাবু সহজ মানুষের মত নিশ্বাস ফেললেন: 'তুমি কালীঘরের পুজোর ভার নাও।'

প্রথম পংক্তির বৈষ্ণব, শক্তিপুজোর ভার নেবে! এক মুহূর্ত দ্বিধা করল হলধারী। আপত্তি কি! শক্তিও যা মধুরতাও তাই। "ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা, বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।" আবার শোনো: "শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীত-পরমায়ুধে, প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥" 'না' বলবার কিছু নেই।

কিন্তু আর যাই বলুন, গংগাতীরে স্বপাকে রান্না করে খাব।

'কেন, গদাধর তো মা'র প্রসাদ খাচ্ছে আজকাল। তোমার আবার খুঁতখুঁতুনি কেন?' টিপ্পনী কাটলেন মথুরবাবু।

হলধারী হাসল। কার সংগে কার তুলনা! মনে করুন, গোড়ায় গদাধরও গংগা-তীরেই রান্না করে খেয়েছে। এখন সে উঠে এসেছে সাধনার উচ্চস্তরে। এখন সে ইচ্ছে করলে ঠাকুরবাড়ির প্রসাদ কেন, ছোটজাত কাঙালীরও উচ্ছিষ্ট খেতে পারে। তার সইবে, সে এখন সহিষ্ণুতার সমুদ্র। কিন্তু আমার সইবে না। যেটুকু বা নিষ্ঠা আছে তাও যাবে নষ্ট হয়ে।

তার স্পষ্টতার সারল্যে খুশি হলেন মথুরবাবু।

কিন্তু, এ তো এক রকম হল—এদিকে আবার বলি বন্ধ করবার বায়না ধরলে হলধারী। বহুকালের প্রথা, বললেই কি আর বন্ধ করা যায়? ক্ষুন্ন হল হলধারী, পুজায় সেই প্রাণঢালা আনন্দ যেন খুঁজে পেল না। খোলা হাওয়ায় না থাকলে মন খোলসা হয় কি করে?

একদিন, সন্ধ্যা করছে হলধারী, দেবী ভবতারিণী তার সামনে এসে দাঁড়ালেন, ক্রুদ্ধ হয়েছেন মা, মা'র এখন উল্লাসিনী মূর্তি নয়, প্রচণ্ডিকা মূর্তি। বললেন, 'তোকে আর আমার পুজো করতে হবে না। এমনি আধাখেঁচড়া পুজো যদি করিস তো ছেলের মরা-মুখ দেখবি।'

হলধারী গ্রাহ্য করলে না। ভাবলে, চোখে বুঝি ঘোর দেখেছে। হয়তো বা মাথার খেয়াল! কিন্তু, আশ্চর্য, ক'দিন পরেই খবর এল, মারা গেছে হলধারীর ছেলে।

হলধারী গদাধরের শরণাপন্ন হল। গদাধর বললে, দেবীপূজো ছাড়ান দিন। যেমন করছিল হৃদয়, হৃদয়ই করুক, আপনি যান রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরে।

রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরে এসে হলধারী মধুর ভাবের পরিচর্যায় পরকীয়া নিয়ে মেতে উঠল। বৈষ্ণব মতে এও এক রকম সাধনা বটে, কিন্তু অপকৃষ্ট, অধোগত সাধনা। ক'দিনেই নানান কথা রটতে লাগল হলধারীর নামে—শুরু হল নানা কানাকানি। কিন্তু কারুর সাধ্য নেই, মুখের উপর বলে কিছু পষ্টাপষ্টি। বিরুদ্ধতা করে। হলধারীকে সক্কলকার ভয়। তার মুখ বড় খারাপ। কথায় কথায় শাপ দেয়। আর সে-শাপ ভীষণ ফলে। বাক্‌সিদ্ধ হলধারী। কিন্তু গদাধরের কানে এলে গদাধর বরদাস্ত করতে পারল না। দাদাই হোক আর যাই হোক, চলবে না এমন কদাচার। হলধারীকে কড়কে দিল গদাধর।

'কি? তোর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!' হলধারী হুমকে উঠল: 'আমার ভাই হয়ে, আমার চেয়ে বয়সে ছোট হয়ে তুই আমাকে শাসন করতে এসেছিস? তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে।'

'আপনি চটছেন মিছিমিছি। আমি আপনার ভালোর জন্যেই বলছিলাম। পাঁচ জনের কান-কথা থেকে রেহাই পান তারি জন্যে।'

হলধারী গুম হয়ে রইল। কথা ফিরিয়ে নিলে না কিছুতেই। যা বলেছি তো বলেছি। ক'দিন পরে, একদিন সন্ধের পরে গদাধরের মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল সত্যি-সত্যি। কালো, ঘন রক্ত। কতক বেরিয়ে আসছে, কতক জমে থাকছে মুখের মধ্যে। কতক বা দাঁতের গোড়া থেকে ঝুলছে সুতোর মত।

এ কি হল? রক্ত থামছে না যে! ঝলকে-ঝলকে বেরুচ্ছে। মুখের মধ্যে কাপড় গুঁজে দিল গদাধর। তবু রক্তের নিবৃত্তি নেই। এ কি হল? মা তুই এ কি করলি? সবাই ছুটে এল আশ-পাশ থেকে। দ্রুতপায়ে হলধারীও।

'দাদা, শাপ দিয়ে তুমি আমার এ কি করেছ দেখ।' ডুকরে উঠল গদাধর।

চোখে দেখে সহ্য করতে পারল না হলধারী। কাঁদতে লাগল। কথা ফিরিয়ে নেবার কথা ওঠে না আর। হাতের তীর আর হাতে নেই। কান্নার মধ্যেও একটু গর্ব মিশে আছে হলধারীর। অব্যর্থবাক সে।

চারদিকে হাহাকার পড়ে গেল। সমস্ত বলিদানের রক্ত বুঝি গদাধর দিলে!

'তুমি কি হঠযোগ করো?'

গদাধর চোখ তুলে তাকাল। দক্ষিণেশ্বরে ক'দিন থেকে আছে যে প্রাচীন সাধু, সে।

'দেখি রক্তের রং। দেখি মুখের কোনখানটা থেকে আসছে? নিশ্চয়ই', সাধু জোর দিয়ে বললে, 'নিশ্চয়ই তুমি হঠযোগ করো। তাই না?'

'করি।'

তবে আর ভয় নেই। সাধনায় সুষুম্নাদ্বার খুলে গিয়েছে। দেহের রক্ত সব মাথায় গিয়ে উঠেছিল। আপনা থেকে যে মুখের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে পেরেছে

সেটা সৌভাগ্য বলতে হবে। জানো তো, হঠযোগে জড়সমাধি হয়ে যায়। রক্ত যদি সব মাথায় গিয়ে একবার জমতে পারত তাহলে তোমার সমাধি আর ভাঙত না।

'সবই মা'র ইচ্ছা।'

'একশো বার। মা'র ইচ্ছেতেই তুমি আজ বেঁচে গেলে। তোমাকে দিয়ে মা'র কত না জানি কাজ আছে।'

হৃদয়কে কাছে ডেকে নিল হলধারী। বললে, 'আচ্ছা হৃদু, তুই বল এটা কি ঠিক হচ্ছে?'

কোনটা?

'এই যে কাপড় ফেলে পৈতে ফেলে সাধন করা?'

হলধারীকে হৃদয়ের বড় ভয়। বললে, 'কখনো না। ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণত্ব বিসর্জন দিলে চলে কি করে?'

'বল্ সেই কথা।' উৎফুল্ল হল হলধারী: 'কত জন্মের পুণ্যে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম। সেই ব্রাহ্মণত্বকে উনি এক কথায় নস্যাৎ করে দেবেন?'

এক কথায় আর সবার মত হৃদয়ও নস্যাৎ করে দিল। বললে, 'পাগল! বদ্ধ পাগল!'

'তবু তোর কথাই যা হোক কিছু শোনে। তুই দৃষ্টি রাখবি, বাধা দিবি, যেন ও-সব অনাচার না করে। দরকার হয় তো বেঁধে রাখবি দড়ি দিয়ে।'

পাগল বলে কেটে পড়তে চাইল হৃদয়। কিন্তু, মুখে যাই বলুক, তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারে না হলধারী। অন্তত যখন পুজো দেখে গদাধরের। দেখে উৎসর্গের উন্মাদনা। ঈশ্বরের আবেশ না হলে কেউ কি এমন বিভোর হয়ে পুজো করতে পারে?

ছুটে যায় হৃদয়ের কাছে। 'ওরে হৃদু, পাগল নয়। অলৌকিক।'

'তাই না কি?' হৃদয় বোকা সাজে।

'অলৌকিক না হলে এমন কখনো হতে পারে? কেউ পুজো করতে পারে এমন ভাবে? তুই বল দেখি সত্য করে ওর মধ্যে তোর কিছু আশ্চর্যদর্শন হয়েছে?'

'আমার কী দর্শন হবে! আমি দর্শনের জানি কী!'

'নইলে ওকে তুই রাত-দিন এমন চাকরের মতন সেবা করিস কেন?'

'তবু মনে হয় আরো কেন করতে পারি না।' তবু হৃদয়ের মুখে তৃপ্তির তন্ময়তা। চিনতে পেরেছে হলধারী। আর তার ভুল হবে না।

'এবার আমি তোকে ঠিক চিনতে পেরেছি। নিশ্চয়ই তোর মাঝে দিব্যাবেশ হয়েছে। হিসেবে আর ভুল হবে না আমার।'

গদাধর হাসে। আবার কখন 'গোলেমালে চণ্ডীপাঠ' হবে তার ঠিক কি।

মন্দিরের কাজ সেরে পাঁজি-পুঁথি নিয়ে পড়তে বসে হলধারী। মাথা পরিষ্কার করবার জন্যে এক টিপ নস্যি নেয়। সেই এক টিপ নস্যিতেই খুলে যায় বুদ্ধি। ভাবে, এত শাস্ত্র-শাসন কিছু পড়েছে গদাধর? বোঝে কিছু? ডাকো গদাধরকে।

'তুই এ সব কিছু জানিস? বুঝতে পারবি?'

'খুব।'

'কি করে পারবি ? তুই তো আকাট মূর্খ—'

'আমি মূর্খ হলে কি হয়, আমার ভেতরে যিনি আছেন তিনি সর্বজ্ঞান। তিনিই সকল কথা বুঝিয়ে দেন আমাকে।'

'ইস্, মস্ত বড় পণ্ডিত এসেছিস ! সব যে তুই বুঝবি, তুই কি অবতার ?' হলধারী গরম হয়ে ওঠে।

'এই যে বলেছিলে, আর গোল হবে না হিসেবে—' মনে করিয়ে দেয় গদাধর।

'রাখ্', তোর কথায় আমার গা জ্বলে। শাস্ত্র পড়িসনি যখন, আমার সঙ্গে কথা বলতে আসিস নে। কলিতে কল্কি ছাড়া আর অবতার নেই। যা, চলে যা। ঠিক চিনেছি তোকে। আর ভুল হবে না। তুই আস্ত আকাট—'

ছুটে গিয়ে হৃদয়কে ধরে এনেছে হলধারী। ঐ দ্যাখ। তুই বলিস পাগল হয়েছে, আমি বলি ব্রহ্মদৈত্যে পেয়েছে। তা না হলে এমন দশা হয় ?

তাকিয়ে দেখল হৃদয়। দেখল বস্ত্র ত্যাগ করে গদাধর গাছের মগডালে বসে আছে স্তব্ধ হয়ে।

ছেলে মারা যাবার পর থেকে কালীকে হলধারী তমোময়ী বলে মনে করত। তমোময়ী মানে তমোগুণান্বিতা। যে তামসিক কর্মের ফল মূঢ়তা তার যে অধিষ্ঠাত্রী। অবিবেক বা প্রমাদমোহের যে উৎপাদিকা। যে 'জঘন্যগুণবৃত্তস্থা'। একদিন মুখোমুখি বললে তাই গদাধরকে। 'তুই ও তামসী মূর্তির পুজো করিস কেন ? ওতে কি কখনো আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে পারে ? বরং ও তোকে অধোগামী করবে। জানিস না, গীতায় কি বলেছে ? 'অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ'।' ইষ্টনিন্দা শুনে বিমর্ষ হয়ে গেল গদাধর। কিন্তু সাধ্য কি হলধারীর সঙ্গে সে তর্ক করে। শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দেবারই বা তার বিদ্যে কোথায় ? সে সোজা-সুজি মাকেই গিয়ে জিগ্গেস করতে পারে, মা, তুই কী ! তোর রূপে যে এত অন্ধকারের ঐশ্বর্য সে কি অজ্ঞানের অন্ধকার ?

মাকে সে তাই বললে সরল ভাবে। বল, তুই কী, তুই কে। তুই না বলে দিলে আমি বুঝব কি করে ? আমি কি শাস্ত্র জানি না ব্যাকরণ জানি ? যখন তুই আমাকে তা শেখালি না তখন নিজে থেকে আমাকে সব দেখিয়ে দে। নইলে হলধারীর সঙ্গে আমি লড়ব কি দিয়ে ? ও শাস্তর-জানা পণ্ডিত, কত শত বচন ওর মুখস্থ। ওর সঙ্গে আমি পারব কেন ? তুই যদি কিছু না বোঝাস, তবে বুঝব হলধারীর কথাই ঠিক। তুই তামসী, তুই—

মা দেখিয়ে দিলেন। বুঝিয়ে দিলেন।

বললেন, আমি ত্রিগুণাতীত, আবার সর্বগুণাশ্রয়ী। স্বরূপতঃ নির্গুণ আবার মায়ারূপে সগুণ। নির্গুণ সগুণের অধিষ্ঠান। সগুণ নির্গুণের উদ্ঘাটন। সমুদ্রকে আশ্রয় করেই তরঙ্গের লীলা। তরঙ্গকে আশ্রয় করে সমুদ্রের উন্মোচন। আবার আমি আকাশ। সমস্ত গুণের অতীত। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-শূন্য।

'তবে রে—' দ্রুত বেগে ছুটল গদাধর। হলধারী পুজো করছিল, একেবারে তার ঘাড়ে চেপে বসল। 'তবে রে, তুই আমার মাকে তামসী বলিস ? মা আমার সর্ব-বর্ণময়ী আবার ত্রিগুণাতীতা ! এত শাস্ত্র পড়িস আর তুই এটুকু জানিস না ?'

মুহ্যমানের মত তাকিয়ে রইল হলধারী। কোথা থেকে কি হয়ে গেল বুঝতে পেল না। মনে হল এ যেন গদাধর নয়, তার মাঝে সাক্ষাৎ জগদম্বার আবির্ভাব। ফুল-বেলপাতা হঠাৎ গদাধরের পায়ে অঞ্জলি দিয়ে বসল।

হৃদয় কাছেই ছিল। শুনিয়ে দিল টাস-টাস।

'কি গো মামা, বলতে না গদাধর পাগল হয়েছে? এখন? এখন যে নিজেই বড় পায়ে ফুল দিয়ে পুজো করছ?'

'কি জানি, আমিই বুঝি পাগল হয়ে গেলাম!' বিহ্বলের মত বললে হলধারী: 'তার মানে আমার স্পষ্ট ঈশ্বরদর্শন হল।'

কর্মত্যাগ হয়ে যাচ্ছে গদাধরের।

গঙ্গাজলে তর্পণ করতে গিয়ে দেখে আঙুলের ভিতর দিয়ে জল গলে পড়ে যাচ্ছে। ছুটে গেল হলধারীর কাছে। শুধোলে, 'দাদা, এ কি হল?'

'একে গলিতহস্ত বলে। বললে হলধারী: 'তোর ঈশ্বরদর্শন হয়েছে। ঈশ্বর-দর্শনের পর তর্পণ থাকে না।'

কোনো কর্মই থাকে না সমাধি হলে।

ঠাকুর বললেন শিবনাথ শাস্ত্রীকে: 'যতক্ষণ তুমি সভায় আসনি, ততক্ষণ তোমাকে নিয়ে কত কথা। কত গুণগুঞ্জন। যেই তুমি এসে পড়েছ অমনি সব কথা বন্ধ হয়ে গেছে। তখন তোমার দর্শনেই সুখ।'

যতক্ষণ হাওয়া না পাওয়া যায় ততক্ষণই পাখা চালানো। যখন হাওয়া আপনি আসে তখন আর পাখার দরকার কি। তখন তার স্পর্শনেই আনন্দ।

* ১৬ *

রাসমণির কালীমন্দিরে গদাধর আর পুজো করছে না—কামারপুকুরে চন্দ্রমণির কানে খবর পেঁছুলো।

কেন করছে না রে পুজো? কী হয়েছে আমার গদাধরের?

মাথা-খারাপ হয়েছে। হারিয়েছে সমস্ত মাত্রাজ্ঞান। এমন কাণ্ডকারখানা সব করছে যা সব সময় পাগল-ছাগলেও করে না। তোমার ছেলেকে বাড়ি আসতে বলো।

চন্দ্রমণি অস্থির হয়ে উঠলেন। চিঠির পর চিঠি লেখাতে লাগলেন রামেশ্বরকে দিয়ে। তুই আমার কাছে চলে আয়। ছেলেবেলায় তোর যে রকম অসুখ হত, তাই বোধ হয় আবার শুরু হয়েছে। এখানে গাঁয়ের জল-হাওয়ায় তোর শরীর ভালো হবে। ভালো হবে আমার যত্ন-আত্তিতে। ঘরের ছেলে তুই ঘরে ফিরে আয়। তোকে না দেখে-দেখে আমার দুই চোখ ক্ষয় হয়ে গেল।

কামারপুকুরে, মা'র অঞ্চলের ছায়ায় ফিরে এল গদাধর।

কিন্তু এ কী হয়ে গেছে সে! কখনো জড়ের মত উদাসী হয়ে বসে থাকে,

কখনো আপন মনে হাসে, কখনো বা 'মা' 'মা' বলে কেঁদে আকুল। এই ব্যাকুল-করা মা-ডাকেই বেশি কাতর হন চন্দ্রমণি। কি ভাবে প্রতিকার করবেন বুঝতে পারেন না। প্রাণের সমস্ত স্নেহ আর আশীর্বাদ দুই করতলে ডেকে এনে ছেলের বুকে-পিঠে হাত বুলিয়ে দেন। একটু বা সুস্থির হয় গদাধর। হাসি-খুশি হয়ে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে সকলের সঙ্গে আলাপ-গল্প করে।

কিন্তু কতক্ষণ সেই স্বভাবস্থিতি! কিছুক্ষণ পরেই আবার সেই ভাবাবেশ। সেই বহির্জ্ঞানশূন্যতা। আচরণে না আছে লজ্জা, না আছে ঘৃণা, না আছে ভয়লেশ। একেবারে নির্মুক্ত-নিঃসীম। ঘর-সংসার বলে কিছু আছে, সে সম্বন্ধে চেতনা নেই। লোকলজ্জা বলে কিছু আছে, নেই সেই সংকীর্ণ সংস্কার।

ঠিক পাগল হয়নি। পাগল হলে মাকে, চন্দ্রমণিকে, এত ভালবাসে কি করে, পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গেই বা কেন এত ঠাট্টা-ইয়ার্কি। আসল কথা, উপদেবতা ভর করেছে। ওঝা ডাকাও।

পাঁচ জনার পরামর্শে ওঝা ডাকালেন চন্দ্রমণি। ওঝা এসে অনেক ঝাড়ফুঁক করলে, মন্তর আওড়ালে। একটা পলতে পুড়িয়ে শুঁকতে দিলে গদাধরকে। বললে, ভুত যদি হয় এতেই পিঠটান দেবে। আর যদি না হয়—মনে মনে হাসল গদাধর।

ওতে কিছু হবে না। চণ্ড নামাতে হবে। এল চণ্ডর ওঝা। মস্ত বড় গুনিন। তন্ত্রে-মন্ত্রে নিপুণ। চণ্ড নামবে—গ্রাম্য লোকজন এসে ভিড় করেছে। এবারে অব্যর্থ ব্যাধি-শান্তি হবে গদাধরের। যথাবিধি পুজো হল, বলি দেওয়া হল চণ্ডকে। চণ্ড এসে অধিষ্ঠান হল শূন্যে। ওঝাকে উদ্দেশ করে বললে, 'ওকে ভুতে পায়নি, ওর কোনো আধি-ব্যাধি নেই—'

পরে সম্বোধন করলে গদাধরকে: 'কি হে সাধু, সাধুই যদি হবে, তবে অত শুপুরি খাও কেন?'

সময় নেই অসময় নেই, শুপুরি খেত গদাধর। কথা শুনে সে তো হতবাক। 'বেশি শুপুরি খেলে কাম বাড়ে। ও খাবে না।'

শুপুরি ত্যাগ করল গদাধর।

গ্রামের দুই ধারে দুই শ্মশান—ভূতির খাল আর বুধুই মোড়ল। দিন-রাতের বেশির ভাগ সময়ই শ্মশানবাস করে গদাধর। হাঁড়ি করে মেঠাই নিয়ে যায়, শিবা আর প্রমথদের ভোগ দেয়। যে হাঁড়ি শেয়ালের জন্যে, কোত্থেকে দলে দলে এসে খেয়ে যায় নিশ্চিন্তে। আর যে হাঁড়ি ভূত-প্রেতের জন্যে তা হঠাৎ শূন্যে উঠে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। আধার বা আধেয় কিছুরই পাত্তা পাওয়া যায় না। কোনো-কোনো দিন বা স্পষ্ট সাক্ষাৎ হয় পিশাচদের সঙ্গে। রঙ্গ-রহস্যও হয় কিছু-কিছু।

একদিন নিশীথ রাত্রেও গদাধরের বাড়ি ফেরার নাম নেই। মা'র কাছে ছোট ছেলে চিরকালই ছোট ছেলে—চন্দ্রমণি শ্মশানে পাঠিয়ে দিলেন রামেশ্বরকে। গদাধরকে গিয়ে ধরে নিয়ে আয়। ও কি মা'র ঘর শ্মশান করে শ্মশানেই বসতি করবে?

শ্মশানের প্রান্তে এসে নিঃসাড় অন্ধকারে ডাকতে লাগল: 'গদাই, গদাই, ওরে গদাই আছিস?'

'যাচ্ছি গো দাদা—' প্রতিধ্বনি করল গদাধর। চেঁচিয়ে বললে, 'এদিক পানে আর এগিয়ো না। আমার সংগে 'তো এঁটে উঠছে না, তাই তোমার এরা অনিষ্ট করবে। তুমি ফিরে যাও।'

শ্মশানে বসতে পেয়ে অনেক শান্ত হয়েছে গদাধর। একটি বেলগাছ পুঁতেছে। আর বুড়ো যে অশ্বত্থ গাছ ছিল ডাল-পালা ছড়িয়ে, তারই তলায় সে আসন নিলে। সেখানে ঘন ঘন কালীদর্শন হতে লাগল তার। দেখতে লাগল সে কর্তৃকারয়িত্রী সংসারৈকসারাকে। যে সাকারশক্তিস্বরূপা দিগন্তবসনা খড়্গ-মুণ্ডাভিরামা। আগম-নিগম-ফলময়ী, বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনী।

শান্ত হয়েছে বটে কিন্তু ঔদাসীন্য যায় না। যায় না সংসার-অস্পৃহা। বসনেই আঁট নেই, আর কোথায় তবে আটা থাকবে? কি করে সংসারে একটু মন পড়বে? মনে কি করে আসবে একটু মোহ-মমতা?

বিয়ে দাও গদাধরকে।

রামেশ্বরে আর চন্দ্রমণিতে লুকিয়ে লুকিয়ে পরামর্শ হচ্ছে। পাছে গদাধরের কানে গেলে সে সব ভণ্ডুল করে দেয়। কিন্তু তুমি দেয়ালের কান এড়াতে পারো, গদাধরের কান এড়াতে পারো না। ঠিক সে শুনে ফেললে। শুনে তার কেমনতরো ভাব হল না জানি!

'ওরে, আমার বিয়ে হবে!' উল্লাসে উথলে উঠল গদাধর। শিশুর মত উল্লাস। শিশুর মতই নৃত্যানন্দ। বাড়িতে কোনো উৎসব হলে বা প্রিয় আত্মীয়ের আসার সম্ভাবনা ঘটলে শিশু যেমন মাতামাতি করে তেমনি। যেন সব চেয়ে প্রিয়, সব চেয়ে প্রয়োজনীয় কে আসছে তার সংসারে। তার সমস্ত প্রার্থনার প্রতীক, প্রত্যক্ষ মাহেশ্বরী।

বিয়েতে মন আছে গদাধরের। নিশ্চিন্ত হলেন চন্দ্রমণি, নিশ্চিন্ত হলেন রামেশ্বর। ঘটক লাগলেন। ঘটক আর কেউ নয়, হৃদয়ের দাদা লক্ষ্মী মুখুজ্জে।

শিয়ড়ে, হৃদয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছে গদাধর। যাচ্ছে পাল্কিতে চড়ে। মুক্ত নীল আকাশ আর ঢেউ-খেলানো অঢেল ধান-খেত দেখতে দেখতে গদাধরের ভাবাবেশ হল। তার ভিতরে যে আদিকবি ধ্যানস্থ ছিলেন, তিনি যেন তার প্রজ্ঞানময় তৃতীয় চক্ষু উন্মীলন করলেন। গদাধর দেখল তার দেহ থেকে দু'টি কিশোর বয়সের ছেলে বেরিয়ে এসে মাঠময় ছুটোছুটি করে খেলা করছে। কখনো যাচ্ছে অনেক দূরে চলে, কখনো বা এসে পড়ছে পাল্কির কাছটিতে। নীরব ছায়ার মত ভাসছে না, দস্তুরমতো হাসছে, কথা কইছে, গান গাইছে। কারা এই দু'টি ছেলে? কোন দেশের? তার শরীরের মধ্যে বাসা নিল কি করে?

অনেক দিন এ প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি। বছর দেড় বাদে দক্ষিণেশ্বরে বামনিকে প্রশ্ন করেছিল গদাধর: 'ঐ দু'টি ছেলে কে বলতে পারো? আমি ভুল দেখিনি তো?'

'না বাবা, ভুল দেখনি। এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব। তোমার মাঝে এবার চৈতন্য আর নিত্যানন্দ দুই-ই এসে বাসা নিয়েছেন। ঐ দু'টিতেই খেলছিল ছুটোছুটি করে।'

শিয়ড়ে হৃদয়ের বাড়িতে গান হচ্ছে। তাই শুনতে এসেছে গদাধর। ভিড় হয়েছে বিস্তর। পুরুষ মেয়ে—আর, সর্বত্রগামী অনুষঙ্গ, ছেলেপিলেও অনেক এসেছে। এক স্ত্রীলোকের কোলে তিন-চার বছর বয়সের এক খুকি। ড্যাবডেবে চোখে চেয়ে আছে সভার মধ্যে। স্ত্রীলোকটি তাকে রঙ্গ করে জিগ্গেস করছে: বিয়ে করবি? সম্মতিতে ঘাড় হেলাল মেয়ে। এত লোকের মধ্যে কা'কে বিয়ে করবি? কা'কে তোর পছন্দ? হাত তুলে নিকটে-বসা গদাধরকে দেখিয়ে দিল স্বচ্ছন্দে।

ঐ যে স্ত্রীলোকটি মেয়ে কোলে নিয়ে বসে আছে সে শিয়ড়ের হরিপ্রসাদ মজুমদারের কন্যা শ্যামাসুন্দরী। জয়রামবাটির রামচন্দ্র মুখুজ্জের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। এসেছে বাপের বাড়িতে বেড়াতে। কোলে প্রথম সন্তান সারদা।

বাপের বাড়িতে শ্যামাসুন্দরীর তখন অসুখ। একদিন এল্লা-পুকুরের পাড়ে বাইরে গেছে—ঠাহর নেই—বসে পড়েছে এক বেল গাছের তলায়। কাছেই গাঁয়ের কুমোরদের পোয়ান, যেখানে পোড়ানো হয় হাঁড়িকুঁড়ি। সেখানে হঠাৎ ছোট ছোট পায়ে নূপুর বেজে উঠল রুনুঝুনু। দেখতে দেখতে ছোট একটি মেয়ে ছুটে এল নাচতে নাচতে। শ্যামাসুন্দরীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা জড়িয়ে ধরলে। মাথা ঘুরে পড়ে গেল শ্যামাসুন্দরী। মনে হল সেই মেয়ে তার পেটে ঢুকেছে।

তেমনি রামচন্দ্র একদিন দুপুরে ঘুমুচ্ছে, স্বপ্ন দেখল একটি ছোট্ট মেয়ে তার পিঠের উপর পড়ে দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরছে। হাতে-গায়ের গয়নায় মেয়ের রূপ যেন আরো খুলেছে। এই গরিবের ঘরে কে মা তুমি? এখানে কি করতে এলে? মেয়েটি বললে, 'এই এলুম তোমার কাছে।'

আটুই পৌষ, বারোশো ষাট সাল, গদাধরের জন্মের প্রায় আঠারো বছর পর, জয়রামবাটিতে শ্যামাসুন্দরীর মেয়ে হল। নাম রাখলে সারদা।

ঠাকুর বললেন, 'ও সরস্বতী। ও সারদা। ও জ্ঞান দিতে এসেছে।'

ভক্তির পথও সত্যি, জ্ঞানের পথও সত্যি। ভক্তি মানে ঈশ্বরে পরানুরক্তি। "সুখানুশয়ী রাগঃ"। বিষয় যত সুখকর তত তীব্র তাতে অনুরাগ। আর যাতে অনুরাগ পরম বা নিরতিশয় তাই ঈশ্বর। অনুরাগের ধর্মই হচ্ছে স্মরণ-চিন্তন-অনুধ্যান। সুতরাং অনুরাগের বস্তুতে নিয়তচিত্ত হয়ে থাকাই ভক্তি। যোগ-শাস্ত্রের ভাষায় তাই সমাধি। তাই ভক্তি আর যোগে কোনো ভেদ নেই। জ্ঞানও অভিন্ন। যখন পরমাত্মবোধ জেগে থাকবে তখনই জ্ঞান। যোগশাস্ত্রে তাকে বলে "অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি"। অন্য বিষয় ত্যাগ করে পরমাত্মাকেই সর্বদা বোধগম্য রাখাই প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষণ। ভক্তিই বলো, যোগই বলো, আর জ্ঞানই বলো, অভীষ্ট বস্তুতে অনন্যচিত্ততাই মুখ্যবৃত্তি।

কিন্তু যতই বিচার-আচার করো, মা'র কৃপা না হলে কিছুই হবার জো নেই। মানুষের কতটুকু শক্তি? কতটুকু সে চেষ্টা করতে পারে? কাম-কাঞ্চন ঠিক ঠিক মিথ্যে, জগৎ তিন কালেই ঠিক ঠিক অ-সৎ, মনে-জ্ঞানে এ ধারণা করা কি যে-সে কথা? মা'র দয়া না হলে কি হয়? কথায় বলে, এক একটি জোয়ানের দানায়

একেকটি ভাত হজম করিয়ে দেয়, কিন্তু যখন পেটের অসুখ হয় তখন একশোটি জোয়ানের দানাও একটি ভাত হজম করতে পারে না। শুধু মাকে প্রসন্ন করো, মা'র কৃপার জন্যে বসে থাকো। "সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।"

জয়রাম মুখুজ্জের মেয়ে কালীর সঙ্গে সম্বন্ধ এনেছে ঘটক। কিন্তু জয়রাম বেঁকে বসল ভাঙড় না হোক, ক্ষ্যাপা তো বটে—তাকে জামাই করব কি। তাছাড়া কোনো কোনো জায়গায় রামেশ্বরই নিজে এগোতে চাইল না। তখনকার দিনে কন্যা-পক্ষেরই পণ নেবার প্রথা। একেক জায়গায় এমন দর হাঁকল, যা রামেশ্বরের নাগালের বাইরে। তবে? এখন ইতিকর্তব্য কি?

খুব সোজা। চাষাদের শশার খেত দেখেছ?

বিরস ও বিষণ্ণ মুখে বসে আছেন চন্দ্রমণি। পাশে রামেশ্বর। দু'জনেই চমকে উঠলেন।

যে শশাটি ভালো ফলেছে তাতে চাষা একটি কুটো বেঁধে রাখে। কুটো বেঁধে চিহ্ন দিয়ে রাখে ভগবানকে ভোগ দেবে বলে। যাতে ভুলে বা গোলমালে না বিক্রি হয়ে যায়। তেমনি—

তেমনি কি? মা-দাদা উৎসুক হয়ে উঠলেন।

'তেমনি আমার বিবাহের পাত্রী জয়রামবাটি গাঁয়ের রাম মুখুজ্জের বাড়িতে কুটোবাঁধা হয়ে আছে।' বললে গদাধর, 'মিছে তোমরা এখানে ওখানে খোঁজাখুঁজি করছ। এতে ভাবনারও কিছু নেই, হয়রানিরও কিছু নেই।'

জয়রামবাটিতে লোক পাঠালেন চন্দ্রমণি। কিন্তু খবর যা এল তা বিশেষ উৎসাহ-বর্ধক নয়। আর সব মিলেছে বটে কিন্তু পাত্রীর বয়স মোটে পাঁচ বছর।

হোক পাঁচ বছর! গুপ্তভাবেই আপ্ত লীলা জগন্মাতার। হয়তো এই জনক-নন্দিনী সীতা। এই কৃষ্ণ-উন্মাদিনী রাধিকা। শিবভাবভাবিনী ভগবতী। চন্দ্রমণি মত দিলেন।

কন্যা-পক্ষের পণ তিনশো টাকা। তা হোক, যোগাড় করলেন রামেশ্বর। বিয়ের দিন ঠিক হল ১২৬৬ সালের বোশেখ মাসের শেষ বরাবর। গদাধর চব্বিশ বছরে পা দিয়েছে, সারদা ছ' বছরে।

জয়রামবাটিতে বিয়ে। জয়রামবাটি কামারপুকুর থেকে মাইল চারেকের পথ—পশ্চিমে। বরবেশে গদাধরকে না-জানি কেমন দেখাচ্ছে! শক্ত করে কসি-বাঁধা সুন্দর ধুতি পরনে, গায়ে কুর্তা, গলায় ফুলের মালা, কপালে চন্দনলেপ। প্রতিবেশিনীরা এসে সাজিয়ে দিয়েছে গদাধরকে কিন্তু মেজ বৌঠানের মনে দুঃখ, বাজনা নেই। অন্তত ঢোল আর কাঁসর না হলে বিয়ে কি!

দাঁড়াও, আমিই ঢোল বাজিয়ে দিচ্ছি।

দু'হাতে পাছা বাজিয়ে নাচতে লাগল গদাধর। মুখে বোল তুললে ঢোলের।

রঙ্গ দেখে সকলে হেসে খুন। মেজ বৌঠানের মনেও আর খেদ নেই।

বিয়েতে চলেছে—এমন সময় ঢোলের বাজনা!

বাল্যভাব না ধরলে গদাধরকে বুঝতে পারবে না কেউ।

খালি পায়ে, খোলা গায়ে বরযাত্রী চলেছে সব। কোমরে চাদর, কাঁধে গামছা,

হাতে লাঠি। যেন শিবের বিয়েতে চলেছে সব তাল-বেতাল, ভূত-প্রেতের দল। মধ্যে চলেছেন কন্দর্পদর্পনাশী ব্যোমকেশ।

সারদার সঙ্গে কেমন না-জানি শুভদৃষ্টি হল গদাধরের। অপর্ণার সঙ্গে মহাদেবের। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীমতীর।

রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তির মানে কি? পুরুষ আর প্রকৃতি অভেদ, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। পুরুষ-প্রকৃতির যোগই যোগমায়া। বঙ্কিম ভাব ঐ যোগের জন্যে। এই যোগ দেখার জন্যেই শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি শ্রীমতীর দিকে, শ্রীমতীর দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণের দিকে। শ্রীমতীর নাকে নীল পাথর, শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ বলে। শ্রীকৃষ্ণের নাকে মুক্তো যেহেতু শ্রীমতীর গৌর বরণ মুক্তোর মত উজ্জ্বল। শ্রীমতীর বসন নীল বলে পীতাম্বর হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমতীর পায়ে নূপুর বলে শ্রীকৃষ্ণের পায়েও নূপুর। তার মানে প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের অন্তরে-বাহিরে মিল। যেমন ধরো আবার শিব কালীর মূর্তি। শিবের উপর দাঁড়িয়ে আছেন কালী, শিব শব হয়ে পড়ে আছেন পদতলে। আর কালী তাকিয়ে আছেন শিবের দিকে। প্রকৃতি কর্ত্রী, পুরুষ অকর্তা। তাই শিব শব হয়ে আছেন। কিন্তু পুরুষের যোগেই প্রকৃতির লীলা—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের রাসোৎসব। শিব আর শক্তি ভিন্ন সংসারে আর কিছু নেই।

শিব আর শক্তির চারি চক্ষুর মিলন হল।

সাতাশ কাঠি জেবলে এয়োরা বরকে প্রদক্ষিণ করছে, হঠাৎ জ্বালা-কাঠি লেগে গদাধরের হাতে-বাঁধা হলুদে-মাখানো মাঙ্গলিক সুতো পুড়ে গেল।

এটা কি হল?

অবিদ্যা বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। অবিদ্যা-মুক্ত শক্তিকে গ্রহণ করল গদাধর।

ঠাকুর বললেন, 'এই অবিদ্যাকে জয় করবার জন্যেই তো শক্তির পুজো-পদ্ধতি। তাকে প্রসন্ন করবার জন্যেই দাসী ভাবে, বীর ভাবে, সন্তান ভাবে আরাধনা। রমণ দ্বারা প্রসন্ন করার নাম বীর ভাব। সে বড় উৎকট সাধনা। আমার সন্তান ভাব। স্ত্রীলোকের স্তন আমি মাতৃস্তন মনে করি। মা'র দাসী ভাবে, সখী ভাবে ছিলাম দু'বছর। মেয়েরা এক-একটি শক্তির রূপ। বিয়ের সময় বাঙলা দেশে বরের হাতে জাঁতি থাকে, পশ্চিমে থাকে ছুরি। তার মানে, ঐ শক্তিরূপা কন্যার সাহায্যে বর মায়া-পাশ ছেদন করবে। এটিও বীর ভাব। কন্যা শক্তিরূপা। বিয়েতে বর-বোকাটি পিছনে বসে থাকে। কন্যা কিন্তু নিঃশঙ্ক।'

বাসর সাজাচ্ছে মেয়েরা। ওদিকে পাত পড়েছে নিমন্ত্রিতদের।

রঙ্গিনীরা ধরলে গদাধরকে, গান ধরো একখানা।

কত রসরঙ্গই যে করছে মেয়েরা, কত লীলা-চাপল্য। দেখতে দেখতে ভুবন-রঙ্গিনীর কথা মনে পড়ে গেল গদাধরের। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, গান গাইবে বৈ কি। মুক্ত-উদার গলায় শ্যামাগুণগান শুরু করলে।

যারা খাচ্ছিল, খাওয়া ভুলে স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগল। রঙ্গিনীরা রঙ্গ ভুলে পাষাণবৎ তাকিয়ে রইল মুখের দিকে। গদাধর তন্ময়, বিভোর, বাহ্যজ্ঞানহীন। লুটিয়ে পড়ে রঙ্গিনীদের প্রণাম করতে ব্যস্ত। মা, মা গো, সর্বত্র তুই, সর্বত্র তোর আনন্দের ছড়াছড়ি।

মধুর স্বরে নামোচ্চারণ করছেন ঠাকুর। আর বলছেন মাকে : 'ও মা, ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহুঁস করে রাখিস নে। ব্রহ্মজ্ঞান চাই না মা। আমি আনন্দ করব, বিলাস করব! শুঁটকে সাধু আমি হব না।'

* ১৭ *

ঘর-আলো-করা বউ এসেছে সংসারে!

বরবধূকে দেখবার জন্যে কত লোক এসেছে আনন্দ করে। কত শান্তির দিন আজ চন্দ্রমণির! কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও একটা দুঃখের কাঁটা তাঁর মনের মধ্যে খচ-খচ করছে। বউয়ের গা থেকে গয়নাগুলো খুলে নিতে হবে।

বউকে গয়না গড়িয়ে দেবেন এমন সংগতি নেই চন্দ্রমণির। লাহা বাবুদের বাড়ি থেকে চেয়ে নিয়ে এসে বিয়ের দিন সাজানো হয়েছিল বউকে। ফিরিয়ে দেবার দিন আজ। লাহা বাবুদের কাছে মুখ থাকবে না নইলে। কিন্তু কোন মুখেই বা ঐ কচি গা থেকে গয়নাগুলো খুলে নেব?

মা'র মনের ব্যথাটা বুঝতে পেরেছে গদাধর। বললে, তুমি কিচ্ছু ভেবো না। আমিই খুলে নিতে পারব।

ঘুমিয়ে পড়েছে সারদা। শৈশবশান্তিতে ঘুমিয়েছে।

ডান হাতখানি আলগোছে আলতো করে তুলে ধরছে গদাধর, সন্তর্পণে খুলে নিচ্ছে গয়না। তেমনি এক সময়ে আবার বাঁ হাত থেকে। ক্রমে-ক্রমে একে-একে আর সবগুলিই। সারদা যেমন ঘুমে তেমনি ঘুমে।

টের পেল ঘুম থেকে জেগে উঠে। এ কি, তার গায়ের গয়না কি হল? কে নিল? কাঁদতে বসল সারদা।

চন্দ্রমণির বুক ফেটে যাচ্ছে। সারদাকে কোলে বসিয়ে আদর করতে লাগলেন। বললেন, 'গেলে গেছে। তুমি কেঁদো না, এর চেয়ে ঢের ভালো গয়না কত দেবে তোমাকে গদাই।'

সারদা শান্ত হল বটে, কিন্তু তার খুড়ো মেনে নিতে চাইলেন না ঘাড় পেতে। নতুন বালিকা-বধূকে একেবারে বৈরাগিনী সাজিয়ে দেওয়া। যা নয় তাই দিয়ে সাজিয়ে ফের সেই সাজ লুকিয়ে খুলে নিয়ে যাওয়া। এ প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কি। ঘোর বিরক্ত হলেন। সারদাকে নিয়ে সোজা ফিরে গেলেন জয়রামবাটিতে।

'কোথায় আর যাবে?' পরিহাসচ্ছলে মাকে প্রবোধ দিল গদাধর। 'ও ফিরে না আসুক কিন্তু বিয়ে তো আর ফিরবে না।'

শ্রীমা যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, ঠাকুর তাঁকে সোনার গয়না গড়িয়ে দিয়েছিলেন। উপর-হাতে তাবিজ আর নিচের হাতে বালা।

ওরে, বালা কিন্তু ডাইমন-কাটা হবে।

ঠাকুরের দেখি গয়নার নক্সার উপরেও নজর।

ওরে, পঞ্চবটীতে যখন সীতা দেবীকে দেখেছিলাম তখন তাঁর হাতে ডাইমন-কাটা বালা ছিল। সেই রকম বালা দেব ওকে।

'বিষ্ণুঘরের যখন গয়না চুরি গেল, মথুরবাবু ঠাকুরকে খোঁটা দিলেন : 'ছি ঠাকুর, তুমি তোমার গয়না রক্ষা করতে পারলে না!'

ঠাকুর বললেন, 'তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি। স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁর দাসী তাঁর কি ঐশ্বর্যের অভাব? তুমি কি ঐশ্বর্য তাঁকে দিতে পারো? ও গয়না তোমার পক্ষেই একটা ভারী জিনিস, মস্ত জিনিস, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে মাটির ড্যালা।'

সেই কথাই আবার বলছিলেন কেশব সেনকে। 'তোমরা এত ঐশ্বর্য বর্ণনা কর কেন? হে ঈশ্বর, তুমি সূর্য করেছ, চন্দ্র করেছ, আকাশ করেছ—এ সব বলার কী দরকার? শুধু বাগান দেখেই তারিফ করে লাভ কি? বাগানের মালিক বাবুকে দেখবে না? বাগান বড় না বাবু বড়? নরেন্দ্রকে যখন আমি দেখলাম, তখন আমি শুধু তাকেই দেখলাম—তার কোথায় বাড়ি, বাবার কি নাম, কি করে, তারা ক'টি ভাই ভুলেও একদিন জিগ্গেস করলাম না। আমার অত খবরে কাজ কি? আমি আম খেতে এসেছি, আম খেয়ে যাব। বাগানে ক'টা গাছ, ক'টা তার ডাল-পালা, কত তার পাতা—ও খোঁজে আমার কি হবে? মদ খাওয়া হলে শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে তার হিসেবে আমার কী দরকার? আমার এক বোতলেই কাজ হয়ে গেছে। তবে কি জানো? মানুষ নিজে ঐশ্বর্য ভালোবাসে বলে ভাবে ঈশ্বরও বুঝি তাই ভালোবাসেন। ভাবে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য প্রশংসা করলে তিনি খুশি হবেন। ঈশ্বরের কাছে ও-সব বাজিকরের বাজি। পঞ্চভুতের কুহক-কৌশল।

ঠাকুর যখন কলকাতায় আসতেন হৃদয় তাঁকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শহর দেখাত। একদিন বললে, 'এই দেখ মামা, লাট সাহেবের বাড়ি। দেখেছ? কত বড় বড় থাম!'

ঠাকুর মাকে দেখলেন। মা-ই সব দেখিয়ে দিলেন ঠাকুরকে। দেখিয়ে দিলেন কতগুলি মাটির চাক থাক-থাক করে সাজানো।

শম্ভু মল্লিক মস্ত বড়লোক—মা-অন্ত প্রাণ। মথুরবাবুর মারা যাবার পর মা'র নির্দেশে তিনিই হলেন ঠাকুরের রসদদার। ঠাকুরকে বললেন, 'এখন এই আশীর্বাদ করো, যাতে আমার যা-কিছু ঐশ্বর্য সব তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে মরতে পারি।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'এ তোমার পক্ষেই ঐশ্বর্য। তাঁকে তুমি কী দেবে? কী আছে তোমার দেবার? তাঁর কাছে এ সব ধুলো-মাটি।'

যদি কিছু দিতে চাও ভক্তি দাও, প্রাণঢালা ভক্তি। ঈশ্বর কি ঐশ্বর্যের বশ? তিনি ভক্তির বশ, তিনি ভাবের বশ। তিনি কি তোমার কাছে টাকা-কড়ি-ধন-দৌলত চান? তিনি চান ভাব, ভক্তি, ভালোবাসা।

গদাধর সেবার প্রায় বছর দুই ছিল কামারপুকুরে। শরীর ভালো করে না সারলে চন্দ্রমণি তাকে কিছুতেই আর যেতে দেবেন না কলকাতায়। এদিকে সারদা সাত বছরে পা দিল। এবার একবার গদাধরকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হয়। 'জোড়ে' ফিরতে হয় বউ নিয়ে। তাই গেল গদাধর।

সাত বছরের মেয়ে সারদা—তাকে কে বলে দিলে কে জানে—ঘটি করে জল নিয়ে এল। নিয়ে এল পাখা। রূপের পুতলি সেই মেয়ে, মাথাভরা এক রাশ কালো

চুল পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। জল ঢেলে গদাধরের পা ধুয়ে দিতে লাগল সারদা। জল-ভরা ছোট ছোট দু'টি হাত বুলিয়ে দিতে লাগল পায়ের উপর। শেষে হাঁটু মুড়ে নিচু হয়ে মাথার চুলে পা মুছে দিতে লাগল। পা-ধোয়ানোর পর কাছে এসে দাঁড়াল সারদা। ছোট হাতে পাখা নেড়ে-নেড়ে হাওয়া দিতে লাগল গদাধরকে।

বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী বসেছেন-বিষ্ণুর পদসেবায়। কিংবা, সারদা গদাধরের।

এই সেবাতেই নিয়তস্থিত সারদা। বারো শো একাত্তর সালে দুর্ভিক্ষ লেগেছে গ্রামে-গ্রামান্তরে। সারদার তখন এগারো বছর বয়েস, আছে বাপের বাড়িতে। খিদের তাড়নায় কত লোকই যে আসছে কাতারে-কাতারে। রামচন্দ্র, সারদার বাবা, চালে-ডালে খিচুড়ি রাঁধিয়ে রাখছেন হাঁড়ি-হাঁড়ি। বলছেন, 'বাড়ি আর বাড়ির বাইরের সবাই খাবে এ খিচুড়ি। যে আসবে সে। শুধু আমার সারদার জন্যে দু'টি ভালো চালের ভাত করবে—'

তাকে তো শুধু খাওয়ানো নয়, তাকে একটু ভোগ দেওয়া!

একেক দিন এত লোক এসে পড়ে যে রাঁধা খিচুড়িতে কুলোয় না। আবার চড়ানো হয় তক্ষুনি। আর সেই গরম খিচুড়ি ঢেলে দেয় ক্ষুধার্তদের পাতায়। যেমন তপ্ত খিদে তেমনি তপ্ত খিচুড়ি। সারদা পাখা নিয়ে এসে দুই হাতে বাতাস করে। আহা, শিগ্‌গির করে জুড়োক, খিদের অন্ন কতক্ষণ মুখে না দিয়ে থাকা যায়! এগারো বছরের বালিকা নয়, স্বয়ং বিশ্বমাতা। দুঃখার্ত জীবের ক্ষুধাহরণ করতে এসেছেন।

তার আগে, পাঁচ বছরের যখন মেয়ে, তখন থেকে সে সংসারের কাজে সাহায্য করছে। খেত থেকে তুলো এনে চরকায় পৈতে কাটছে। মুনিষদের মুড়ি-গুড় দিয়ে আসছে মাঠে। একবার পঙ্গপাল এসে সমস্ত ধান নষ্ট করে দিলে। মাটি থেকে ধান কুড়োবার পালা পড়ল। সারদার ছোট ছোট দু'টি মুঠিতে কি কম জায়গা? সেও লেগে গেল ধান কুড়োতে। আকণ্ঠ জলে নেমে গরুর জন্যে দলঘাস কাটছে। একবার দলঘাস কাটবার সময় দেখলে, তারই সমবয়সী আরেকটি মেয়ের হাতে দা, সেও কাটছে দলঘাস। কে মেয়ে, কেন কাটছে, কে বলবে। কাটছে বটে কিন্তু নিচ্ছে না। একটি দল কেটে উপরে রেখে এসে সারদা দেখছে আরেকটি দল কেটে রেখেছে মেয়েটি, সারদাকে আর কাটতে হচ্ছে না।

এমনি আরো কত দেখেছে সারদা। তেরো বছর বয়সে যখন সে আবার কামারপুকুরে যায় তখন হালদার-পুকুরে একা একা নাইতে যেতে তার ভয় হত। নতুন বউ, একলা ঘাটে যাবে কি! খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখে, আটটি মেয়েছেলে দাঁড়িয়ে। তারাও নাইতে চলেছে। আর তবে কিসের ভয়! রাস্তায় নামল সারদা, মেয়েছেলেদের চারজন তার আগে, চারজন তার পিছনে। তার সঙ্গে তারাও আগে-পিছে হয়ে স্নান করলে। তেমনি করে পৌঁছে দিয়ে গেল বাড়ি। এমনি শুধু একদিন নয়, নিত্যি।

কিন্তু কারা এরা, গ্রামের নতুন ছুটুলে বউ সারদা, তার সে কি জানে!

এবার, সাত বছর বয়সে, স্বামীর সঙ্গে 'জোড়ে' এসেছে সে কামারপুকুরে। কিন্তু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হবার পরেই গদাধর জেদ ধরল, দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাব।

চন্দ্রমণি আর পীড়াপীড়ি করতে পেলেন না। গদাধর এখন অনেক সুস্থ হয়েছে, শান্ত হয়েছে। তারপর বিয়ে করেছে সজ্ঞানে। চন্দ্রমণির এখন অনেক আশ্বাস, অনেক জোর। সারদাই তাঁর সেই বল-ভরসা।

কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে ফিরেই গদাধর আবার যে-কে-সে। কোথায় তার মা-ভাই, কোথায় তার স্ত্রী-সংসার! আবার, দেখতে দেখতে, বুক তার লাল হয়ে উঠল, শুরু হল দুঃসহ গাত্রদাহ। আর চোখের কোণ থেকে ঘুম গেল অদৃশ্য হয়ে। আবার দেখা দিল সেই অসাধ্য রোগ। আবার শুরু হল মা'র জন্যে কান্না।

'তোকে ডাকার এই ফল হল, মা? শরীরে এই বিষম ব্যাধি দিলি? যায়-থাক এই শরীর, তবু তুই আমাকে ছাড়িসনি। তুই আমাকে দেখা দে, আমায় শুধু তুই এইটুকু কৃপা কর। আমার কেউ নেই, আমার কেউ নেই তুই ছাড়া—'

* ১৮ *

দেখুন দেখি আবার কি হল।

গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে গদাধরকে আবার নিয়ে এসেছেন মথুরবাবু।

ক্রমশই বৃদ্ধির মুখে। এ কি উন্মাদ না মূর্চ্ছারোগ? রাতে এক ফোঁটা ঘুম নেই, একটা বাঁশ কাঁধে করে মন্দিরের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। কুকুরকে খেতে দিয়ে তার ভুক্তাবশেষ মুখে পোরে। সর্বাঙ্গে জ্বালা, বুক-পিঠ লাল। আগের ওষুধে তো কিছু হল না। অন্য কিছু ব্যবস্থা করুন।

গঙ্গাপ্রসাদ ভাবতে বসলেন। পাশেই উপস্থিত ছিলেন আরেক জন কে কবিরাজ। কেউ বলেন, গঙ্গাপ্রসাদের ভাই দুর্গাপ্রসাদ, কেউ বলেন, পূর্ববঙ্গের এক নামী বৈদ্য। তিনি বললেন, এ রোগ ওষুধে মালিশে সারবার নয়। এ হচ্ছে দিব্যোন্মাদের অবস্থা। এ ব্যাধি যোগজ ব্যাধি—

দিব্যদ্রষ্টা আয়ুর্বেদী। ইনিই প্রথম বুঝতে পারলেন রোগের মূল কোথায়। কিন্তু তাঁর কথা কে শোনে। বাইরের শাখা-পল্লব নিয়েই সকলের মাথাব্যথা। তেল-বড়ি, ভস্ম-চূর্ণ।

আস্তে আস্তে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় গদাধর। নিজের চোখ দেখে। স্থির, বদ্ধ, নিশ্চল চোখ। আঙুল দিয়ে চোখের পাতা দুটো টানতে চেষ্টা করে, নড়াতে চেষ্টা করে। নড়ে না, পলক পড়ে না চোখের। কাচের চোখের মত নিস্পন্দ হয়ে আছে। চোখে খোঁচা মারে আঙুলের। তবু নিষ্পলক।

চন্দ্রমণির কানে খবর পৌঁছুল। নিরুপায় হয়ে বুড়ো শিবের মন্দিরে হত্যে দিয়ে পড়লেন। আমার গদাধরকে ভালো করে দাও। তার চোখে ঘুম দাও, তার গায়ের দাহ নিবারণ করো। যতক্ষণ পর্যন্ত না শুনছ আমার প্রার্থনা জলস্পর্শ করব না আমি।

মুকুন্দপুরের শিবের কাছে যা। সেখানে গিয়ে হত্যে দে!

প্রত্যাদেশ পেলেন চন্দ্রমণি। ছুটলেন মুকুন্দপুরে। দু'-তিন দিন পড়ে রইলেন। ধন্না দিয়ে, নিরম্বু নিরশনে। স্বপ্নে দেখা দিলেন মহাদেব। পরনে বাঘছাল, মাথায় জটাজুট, হাতে ত্রিশূল। শুদ্ধ-স্ফটিক-সঙ্কাশ চন্দ্রশেখর। বললেন, কিছু ভয় নেই, তোর ছেলে পাগল হয়নি। তার মাঝে ঈশ্বরের সঞ্চার হয়েছে, তাই তার ঐ বৈলক্ষণ্য। বাড়ি যা, মন ঠাণ্ডা করে থাক—

চন্দ্রমণি আশ্বস্ত হলেন। শিবের পুজো দিয়ে মন খাঁটি করে ঘরে ফিরলেন। ঘরে ফিরলেন তাঁর কুলদেবতা রঘুবীরের আশ্রয়ে। সেবা করতে লাগলেন প্রাণ ঢেলে। আমার গদাধরকে দেখো। রেখো তাকে বাঁচিয়ে।

কিন্তু গদাধরের মন ঠাণ্ডা হয় না। নিয়তজাগ্রত নিষ্পলক দুই চক্ষু দিয়ে দীর্ঘ ধারায় তার জল পড়ে। বলে, মা, মা গো, দুই চোখ আমার নিশ্চল করে দিয়েছিস চোখের সামনে চিরন্তনী হয়ে থাকবি বলে। যাতে এক নিমেষও তোকে না হারাই। যাতে পলক ফেলতে না ফেলতে পালিয়ে না যাস ফাঁকি দিয়ে। কিন্তু তুই কই? এমনি করে আমাকে জাগিয়ে রেখে তুই শেষে ঘুমিয়ে পড়বি নিশ্চিন্ত হয়ে? এই তোর বিচার? তোর বিবেচনা? রোগের যন্ত্রণায় বিনিদ্র সন্তান ছট্‌ফট্‌ করলে তার মা কি ঘুমোয়? না, তার ঘুম আসে?

এমনি ছ' বছর চোখের পাতা একত্র করেনি গদাধর। ছ' বছর সে পলক ফেলেনি। ঘুমোয়নি এক বিন্দু। দিনে-রাত্রে, আলোতে-অন্ধকারে, নির্জনে-জনতায় সর্বক্ষণ দুই চোখ সে খুলে রেখেছে। একটি তীব্র দৃষ্টিতে আবিদ্ধ করে রেখেছে। স্থির-নিবদ্ধ তীব্র দৃষ্টি।

মা কি পারেন না এসে? ঐ দৃষ্টির আহ্বান, ঐ দৃষ্টির আকর্ষণ এড়াতে পারেন এমন তাঁর সাধ্য নেই। ঐ পাথুরে কান্নাই মমতার নির্ঝরিণীকে ডেকে আনে। বসেন এসে পাশটিতে। বলেন, ওরে, আর কাঁদিস নে। আমি এসেছি। ডাকার মত ডাকলে আমি কি না এসে থাকতে পারি? এখন কি বলবি আমাকে বল। তাকা, কথা ক—

চাই এই একগুঁয়ে ব্যাকুলতা। অবাধ্য উন্মাদনা। যদি দেখা না দিবি তো রাত-দিন চোখ চেয়ে থাকব। দাঁতে কুটোটিও কাটব না। অনশনে দেহ পাত করব। যদি বেশি দেরি করিস নিজের গলা কাটব। দেখি তুই টলিস কি না। চাই এই একবগ্‌গা গোঁ।

'মাগ-ছেলের জন্যে লোকে এক ঘটি কাঁদে, টাকার জন্যে এক গামলা, কিন্তু ঈশ্বরের জন্যে কে কাঁদছে? ঈশ্বরের জন্যে কাঁদতে বাবুদের লজ্জা হয়!' বললেন ঠাকুর: 'টাকার জন্যে খুব ছটফটানি। কিন্তু টাকায় হয় কি? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়—এই পর্যন্ত। ভগবান লাভ হয় না। ভগবান লাভ হবে না তো মানুষ হয়ে জন্মালুম কেন?'

কিন্তু কি করে পাবো ঈশ্বরকে?

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। পড়ে-বুঝে-শুনে কিছুতেই পাবি না। যদি তিনি কৃপা করেন তবেই পাবি। তবে এই কৃপা উদ্রেক করবি কি করে? খুব খানিকটা ছুটোছুটি করে। ছেলে অনেক ছুটোছুটি করছে

দেখে মা'র দয়া হয়। খেলায় এসে মা লুকিয়েছিলেন, এসে দেখা দেন। তাঁরই ইচ্ছে বেশ খানিকটা ছুটোছুটি হোক। তাঁর এ সংসার যে লীলার সংসার। তিনি যে ইচ্ছাময়ী। চাই ব্যাকুলতা, চাই আনন্দসান্দ্রা ভক্তি, চাই অচল-অনল বিশ্বাস। তিন টান হলেই তবে দেখা দেন ভগবান। বিষয়ের উপর বিষয়ীর টান, পতির উপর সতীর টান আর সন্তানের উপর মা'র টান। এই তিন টান যদি মেশাতে পারিস তবে ভগবান সটান এসে মিশে যাবেন।

মা'র আঁচল ধরে ছেলে পয়সা চাচ্ছে, ঘুড়ি কিনবে। মা পাড়াবেড়ানীদের সঙ্গে গল্পে মত্ত, লক্ষ্যও নেই ছেলের দিকে। ছেলেও তেমনি নাছোড়, নাকী সুরে শুরু করে কাকুতি-মিনতি। মা তখন ওজর আপত্তি তোলে: না, উনি বারণ করে গেছেন। ঘুড়ি কিনে শেষে একটা কাণ্ড বাধাবি আর কি। বলে আবার ছেঁড়া গল্পের সুতো ধরে। ছেলেও তেমনি ধুরন্ধর। কাকুতি-মিনতিতে যখন কিছু হল না, তখন সে স্রেফ কান্না জোড়ে। গল্প করা মাথায় ওঠে। তখন পাড়া-বেড়ানীদের মা বলে, তোমরা একটু বোস ভাই, ছেলেটাকে আগে শান্ত করে আসি। বলে ঘরে ঢুকে বাক্স খুলে পয়সা ফেলে দেয়। বিরক্ত হয়েছে মা, কিন্তু ব্যাকুলতার কাছে হার মেনেছে।

অনুরক্ত না করতে পারিস বিরক্ত করে করে মা'র থেকে আদায় করে নে। যা বিরক্তি তাই তাঁর অনুরক্তি। তার জন্যে এক অস্ত্র ব্যাকুলতা। তিনি যেকালে জন্ম দিয়েছেন আমাদের, সেকালে তাঁর ঘরে আমাদের হিস্যা আছে। বিষয়ের ভাগের জন্যে ব্যতিব্যস্ত করে তোল তাঁকে, আগেই দেখিস তোর হিস্যা ফেলে দেবেন। মা'র উপর জোর খাটবে না তো কার উপর খাটবে? আগে আমার হিস্যা ফেলে দাও তো দাও, নইলে গলায় ছুরি দেব।

নে বাবা, নে তোর হিস্যা, শান্ত হ।

ঈশ্বরকে কেমন করে পাওয়া যায়? এক শিষ্য জিগগেস করলে গুরুকে। গুরু বললে, এস দেখিয়ে দিই। বলে এক পুকুরের কাছে নিয়ে গেল। এই জলের মধ্যে ঢোকো। জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখল শিষ্যকে। কতক্ষণ পরে টেনে তুললে হাত ধরে। জিগগেস করলে, কেমন লাগছিল? শিষ্য হাঁফ নিয়ে বললে, প্রাণ আটুবাটু করছিল, যেন প্রাণ যায়। গুরু বললে, যখন ভগবানের জন্যে প্রাণ এমনি আটুবাটু করবে, তখন জানবে দর্শনের আর দেরি নেই। তোমার ব্যাকুলতা, তাঁর কৃপা। কিন্তু ব্যাকুলতা হয় কি করে? অনুরাগে। পরম প্রেমভাবে। সে প্রেমভাব কোত্থেকে আসবে? শুধু নামে। নামানন্দে।

'তবে কি জানো? ভোগান্ত না হলে ব্যাকুলতা হয় না। কাম-কাঞ্চনের ভোগ যেটুকু আছে সেটুকু তৃপ্তি না হলে জগতের মাকে মনে পড়ে না। ছেলে যখন খেলায় মাতে তখন মাকে চায় না। খেলা সাঙ্গ হয়ে গেলে তখন বলে, 'মা যাবো।' হৃদের ছেলে পায়রা নিয়ে খেলা করত, পায়রাকে ডাকত, আয় তি-তি, তি-তি! যেই তৃপ্তি হল খেলা, অমনি কান্না ধরল, মা যাবো। কত ভোলাতে চেষ্টা করতুম, সে ভুলত না। খেলা-টেলা আর তার কিছুই ভালো লাগছে না, সন্ধ্যা হয়-হয়, তার এখন মাকে চাই। তাকে কাঁদতে দেখে আমিও কাঁদতুম। এমনিই তো ঈশ্বরের জন্যে

কান্না। ছেলে আমার কাছে যাবে না, কিন্তু যেই এক জন অচেনা লোক এসে বললে, চল তোকে তোর মা'র কাছে দিয়ে আসি, অমনি তার কোলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল।'

আসলে যত দিন ভোগান্ত না হয় তত দিনই ভোগান্তি।

তার পর আবার উপাধি আছে না? এদিকে পিলে-রুগী, পরেছে কালোপেড়ে কাপড়, অমনি নিধু বাবুর টপ্পা ধরেছে। রোগা লোকও যদি বুট-জুতো পরে, অমনি শিস দিতে আরম্ভ করে, মুখ দিয়ে ফুটফাট ইংরিজি কথা বেরোয়। সামান্য একটু আধার হয়েছে, গেরুয়া পরেছে, অমনি অহংকারে ডগমগ। একটু ত্রুটি হলেই ক্রোধ, অভিমান।

টাকা একটা বিলক্ষণ উপাধি। টাকা হলেই মানুষ আরেক রকম হয়ে যায়, সে আর মানুষ থাকে না। সেই ব্রাহ্মণের কথা মনে আছে রে তোর হৃদে? এখানে আসা-যাওয়া করত, বাইরে বেশ বিনয়ী, বেশ সরল-কোমল। সেবার কোন্নগর যাচ্ছি, তুই সঙ্গে আছিস। নৌকো থেকে যেই নামছি, দেখি সেই ব্রাহ্মণ বসে আছে গঙ্গার ধারে। বোধ হয় হাওয়া খাচ্ছে। আমাকে দেখে বলছে, কি ঠাকুর! বলি আছ কেমন? আমি থমকে গেলুম। তার কথার স্বর শুনেই তোকে বললুম, ওরে হৃদে, ওর নিঘঘাৎ টাকা হয়েছে, নইলে গলা দিয়ে অমন সুর বেরোয়? তুই হাসতে লাগলি।

কেশব সেনকে বললেন ঠাকুর: 'যতক্ষণ উপাধি আছে, ততক্ষণ তিনি নেই। উপাধি যতই যাবে ততই তিনি কাছে হবেন। উঁচু ঢিপিতে বৃষ্টির জল জমে না, খাল জমিতে জমে। তাই যেখানে অহংকার, সেখানে জমে না তাঁর কৃপাবারি। তাই দীনহীনের ভাব ভালো, নিঃস্ব-নিষ্কিঞ্চনের ভাব।'

ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে!

সেই শ্যামা এসেছেন গদাধরের কাছে। দুধের ছেলেকে কোলে নিয়ে বসেছেন। মা গো, কেন এত ছুটোছুটি করিয়ে বেড়াস? তুই যখন হাতের এত কাছে কেন তোকে ছুঁতে দিস না?

বুড়িকে যদি আগে থাকতেই সকলে ছুঁয়ে ফেলে, তা হলে খেলা কেমন করে হয়? খেলা চললেই তো বুড়ির আহ্লাদ। তার মায়াতেই বন্ধ, তার দয়াতেই আবার মুক্ত। সব যে তার ইচ্ছা, তার খেলা। তার যে খুশি এমনি করেই খেলা হোক। একবার মায়ার খেলা, তার পর আবার দয়ার খেলা।

মা যখন আসেন না তখন গদাধরের শরীর থেকে আরেক জন কে বেরিয়ে আসে। অবিকল আরেক জন গদাধর। পবিত্র-পাবক সন্ন্যাসীমূর্তি। তার যে আত্মস্বরূপ, সে। সেই তার সচ্চিদানন্দ গুরু। যখন পূর্ণজ্ঞান হয় তখন কে বা গুরু কে বা শিষ্য। তখন নিজেই গুরু, নিজেই শিষ্য। বা, তখন গুরুও নেই শিষ্যও নেই। সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু-শিষ্যে দেখা নাই। তাই শুকদেব যখন ব্রহ্মজ্ঞানের জন্যে জনকরাজার কাছে গিয়েছিলেন, জনকরাজা বললেন, আগে দক্ষিণা দাও। শুকদেব বললেন, আগে জিনিস না পেলে কি করে দক্ষিণা হয়? জনকরাজা হাসতে লাগলেন। বললেন, ব্রহ্মজ্ঞান পেলে কি আর গুরু-শিষ্য বোধ থাকবে? তখন কে বা জনক, কে বা শুক, আর কী বা দক্ষিণা! তাই বলি, বাপু দক্ষিণাটি আগে দাও।

একদিন এক শিবমন্দিরে ঢুকে গদাধর 'মহিম্নঃ স্তোত্র' পড়ছে। পড়তে-পড়তে সেই শ্লোকে এসেছে যেখানে বলেছে শিবমহিমার আর পারাপার নেই। হিমালয় যদি হয় কালির বড়ি, সমুদ্র হয় দোয়াত, কল্পতরুশাখা কলম, সমস্ত পৃথিবী কাগজ আর স্বয়ং সরস্বতী লেখিকা, তবু সেই কালির দোয়াতে সেই কলম ডুবিয়ে সেই বিস্তীর্ণ কাগজে অনন্ত কাল ধরে লিখে-লিখেও শিবমহিমার কথা সে লেখিকা শেষ করতে পারবেন না।

পড়তে-পড়তে বিহ্বল হয়ে পড়ল গদাধর। দরদরধারে কাঁদতে লাগল। কথা আর পাঠ সব গুলিয়ে যেতে লাগল। চেঁচিয়ে উঠল আকুল হয়ে: মহাদেব গো, তোমার গুণের কথা কেমন করে বলব! শুধু নীরবে অশ্রু-বিসর্জন নয়, একেবারে কান্নার রোল তুলল গদাধর। মুক্তকণ্ঠের কান্না। আন্তরিকতার আর্তনাদ।

মন্দিরের আমলা-ফয়লারা ছুটে এল চার দিক থেকে। ওরে, ছোট ভটচাজ আবার পাগলামি শুরু করেছে। সেই পেটেণ্ট পাগলামি। ভাবলুম বুঝি অন্য রকম কিছু হবে। না রে, আজ কিছু বাড়াবাড়ি দেখছি। ঐখানে দাঁড়িয়ে আছিস কি, সেজবাবু আছেন আজ ঠাকুরবাড়িতে, পাগলাকে বেঁধে রাখ। নইলে বলা যায় না শেষ কালে হয়তো শিবের ঘাড়ে গিয়ে চেপে বসবে। টেনে রাখ, হাত ধরে রাখ কেউ—

গোলমাল শুনে স্বয়ং মথুরবাবু এসে উপস্থিত। দৃশ্য দেখে মোহিত হয়ে গেলেন। শিব-ভাবে বিভোর হয়ে আছে গদাধর। উদাসীন আর উপশান্ত। আত্মবিভূতিতে বৈভবময়। কিন্তু ওরা ওদিকে সবাই গোলমাল করছে কেন?

'বলছি কি, বিগ্রহের থেকে ওকে দূরে সরিয়ে রাখুক কেউ। কি অঘটন করে বসে তার ঠিক কি।'

'খবরদার।' গর্জে উঠলেন মথুরবাবু, 'কার ঘাড়ে দুটো মাথা ছোট ভটচাজের গায়ে হাত দেয়!'

জোঁকের মুখে নুন পড়ল। সবাই চুপ হয়ে গেল।

মুগ্ধ নেত্রে মথুরবাবু তাঁর গুরুকে দেখতে লাগলেন। দুস্তর ভব-সমুদ্রের নিপুণ কর্ণধারকে। দেবতার চেয়েও গুরু গরীয়ান্। 'শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।'

কতক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে এল গদাধরের। চোখ চেয়ে দেখলে এখানে-ওখানে ভিড় জমে আছে—মাঝখানে সেজবাবু। বেসামাল হয়ে কিছু অঘটন করে ফেলেছে হয়তো। গদাধর শিশুর মত ভয় পেল। বললে সেই শিশুর মত সারল্যে: 'কিছু অন্যায় করে ফেলেছি না কি?'

গদাধরকে প্রণাম করলেন মথুরবাবু। বললেন, 'না বাবা, তুমি স্তব পাঠ করছিলে, তাই সকলে শুনছিলাম।'

আরেক দিন।

তার ঘরের উত্তরের বারান্দায় পাইচারি করছে গদাধর, কাছেই 'বাবুদের কুঠি' বা কাচারি-ঘরে কাজ করছেন মথুরবাবু। গদাধরকে দিব্যি দেখতে পাওয়া যায় সেখান থেকে। কাজ করছেন আর একবার তাকাচ্ছেন ওদিকে। গদাধরের সেদিকে

লক্ষ্যও নেই। এক বার পশ্চিম থেকে পূবে, আরেক বার পূব থেকে পশ্চিমে টহল দিয়ে ফিরছে। কে তাকে দেখছে বা না-দেখছে তা কে দেখে! হঠাৎ এ কী অভাবনীয় কাণ্ড! মথুরবাবু পাগলের মত হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। এসেই গদাধরের পা জড়িয়ে ধরে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। কাঁদতে লাগলেন অঝোরে।

গদাধর তো হতবুদ্ধি!

'এ কি, তুমি এ কী করছ! তুমি রানির জামাই, একটা গন্নিমান্নি লোক, তোমায় এমন করতে দেখলে লোকে বলবে কী? ওঠো, ঠাণ্ডা হও—'

আর কি সে কথা শোনেন মথুরবাবু! কান্না কি আর থামে!

বললেন, 'অপরূপ এক দর্শন হল আজ তোমার মধ্যে। পূব থেকে পশ্চিমে আসছ, স্পষ্ট দেখছি, তুমি নও, মন্দিরের মা আসছেন। আবার যেই পিছন ফিরে পূবে যাচ্ছ, দেখছি, সাক্ষাৎ মহাদেব চলেছেন। ভাবলাম বুঝি চোখের ভুল। চোখ মুছে আবার তাকালাম। আবার সেই শিবকালী—আবার—যত বার দেখি তত বার—' কান্নায় গলে যেতে লাগলেন মথুরবাবু।

'কই বাপু আমি তো কিছু টের পেলুম না। ও সব ধোঁকা—' উড়িয়ে দিতে চাইল গদাধর।

কিন্তু সে-কথা আর কানে নেন না মথুরবাবু। পা ছাড়েন না। তিনি পেয়ে গেছেন তাঁর জগৎগুরুকে। ভবভয়বৈদ্য সর্বকারণকারণকে।

ভড়কে গেল গদাধর। শেষে এ ব্যাপার কেউ দেখে ফেলে রানির কাছে গিয়ে লাগাক। রানি হয়তো ভাববেন, জামাইকে ছোট ভটচাজ গুন করেছে!

অনেক করে ঠাণ্ডা করল মথুরবাবুকে। আমি কে, আমি কি—মা-ই সব দেখিয়ে দিচ্ছেন তোমাকে। নইলে আমারটা তুমি এত করবে কেন, সর্বস্ব দিয়ে কেন ভালোবাসবে আমাকে?

গদাধরের শখ হল মাকে পায়জোর পরাবে, মথুরবাবু অমনি গড়িয়ে দিলেন পায়জোর। সখীভাবে সাধন করবার সময় স্ত্রীলোকের বেশ ধরবে গদাধর, মথুরবাবু বেনারসী শাড়ি, ওড়না আর এক স্যুট ডায়মণ্ডকাটা গয়না কিনে দিলেন। শুধু তাই নয়, পানিহাটির উৎসবে যাচ্ছে গদাধর, দারোয়ান নিয়ে গুপ্ত ভাবে সঙ্গে চলেছেন মথুরবাবু। ভিড়ে-ভাড়ে গদাধরের না কষ্ট হয় সেই তদারকে। ভৃত্য, ভক্ত আর ভাণ্ডারী। মথুরবাবু এক আধারে ত্রিমূর্তি।

বললেন, 'আমার ঠিকুজির কথা ফলল এত দিনে।'

'কি আছে তোমার ঠিকুজিতে?'

'আমার ইষ্টের এত কৃপা থাকবে আমার উপর যে, সে শরীর ধারণ করে আমার সঙ্গে-সঙ্গে ফিরবে। তুমিই আমার সেই ইষ্ট, আমার অভিলষিত—আমার পরম প্রার্থনার চরম পুরস্কার।'

তুমি কৃপানিধি।

তুমি আগে মায়া, পরে দয়া। আগে মায়ারূপে এসে মনোহরণ কর, পরে দয়ারূপে এসে কর মায়ামোচন। মায়ার পারে এসে তোমার দয়ার জন্যে বসে আছি।

'পদ্ম সই দিলে না ?' রানি রাসমণি কাতর চোখে তাকালেন চার দিকে : 'কেন এমন হল ?'

শেষ শয্যায় শুয়েছেন রাসমণি। কিন্তু মনে শান্তি নেই। এত বড় কীর্তি করে গেলেন জীবনে, তবু মৃত্যুতে নেই কেন শান্তি ? দেবী-সেবার জন্যে দু'লাখ ছাব্বিশ হাজার টাকায় তিন লাট জমিদারি কিনেছেন কিন্তু এখনো দেবোত্তর করেননি সম্পত্তি। চার মেয়ের মধ্যে দু'জন শুধু এখন বেঁচে আছে। প্রথমা পদ্মমণি আর সব চেয়ে ছোট জগদম্বা। দেবতার নামে দানপত্র সম্পাদন করছেন রানি, সেই সঙ্গে মেয়েরাও একটা একরারনামা দস্তখৎ করে দিক, ঐ সম্পত্তিতে তাদের কোনো দাবি-দাওয়া নেই। জগদম্বা সই করে দিল একবাক্যে। কিন্তু কলম স্পর্শ করল না পদ্মমণি। সেই ভেবে রানি বড় অসুখী। মা গো, তোর খেলা তুই জানিস। তোর মনে কি আছে যার জন্যে পদ্মমণির মনে এই নেওয়ালি ! আঠারো শো একষট্টি সালের আঠারোই ফেব্রুয়ারি দানপত্রে সই করলেন রাসমণি। আর তার পরের দিনই স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

মৃত্যুর কিছু দিন আগে থেকেই তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে অপেক্ষা করছিলেন। সময় আসন্ন হয়ে এলে আদি গঙ্গার পারে তাঁকে নিয়ে আসা হল। অনেকগুলি আলো জ্বলছিল সামনে। হঠাৎ রাসমণি চেঁচিয়ে উঠলেন : 'সরিয়ে দে, নিবিয়ে দে ও সব রোশনাই। অন্ধকার করে দে। এখন আমার মা আসছেন, তাঁর অঙ্গের আলোয় দশ দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে !'

রাত্রি দ্বিতীয় যাম। রানি সহসা আকুল হয়ে উঠলেন. 'এসেছিস মা ? নে, টেনে নে কোলের কাছে। কিন্তু শেষ কথাটা তোকে বলি—পদ্ম যে সই দিলে না !'

মা হাসলেন। তাতে তোর কি। হয়তো ঢের মামলা-মোকদ্দমা হবে তোর দৌহিত্রদের মধ্যে, হয়তো দেবোত্তর সম্পত্তি তছনছ হয়ে যাবে। তার জন্যে তোর ভাবনা কেন ? যা থাকবার নয় তা যাক না। তুই থাকবি আর তোর গদাধর থাকবে।

'এ আমার কি স্বভাব হলো বলো দেখি।' গদাধর বললে গিয়ে হলধারীকে : 'জপ করতে বসে কেউ অন্যমনস্ক হয়েছে অমনি তাকে এক চড় মেরে বসি। সেই কালী-ঘরে রাসমণিকে এক চড় মেরেছিলাম, আজ আবার বরানগরের ঘাটে জয় মুখুজ্জেকে দুই চড় মেরে বসেছি। ঠাট করে জপ করতে বসেছেন, কিন্তু মন রয়েছে অন্য দিকে।'

'তুই উন্মাদ।' বললে হলধারী।

'তাই হবে। তাই হক কথা বেরিয়ে আসে মুখ থেকে। কাউকে মানি না। বড়লোককে কেয়ার করি না কানাকড়ি।'

দক্ষিণেশ্বরে যদু মল্লিকের বাগানে যতীন্দ্র ঠাকুর বেড়াতে এসেছেন। ঠাকুরও গিয়েছেন সেখানে। যতীন্দ্র বললেন, 'আমরা সংসারী লোক, আমাদের কি আর মুক্তি আছে ? স্বয়ং যুধিষ্ঠিরই নরকদর্শন করেছিলেন তো আমরা কোন ছার।'

করেছিলেন তো করেছিলেন। কথা শুনে ঠাকুরের রাগ হল। বললেন, 'যুধিষ্ঠির বুঝতে শুধু ঐ নরকদর্শনটুকুই মনে করে রেখেছ? তার সত্য, ক্ষমা, ধৈর্য, বৈরাগ্য—তার কৃষ্ণভক্তি এ সমস্ত ভুলে যাবে?' আরো কত কি বলতে যাচ্ছিলেন ঠাকুর, হৃদয়ের বড়লোককে বড় ভয়, তাড়াতাড়ি ঠাকুরের মুখ চেপে ধরল।

আর, যতীন্দ্র করলেন কি?

যতীন্দ্র বললেন, 'আমার একটু কাজ আছে।' বলে সরে পড়লেন।

আরেক দিন গিয়েছিলেন সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি। তাঁকে দেখেই বললেন, 'দেখ বাপু, তোমাকে কিন্তু রাজা-টাজা বলতে পারব না। তুমি যা নও তাই তোমাকে বলি কি করে?'

রজোগুণী লোক সৌরীন্দ্র, রাজা না বলাতে ষোলো আনা খুশি হলেন না হয়তো। একা-একা কি আলাপ করবেন, যতীন্দ্রকে খবর পাঠালেন। যতীন্দ্র বলে পাঠালেন, 'আমার গলা-ব্যথা হয়েছে, যেতে পারব না।'

'তুমি উন্মাদ।' বললে কৃষ্ণকিশোর। এঁড়েদার কৃষ্ণকিশোর। সর্বশাস্ত্রে পারংগম। 'উন্মাদ নও তো পৈতে-ধুতি উড়িয়ে দিলে কেন?'

ঠাকুর বললেন, 'তোমার একবার উন্মাদ হয় তা হলে বোঝ।'

হলও তাই। কৃষ্ণকিশোরের উন্মাদ হল। একা এক ঘরে চুপ করে বসে থাকে আর কেবল ওঁ-ওঁ করে। সকলে বললে, মাথা খারাপ হয়েছে, কবরেজ ডাকো। কবরেজ এল নাটাগড় থেকে। কৃষ্ণকিশোর বললে, 'আমার রোগ আরাম করো আপত্তি নেই, কিন্তু দেখো যেন আমার ওঁকারটি আরাম করো না।'

নদীয়ায় ন্যায় পড়তে এসেছিল নারায়ণ শাস্ত্রী। বাড়ি রাজপুতানায়, গুরুগৃহে পঁচিশ বছর ব্রহ্মচর্য পালন করে এসেছে। জয়পুরের মহারাজা বড় চাকরিতে বাঁধতে চেয়েছিলেন তাঁকে, কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। জ্ঞানের মতন আনন্দ নেই। শাস্ত্র-দর্শন সব তিনি মন্থন করে দেখবেন কোথায় সেই বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মের ঠিকানা। কিন্তু বই পড়ে মন ভরল না নারায়ণ শাস্ত্রীর। অস্তি—তিনি আছেন, শুধু এইটুকুই বলা যায়, তার বেশি আর উপলব্ধি হয় না। "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।"

শুনলেন দক্ষিণেশ্বরে সেই উপলব্ধির অব্ধি বিরাজমান। ছুটলেন সেখানে। বুঝলেন আহারের চেয়ে আস্বাদ বড় জিনিস। ঠিকানা জানার চেয়ে একখানা চিঠি পাওয়ার বেশি দাম।

কিন্তু এসে দেখলেন কি? গদাধর বাঁশ ঘাড়ে করে বেড়াচ্ছে। কাঙালীরা খেয়ে গেলে তাদের পাতা চাটছে, মাথায় ঠেকাচ্ছে। কোথাকার কে নিচু জাতের স্ত্রীলোক, খাচ্ছে তার হাতের শাকান্ন। সবাই বলছে, উন্মাদ। কিন্তু নারায়ণ শাস্ত্রী দেখল, জ্ঞানোন্মাদ। পরে দেখল, শুধু জেনে উন্মাদ নয় পেয়ে উন্মাদ।

কিন্তু হলধারী এল মুখসাট মেরে: 'তুই এ-সব করছিস কি? কাঙালীদের এঁটো খাচ্ছিস, তোর ছেলেমেয়ের বিয়ে হবে কেমন করে?'

কথা শুনে ক্ষেপে গেল গদাধর: 'তবে রে শালা, তুমি না গীতা-বেদান্ত পড়ো? তুমি না শেখাও জগৎ মিথ্যে ব্রহ্ম সত্য আর সর্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি? ভেবেছ

আমি জগৎ মিথ্যে বলব আর ছেলেপুলের বাপ হব? তোর শাস্ত্রপাঠের মুখে আগুন!' কি হবে শাস্ত্রপাঠে? ভাবল নারায়ণ শাস্ত্রী। বাজনার বোল মুখস্থ বলা সোজা, হাতে আনাই দুষ্কর।

রানি মারা যাবার পর সম্পত্তির এক্সিকিউটর হলেন মথুরবাবু। এক দিন গদাধরকে বললেন, 'তোমার নামে কিছু জমি-জায়গা লিখে দি, কি বলো?'

গদাধর রেগে টং। কি, আমাকে তোমার বিষয়ী করবার মতলব? আমিও কি কলাইয়ের ডালের খদ্দের?

ভগবানের আনন্দের কাছে আর কিছু আনন্দ আছে? ভগবানের স্বাদ পেলে সংসার আলুনি লাগে। শাল পেলে আর বনাত ভালো লাগে না। এ আনন্দ কি বলে বোঝানো যায়? বিয়ের পর অনেক দিন বাদে মেয়ের কাছে তার স্বামী এসেছে। রাত্রিশেষে সখীরা ঘিরে ধরল মেয়েকে। হ্যাঁ লো, কেমন আনন্দ করলি কাল? মেয়েটি বললে, কি করে বোঝাই বল। সে বলে বোঝানো যায় না। যখন তোদের স্বামী আসবে তখনই বুঝতে পারবি, তার আগে নয়। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে চাতকের! সাত সমুদ্র তেরো নদী খাল-বিল পুকুর-দিঘি সব জলে ভরপুর। অথচ সে-জল খাবে না। ছাতি ফেটে যাচ্ছে, তবু না। স্বাতী নক্ষত্রের জলের জন্যে হাঁ করে আছে। 'বিনা স্বাতী কি জল সব ধুর'। মিছরির পানা যে খেয়েছে সে কি আর চিটে গুড়ের পানা খাবে?

'কিন্তু সংসারে থাকতে গেলে টাকাও তো চাই—' ত্রৈলোক্য সান্যাল বললেন, 'সঞ্চয়ও দরকার। পাঁচটা দান-ধ্যান—'

'রাখো। কত তোমাদের দান ধ্যান! নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার-হাজার খরচ, আর পাশের বাড়িতে খেতে পাচ্ছে না। তাদের দু'টি চাল দিতে কষ্ট হয়—দিতে-থুতে অনেক হিসেব! খেতে পাচ্ছে না—তা আর কি হবে! ও শালারা মরুক আর বাঁচুক—আমি আর আমার বাড়ির সকলে ভালো থাকলেই হল। এদিকে মুখে বলে, সর্বজীবে দয়া!'

আগে ঈশ্বর লাভ করো, পরে সংসারে থাকো। ঈশ্বর লাভের পর যে সংসার সে বিদ্যার সংসার। তখন 'কলঙ্কসাগরে ভাসি, কলঙ্ক না লাগে গায়!' এই দেখ না জয়গোপাল সেনকে। বিস্তর টাকা, কিন্তু আঙুল দিয়ে জল গলে না।

'গাড়ি করে আসে। গাড়িতে ভাঙা লণ্ঠন, ভাগাড়ের ফেরৎ ঘোড়া, হাসপাতাল ফেরৎ দারোয়ান। আর এখানের জন্যে নিয়ে এল দুটো পচা ডালিম!'

এই তো টাকার কেরামতি!

মথুরবাবুর সঙ্গে ঠাকুর কাশীতে তীর্থ করতে এসেছেন, উঠেছেন রাজাবাবুর বাড়িতে। সেখানেও সর্বক্ষণ বিষয়-আশয়ের কথাবার্তা। ঠাকুর কাঁদতে লাগলেন: 'মা, এ কোথায় আনলে? আমি যে রাসমণির মন্দিরেই খুব ভালো ছিলাম। সেখানে বিষয়ের কথা শুনতে হয়নি।'

ছাদের উপর ঠাকুর-ঘর, নারায়ণ পুজো হচ্ছে। বাড়ির গিন্নি-বান্নিরা চন্দন ঘষছে, নৈবেদ্য সাজাচ্ছে, করছে নানান রকম আয়োজন। কিন্তু মুখে একটিও

ঈশ্বরের কথা নেই। কি রাঁধতে হবে, আজ বাজারে কিছু ভালো পেলে না, কাল অমুক রান্নাটি বেশ হয়েছিল—এই সব কথাবার্তা।

মথুরবাবু কথা ফিরিয়ে নিলেন। কত লোক তাঁকে আশ্রয় করে ফিরিয়ে নিল অবস্থা। আর এ এমন এক গুণী-গুরু যে তাঁরই অবস্থান্তর ঘটালেন।

'বাবা, তোমার জন্যে এই শাল এনেছি দেখ।'

হাজার টাকা দাম দিয়ে কিনে এনেছেন মথুরবাবু। গদাধরের গায়ে নিজেই পরিয়ে দিলেন আদর করে।

শাল গায়ে দিয়ে শিশুর মত সরল আনন্দে নেচে উঠল গদাধর। ডেকে দেখাতে লাগল সকলকে। ওরে শুনেছিস হাজার টাকা দাম!

পরক্ষণেই অন্য চিন্তা মনে এল। এই শালের মধ্যে আছে কি? কতগুলো ছাগলের লোম বই কিছু নয়। তারই এত চটকদারি! শীত ঠেকাতে সামান্য একখানা কম্বলই তো যথেষ্ট। বলি, এই শালে ঈশ্বরস্পর্শ পাওয়া যাবে? বরং বিকার বাড়বে, মনে হবে আমি এক জন মস্ত এলেমবাজ। আর সকলের চেয়ে বড়, এক জন কেষ্ট-বিষ্টু। আর জানো না, বিকার হলে কি বলে? বলে, আমি পাঁচ সের চালের ভাত খাবো রে, আমি এক জালা জল খাবো। বদ্যি বলে, বেশ তো খাবি, নিশ্চয় খাবি। বলে বদ্যি নিজে তামাক খায়। বিকারের পর কি বলবে তারি জন্যে অপেক্ষা করে।

হঠাৎ গা থেকে শালখানি খুলে নিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল গদাধর। থুতু ফেলতে লাগল তার উপর, পা দিয়ে মাড়িয়ে ঘষতে লাগল ধুলোয়। তাতেও ক্ষান্তি নেই, আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলব এই জঞ্জাল।

কে এক জন ছুটে এসে উদ্ধার করলে শালখানি। জানালে গিয়ে মথুরবাবুকে।

মথুরবাবু বললেন, 'বেশ করেছে। ঠিক করেছে। যেমনটি চেয়েছিলাম তাই করেছে।'

এ চমৎকার পরিহাস ঈশ্বরের। গদাধরকে কয়েক দিনের জন্যে নিজের কাছে জানবাজারের বাড়িতে নিয়ে এসেছেন মথুরবাবু। সোনার থালায় করে ভাত খেতে দেন, রুপোর বাটিতে করে পঞ্চ ব্যঞ্জন। যে খাচ্ছে তার কিন্তু থালা-বাটির দিকে নজরও নেই, খাওয়া শেষ হলে চেয়েও দেখে না এঁটো বাসনের কি হল। মথুর-বাবুরই যত গরজ। দেখ, ঠিকমত মাজা-ঘষা হল কি না, ভাঙা-ফুটো হল কি না, চোরে নিয়ে গেল না কি চুরি করে। তাঁরই যত হাঙ্গামা পোয়ানো। আর যে ভোজন করে গেল তার কাছে সব কিছুই একটা অসার ভোজবাজি।

চন্দ্র হালদার মথুরবাবুদের কুল-পুরোহিত। আছে বাবুদের আশ্রয়ে কিন্তু গদাধরের প্রাধান্য দেখে হিংসেয় ফেটে পড়ছে। কী কৌশলে যে বাবুকে হাত করল তাই বুঝে উঠতে পাচ্ছে না। কোথাকার কে বিদেশী, তার কিনা এত প্রতাপ! যাই বলো, আর আস্কারা দেওয়া চলে না। একটা হেস্তনেস্ত করতে হয়। বাইরের ঘরে একা বেহুঁস হয়ে বসে আছে গদাধর, চন্দ্র হালদার কাছে গিয়ে তার গায়ে ঠেলা মারতে লাগল; 'ও বামুন, বল্ না বাবুকে কি করে বশে আনলি?'

গদাধর নিঃসাড়।

'আহা, ঢং দেখ না ! ঝিমুচ্ছে বসে-বসে ! বল্ না সত্যি করে, কি করে বাগালি বাবুকে ?'

গদাধর নিঃসংজ্ঞ।

'উঃ, খুব ফুটুনি হয়েছে !' বলেই গদাধরকে সে লাথি মারলে। একবার নয়, তিন-তিনবার।

গদাধর চোখও মেলল না। পৃথিবী সকলের চেয়ে বড়, সাগর তার চেয়ে বড়, আকাশ তারও চেয়ে বড়। কিন্তু ভগবান বিষ্ণু এক পায়ে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল তিন ভুবন আবৃত করেছেন। সাধুর হৃদয়ের মধ্যে সেই বিষ্ণুপদ। আর সেই পদচ্ছায়ে অনন্ত সহাশক্তি !

সহ্য করে গেল গদাধর। মথুরবাবুকে বললে চন্দ্র হালদার আর আস্ত থাকত না।

ঠাকুর তাই বলতেন হৃদয়কে : 'তুই আমার কথা সহ্য করবি, আমি তোর কথা সহ্য করবো—তবে হবে। তা না হলে তখন খাজাঞ্চিকে ডাকো।'

যে সয় সেই রয়। যাকে রাখো সেই রাখে।

• ২০ •

বকুলতলার ঘাটে এসে নৌকো লাগল। সকাল বেলা। দক্ষিণেশ্বরের বাগানে গদাধর ফুল তুলছে। সহসা চোখ পড়ল ঘাটের দিকে। কে এল নৌকোয় ?

আশ্চর্য, স্ত্রীলোক ! কিন্তু এ কী তার অদ্ভুত বেশবাস ! পরনে গেরুয়া, হাতে ত্রিশূল, ঘাড়ে-পিঠে অসম্বদ্ধ চুল—এ যে সন্ন্যাসিনী ! এ এখানে এল কি করে ? এখানে তার কি কাজ ? কে তাকে পথ দেখাল ?

তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরে এল গদাধর। ডাকলে হৃদয়কে। ওরে, দ্যাখ গিয়ে, ঘাটে এক ভৈরবী এসেছে। কি তার গায়ের রং, কি তার চোখের ছটা ! কি তার ভঙ্গির তেজ ! চাঁদনিতে রয়েছে। যা, তাকে গিয়ে ডেকে নিয়ে আয় এখানে।

হৃদয় তো অবাক। সে এখানে আসবে কেন ? তুমি ডাকলে তার কি ?

'তুই যা না। গিয়ে বল আমি এখানে আছি। তা হলেই সে আসবে।'

তাই গেল হৃদয়। গিয়ে দেখল, ঘাটের চাঁদনিতে ভৈরবী বসে আছে চুপচাপ। যেন বা তারই সংবাদের প্রতীক্ষায়। বললে তার মামার কথা। মামা যেতে বলেছে তাকে। হৃদয় তো অবাক ! এক বাক্যে উঠে পড়ল ভৈরবী। বিনা প্রশ্নে অনুসরণ করলে।

চলে এল গদাধরের ঘরের দরজায়। গদাধরকে দেখেই আনন্দে আর বিস্ময়ে কেঁদে ফেলল। বললে উচ্ছ্বসিত হয়ে : 'বাবা, তুমি এখানে ? শুধু এইটুকু জেনেছি তুমি গঙ্গাতীরে আছ। সেই থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি তোমাকে। এত দিনে দেখা পেলাম।'

বছর চল্লিশ বয়েস হবে ভৈরবীর—অভিভূতের মত তার দিকে তাকিয়ে রইল গদাধর। বললে, 'আমাকে তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছ, মা? কিন্তু আমার কথা তুমি জানলে কি করে?'

'মা মহামায়া জানিয়ে দিলেন। বললেন, এই তিন জনের সঙ্গে গিয়ে দেখা কর।'

'তিন জন?'

'হ্যাঁ, আর দু'জনের সঙ্গে পূর্ব-বাঙলায় দেখা হয়েছে। বাকি তোমাকেই এত দিন খুঁজছিলাম।'

গৃহহারা শিশু যেন মাকে ফিরে পেয়েছে এমনি আগ্রহে গদাধর আঁকড়ে ধরল ভৈরবীকে। কত দিনের কত সুখ-দুঃখের কথা বলতে বাকি। মা গো, সব বলি তোকে বসে-বসে। বাহ্যজ্ঞান থাকে না, অলৌকিক কত কি দেখি-শুনি, সমস্ত গা জ্বলে-পুড়ে যায়, চোখের পাতা এক করতে পারি না। সবাই বলে পাগল হয়ে গেছি। তাই কি সত্যি? রাত-দিন মাকে ডেকে-ডেকে শেষে পাগল হয়ে গেলাম? মাকে ডাকার এই পরিণাম?

'কে তোমাকে পাগল বলে?' ভৈরবীর কণ্ঠ থেকে অমৃত-আশ্বাস ঝরে পড়ল: 'একে বলে, মহাভাব। এ ভাব চেনে এখানে এমন কারু সাধ্যি নেই। তাই যেমন সব পণ্ডিত তেমনি সব ভাষ্য।'

'মহাভাব!' গদাধরের দুই উন্নিদ্র চক্ষু জ্বলজ্বল করে উঠল।

'হ্যাঁ, এই ভাব হয়েছিল রাধারানির, এই ভাব হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের। ভক্তিশাস্ত্রে এ সব লেখা আছে। আমি পড়ে সব দেখিয়ে দেব তোমাকে। মিলিয়ে-মিলিয়ে দেখিয়ে দেব।'

ভৈরবী তার ঝুলি ঘাঁটতে লাগল। ঝুলিতে খান কয়েক পুঁথি আর দু'একখানা কাপড়। জীবনের পথবাহনের যা-কিছু সম্বল।

দেবীর কিছু প্রসাদ খাও মা। কিছু মাখন আর মিছরি ভৈরবীকে নিবেদন করল গদাধর। কিন্তু ছেলে না খেলে কি মা আগে খায় কখনো? গদাধর তাই মুখে দিল খানিকটা। তবেই ভৈরবী জলযোগ করলে।

কিন্তু কে মা তুমি সংসারত্যাগিনী? কেন তোমার এই সন্ন্যাসসজ্জা?

কেউ কিছুই জানে না—আমিও না। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, যশোর জেলায় আমার বাড়ি আর ব্রাহ্মণের ঘরে আমার জন্ম। যদি কিছু নাম দিতে চাও, বলো, যোগেশ্বরী। এই যোগে বসেই জানতে পেলাম তিন জনকে সাধনায় সাহায্য করতে হবে। প্রথম দু'জনের নাম হচ্ছে চন্দ্র আর গিরিজা—দুয়ের বাড়িই বরিশালে। আর তৃতীয় জন তুমি। চন্দ্র আর গিরিজাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে এসেছি, এবার তোমার পালা।

ওরা কী শিখল?

কয়েক দিনের মধ্যেই দেখতে পাবে। ওদের নিয়ে আসব দক্ষিণেশ্বরে। তোমার সঙ্গে মিলিয়ে দেব। আমার তিন শিষ্য একত্র হবে।

মন্দির ঘুরে সব দর্শন করলে যোগেশ্বরী। গলায় ঝুলছে যে রঘুবীর শিলা,

এখন তার ভোগের যোগাড় দেখতে হয়। সিধে এল ঠাকুরবাড়ি থেকে। তাই নিয়ে সে পঞ্চবটীতে রাঁধতে গেল।

মহাভাব! মহাভাব কাকে বলে?

যেমন শ্রীমতীর হত। এক সখী ছুঁতে গেলে অন্য সখী বলত, ওরে এখন কৃষ্ণবিলাসের অংগ, ছুঁসনি—এ'র দেহের মধ্যে এখন কৃষ্ণ বিলাস করছেন। মহাভাব ঈশ্বরের ভাব—দেহ-মনকে তোলপাড় করে দেয়। যেন একটা মস্ত হাতি নাড়াকুচির কুঁড়েঘরে গিয়ে ঢুকছে। ঘর চুরমার। ঈশ্বরের বিরহ-আগুন প্রলয়ের আগুনের মত। সে কি সামান্য? রূপ সনাতন যে গাছের তলায় বসতেন, সে গাছের পাতা ঝলসা-পোড়া হয়ে যেত।

'এই অবস্থায় তিন দিন ঠায় অজ্ঞান হয়ে ছিলাম।' বললেন এক দিন ঠাকুর: 'অনড় হয়ে পড়েছিলাম এক জায়গায়। হুঁস হলে বামনি আমায় ধরে স্নান করাতে নিয়ে গেল। কিন্তু আমার গায়ে হাত ঠেকাবার কি জো আছে। গা মোটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিলে। সেই চাদরের উপর দিয়ে ধরলে আমাকে। ধরে নিয়ে গেল গংগায়। গায়ে যে সব মাটি লেগেছিল পুড়ে গিয়েছিল—'

শ্রীমা বলতেন, 'ঠাকুরের যখন মহাভাব হত, মনে হত বুকের ভিতর যেন সাতটা আগুনের তাওয়া জ্বলছে।' বলতে বলতে ভাবারূঢ় হতেন: 'আহা, সে কী গায়েব রং! সোনার ইষ্ট কবচের সংগে গায়ের বং মিশে থাকত। যখন তেল মাখিয়ে দিতুম দেখতুম সব গা থেকে যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে! যখনই কালী-বাড়িতে বার হতেন, সব লোক দাঁড়িয়ে পড়ত, বলত, ঐ তিনি যাচ্ছেন। বেশ মোটাসোটা ছিলেন। ছোট তেলধুতিটি পরে যখন থসথস করে গংগায় নাইতে যেতেন, রূপের সে কি ঢেউই উঠত! বেড়ার ফাঁকে দাঁড়িয়ে চোখ ভরে দেখতুম। মথুরবাবু একখানা পিঁড়ে দিয়েছিলেন, বেশ বড় পিঁড়ে। যখন খেতে বসতেন তখন তাতেও বসতে কুলোত না—ছাপিয়ে পড়তেন—'

'আমাকে তিনি কি বলতেন জানো?' বললেন এক দিন শ্রীমা: 'বলতেন, তাঁর দেহ দেখিয়ে বলতেন, আমার এই দেহটি গয়া থেকে এসেছে। তাই তাঁর মা দেহ রাখবার পর আমাকে তিনি বললেন, তুমি গিয়ে গয়ায় পিণ্ড দিয়ে এস। সে কি কথা? পুত্র বর্তমান থাকতে আমি পিণ্ড দেব কি! হবে গো হবে, তুমি দিলেই হবে। বললেন তিনি, আমার কি আর ওখানে যাবার জো আছে? গেলে কি আর ফিরবো? চমকে উঠলুম। কাজ নেই তবে গিয়ে। আমিই যাব। বুড়ো গোপালকে নিয়ে পরে আমিই গিয়েছিলুম গয়ায়।'

রান্না করে রঘুবীরের সামনে ভোগ্য-ব্যঞ্জন রেখে ধ্যানে বসেছে ভৈরবী। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে, গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে আনন্দবৃষ্টি। ধ্যানে দেখছে, স্বয়ং রঘুবীর যেন খাচ্ছে সেই তার নিবেদনের অন্ন। আহা, খাক তৃপ্ত করে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে। জ্ঞান হয়ে চোখ মেলে নিজেই আনন্দে আত্মহারা। যে খাচ্ছে এ ভাত সে গদাধর। অনাহূত কখন চলে এসেছে পঞ্চবটীতে। চলে এসেছে অদৃশ্য কোন প্রাণের টানে। অদৃশ্য কোন নিমন্ত্রণের সংবাদে।

ভৈরবীর সংগে চোখাচোখি হতেই জ্ঞানভূমিতে নেমে এল গদাধর।

অপ্রস্তুতের মত বললে, 'কখন কি যে গোলমাল হয়ে যায়, যত সব আজব কাণ্ড করে বসি।'

ভৈরবীর মুখে প্রশান্ত অভয়। বললে, 'বেশ করেছ, প্রাণ যেমনটি চেয়েছিল ঠিক তেমনটি করেছ। ধ্যানে যা দেখেছি তাই প্রত্যক্ষ করলাম চোখ মেলে। আমার আর বাইরের পুজোয় দরকার নেই, আমি পেয়ে গেছি আমার রঘুবীরকে।' বলে সে খেতে লাগল সেই উচ্ছিষ্টান্ন। তার দেবতার প্রসাদ।

খাওয়ার শেষে এল গংগাতীরে। কী হবে আর শিলামূর্তিতে। পেয়ে গেছি প্রাণ-স্বরূপকে। এত দিন গলায় ঝুলিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছিল যে শিলাখণ্ড, নিমেষে তা ফেলে দিলে গংগায়।

মাকে বলত গদাধর : মা আমাকে দেখিয়ে দে, শিখিয়ে দে। তোর ছেলে হয়ে আমি কি আকাট হয়ে থাকব ?

তাকে শেখাবার জন্যেই মা পাঠিয়ে দিয়েছেন ভৈরবীকে, তাঁর জ্ঞানবতী যোগেশ্বরী মেয়েকে। তন্ত্রশাস্ত্রে বিধিবেত্তা, বহুদর্শিনী ভৈরবী। পুত্রবৎ পড়াতে লাগল গদাধরকে। কাকে বলে দিব্য-দর্শন, কাকেই বা বলে দিব্যোন্মাদনা, বইয়ের লিখনের সংগে লক্ষণ মিলিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগল। বহু জিজ্ঞাসার সমাধান হল গদাধরের, হল বহু সংশয়ছেদন। পঞ্চবটীতে বইতে লাগল দিব্যানন্দের ঢেউ। 'চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।'

দিন সাতেক কেটে গেল অলৌকিক ঘনিষ্ঠতায়। কিন্তু বাইরের সংসার এ ঘনিষ্ঠতাকে কি চোখে দেখছে কে জানে। হয়তো বা ভৈরবীর নামে অন্যায় কিছু রটনা করে বসবে। তাই গদাধর ভৈরবীকে বললে, গাঁয়ের মধ্যে তুমি কোথাও একটু দূরে সরে থাকো না—

ঠিক বলেছ। তবে কোথায় কে জায়গা দেয় কে জানে। তবে যেখানেই থাকি রোজ আসব আমি গোপালকে ননী খাওয়াতে। গোপালকে না দেখে যে আমার সূর্য-চন্দ্র উদয় হবে না।

খানিক দূরে উত্তরে দেবমণ্ডলের ঘাটে বামনি থাকবার আশ্রয় পেল। মণ্ডলরাই সাদরে জায়গা করে দিল তার। চাঁদনিতে তক্তপোশ পেতে দিব্যি থাকো তোমার খুশি-মত। গাঁয়ে ঘুরে-ঘুরে দু'দিনেই সকলের মন টেনে নিলে ভৈরবী। যেই কাছে আসে সে-ই মনে-মনে হাত জোড় করে। মুখে-মুখে মধুরতার রসদ জোগায়। এ বলে আমার থেকে সিধে নাও, ও বলে আমার বাড়িতে এসে থাকো। কারুর সাহস নেই দুর্নামের কাদা ছোড়ে।

গোপাল ! গোপাল ! ননী হাতে করে বসে-বসে কাঁদছে বামনি।

প্রায় দু-মাইল দূর। সে কান্না কালীবাড়িতে গদাধরের কানে এসে লাগে। মা খাবার খেতে ডাকছে শুনে ছেলে যেমন ছোটে তেমনি হঠাৎ ছুট দেয় গদাধর। দু'-মাইল রাস্তা এক নিশ্বাসে পার হয়ে যায়। দম না নিয়েই বামনির হাতের থেকে ননী তুলে নিয়ে খেতে আরম্ভ করে।

কোন-কোন দিন পোশাক বদলায় ভৈরবী। গাঁয়ের মেয়েদের থেকে শাড়ি-গয়না চেয়ে নিয়ে সাজগোজ করে। ওদেরই সাহায্যে তৈরি করে নানা ভক্ষ্যভোজ্য। থালায়

করে সাজিয়ে গান গাইতে-গাইতে চলে আসে কালীবাড়ি। নিজের হাতে খাওয়ায় গদাধরকে, তার গোপালকে।

বলে, নিত্যানন্দের খোলে এবার চৈতন্যের আবির্ভাব।

গদাধরের মনে হয় এ যেন সেই নন্দরাণী যশোদা। বাৎসল্যরসের সুরধুনী।

শুধু জননী নয়, জগৎগুরু। বলে, একে-একে চৌষট্টিখানা তন্ত্র শেখাব তোমাকে। মা'র আদেশ। মা'র আশীর্বাদ।

গদাধরের চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে।

ঠাকুরের ধর্মজীবনের প্রথম গুরু নারী। যে নারী মাতৃস্বময়ী মংগলস্বরূপিণী।

* ২১ *

এ সব কী দেখছে ভৈরবী?

ভগবানের কথা বলতে গেলেই ভাববিভোর হয়ে যায়। কীর্তনে গলে পড়ে, ঢলে পড়ে। ধ্যানে বসলেই সমাধিস্থ। এ সব সেই চৈতন্যদেবের লক্ষণ। সেই জ্ঞান সেই ভক্তি সেই তীব্র বৈরাগ্য। চৈতন্যদেবের জিভে সার্বভৌম চিনি ঢেলে দিলে, চিনি ভিজলই না, ফরফর করে উড়ে গেল হাওয়ায়। তেমনি বহ্নিময় সন্ন্যাস। প্রজ্বলন্ত অনাসক্তি। যাকে ছুঁচ্ছে তাকেই ঈশ্বরভাবিত করে দিচ্ছে। যাকে ধরছে তাকেই নাচিয়ে ছাড়ছে। এমন প্রিয় যে নিজের দেহ, তাই ভুল করে ফেলছে। শুধু ভুল কি, শরীরের বোধই নেই এক বিন্দু। চেতনার চিহ্ন নেই এক কণা। এ সবই চৈতন্যদেবের হয়েছিল। যাকে বলে প্রেমোন্মাদ। সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন, সাগর বলে বোধ নেই। মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়লেন, শরীর সেই মাটির চেয়েও তুচ্ছ। বন দেখে ভাবলেন বৃন্দাবন, সমুদ্র দেখে যমুনা। যেমন গোপিনীদের হয়েছিল। রাসমণ্ডলের মধ্যে থেকে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হলেন, গোপিনীরা উন্মাদিনী হয়ে উঠল। গাছ দেখে বললে, তুমি নিশ্চয়ই কৃষ্ণকে দেখেছ নইলে অমন নিশ্চল, সমাধিস্থ হয়ে রয়েছ কেন? তৃণাচ্ছন্ন মাটিকে দেখে বললে, তুমি নিশ্চয়ই কৃষ্ণকে দেখেছ নইলে অমন রোমাঞ্চিত হয়ে রয়েছ কেন? আবার মঞ্জরিত মাধবীকে দেখে বললে, ও মাধবী, আমার মাধবকে এনে দে। সেই প্রেমোন্মাদ। প্রেমে হাসে প্রেমে কাঁদে প্রেমে নাচে প্রেমে গায়। সেই 'চিদানন্দ-সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী'।

চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতে পড়েছে ভৈরবী, মহাপ্রভু আবার দেহ ধরবেন। দুঃখ ও অজ্ঞান থেকে জীবোদ্ধার করবার জন্যে অবতীর্ণ হবেন পৃথিবীতে। সন্দেহ নেই, ঠিক-ঠিক মিলে যাচ্ছে। তিনিই এসেছেন।

'মা গো, বুক-পিঠ জ্বলে যাচ্ছে। কত চিকিৎসা করালাম, কিছুতেই কিছু হল না।' ভৈরবীকে বললে গদাধর। 'কি করি বলতে পারো? কিসে যাবে এই জ্বালা-পোড়া?'

সূর্যোদয়ে শুরু হয়, বেলা বাড়বার সংগে-সংগে বাড়ে। দুঃসহতম হয় দুপুরে।

মাথায় গামছা দিয়ে গদাধর তখন গংগায় ডুবে থাকে। রোজ তিন-চার ঘণ্টা। তবু জবালার উপশম হয় না। আরো বেশিক্ষণ ডুবে থাকতে সাহস হয় না, পাছে অন্য কোনো অসুখ হয়। মর্মরের মেঝে ভিজে গামছা দিয়ে মুছে-মুছে ঠাণ্ডা করে। তার পর তার উপর পড়ে থাকে। তবু নিবৃত্তি নেই।

'কিসে যাবে এই দেহের দাহ ? কিছু বলতে পারো ?'

'পারি।' প্রসন্নচোখে তাকাল ভৈরবী।

এমন কথা শুনতে পাবে গদাধর যেন ভাবতেও পারত না। বিস্ময়ে চমকে উঠল।

'কিসে ? কী সেই প্রতিষেধ ?'

ভেবেছিল, কি না-জানি কঠিন ক্লেশসাধনা করতে হবে। ভৈরবী নির্মল বয়ানে হাসল। বললে, 'প্রতিষেধ অত্যন্ত সোজা। শাস্ত্রেই তার উল্লেখ আছে।'

কি ? কি ? সবাই ঘিরে ধরল ভৈরবীকে।

শুধু চন্দনে গা চর্চিত করো। আর গলায় সুগন্ধি ফুলের মালা পরো একটি। সবাই হেসে উড়িয়ে দিলে। উড়িয়ে দিলেই তো আর উড়ে যায় না। এমনি দাহ শ্রীরাধিকার হয়েছিল। আর যদি প্রত্যক্ষ ইতিহাস চাও, এমনি দাহ হয়েছিল শ্রীগৌরাংগের। এ দাহ চর্মদাহ নয়, এ মর্মদাহ। এ ঈশ্বরবিরহের যন্ত্রণা।

মথুরবাবু বললেন, 'দেখা যাক না এর চিকিৎসাটা।'

সুবাসিত ফুলের মালা পরল গদাধর। সারা গায়ে চন্দন মাখল। ভালো হয়ে গেল তিন দিনে। গদাধরের গায়ের জবালা শীতল হয়ে গেল। পরীক্ষায় সিদ্ধকাম হল ভৈরবী। ঐ দেহে কে বাস করছে—সন্দেহের আর অবকাশ রইল না সিদ্ধান্তে।

তার পর গদাধর যখন বললে সেই শিওড়ে যাবার সময়কার ভাবদর্শনের কথা, কেমন দুটি ছেলে তার গা থেকে বেরিয়ে এসে ছুটোছুটি করে খেলা করছিল মাঠে-মাঠে, তখন ভৈরবীর সিদ্ধান্ত আরো পাকা হল। ভৈরবী ঘোষণা করলে, নিত্যানন্দের খোলে এবার চৈতন্যের আবির্ভাব। তুমি সামান্য মানুষ নও। নও বা তুমি শুধু সম্পূর্ণ মানুষ। নও বা তুমি শুধু অতিমানুষ যে উপলব্ধির উচ্চতম চূড়ায় এসে উঠেছে। তুমি অবতার। তুমিই তিনি। অনন্ত ঈশ্বর তোমার মাঝে অন্তবান হয়েছেন। তোমার মূর্তিতে প্রতিমূর্ত হয়েছেন। তোমার মা যা তুমিই তা। তোমার কায়ায় বাসা বেঁধেছেন মহামায়া। তুমি আবির্ভূত দেবতা। তুমি প্রতিভাত ব্রহ্ম। তারণ করতে তোমার অবতরণ।

এক দিন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করল ভৈরবী।

কিন্তু মথুরবাবু মানতে চান না। কি করে মানবেন ? খবরের কাগজে লেখেনি যে। এক জন তার বন্ধুকে এসে বললে, কাল ওপাড়া দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি একটা বাড়ি হুড়মুড় করে পড়ে গেল। বন্ধু বললে, দাঁড়াও, আগে খবরের কাগজখানা দেখি। খবরের কাগজ খুলে দেখল বাড়ি পড়ার কথা কিছু লেখা নেই। কি বলছ হে, খবরের কাগজে তো কিচ্ছু নেই। খবরের কাগজে যখন নেই তখন তোমার কথা বিশ্বাস করি কি করে ? তুমি দেখবে চলো সেই ভাঙা বাড়ি। ভাঙা বাড়ি তো দেখব কিন্তু হুড়মুড় করে যে পড়েছে তার প্রমাণ কি ?

ঈশ্বর মানুষ হয়ে লীলা করছেন এ তো ইন্দ্রিয়ের তত্ত্ব নয়, ভক্তির তত্ত্ব।

অবতার তো জ্ঞানীর জন্যে নয়, ভক্তের জন্যে। নইলে চৌদ্দ পোয়ার মধ্যে অনন্ত এসেছেন এ কি সহজে বিশ্বাস করবার? নরলীলায় ভগবান যদি মানুষ হয়েছেন তো একেবারে ঠিক-ঠিক মানুষ হয়েছেন। এতটুকু ভুলচুক নেই, নেই এতটুকু এদিক-ওদিক। একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় নিখুঁত মানুষ। সেই ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ শোক— কখনো বা ভয়, সব ঠিক মানুষের মত। কি করে তাকে চিনতে পারে অবতার বলে? রামচন্দ্র সীতার শোকে অস্থির হয়েছিলেন। লক্ষ্মণ যখন শক্তি-শেলে পড়ল তখনও তাঁর কাতরতার অন্ত নেই। মানুষ হয়ে তেমনিই যদি তিনি হাসেন-কাঁদেন, খান-দান, রোগে-কষ্টে জর্জর হন, তবে তাঁকে তুমি চেন কি করে? মনে হবে এ তো মামুলি মানুষই, নারায়ণ কোথায়? বহুরূপী সাধু সেজে এসেছে, ত্যাগী সাধু। সাজ একেবারে নিখুঁত। সাজ দেখে বাবুরা খুব খুশি। যেই একটি টাকা দিতে চেয়েছে, উঁহু করে হাত গুটিয়ে চলে গেল। ত্যাগী সাধু টাকা নেয় কি করে? তার পরে সাজ খুলে যখন সে সহজ হয়ে এল, বললে, টাকা দাও। তেমনি ঈশ্বর যখন মানুষ সেজে আসেন, তখন হুবহু মানুষের মতই আচরণ করেন। দেহটি আবরণ, ঘেরাটোপ, কিন্তু চেয়ে দেখ, লণ্ঠনের ভিতরে আলো জ্বলছে।

'কিন্তু তা কি করে হয়?' বললেন মথুরবাবু, 'শাস্ত্রে আছে বিষ্ণুর দশাবতার। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ আর কল্কি। এই দশের বাইরে আর অবতার নেই। অনুভাগবতে যে কল্কির কথা লেখে সে তো বাবা তুমি নও।'

'তার আমি কি জানি!' গদাধর সরলতার প্রতিমূর্তি। বললে, 'তবে বামনি বলছে—'

'কে বামনি?'

'তাকে তুমি এখনো দেখনি বুঝি?' কথাটা সংক্ষেপে সারল গদাধর। বললে, 'সর্বশাস্ত্রে বিদুষী। ঝোলার মধ্যে এক রাশ পুঁথি। সে পুঁথি দেখে মিলিয়ে-মিলিয়ে বলে আমার দেহে আর মনে না কি অবতারের চিহ্ন। কী যে বলে তা কে জানে।'

বিশেষ আমোল দিলেন না মথুরবাবু। বললেন, 'অবতারতত্ত্বের সে জানে কি! বেমক্কা একটা কিছু বললেই তো আর হল না। তবে, হ্যাঁ, কালাকালের যে মহিষী সেই কালীকে তুমি পেয়েছ বটে—'

এক থালা মিষ্টি নিয়ে এদিক পানে আসছে ভৈরবী। আসছে গদাধরকে খাওয়াতে। আনন্দময়ী নন্দরাণীর আবেশে। প্রেমময় মাতৃমূর্তিতে। কাছে এসেই মথুরবাবুকে দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেল। খাবারের থালা হৃদয়ের হাতে ধরে দিলে।

'এই বুঝি তোমার সেই বামনি?' কটাক্ষ করলেন মথুরবাবু।

'হ্যাঁ, এই সেই যোগেশ্বরী ভৈরবী।' বলেই গদাধর ভৈরবীকে সম্বোধন করলে: 'ওগো, তুমি যা বলছিলে তা ইনি মানতে রাজি নন। বলেন, দশের বেশি অবতার নেই।'

'মিথ্যে কথা।' ভৈরবী হুঙ্কার করে উঠল : 'ভাগবতে বাইশ অবতারের উল্লেখ আছে। তার পরেও সম্ভবামি যুগে-যুগে—অসংখ্য বার ভগবানের অবতীর্ণ হবার কথা বলে গেছেন ব্যাসদেব। বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে মহাপ্রভু আবার দেহ ধরবেন। তা ছাড়া গদাধরের সঙ্গে গৌরাঙ্গদেবের কাঁটায়-কাঁটায় মিল—'

এ আরেক পাগলি জুটল দেখি দক্ষিণেশ্বরে। মনে-মনে হাসলেন মথুরবাবু। আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করলেন ভৈরবীকে। এত রাজ্যের রূপ নিয়ে দেশে-দেশে একা-একা ঘুরে বেড়ায়, যোগিনী না নাগিনী, তা কে জানে। দেখি একবার যাচাই করে। কালীমন্দিরের বারান্দায় তাকে পাকড়াও করলেন মথুরবাবু। বিদ্রূপের টান দিয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন, 'বলি, বেড়ে ভৈরবী তো সেজেছ কিন্তু তোমার ভৈরব কোথায় ?'

এক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল ভৈরবী। মন্দিরে কালীর পায়ের তলায় যে মহাকাল শুয়ে আছে তার দিকে স্পষ্ট আঙুল দেখাল। বললে, 'ঐ ভৈরব।'

মথুরবাবু ঠোঁট বেঁকালেন। 'ঐ ভৈরবটি তো অচল। বলি সচল ভৈরবটি কোথায় ?'

ফণিনীর মত মাথা তুলল ভৈরবী। দৃঢ়স্বরে বললে, 'ঐ অচলকে যদি সচল করতে না পারি তবে মিছিমিছি ভৈরবী হয়েছি।'

মথুরবাবু ধাক্কা খেলেন। কিন্তু সন্দেহ যায় না।

গায়ের জ্বালা ঠাণ্ডা হয়েছে গদাধরের, কিন্তু এ আবার কি উপসর্গ শুরু হল ! 'মা গো, নিদারুণ খিদে ! এই খাচ্ছি আবার অমনি খিদে পাচ্ছে।' ভৈরবীর কাছে নালিশ জানাল গদাধর : 'রাত-দিন আর কোনো চিন্তা নেই, কেবল খাবার চিন্তা। এ আবার আমার কি হল ?'

'কোনো ভাবনা নেই।' অভয় দিল ভৈরবী। বললে, 'সবই সেই একই কাহিনী। তোমার মাঝে যে ভাবস্বরূপ বিরাজ করছেন এ তাঁরই ভাব।'

'না মা, এ বুঝি আরেক রকম রোগ হল আমার—'

'দাঁড়াও, সারিয়ে দিই।'

মথুরবাবুকে বললে, যত রাজ্যের বিচিত্র খাবার পাও সব এক ঘরে জড়ো করো। গদাধরকে বললে, ঐ খাবারের ঘরে খিল চাপিয়ে একা-একা বাস করো দিন-রাত। যত ইচ্ছে তত খাও, যখন খুশি। যখন যেমন খিদে। নাও আর খাও, ফেল আর ছড়াও।

অদ্ভুত ব্যবস্থা ! কখনো এটা খাচ্ছে কখনো ওটা খাচ্ছে। যত খাচ্ছে ততই খিদে পাচ্ছে। যত খিদে পাচ্ছে ততই খাচ্ছে। কিন্তু তিন দিনের দিন, আশ্চর্য, আর সেই চণ্ডাল খিদে নেই। গদাধর আবার সেই স্বাভাবিক মানুষ। এ সব নির্ভুল অবতারলীলা। বামনি আবার ঘোষণা করল। গদাধর নরদেহে ভগবান।

মথুরবাবু তবুও নারাজ।

'তুমি সভা ডাকাও।' তেজতপ্ত কণ্ঠে গর্জে উঠল ভৈরবী : 'আমি শাস্ত্রের উক্তি দিয়ে প্রমাণ করব। সাধ্য থাকে কেউ এসে আমাকে খণ্ডন করুক।'

কালীমন্দিরে সাড়া পড়ে গেল। এ বলে কি বামনি ?

'ঠিকই বলছি। তোমরা যাকে এত দিন পাগল ভেবে এসেছ, সে স্বয়ং নরদেহী রামচন্দ্র।' ভৈরবী আবার হুঙ্কার ছাড়ল : 'এ শুধু আমার মুখের কথা নয়, এ শাস্ত্রের কথা। শাস্ত্র যদি মানো তবে আমার প্রমাণও মানবে।'

গদাধর বললে, 'বসাও না পণ্ডিত-সভা। মজাটা দেখা যাক না—'

কালীঘরের আমলারা মথুরবাবুর দিকে তাকাল। নিশ্চয়ই উপহাস করে উড়িয়ে দেবেন কথাটা। একটা মাথা-খারাপ বাউণ্ডুলে, সে না কি ঈশ্বর!

না, না, বসাক না সভা। মন্তব্য করলে কেউ-কেউ। সভা করলেই বুজরুকিটা বেরিয়ে পড়বে। গদাধর নিজে যখন সভার কথা বলছে তখন মথুরবাবু আর আপত্তি করতে পারেন না। মন্দ কি, নিজের সন্দেহেরও একটা শান্তি হবে। কিন্তু ডাকাই কাকে? সে যুগে সব চেয়ে বড় পণ্ডিত আর সাধক হচ্ছে বৈষ্ণবচরণ আর গৌরীকান্ত তর্কভূষণ। তাদের নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন মথুরবাবু।

আমি মুর্খ। তবু পণ্ডিতেরা আমার কাছেই আসবে! আমারই জন্যে! ভাবলে গদাধর। ভেবে অবাক হয়ে গেল। মা গো, এ তোর কি আশ্চর্য খেলা!

যে ধান মাপে তার পিছনে বসে আরেক জন কে রাশ ঠেলে দেয়। তুই তেমনি আমাকে রাশ ঠেলে দিস।

* ২২ *

সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে বৈষ্ণবচরণ চলে এল দক্ষিণেশ্বরে। বসল পণ্ডিত-সভা। ভৈরবী সওয়াল শুরু করল। অবতারের লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলে আর গদাধরের মধ্যে সে কী পর্যবেক্ষণ করছে তারই বিবৃতি দিলে। প্রায় প্রতিটি লক্ষণ গদাধরের মধ্যে পরিস্ফুট। দেখুন সবাই মিলিয়ে। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বৈষ্ণবচরণকে সরাসরি সম্বোধন করলে ভৈরবী, গদাধর মর্তদেহী ভগবান। আপনি যদি তা না মানেন, বলুন, কেন, কি কারণে আপনি তা মানছেন না—

সাহসিকা জননীর মত আশ্রয়পক্ষপুট বিস্তার করে দাঁড়াল ভৈরবী। দেখি কে আমার গদাধরকে মন্দ বলে। কার সাধ্য ছোট করে গদাধরকে।

আর গদাধর? সে সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। যাকে নিয়ে এত হট্টগোল, সে হাঁ-ও জানে না, না-ও জানে না। আত্মভোলা শিশুর মত সভার মাঝখানে বসে আছে। কখনো হাসছে কখনো ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে, কখনো বা বটুয়া থেকে মশলা তুলে মুখে ফেলছে। অবতার হলেই বা কি, না হলেই বা কি—তার কী যায়-আসে! সে যেমন আছে বেশ আছে!

বৈষ্ণবচরণ প্রশ্ন করতে লাগল গদাধরকে।

হ্যাঁ, জ্যোতি দেখি। নিদারুণ আনন্দ হয়। বুকের মধ্যে তুবড়ির মত গরুগুরু করে মহাবায়ু ওঠে। নাভি থেকে যে শব্দ ওঠে শুনি সেই অনাহত শব্দ। শব্দ-কল্লোল ধরে সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছুই। সেই সমুদ্রই প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। তাই পরম

পদ। 'যত্র নাদো বিলীয়তে।' সেখানে আমিও নেই তুমিও নেই, একও নেই অনেকও নেই। সে জ্ঞান-অজ্ঞানের পার। বিজ্ঞানী সাধু। যে দুধের কথা কেবল শুনেছে সে অজ্ঞান, যে দুধ দেখেছে তার জ্ঞান। আর যে দুধ খেয়েছে সে বিজ্ঞানী।

শুধু যে জ্ঞানী তার বসবার ভঙ্গিই অন্য রকম। সে গোঁফে চাড়া দিয়ে বসে। লোক দেখলে ডেকে শুধোয়, তোমার কিছু জানবার আছে? আছে তো বোসো, শোনো। কিন্তু বিজ্ঞানী—যে সর্বদা ঈশ্বরকে দেখছে, ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কইছে, তার ধরন-ধারণ অদ্ভুত। সে কখনো জড়, কখনো পিশাচ, কখনো বালক, কখনো উন্মাদ। বেশ আছে, হঠাৎ সমাধিস্থ হয়ে অসাড়-অস্পন্দ হয়ে গেল। তাই জড়। জগৎ ব্রহ্মময় দেখছে, তাই শুচি-অশুচি মেধ্য-অমেধ্য জ্ঞান নেই। এমন যে ভাত আর ডাল—তাও অনেক দিন রাখলে বিষ্ঠার মতন হয়ে যায়। তাই খাদ্যে আর ত্যাজ্যে সমান ব্রহ্মস্বাদ। তাই আবার পিশাচ। তার রকম-সকম সাধারণের শাদা চোখে স্বাভাবিক নয়। তাই সে পাগল। সে যে খাপ-খোলা তলোয়ার। তাই সে খাপ-ছাড়া। আবার পর মুহূর্তেই সে বালকের মত। কোনো পাপ নেই, লজ্জা-ঘৃণা নেই। ছলা-কলার ধারে ধারে না। একেবারে সহজ অবস্থা। সহজ অবস্থাই সিদ্ধ অবস্থা। আরো অনেক সব উত্তর দিল গদাধর। এটা হয় ওটা হয়, এটা দেখি ওটা দেখি—এই ধরনের উত্তর। নিজে কিছুই জানে না। যার খোঁজ তার খবর নেই!

ভৈরবীর সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ সায় দিল বৈষ্ণবচরণ। শুধু তাই নয়, অন্যান্য অবতারে শাস্ত্রোক্ত যত লক্ষণ দেখা দিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি—প্রায় সমস্ত-গুলিই—বিকশিত। যে পরমা ভক্তির ফল মহাভাব তা গদাধরে সবিশেষ দেদীপ্যমান। সন্দেহ নেই, গদাধর ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। স্বয়ং বৈষ্ণবচরণ বলছে। মথুরবাবু থ হয়ে রইলেন। আমলারা যারা ছিল তারা এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

ক'দিন পরে হাজির হল এসে গৌরীকান্ত তর্কভূষণ। বাড়ি বাঁকুড়া জেলার ইন্দেশে। বৈষ্ণবচরণ কর্তাভজা, গৌরীকান্ত তান্ত্রিক। মহাশক্তিশালী তান্ত্রিক। প্রতি দুর্গাপুজায় স্ত্রীকে ভগবতীজ্ঞানে আরাধনা করত। যজ্ঞ করার রীতি ছিল অলৌকিক। যজ্ঞের কাঠ মাটিতে সাজাত না, বাঁ হাতের তালুর উপর সাজাত। বাঁ হাত প্রসারিত, করতলের উপর কাঠ সাজিয়ে রাখছে—দু'-চারখানা নয়—সম্পূর্ণ এক মণ কাঠ—আর তাতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে ডান হাতে। যতক্ষণ অনুষ্ঠান না শেষ হচ্ছে ততক্ষণ হাতের উপর জ্বলছে সেই কাঠ। নিজের চোখে একদিন তা দেখেছিলেন ঠাকুর। সেই গৌরীকান্ত এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। যেমন পণ্ডিত তেমনি তার্কিক। তার সঙ্গে সহজে কেউ এঁটে উঠতে পারে না। দাঁড়াতে পারে না মুখের সামনে। সবাই বলে এও তার তন্ত্রবল।

তর্কসভায় যখন সে ঢোকে তখন প্রাণপণ শক্তিতে একটা হুঙ্কার ছাড়ে। কোনো স্তোত্রের বিশেষ একটা অংশই আবৃত্তি করে হয়তো, কিন্তু কণ্ঠস্বরে গগন-বিদার বজ্রের কাঠিন্য। আওয়াজ শুনে ছাদ-দেওয়াল ফেটে পড়বে মনে হয়, ভয়ে হৃৎকম্পন স্তব্ধ হয়ে যায়। এই চীৎকারের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, প্রতিপক্ষকে ভয় পাইয়ে দেওয়া। কেউ-কেউ বলে অমনি চীৎকার করেই না কি সে নিজের মধ্যে

তার আশ্চর্য শক্তিকে উদ্দীপিত করে তোলে। সে যে একজন অসীম শক্তিধর ঐ চীৎকারই তার অভিজ্ঞান!

কালীমন্দিরের প্রাঙ্গণে ঢুকে যথারীতি হুঙ্কার ছাড়ল গৌরীকান্ত।

নিজের ঘরের নিরিবিলিতে বসেছিল গদাধর। চীৎকার শুনে চমকে উঠল। কোথাকার কোন পণ্ডিত এসেছে, কি তার শক্তি-সাধনা, কিছুরই সে খবর রাখে না। কিন্তু কি স্তোত্রাংশ বলেছে চীৎকার করে তা ঠিক ধরতে পেরেছে। তার অন্তরে যে বসে আছে সে-ই বলে দিলে গোপনে। বললে, তুইও ঐ ভাঙা লাইনটা আবৃত্তি কর। কিন্তু খবরদার, ও যতটা জোরে চেঁচিয়েছে, তার চেয়ে আরো জোরে চেঁচানো চাই।

তাই সই। গদাধর চীৎকার করে উঠল। প্রবলতর, পরুষতর কণ্ঠে। মনে হল যেন ডাকাত পড়েছে।

যে যেখানে ছিল হকচকিয়ে উঠল। লাঠি হাতে ছুটে এল দারোয়ানরা। কি ব্যাপার? ডাকাত কোথায়?

ডাকাত-টাকাত কিছু নয়। গৌরী পণ্ডিতের সঙ্গে পাগলা-পুরোতের প্রতিযোগিতা হচ্ছে—কার গলার কত জোর! সবাই অবাক মানল। পাগলা-পুরোতের গলা এত দরাজ! এমন সাংঘাতিক!

হার মানল গৌরীকান্ত। মুখ গম্ভীর করে ঢুকল এসে মন্দিরে। এক ডাকে এত নাজেহাল হবে স্বপ্নেও ভাবেনি। কে এ কালীর বরপুত্র!

তর্কে অজেয় ছিল গৌরী। দেখল তারো চেয়ে আশ্চর্যতর শক্তি আছে। তার যা শক্তি তা তাকে তর্কেই আবদ্ধ করে রেখেছে, তর্কাতীতকে দেখতে দেয়নি। সে শুধু রৌদ্রই পেয়েছে, রুদ্রকে পায়নি। কিন্তু কে এ অলোকসম্ভব, যে একটি ধ্বনিতেই সমস্ত কোলাহল স্তব্ধ করে দেয়! একটি উক্তিতেই শান্ত করে দেয় সমস্ত জিজ্ঞাসা! গদাধরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করল গৌরীকান্ত।

এততেও মথুরবাবু তুষ্ট হলেন না। তিনি আরও পণ্ডিত ডাকালেন। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে শাস্ত্র মিলিয়ে বিচার হোক। মন্দিরের সামনে বিরাট নাটমন্দিরে বিচারসভা। সে-সভায় ঢোকবার আগে গদাধর মন্দিরে ঢুকল কালী-প্রণাম করতে। কালী-প্রণাম করে বেরিয়ে আসছে, হঠাৎ বৈষ্ণবচরণ তার পায়ে পড়ল। অমনি ভাবসমাধি হল গদাধরের। বৈষ্ণবচরণের অন্তরে বইতে লাগল দিব্যানন্দের প্রবাহ। মুখে-মুখে সে তক্ষুনি এক সংস্কৃত স্তোত্র রচনা করে ফেললে। সে স্তোত্রে শুধু গদাধরের স্তুতি।

'বৈষ্ণবচরণের সঙ্গে তর্ক করতে এসেছি আমি।' সমবেত পণ্ডিতদের উদ্দেশ্য করে বললে গৌরীকান্ত। 'আপনারা এসেছেন সে বাগ্‌যুদ্ধ দেখতে। সে যুদ্ধে কে জেতে তাই নির্ণয় করতে। কিন্তু সে যুদ্ধের আর দরকার নেই। বৈষ্ণবচরণ আজ বিষ্ণুচরণের স্পর্শ পেয়েছে—তাকে পরাস্ত করা মানুষের অসাধ্য। তা ছাড়া তর্ক করার আছে কি। শাস্ত্র মিলিয়ে দেখেছি আমরা দু'জনে, গদাধর ভগবানের মহাবতরণ।'

ওরা বলে কি ! গদাধর বালকের মত অবাক মানল। কই আমি তো কিছু বুঝি না।

ঈশ্বরের স্বভাবই তো বালকের মত। ছোট ছেলে যেমন খেলাঘর করে, একবার গড়ে, একবার ভাঙে, ঈশ্বরও তেমনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। ছোট ছেলে যেমন কোনো গুণের বশ নয়, ঈশ্বরও তেমনি তিন গুণের অতীত। তাই ছোট ছেলেদের সঙ্গে মেশ, তাদের সঙ্গে থাকো। তা হলেই তাদের স্বভাব আরোপ হবে। ওদের কথাই চিন্তা করো। তা হলেই সত্তা পাবে ওদের। তদাকারিত হবে।

ঈশ্বর কেমনতরো ? না, যেন কোনো ছেলে কোঁচড়ে রত্ন নিয়ে রাস্তায় বসে আছে। কত লোক যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। অনেকে চাচ্ছে তার কাছে রত্ন। কাপড়ে হাত চেপে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে বলছে, না, দেব না। আবার যে হয়তো চায়নি, চলে যাচ্ছে আপন মনে, তারই পিছু-পিছু ছুটে যেচে সেধে তাকে দিয়ে ফেলছে।

ভৈরবীর মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। তার কথা সবাই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। মথুরের বুক ফুলে উঠল দশ হাত। তিনি যাকে গুরু বলে শিরে ধরেছেন সে গুরুর গুরু, স্বয়ং সচ্চিদানন্দ—নিত্য সত্য জ্ঞানময় ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের অবতার।

অবতার বলে সবাই মেনে নিলেও গদাধর ক্ষান্ত হবার নয়। লোকের কথায় তার সান্ত্বনা কোথায় ? সে চায়, নিজের অনুভব, নিজের উজ্জীবন। বোধ থেকে বোধির আস্বাদ। নতুন সাধনায় তাই সে আত্মনিয়োগ করলে। কঠিনতর তপস্যায়। বিধিগত যোগচর্চায়। তারই নাম তান্ত্রিক সাধনা। আর সে সাধনায় তার গুরু হল ভৈরবী যোগেশ্বরী।

এ পর্যন্ত গদাধর নিজের চেষ্টায় ঈশ্বরকে ধরতে চেয়েছে। নিজের চেষ্টায় মানে শুধু অন্তরের ব্যাকুলতায়। দেখা যাক পরের সাহায্যে কত দূর যেতে পারি। পরের সাহায্যে মানে গুরুর নির্দেশে। সেই গুরু যোগেশ্বরী। একজন কি না স্ত্রীলোক ! কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে বলেছেন ঠাকুর। অথচ কি না এক নারী তাঁর গুরু !

তার মানে নারীর মধ্যে যে কামিনী যে তামসী তাকে ত্যাগ করবে। যে যোগিনী, যে মহিমাময়ী মাতৃস্বরূপিণী তাকেই গ্রহণ করবে। অভিনন্দন করবে।

> "যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে,
> মন, তুই দ্যাখ আর আমি দেখি
> আর যেন কেউ নাহি দেখে।
> কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি
> আয় মন বিরলে দেখি
> রসনারে সঙ্গে রাখি
> সে যেন মা বলে ডাকে ॥"

জনক রাজার আরেক নাম বিদেহ, যেহেতু তিনি নির্লিপ্ত, তাঁর দেহে দেহবুদ্ধি নেই। সেই জনক রাজার সভায় একদিন এক ভৈরবী এসেছিল। স্ত্রীলোক দেখে জনক হেঁটমুখ হয়ে চোখ নিচু করে রইলেন। ভৈরবী বললে, 'তোমার এখনো

স্ত্রীলোক দেখে ভয়! তোমার তবে এখনো পূর্ণজ্ঞান হয়নি। পূর্ণজ্ঞান হলে পাঁচ বছরের ছেলের স্বভাব হয়—তখন স্ত্রী-পুরুষ বলে ভেদ থাকে না।'

আমাদের গদাধর সেই পাঁচ বছরের ছেলে। স্ত্রীলোক মাত্রই তার মা'র প্রতিমা। তা ছাড়া কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ সন্ন্যাসীর পক্ষে, সংসারীর পক্ষে নয়। সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের পট পর্যন্ত দেখবে না। স্ত্রীলোক কেমনতরো জানো? যেমন আচার-তেঁতুল। মনে করলে মুখে জল সরে। আচার-তেঁতুল সামনে আনতে নেই। 'কিন্তু এ কথা আপনাদের পক্ষে, সংসারীদের পক্ষে নয়।' বললেন ঠাকুর, 'আপনারা যদ্দুর পারো স্ত্রীলোকের সঙ্গে অনাসক্ত হয়ে থাকো। মাঝে-মাঝে নির্জনে গিয়ে ঈশ্বরচিন্তা করো। সেখানে ওরা যেন কেউ না থাকে। ঈশ্বরে বিশ্বাস-ভক্তি এলেই অনেকটা অনাসক্ত হতে পারবে। দু'-একটি ছেলেপুলে হলে স্ত্রী-পুরুষ দুই জনে ভাই-বোন হয়ে যাবে। ঈশ্বরকে সর্বদা প্রার্থনা করবে যাতে ইন্দ্রিয়সুখে মন না যায়, ছেলেপুলে আর না হয়।'

গিরিশ ঘোষ বললে, 'কামিনীকাঞ্চন ছাড়ে কই?'

'তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করো, বিবেকের জন্যে প্রার্থনা করো। ঈশ্বরই খাঁটি আর সব ভেজাল, অসার—এরই নাম বিবেক। জল-ছাঁকা দিয়ে জল ছেঁকে নিতে হয়। ময়লাটা এক দিকে পড়ে, ভালো জল এক দিকে পড়ে। বিবেকরূপ জল-ছাঁকা আরোপ করো। তোমরা তাঁকে জেনে সংসার করো। তাই হবে বিদ্যার সংসার।'

আর অবিদ্যার সংসারে দেখ না মেয়েমানুষের কী মোহিনী শক্তি! পুরুষ-গুলোকে বোকা অপদার্থ করে রেখে দিয়েছে। হারু এমন সুন্দর ছেলে, তাকে পেত্নিতে পেয়েছে। ওরে হারু কোথা গেল, ওরে হারু কোথা গেল? আর হারু কোথা গেল! সব্বাই গিয়ে দেখে হারু বটতলায় চুপ করে বসে আছে। সে রূপ নেই সে তেজ নেই সে আনন্দ নেই। বটগাছের পেত্নি হারুকে পেয়েছে। পেত্নি যদি বলে, যাও তো একবার, হারু অমনি উঠে দাঁড়ায়। আবার যদি বলে, বোসো তো, অমনি বসে পড়ে।

তবু ঠাকুর বিয়ে করলেন।

'আচ্ছা, আমার বিয়ে কেন হল বল্ দেখি? স্ত্রী আবার কিসের জন্যে হল? পরনের কাপড়ের ঠিক নেই—তার আবার স্ত্রী কেন?'

নিজেই আবার উত্তর দিলেন ঠাকুর: 'সংস্কারের জন্যে বিয়ে করতে হয়। ব্রাহ্মণশরীরের দশ রকম সংস্কার আছে—বিয়ে তার মধ্যে একটা। শুকদেবেরও বিয়ে হয়েছিল সংস্কারের জন্যে। ঐ দশ রকম সংস্কার হলেই তবে আচার্য হওয়া যায়। সব ঘর ঘুরে এলেই তবে ঘুঁটি চিকে ওঠে।'

বিয়ে করলেন অথচ সংসার ভোগ করলেন না। বিয়ের কত বড় আদর্শ হতে পারে তাই দেখালেন সংসারকে। স্বামি-স্ত্রী ভোগাসনে না বসে বসলেন যোগাসনে। যে কামিনী হতে পারত সে হয়ে দাঁড়াল জ্যোতিষ্মতী জগদ্ধাত্রী। রতির পৃথিবীতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত করলেন মূর্তিমতী বিরতিকে—অতৃপ্তির জগতে সন্তোষময়ীকে। নারীর সব চেয়ে যে বৃহত্তম মহিমা তাই অর্পণ করলেন নারীকে।

'এখানকার যা কিছু করা সব তোদের জন্যে।' ঠাকুর বললেন ভক্তদের : 'ওরে, আমি ষোলো টাং করলে তবে তোরা যদি এক টাং করিস—'

ঠাকুরের জন্যে পূর্ণ নিবৃত্তি, সংসারী ভক্তদের জন্যে অন্তত একটু সংযম। ঠাকুরের জন্যে পূর্ণ নির্বাসনা, সংসারী ভক্তদের জন্যে অন্তত একটু অস্পৃহা।

'বাতাস করো তো মা, শরীর জ্বলে গেল।' অস্থির হয়ে বললেন একদিন শ্রীমা : 'গড় করি মা কলকাতাকে। কেউ বলে আমার এ দুঃখ, কেউ বলে আমার ও দুঃখ, আর সহ্য হয় না। কেউ বা কত কি করে আসছে, কারু বা পাঁচিশটে ছেলে-মেয়ে—দশটা মরে গেল বলে কাঁদছে। মানুষ তো নয়, সব পশু—পশু। সংযম নেই, কিছু নেই। ঠাকুর তাই বলতেন, ওয়ে এক সের দুধে চার সের জল, ফুঁকতে ফুঁকতে আমার চোখ জ্বলে গেল। কে কোথায় ত্যাগী ছেলেরা আছিস—আয় রে, কথা কয়ে বাঁচি। ঠিক কথাই বলতেন। জোরে বাতাস করো মা, লোকের দুঃখ আর দেখতে পারি না।'

* ২৩ *

মা গো, বামনি বলছে তন্ত্রমতে সাধন করতে। করব ?

করবি বৈ কি, সম্পূর্ণ ভাবে করবি। ইঙ্গিত করলেন জগদম্বা। বললেন তন্ত্র-সাধনা জীবনের সর্বাঙ্গীণ সাধনা। সত্তার নিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতম স্তরের ক্রম-উন্মোচন। বোধ থেকে বিকাশে চলে আসা, ভোগ ছেড়ে যোগৈশ্বর্যে। জীব-সত্তার উপর দাঁড়িয়ে ব্রহ্ম-ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা পাওয়া। চিত্ত থেকে চৈতন্যে উদ্‌বুদ্ধ হওয়া। শক্তিই তন্ত্রের সর্বস্ব। তন্ত্রে কোথাও কিছু তুচ্ছ নেই, হেয় পরিত্যাজ্য নেই। সব কিছুর থেকেই ঈশ্বরী শক্তিকে আহরণ করা, আকর্ষণ করা। আত্মশক্তিকে অধ্যাত্মশক্তিতে নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ শক্তিকে ছুটিয়ে এনে শিবত্বে পৌঁছে দেওয়া। সমস্ত গতিকে একটি পরম ধৃতির মধ্যে শান্ত করা।

মা গো, তোকে তো আমি দেখেছি, তবে আমার আবার সাধন কি ?

দরকার আছে। লাউ-কুমড়োর দেখেছিস তো, আগে ফল হয় পরে ফুল ফোটে। তেমনি তোর আগে সিদ্ধি, পরে সাধন।

তুমি যদি আমাকে অবতারই বলো, বামনিকে গিয়ে ধরল গদাধর, তবে আমার আবার সাধন কেন ?

দেখি না তোমার নরদেহে তা কী অপূর্ব ঐশ্বর্য নিয়ে আসে। দেহ যখন ধরেছ তখন নিয়েছ সকল বিকারের ভার। তাই দেহের পক্ষে যা সাধ্য সকল সাধন তোমাকে করতে হবে। এ জৈব দেহকে নিয়ে যেতে হবে শৈব স্থিতিতে। মৃণ্ময় থেকে চিণ্ময়ে। নইলে জীবোদ্ধার হবে কি করে ?

পার্বতী ভগবতী হয়েও শিবের জন্যে কঠোর সাধন করেছিলেন। পঞ্চমুণ্ডীর

উপরে বসে পঞ্চতপা। শীতকালে জলে গা ডুবিয়ে থাকা। অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা সূর্যের দিকে।

তেমনি কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হলেও, অনেক সাধন করেছিলেন রাধাযন্ত্র নিয়ে।

'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখাও।' নরদেহ ধরেও কোথায় চলে আসা যায় কোন অলৌকিক তীর্থভূমিতে, তাই তুমি প্রণাম করো। দেহী হয়েও দেহোত্তীর্ণ হবার আদর্শ তুলে ধরো। তুমি নইলে এই সব দুর্বল অবিশ্বাসী জীব কোথায় আশ্বাস পাবে? কোথায় এসে ত্রাণ খুঁজবে? রাগ-বেগ থেকে চলে আসবে বৈরাগ্য-আবেগে? তা ছাড়া, শাস্ত্রের মর্যাদা তো রাখতে হবে ষোলো'আনা। সংস্কার-পালনের জন্যে যেমন বিয়ে করেছ তেমনি শাস্ত্রপালনের জন্যেও তোমাকে তন্ত্রসাধন করতে হবে। তন্ত্র সকল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ।

'দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা।
তথা সমস্তশাস্ত্রাণাং তন্ত্রশাস্ত্রমনুত্তমম্ ॥'

তন্ত্রের তিন রকম আচার—পশু, বীর আর দিব্য। পশ্বাচার সাধারণ জীবের জন্যে। এতে শুধু শম-দম যম-নিয়ম ধ্যান-পূজা যত সব আনুষ্ঠানিক রীতি-নীতি। কামনার থেকে দূরে সরে থাকার চেষ্টা—এতে করে হয়তো বা সেই কামনাকেই মূল্য দেওয়া। এ পথে যতটুকু সম্ভব, জীবভাবের সংস্কার চলে মাত্র, কিন্তু জীবভাবের লয় হয় না। অর্থাৎ জীবত্ব আরূঢ় হয় না শিবত্বে।

বীরাচার অন্য জাতের। কামনার মধ্যে বাস করে তাকে উপেক্ষা করা, উদাসীন থাকা। উল্লাসকে অনুভব করা কিন্তু তাতে আকৃষ্ট বা আবদ্ধ না হওয়া। মৌমাছি হয়ে পদ্মের উপর বসেও মধুপান না করা। ফল পেয়েও ফলত্যাগ করে যাওয়া। সমস্ত স্থূলাধারকে অধ্যাত্মশক্তির আয়ত্তাধীনে নিয়ে আসা। পশু শক্তি দ্বারা চলছে কিন্তু শক্তিকে চালাচ্ছে বীর। বীর শক্তিকে চালিয়ে নিয়ে এসে শিবভাবে প্রতিষ্ঠা দিচ্ছে। শক্তিকে রূপান্তরিত করছে শান্তিতে। স্থূলকে সূক্ষ্মে। বোধকে বিভূতিতে। আর দিব্য? তিনি জ্ঞানস্বরূপ। তিনি ব্রহ্মমগ্ন। শক্তিতেও তিনি নেই, বিভূতিতেও তিনি নেই। তাঁর স্থিতিতেও ব্রহ্ম, প্রাপ্তিতেও ব্রহ্ম। তিনি প্রশান্ত ও প্রসারিত। এখন কী করতে হবে?

সর্বপ্রথমে মুণ্ড সাধন করো। যে দেশে গঙ্গা নেই সে দেশ থেকে আগে মুণ্ডমালা সংগ্রহ করি। স্থাপন করি মুণ্ডাসন।

বাগানের উত্তরসীমায় বেল গাছ। তার নিচে বেদী তৈরি হল। সেই বেদীর নিচে তিনটি নরমুণ্ড পুঁতলে। বিকল্প আসন হল পঞ্চবটীতে। সে বেদীর নিচে পঞ্চজীবের পঞ্চমুণ্ড। শেয়াল, সাপ, কুকুর, ষাঁড় আর মানুষ। বামনিই সব যোগাড় করেছে ঘুরে-ঘুরে। যেটার জন্যে যে আসন দরকার তাতেই বসে তন্ত্রসাধন শুরু করলে গদাধর।

অনেক রকম পূজো, অনেক রকম জপ, অনেক রকম হোম-তর্পণ। উগ্র হতে উগ্রতর তপস্যা। একেকটা সাধন ধরে আর দু'-তিন দিনের মধ্যেই নিরাপদে পার হয়ে যায়। শাস্ত্রে যে ফল নির্দিষ্ট আছে তাই প্রত্যক্ষ করে। দর্শনের পর দর্শন, অনুভূতির পর অনুভূতি।

এমনি করে গুনে গুনে চৌষট্টিখানা তন্ত্র শেখালে বামনি।

এতটুকু পদস্খলন হল না গদাধরের। কি করে হবে? মা যে তার হাত ধরে আছেন।

এক দিন রাত্রে বামনি কোত্থেকে এক স্ত্রীলোক ধরে আনল। পূর্ণযৌবনা সুন্দরী স্ত্রীলোক। তাকে বেদীর উপর বসালে। গদাধরকে বললে, 'বাবা, একে দেবীবুদ্ধিতে পূজা করো।'

স্ত্রী-মাত্রেই মাতৃজ্ঞান গদাধরের। তার ভয় কি। সে তন্ময় হয়ে পূজা করতে লাগল।

পূজা সাঙ্গ হলে ভৈরবী বললে, 'বাবা, সাক্ষাৎ জগজ্জননী-জ্ঞানে এর কোলে বোস। কোলে বসে তদ্‌গত হয়ে জপ করো।'

শিউরে উঠল গদাধর। রমণী দিগম্বরী।

এ কি আদেশ করছিস মা? তোর দুর্বল সন্তান আমি, আমার কি এ দুঃসাহসের শক্তি আছে?

কে বলে তুই আমার দুর্বল সন্তান? তুই আমার সব চেয়ে জোরদার ছেলে। ওখানে ও বসে কে? ও তো আমি। তুই আমার কোলে বসবি নে? এ তো সহজ অবস্থা। এতে আবার দুঃসাহস কি!

"নিবিড় আঁধারে তোর চমকে অরূপরাশি। তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি-গুহাবাসী।" সত্যিই তো, মা-ই তো বসে আছেন। অমনি সমস্ত দেহপ্রাণ অনন্ত দৈববলে বলীয়ান হয়ে উঠল। রমণীর কোলে বসেই সমাধিস্থ হল গদাধর।

বামনি বললে, 'পরীক্ষায় পাশ হয়ে গেছ বাবা।'

আরেক দিন শবের খর্পরে মাছ রাঁধলে ভৈরবী। জগদম্বাকে তর্পণ করলে। গদাধরকে খেতে বললে মাছ। নির্ঘৃণ হয়ে খেল তাই গদাধর।

তার পরে সেদিন যা হল তা কল্পনায়ও ভয়াবহ। ভৈরবী কোত্থেকে গলিত নরমাংস যোগাড় করে আনলে। দেবী-তর্পণের শেষে গদাধরকে বললে, 'এ মাংস জিভে ঠেকাও।'

'অসম্ভব! এ আমি পারব না।' ঝটকা মারল গদাধর।

'কেন, ঘেন্নার কি! কোনো কিছুকেই ঘেন্না করতে নেই। এই দেখ না, আমি খাচ্ছি।' বলেই এক টুকরো নরমাংস নিজের মুখে ফেলে চিবুতে লাগল বামনি।

'এইবার তুমি খাও।' গদাধরের মুখের সামনে ধরল আরেক টুকরো।

মা, তুই বলছিস? খাব?

দেহে-প্রাণে চণ্ডীর প্রচণ্ড উদ্দীপনা এসে গেল। 'মা' 'মা' বলতে-বলতে ভাবাবিষ্ট হল গদাধর। অমনি বামনি তার মুখের মধ্যে মাংসের টুকরো পুরে দিলে।

ভয় নেই লজ্জা নেই ঘৃণা নেই গদাধরের। সে ত্রিপাশমুক্ত।

শেষ তন্ত্র এখনো বাকি। এবার শিব-শক্তির লীলা-বিলাস দেখতে হবে। এই বীরাচারের শেষ সাধন। এক চুল বিচলিত হল না গদাধর। নির্বিকল্প সমাধিতে প্রশান্ত হয়ে রইল।

সমস্ত স্ত্রীতেই সে মাতৃত্ব নিরীক্ষণ করছে। রমণী মাত্রেই মা। মাতৃভাবেই

আদ্যাশক্তির অধিষ্ঠান। মাতৃভাব নির্জলা একাদশী—ভোগের গন্ধ নেই এক বিন্দু। ফল-মূল খেয়েও একাদশী হয়। কোথাও বা লুচি ছক্কা খেয়ে। সে সব বামাচার। বামাচারে ভোগের কথা আছে। ভোগ থাকলেই ভয়। সন্ন্যাসী যদি ভোগ রাখে, তা হলেই তার পতন। যেন থুতু ফেলে আবার সেই থুতু খাওয়া।

'আমার নির্জলা একাদশী। সব মেয়ে আমার মূর্তিমতী মহামায়া।' বললেন ঠাকুর। 'এই মাতৃভাবই সাধনের শেষ কথা। তুমি মা আমি তোমার ছেলে—এর পরে আর কথা নেই, এর বাইরে আর সম্পর্ক নেই।'

'বাবা, তুমি আনন্দাসনে সিদ্ধ হয়ে দিব্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে।' বললে ভৈরবী।

সাধনাসম্ভূত সে কী রূপ এল গদাধরের শরীরে। সে এক জ্যোতির্ময় দেহ। রোদে গিয়ে দাঁড়ালে ছায়া পড়ে না। সর্বাঙ্গে সুধাংশু-কান্তি। যেন ধবলগিরি-শিরে শিব বসেছেন পদ্মাসনে।

'মা, আমার এই বাইরের রূপে কী হবে? আমাকে অন্তরের রূপ দে। যেন সকল স্বরূপে-কুরূপে তোকেই কেবল দেখতে পারি।'

এক দিন কালীঘরে পূজার আসনে বসে ধ্যান করছে গদাধর, কিন্তু কিছুতেই মা'র মূর্তি মনে আনতে পারছে না। হঠাৎ চেয়ে দেখে ঘটের পাশ থেকে উঁকি মারছে—ও কে? ও তো রমণী, পতিতা, দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে যে প্রায়ই স্নান করতে আসে! সে কি কথা? মা আজ পতিতার বেশে পূজা নিতে এলেন?

'ও মা, আজ তোর রমণী হতে ইচ্ছে হয়েছে? তা বেশ, যেমন তোর খুশি তাই হ। তেমনি হয়ে তুই পূজো নে।'

আরেক দিন থিয়েটার দেখে ফিরছেন ঠাকুর। গণমোহিনীরা সেজে-গুজে, খোঁপা বেঁধে, টিপ পরে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাঁধা হুঁকোয় তামাক খাচ্ছে। 'ওমা, মা, তুই এখানে এ ভাবে রয়েছিস?' বলে ঠাকুর প্রণাম করলেন ওদের।

জননী, জায়া আর জনতোষিণী—সব সেই জগদম্বার অংশ।

তুমি মহাবিদ্যা। মহাবিদ্যাতে মহা বিদ্যাও আছে, আবার মহা অবিদ্যাও আছে। তেমনি বেদ-বেদান্তও তুই, খিস্তি-খেউড়ও তুই।

'মা, তুই তো পঞ্চাশৎ-বর্ণ-রূপিণী। তোর যে সব বর্ণ নিয়ে বেদ-বেদান্ত, সেই সবই তো ফের খিস্তি-খেউড়ে। তোর বেদ-বেদান্তের ক-খ আলাদা, আর খিস্তি-খেউড়ের ক-খ আলাদা—এ তো নয়! ভালো-মন্দে পাপে-পুণ্যে শুচি-অশুচিতে সর্বত্র তোর আনাগোনা।'

সর্বত্র সমবুদ্ধি। সকলের জন্যে স্থান, সকলের জন্যে মান, সকলের জন্যে আশ্বাস। পাপী আর তাপী, আর্ত আর পীড়িত, অবর আর অধম—কেউ তোমরা হেয় নও, অপাঙ্‌ক্তেয় নও। কেউ নও নিঃস্ব-নিরাশ্রয়। যে অবস্থায় আছ সে অবস্থায়ই চলে এস। সব অবস্থায়ই সন্তানের স্থান আছে মা'র কোলে। সে যদি আমাদের মা, তবে তার কাছে লজ্জাই বা কি, ভয়ই বা কি! আর, যদি দেরি একটু আমাদের হয়েই থাকে, তাই বলে কি মা'র কখনো দেরি হয়?

ভৈরবী বললে, 'একটু কারণ খাও।'

কারণ ? জগৎকারণ ঈশ্বরের অমৃতই তো খেতে চলেছি। এ তুচ্ছ মদিরা তার কাছে কী !

'বাবা, বীরভাবে সাধনা করেই সিদ্ধি পেয়েছি আমি।' ভৈরবী মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকাল গদাধরের দিকে : 'কিন্তু তুমি দিব্যভাবের অধিকারী হয়েছ। তুমি আমার চেয়ে অনেক উঁচুতে।'

দিব্যভাব ? হাসল গদাধর।

তুমি জল না ছুঁয়ে মাছ ধরেছ। তোমার দেহবোধ নেই। তোমার সুষুম্নাদ্বার সম্পূর্ণ খুলে গিয়েছে। তুমি বালকস্বভাব হয়েছ। সর্ব বস্তুতে তোমার অদ্বৈত-বুদ্ধি এসেছে। গঙ্গার জল আর নর্দমার জল তোমার কাছে সমান। তুলসী আর সজনেতে কোনো ভেদ নেই। আমাকে এবার তোমার শিষ্যা করো। আমাকে বীর থেকে দিব্যে নিয়ে চলো। নিয়ে চলো রূপ থেকে অরূপে, ক্রিয়া থেকে সত্তায়, দীপ্তি থেকে তৃপ্তিতে—

তুমি যোগেশ্বরী। তুমি যোগমায়ার অংশ। তোমার আবার অপূর্ণ কি ?

জানি না। কিন্তু তোমার মাঝে এখন যে শান্তি যে বিশুদ্ধি যে স্বচ্ছতা দেখছি, তা আমার অনধিগম্য। তাই মনে হয় আমি অপূর্ণ, অশক্ত। তুমি অগ্নি থেকে চলে এসেছ জ্যোতিতে, ঝড় থেকে নীলিমায়, কেন্দ্র থেকে প্রসারে। আমি তোমার শিষ্যা হব। আমি চাই ঐ শান্তি, ঐ ব্যাপ্তি, ঐ নীরবতা। ঐ দিব্যচেতনা।

গদাধর হাসল। বললে, 'যে গুরু সেই আবার শিষ্য। যে মা সেই আবার সন্তান। যিনি ভগবান তিনিই আবার ভক্ত।'

ভৈরবী বসল এসে গদাধরের ছায়াতলে। তার এখনো শেষ তপস্যা বাকি।

২৪

তন্ত্রে তোমার সিদ্ধি হল, এবার কিছু একটা ভোজবাজি দেখাও। হয় পাহাড় টলাও নয় তো মরা নদীতে জোয়ার আনো। কিছুই করবে না, শুধু চুপচাপ বসে থাকবে, কি করে তবে বুঝব তুমি মস্ত বড় একটা সাধু হয়েছ !

'মা'র কাছে গিয়ে একটু ক্ষমতা-টমতা চাও না।' হৃদয় পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

ক্ষমতা দিয়ে কী হবে ? মাকে দেখতে পাচ্ছি, টেনে আনতে পারছি কাছে, এই কি যথেষ্ট ক্ষমতা নয় ?

এ পাঁচ জনে দেখতে পারছে কই ? যা দেখে পাঁচ জনের তাক লেগে যায় তেমন একটা কিছু করো।

তন্ত্রবলে অষ্টসিদ্ধির বিকাশ হয়েছে গদাধরে। তাই কি সে এবার প্রয়োগ করবে নাকি ? থ বানিয়ে দেবে নাকি সবাইকে ? মা'র কাছে গেল তাই জিগগেস করতে। চক্ষের নিমিষে মা দেখিয়ে দিলেন ও-সব সিদ্ধাই ঘৃণ্য আবর্জনা। বিষ্ঠ-কলুষ।

ভগবানকে পাবার পথের দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায়। যদি একবার ঐ প্রলোভনে পা দাও তবে মাটি হয়ে যাবে সব তপস্যাফল। দেখতে-দেখতে দেউলে হয়ে যাবে।

কৃষ্ণ অর্জুনকে কী বলেছিলেন? বলেছিলেন, অষ্টসিদ্ধির মধ্যে যদি একটিও তোমার থাকে তা হলে তোমার শক্তি বাড়বে বটে, কিন্তু আমায় তুমি পাবে না। সিদ্ধাই থাকলে মায়া যায় না, আবার মায়া থেকেই অহঙ্কার। অহঙ্কার যদি থাকে তবে ভগবানের পথে এগুবে কি করে? ছুঁচের ভিতর সুতো যাওয়া, একটু রোঁ থাকলে হবে না—

আর কী হীনবুদ্ধির কথা! সিদ্ধাই চাই, না, মোকদ্দমা জিতিয়ে দেব, বিষয় পাইয়ে দেব, রোগ সারিয়ে দেব। আহা, এরি জন্যে সাধন? যে বড়লোকের কাছে কিছু চেয়ে ফেলে, সে আর খাতির পায় না। তাকে আর এক গাড়িতে চড়তে দেয় না। আর যদি চড়তে দেয়ও, কাছে বসতে দেয় না। কথা কয় না মন খুলে।

যদি সিদ্ধাই-ই নিয়ে নিলাম তবে ভগবান বলবেন, আর কেন? খুব হয়েছে। ঐ নিয়েই ধুয়ে খা। ঐ নিয়েই মজে থাক। সেই সাবির কথা জানিস না? সবাই বলছে, সাবির এখন খুব সময়। একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে, দুখানা বাসন হয়েছে, তক্তপোশ বিছানা মাদুর তাকিয়া হয়েছে, কত লোক আসছে-যাচ্ছে। তার সুখ আর ধরে না। তার মানে আগে সে গৃহস্থ বাড়ির দাসী ছিল এখন বাজারে হয়েছে। তার মানে, সামান্য জিনিসের জন্যে নিজের সর্বনাশ করেছে। যে শরীর-মন-আত্মা দিয়ে ভগবানকে লাভ করব সেই শরীর-মন-আত্মা তুচ্ছ টাকা-কড়ি তুচ্ছ লোকমান্য তুচ্ছ দেহ-সুখের জন্যে বিক্রি করে দেব?

'তবে কী চাইবে মা'র কাছে?' হৃদয় ঝটকা মারল।

'শুধু কৃপা চাইব। বলব, আমাকে ভক্তি দাও, শুদ্ধা ভক্তি, অহেতুকী ভক্তি।'

হ্যাঁ, প্রহ্লাদের যেমন ছিল। রাজ্য চায় না, ঐশ্বর্য চায় না, শুধু হরিকে চায়। কিছু চাও না অথচ ভালোবাসো, এরই নাম ভক্তি। তুমি বড় লোকের বাড়ি রোজ যাও কিন্তু কিছুই চাও না, জিগগেস করলে বলো, আজ্ঞে, কিছু না, এমনি একটু শুধু আপনাকে দেখতে এসেছি, এরই নাম নিষ্কাম ভক্তি। যেমন নারদের ছিল। ঘুরে-ঘরে বেড়ায় আর বীণা বাজিয়ে হরিনাম গান করে।

গদাধর মন্দিরে গিয়ে মা'র পাদপদ্মে ফুল দিলে। বললে, 'মা, এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও—'

একটা নিলে আরেকটাও নিতে হবে। যদি মা জ্ঞান নেন তবে অজ্ঞানও নেবেন, পুণ্য নিলে পাপও। অনেক ছাড়া এক নেই। অন্ধকার ছাড়া আলো নেই। অহল্যার শাপ-মোচনের পর শ্রীরামচন্দ্র তাকে বললেন, বর চাও। অহল্যা বললেন, যদি বর দেবে তো বর দাও, যদি পশু হয়েও জন্মাই যেন তোমার পাদপদ্মে মন থাকে।

আমি সিদ্ধি চাই, সিদ্ধাই চাই না। আমার এ সিদ্ধি গায়ে মাখলে নেশা হয় না। এ সিদ্ধি খেতে হয়।

ভৈরবীর সেই দুই শিষ্য—চন্দ্র আর গিরিজা—এক দিন এসে উপস্থিত হল দক্ষিণেশ্বরে। দু'জনেই সিদ্ধাই নিয়ে ব্যস্ত। নানা রকম ক্ষমতার ভেল্‌কিবাজি নিয়ে।

এই হচ্ছে অহঙ্কার। এক রকম মায়া। এক টুকরো মেঘের মতন। সামান্য মেঘের জন্যে সূর্যকে দেখা যায় না। তেমনি এই অহং বুদ্ধির জন্যেই হয় না ঈশ্বরদর্শন। অহঙ্কার ত্যাগ না করলে ঈশ্বরকে ধরা যায় না। ভার নেন না ঈশ্বর।

কাজকর্মের বাড়িতে যদি এক জন ভাঁড়ারি থাকে তবে কর্তা আর আসে না ভাঁড়ারে। যখন ভাঁড়ারি নিজে ইচ্ছে করে ভাঁড়ার ছেড়ে চলে যায় তখনই কর্তা ঘরে চাবি দেয় আর নিজে ভাঁড়ারের বন্দোবস্ত করে।

তাই, ক্ষমতা নিজের হাতে না নিয়ে ছেড়ে দাও সেই সর্বশক্তিমানের হাতে।

একবার বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী নারায়ণের পদসেবা করছেন, হঠাৎ নারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ্মী বললেন, 'ও কি, কোথায় যাও?' নারায়ণ বললেন, 'আমার একটি ভক্ত বড় বিপদে পড়েছে, তাকে রক্ষা করতে যাচ্ছি।' কিন্তু খানিক দূরে গিয়েই ফিরে এলেন নারায়ণ। 'এ কি, এত শিগগির ফিরে এলে যে?' শুধোলেন লক্ষ্মী। নারায়ণ হেসে বললেন, 'ভক্তটি ভাবে বিহ্বল হয়ে পথ চলছিল। মাঠে কাপড় শুকোতে দিয়েছিল ধোপারা, ভক্তটি তাই মাড়িয়ে দিলে। তাই দেখে তাকে মারতে ধোপারা লাঠি নিয়ে তেড়ে এল। আমি তাকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম।' 'কিন্তু ফিরে এলে কেন?' নারায়ণ বললেন, 'দেখলাম ভক্তটি নিজেই ধোপাদের মারবার জন্যে ইঁট তুলেছে। তাই আর আমি গেলাম না।'

নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে সমর্পণ করে দাও। নিজের জন্যে কিছু রেখো না। নিজেকে দেখিয়েও 'আমি' বলবে না, বলবে 'তুমি'।

চন্দ্রের 'গুটিকা-সিদ্ধি' হয়েছিল। একটি মন্ত্রপূত গুটিকা ছিল তার। সেটি ধারণ করলেই সে অদৃশ্য বা অশরীরী হয়ে যেতে পারত। আর অদৃশ্য হয়েই যেতে পারত যেখানে খুশি, সে জায়গা যতই দুর্গম বা দুষ্প্রবেশ্য হোক। ঐ শক্তি পেয়ে অহঙ্কারে ফুলে উঠেছিল চন্দ্র। ভাবলে, যখন যেখানে-খুশি যেমন-খুশি যাতায়াত করতে পারি, তখন ঐ দোতালায় সুন্দরী ঐ মেয়েটির ঘরে ঢুকলে কেমন হয়? সম্ভ্রান্ত বড়লোকের মেয়ে, আছে পর্দার ঘেরাটোপে। তা থাক, আমি তো অশরীরী হয়ে তার ঘরে ঢুকব। দরজা বন্ধ থাক, জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে ঢুকব, নয় তো বা কোনো দেয়ালের ছিদ্রপথে। সিদ্ধাইয়ের তেজ দেখাতে গিয়ে চন্দ্র ক্রমে-ক্রমে সেই ধনীকন্যাতে আসক্ত হয়ে পড়ল। ফতুর হয়ে গেল নিঃশেষে। যার জন্যে এত চোটপাট সেই সিদ্ধাইও আর রইল না।

আর গিরিজা? এক দিন শম্ভু মল্লিকের বাগানে বেড়াতে গিয়েছেন ঠাকুর। সঙ্গে গিরিজা। কথা বলতে-বলতে কখন এক প্রহর রাত হয়ে গিয়েছে খেয়াল নেই। পথে এসে দেখেন বিষম অন্ধকার। ঈশ্বরের কথা বলতে-বলতে এত তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন একটা লণ্ঠন চেয়ে আনতে পর্যন্ত মনে ছিল না। এখন যান কি করে? এক প্যা হাঁটেন তো হোঁচট খান, দু'পা হাঁটেন তো দিক ভুল হয়ে যায়। কি হল বলো তো—এখন করি কি?

'দাঁড়াও, আমিই আলো দেখাই।'

সিদ্ধাই হয়েছে গিরিজার। সে পিঠের থেকে আলো বের করতে পারে।

কালীবাড়ির দিকে পিঠ করে দাঁড়াল গিরিজা। আলোর ছটা বেরুল একটা। সেই ছটায় কালীবাড়ির ফটক পর্যন্ত দেখা গেল স্পষ্ট। আলোয়-আলোয় চলে এলেন ঠাকুর। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। গিরিজার আর কিছু হল না। লণ্ঠনই হল, সূর্য হল না।

ভবতারিণী ঠাকুরের শরীরে ওদের সিদ্ধাই সব টেনে নিলেন। ওরা মোহমুক্ত হল। মন থেকে অভিমান মুছে ফেলে দীনভাবে বসল আবার যোগাসনে।

ও সকলে আছে কি ? ও সব তো বন্ধন। মনকে টেনে রাখে, এগোতে দেয় না। জানিস না সেই এক পয়সার সিদ্ধাইয়ের গল্প ?

দু' ভাই। বড় ভাই সন্নেসী হয়ে সংসার ত্যাগ করেছে। ছোট ভাই লেখা-পড়া শিখে সংসার-ধর্ম করছে। বারো বছর পর বাড়ি এসেছে সন্নেসী, ছোট ভাইয়ের জমি-জমা চাষ-বাস কেমন কী হয়েছে তাই দেখতে। ছোট ভাই জিগ্গেস করলে, এত দিন যে সন্নেসী হয়ে ফিরলে তোমার কি হল ? দেখবি ? তবে আয় আমার সঙ্গে। ছোট ভাইকে সন্নেসী নদীর পাড়ে নিয়ে এল। এই দ্যাখ। বলে নদীর জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে গেল পরপারে। খেয়ার মাঝিকে এক পয়সা দিয়ে নৌকোয় করে ছোট ভাইও নদী পেরোল। বড় ভাই বললে, 'দেখলি ? কেমন হেঁটে পেরিয়ে এলুম নদী।' 'আর তুমিও তো দেখলে,' বললে ছোট ভাই, 'আমিও কেমন এক পয়সা দিয়ে দিব্যি নদী পেরোলুম। বারো বছর কষ্ট করে তুমি যা পেয়েছ আমি তা পাই অনায়াসে, মোটে এক পয়সা খরচ করে। তা হলে তোমার ঐ সিদ্ধাইয়ের দাম এক পয়সা !'

আরেক যোগী যোগসাধনায় বাক্‌সিদ্ধি লাভ করেছে। কাউকে যদি বলে, মর্, অমনি মরে যায়। আর যদি বলে, বাঁচ্, অমনি বেঁচে ওঠে। এক দিন দেখে এক সাধু এক মনে ঈশ্বরের নাম জপ করছে। ওহে, অনেকই তো হরি-হরি করলে, কিন্তু পেলে কিছু ? কি আর পাব ? শুধু তাঁকেই চাই, কিন্তু তাঁর কৃপা না হলে কিছুই হবার নয়। তাই করুণা ভিক্ষা করেই দিন যাচ্ছে। ও সব পণ্ডশ্রম ছাড়ো। যাতে কিছু একটা পাও তার চেষ্টা দেখ। আচ্ছা মশাই, আপনি কী পেয়েছেন শুনি ? শুনবে আর কি। দেখ। কাছেই একটা হাতি বাঁধা ছিল, তাকে বললে, মর্। হাতি মরে গেল তক্ষুনি। ফের মরা হাতিকে লক্ষ্য করে বললে, বাঁচ্। অমনি গা-ঝাড়া দিয়ে হাতি উঠে দাঁড়াল। দেখলে ? কি আর দেখলুম বলুন— হাতিটা একবার মলো, আবার বাঁচলো। তাতে আপনার কী এসে গেল ? আপনি কি ঐ শক্তিতে নিজের জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে ত্রাণ পেলেন ?'

'শোন্, এই দিকে আয়।' ঠাকুর এক দিন চুপি-চুপি ডাকলেন নরেনকে। নিয়ে গেলেন পঞ্চবটীর নির্জনে। বললেন, 'তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।'

নরেন নিস্পন্দ, নির্বাক।

'শোন, তোকে বলি। আমার মধ্যে অষ্টসিদ্ধি আবির্ভূত আছে। কিন্তু ও আমি কোনো দিন প্রয়োগ করিনি, করবও না। তোকে ও-সব দিয়ে দিতে চাই—'

'আমাকে ?'

'হ্যাঁ, তুই ছাড়া আর কে আছে ? তোকে অনেক কাজ করতে হবে, অনেক ধর্মপ্রচার। তোরই ও-সব দরকার। তুই ছাড়া কারু সাধ্যও নেই এত শক্তি ধারণ করে। বল্, নিবি ?'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল নরেন। বললে, 'ঐ সব শক্তি আমাকে ঈশ্বরলাভে সাহায্য করবে ?'

কি ভাবলেন ঠাকুর। বললেন, 'না, তা করবে না।'

'তবে ও-সবে আমার দরকার নেই।' নরেনের ভঙ্গিতে ফুটে উঠল অনাসক্তির দৃঢ়তা : 'যা দিয়ে আমার ঈশ্বরলাভ হবে না শুধু লোকমান্য হবে তা দিয়ে আমি কী করব ?'

ঠাকুর হাসতে লাগলেন প্রসন্ন হয়ে।

এক দিন নরেন নিজেই গিয়ে উপস্থিত হল ঠাকুরের কাছে। তার ধ্যানের ফল কি হচ্ছে না-হচ্ছে তাই বুঝিয়ে বলতে। খেতে-শুতে-বসতে সব সময়েই ধ্যান করছে নরেন। কাজকর্মের সময়ে মনের কতকটা ভিতরে বসে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে।

'এ আমার কী হল বলুন তো ?'

'কী হল ?' ঠাকুর প্রফুল্ল বয়ানে হাসলেন।

'ধ্যান করতে বসে আমি দূরের জিনিস দেখতে পাচ্ছি, শুনছি অনেক দূরের শব্দ। দেখছি কোন বাড়িতে বসে কে কি করছে, কে কি বলছে। উঠে-উঠে যাচ্ছি সে-সে বাড়িতে। গিয়ে দেখছি যা দেখেছি আর শুনেছি সব সত্যি। এ আবার কী নতুন খেলা !'

ঠাকুর বললেন, 'এ সব সিদ্ধাই। তোকে ভোলাতে এসেছে। ঈশ্বরলাভের পথে বাধা সৃষ্টি করতে এসেছে। তুই সিদ্ধাই নিবি কেন ? তুই ভগবানকে নিবি। তুই ধ্যানসিদ্ধ হবি। দিন কতক ধ্যান তুই বন্ধ করে রাখ। তার পরে দেখবি ও-সব আর আসবে না। তুই পথ পাবি—নিত্য কালের এগিয়ে যাবার পথ !'

॥ ২৫ ॥

তুমি যেমন আমার মা তেমনি আবার তুমি আমার মেয়ে। তুমি যেমন 'পিতেব পুত্রস্য' তেমনি আবার তুমি সন্তান। তোমার রসের কি আর শেষ আছে ? তুমি যেমন ভক্তিতে আছ প্রেমে আছ তেমনি আছ আবার বাৎসল্যে। শীতল স্নেহরসে। তুমি গুরুর চেয়েও গরীয়ান। তুমি বিশ্বচরাচরের পিতা। তুমি গুহাহিতং, গহ্বরেষ্ঠং। আবার তুমি বুকে-জড়ানো ছোট্ট অপোগণ্ড শিশু। অবোলা দুধের ছেলে।

'আমি একঘেয়ে কেন হব ? আমি পাঁচ রকম করে মাছ খাই। কখনো ঝোলে কখনো ঝালে কখনো অম্বলে কখনো বা ভাজায়।'

আমার নিত্য-নতুন আস্বাদন। তিনি যে রসের অপার পারাবার। রসো বৈ সঃ। তাই রামকে সেবা করবার জন্যে হনুমান সাজি। আবার তাকে স্নেহ করবার জন্যে সাজি কৌশল্যা।

ভক্তের যেমন ভগবান চাই ভগবানেরও তেমনি ভক্ত ছাড়া চলে না। ভক্ত হন রস, ভগবান হন রসিক। সেই রস পান করেন। তেমনি ভগবান হন পদ্ম, ভক্ত হন অলি। ভক্ত পদ্মের মধু খান। ভগবান নিজের মাধুর্য আস্বাদন করবার জন্যেই দু'টি হয়েছেন। প্রভু আর দাস। মা আর ছেলে। প্রিয় আর প্রিয়া।

দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে অনেক সব সাধু-সন্নেসীর আনাগোনা বেড়েছে। পেট-বোরেগীর দল নয়, বেশ উঁচু-থাকের লোকজন। হয়তো গংগাসাগরে চলেছে নয়তো পুরী—মাঝখানে ক'টা দিন দক্ষিণেশ্বরে ডেরা করে যাচ্ছে। স্বচক্ষে দেখে যাচ্ছে গদাধরকে। সর্বতীর্থসারকে। গদাধর কোথাও নড়ে না। সে স্থির হয়ে বসে আপন-মনে গান গায় :

'আপনাতে আপনি থেকো
যেয়ো না মন কারু ঘরে।
যা চা'বি তাই বসে পাবি
খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে ॥'

এক দিন এক অদ্ভুত সাধু এসে হাজির। সংগে জল খাবার একটা ঘটি আর একখানা পুঁথি। সেই পুঁথিই তার একমাত্র বিত্ত। রোজ ফুল দিয়ে তাকে পুজো করে, আর সময় নেই অসময় নেই থেকে-থেকে তাই পড়ে একমনে। 'কি আছে তোমার বইয়ে ? দেখতে পারি ?' গদাধর এক দিন তাকে চেপে ধরল।

দেখল সে বই। বইটির প্রত্যেক পৃষ্ঠায় লাল কালিতে বড়-বড় অক্ষরে দু'টি মাত্র শব্দ লেখা : ওঁ রাম ! আর কিছু নয়, আর কোনো কথা নয়। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা শুধু ঐ একই পুনরাবৃত্তি।

'কী হবে এক গাদা বই পড়ে ? আর, কথাই বা আর আছে কী ?' বললে সেই বাবাজী : 'ঈশ্বরই সমস্ত বেদ-পুরাণের মূল, আর, তাঁতে আর তাঁর নামেতে কোনোই তফাৎ নেই। তাঁর একটি নামেই সমস্ত শাস্ত্র ঘুমিয়ে আছে। কি হবে আর শাস্ত্র ঘেঁটে ? ঐ একটি রাম-নামেই প্রাণারাম।'

এ সাধু বৈষ্ণবদের রামায়েৎ সম্প্রদায়ের লোক। তেমনি আমাদের জটাধারী। গদাধরের তন্ত্রসিদ্ধ হবার পর ১২৭৯ সালে চলে এসেছে ঘুরতে-ঘুরতে। সংগে অষ্টধাতুর তৈরি বালক রামচন্দ্রের বিগ্রহ। আদরের নাম রামলালা।

আর কিছুই ধ্যানজ্ঞান নেই জটাধারীর। অষ্টপ্রহর তাকে নিয়েই মেতে আছে। যেখানে যাচ্ছে সংগে করে নিয়ে যাচ্ছে। এক মুহূর্ত কাছ-ছাড়া নেই। যা পায় ভিক্ষে করে তাই রেঁধে-বেড়ে খাওয়ায় রামলালাকে। শুধু নিয়মরক্ষার নিবেদন নয়। জটাধারী দস্তুরমত দেখে, রামলালা খাচ্ছে, শুধু খাচ্ছে না চেয়ে নিচ্ছে, বায়না করছে। মনে-মনে স্বপ্ন দেখছে না জটাধারী, প্রসারিত চোখের উপরে দেখছে প্রত্যক্ষ। তার রামলালা মূর্তি নয়, মানুষ। বালগোপাল। আর সারাক্ষণ বসে-বসে তাই দেখছে গদাধর। কয়েক দিনেই, কি আশ্চর্য, তারই উপর রামলালার টান

পড়ল। জটাধারীর কাছে যতক্ষণ বসে আছে ততক্ষণ রামলালা ঠিকই আছে, আপন মনে খেলাধুলো করছে। কিন্তু যেই গদাধর নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ায় অমনি রামলালা তার পিছু নেয়।

'কি রে, তুই আমার সঙ্গে চলেছিস কোথা?' ধমকে ওঠে গদাধর: 'তোর নিজের লোকের কাছে, জটাধারীর কাছে, ফিরে যা।'

কথা কানেই তোলে না। নাচ শুরু করে রামলালা। কখনো আগে-আগে কখনো পিছে-পিছে নাচতে-নাচতে সঙ্গে চলে। মাথার খেয়ালে ধাঁধা দেখছে না কি গদাধর? নইলে জটাধারীর পুজা-করা চিরকেলে ঠাকুর, সে জটাধারীকে ফেলে গদাধরের সঙ্গ নেবে কেন? প্রাণে-মনে কী নিবিড় নিষ্ঠায় জটাধারী তাকে সেবা করছে। সেই জটাধারীর চেয়ে গদাধর তার বেশি আপন হল? কিন্তু রামলালা যদি ধাঁধা হয় তবে চোখের সামনে এই গাছ-পালা বাড়ি-ঘর লোক-জন সবই ধাঁধা।

এই দেখ! দু' হাত তুলে কোলে ওঠবার জন্যে আবদার করছে রামলালা।

উপায় নেই। সত্যি-সত্যি কোলে নিতে হয় গদাধরকে।

তার পর এক দিন হয়তো চুপচাপ কোলে বসে আছে, হঠাৎ খেয়াল ধরল, এক্ষুনি কোল থেকে নেমে যাবে। ছুটোছুটি করবে রোদ্দুরে, নয়তো ফুল তুলবে গিয়ে কাঁটা বনে, নয়তো গঙ্গায় নেমে হুটোপুটি করবে।

ছেলের সে কি দুরন্তপনা! কিছুতেই বারণ শুনবে না। ওরে যাসনি, রোদ্দুরে পায়ে ফোস্কা পড়বে, হাতে-পায়ে কাঁটা ফুটবে, সর্দি হবে ঠাণ্ডা লেগে। কে কার কথা শোনে! দূরে দাঁড়িয়ে ফিক-ফিক করে হাসে রামলালা, কখনো বা ঠোঁট ফুলিয়ে দিব্যি মুখ ভেঙচায়।

'তবে রে পাজি, রোস, আজ তোকে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব।' দৌড়ে তার পিছু নেয় গদাধর।

জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে রামলালা। গদাধরও নাছোড়বান্দা। জল থেকে তাকে জোর করে টেনে নিয়ে আসে। এটা-সেটা দিয়ে তাকে ভোলাবার চেষ্টা করে। বলে, ঘরের মধ্যে খেলা কর্, বাইরে কেন? তবুও যদি কথা সে না শোনে, দুষ্টুমি না থামায়, সটান চড়-চাপড় বসিয়ে দেয় গদাধর।

সুন্দর ঠোঁট দু'টি ফুলিয়ে জল-ভরা টলটলে চোখে চেয়ে থাকে রামলালা।

তখন আবার গদাধরের কষ্ট। তখন আবার বুকের মধ্যে মোচড় খাওয়া। তখন আবার তাকে কোলে নাও, আদর করো, মিষ্টি-মিষ্টি বুলি শোনাও।

ভাবের ঘোরে ছায়াবাজি দেখছে না গদাধর, দেখছে অবিকল রক্তে-মাংসে। তার নিজের ব্যবহারেও সেই অবিকল বাস্তবতা।

একদিন নাইতে যাচ্ছে গদাধর, রামলালা বায়না ধরল সেও যাবে। বেশ তো চল্, দোষ কি। কিন্তু সবাইর নাওয়া শেষ হয়, ওর হয় না। কিছুতেই উঠবে না জল থেকে। যত বলো, কানও পাতে না। শেষকালে চটে গিয়ে গদাধর তাকে জলের মধ্যে চুবিয়ে ধরল। বললে, নে, তোর যত খুশি জল ঘাঁট্। কিন্তু তা আর কতক্ষণ! গদাধর লক্ষ্য করল জলের মধ্যে রামলালা শিউরে উঠছে। তখন

তাড়াতাড়ি হাতের চাপ ছেড়ে দিয়ে রামলালাকে বুকে তুলে নিয়ে পাড়ে উঠে এল গদাধর।

আরেক দিন কি আখখুটেপনা করছে রামলালা। তাকে ভোলাবার জন্যে গদাধর তাকে ক'টি খই খেতে দিল। দেখেনি, খইয়ের মধ্যে ধান ছিল আটকে। এখন দেখে, খই খেতে ধানের তুষ লেগে রামলালার নরম জিভ চিরে গেছে। কষ্টে বুক ফেটে গেল গদাধরের। রামলালাকে কোলে নিয়ে সে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগল। যে মুখে লাগবে বলে ননী-সর-ক্ষীরও মা কৌশল্যা অতি সন্তর্পণে তুলে দিতেন, সে-মুখে সে তুলে দিলে কি না ধানশুদ্ধ খই! তার এতটুকুও কাণ্ডজ্ঞান নেই? গদাধর আকুল হয়ে কাঁদে। তার কোলে রামলালাকে কেউ দেখতে পায় না, কিন্তু সবাই দেখে তার এই কান্নার আন্তরিকতা। শোনে তার এই কান্নার কাতরিমা। যে দেখে যে শোনে তারই চোখে জল আসে।

রান্না হয়ে গেছে, জটাধারী খুঁজছে রামলালাকে। ওরে খাবি আয়, কোথায় রামলালা! খুঁজতে-খুঁজতে এসে দেখে গদাধরের ঘরে গদাধরের সঙ্গে খেলা করছে। অভিমান হল জটাধারীর। বললে, 'বেশ ছেলে তুমি! আমি সব রেঁধে-বেড়ে রেখে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আর তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে এখানে বসে খেলা করছ!'

সে-অভিমান বেদনায় গলে পড়ল। 'জানি না? তোমার ধরনই ঐ রকম। দয়ামায়া বলে কিছু নেই। বাবা-মাকে ছেড়ে দিব্যি বনে গেলে, বাবা কেঁদে-কেঁদে মরে গেল তবু একবার তাকে দেখা দিলে না! এমনি তুমি পাষাণ!' বলে জোর করে ধরে নিয়ে গেল রামলালাকে।

কিন্তু গা-জুরি করে কত দিন তাকে ঠেকিয়ে রাখবে? ঘুরে-ঘুরেই আবার ফিরে আসে গদাধরের কাছে। দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে জটাধারীর আর যাওয়া হয় না—কি করে যায়? রামলালা যে ছাড়তে চায় না গদাধরকে। আর রামলালাকেই বা জটাধারী কি করে ছাড়ে? প্রেমাস্পদের চেয়েও প্রেম বড়—শেষ পর্যন্ত বুঝল তাই জটাধারী। সজল চোখে এক দিন তাই দাঁড়াল এসে গদাধরের দোরগোড়ায়।

বললে, 'আমি আজ চলে যাব।'

'যাবে?' চমকে উঠল গদাধর: 'তোমার রামলালা?'

'সে এখান থেকে কিছুতেই যাবে না। তাকে তাই তোমার কাছে রেখে যাব।'

'রেখে যাবে?' খুশিতে উছলে উঠল গদাধর।

'হ্যাঁ, তাইতেই ওর আনন্দ। ও আজকে আমাকে আমার মনোমত মূর্তিতে দেখা দিয়েছে, বলেছে, এখান থেকে ও নড়বে না এক পা। তাই একা-একা আমিই চলে যাচ্ছি। ও তোমার কাছে আছে, তোমার সঙ্গে খেলাধুলো করছে এই ভেবেই আমার সুখ। ও সুখে আছে এই ধ্যানই আমার শান্তি। ওর যাতে আনন্দ তাইতে আমারও আনন্দ। তাই তোমার কাছেই রইল আমার রামলালা।'

রামলালাকে দক্ষিণেশ্বরে রেখে রিক্ত হাতে চলে গেল জটাধারী।

সে এমন প্রেমের সন্ধান পেয়েছে, যে প্রেমে স্বার্থবোধ নেই, তাই বিচ্ছেদও নেই, বেদনাও নেই। যে প্রেমে পরম পূর্ণতা। যে প্রেম সকল ভাবের বড়—মহাভাব।

পূজার চেয়ে জপ বড়। জপের চেয়ে ধ্যান বড়। ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়। ভাবের চেয়ে মহাভাব বড়। মহাভাবই প্রেম। আর প্রেমও যা ঈশ্বরও তাই।

একটি ধাতব মূর্তি এই রামলালা। তাই সবাই দেখত চর্মচোখে। সবার কাছে সে শুষ্ক প্রতীক; গদাধরের কাছে পূর্ণ প্রাণবান। এর আগে রঘুবীরকে সে প্রভুরূপেই আরাধনা করে এসেছে, জটাধারীই তাকে গোপালমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে দেখিয়ে দিল তার বালকমূর্তি। যিনি প্রভু যিনি আরাধনীয়, তিনিই আবার শিশু, আদরণীয়। সম্পর্ক শুধু একটা সেতু। সেই সেতু ধরে চলে আসতে হবে এ-পার থেকে ও-পারে, প্রতীক থেকে প্রত্যক্ষে, মূর্তি থেকে ব্যাপ্তিতে, বিশ্বময়তায়। যে বাইরের দুর্লভ নিধি তাকে নিয়ে আসতে হবে অন্তরে, অন্তরের অন্দরমহলে—আর যে অন্তরের ধন তাকে দেখতে হবে বাইরে এনে, সর্ব জীবে, সমস্ত বিশ্ব-সৃষ্টিতে। সম্পর্ক থেকে চলে আসতে হবে বিরাট বন্ধন-হীনতায়।

'মধুর ভাবসাধনের এই তো আসল তাৎপর্য।' বললে ভৈরবী।

"যো রাম দশরথকি বেটা, ওহি রাম ঘট-ঘটমে লেটা। ওহি রাম জগৎ পশেরা, ওহি রাম সবসে নেয়ারা॥"

রাম শুধু দশরথের ছেলে নয়, সে সমস্ত জীবদেহে প্রকাশিত। আবার অমনি প্রকাশিত হয়েও জগতের সব কিছুর থেকে সে পৃথক, মায়াহীন, নির্গুণ।

ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বানুভু। তিনি যেমন ঘটে তেমনি আকাশে। স্থানে কোথাও তাঁর বিচ্ছেদ নেই, কালে কোথাও তাঁর বিরাম নেই, পাত্রে কোথাও তাঁর বিভেদ নেই। তবু আবার তিনি স্থান-কাল-পাত্রের অতীত। তাঁর অসীম ক্ষমতা, অনন্ত ঐশ্বর্য, অসামান্য প্রতাপ। কিন্তু আমাদের কাছে তাঁর সত্য পরিচয় কোথায়? তিনি সুন্দর, তিনি সরস, তিনি মধুর। তিনি আনন্দ-আকর।

২৬

বাৎসল্য রসের সাধনায় বসে গদাধরের অনুভব হল সে স্ত্রীলোক হয়ে গিয়েছে। সমস্ত স্ত্রীলোকে সে যে মা দেখছে সে-ই এখন সে-মা। মা কৌশল্যা। অন্তরে বিগলিত স্নেহ, অঙ্গে করুণার্দ্র কোমলতা। স্নিগ্ধ থেকে চলে এল সে মধুরে। ধরল সে নারীর আরেক রূপ। সম্পর্কের আরেক সেতু। সাধনের আরেক সোপান। সে এখন প্রিয়া, প্রেমিকা, প্রেমোৎসুকা। সে এখন কৃষ্ণকামিনী গোপাঙ্গনা।

কে বলবে সে মেয়ে নয়! বেশ-বাস সব কিনে দিয়েছেন মথুরবাবু। শাড়ি-ঘাগরা ওড়না-কাঁচুলি থেকে শুরু করে মাথার পরচুলা পর্যন্ত। গায়ে এক সুট সোনার গয়না, পায়ে রুপোর নূপুর। শুধু তাই? চলনে-বলনে চেষ্টায়-কটাক্ষে ভঙ্গে-রঙ্গে সে একেবারে হুবহু মেয়ে। সে সখী, সে দাসী, সে সেবিকা।

দুর্গা পূজার সময় জানবাজারে এসেছে গদাধর। মথুরবাবুদের বাড়িতে। গদাধরের আনন্দের অন্ত নেই। সে মা'র দাসী সেজেছে। শুধু মনে-মনে নয়,

বেশে-বাসে ইঙ্গিতে-ভঙ্গিতে। অন্তরের এক জন হয়ে মিশে গিয়েছে অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে।

কিন্তু সন্ধ্যায় যখন মা'র আরতি হবে তখন গদাধর কোথায়? মথুরবাবুর স্ত্রী, জগদম্বা, খুঁজতে এসে দেখেন গদাধর সমাধিস্থ হয়ে বসে আছে। সখীরূপে সমাধিস্থ। তাকে ঐ অবস্থায় ফেলে কি করে যান তিনি আরতি দেখতে? ভাবে বিহ্বল হয়ে কোথাও পড়ে-টড়ে যান কি না ঠিক নেই। কিছু কাল আগেই এ বাড়িতে অমনি টলে পড়ে গিয়েছিলেন। আর কোথাও নয়, একেবারে গুলের আগুনের মধ্যে। কী করবেন তা হলে?

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এল জগদম্বার। জগদম্বা তার দামী-দামী গয়নাগাঁটি নিয়ে এলেন। একের পর এক পরিয়ে দিতে লাগলেন গদাধরকে। কানের কাছে মুখ এনে বলতে লাগলেন, 'মা'র এখন আরতি হবে। চলো, মাকে চামর করবে না?'

মা'র নামে ধ্যান ভাঙল গদাধরের। দ্রুত পায়ে চলল সে ঠাকুর-দালানের দিকে। সেও পৌঁচেছে অমনি আরতি আরম্ভ হল। আর-আর মেয়েদের সঙ্গে সেও চামর দোলাতে লাগল।

দু' লাইনে ভাগ হয়ে সবিস্ময়ে আরতি দেখছে সব মেয়ে-পুরুষ। কিন্তু মথুরবাবুর বিস্ময়েরই আর শেষ নেই। তাঁর স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে চামর করছে আরেক জন যে স্ত্রীলোক, সে কে? কার স্ত্রী? এত আশ্চর্য সাজ, আশ্চর্য রূপ—সে কোন ঘরের ঘরণী? তাঁর স্ত্রীর বন্ধুদের মধ্যে এত সুন্দরী কেউ আছে না কি?

আরতির শেষে স্ত্রীকে জিগগেস করলেন মথুরবাবু, 'তোমার পাশে দাঁড়িয়ে তখন কে চামর করছিল? বাড়ি কোথায়? কার স্ত্রী?'

'ওমা, তুমি চিনতে পারোনি? উনি বাবা, আমাদের ঠাকুর গদাধর।'

মূক হয়ে গেলেন মথুরবাবু। আশ্চর্য, এত যে কাছের মানুষ, দিন-রাত একসঙ্গে থেকেও তাকে চেনা যায় না!

হৃদয়কে এক দিন অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন। মেয়েদের মধ্যে মেয়ে সেজে বসে আছে গদাধর। মথুরবাবু জিগগেস করলেন, 'বলো দেখি ওই মেয়েদের মধ্যে তোমার মামা কোনটি?'

অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও চিনতে পারল না হৃদয়।

ভৈরবী বললে, 'আমি চিনিয়ে দিতে পারি। যে রাধারানির মত দেখতে সে-ই আমাদের গদাধর। গদাধর যখন সকালে ফুল তুলত দক্ষিণেশ্বরে, কত দিন ওকে আমার রাধারানি বলে ভুল হয়েছে।'

গোপিনীদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কাত্যায়নী। গোপিনীরা তারই পুজো করে আর কৃষ্ণ-বর ভিক্ষে চায়। গদাধরও তাই ভবতারিণীর কাছে গিয়েই সর্বাগ্রে প্রার্থনা করল। মা গো, তোর শক্তিবলে সেই মধুরকে এনে দে। তুই শ্যামা, তুই-ই আবার শ্যাম হ।

কিন্তু সেই মধুরের যে সর্বস্বত্বাধিকারিণী, সেই মহাভাবভাবিনী রাধারানিকে তুষ্ট না করলে চলবে কেন? রাধারানির কৃপা না হলে হবে না কৃষ্ণদর্শন।

রাধারানির জন্যে ধ্যানে বসল গদাধর। নিত্য স্মরণ-মনন করতে লাগল সেই অকাম-প্রেমমূর্তির। আকুল আবেগে অবিরাম বলতে লাগল তাকে : আমাকে দেখা দাও। আমি তোমারই সখী, তোমারই সঙ্গিনী। আমাকে বঞ্চনা কোরো না। অদর্শনের বিরহ যে কি তা তো তুমি জানো—

রাধারানি দেখা দিল। নাগকেশরের মত গায়ের রং। সে এক গৌরগৌরবোজ্জ্বল মূর্তি। সে মূর্তি ধীরে-ধীরে এসে মিলিয়ে গেল গদাধরের শরীরে। গদাধর রাধারানি হয়ে গেল। যা রাধা তাই ধারা। যা ধারা তাই রাধা।

কেঁদে আকুল হচ্ছে শ্রীমতী। ওলো, আমার কৃষ্ণকে এনে দে। না এনে দিবি তো আমাকে সেখানে নিয়ে চল। দিন গুনতে-গুনতে নখের ছন্দ ক্ষয় হয়ে গেল—আমার সেই কৃষ্ণচন্দ্রের উদয় হল কই? সেই কৃষ্ণ মেঘকে কবে দেখতে পাব? আর দেখবই বা কি দিয়ে? মোটে দুটি মাত্র তো চোখ—তায় তাতে আবার নিমিখ, তাতে আবার বারিধারা। ওলো নিমিখে নিমিখ নাহি সয়। আমি দেখব কি করে?

সুচির-বিরহের নায়িকা। নিরুপাধি প্রেম, অথচ অনির্বেয় বিরহ। এত যেখানে যন্ত্রণা, সেখানে তাকে ভুলে থাকলেই তো হয়! হায় হায়, তাকে ভুলব কি করে? যখন জল-আহরণে যাই, তখন যমুনা দেখি। যদি গৃহে থাকি, দূরে দেখি সেই গিরি-গোবর্ধন। যদি বনে যাই দেখি সেই কুঞ্জকুটির। শুনি সেই বেণুধ্বনি। তাকে ভুলব কি করে? তাকে বাইরে পাই না বলে অন্তরে অনুসন্ধান করি। সেইখানেই তাকে দেখি, শুনি, ছুঁই, আঘ্রাণ করি। সেই তো আমার মানস-সাক্ষাৎকার। আমার মানস-মহোৎসব। বল্ সই, যিনি অন্তরের অন্তরতম, তাঁর সঙ্গে কি সর্বাংশে বিরহ হতে পারে? তবু, কেন, কেন এই বিরহ? যাকে অন্তরে পাই তাকে বাইরে পাব না কেন? যে নিরাধার সে কেন হবে না আধারভূত? কেন দাঁড়াবে না এসে চোখের সামনে?

ওলো, শুনেছিস, তাকে গভীর-নিবিড় করে পাব বলেই না কি এই বিরহ। বিরহই হচ্ছে প্রেমরূপা ভাবনা। প্রেমরূপা জীবিকা। মিলনে মন প্রিয়তমে অভিনিবিষ্ট হতে চায় না; সে কেবল এক লীলা ছেড়ে আরেক লীলার সন্ধান করে, এক বিলাস ছেড়ে আরেক বিলাস। কিন্তু বিরহে সমস্ত সৃষ্টিই যে তদ্‌গত-সমাহিত। মিলনে সে সংক্ষিপ্ত, বিরহে পরিব্যাপ্ত। মিলনে আমি একা, বিরহে ত্রিভুবন আমার সহচর। তাই তো কৃষ্ণ বললেন গোপিনীদের, আমাকে কাছে পেয়ে যত স্বাদ তার চেয়ে বেশি স্বাদ আমাকে ধ্যান ক'রে। মধুধারার মতই এই ধ্যানধারা।

প্রেমের মত আছে কি! এই বিশ্বসংসার ভগবানের অধীন, কিন্তু ভগবান প্রেমের অধীন। সর্বস্বাধীন ভগবান প্রেমের কামনায় ভক্তের দুয়ারে এসে হাত পাতেন। তিনি তো আপ্তকাম, তাঁর কি কিছু অভাব আছে? তবে তিনি ভক্তের কাছে প্রেম ভিক্ষা চান কেন? চান, এ তাঁর অভাব বলে নয়, এ তাঁর স্বভাব বলে। প্রেমই পুরুষার্থ। বাইরে বিষজ্বালা, ভিতরে অমৃতময়। শীতও আছে আবার আচ্ছাদনও আছে। আচ্ছাদন আছে বলে শীত সুখকর, আবার শীত আছে বলে আচ্ছাদন আরামপ্রদ। তেমনি মিলনের আকাঙ্ক্ষায় বিরহ আনন্দময়, আবার বিরহের

উৎকণ্ঠায় মিলনও আনন্দময়। তবু মিলনের চেয়ে বিরহ অধিকতর। মিলনে শুধু সঙ্গ, বিরহে যেমন স্মৃতি তেমনি আবার আশা। প্রথমে যদি বা দুঃখ, পরিপাকে আনন্দ। আর সেই আনন্দই পরাকাষ্ঠা। গদাধর এখন সেই আনন্দময়ী বিরহিণী।

প্রেমের যে এই আনন্দ, এ কি ভক্তের নিজের আস্বাদের জন্যে? না গো না, এ ভগবানের আস্বাদের জন্যে। এ রস তত মিঠা যত এর জ্বাল বেশি। এতে যত আর্তি তত আপ্তি।

চার রকম প্রেম। এক দিক থেকে ভালোবাসা, তার নাম একাঙ্গী। তার মানে এক পক্ষ চায়, অন্য পক্ষ গ্রাহ্যও করে না। যেমন হাঁস আর জল। হাঁস জলকে ভালোবাসে, জল হাঁসকে চায় না। আরেক রকম প্রেম আছে, তার নাম সাধারণী, যেখানে শুধু নিজের সুখ চায়। তুমি সুখী হও বা না হও, বয়ে গেল। এখানে নায়িকা শুধু আত্মসুখের জন্যে নায়ককে প্রিয়জ্ঞান করে। যেমন চন্দ্রাবলী। তৃতীয় হচ্ছে সমঞ্জসা। সমান-সমান। আমারও সুখ হোক তোমারও সুখ হোক। নায়কের সুখ চাই বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের সুখের দিকে সমান লক্ষ্য। সর্বশেষ, বা, সর্ব-উচ্চ প্রেমের নাম সমর্থা। আত্মসুখ চাই না, শুধু তোমার সুখ হোক। আমার যাই হোক না-হোক, তুমি সুখে থাকো। এই হচ্ছে শ্রীমতীর ভাব। শ্রীমতীর তাই সমর্থা রতি। শুধু কৃষ্ণসুখে সুখী। কৃষ্ণৈকনিষ্ঠা। কৃষ্ণময়ী বলেই তো সে শ্রীমতী। মূর্তিময়ী মাধুরী।

তোমাকে সব দেব। কুল আর শীল, ধৈর্য আর লজ্জা, দেহ আর আত্মা, ইহকাল আর পরকাল। কিছু চাই না বিনিময়ে। আমার প্রেম ধর্মাধর্মের অতীত। ধর্মের অতীত, কেননা তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ নেই। অধর্মেরও অতীত, কেননা আমি তোমারই স্বরূপশক্তি। তাই, "যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি।" আমি ছাড়া তুমি নেই। আবার তুমি ছাড়াও আমি নেই। আর সকল সম্বন্ধে একে-একে দুই, শুধু প্রেমেই দুইয়ে মিলে এক।

কে বলবে গদাধর রাধিকা নয়? রূপ যেন ফেটে পড়ছে। শুধু বেশবাসে বা হাবভাবে নয়, মহাভাবে। রাধিকার মতই সে জয়শ্রীমূর্তিধারিণী। তার দেহ যেন অমৃতবর্তিকা। কিন্তু যতই কেননা রূপ দেখছ, সব সেই কৃষ্ণের প্রতিচ্ছায়া। "তোমার গরবে গরবিণী আমি, রূপসী তোমার রূপে।"

মনই শরীরকে তৈরি করে। মনে যেমন ভাব মুখে তেমনি আভা। হনুমানের ভাবে থেকে ল্যাজের সূচনা হয়েছিল গদাধরের। এখন স্ত্রী-ভাবে থেকে তার রোমকূপ থেকে নিয়মিত সময়ে রক্তক্ষরণ হতে লাগল।

পদ্মলোচন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। বললেন, 'এ সব উপলব্ধি বেদ-পুরাণকে ছাড়িয়ে গেছে।'

সে কেন মেয়ে হয়ে জন্মাল না, প্রথম কৈশোরে মনে-মনে আক্ষেপ করেছে গদাধর। মেয়ে হলে গোপিনীদের মত দিব্যি ভজনা করতে পারত কৃষ্ণকে। এক দিন তাকে পেয়েও যেত শেষ পর্যন্ত। এই পুরুষদেহটাই তার সে সাধনার বাধা। যদি আরেক বার জন্ম নিতে হয়, সে ঠিক মেয়ে হয়ে জন্মাবে। ব্রাহ্মণের ঘরের সুন্দরী বালবিধবা হয়ে। কৃষ্ণ ছাড়া আর কাউকে পতি বলে জানবে না। ছোট্ট

একটি কুঁড়ে ঘরে সে থাকবে আর থাকবে তার দূর সম্পর্কের বুড়ো পিসি বা মাসি। ঘরের পাশে সামান্য একটু জমি, তাতে শাক-সব্জি ফলাবে। দিন গুজরাবে চরকা কেটে। গোয়ালে থাকবে একটি গরু, দুধ দুইবে নিজের হাতে। সেই দুধে ক্ষীর-সর করে গলা ছেড়ে কাঁদতে বসবে। ওরে আমার কৃষ্ণ, খাবি আয়। তোকে নিজের হাতে খাওয়াব বলে এ সব করেছি আমি, বসে আছি কখন থেকে। এত সেবা এত কান্না—সে কি নিষ্ফল হতে পারে? কৃষ্ণ গোপবালকের বেশে এসে দেখা দেবে, তার হাতের থেকে খেয়ে যাবে চুপি-চুপি। এমনি এক-আধ দিন নয়, প্রত্যহ।

কিশোরকালের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি বটে, কিন্তু এখন, সাধনার আরো উচ্চ ভূমিতে এসে গদাধরের শ্রীকৃষ্ণদর্শন হল। আর, ভগবানের ভাবই হচ্ছে এই মধুর ভাব। এই ঘনানন্দময় মধুর ভাবেই তাঁর মতি, রতি, অবস্থিতি। এই মধুর ভাবের সাধনায় শেষ শিখরে এসে গদাধর দেখলে, ঘাস থেকে আকাশ পর্যন্ত সমস্ত কৃষ্ণ। এমন কি, সে নিজেও বাসুদেব। যে রাধা সেই মাধব। কৃষ্ণই দুই অংশে সমান ভাবে বিভক্ত হয়েছেন—প্রিয় আর প্রিয়া, ভগবত্তা আর ভক্তি।

মাটির থেকে একটা ঘাসফুল ছিঁড়লেন ঠাকুর। বললেন ভক্তদের, 'তখন যে কৃষ্ণমূর্তি দেখতাম, এই রকম তার গায়ের রঙ।'

সামান্য ঘাসফুলেও তাঁর লাবণ্যলিখন।

ভাগবত পাঠ শুনেছে গদাধর। হঠাৎ জ্যোতির্ময়মূর্তি শ্রীকৃষ্ণকে দেখল সামনে। দেখল তাঁর পা থেকে জ্যোতির একটা ছটা বেরিয়ে এসে প্রথমে ভাগবত স্পর্শ করলে, পরে এসে লাগল তার নিজের বুকে। এর তাৎপর্য কি? বুঝতে দেরি হল না। ভাগবত, ভক্ত আর ভগবান এক। একেই তিন, তিনেই এক।

* ২৭ *

ও কে স্নান করছে রে গঙ্গায়? কালী-মন্দিরে পূর্বমুখ হয়ে ধ্যান করছে গদাধর, তার মনশ্চক্ষে এক সন্ন্যাসীর মূর্তি ভেসে উঠল। নাগা সন্ন্যাসী। কটিতে একটা কৌপীন পর্যন্ত নেই। মাথায় দীর্ঘ জটা, তেজঃপুঞ্জ কলেবর। গঙ্গায় নেমে স্নান করছে।

ধ্যানে এ সে কী দেখল? গদাধর চলল ঘাটের দিকে। ঠিকই দেখেছে। দীর্ঘকায় জটাজুটধারী উলঙ্গ এক সন্ন্যাসী তার সামনে এসে দাঁড়াল। দহনোত্তীর্ণ স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল।

'আরে, এই তো পাওয়া গেছে যোগ্য লোক।' গদাধরকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠল সন্ন্যাসী। বললে, 'সাধন-ভজন কিছু করবে?'

গদাধর তো অবাক। কিসের সাধন-ভজন?

'ভাবাতীত অরূপের সাধন। বেদান্তসাধন। যাকে বলে ব্রহ্মবিদ্যালাভ। করবে?'

'তার আমি কী জানি!'

'তুমি কী জানো মানে ? তবে কে জানে ?'

'আমার মা জানে।'

'কে তোমার মা ?'

মন্দিরের দিকে ইংগিত করল গদাধর। বললে, 'ঐ পাষাণময়ীই আমার মা।'

বিদ্রূপের সূক্ষ্ম একটু হাসি খেলে গেল সন্ন্যাসীর মুখে। ও তো একটা মূর্তি, একটা পুত্তলিকা। ও আবার মা হয় কি করে ? ঈশ্বর এক, সত্য। দেবদেবী সব ভ্রম।

মুখের উপর কিছু বললে না স্পষ্ট করে। বললে, 'বেশ, যাও, তোমার মাকে জিগ্‌গেস করে এস্। শোনো, বেশি যেন দোর করে ফেলো না। বড় জোর তিন দিন এখানে থাকব। তিন দিনের বেশি থাকি না কোথাও এক দণ্ড। এরি মধ্যে দীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।'

গদাধর কতক্ষণ তাকিয়ে রইল সন্ন্যাসীর দিকে। বললে, 'আচ্ছা, আপনি কি তোতাপুরী ?'

'কি আশ্চর্য ! তুমি আমার নাম জানলে কি করে ?'

হ্যাঁ, আমি তোতাপুরী। পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় আমার মঠ ছিল। চল্লিশ বছর ধরে সাধনা করেছি। নর্মদাতীরে দুশ্চর তপস্যায় নির্বিকল্প সমাধি হয়েছে আমার। হয়েছে ব্রহ্মসাক্ষাৎ। ব্রহ্মজ্ঞ হবার পর তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছি। গংগাসাগর আর শ্রীক্ষেত্র দর্শন করে আমি এসেছি দক্ষিণেশ্বরে। মাত্র তিন দিনের জন্যে। আমি শক্তি-ভক্তি মানি না। আমি আছি বিশুষ্ক জ্ঞানের কাণ্ডে। আমি বেদান্তবাদী। আমার নিরাকার ব্রহ্মসাধনা।

গদাধর চলে এল ভবতারিণীর দুয়ারে। বললে, 'মা, তোতাপুরী বলছে নিরাকার সাধনা করতে। করব ?'

'করবে বৈ কি।' আদেশ হল মা'র। 'তোমাকে শেখাবার জন্যেই সে এসেছে।'

কিন্তু বামনির বড় আপত্তি। সে বলে, ওই ন্যাংটার কাছে তুমি ঘেঁষো না। ও তোমার সমস্ত ভাব-টাব নষ্ট করে দিয়ে শুকনো দড়ি বানিয়ে ছাড়বে।

বানাক না। ভাবরাজ্যের চরম ভূমিতে এসেছি। এবার ভাবাতীত অদ্বৈতভূমিটা বেড়িয়ে আসি একবার। মেয়েরা তত দিনই পুতুল খেলে, যত দিন তাদের বিয়ে না হয়। বিয়ে হয়ে যখন স্বামী পায় তখন পুতুলগুলি প্যাঁটরায় পুঁটলি বেঁধে তুলে রাখে। তেমনি ঈশ্বরলাভ হলে আর প্রতিমার দরকার হয় না। সাকার-নিরাকার দুই-ই লাগে। কেউ সাকার থেকে নিরাকারে আসে। কেউ নিরাকার থেকে সাকারে। রসুনচৌকিতে দুই-ই লাগে। পোঁও লাগে, সানাইও লাগে। পোঁ-এর শুধু এক সুর—সে যেন নিরাকার। আর সানাইয়ে বাজছে কত রাগ-রাগিণী। ঈশ্বরকে নানা ভাবে সম্ভোগ।

তা ছাড়া, মা'র আদেশ হয়েছে। গদাধর সটান চলে এল তোতার কাছে। বললে, 'হ্যাঁ, মা মত দিয়েছে। দীক্ষা নেব। আমাকে চেলা করুন আপনার।'

'গুরু মিলে লাখ তো চেলা মিলে এক।' উল্লসিত হয়ে উঠল তোতা। বললে, 'প্রথমে শিখা-সূত্র ত্যাগ করে যথাশাস্ত্র সন্ন্যাস নিতে হবে তোমাকে।'

'নেব। কিন্তু গোপনে।'

'গোপনে কেন ?'

'বছর খানেক হল আমার মা এখানে এসে রয়েছেন। এ মা আমার গর্ভধারিণী মা। সব সংস্কার বিসর্জন দিয়ে যদি পাকাপাকি ভাবে সন্ন্যাস নিই, আর মা যদি জানতে পারেন তবে বড় আঘাত পাবেন।'

এ হচ্ছে বারশো একাত্তর সালের কথা। বছর খানেক আগে থেকেই এখানে আছেন চন্দ্রমণি। যে সংসারে গদাধর নেই সে সংসার তাঁর কাছে অসার। তাই তিনি বাকি জীবন গদাধরের কাছেই কাটিয়ে দিতে চান গঙ্গাতীরে। আছেন নহবৎখানায়। গদাধরকে দেখতে পাচ্ছেন চোখের উপর—এর বেশি আর কিছু তাঁর চাইবার নেই।

মথুরবাবু এমনিতে খুব হাত-টান, অথচ গদাধরের বেলায়, কেন কে জানে, তাঁর উদারতার অন্ত নেই। সে উদারতা চন্দ্রমণির দুয়ার পর্যন্ত এগিয়ে এল। একদিন মথুরবাবু বললেন, 'আচ্ছা ঠাকুমা, তুমি তো কোনো সেবা নিলে না আমার থেকে ?'

'আমার অভাব কোথায় ?' হাসলেন চন্দ্রমণি।

'তবু কিছু নাও না চেয়ে। যা তোমার খুশি।'

'কি চাইব ? চাইবার আমার কি আছে ! খাবার-পরবার এতটুকু কষ্টও তো তুমি রাখোনি।'

তবু মথুরবাবু পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। আমার বুঝি কিছু দিতে ইচ্ছে করে না তোমাকে ? যা মন চায় একটা কিছু নাও না।

যার গদাধর আছে তার আবার চাইবার আছে কি ? তবু মথুরবাবুর পীড়াপীড়িতে কিছু একটা না চেয়ে থাকতে পারলেন না। বললেন, 'যদি নেহাৎ দেবেই তবে আমাকে চার পয়সার দোক্তা কিনে দাও।'

এমন নির্লোভ মা হলে এমন নিষ্কাম ছেলে হয় ! সেই মা যদি টের পান ছেলে সমস্ত সংসার-সম্পর্ক ঘুচিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছে তবে সইবেন কি করে ?

তোতাপুরী বললে, 'বেশ গোপনেই দীক্ষা দেব। কেউ জানতে পাবে না।'

সর্বাগ্রে নিজের প্রেত-পিণ্ড দাও। শ্রাদ্ধাদি করে সংযত হয়ে অবস্থান করো। পঞ্চবটীর সাধন-কুটিরে জড়ো করো সব উপচার। শুভ-মুহূর্তের উদয় হলে খবর দেব।

এল সেই ব্রহ্ম মুহূর্ত। সপ্ত শিখা মেলে জ্বলে উঠল হোমাগ্নি।

সম্যক প্রকার ত্যাগের নাম সন্ন্যাস। এ সর্বস্বত্যাগ ঈশ্বরার্থে। কিন্তু কী তোমার আছে যে ত্যাগ করবে ? দেহ-মন-ইন্দ্রিয় কিছুই তোমার আপনার নয়। যার নিজের বলতে কিছু নেই, সে ত্যাগ করবে কী ?

তাই ত্যাগ করবার জন্যে অর্জন দরকার। আগে অর্জন কর—অর্জন কর আত্মবিভূতি। সকল জগৎকে আত্মবোধে প্রাণময় করে তোলো। এই বিশ্বরূপকে নিজের রূপ বলে অনুভব করো। সেই অনন্ত অনুভূতির মধ্যে নিজেকে বিসর্জন দাও। এই-ই ত্যাগ, এই-ই সন্ন্যাস। যার সেই ঐশ্বর্য নেই, বিভূতি নেই, সে ত্যাগ করবে কী ? সে তো দীনহীন ভিক্ষুক।

কী যে প্রার্থনীয় তাই মানুষ জানে না, তাই ধন-জন কাম-যশ চেয়ে বসে। চাওয়া আর পাওয়া দুই-ই ভ্রান্তিবিলাস—কেননা পেলেও অভাব মেটে না। কী পেলে যে তার শান্তি হয় তা সে জানে না বলেই ওসবের পিছু নেয়। শুধু খবর পায় না বলেই অলিতে-গলিতে ঘোরে। যদি একবার আনন্দময় ঈশ্বরসত্তার খবর পেত, প্রহ্লাদের মত যদি স্ফটিক-স্তম্ভেও হরি দেখত, তা হলে আর মণি ফেলে কাচ কুড়োত না। মধুর জ্ঞান নেই বলেই গুড় খোঁজে। সর্বদেশে সর্বদিকে সর্বাবস্থায় নিয়ত মধু ক্ষরণ হচ্ছে এই উপলব্ধিই ঈশ্বরোপলব্ধি।

তোতাপুরী মন্ত্র পাঠ করতে লাগল।

দৃঢ়াসীন হয়ে বোসো। তদ্গত মনে শোনো। সমিদ্ধ হুতাশনে আহুতি দাও। প্রার্থনা করো।

হে যজ্ঞপতি, হে পরমাত্মন, আমার সমস্ত প্রাণবৃত্তি তোমাকে আহুতি দিচ্ছি, তুমি আমাতে প্রকাশিত হও। তুমি তো নিত্যকালের প্রকাশ, একবার আমার হয়ে প্রকাশ পেয়ে ওঠো। অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মবস্তু আমাতে দীপ্যমান করো। বুঝতে দাও তুমিও যা আমিও তা। কোনো দ্বৈত নেই, সর্বত্র এক অখণ্ড চৈতন্য মাত্র বিদ্যমান। জীব আর ঈশ্বর একই অদ্বিতীয় পরম তত্ত্বের দুইটি পৃষ্ঠা। দাও আমাকে সেই একত্ববোধের চেতনা।

তার পর শুরু হল বিরজা হোম।

আমার দেহ যে পঞ্চভূতে তৈরি সে ভূতপঞ্চ শুদ্ধ হোক। শুদ্ধ হোক আমার কোষ-পঞ্চ, অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় আনন্দময় কোষ। শুদ্ধ হোক পঞ্চবায়ু—প্রাণ, অপান, সমান, উদান আর ব্যান। পঞ্চেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে যে পঞ্চবিষয়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস আর গন্ধ, তাও শুদ্ধ হোক। শুদ্ধ হোক আমার দেহ আর মন, বাক্য আর কর্ম, শুদ্ধ হোক আমার নিরোধ-সমাধি। হে জ্বালামালী, হে সর্বদেবমুখ বৈশ্বানর, আমার মধ্যে জাগ্রত হও। হে সর্বার্থসাধক, আমার অভীষ্টলাভের পথে যত বাধা আছে সব বিনাশ করো। দাও আমাকে সেই সম্যক প্রজ্ঞা, যাতে গুরুদত্ত জ্ঞান নিরন্তর জাজ্বল্যমান থাকে। আমি স্ত্রী-পুত্র ধন-মান রূপ-যৌবন কিছুই চাই না। আমার সমস্ত বাসনা তোমাতে আহুতি দিয়ে নিঃশেষে ত্যাগ করছি। আমি নিজেই এখন সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম। যে ভাবে ঈশ্বর সমাহিত আমিও এখন সেই সর্বতো-নিরাবরণ সর্ব-প্রশান্ত পরমানন্দময়, মহদাত্মভাবে নিমগ্ন। হে অর্চিষ্মান, আমি এখন শিখাহীন বিশুদ্ধ জ্যোতি। নিরবয়ব আভা।

নবজন্মে দীক্ষা হল গদাধরের।

রূপ থেকে চলে এল অরূপে। অল্প থেকে ভূমায়। পরিমিত থেকে নিরতিশয়ে। আকার থেকে অকায়ে।

শিষ্যকে নতুন কোপীন আর কাষায় দিল তোতাপুরী। বললে, এবার তোমাকে নতুন নাম দেব।

'আমার নামও বদলে যাবে ?'

'শুধু নাম নয়, পদবীও বদলে যাবে। তুমি এখন সম্পূর্ণ নতুন। নতুন দেশে তুমি নতুন জন্মালে।'

গদাধর তাকিয়ে রইল আবিষ্টের মত।

'হ্যাঁ, এখন থেকে তোমার নাম রামকৃষ্ণ। সন্ন্যাস যখন দীক্ষা নিলে, অর্থাৎ কি না, যখন শ্রী-তে অধিষ্ঠিত হলে, তুমি শ্রীরামকৃষ্ণ। আর পদবী? পদবী পরমহংস। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। পরমহংস কাকে বলে জানো তো?'

'জানি।' আবিষ্টের মতই বললে গদাধর: 'দুধে-জলে একসঙ্গে থাকলেও যিনি হাঁসের মত জলটি ছেড়ে দুধটি নিতে পারেন। বালিতে-চিনিতে একসঙ্গে থাকলেও যিনি পিঁপড়ের মত চিনিটুকু নিতে পারেন।'

ঠিক বলেছ। তিনিই পরমহংস। খোসাটি ছেড়ে সারটি নাও। খণ্ড ছেড়ে অখণ্ডকে। উপাধি ছেড়ে নিত্যবস্তুকে।

'জানিস, পরমহংস দুই রকম।' ঠাকুর এক দিন বললেন গিরিশ ঘোষকে: 'জ্ঞানী পরমহংস আর প্রেমী পরমহংস। যিনি জ্ঞানী পরমহংস, তিনি আপ্তসার—ভাবখানা, একলা আমার হলেই হল। কিন্তু যিনি প্রেমী পরমহংস, তাঁর একলার হলেই সুখ নেই—ঈশ্বরকে পেয়ে তার সংবাদ দিয়ে যেতে চান জনে-জনে। কেউ আম খেয়ে মুখটি পুঁছে ফেলে, কেউ বা আর পাঁচজনকে দেয়। পাতকো খোঁড়বার সময় যে সব ঝুড়ি-কোদাল আনা হয়, খোঁড়া হয়ে গেলে কেউ সেগুলো ঐ পাতকোতেই ফেলে দেয়; কেউ বা তুলে রেখে দেয় যদি পাড়ার লোকের কারুর দরকারে লাগে। নারদ-শুকদেব ওঁরা পরের জন্যে ঝুড়ি-কোদাল তুলে রেখেছিলেন।'

গিরিশ ঘোষ বললে, 'আপনিও তেমনি। আপনি তবে আমাকে আশীর্বাদ করুন।'

'আমি কে? আমি কেউ নয়। তুমি মাকে বলো, মাকে ডাকো, হয়ে যাবে।'

'হয়ে যাবে? কিন্তু আমি যে পাপী, ঘোরতর পাপী।'

ঠাকুর বিরক্ত হলেন। বললেন, 'ও কথা মুখেও এনো না। যে নিজেকে সব সময়ে কেবল পাপী-পাপী বলে সে পাপীই হয়ে যায়। বলো, আমি মা'র সন্তান, আমি মাকে ধরেছি—আমার আবার পাপ কী!'

'বলছি। কিন্তু আপনি আমার হয়ে একটু বলুন—'

'আমি বলব কি! আমি কে! আমি কেউ নয়। আমি খাই-দাই তাঁর নাম করি। তোমার যদি আন্তরিক হয়—'

'সেই তো কথা। ঐ আন্তরিকটুকুই তো নেই। ঐটুকু যদি দেন—'

'আমি কে! নারদ-শুকদেব ওঁরা হতেন, তাহ'লে না-হয়—'

'নারদ-শুকদেবকে পাব কোথায়! আমরা পাচ্ছি শ্রীরামকৃষ্ণকে।'

ঠাকুর হাসতে লাগলেন। বললেন, 'যো-সো করে একটা কিছু ধরলেই হয়! আসল হচ্ছে বিশ্বাস, আসল হচ্ছে শরণাগতি।'

এবার ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা হও। বললেন তোতাপুরী।

বললেন, নাম আর রূপের সীমার মধ্যে মায়া খণ্ডিত হয়ে আছে, সে সীমা লঙ্ঘন করে চলে এস নিজ লোকে, ব্রহ্মসাধর্ম্যে। তোমার নিজের মধ্যে অবস্থিত যে আত্মতত্ত্ব তাকে আবিষ্কার করো। তোমার সীমিত আমিকে ব্রহ্মানুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত করো। স্বসত্তাবোধের লোপ নয়, স্বসত্তাবোধের প্রতিষ্ঠা। এই অদ্বৈতবাদ। এই আত্মবোধ জাগানোতেই অদ্বৈতবাদের সার্থকতা। আমি ক্ষুদ্র নই আমি নীচ নই, আমি মহান, আমি ভূমা এই উদার উচ্চবোধই আত্মবোধ। আত্মবোধই আনন্দ। আর, আনন্দই সৎ।

আবার বললেন, বোঝো ভালো করে। জীব মাত্রই ঈশ্বরের আভাস। জীব প্রতিবিম্ব, ঈশ্বর বিম্বস্থানীয়। আসলে জীব আর ব্রহ্ম অভিন্ন। জীব ব্রহ্মের পরিণাম। আবার জীবের পরিণাম ব্রহ্ম। এই জ্ঞানেই আত্মস্বরূপের স্ফূর্তি। এই জ্ঞানই মোক্ষ। এখন তুমি চার দিকে ঈশ্বরকে দেখছ, কিন্তু এ সাধনায় তুমি আর চার দিকে তাকাবে না, দিকবিদিকের ভাব ভুলে কেবল এক দিকে, একমাত্র ঈশ্বরের দিকেই তাকাবে। চার দিকে ফিরে-ফিরে চার দিকে ঈশ্বরকে দেখাও তো চঞ্চলতা। কিন্তু এ সাধনায় চিত্ত নিশ্চল হয়ে একাগ্র হয়ে কেবল সেই এক-কেই দেখবে। তখন আর তোমার পৃথকত্ব থাকবে না। ঈশ্বরের ভিতরেই তোমার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হবে। ঈশ্বরে যে শাশ্বতী শান্তি তাই অবস্থিতি করবে তোমাতে।

কিন্তু আমাকে কী করতে হবে তাই বলো না। প্রশ্ন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

তোমাকে বসতে হবে এখন নির্বিকল্প সমাধিতে। সেই গুণাতীত নির্বিশেষের তপস্যায়।

যার চেয়ে দূরবর্তী কিছু নেই, যার চেয়ে নেই কিছুই নিকটবর্তী; যার চেয়ে সূক্ষ্মতর কিছু নেই, যার চেয়ে নেই কিছুই মহত্তর, আকাশে বৃক্ষের মত যিনি স্তব্ধ ভাবে বিরাজমান, যিনি এক—দেশ, কাল ও বস্তু এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদশূন্য—অদ্বিতীয়, সেই অসংগ পুরুষের ধ্যান করো। বলো, আমার এই ক্ষীণ প্রাণস্পন্দন তোমার মহান প্রাণের সংগে যোজনা করে দাও, এই ক্ষুদ্র প্রাণ তোমার বিরাট প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হোক। তোমার অন্তরের স্বভাবের সংগে আমার অন্তরের পরিচয় করিয়ে দাও। তোমার নামে আমার কাজ নেই, তোমার রূপে আমার কাজ নেই, তোমার স্বভাবটি আমার স্বভাব হোক।

সমাধিতে বসল রামকৃষ্ণ।

শরীর আর ইন্দ্রিয়ের সংগে মনের চরম স্থিরতার নামই সমাধি। যখন ধ্যাতা নিজেকে ভুলে গিয়ে কেবল ধ্যেয় বিদ্যমানতা উপলব্ধি করে তখনই সে সমাহিত। কিন্তু রামকৃষ্ণ চিত্ত একবার স্থির করছে কি, ধ্যানচক্ষে জগদম্বা এসে উদয় হয়েছেন। কিছুতেই নামের বা রূপের গণ্ডি পেরিয়ে বেরিয়ে আসতে পারছে না। যেই মনকে একাগ্র ভূমিতে নিয়ে আসছে অমনি মন রূপময় হয়ে উঠছে। আমি ভোক্তাও

নই ভোজ্যও নই, আমি শুধু ভোজন, এই নির্বিতর্ক চেতনায় মন নিশ্চল হচ্ছে না।

'ও আমার হবে না।' চোখ মেলল রামকৃষ্ণ।

'কেঁও হোগা নেহি ?' ধমকে উঠলেন তোতাপুরী। হতেই হবে। রূপের পদ্ম-সরোবর পেরিয়ে চলে আসতে হবে অরূপের মহাসমুদ্রে।

এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল তোতা। কুটিরের বাইরে এক টুকরো ভাঙা কাচ চোখে পড়ল। তাই কুড়িয়ে এনে রামকৃষ্ণের কপালের উপর, ঠিক ভুরু দু'টির মাঝখানে টিপে ধরল সজোরে। বললে, 'মনকে ঠিক এই বিন্দুতে গুটিয়ে আনো।'

আবার সংকল্পহীন হবার সংকল্পে নিয়ে ধ্যানে বসল রামকৃষ্ণ। আবার জগদম্বা আবির্ভূত হলেন। কিন্তু এবার আর রামকৃষ্ণ অভিভূত হবে না। স্বস্থানে নিয়তাবস্থ থাকবে। যেই জ্ঞান নিরংশ, নিরবচ্ছিন্ন, সেই জ্ঞানে সমাসীন থাকবে। মূর্তি থেকে চলে আসবে সে ভাবে, আকার থেকে একাকারে। মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল আস্তে-আস্তে—আর কোথাও কোনো বিকল্প বা বিশেষের লেশ রইল না। নিষ্কল-নির্মল, শান্ত ও সর্বাতীত এক রাজ্যে এসে রামকৃষ্ণ স্তব্ধ হয়ে গেল। এই অদ্বৈত-সাধনার সমাধি।

তোতা চুপচাপ বসে রইল পাশে। এক মনে দেখতে লাগল শিষ্যকে। বিন্দুমাত্র কম্পন নেই, নিশ্বাসও পড়ছে না বোধ হয়। এক জ্যোতির্ময় মৌনে আবৃত হয়ে আছে। আরূঢ় হয়ে আছে এক জ্যোতির্ময় উপলব্ধিতে।

দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে এল তোতাপুরী। পঞ্চবটীতে নিজ আসনে নিশ্চল হয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। সাড়া পেলেই খুলে দেবে দরজা।

কিন্তু সাড়াও নেই শব্দও নেই। থাক, যতক্ষণ পারে, থাক ঐ ব্রহ্মাস্বাদে তন্ময় হয়ে। কিন্তু কতক্ষণ থাকবে ? দিন শেষ হল, রাতও প্রায় যায়-যায়। তোতাপুরী ভাবলে, এখন কী করি! 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং, ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু'—তাই হল না কি রামকৃষ্ণের ? না, ভয় কিসের ? ঐ দিব্য দীপাধার যার দেহ তার সম্বন্ধে ভুল হবে কী! তোতাপুরী আরো এক দিন—আরো এক রাত অপেক্ষা করল। তবু রামকৃষ্ণের ডাক এসে পৌঁছুলো না। দেহ কোনো প্রয়োজনেরই জানান দিল না। ব্যাপার কি, বেঁচে আছে তো ? দরজা খুলে একবার দেখবে না কি অবস্থাটা ? কিন্তু, কে জানে, কী অবস্থায় না-জানি দেখতে হবে। যাক আরো এক দিন—হয়তো এরি মধ্যে ডাক এসে পড়বে। সেই দিনও এখন যেতে চলেছে। তবুও কুটির তেমনি নিঃসাড়, নিশ্বাসশূন্য। তোতাপুরী আর নিশ্চেষ্ট থাকতে পারল না। নিজের আসন ছেড়ে উঠে পড়ল। স্তব্ধীভূত রামকৃষ্ণ শিলীভূত হয়ে গেল না কি ? এখনো বেঁচে আছে তো ? না, কি—জোর করে খুলে ফেলল দরজা। কোথায় রামকৃষ্ণ ?

যেমন বসিয়ে গিয়েছিল তেমনি বসে আছে স্থির হয়ে। দেহে প্রাণের প্রকাশ পর্যন্ত নেই। নেই নিশ্বাসের আভাস-লেশ। অথচ শরীরে তপ্ত দীপ্তি, মুখে জ্যোতির্ময় প্রসন্নতা। নিরুদ্ধাবস্থায় প্রশান্ত হয়ে বসে আছে। বসে আছে

নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মত। বসে আছে আত্মজ্ঞানে আত্মদর্শনে বিভোর হয়ে। ব্রহ্মে লগ্ন, লিপ্ত, লীন হয়ে।

সংমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল তোতাপুরী। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে চাইল না। চল্লিশ বছর সাধনা করে সে যে সমাধিতে উত্তীর্ণ হয়েছে, রামকৃষ্ণের পক্ষে তা তিন দিনেই সম্ভব হল ? নাকের নিচে হাত রাখল, রামকৃষ্ণের নিশ্বাস পড়ছে না। বুকের উপর হাত রাখল, হৃৎস্পন্দন হচ্ছে না। বারংবার স্পর্শেও বিকার জাগছে না চেতনার। যেন ঊর্ধ্ব-অধঃ-মধ্য সমস্ত আত্মবোধে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। আর এর নামই তো নির্বিকল্প সমাধি।

"ঊর্ধ্বপূর্ণমধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকং,
সর্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্।"

'ইয়ে ক্যা দৈবী মায়া!' বিস্ময়ে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল তোতাপুরী। দেবতার এ কী আশ্চর্য মায়া, শুধু একবারের চেষ্টায়, মাত্র তিন দিনের মধ্যেই, রামকৃষ্ণের নির্বিকল্প সমাধি হয়ে গেল!

এখন সমাধিভূমি থেকে নামিয়ে আনতে হয়। তোতাপুরী রামকৃষ্ণের কানে 'হরি ওম্' মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল পঞ্চবটী। রামকৃষ্ণ চোখ মেলল।

তিন দিন থাকবার কথা, একটানা এগারো মাস থেকে গেল তোতাপুরী। এমন আধার পেয়েছে, তাকে সহজে ছেড়ে যেতে মন উঠল না। ঠিক করল তাকে নির্বিকল্প ভূমিতে দৃঢ়াসনে বসিয়ে দিয়ে যাবে।

রামকৃষ্ণ তাকে ডাকত 'ল্যাংটা' বলে। তোতাপুরীর যেমন বালকত্ব উলঙ্গতায়, রামকৃষ্ণেরও তেমনি বালকত্ব ঐ সম্বোধনে। সর্বক্ষণ ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকে তোতাপুরী। বর্ষা হোক বাদল হোক ধুনির নির্বাণ নেই। খাওয়া বলো, শোওয়া বলো, সব এই ধুনির ধারটিতে। ধুনিকেই আরতি করে সকাল-সন্ধ্যা, ভিক্ষার অন্ন ধুনিকেই প্রথমে অর্ঘ্য দেয়। ধুনির পাশেই সমাধিতে বসে, ধুনির পাশেই ঘুমোয়। উলঙ্গ আকাশের নিচে এই উলঙ্গ অগ্নিই তার দেবতা। সম্পত্তির মধ্যে একটি লোটা আর চিমটা আর একটি চর্মাসন। আর, সত্যি যখন ধ্যান করছে তখন লোকে ভুল করে ভাবুক যে সে লম্বা হয়ে ঘুমোচ্ছে, তার জন্যে গা মুড়ি দেবার চাদর।

লোটা আর চিমটা রোজ মাজা চাই তোতাপুরীর। তাই ব্রহ্মলাভ হবার পরও তার নিত্যি ধ্যানাভ্যাস চাই। চাই যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম।

রামকৃষ্ণ একদিন বললে, 'ব্রহ্মলাভের পর আবার নিত্যি এই ধ্যানাভ্যাস কেন?' ঝকঝকে করে মাজা লোটার দিকে ইঙ্গিত করল তোতাপুরী। বললে, 'নিত্যি মাজি বলেই ওর অমন উজ্জ্বল চেহারা। যদি না মেজে ফেলে রাখি তবে ময়লা ধরে যাবে। মনও সেই রকম। অভ্যাসযোগে নিত্যি তার মার্জনা চাই। মেজে-ঘষে না রাখলেই তা মলিন হয়ে যাবে।'

কথাটা মনের মত, সন্দেহ নেই। কিন্তু এরও পরে আরও কথা আছে। রামকৃষ্ণ তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল গুরুর দিকে। বললে, 'কিন্তু লোটা যদি সোনার হয়?'

ঠিকই তো, তা হলে আর মাজতে লাগবে কেন ? নিকৃষ্ট ধাতুর পিতলের ঘটিই মাজতে হয় প্রত্যহ।

তোতাপুরী হাসল। বললে, 'কিন্তু সংসারে সোনার লোটা ঐ একটিই।

দু'জনে ধুনির ধারে বসে আছে। অদ্বৈত ধ্যানে প্রায় অচেতন হয়ে। কে একটা লোক কলকেতে তামাক ধরাবার জন্যে আগুন খুঁজছিল। সে হঠাৎ ধুনির কাঠ টেনে আগুন নিতে বসল। তোমরা চোখ বুজে ধ্যান করছ তা করো, আমার একটু চোখ বুজে তামাক খেতে দোষ কি।

আরামে তামাক খাবার উপায় নেই। তোতাপুরীর সব চেয়ে যে পবিত্র জিনিস সেই ধুনিতে সে হাত দিয়েছে। এত বড় অনাচার সইতে পারবে না তোতা। মুহূর্তে টুটে গেল তার ধ্যান। পাবকের মতই সে ক্রোধে জ্বলে উঠল, গালি-গালাজ করতে লাগল। তাতেও ক্ষান্তি নেই, মারতে গেল চিমটে তুলে।

'দূর শালা ! দূর শালা !' অর্ধবাহ্যদশায় হেসে উঠল রামকৃষ্ণ।

লোকটাকে বলছে না—যেন তাকে বলছে, এমনি মনে হল তোতাপুরীর। আর, সেই লোকটা এখন কোথায় ? তাড়া খেয়ে সটকান দিয়েছে। কিন্তু এতে এত হাসবার আছে কী ? অন্যায় দেখলে হাসি ? হেসে একেবারে গড়াগড়ি দিচ্ছে রামকৃষ্ণ।

'এত হাসছ কেন ? লোকটার অন্যায়টা একবার দেখলে না ?'

'দেখলুম। সেই সঙ্গে তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের দৌড়টাও দেখলুম। এই বলছিলে, ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় সত্তাই নেই—জীব মাত্রই ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। তবে আবার সেই ব্রহ্মরূপী জীবকেই মারতে উঠেছ ? তাই হাসছি, মায়ার কি প্রভাব !'

তোতাপুরী গম্ভীর হয়ে গেল। ভেবে দেখল, কাম ত্যাগ করলেও ক্রোধ ত্যাগ হয়নি। তাই বললে, 'তুমি ঠিক বলেছ। ক্রোধ ত্যাগ হয়নি। আজ থেকে ত্যাগ করলুম ক্রোধ।'

গুরু মিলে তো লাখ, চেলা মিলে এক—ঠিকই বলেছে তোতাপুরী। সকল গুরুর গুরু এই রামকৃষ্ণ।

একটা ফড়িঙের পাখায় কে একটা কাঠি ফুঁড়ে দিয়েছে। নিশ্চয়ই কোনো দুষ্টু ছেলের কাজ। রামকৃষ্ণের মন ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল। পরক্ষণেই সে হাসির রোল তুললে। বললে, 'তুমিই তোমার দুর্দশা করেছ। তুমিই ফড়িং, তুমিই সেই দুষ্টু ছেলে।'

কালীবাড়ির বাগানে নতুন ঘাস উঠেছে। রামকৃষ্ণ অনুভব করলে ও যেন তার নিজের অংগ। কে-একটা লোক হেঁটে যাচ্ছিল ওখান দিয়ে, যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল রামকৃষ্ণ : 'ওরে যাসনি, যাসনি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, সইতে পারছি না—'

গংগার ঘাটে ঝগড়া করছে মাঝিরা। ঝগড়া থেকে হাতাহাতি। এক জন আরেক জনের পিঠে সজোরে চড় মেরে বসল। রামকৃষ্ণ দাঁড়িয়েছিল ঘাটে, চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল হঠাৎ। ভয়ের কান্না নয়, যন্ত্রণার কান্না।

কালীঘর থেকে শুনতে পেল হৃদয়। কি হয়েছে ? ছুটে এল ঘাটের চাঁদনিতে। দেখল রামকৃষ্ণের পিঠ ফুলে লাল।

'এ কি, কে তোমাকে মেরেছে ? বলো, তাকে একবার আমি দেখে নিই।'

কিছুই বলে না, রামকৃষ্ণ শুধু কাঁদে। অনেক পরে শান্ত হয়ে বললে, 'এক মাঝি আরেক মাঝিকে মেরেছে, আমাকে নয়। কিন্তু সেও তো আমাকেই মারা। নইলে আমার লাগল কেন? কাঁদলাম কেন এতক্ষণ?'

এই অদ্বৈত ভাব। সে ভাবে তুমিও নেই আমিও নেই। একও নেই দুইও নেই। অর্থাৎ সীমাও নেই সংখ্যাও নেই। শুধু একটি বিমল বোধের ঘনতা। এইটিই আত্মবোধ। নিরবধি গগন থেকে ক্ষুদ্র ধূলিকণা পর্যন্ত পরিব্যাপী আত্মময়তা। এই ভাবনাতীত ভাবসমুদ্র দূর থেকে দেখেই কেউ ফিরে আসে, কেউ ছোঁয় কি না-ছোঁয়, আর কেউ যদি তার জল খেতে পায় এক চুমুক তার যে কী হয় তা সে নিজেও জানে না। নারদ দূর থেকে দেখেই ফিরেছিল। শুকদেব শুধু ছুঁয়েছিল। আর শিব তিন গণ্ডুষ জল খেয়েছিল সাহস করে। খেয়ে অবধি কি হয়েছে কে জানে। শব হয়ে পড়ে আছে। সেই অদ্বৈত ভাবের ভূমিতে যদি এক মুহূর্তের জন্যেও কেউ পৌঁছুতে পারে তবেই তার নির্বিকল্প সমাধি।

এক-আধ দিন নয়, একটানা ছ'মাস রামকৃষ্ণ ছিল এই নির্বিকল্প অবস্থায়। খুব বেশি একুশ দিন থাকলেই শরীর নস্যাৎ হয়ে যায়—সেখানে ছয় মাস! কি দেখছে কি শুনছে কেউ জানে না। নুনের পুতুল যেন সমুদ্র মাপতে নেমেছে। যেই নামা অমনি গলে যাওয়া!

বিচার যেখানে এসে থেমে যায় তাই ব্রহ্ম। যাকে দেখে আর দেখবার নেই, যাকে জেনে আর জানবার নেই, যা হয়ে আর হবার নেই। কিন্তু কী তুমি দেখলে কী তুমি জানলে কী তুমি হলে বোঝাও তোমার সাধ্য কি। সংসারে আর সব জ্ঞেয় বস্তু এঁটো হয়ে গেছে। বেদই বলো আর পুরাণই বলো, কত পঠন-পাঠন কত বিচার-বিতর্ক হয়ে গেছে মুখে-মুখে। কত উচ্চারণ, কত বিশ্লেষণ। কিন্তু ব্রহ্ম? ব্রহ্মই একমাত্র অনুচ্চারিত। ব্রহ্মই একমাত্র অনুচ্ছিষ্ট।

কখন কোন দিক দিয়ে দিন আসছে, কোন পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে রাত, খেয়াল থাকছে না রামকৃষ্ণের। আগে-আগে সমাধিতে 'মা'-'মা' বলে কাঁদত, এখন বাক্যমনের পরপারে চলে এসেছে। জাগরণও নয়, স্বপ্নও নয়, সুষুপ্তিও নয়—চলে এসেছে স্বরূপবোধের স্তব্ধতায়। নাকে-মুখে মাছি ঢুকছে, তবু সাড় আসছে না শরীরে। ধুলোয়-ধুলোয় চুলে জট পাকিয়ে যাচ্ছে। অসাড়ে শৌচাদি হয়ে যাচ্ছে তবু চেতনা নেই। শূন্যও নয়, অশূন্যও নয়, সর্ব জগতে চিন্মাত্রবিস্তার।

আর সেই চেতনায় শিব শবীভূত।

শরীর ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল রামকৃষ্ণের। কিন্তু কোত্থেকে এক সাধু এসে হাজির তখন দক্ষিণেশ্বরে। হাতে একগাছা মোটা লাঠি, তাই দিয়ে থেকে-থেকে মারতে শুরু করল রামকৃষ্ণকে।

'কি, খাবি না কি? একশো বার খেতে হবে।' মারে আর শাসায় সেই সাধু। বলে, 'ওই দেহ অমনি করে নষ্ট করতে দেব না। ওই দেহে মার এখনো অনেক কাজ আছে। বাকি আছে অনেক লোক-কল্যাণ। নে, ওঠ্‌ খা—' বলে আবার মার।

এমনি করে হুঁস আনবার চেষ্টা করছে। মারের চোটে যেই একটু হুঁস আসছে, অমনি খাবার গুঁজে দিচ্ছে মুখের মধ্যে। এমনি করে বাঁচিয়ে রাখছে। এমনি করে এক-আধ দিন নয়, ছয় মাস।

তার পর এক দিন জগদম্বা দেখা দিলেন। বললেন, 'এবার নেমে আয়। এখন থেকে ভাবমুখে থাক। লোকশিক্ষার জন্যে ভাবৈশ্বর্য ধারণ কর।'

রামকৃষ্ণের রক্ত-আমাশা হল। সেই রোগে ভুগে-ভুগে ক্রমে-ক্রমে দেহে মন নামল।

'ছাদে কতক্ষণ লোক থাকতে পারে? তার পর আবার নেমে আসে। সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি—নি-তে কতক্ষণ থাকা যায়? আবার সা-তে নেমে আসে। সমাধিস্থ হয়ে যে ব্রহ্মকে দেখে, নেমে এসে সে আবার দেখে জীব-জগৎ সব তিনিই হয়েছেন। যিনি ব্রহ্ম তিনিই ভগবান। ব্রহ্ম গুণাতীত, ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। এই জীব জগৎ মন বুদ্ধি ভক্তি জ্ঞান ত্যাগ বৈরাগ্য সব তাঁরই ঐশ্বর্য। ব্রহ্ম জ্ঞান-মুখে, ভগবান ভাব-মুখে। আমাদের ভাব-মুখের ভাবনাটিই ভালো। তার ঘর-দুয়ার আছে, ধন-দৌলত আছে—তাই তার এত নাম-ডাক! আর ব্রহ্মটি দেউলে, বাউণ্ডুলে। যে বাবুর ঘর-দুয়ার নেই সে বাবু আবার কিসের বাবু!

বাবুরাম ঘোষ, পরে যিনি স্বামী প্রেমানন্দ নামে প্রসিদ্ধ, এক রাতে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে এক ঘরে শুয়ে আছে। হঠাৎ কিসের শব্দে বাবুরামের ঘুম ভেঙে গেল। কান খাড়া রেখে শুনল কে যেন হাঁটছে ঘরের মধ্যে। আর কে? ঠাকুরই অস্থির হয়ে ঘরের মধ্যে পাইচারি করে বেড়াচ্ছেন। পরনের কাপড় বগলের নিচে গুটানো। পাইচারি করছেন আর বলছেন উত্তেজিত হয়ে: 'ও সব আমি চাই না। ও সব তুই ফিরিয়ে নিয়ে যা। ছিঃ, ও দিয়ে আমার কী হবে?'

তরুণ শিষ্য বাবুরাম বিস্ময়ে কাঠ হয়ে আছে।

আবার পাইচারি। আবার সেই সঘৃণ প্রত্যাখ্যান।

কতক্ষণ পরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল রামকৃষ্ণ। বাবুরাম জিগ্গেস করলে, 'তখন ও রকম করছিলেন কেন?'

'ও! তুই দেখে ফেলেছিস না কি? মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে যেতে দেখি, ঘরে মা এসেছেন। হাতে একটা থলে। বললেন, থলের মধ্যে যা-কিছু আছে, সব তোর, তোর জন্যে এনেছি। নে, হাত পাত। কি এনেছিস? তাকিয়ে দেখি, থলের মধ্যে নাম-যশ, লোকমান্য। থলের থেকে মুখ বার করে রয়েছে। উঃ, সে কী বীভৎস দেখতে! চেঁচিয়ে উঠলাম, তুই ও-সব ফিরিয়ে নিয়ে যা, ফিরিয়ে নিয়ে যা। আমি ও-সব চাইনে। আমাকে লোভ দেখাসনে, তোর পায়ে পড়ি—'

'তার পর?'

'তার পর আর কি। মা একটু হাসলেন। চলে গেলেন থলে নিয়ে।'

* ২৯ *

'আরে, কেঁও রোটি ঠোকতে হো ?'

হাততালি দিতে-দিতে হরিনাম করছে রামকৃষ্ণ। সকাল সন্ধেয় যেমন চিরকালের অভ্যাস। হয় হরিবোল, হরিবোল, নয় তো হরি গুরু, গুরু হরি। হয় আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, নয় তো মন কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ।

নির্বিকল্প সমাধি লাভ করে এ সব আবার কী ছেলেমানষি !

বিরক্ত হল তোতাপুরী। ঠাট্টা করে বললে, 'হাত চাপড়ে-চাপড়ে রুটি তৈরি করছ না কি ?'

'দূর শালা ! আমি ঈশ্বরের নাম করছি—শুনতে পাচ্ছ না ?'

'ঈশ্বরের নাম করছ তো তালি দিচ্ছ কেন ?'

কেন দিচ্ছে কে জানে। বেশি ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। ও-সব ভাবের ব্যাপার কিছুই বুঝবে না তোতাপুরী। সে ব্রহ্ম নিয়েই মশগুল। তার সঙ্গিনী যে মায়া, যে ভাবরূপিনী শক্তি, তার খবর সে রাখে না। বিচার-বিতর্কে ঈশ্বরকে শুধু সন্ধানই করা যায়, তাকে যে ভালোবাসা যায়, তার জন্যে যে কেউ কাঁদতে পারে, নাচতে পারে—এ তার ধারণার অতীত। সে মনন-চিন্তন বোঝে, কীর্তন-ভজন বোঝে না। শম-দম বোঝে, বোঝে না বাৎসল্য-মাধুর্য। ভক্তি তার কাছে নিছক প্রলাপোচ্ছ্বাস। বুদ্ধির বিক্লিন্ন বিকার। সে অভীঃ। তার ধুনির আগুনের মত সে মায়াশূন্য, নিষ্কলঙ্ক।

গভীর রাত্রে ধ্যানে বসবার উদ্যোগ করছে তোতাপুরী। মন্দিরচূড়ায় একটা পেঁচা ডাকছে। থমথম করছে চার পাশ। হঠাৎ দীর্ঘাকার একটা লোক গাছ বেয়ে নিচে নেমে এল। দাঁড়াল এসে সামনে। এ কি, এ যে তারই মত উলঙ্গ।

'কে তুমি ?' জিগগেস করল তোতাপুরী।

'আমি ভূত—ভৈরব। গাছের উপর থাকি। এই দেবস্থান রক্ষা করি। কিন্তু তুমি কে ?'

বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না তোতা। বললে, 'তুমিও যা, আমিও তা।'

'আমি তো ভূত।'

'হলেই বা। তুমিও ব্রহ্মের প্রকাশ, আমিও ব্রহ্মের প্রকাশ। আমাতে-তোমাতে কোনো তফাৎ নেই। বোসো এসে পাশে। ধ্যান করো।'

নিমেষে মিলিয়ে গেল ভূত।

পরদিন তোতা বলল সব রামকৃষ্ণকে।

'জানি। অনেক বার দেখেছি তাকে।' রামকৃষ্ণ উদাসীনের মত বললে।

'বলো কি ? দেখেছ ? ভয় পাওনি ?'

'ভয় পাব কেন ? আমাকে কত সে ভবিষ্যৎ বলে দিয়েছে। সেবার কি হয়েছিল জানো না বুঝি—?'

বারুদ-ঘর করবার জন্যে কোম্পানি পঞ্চবটীর জমি নেবে ঠিক করেছিল। একটু

নির্জনে বসে মাকে ডাকি, তাও উঠে যাবে? কোম্পানির বিরুদ্ধে মথুর খুব লড়লে একচোট। মামলায় কে হারে কে জেতে তখন সেটা একটা সঙিন অবস্থা। এমন সময় একদিন রাত্রে দেখি ভৈরবটি পা ঝুলিয়ে বসে আছেন গাছে। 'কি খবর?' ইশারায় বললে, ভয় নেই। মামলায় হেরে যাবে কোম্পানি। হলও তাই। কোম্পানি ডিসমিস খেয়ে গেল।

তুমি জ্ঞানে নির্ভয়, আমি ভালোবাসায় নির্ভয়। তুমি ব্রহ্ম পেয়ে ব্রহ্ম নিয়েই থাকো। আমি ব্রহ্ম পেয়ে জীব নিয়ে থাকব। তোমার আগেও জ্ঞান পরেও জ্ঞান। আমার ভক্তি থেকে জ্ঞান। আবার জ্ঞান থেকে ভালবাসা। আমার কখনো পূজা কখনো জপ কখনো ধ্যান কখনো শুধু নামগুণগান। কখনো বা দু'হাত তুলে নৃত্য। আমি শাক্তদেরও মানি, বৈষ্ণবদেরও মানি, আবার বেদান্তবাদীদেরও মানি। আজকালকার ব্রহ্মজ্ঞানীদেরও মানি। তুমি একরোখা, একঘেয়ে। আমি বিচিত্র। আমি বহুল। আমার সর্বসমন্বয়।

ভক্তি-ভালবাসা না মানলে কি হয়, তোতাপুরী যখন রামকৃষ্ণের গান শোনে, কেঁদে ফেলে।

ভক্তির বীজ আর যায় না। যতই জ্ঞান-চাপা দাও, আঁকুর থেকে ফুল-ফল হবেই। হাজার জ্ঞান বিচার করো, আবার ঘুরে-ফিরে 'মা'-'মা', আবার ঘুরে-ফিরে হরিবোল, হরিবোল! তুমি অদ্বৈতজ্ঞান নিয়ে নিশ্চল হয়ে বসে থাকো। আমি অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে কাজ করি। আমার কত কাজ, কত কথা। আমি না বললে শুনবে কে? আমি না করলে করবে কেন? আর এই আমিটি আমি নয়, কেউ নয়। সকলই তিনি, সকলই তুমি। তিনিটি জ্ঞান। আর তুমিটি ভালবাসা।

'অদ্বৈতভাব কেমন জানিস? যেমন, ধরো, অনেক দিনের পুরোনো চাকর। মনিব তার উপর খুব খুশি। তাকে সকল কথায় বিশ্বাস করে, সব বিষয়ে পরামর্শ করে। একদিন করলে কি—তার হাত ধরে নিজের গদিতেই বসাতে গেল। কি কর, কি কর—চাকর তো সঙ্কোচে এতটুকু। আঃ, বোস না—মনিব তাকে জোর করে টেনে বসিয়ে দিল। বললে, তুইও যে, আমিও সে। অদ্বৈতভাব এই রকম।'

পদ্মলোচন প্রকাণ্ড বৈদান্তিক। দেশজোড়া প্রসিদ্ধি। বর্ধমান-রাজার সভা-পণ্ডিত হয়ে আছে। রামকৃষ্ণ ধরল মথুরবাবুকে। বললে, আমাকে একবার বর্ধমান নিয়ে চলো। পণ্ডিতকে একবার দেখে আসি।

যেখানে পাণ্ডিত্য আর ভক্তি একসঙ্গে মিশেছে, সেখানে তো ভগবানের অধিষ্ঠান। সেই তো তীর্থক্ষেত্র। সেইখানেই তো হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

যেতে হল না রামকৃষ্ণকে। পদ্মলোচনই চলে এল কামারহাটি। দক্ষিণেশ্বরের কাছে। শরীর সারাবার জন্যে রয়েছে গঙ্গাতীরে।

'একবার গিয়ে পণ্ডিতের খোঁজ নিয়ে আয় তো।' হৃদয়কে বললে রামকৃষ্ণ।

'সে আবার কে?'

জানিস না বুঝি? প্রকাণ্ড সাধক। ঈশ্বরপ্রেমিক। বিদ্যেবুদ্ধিতে প্রচণ্ড, আবার ভক্তিতে মেদুর। যেমন সদাচার ইষ্টনিষ্ঠা তেমনি আবার ঔদাসীন্য আর

ঔদার্য। যেমন সরল তেমনি স্পষ্টবাদী। একবার রাজসভায় তর্ক উঠল, শিব বড় না বিষ্ণু বড়? মীমাংসা হচ্ছে না, ডাকো পদ্মলোচনকে। পদ্মলোচন এসে বললে, তার আমি কি জানি! আমার চোদ্দ পুরুষে কেউ শিবও দেখেনি বিষ্ণুও দেখেনি। বড়-ছোট বলব কি করে? যার কাছে যে বড় তার কাছে সেই বড়।

'গিয়ে কি করতে হবে?' জিগ্‌গেস করল হৃদয়।

'গিয়ে দেখে আয় তার মধ্যে অভিমান আছে কি না।'

হৃদয় গিয়ে দেখে এল পদ্মলোচনকে। বললে, 'সে তোমার জন্যে বসে আছে। আমাকে তোমার ভাগ্নে জেনে কত খাতির।'

তক্ষুনি চলল রামকৃষ্ণ। জীবন ফুরিয়ে যাচ্ছে, যা কিছু সৎসঙ্গ করবার করে নাও। দিন থাকতে-থাকতে দেখে নাও দিনমণিকে। পদ্মলোচন দেখল তার দুয়ারে পদ্মপলাশলোচন এসেছে।

পরস্পরকে দেখে গলে গেল দু'জনে। শুরু হল কথার হোলিখেলা। রামকৃষ্ণ গান করলে। পদ্মলোচন কেঁদে আকুল।

'এত জ্ঞানী আর পণ্ডিত,' বললেন একদিন ঠাকুর, 'তবু আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কান্না! জানিস, কথা কয়ে এমন সুখ আর পাইনি কোথাও।'

আর পদ্মলোচন বললে, 'ঝুড়ি-ঝুড়ি বই পড়ে যা জেনেছি ও এক পৃষ্ঠা না উলটিয়েও তার চেয়ে বেশি জেনেছে।'

বেদান্তবাদী হলে কি হয়, পদ্মলোচন তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ। ইষ্টদেবীর শক্তিবলে তর্কে সে সর্বজয়ী। কিন্তু এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটু রহস্য ছিল। সব সময়েই তার কাছে থাকত একটি জলে-ভর্তি গাড়ু আর একখানি গামছা। তর্কে প্রবৃত্ত হবার আগে সেই জলে সে মুখ ধুয়ে নিত। ব্যস, একবার মুখ ধুয়ে নিতে পারলেই সে কেল্লা মেরে দিয়েছে। কেউ আর হারাতে পারবে না তাকে। তার প্রাধান্যই অক্ষুণ্ণ থাকবে। একটা অত্যন্ত সাধারণ আচরণ। বাগদেবীকে জিহ্বাগ্রে আনবার আগে এই একটু মুখ-ধোওয়া। কিন্তু বিষয়টা কি, রামকৃষ্ণ বুঝতে পারল। জগদম্বা বলে দিলে।

সেদিন তর্কে প্রবৃত্ত হবার আগে পদ্মলোচন যথারীতি মুখ ধুতে উঠেছে। কিন্তু কোথায় গাড়ু-গামছা? বা, তার গাড়ু-গামছা কি হল? মুখ না ধুয়ে সে শাস্ত্রালোচনা শুরু করে কি করে? সে কি কথা? তার গাড়ু-গামছা কে নিল? এইখানেই তো ছিল—

আর কে নেবে! রামকৃষ্ণই লুকিয়েছে।

'কি, আরম্ভ করো মীমাংসা!' রামকৃষ্ণ হাসতে লাগল মৃদু-মৃদু।

'কি আশ্চর্য!' পদ্মলোচন তো হতবাক: 'তুমি জানলে কি করে? তবে তুমি কি অন্তর্যামী?'

পদ্মলোচনের দুই চোখ জলে প্লাবিত হয়ে গেল। করজোড়ে স্তব করতে লাগল রামকৃষ্ণকে। পরে বললে, 'আমি নিজে এক সভা বসাব। ডাকাব সব পণ্ডিতদের। বলব তুমি ঈশ্বরাবতার—দেখি কে কাটতে পারে আমার কথা।'

সে-সভা আর বসাতে পারেনি পদ্মলোচন। তার অসুখ ক্রমশই বৃদ্ধির মুখে।

একদিন বললে রামকৃষ্ণকে, 'ভক্তের সংগ করব এ কামনা ত্যাগ কোরো, নইলে নানা রকমের লোক এসে তোমায় পতিত করবে।'

রামকৃষ্ণ হাসল। বললে, 'পতিত-অভাজনদের মধ্যেই তো এখন ঠাঁই নেব। আমাকে আবার পতিত করবে কে ?'

দক্ষিণেশ্বরে মথুরবাবু বিরাট ব্রাহ্মণ-বিদায়ের আয়োজন করেছেন। এক হাজার মণ চাল বিলোনো হবে, সংগে বহু বিচিত্র খাদ্যসম্ভার, সোনা-রুপোও যথেষ্ট। গাইয়েও নিমন্ত্রিত হয়েছে অনেক, যার গানে যত বেশি ভাব হবে রামকৃষ্ণের তাকে তত বেশি টাকা দেবেন—শয়ে-শয়ে টাকা, সংগে শাল, ক্ষৌমবস্ত্র। মথুরবাবুর ইচ্ছে পণ্ডিত পদ্মলোচনকে নিমন্ত্রণ করে। কিন্তু সে যেমন গোঁড়া, হয়তো নেবে না নিমন্ত্রণ। রামকৃষ্ণকে বললে, 'তুমি একবার দেখ না বলে।'

'হ্যাঁ গা, তুমি যাবে না দক্ষিণেশ্বর ?' পদ্মলোচনকে জিগগেস করল রামকৃষ্ণ।

পরম নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ। অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী। বললে, 'তোমার সংগে হাড়ির বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসতে পারি। কৈবর্তের বাড়িতে সভায় যাব, এ আর কি বড় কথা !'

কিন্তু শরীরে শেষ পর্যন্ত কুলোল না। রামকৃষ্ণের থেকে বিদায় নিয়ে কাশী চলে গেল। আর ফিরল না।

সিঁতির বাগানে আরেক পণ্ডিত এসেছে। নাম দয়ানন্দ সরস্বতী। আর্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। রামকৃষ্ণ গেল তার সংগে দেখা করতে। যেখানে প্রসিদ্ধি সেখানেই ঈশ্বরের বিভূতি। আর যেখানেই ঈশ্বরের বিভূতি সেখানেই রামকৃষ্ণের স্বীকৃতি। 'কেমন দেখলেন সরস্বতীকে ?'

'দেখলুম শক্তি হয়েছে—বুক লাল। কথা কইছে খুব, যাকে বলে বৈখরী অবস্থা। ব্যাকরণ লাগিয়ে শাস্ত্রবাক্যের ব্যাখ্যা করছে। নিজে একটা কিছু করব, একটা মত চালাব, এই অহঙ্কার ষোলো আনা।'

'আর জয়নারায়ণ পণ্ডিত ?'

'আহা, তার কথা বোলো না। এত বড় বিদ্বান, এক বিন্দু অহঙ্কার নেই। নিজের মৃত্যুর কথা টের পেয়েছিল আগে থেকে। টের পেয়ে বললে, কাশী চললুম।'

আর এঁড়েদার কৃষ্ণকিশোর বিশ্বাসে একেবারে আগুন। কি ? একবার তাঁর নাম করেছি, আমার আবার পাপ ? অসম্ভব।

'যে গরু বাচকোচ করে খায় সে ছিড়িক-ছিড়িক করে দুধ দেয়। আর যে গরু শাক-পাতা খোসা-ভুষি যা দাও গব-গব করে খায়, সে হুড়হুড় করে দুধ দেয়।'

কৃষ্ণকিশোরের ডাকাতে বিশ্বাস। তেষ্টা পেয়েছে, পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত। কুয়োর কাছে কে একজন দাঁড়িয়েছিল, তাকে বললে একটু জল তুলে দিতে। সে বললে, আমি মুচি, ছোট জাত। হলেই বা। একবার শিব নাম নাও, অমনি শুচি হয়ে যাবে। একবার নাম নিলেই হবে ? হ্যাঁ, বলছি কি, একবার নিলেই হবে। একবারই যথেষ্ট। লোকটা তাই একবারই 'শিব' বললে। জল তুলে দিল কৃষ্ণ-কিশোরকে। কৃষ্ণকিশোর পরম তৃপ্তিতে জল খেল।

কৃষ্ণকিশোর বলে, তোমরা রাম নাম করো, আমি বলি 'মরা'-'মরা'। রামের চেয়েও 'মরা' বেশি শক্তিশালী। মরাতেই রত্নাকরের উদ্ধার, মৃতের পুনর্জীবন। তোমাদের কী মন্ত্র জানি না, আমার এই মরা মন্ত্র।

বিষয়ীসঙ্গ সহ্য হত না, রামকৃষ্ণ প্রায়ই আসত কৃষ্ণকিশোরের কাছে। কৃষ্ণকিশোরের ঈশ্বর ছাড়া বাক্য নেই, ঈশ্বর ছাড়া স্তব্ধতাও নেই। কৃষ্ণকিশোর সচল তীর্থ উদ্ঘাটিত শাস্ত্র।

হলধারীকে দেখতে পারত না দু'চোখে।

একবার রামকৃষ্ণ আর কৃষ্ণকিশোর এক সাধুদর্শনে চলেছে। তুমি যাবে? জিগ্‌গেস করল হলধারীকে। হলধারী বললে, 'পঞ্চভূতের একটা খাঁচাকে দেখে লাভ কি?'

খেপে উঠল কৃষ্ণকিশোর। 'যে লোক ঈশ্বরের নাম করে, ঈশ্বরের ধ্যান করে, ঈশ্বরের জন্যে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে এসেছে, সে খাঁচা? সে জানে না যে ভক্তের হৃদয় চিন্ময়?'

কচু! তা হলে অজামিলকে আর দুশ্চর তপস্যা করতে হত না। একবার 'নারায়ণ' উচ্চারণ করেই তরে যেত।

কিন্তু কিছুতেই মানবে না কৃষ্ণকিশোর। তার ভক্তির তমঃ—মারো-কাটো-বাঁধো—জবরদস্ত ভক্তি। আবার কতবার বলবে? একবার বলেছি, এতেই হয়েছে। এতেই ছিনিয়ে নেব জোর করে। আমি কি ভিখিরি? আমি ডাকাত।

দক্ষিণেশ্বরে ফুল তুলতে আসত, হলধারীর সঙ্গে দেখা হলেই ফিরিয়ে নিত মুখ। অমন ক্ষুদ্র যার বিশ্বাস, যে ছিড়িক-ছিড়িক করে দুধ দেয়, তার সে মুখ দর্শন করবে না।

একদিন রামকৃষ্ণ গিয়ে দেখে, কৃষ্ণকিশোর কি ভাবছে বসে-বসে। কি হয়েছে? আনমনা কেন?

'ট্যাক্সওয়ালা এসেছিল। বললে, টাকা না দিলে ঘটি-বাটি বেচে লবে।'

'তাই ভাবছ?' রামকৃষ্ণ হেসে উঠল: 'লিক না ঘটি-বাটি। চাই কি, বেঁধে লয়েই যাক না। কিন্তু তোমাকে তো লয়ে যেতে পারবে না। তুমি তো 'খ' গো। তুমি তো আকাশবৎ।'

ঠিকই তো। আমাকে কে নেয়! আমাকে কে বাঁধে! কিন্তু তুমি যে এ-কথা বললে, তুমি কে?

তুমি 'অ'। "অক্ষরাণাং অকারোঽস্মি"। তুমি সেই অ-কার। তুমি প্রণবের আদ্য অক্ষর।

এ হেন কৃষ্ণকিশোরের পুত্রশোক হল। দু-দু উপযুক্ত পুত্র মারা গেল পর-পর। কোন জ্ঞানেই কিছু কুলোল না। শোকে উদ্ভ্রান্ত হয়ে গেল। তা অর্জুনই অধীর, এ তো কৃষ্ণকিশোর। যার জন্যে এত গীতা, যার জন্যে এত আত্মার বিশ্লেষণ সে-ই কি না অভিমন্যু শোকে মূর্ছিত। সঙ্গে কৃষ্ণ, কৃষ্ণের এত সব শিক্ষা-দীক্ষা। কিছুতেই কিছু হল না। চোখের জলে সব ভেসে গেল। বশিষ্ঠ যে এত বড় জ্ঞানী, সেও পুত্রশোকে অস্থির। তখন লক্ষ্মণ বললে, এ কি আশ্চর্য! ইনিও এত

শোকার্ত। রাম বললে, 'ভাই, যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞানও আছে। যার সুখবোধ আছে তার দুঃখবোধও আছে। তাই তোকে বলি, তুই দুইয়ের পার হ। সুখ-দুঃখের জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যা।'

রাবণ যখন বধ হল, লক্ষ্মণ দৌড়িয়ে গেল দেখতে। দেখে হাড় শতচ্ছিদ্র হয়ে গেছে। এমন জায়গা নেই যেখানে ছিদ্র নেই। রামকে বললে, রাম! তোমার বাণের কি মহিমা! রাবণের দেহে এমন জায়গা নেই যেখানে ছিদ্র না হয়েছে। রাম বললে, ও সব ছিদ্র বাণের জন্যে নয়। শোকে তার হাড় জর-জর করছে। ও সব ছিদ্র শোকের চিহ্ন।

তেলির ছেলে গোবিন্দ, থাকে বরানগর। ছোকরা বয়স, প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসে। আর রামকৃষ্ণের কথামৃত শোনে।

একদিন বললে, 'গোপালকে আনব এখানে ?'

'কে গোপাল ?'

'আমার এক বন্ধু। আমারই সমবয়সী।'

'বেশ তো। নিয়ে আসিস একদিন।'

গোপাল এল গোবিন্দের সঙ্গে। রামকৃষ্ণের মুখে কথা শুনেই কেমন বেহুঁস হয়ে গেল। রামকৃষ্ণের যেমন সমাধি হয়, প্রায় তেমনি।

একদিন গোপাল এসে রামকৃষ্ণের পায়ের ধুলো নিলে। বললে, 'চলে যাচ্ছি।'

'সে কি ? কোথায় যাচ্ছিস ?' জিগ্গেস করল রামকৃষ্ণ।

'জানি না। এ সংসার আর ভালো লাগছে না তাই আর থাকছি না এখানে।'

কত দিন আর ছেলে দুটোর কোনো খবর নেই। এদিকে আর আসে না। কি হল কে জানে। এক দিন গোবিন্দ এসে হাজির।

'আরে! কি খবর ?'

'গোপাল মারা গেছে।'

মারা গেছে ? রামকৃষ্ণ কাতর হয়ে পড়ল।

ক'দিন পরে খবর এল গোবিন্দও চলে গিয়েছে ওপারে।

ভাগ্যিস ওরা আমার কেউ নয়। ওরা আমার কে। রামকৃষ্ণ বলে আর চোখ মোছে।

* ৩০ *

তোতাপুরী জগদম্বাকে মানে না, কিন্তু তোতাপুরীর উপর জগদম্বার অপার করুণা। করুণাবলেই তার সাধনার পথ সহজ করে দিয়েছেন। দেখাননি তাকে তাঁর রঙ্গিণী মায়ার খেলা। অবিদ্যারূপিণী মোহিনী মায়ার ইন্দ্রজাল। দেখাননি তাকে তাঁর সর্বগ্রাসিনী করালী মূর্তি। প্রকটিতরদনা বিভীষিকা। বরং তাকে দিয়েছেন সুদৃঢ় স্বাস্থ্য, সরল মন আর বিশুদ্ধ সংস্কার। তাই নিজের

পুরুষকারের প্রয়োগে সহজ পথে উঠে গিয়েছে শিখরে। আত্মজ্ঞানে, ঈশ্বরদর্শনে, নির্বিকল্প সমাধিভূমিতে। এখন মহামায়া ভাবলেন, ওকে এবার বোঝাই আসল অবস্থাটা কী!

লোহার মত শরীর, লোহা চিবিয়ে হজম করতে পারে তোতাপুরী—হঠাৎ তার রক্ত আমাশা হয়ে গেল। সব সময়ে পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। কি করে মন আর ধ্যানে বসে! ব্রহ্ম ছেড়ে মন এখন শুধু শরীরে লেগে থাকে। মনের সেই শান্তির মৌন চলে গিয়ে দেখা দেয় শারীরিক আর্তনাদ। ব্রহ্ম এবার পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়েছেন। এবার মহামায়ার কৃপা না হলে আর রক্ষে নেই।

তোতাপুরী ভাবলে এবার পালাই বাঙলা দেশ থেকে। কিন্তু শরীর ভালো থাকছে না এই অজুহাতে পালিয়ে যাব? হাড়-মাসের খাঁচা এই শরীর, তাকে এত প্রাধান্য দেব? তার জন্যে ছেড়ে যাব এই ঈশ্বর-সংগ? যেখানে যাব সেখানেই তো শরীর যাবে, শরীরের সংগে-সংগে রোগও যাবে। আর, রোগকে ভয়ই বা কিসের? শরীর যখন আছে তখন তো তা ভুগবেই, শেষও হয়ে যাবে এক দিন। সেই শরীরের প্রতি মমতা কেন? যাক না তা ধুলোয় নস্যাৎ হয়ে। ক্ষয়হীন আত্মা রয়েছে অনির্বাণ। রোগ বা জরা বা মৃত্যু তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। সে প্রদীপ্ত চৈতন্য শরীর-বহির্ভূত।

নানা তর্ক করে মনকে স্তব্ধ করলে তোতাপুরী।

কিন্তু রোগ না শোনে ধর্মের কাহিনী। ক্রমেই তা শিখা বিস্তার করতে লাগল—যন্ত্রণার শিখা। ঠিক করল, আর থাকা চলবে না দক্ষিণেশ্বরে—রামকৃষ্ণর থেকে শেষ বিদায় নিতেই হবে। কিন্তু মুখ ফুটে রামকৃষ্ণকে তা বলে এমন তার সাধ্য নেই। কে যেন তার মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে কথা কইতে বাধা দিচ্ছে। আজ থাক, কাল বলব—বারে-বারে এই ভাব এসে তাকে নিরস্ত করছে। আজ গেল, কালও সে পঞ্চবটীতে বসে রামকৃষ্ণের সংগে বেদান্ত নিয়েই আলোচনা করলে, অসুখের কথা দন্তস্ফুট করতে পারল না। কিন্তু বুঝতে পারল রামকৃষ্ণ। মথুরবাবুকে বলে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করালে। মনকে সমাধিস্থ করে যন্ত্রণা থেকে ত্রাণ খুঁজছে তোতাপুরী। আমি দেহ নই আমি আত্মা, আমি জীব নই আমি ব্রহ্ম এই দিব্যবোধে নিমগ্ন হয়ে থাকছে। শরণ নিচ্ছে যোগজ প্রজ্ঞার। কিন্তু কত দিন?

এক দিন রাতে শুয়েছে, পেটে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হল। উঠে বসল তোতাপুরী। এ যন্ত্রণার কিসে নিবারণ হবে? মনকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাঠাতে চাইল সেই অদ্বৈতভূমিতে। কিন্তু মন আর যেতে চায় না। একটু ওঠে আবার পেটের যন্ত্রণায় নেমে পড়ে। শরীরবোধের আর বিচ্যুতি ঘটে না। ভীষণ বিরক্ত হল তোতাপুরী। যে অপদার্থ শরীরটার জন্যে মনকে বশে আনতে পারছি না সে শরীর রেখে আর লাভ কী? তার জন্যে কেন এত নির্যাতন? সেটাকে বিসর্জন দিয়ে মুক্ত, শুদ্ধ, অসংগ হয়ে যাই।

তোতাপুরী স্থির করল ভরা গংগায় ডুবে মরবে।

গংগার ঘাটে চলে এল তোতা। সিঁড়ি পেরিয়ে ধীরে-ধীরে জলে নামতে লাগল। ক্রমে-ক্রমে এগুতে লাগল গভীরের দিকে, মাঝ-নদীতে।

কিন্তু এ কি ! গঙ্গা কি আজ শুকিয়ে গেছে ? আধেক প্রায় হেঁটে চলে এল, তবু এখনো কি না ডুব-জল পেল না ? এ কি গঙ্গা, না, একটা শিশে খাল ? প্রায় ও-পারের কাছাকাছি এসে পড়ল, এখন কি না ফের হাঁটু-জলে এসে ঠেকেছে। এ কি পরমাশ্চর্য ! ডুবে মরবার জল পর্যন্ত আজ গঙ্গায় নেই।

'এ ক্যা দৈবী মায়া !' অসহায়ের মত চীৎকার করে উঠল তোতাপুরী।

হঠাৎ তার চোখের ঠুলি যেন খসে পড়ল। যে অবায়-অদ্বৈত ব্রহ্মকে সে ধ্যান করে এসেছে তাকে সে এখন দেখলে মায়ারূপিণী শক্তিরূপে। যা ব্রহ্ম তাই ব্রহ্মশক্তি। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত, কিন্তু শক্তিতেই জীব-জগৎ। ব্রহ্ম নিত্য, শক্তি লীলা। যেমন সাপ আর তির্যক গতি। যেমন মণি আর বিভা।

সেই বিভাবতী জ্যোতির্ময়ীকে দেখল এখন তোতাপুরী। দেখল জগজ্জননী সমস্ত চরাচর আবৃত করে রয়েছেন। যা কিছু দৃশ্য দর্শন ও দ্রষ্টা সব তিনি। শরীর-মন রোগ-স্বাস্থ্য জ্ঞান-অজ্ঞান জীবন-মৃত্যু—সব তাঁর রূপচ্ছটা ! "একৈব সা মহাশক্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।"

মা'র এই বিরাট বিশ্বব্যাপ্ত রূপ দেখে তোতা অভিভূত হয়ে গেল। লুপ্ত হয়ে গেল ব্যাধিবোধ। নদী ভেঙে ফের সে ফিরে চলল দক্ষিণেশ্বরে। পঞ্চবটীতে ধুনির ধারে বসল গিয়ে সে চুপচাপ। ধ্যানে চোখ বোজে আর দেখে সে জগদম্বাকে। চিৎসত্তাস্বরূপিণী পরমানন্দময়ীকে।

সকাল বেলা তোতাকে দেখে রামকৃষ্ণ তো অবাক। শরীরে রোগের আভাসলেশ নেই। সর্বত্র প্রহর্ষ-প্রকাশ।

'এ কি হল তোমার ? কেমন আছ ?'

'রোগ সেরে গেছে।'

'সেরে গেছে ? কি করে ?'

'কাল তোমার মাকে দেখেছি।' তোতার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

'আমার মাকে ?'

'হ্যাঁ, আমারো মাকে। জগতের মাকে। সর্বত্র তাঁর আত্মলীলার স্ফূর্তি—চিদৈশ্বর্যের বিস্তার—'

'কেন, বলেছিলাম না ?' রামকৃষ্ণ উল্লসিত হয়ে উঠল : 'তখন না বলেছিলে, আমার কথা সব ভ্রান্তি ? তোমায় কী বলব, আমার মা যে ভ্রান্তিরূপেও সংস্থিতা—'

'দেখলাম যা ব্রহ্ম তাই শক্তি। যা অগ্নি তাই দাহিকা, যা প্রদীপ তাই প্রভা, যা বিন্দু তাই সিন্ধু। ক্রিয়াহীনে ব্রহ্মবাচ্য, ক্রিয়াযুক্তেই মহামায়া।'

'দেখলে তো, দেখলে তো ?' রামকৃষ্ণের খুশি আর ধরে না। 'আমার মাকে না দেখে কি তুমি যেতে পারো ? যোগে বসে এত দেখছ আর আমার মহাযোগিনী মাকে দেখবে না ?'

যা মন্ত্র তাই মূর্তি। এক বিন্দু বীর্য থেকে এই অপূর্বসুন্দর দেহ, এক ক্ষুদ্র বীজ থেকে বৃহৎ বনস্পতি, এক তুচ্ছ স্ফুলিঙ্গ থেকে বিস্তীর্ণ দাবানল। তেমনি ব্রহ্ম থেকে এই শক্তির আত্মলীলা।

'এবার তোমার মাকে বলে আমাকে ছুটি পাইয়ে দাও।'

'আমি কেন ? তোমার মা, তুমি বলো না।' হাসতে লাগল রামকৃষ্ণ।

তোতা চলে এল ভবতারিণীর মন্দিরে। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে মাকে। প্রসন্ন মনে মা তাকে যাবার অনুমতি দিলেন। রামকৃষ্ণকে বিদায় জানিয়ে কালীবাড়ি ছেড়ে চলে গেল। কোন দিকে গেল কেউ জানে না।

* ৩১ *

তোতাপুরী গেল, এল গোবিন্দ রায়।

গোবিন্দ রায় জাতে ক্ষত্রিয়, কিন্তু আরবি-ফার্সিতে পণ্ডিত। ইসলামের এক-ভ্রাতৃত্বের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে মুসলমান হয়েছে। ঘুরতে-ঘুরতে চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বর। আস্তানা গেড়েছে কালীবাড়ির বাগানে। তখন এমনি উদার ব্যবস্থা। রানি রাসমণির পুণ্যের আকর্ষণে হিন্দু সন্নেসির মত মুসলমান ফকিররা এসেও জমায়েত হচ্ছে। যেখানে ভক্তির রাজ্য, ভাবের রাজ্য, সেখানে আবার জাত বিচার কি ! তা ছাড়া রানি যেখানে অন্নপূর্ণা। গোবিন্দ রায় দরবেশ। সুফী-পন্থী। প্রেমভাবে মাতোয়ারা। ভাবের পশরা মাথায় নিয়ে ভবের হাটে কেনা-বেচা করে।

রামকৃষ্ণর চোখ পড়ল গোবিন্দর উপর। ভাবেশ্বরীই তাকে পথ দেখালেন।

'কি হে, এসেছ ?' ছুটে গেল রামকৃষ্ণ।

'তুমি ডাকলে যে ! না এসে কি পারি ?' গোবিন্দ রায় মহানন্দে হাসল।

চুম্বকের ডাকে লোহা চলে এসেছে। যেখানেই অনুভূতির গভীরতা সেখানেই স্বচ্ছ সারল্য। যেখানে জ্ঞানের বিস্তৃতি সেখানেই প্রেমের সদানন্দ। গোবিন্দ রায়ের বিতর্কহীন বিশ্বাস আর প্রশ্নহীন প্রেমে মুগ্ধ হয়ে গেল রামকৃষ্ণ। দেখল, এও তো একটা পথ ঈশ্বরের কাছে পোঁছুবার। এই পথেই তো মা কত লোককে টেনে নিয়ে চলেছেন, পোঁছে দিচ্ছেন বিশ্বনিয়ন্তার পাদপদ্মে। এই পথটা একবার দেখে এলে কেমন হয় ? পথ যখন আরেকটা আছে তখন সেটাই বা তার কাছে রুদ্ধ থাকবে কেন ? সমস্ত রসের রসিক সে। সমস্ত পথের সে পর্যটক।

যত মত তত পথ। নদী নানা দিক দিয়ে আসে, কিন্তু পড়ে গিয়ে সেই সমুদ্রে। তেমনি ছাদে নানা উপায়ে ওঠা যায়। পাকা সিঁড়ি, কাঠের সিঁড়ি, বাঁকা সিঁড়ি, ঘোরানো সিঁড়ি। ইচ্ছে করলে শুধু একটা দড়ি দিয়েও উঠতে পারো। তবে যে ভাবেই ওঠো, একটা কিছু ধরে উঠতে হবে। দু' সিঁড়িতে পা দিলে পড়ে যাবে মুখ থুবড়ে। যখন যেটা ধরেছ সেটা ধরেই উঠে যাও। দেখ ঠিক উঠছ কি না।

ধর্ম তো আর ঈশ্বর নয়। ধর্ম হচ্ছে শুধু একটা কিছু ধরবার জন্যে। যেটা ধরে উঠতে পারবে উপরে, পর্বতচূড়ায়, যেখানে ঈশ্বর বিরাজ করছেন। যা তুমি ধরবে, তা বাপু, একটু শক্ত করে ধোরো। পা পিছলে পড়ে না যাও।

কালীঘাটে যাবার নানান রাস্তা। নানান বাহন। তোমার গাড়ি-ঘোড়া না জোটে, না জুটুক, তোমার খুব দূরের পাড়ি হয়, হোক যত দূর খুশি। তুমি পায়ে হেঁটেই চলে এস মন্দিরে। সোজা ভক্তি-বিশ্বাসের পথ দিয়ে।

রামকৃষ্ণ ধরল গিয়ে গোবিন্দ রায়কে। বললে, 'আমি মুসলমান হব।'

চিত্রার্পিতের মত তাকিয়ে রইল গোবিন্দ রায়। দেখলে সে কী মহাভাববিদ্যুতি রামকৃষ্ণের চোখে-মুখে খেলে যাচ্ছে। দেখল ভক্তি-ভালোবাসার বিশাল ঝঞ্ঝাবাতে উড়ে গেছে সব বিধি-নিষেধ, সব সংস্কার-সংকীর্ণতা। অভিমানের জঞ্জালস্তূপ। তবু নিজের কানকে যেন বিশ্বাস হল না গোবিন্দর। জিজ্ঞাসা করলে, 'কি হবে?' 'মুসলমান হব। ইসলামের পথও তো একটা পথ। এই পথে কত সাধকই তো বাঞ্ছিত ধামে গিয়ে পৌঁছুচ্ছেন। আমি সে পথটাই বা বাদ দেব কেন?'

'সত্যি বলছ মুসলমান হবে?'

'হ্যাঁ, তুমি আমাকে দীক্ষা দাও। আমার আর দেরি সইছে না—খিদের মুখেই আমার আস্বাদন চাই।'

গোবিন্দ রায় যথাবিধি দীক্ষা দিল রামকৃষ্ণকে।

রামকৃষ্ণ কাছা খুলে ফেলল। লুঙ্গির মতন করে পরল দু'গজি কাপড়। মুখে আর 'মা' 'মা' নেই, শুধু 'আল্লা' 'আল্লা'। মন্দিরের ধারে-কাছেও যায় না। যে শ্যামা তার চক্ষুর চক্ষু ছিল তাকে দেখবার জন্যে আর এক বিন্দু ব্যাকুলতা নেই। বরং দেবদেবীর নাম শুনলে জ্বলে ওঠে। সেই একেশ্বর খোদাতাল্লার ভজনা করে।

থাকে মথুরবাবুর কুঠির এক পাশে। চোখের উপর এত বড় যে একটা মন্দির সেটা চোখে পড়ে না। শোনে না সকাল সন্ধ্যার ঘন্টার আওয়াজ। পাঁচ বেলা নামাজ পড়ে তদ্গত মনে। নামাজের আগে পুকুরে ওজু করে নেয়।

এক দিন বললেন মথুরবাবুকে, 'মুসলমানের রান্না খাব।'

'সে কি কথা?'

'হ্যাঁ, খুব ঝাল-পেঁয়াজ-রশুন দেওয়া উগ্র রান্না। রান্নার গন্ধ বাতাসে টের পাওয়া যাবে।'

মথুরবাবু রাজি হন না। কিন্তু রামকৃষ্ণের দাবি দৃঢ়তর।

বেশ, মুসলমান বাবুর্চি দেখিয়ে দেবে, রাঁধবে হিন্দু বামুন। তাই সই। শিগগির-শিগগির চাপিয়ে দাও রান্না। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে।

আমাশায় ভোগা রুগী, আঝাল ঝোল-ভাত যার পথ্য, তার জন্যে ঐ উগ্রচন্ড রান্না। কিন্তু উপায় নেই। রামকৃষ্ণ যখন গোঁ ধরেছে তখন মানতেই হবে। মুসলমান-বাবুর্চি বলে দিচ্ছে, আর তার কথামত রাঁধছে হিন্দু বামুন। কাছে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাই দেখছে রামকৃষ্ণ। বাতাসে ঘ্রাণ নিচ্ছে।

হঠাৎ ডাকিয়ে আনলেন মথুরবাবুকে। বললেন, 'এ ঠিক হচ্ছে না। বামুনকে বলো কাছা খুলে ফেলতে। ওতে আর ঐ বাবুর্চিতে কিছু তফাৎ নেই আমাকে ভাবতে দাও সেই কথা।'

মথুরবাবুর নির্দেশে বামুন কাছা খুলে ফেলল।

সানকিতে করে ভাত খেল রামকৃষ্ণ। জল খেল বদনাতে করে।

এ কি ভাব হল রামকৃষ্ণের—মথুরবাবু ভাবনায় পড়লেন। কিন্তু হৃদয় এল তেড়েফুঁড়ে, ভীষণ চোটপাটের সংগে।

'এ সব কী হচ্ছে পাগলামি ? নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে এ কী ব্যবহার ? পৈতে ফেলে দিয়েছ বলে কাছাও ফেলে দেবে ? কাছা ফেলে দিয়েছ বলে নামাজ পড়বে ওঠ-বোস করতে-করতে ? পাগলামি ছাড়ো। যাও, মন্দিরে যাও। মন্দিরে গিয়ে মা'র কাছে বোসো। তাকে ভজনা করো।'

ধরে টেনে ঠেলে রামকৃষ্ণকে পাঠিয়ে দিল মন্দিরের দিকে। কতক্ষণ পরে হৃদয় মন্দিরে এসে দেখে রামকৃষ্ণের টিকিটিও কোথাও নেই। কোথায় গেল মামা ? ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল হৃদয়। মথুরবাবুর কুঠির বারান্দাতেও নেই, নেই বা গংগার ধারে-কাছে। বাগান-পঞ্চবটীও শূন্য। তবে কোথায় অদৃশ্য হল ? খুঁজতে-খুঁজতে চলে এল রাস্তায়। রাস্তা ছেড়ে সামনের মসজিদে। দেখল মসজিদে নামাজ পড়ছে রামকৃষ্ণ। দুষ্টুমি করার সময় ছোট ছেলে যেন ধরা পড়েছে অভিভাবকের কাছে। হৃদয় যেন রুদ্রচক্ষু গুরুজন আর রামকৃষ্ণ অবোধ অপোগণ্ড শিশু।

বললে, 'আমি কি করব বল্, আমার কোনো দোষ নেই। আমাকে কে যেন জোর করে এখানে টেনে এনেছে।'

সকাল বেলা। আজান দিয়েছে মসজিদ থেকে। রামকৃষ্ণ দে-ছুট।

'এ কি, তুমি কে ?' প্রথম দিনে জিগ্গেস করেছিল মুসলমানেরা।

ওদের থেকেই কে একজন বললে, 'ওকে চেন না ? ও মন্দিরে থাকে, পুজো-টুজো করে—'

'করে না করত। আমি এখন ইসলামের দীক্ষা নিয়েছি। আমার ভায়েদের সংগে একত্র উপাসনা করব।'

সকলে ভাবলে পাগল হবে বা। কিন্তু সাধ্য নেই তাকে কেউ তাড়িয়ে দেয়। নামাজের প্রত্যেকটি কৃত্য-করণ তার মুখস্থ। আর সব চেয়ে মর্মস্পর্শী হচ্ছে তার মুখস্থ ভাবটি। যে ভাবটি আসে শুধু সরলতা থেকে, ব্যাকুলতার সরলতা। তিন দিন ছিল এই ইসলামভাবে।

একদিন হঠাৎ এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তার সামনে আবির্ভূত হল। মসজিদে যখন নামাজ পড়তে এসেছে। বৃদ্ধ ফকিরের বেশ, মাথার চুল সব শাদা, গোঁফদাড়িও তাই। গলায় কাঁচের মালা, হাতে লাঠি। বললে, 'তুমি এসেছ ? বেশ—' বলে হাসল, হাত নেড়ে আশীর্বাদ করল। সেই পুরুষ-প্রবর বিরাট ব্রহ্মেরই প্রতিভাস।

পরে আরো এক দিন দেখেছিলেন তাকে ঠাকুর। বললেন, 'মা ভেদবুদ্ধি সব দূর করে দিলেন। বটতলায় বসে ধ্যান করছি, দেখালেন এক জন বুড়ো মুসলমান সানকি করে ভাত নিয়ে সামনে এল। সানকি থেকে ম্লেচ্ছদের খাইয়ে আমাকে দুটি দিয়ে গেল। মা দেখালেন এক বই দুই নেই—'

মা'র মন্দিরে বসে তোরা চোখ বুজে কেন ধ্যান করিস বল তো ? সাক্ষাৎ মা চিন্ময়ী বিরাজ করছেন, আশ মিটিয়ে দেখে নে। দ্যাখ তাঁর আয়ত-শান্ত চোখ দুটি, দ্যাখ তার পাদপদ্ম দু'খানি। যখন আপন মা'র কাছে যাস মাকে দেখতে, তখন কি চোখ বন্ধ করে মা'র কাছে বসিস, না, মালা ফেরাস বসে-বসে ?

চেয়ে দ্যাখ দেখি—এ তোর আপনার মা নয় ?

'শিখেরা বলেছিল, ঈশ্বর দয়ালু। আমি বললাম, তিনি আমাদের মা-বাপ, তিনি আবার দয়ালু কি ! ছেলের জন্ম দিয়ে বাপ-মা লালন-পালন করবে না, করবে কি বামুন-পাড়ার লোকেরা ?'

কালীমন্দিরের চাতালে বসে স্তব করছে রামকৃষ্ণ :

'ও মা, ও মা ওঁকাররূপিণী মা ! এরা কত কি বলে মা, কিছু বুঝতে পারিনি। কিছু জানি না, মা। শুধু শরণাগত ! শরণাগত ! কেবল এই কোরো মা তোমার শ্রীপাদপদ্মে যেন শুদ্ধা ভক্তি হয়। আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ কোরো না। শরণাগত ! শরণাগত !'

* ৩২ *

এই সেই যদু মল্লিক।

তুমি বড্ড হিসেবী লোক। অনেক হিসেব করে কাজ করো, তাই না ? সেই বামুনের গরু, খাবে কম, নাদবে বেশি, আর হুড়হুড় করে দুধ দেবে—

কি বললেন ?

তুমি বড় অন্যমনস্ক। ঈশ্বরচিন্তায় নয়, বিষয়চিন্তায়। কোন ব্যঞ্জনে নুন হয়েছে কোন ব্যঞ্জনে হয়নি এ তুমি বুঝতে পারো না। কেউ যদি বলে দেয়, এ ব্যঞ্জনে নুন হয়নি, তখন এ্যাঁ-এ্যাঁ করে বলো, হয়নি না কি ? তখন তোমার হুঁস হয়। কেউ না বলে দিলে—

আপনি বলে দিন।

তুমি সেই রামজীবনপুরের শিলের মত—আধখানা গরম, আধখানা ঠাণ্ডা। ঈশ্বরেও মন আছে, আবার সংসারেও মন আছে—

ষোলো আনা গরম করে দিন।

অসম্ভব। কথা দিয়ে কথা রাখো না কেন ? বাড়িতে যে চণ্ডীর গান দেবে বলেছিলে, তা হল কই ? কত দিন কেটে গেল—

অনেক ঝঞ্ঝাট—নানান ঝামেলা।

তুমি পুরুষ-মানুষ তো বটে ? তবে কথা রাখবে না কেন ? পুরুষ-মানুষের এক কথা। কি, মানো ?

তা মানি বৈ কি।

তা যদি মানো, সেই মান সম্বন্ধে যদি হুঁস থাকে, তবে তো মানুষই হয়ে যেতে। মান-হুঁস—মানুষ। আর পুরুষ কাকে বলে ? পুরুষের সম্পদ কোথায় ?

যদু মল্লিক তাকাতে লাগল এদিক-ওদিক।

কথায়। হাতির দাঁত, আর পুরুষের ? পুরুষের বাত। এক কথার মালিক যে সেই পুরুষ।

এই সেই যদু মল্লিক। এই যদু মল্লিকের বাগান-বাড়িতে এক দিন বেড়াতে এসেছে রামকৃষ্ণ। বৈঠকখানায় বসে গল্প করছে যদুর সঙ্গে। হঠাৎ দেয়ালে-টাঙানো একখানা ছবির দিকে তার নজর পড়ল। বড় মধুর ভাবের ছবিখানি। মা আর ছেলে। মা'র নধর বাহুর বেষ্টনীতে পবিত্র একটি শিশু, ঊষার আকাশে প্রথম উদয়ভানু। মা'র দুটি বড়-বড় বিভোর চোখে দ্রবীভূত স্নেহ, মুখে তৃপ্তিপূর্ণ হাসি। আর শিশুর মুখে সে যে কি নিষ্পাপ সারল্য তা রামকৃষ্ণ যেমন বুঝছে তেমন কি কেউ বুঝবে ?

'ওরা কারা হে ?'

এক মেমসাহেব আর তার ছেলে।

তাই হবে বা। অন্য দিকে চোখ ফেরাতে চাইল রামকৃষ্ণ। কিন্তু চোখ ফেরায় এমন সাধ্য নেই। বলো না সত্যি করে। ওরা কে ? ও তো দেখছি জ্যোতির্ময় দেবশিশু। আর ওর মা তো পূর্ণময়ী পবিত্রতা।

'মা মেরী আর তার ছেলে যীশুখৃষ্ট।'

একদৃষ্টে চেয়ে রইল রামকৃষ্ণ। দেখল যশোদা আর তার কোলে বালগোপাল। সোজা শম্ভু মল্লিকের কাছে গিয়ে হাজির হল। বললে, 'যীশুখৃষ্টের গল্প শোনাও আমাকে।'

এই সেই শম্ভু মল্লিক।

হাসপাতাল করা, ডিসপেনসারি করা, রাস্তা বানানো, কুয়ো কাটানো—এই সবে বড় ঝোঁক। এ সব কাজ অনাসক্ত হয়ে করতে পারো তো বুঝি। নইলে ও-সবের পিছনে তো শুধু নামের পিপাসা, ঢাকের বাদ্যি। কালীঘাটে এসে যদি শুধু দানই করতে থাকো তো কালীদর্শন হবে কখন ? আগ যো-সো করে ধাক্কাধুক্কি খেয়েও কালী-দর্শন করে নাও, তার পর দান যত করো আর না-করো। ঈশ্বর যদি তোমার কাছে এসে বলেন, কী বর চাও, তখন তুমি কী বলবে ? বলবে, কতগুলি হাসপাতাল-ডিসপেনসারি করে দাও, না, স্থান দাও, আশ্রয় দাও, তোমার পাদপদ্মে ?

গৌরবর্ণ পুরুষ, মাথায় তাজ। ভাবে তাকে দেখেছিল রামকৃষ্ণ। দেখেছিল সেবায়েৎ বলে। সেজোবাবুর পরে রসদদার এই শম্ভু মল্লিক।

বাগবাজার থেকে হেঁটে চলে আসে বাগানে। আসে সটান পায়ে হেঁটে। কেউ যদি বলে, অত রাস্তা, গাড়ি করে আস না কেন ? যদি কোনো বিপদ হয়। শম্ভু মুখ লাল করে বলে, মা'র নাম করে বেরিয়েছি, আমার আবার বিপদ !

'আমি বই-টই কিছু পড়িনি, কিন্তু দেখ দেখি মা'র নাম করি বলে আমায় সবাই মানে।' শম্ভু মল্লিককে বলেছিল এক দিন রামকৃষ্ণ।

'আহা, তা আর জানি না ?' সহাস্য সারল্যে বললে শম্ভু মল্লিক, 'ঢাল নাই তরোয়াল নাই, শান্তিরাম সিং।'

জানোই তো আমার বিদ্যেবুদ্ধি। তবে এবার একটু বাইবেল শোনাও দিকি। শম্ভু মল্লিক বাইবেল নিয়ে বসল। আবিষ্টের মত শুনতে লাগল রামকৃষ্ণ। ভূমাভিমুখী মন নামল অবগাহনে।

পরে এক দিন উন্মনার মত চলে এল যদু মল্লিকের বাগান-বাড়িতে।

যদু মল্লিক বাড়ি নেই। বৈঠকখানা খুলে দিলে চাকররা। শিশুযুতা মাতৃচিত্রের কাছে বসল রামকৃষ্ণ।

'মা গো, তুই আমাকে এ কী দেখাচ্ছিস?'

রামকৃষ্ণ দেখল সেই ছবি যেন জীবনায়িত হয়ে উঠেছে। মা আর ছেলের দিব্য অঙ্গের জ্যোতিতে ভেসে যাচ্ছে দশ দিক। তার অন্তর-বাহির ধুয়ে যাচ্ছে সেই জ্যোতিস্নানে। এত দিনের দৃঢ়মূল সংস্কার উন্মূলিত হয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব-সংসারে আর কেউ বিরাজমান নয়—শুধু পীযূষপ্রেমময় যীশু। কৃষ্ণ নয়, খৃষ্ট। ঈশান নয়, ঈশা।

দেখল এ ঘর যেন গির্জা হয়ে গিয়েছে। নানা ধূপ দীপ মোমবাতি জেবলে ব্যাকুলতার মূকমূর্তি হয়ে প্রার্থনা করছে পাদারিরা। সামনে ক্লেশভারক্লিষ্ট অথচ অক্লিষ্টকান্তি দেবতা।

কে তুমি পরম যোগী পরম প্রেমিক? কে তুমি 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'? সংসারদুঃখগহন থেকে জীবের উদ্ধারের জন্যে বুকের রক্ত ঢেলে দিলে। যাকে ত্রাণ করতে এলে তারই হাতে প্রাণ দিলে হাসিমুখে। এলে যে যন্ত্রণার নিবারণে সেই যন্ত্রণাই ক্ষমা হয়ে প্রেম হয়ে শান্তি হয়ে উদ্ভাসিত হল।

হাঁটতে-হাঁটতে চলে এল এক গির্জার সামনে। বড় রাস্তার পারে বড় গির্জা। সব বিদেশী-বিজাতীয়দের ভিড়। 'রাজার বেটা' না হোক, সব রাজার জাতের লোক। ভিতরে ঢুকতে সাহস পেল না রামকৃষ্ণ। কে জানে, হয়তো বা কালীঘরের খাজাঞ্চি বসে আছে।

'মা গো, খৃষ্টানরা গির্জেতে তোমাকে কি করে ডাকে একবার দেখিও। কিন্তু ভিতরে গেলে লোকে কি বলবে? যদি কিছু হাঙ্গামা হয়? আবার কালী-ঘরে ঢুকতে না দেয়! তবে মা, গির্জের দোরগোড়া থেকেই দেখিও।'

গির্জার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল রামকৃষ্ণ। চক্ষু মেলে তাকাল একবার ভিতরে। সর্বতশ্চক্ষু রামকৃষ্ণের চোখে এখন "পরম পশ্যন্তী দৃষ্টি"। দেখল সত্যি-সত্যিই এ কালী-ঘর। ভিতরে, বেদীতে মা বসে আছেন। মা জগদম্বা। মা ভবতারিণী। সব্যে খড়্গমুণ্ডকরা, অসব্যে বরাভয়দাত্রী—সেই মা, যিনি করালী হয়েও কৈবল্যদায়িনী। আনন্দধারায় দুই চোখ ভেসে গেল রামকৃষ্ণের।

সর্বত্রই এই মা'র ভজন। সর্বস্থানই মাতৃস্থান। কাজলের ঘরে বাস করলে গায়ে কালি লাগবেই, কিন্তু কোথাও আর কাজলের ঘর নেই—সর্বত্র কালী-ঘর।

যিনি যীশুখৃষ্ট তিনিই মোক্ষকরী শিবকরী মাহেশ্বরী।

তিন দিন থাকল এই খৃস্টান ভাবে। চার দিনের দিন পঞ্চবটীতে বেড়াচ্ছে রামকৃষ্ণ, দেখল কে এক জন গৌরবর্ণ সুপুরুষ হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বুঝতে দেরি হল না, বিদেশী, বিজাতি। কিন্তু সৌম্য আননে কী অপার সৌন্দর্য, সর্বাঙ্গে দেবদ্যুতি। কে তুমি? তুমিই কি সেই পুরুষোত্তম যীশু? তুমিই কি সেই তমালশ্যামল বনমালী?

সেই দেবমানব আলিঙ্গন করল রামকৃষ্ণকে। এক দেহে লীন হয়ে গেল দু'জনে। লীন হয়ে গেল ব্রহ্মাত্মবোধে।

'আচ্ছা তোরা তো সবাই বাইবেল পড়েছিস—' এক দিন ভক্তদের জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুর : 'সেইখানে যীশুর চেহারার কোনো বর্ণনা আছে ?'

না, বাইবেলে তার উল্লেখ নেই।

'আচ্ছা, যীশু কেমন দেখতে ছিল বল তো ?'

কে জানে ! তবে ইহুদি ছিলেন যখন তখন রং গৌর, চোখ টানা আর নাক টিকলো ছিল নিশ্চয়ই।

'কিন্তু আমি যখন দেখেছিলাম, দেখলাম নাক একটু চাপা। কেন দেখলাম কে জানে।'

ভাবে-দেখা মূর্তি কি বাস্তব মূর্তির অনুরূপ হয় ? কিন্তু যীশুখৃস্টের আকৃতির যে বর্ণনা পাওয়া গেছে, তাতে তাঁর নাক চাপা বলেই লেখা আছে।

'মা গো, সবাই বলছে আমার ঘড়ি ঠিক চলছে। হিন্দু মুসলমান খৃস্টান ব্রহ্ম-জ্ঞানী। সকলেই বলে আমার ধর্মই ঠিক। কিন্তু মা, কারুর ঘড়িই তো ঠিক চলছে না। তোমার ঘড়ির সংগে কেউই তো মিলিয়ে নিচ্ছে না ঠিক-ঠিক। সবাই ঘড়ির কাঁটা দেখে, কেউই তোমাকে দেখে না।'

মিশ্র এসেছে ঠাকুরের সংগে দেখা করতে। ধর্মে খৃস্টান, বাড়ি পশ্চিমে। ভাই গিয়েছিল বিয়ে করতে, সেখানে বরের সভায় শামিয়ানা চাপা পড়ে মারা যায়। একা নয়, সংগে আরো একটি ভাই—গিয়েছিল বরযাত্রী। সেই থেকেই মিশ্র সন্ন্যাসী। পরনে প্যাণ্ট কোট বটে, কিন্তু ভিতরে গেরুয়ার কৌপীন।

'ইনিই ঈশ্বর, ইনিই রাম, ইনিই কৃষ্ণ—' বলতে লাগল মিশ্র।

ঠাকুর হাসছেন। বলছেন, 'পুকুরে অনেকগুলি ঘাট। এক ঘাটে হিন্দুরা জল খাচ্ছে, বলছে জল। আরেক ঘাটে খৃস্টানরা খাচ্ছে, বলছে ওয়াটার। মুসলমানেরা আরেক ঘাটে খাচ্ছে, বলছে পানি।' মিশ্রের দিকে তাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'কিছু দেখতে-টেকতে পাও ?'

'শুধু আপনাকে দেখি। আপনি আর যীশু এক।'

ঠাকুরের বুঝি যীশুর ভাব হল। দাঁড়িয়ে পড়লেন। সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। ভাবাবেশে মিশ্রের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। সেকহ্যাণ্ড করতে লাগলেন।

সবার সংগে মিশে এক হয়ে যাবে। তার পরে আবার নিরালায় ফিরে যাও নিজের ঘরে। সেখানে গিয়ে ফের শান্তিতে থাকো। রাখালেরা এক-এক বাড়ি থেকে গরু চরাতে নিয়ে যায়, কিন্তু মাঠে গিয়ে সব গরু মিলে-মিশে একাকার। আবার সন্ধ্যের সময় ফিরে যায় নিজের-নিজের ঘরে, আপনাতে আপনি থাকে।

গড়ের মাঠে বেড়াতে গিয়েছে রামকৃষ্ণ। বেলুন উঠবে, বেজায় ভিড়। জায়গা নিয়েছে এক পাশে। হঠাৎ নজরে পড়ল, একটি সাহেবের ছেলে গাছে হেলান দিয়ে ত্রিভংগ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেই দেখা, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপনা হয়ে গেল। সমাধি হয়ে গেল রামকৃষ্ণের।

উলোর বামনদাস ঠিকই বলে। বলে, 'বাবাঃ, বাঘ যেমন মানুষ ধরে তেমনি ঈশ্বরী একে ধরে রয়েছেন।'

মধুসূদন এসেছে দক্ষিণেশ্বরে—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এসেছে ব্যারিস্টার হিসাবে। মথুরবাবুর বড় ছেলে দ্বারিক ডেকে এনেছে। বারুদ-ঘরের সাহেবদের সঙ্গে যে মামলার যোগাড় হয়েছে সেই উপলক্ষে। দপ্তরখানার পাশে বড় ঘর। সেই ঘরে বসেছে মাইকেল। বললে, 'শ্রীরামকৃষ্ণকে একবার দেখব।'

খবর গেল রামকৃষ্ণের কাছে। রামকৃষ্ণ যেতে চায় না। অত বড় গণ্যমান্য লোক, দুর্দান্ত সাহেব, তার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে কি! হৃদয়কে বলে, 'তুই যা।'

হৃদয় গেলে হবে কেন? দ্বারিক বিশ্বাস আবার তাগিদ পাঠাল।

নারায়ণ শাস্ত্রী ছিল সামনে, রামকৃষ্ণ বললে, 'তুমিও সঙ্গে চল। ইংরিজি-টিংরিজি জানি না—কি বলতে কি বলব তার ঠিক নেই—'

দু'জনে এসে দাঁড়াল মাইকেলের মুখোমুখি। রামকৃষ্ণ ঠেলে দিল নারায়ণ শাস্ত্রীকে। বললে, 'তুমিই কথা কও।'

নারায়ণ শাস্ত্রী সংস্কৃতে আলাপ চালাল।

মাইকেল বললে, 'বাংলাতেই কথা বলুন—'

নারায়ণ শাস্ত্রী বললে, 'তুমি নিজের ধর্ম কেন ছাড়লে?'

মাইকেল পেট দেখাল। বললে, 'পেটের জন্যে।'

'পেটের জন্যে?' চটে উঠল নারায়ণ শাস্ত্রী: ''পেটের জন্যে তুমি ধর্ম ছাড়লে? তোমার বাপ-পিতেমোর ধর্ম? যে পেটের জন্যে ধর্ম ছাড়ে তার সঙ্গে কী কথা কইব!' ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলে।

'কিন্তু আপনি কিছু বলুন'—মাইকেল মিনতি করলে রামকৃষ্ণকে।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল রামকৃষ্ণ। বললে, 'আশ্চর্য, আমি কিছুই বলতে পারছি না। কে যেন আমার মুখ চেপে ধরছে।'

রামকৃষ্ণের চাইতে মাইকেল বয়সে বারো বছর বড়। তা হলে কি হয়, করজোড় করল মাইকেল। বললে, 'আমাকে কেন আপনার কৃপা হবে না? আমি আপনার ভক্ত—'

'সে কথা নয়। আমি তো চাই কথা বলতে, কিন্তু বারে বারে কে যে আমার মুখ চেপে ধরছে, কথা কইতে দিচ্ছে না।'

মরমে মরে গেল মাইকেল। সে কি এত অভাজন? এত পরিত্যাজ্য?

বাজল বুঝি রামকৃষ্ণের। বললে, 'গান শোনো। গান শুনলে শান্তি পাবে।'

রামপ্রসাদী গান ধরল রামকৃষ্ণ। রক্তাক্ত ক্ষতে যেন প্রলেপ পড়ল। শান্তিতে চোখ বুজল মাইকেল।

কিন্তু নারায়ণ শাস্ত্রীর রাগ যাবার নয়। রামকৃষ্ণের ঘরের সামনেকার দেয়ালে কয়লা দিয়ে বড়-বড় অক্ষরে বাংলায় সে লিখলে: পেটের জন্যে ধর্ম ছাড়া মূঢ়তা।

মথুরকে বামনি বলত, প্রতাপরুদ্র। কত কি করলেন প্রাণ ঢেলে। আলাদা ভাঁড়ার করে দিলেন সাধুসেবার জন্যে। গাড়ি পালকি যাকে যা দিতে বলেছে

রামকৃষ্ণ, দিয়ে দিলেন। একবার সাধ হল ভালো জরির সাজ পরবে, আর রুপোর গড়গড়িতে তামাক খাবে। সব কিনে পাঠিয়ে দিলেন মথুরবাবু। জরির সাজ পরে গড়গড়ি বাগিয়ে নানারকম করে টানতে লাগল রামকৃষ্ণ—একবার এ পাশ থেকে, একবার ও পাশ থেকে, উঁচু থেকে, নিচু থেকে। মনকে বোঝাল, মন, এরই নাম সাজ আর এরই নাম রুপোর গড়গড়িতে তামাক খাওয়া। অমনি খুলে ফেলল সাজ, ছুঁড়ে ফেলল গড়গড়ি।

'কামনা থাকতে, ভোগলালসা থাকতে মুক্তি নেই। আমি তারি জন্যে যা-যা মনে উঠত অমনি করে নিতাম। বড়বাজারের রং-করা সন্দেশ খেতে ইচ্ছে হল। খুব খেলুম। তার পর অসুখ। ধনেখালির খইচুর, কৃষ্ণনগরের সরভাজা—তাও খেতে সাধ হয়েছিল। ছাড়িনি একটাও—'

মথুরবাবু এসে বললেন, তাঁর স্ত্রী জগদম্বার মরণাপন্ন অসুখ। ডাক্তার-কবরেজরা জবাব দিয়ে দিয়েছেন। স্ত্রী তো চলেছেই, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর এই বিষয়-আশয়ও শেষ হয়ে যাবে। পাগলের মতো হয়ে গিয়েছেন। তাঁকে ধরে পাশে বসাল রামকৃষ্ণ। কি হয়েছে ? এত উতলা হবার আছে কী !

রামকৃষ্ণের পায়ের উপর পড়লেন। বললেন, 'আমার যা হবার তা তো হবেই। কিন্তু, বাবা, তোমার সেবা আর করতে পাব না।' ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন মথুরবাবু।

করুণায় মন বুঝি ভরে গেল রামকৃষ্ণের। বললে, 'যাও, বাড়ি যাও। তোমার স্ত্রী দিব্যি ভালো হয়ে উঠেছেন।'

ফুল্ল মনে বাড়ি ফিরলেন মথুরবাবু। দেখলেন, এ কি ইন্দ্রজাল, স্ত্রীর দেহে আর রোগ নেই।

'ইন্দ্রজাল নয়। ঐ রোগ এই দেহের মধ্যে টেনে এনেছি।' বললে রামকৃষ্ণ। ছয় মাস ভুগল এক নাগাড়ে।

বর্ষা আসতেই মথুরবাবু ভাবিত হলেন। গঙ্গার জল এখন লোনা হয়ে উঠবে। আর, খাবার জল বলতে তো ঐ গঙ্গাজলই। নির্ঘাৎ তবে ফের পেটের অসুখ করবে রামকৃষ্ণের। এখানে থেকে তবে আর কাজ নেই। কয়েক দিন বরং দেশের বাড়িতে গিয়ে থেকে এস। মন্দ কি। দেখে আসি একবার জন্মভূমি। আট বছর এই দেশ ছাড়া। দেখে আসি একবার সারদাকে।

'মা গো, তুমি যাবে কামারপুকুর ?' চন্দ্রমণিকে শুধোল রামকৃষ্ণ।

'না বাবা, গঙ্গাতীর আর ছাড়ব না। এইখানেই কাটিয়ে যাব বাকি জীবন। তুমি বামনিকে নিয়ে যাও।'

না-বলতেই প্রস্তুত বামনি। আর কে যাবে সঙ্গে ? কেন, হৃদয় ? দেশে-গাঁয়ে রটে গেছে, পাগল হয়ে গিয়েছে রামকৃষ্ণ। কাছা খুলে ফেলে আল্লা-আল্লা করছে। স্ত্রীবেশ ধরে গয়না-গাটি পরে ঢপ গাইছে। একবার চোখে আঙুল দিয়ে সবাইকে দেখিয়ে আসি।

মথুরবাবু আর তাঁর স্ত্রী দুজনে মিলে সব গোছগাছ করে দিচ্ছেন। যাতে দেশে গিয়ে রামকৃষ্ণের তৃণমাত্র না অসুবিধে হয়। কামারপুকুরের সংসার তো শিবের

সংসার। জানতেন তা দুজনে—তাই "ঘর-বসত" সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছেন। মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার সময় বাপ-মা যেমনটি করে দেয় সাজিয়ে-গুছিয়ে। প্রদীপের সলতেটি থেকে দাঁতের খড়কে কাঠিটি পর্যন্ত।

গ্রামে আনন্দ-বাজার বসে গেল। ওরে, শুনেছিস, রামকৃষ্ণ এসেছে। সঙ্গে কে এক ভৈরবী। হাতে মস্ত ত্রিশূল। চল দেখবি চল।

জয়রামবাটিতে সারদাকে খবর পাঠাল রামকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণী এসেছেন, তুমি এস। তুমি নইলে কে ওঁর সেবা করবে? সঙ্গে মা আসেননি, কিন্তু উনিই তোমার শ্বশ্রুমাতা।

সত্যিকারের এই প্রথম স্বামিসন্দর্শন সারদার। চোদ্দ পেরিয়ে সে এখন পনেরোয় পা দিয়েছে। সে এখন স্বভাবসুন্দরাঙ্গা কিশোরী। শুভাননা। সর্বকল্যাণকারিণী। "কীর্তির্লক্ষ্মীধৃতির্মেধাপুষ্টিঃশ্রদ্ধাক্ষমামতিঃ"-র সমাহার। স্বামীকে প্রথম দেখেছে ছ-সাত বছর বয়সে। ভালো করে কিছু মনে পড়ে না। পা ধুয়ে চুল দিয়ে মুছে দিয়েছিল—এই একটু মনে পড়ে ঝাপসা-ঝাপসা। বিয়ের সময় লোকে বলেছিল, পাগলা-জামাই হয়েছে। শিব গেল শ্বশুরবাড়ি, সবাই বলতে লাগল, 'ও মা উমা, তোর এই ছিল কপালে! শেষে একটা ভাঙড়ের হাতে পড়লি?' এখন তো শুনি আরো কত কি কথা! কে জানে এখন গিয়ে না-জানি কি রকম দেখব!

বাড়ির মধ্যে কোথায় গিয়ে লুকিয়েছে সারদা। কিন্তু হৃদয়ের চোখ এড়াবে এমন তার সাধ্য নেই। খুঁজে বার করে ফেলেছে সারদাকে। বলছে, 'এই দেখ তোমার জন্যে কত পদ্মফুল যোগাড় করে এনেছি।' সারদা তো লজ্জায় এতটুকু। 'দাঁড়াও, পদ্মফুল দিয়ে তোমার পাদপদ্মদুখানি পূজা করি।'

কিন্তু যাঁর পাদপদ্মের লোভে সারদা ছুটে এসেছে তিনি কোথায়?

দূর থেকে দেখলে রামকৃষ্ণকে। কী রূপ, কী রঙ! সৌন্দর্য যেন স্থির হয়ে বসে নেই, আনন্দে লীলা করে বেড়াচ্ছে।

ঘরের বার হলেই মেয়ে-পুরুষ হাঁ করে দেখে রামকৃষ্ণকে। সঙ্গে হৃদয়, ভূতির খালের দিকে বেড়াতে চলেছে এক দিন। মেয়েরা জল ভরছে খাল থেকে। আর জল-ভরা! চার পাশ থেকে দেখছে সবাই একদৃষ্টে। বলাবলি করছে, ওরে, ঐ ঠাকুর—ঐ রামকৃষ্ণ। আঙুল তুলে দেখাচ্ছে পরস্পরকে।

'ও হৃদু, আমায় ঘোমটা দিয়ে দে, আমায় ঘোমটা দিয়ে দে—'

হৃদয় তো অবাক।

'ওরে, ওরা আমার বাইরের রূপ দেখছে! কী সর্বনাশ! শিগ্‌গির আমায় ঘোমটা দিয়ে দে। নইলে আমি এক্ষুনি ন্যাংটা হব।'

'না মামা, এখানে ন্যাংটা হয়ো না।' হৃদয় গম্ভীর হয়ে বললে, 'এখানে ন্যাংটা হলে লোকে কী বলবে!'

'নইলে যে পালাবে না মেয়েগুলো।'

'দাঁড়াও, আমি তোমার মুখ ঢেকে দিচ্ছি। কেউ আর তোমার রূপ দেখবে না।'

থালি গায়ে চাদর ছিল রামকৃষ্ণের, তাই দিয়ে হৃদয় তার মুখ ঢেকে দিলে।

রাত থাকতেই ওঠে রামকৃষ্ণ। উঠেই ফরমাস করে সারদাকে আর লক্ষ্মীর মাকে: আজকে এই-এই সব খাব। এই-এই সব রেঁধো। সব যোগাড় করে রাঁধে দুজনে। এক দিন পাঁচফোড়ন ছিল না, লক্ষ্মীর মা বললে, 'তা অমনিই হোক, নেই তার কি হবে?' শুনতে পেয়েছে রামকৃষ্ণ। বললে, 'সে কি গো, পাঁচফোড়ন নেই, এক পয়সার আনিয়ে নাও না। যাতে যা লাগে তা বাদ দিলে হবে কেন? তোমাদের এই ফোড়নের গন্ধের বেন্নন খেতে দক্ষিণেশ্বরের মাছের মুড়ো আর পায়েসের বাটি ফেলে এলুম, আর তাই তোমরা বাদ দিতে চাও?' দুই জা তখন লজ্জা রাখবার জায়গা পায় না।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার আরেক রকম সুর ধরে রামকৃষ্ণ: 'আঃ, আমার এ কি হল? সকাল থেকে উঠেই কি খাব! কি খাব! রাম রাম!'

এক দিন খেতে বসেছে দুজনে—রামকৃষ্ণ আর হৃদয়। রেঁধেছেও দুজনে—লক্ষ্মীর মা আর সারদা। লক্ষ্মীর মা পাকা রাঁধুনি, তার রান্নায় তার বেশি। আর সারদা ছেলেমানুষ বউ, তার রান্না অখ্যাদ্য!

লক্ষ্মীর মা যেটা রেঁধেছে সেটা মুখে তুলে রামকৃষ্ণ বললে, 'ও হৃদু, এ যে রেঁধেছে সে রামদাস বদ্যি।' আর সারদা যেটা রেঁধেছে সেটা মুখে ঠেকিয়ে বললে, 'আর এ যে রেঁধেছে সে ছিনাথ সেন।'

রামদাস ভালো চিকিৎসক আর শ্রীনাথ সেন হাতুড়ে।

রামকৃষ্ণ বুঝি একটু ঠেস দিলে সারদাকে!

হৃদয় বললে, 'তা হোক। তবে তোমার এ হাতুড়ে তুমি সব সময়ে পাবে—গা টিপতে, পা টিপতে পর্যন্ত। ডাকলেই হল। এক পায়ে খাড়া। আর রামদাস বদ্যি? তার অনেক টাকা ভিজিট, সব সময়ে পাবেও না তাকে। লোকে আগে হাতুড়েকেই ডাকে—সে তোমার সব সময়েব বান্ধব!'

'তা বটে, তা বটে।' হাসতে লাগল রামকৃষ্ণ: 'ও সব সময়ে আছে।'

বৃষ্টি হয়ে গেছে সেদিন, ভূতির খালের দিক থেকে একা-একা ফিরছে রামকৃষ্ণ। পায়ে কি যেন একটা ঠেকল। চেয়ে দেখল মস্ত একটা মাগুর মাছ। পুকুর থেকে রাস্তায় কখন উঠে এসেছে। পায়ে করে ঠেলে-ঠেলে এনে মাছটাকে রামকৃষ্ণ পুকুরে ছেড়ে দিলে। বললে, 'পালা, পালা! হৃদে দেখতে পেলে তোকে আর আস্ত রাখবে না।'

পরে বললে হৃদয়কে, 'ওরে এই এত বড় একটা মাগুর মাছ—হলদে রং—রাস্তায় উঠে এসেছিল পুকুর থেকে—'

'কই? কী করলে?' চার দিকে তাকাতে লাগল হৃদয়।

'পুকুরে ছেড়ে দিলুম।'

'ও মামা, তুমি করলে কি গো! এত বড় মাছটা তুমি ছেড়ে দিলে! আঃ, আনলে কি রকম ঝোল হত—'

জয়রামবাটিতে এক দিন ভোর-রাতে একটা বাছুর খুব চেঁচাচ্ছে। গরু দুইছে এ-সময়, মা'র কাছে বাছুরটাকে ঘেঁষতে দেওয়া হচ্ছে না। দূরে বেঁধে রেখেছে খুঁটিতে। প্রবোধ মানছে না বাছুর মা'র স্তন্যের জন্যে আর্তনাদ করছে।

'যাই মা যাই,' ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে সারদা, করুণারূপিণী কিশোরী, বলছে, 'আমি এক্ষুনি তোকে ছেড়ে দেব, এক্ষুনি তোকে ছেড়ে দেব—'

দ্রুত পায়ে এসে বাছুরের বন্ধন মুক্ত করে দিলে সারদা।

* ৩৪ *

ও মামি, ও কী হচ্ছে?

সারদা হকচকিয়ে উঠল। সংগে-সংগে লক্ষ্মীও। বর্ণপরিচয় পড়ছিল দুজনে। পিছন থেকে হুমকে উঠল হৃদয়: 'বই পড়া হচ্ছে?'

সারদার হাত থেকে কেড়ে নিল বই। বললে, 'মেয়েছেলের লেখাপড়া শিখতে নেই। শেষে কি-নাটক নভেল পড়বে?'

লক্ষ্মীর বইও কাড়তে গেল, পারলে না। ঝিয়ারি মানুষ, তার সংগে আঁটবে কে! সটান গেল সে পাঠশালায় পড়ে আসতে। লুকিয়ে সারদাও আরেকখানা কিনে আনাল বর্ণপরিচয়। লক্ষ্মী শিখে এসে পড়াতে লাগল সারদাকে।

'কী হবে লিখে-পড়ে? পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না। এক ফোঁটাই পড়ুক, তাও না।'

পড়ার চেয়ে শোনা ভালো। শোনার চেয়ে দেখা ভালো। গুরুমুখে বা সাধু-মুখে শুনলে ধারণা বেশি হয়। আর শাস্ত্রের অসার ভাগ চিন্তা করতে হয় না। শোনার চেয়ে দেখা আরো ভালো। দেখলে আর সন্দেহ থাকে না। শাস্ত্রে অনেক কথাই তো আছে। কিন্তু ঈশ্বরদর্শন না হলে, তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি না হলে, চিত্তশুদ্ধি না হলে—সবই বৃথা।

তোতাপুরী বলে দিয়েছিল, স্ত্রীকে কাছে-কাছে রাখবি। স্ত্রী কাছে রেখেও যার ত্যাগ-বৈরাগ্য-বিবেক-বিজ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকে, সে-ই আসল ব্রহ্মজ্ঞ।

সারদাকে কাছে ডেকে নিল রামকৃষ্ণ। শোনাতে লাগল ঈশ্বরের কথা।

'চাঁদা মামা সকল শিশুর মামা। তেমনি ঈশ্বর সকলের আপনার। তুমি ডাকো তো তোমাকেও তিনি দেখা দেবেন।' কাছে বসিয়ে স্নেহস্বরে বলছে রামকৃষ্ণ: 'বই-শাস্ত্র ঈশ্বরের কাছে পেঁছুবার পথ বলে দেয়। পথ জানা হয়ে গেলে আর বই-শাস্ত্রের দরকার কি? তখন নিজে কাজ করতে হয়।'

কুটুম্ববাড়ি তত্ত্ব করতে হবে। কি-কি জিনিস কিনবে তারই ফর্দ-সমেত চিঠি এসেছে। কিন্তু চিঠি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক পরে পাওয়া গেল চিঠি। তখন আনন্দ আর ধরে না। দেখ, দেখ, কি লিখেছে চিঠিতে। কি পাঠাতে হবে। পাঁচ সের সন্দেশ আর একখানা কাপড়। ব্যস, হয়ে গেল। এখন আর চিঠির কি দরকার! উড়েই যাক বা পুড়েই যাক, কিছু আসে-যায় না। আসল খবর জানা হয়ে গিয়েছে। চিঠির ততক্ষণই দরকার, যতক্ষণ তত্ত্বের খবরটুকু জানা যায়নি। জানার পর শুধু পাবার চেষ্টা।

কৃপা হলেই পাবে। কিন্তু কৃপা পাবে কি করে? কৃ আর পা, দুয়ে মিলে কৃপা। করলেই পাবে। সুতরাং কাজ করো। কর্তব্য করো। 'শরীরং কেবলং কর্ম'।

'তুমি হবে আমার বিদ্যারূপিণী স্ত্রী।' সারদাকে বললে রামকৃষ্ণ।

বিদ্যারূপিণী স্ত্রী ভগবানের দিকে নিয়ে যায়। আর অবিদ্যারূপিণী স্ত্রী ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, সংসারে ডুবিয়ে রাখে। বিদ্যার সংসারে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ঈশ্বরের ভক্ত। ঈশ্বরই তাদের একমাত্র আপনার লোক. . অনন্ত কালের আপনার। তারা পান্ডবদের মত। সুখ হোক দুঃখ হোক কখনো তাঁকে ভোলে না।

কিন্তু অবিদ্যাতে যদি অজ্ঞান, তবে ঈশ্বর অবিদ্যা করেছেন কেন?

তাঁর লীলা। মন্দটি না থাকলে ভালোটি বুঝবে কি করে? আবার খোসাটি আছে বলেই আম বাড়ে আর পাকে। আমটি তৈরী হলেই তবে খোসা ফেলে দিতে হয়। মায়ারূপ ছালটা আছে বলেই ক্রমে-ক্রমে ব্রহ্মস্বাদ।

কিন্তু বামনির মোটেই ইচ্ছা নয় সারদার সংগে রামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠতা ঘটে। সে বলে এতে ব্রহ্মচর্যের হানি হবে।

সরলা সারদা ভয় পায়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ হাসে।

একদিন রামকৃষ্ণকে গৌরাংগ সাজাল বামনি। সাজাতেই ভাব হয়ে গেল রামকৃষ্ণের।

বামনি সারদাকে ডেকে আনল। বলল, 'কেমন হয়েছে?'

ভাবাবেশ দেখে ভয় পেল সারদা। কোনো রকমে একটা প্রণাম সেরে ছুটে পালাল। বামনির এমন একটা ভাব, রামকৃষ্ণের যা কিছু দিব্যচেতনা সমস্ত তার জন্যে। অন্ধজনকে সেই যেন দৃষ্টিদান করেছে! মহামায়ার কি লীলা, বামনির মধ্যে অহঙ্কার ঢুকে গেল। কি থেকে কী যে হয়ে গেল কেউ কিছু বুঝতে পারল না।

চিনু শাঁখারি তখনো বেঁচে আছে। বুড়ো, অথর্ব। রামকৃষ্ণের কাছে এসেছে প্রসাদ নিতে। তার ভক্তি দেখে বামনি বেজায় খুশি। প্রসাদ পাবার পর এঁটো পরিষ্কার করতে যাচ্ছে চিনু, বামনি বললে, থাক, এ এঁটো আমি তুলব। চিনু তা মানতে রাজি নয়, কিন্তু বামনির রূঢ় নিষেধের কাছে তার আর হাত উঠল না। কিন্তু হৃদয় এল চোটপাট করে। এ কী অনাচার!

গাঁয়ের বামুনের মেয়ে যারা সেখানে ছিল তারাও বামনির বিরুদ্ধে। এখানে চলবে না এ সব অনাসৃষ্টি।

'চিনু ভক্ত লোক, তার এঁটো নেব, তাতে কি?' বামনিও ফণা বিস্তার করলে।

'শাঁখারির এঁটো নেবে, থাকবে কোথা?' হৃদয় এল মুখ খিঁচিয়ে: 'বলি, কে তোমাকে জায়গা দেবে? শোবে কোথা?'

বামনি গর্জন করে উঠল: 'শীতলার ঘরে মনসা শোবে।'

এই থেকে লেগে গেল বিষম ঝগড়া। যেখানে যেমন সেখানে তেমন—এই নীতিবাক্যের ভুল হয়ে গেল বামনির। আর হৃদয়ও কাঠ-গোঁয়ার, দিশপাশের জ্ঞান নেই। মুখের ঝগড়া না মারামারিতে এসে পৌঁছয়। বামনি বুঝি আসে এই ত্রিশূল উঁচিয়ে। কোথা থেকে কী হয়ে গেল, হৃদয় কি-একটা ছুঁড়ে মারলে বামনিকে। জোরে ছুটে এসে লাগল ঠিক কানের কাছাকাছি। রক্ত পড়তে লাগল। কাঁদতে বসল বামনি।

রামকৃষ্ণ কাতর হয়ে পড়ল। 'ওরে হৃদু, তুই কেন এমন করলি ? ওরে, ও যে ভক্তিমতী যশোদা। এমন হলে যে লোক জড় হবে, কেলেঙ্কারি হবে—'

এখন উপায় কি। রামকৃষ্ণই ঠিক করল উপায়। বামনিকে ভাব দিয়ে দিলে। ভয় পাবার ভাব।

থেকে-থেকে উপরের দিকে তাকায় আর ভয় পায়। লাহাদের প্রসন্নময়ীকে সম্বোধন করে বলে, 'ওরে প্রসন্ন, আমার এ-কী হল ? আমি এখন কি করি, কোথা যাই ! জগন্নাথ যাই না বৃন্দাবন যাই।'

এক দিন সত্যি-সত্যি কোথায় চলে গেল বামনি কেউ টের পেল না। ছ বৎসরের নিরন্তর-বাসের মায়া কেটে গেল এক মুহূর্তে।

চাতুর্মাস্যের সময় প্রায়ই এখন কামারপুকুরে আসে রামকৃষ্ণ। সেবার এসে অসুখে পড়েছে। পেটের অসুখ। পথ্য সাবু-বার্লি।

রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে পাট চুকিয়ে শুতে গেছে মেয়েরা। ভাবে টলমল করতে-করতে দরজা খুলে বাইরে হঠাৎ বেরিয়ে এল রামকৃষ্ণ। লক্ষ্মীর মাকে উদ্দেশ করে বললে, 'সে কি গো, তোমরা যে সব শুতে গেলে ! আমাকে খেতে দেবে না ?'

সকলে তো হতবুদ্ধি। লক্ষ্মীর মা বললে, 'সে কি কথা ? এই যে তুমি খেলে দুধ-বার্লি—'

'কই খেলুম ! আমি তো এই দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি। কই খাওয়ালে !'

বুঝতে কারু বাকি রইল না, ভাবাবেশ হয়েছে রামকৃষ্ণের। কিন্তু উপায় ? ঘরে তো কিছুই তেমন খাবার নেই। কি দেব এই পেট-রোগা মানুষকে ?

'ঘরে তো তেমন কিছু নেই। শুধু মুড়ি আছে।' বললে লক্ষ্মীর মা। 'তা, খাবে মুড়ি ? তাই দুটি খাও না। পেটের অসুখ করবে না তাতে।'

থালায় করে মুড়ি আনল। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে রইল রামকৃষ্ণ। বললে, 'শুধু মুড়ি আমি খাব না।'

কিন্তু ঘরে আর কিছু নেই যে। তোমার এই পেটের অসুখে অন্য-কিছুই বা আর কি দেওয়া যায় ? দোকান-পসার এখন বন্ধ। সাধ্য নেই সাবু-বার্লি কিনে এনে তোমাকে এখন জ্বাল দিয়ে দি।

ও আমি খাব না। অভিমানে মুখ ভার করে রইল রামকৃষ্ণ।

ভাইপো রামলালকে তখন বেরুতে হল বাজারে। ঝাঁপ ফেলে ঘুমিয়ে পড়েছে দোকানি, ডাকাডাকি করে তার ঘুম ভাঙাল। মিষ্টি কিনলে এক সের। বাড়িতে এসে মুড়ির থালার পাশে নামিয়ে রাখল মিষ্টির হাঁড়ি। রামকৃষ্ণের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, আরো দুটি মুড়ি দাও। থালায় আরো মুড়ি ঢেলে দিলে লক্ষ্মীর মা। আনন্দে খেতে লাগল রামকৃষ্ণ।

কী সর্বনাশ যে হবে কল্পনা করতেও ভয় পেল সকলে। মাসের অর্ধেক দিন সাবু-বার্লি খেয়ে যে কোনো-মতে বেঁচে আছে তার এই রাক্ষুসে খাওয়া ! এত রাত্রে, পেটের এই অবস্থায় ! ডাক্তার-বদ্যিতে আর কুলোবে না।

ভয়ে-ভয়ে রাত কাটাল সারদা। সঙ্গে-সঙ্গে লক্ষ্মীর মা।

কিন্তু পর দিন দিব্যি সুস্থ আছে রামকৃষ্ণ। দেহে কোনো রোগ-উদ্বেগ নেই। তার দেহে বসে ঐ খাওয়া কে খেয়েছে কে বলবে।

সেবারে এসে শ্বশুরবাড়ি গেছে। কি একটা ক্রিয়াকর্ম ছিল সেদিন, অনেক লোক-খাওয়ানো হয়েছে। রাতের খাওয়া চুকে গিয়েছে অনেকক্ষণ, শুতে গিয়েছে সবাই। হঠাৎ রামকৃষ্ণ বিছানা থেকে উঠে পড়ল। বললে, 'আমি খাইনি না কি? ভীষণ খিদে পেয়েছে যে। কিছু খেতে দাও—'

কি হবে! ঘরে যে এখন কিছুই নেই। মেয়েরা মাথায় হাত দিয়ে বসল। খুঁজে-পেতে দেখা গেল হাঁড়িতে কতগুলো পান্তা ভাত শুধু পড়ে আছে। ওমা, তাও কি দেওয়া যায় জামাইকে!

তবু, ভয়ে-ভয়ে তাই বলতে গেল সারদা। বললে, 'হাঁড়িতে পান্তা ভাত ছাড়া আর কিছু নেই।'

'তাই নিয়ে এস।' হুঙ্কার ছাড়ল রামকৃষ্ণ।

তবু কুণ্ঠা যায় না সারদার। বললে, 'সঙ্গে তো আর কোনো তরকারি নেই।'

'আছে।' রামকৃষ্ণ আবার গর্জন করল। 'মাছ-চাটুই যে করেছিলে দেখ এক-আধটু পড়ে আছে কি না—'

সারদা ছুটে গেল রান্নাঘরে। দেখল বাটির এক কোণে ছোট্ট একটি মৌরলা মাছ পড়ে আছে। আর তার আশে-পাশে একটুখানি কাই। তাই রাখলে ভাতের পাশে। উল্লাস আর ধরে না রামকৃষ্ণের। ছোট্ট ঐ একটি মাছের সহযোগে এক রেক চালের ভাত খেয়ে ফেলল। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সারদা। এ কি আহার না আহুতি! এ নিছক পাগলামি। মনে-মনে আপশোষ করতে লাগল সারদার মা।

শুধু মনে-মনেই বা কেন? স্পষ্টাস্পষ্টিই দুঃখ করলে এক দিন। বললে, 'কী পাগল জামাইয়ের সঙ্গেই আমার সারদার বে দিলুম! আহা! ঘর-সংসারও করলে না, ছেলেপিলেও হল না, মা বলাও শুনলে না—'

শুনতে পেল রামকৃষ্ণ।

বললে, 'শাশুড়ি ঠাকরুন, সে জন্যে দুঃখ করবেন না। আপনার মেয়ের এত ছেলেমেয়ে হবে যে শেষে দেখবেন মা ডাকের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছে—'

'তা যা বলে গেছেন তাই ঠিক হয়েছে, মা।' শ্রীমা এক দিন তাই বললেন, স্ত্রী-ভক্তদের। 'আমার নরেন, বাবুরাম, রাখাল, শরৎ। আমার দুর্গাচরণ নাগ—' ভক্ত মেয়েরা ঘিরে বসল শ্রীমাকে।

'মঠে যেবার প্রথম দুর্গাপূজা করালে নরেন, আমাকে নিয়ে গেল। আমার হাত দিয়ে পঁচিশ টাকা দক্ষিণা দেওয়ালে। মোট চৌদ্দশ টাকা খরচ করেছিল নরেন। চারদিকে লোকারণ্য, ছেলেদের খাটা-খাটনির অন্ত নেই। হঠাৎ নরেন এসে আমাকে বললে, 'মা, আমার জ্বর করে দাও।' ওমা, খানিক বাদে সত্যি-সত্যি তার হাড় কাঁপিয়ে জ্বর এসে গেল। সে কি কথা? এখন কি হবে। 'সেধে জ্বর নিলুম, মা। ছেলেগুলো প্রাণপণে খাটছে বটে, তবু কখন কি ভুলচুক করে বসবে আর আমি

রেগে উঠে কখন থাপ্পড় মেরে বসব ঠিক নেই। তাই ভাবলুম, কাজ কি, থাকি কিছুক্ষণ জ্বরে পড়ে।' কাজকর্ম চুকে আসতেই বললুম, 'ও নরেন, এখন তা হলে ওঠো।' হ্যাঁ মা, এই উঠলুম আর কি। ঝটকা মেরে যেমন তেমনি উঠে বসল নরেন।'

॥ ৩৫ ॥

এক গলা ঘোমটা টেনে স্বামীর কাছে এসে দাঁড়ায় সারদা। যখন পাশে এসে বা বসে তখনো ঘোমটা খোলে না। কি করে সলতেটা রাখতে হয় প্রদীপে—তা থেকে শুরু করে—কি করে চলতে হয় ট্রেনে-নৌকায় সব তাকে শেখায় রামকৃষ্ণ। গৃহস্থালীর ছোটখাটো ব্যাপার, দৈনন্দিন খুঁটিনাটির কাঁটাখোঁচা। নেমন্তন্ন বাড়ির ভোজ থেকে শুরু করে শাকপাতার কচুঘেঁচু। বাড়ির কে কেমন লোক, কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে তার ফিরিস্তি। শুধু নিজের বাড়িতেই বা কেন? ধরো আর কারু বাড়িতে বেড়াতে গেলে, তখন সেখানেই বা কেমনধারা চলবে-ফিরবে, জেনে রাখো। আমি না-হয় টাকা ছুঁই না, কিন্তু তোমার হাতে তো টাকা আসবে, করতে হবে কত দেবতা-অতিথির সেবা, কত ভক্ত-বন্ধুর পরিচর্যা—সূক্ষ্ম করে হিসেব রাখবে মনে-মনে। গরমিল-গোঁজামিলের ধার ধারবে না।

শুধু তাই? তার পর ঈশ্বরসংবাদ আছে না? শুধু কি সংসারের রান্না-ভাঁড়ারের খবর নিয়ে ক্ষান্ত হবে, নেবে না সেই সমস্তসাক্ষী ভগবানের সম্ভাষণ? কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু তার মন পড়ে আছে আড়ায়, যেখানে তার ডিম রয়েছে। বড়লোকের বাড়িতে ঝি কাজ করছে, কিন্তু তার মন পড়ে আছে নিজের দেশের বাড়িতে। মনিবের ছেলেদের বলে, আমার রাম, আমার হরি, কিন্তু মনে-মনে বেশ জানে, এরা আমার কেউ নয়। তেমনি সংসারে কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরে ফেলে রাখবে।

আর, ঈশ্বরও শুধু এই মনটিই দেখেন। একলব্য মাটির দ্রোণ সামনে রেখে বাণ-চালনা শিখেছিল। তার মনের একাগ্রতায়ই সে-মাটির মূর্তি গুরু হয়ে উঠেছে। কিন্তু মন বিষয়ে ফেলে রাখো, ভিজে-দেশলাই হয়ে উঠবে। যতই কেননা ঘষো, জ্বলবে না কিছুতেই।

পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরবার জন্যে মাঠে ঘুনি পাতে দেখনি? ঘুনির ভেতরে চিক-চিক করে জল যায় দেখে ছোট-ছোট মাছগুলোর ভারি ফুর্তি, খেলতে-খেলতে তারাও ঢুকে যায় ভিতরে। যে পথে ঢুকেছে সেই পথেই বেরিয়ে আসতে পারে অনায়াসে, কিন্তু জলের মিষ্টি শব্দ আর মাছের সঙ্গে খেলা তাদের ভুলিয়ে রাখে। আর বেরিয়ে আসবার চেষ্টাও করে না, সেইখানেই আটকে থাকে। পরে মারা পড়ে। তেমনি সংসারের বাইরের চাকচিক্য দেখে লোকে সাধ করে ঢোকে আর মায়া-মোহে জড়িয়ে পড়ে পথ খুঁজে পায় না। 'গতায়াতের পথ আছে রে তবু মীন পলাতে

নারে।' কিন্তু এমন মাছও আছে যে, ঘুনির কাছে গিয়ে ঐ দেখে লাফিয়ে অন্য দিকে বেরিয়ে যায়।

তাকাও এবার অন্য দিকে। আকাশের দিকে। 'যঃ সর্বতঃ সর্বং জগৎ প্রকাশয়তি স আকাশঃ।" যিনি সমস্ত দিক থেকে জগৎকে প্রকাশিত করছেন তিনিই আকাশ। যিনি সামর্থ্যবান তাঁরই নাম ঈশ্বর। সর্বদা ও সর্বত্র আছেন তাই তিনি ভব। সর্বসংহারকে বলে শর্ব। রোদন করান বলে রুদ্র। পরমৈশ্বর্যবান বলে ঈশান। কল্যাণকর্তা বলে শিব। পশু ও পাশের ঈশ্বর বলে পশুপতি। সমস্ত বিশ্বে পূর্ণ হয়ে আছেন বলে পুরুষ। সর্বব্যাপক ও সর্বনিয়ামক বলে অন্তর্যামী। ভজনের যোগ্য বলে ভগবান। আর তিনি উৎপত্তি ও প্রলয়ের পরেও অবশিষ্ট থাকেন বলে তাঁর আরেক নাম বা আদি নাম "শেষ।" তাঁকে প্রণিপাত করো। নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করে দাও। কিন্তু, জানো তো, তিনি আমাদের কাছে কোনো দূরের জিনিস বা দুষ্প্রাপ্য জিনিস নন। তিনি আমাদের বাপ-মা। পালন করেন বলে তিনি আমাদের বাপ, আর সন্তানের সুখ আর উন্নতি কামনা করেন বলে মা।

স্ত্রী-সঙ্গে বসে এমনি সেই অসঙ্গের আলাপ।

ঘৃতকুম্ভসমা নারী আর জ্বলদ্‌বহ্নিসমান পুরুষ—রাখবে না পাশাপাশি। কিন্তু নারী এখানে ঘৃত নয়, সম্মুখে জ্বলছে যে অর্চিষ্মান অগ্নি সে তারই দাহিকা। যে ভাস্বর সূর্য সে তারই দীধিতি। "দেবতা সা ন মানুষী।"

সেই কোপনি-ধারী সাধুর গল্প জানো না?

গুরু বলছে সাধুকে, নির্জনে গিয়ে সাধনা করো। বনের কোণে কুঁড়ে বেঁধে সাধন-ভজনে মন দিয়েছে সাধু। কিন্তু কোত্থেকে জুটল এসে ইঁদুরের উৎপাত। ইঁদুর আর-কিছুই করে না, স্নান করে ভিজে কৌপীন যখন শুকোতে দেয় সাধু, তখন এসে কেটে দেয়। ভিক্ষেয় বেরিয়ে সাধু জনে-জনে নালিশ করে। আপনাকে রোজ-রোজ কে কৌপীন দেবে? একটা বেড়াল পুষুন। উপদেশ দিলে কেউ-কেউ। ভালো কথা—সাধু তখুনি এক বেড়ালের বাচ্চা যোগাড় করলে। বেড়ালের ভয়ে পালাল ইঁদুর। কিন্তু বেড়ালের জন্যে রোজ-রোজ দুধ ভিক্ষে করে আনা কঠিন হয়ে উঠল। বারো মাস কে আপনাকে দুধ দেবে? একটা গরু পুষুন। বেড়ালও খাবে নিজেও পরিতৃপ্ত হবেন। তাই সই। দুধালো গরু আনলে সাধু। এখন থেকে ঘরে-ঘরে খড়-বিচালি ভিক্ষে করতে লাগল। নিত্যি-নিত্যি কে আপনাকে খড় জোগাবে? আপনার কুটিরের কাছে পতিত জমি পড়ে আছে, তাই চষে খড় লাগান। মন্দ কি, হাল-বলদ নিয়ে এসে পতিত জমিতে লাঙল চালাল সাধু। এখন তবে গোলাবাড়ি করতে হয়, নইলে ফসল রাখবে কোথায়? সাধু তাই নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, এমন সময় গুরু এসে উপস্থিত। চারদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গুরু প্রশ্ন করলেন, এ সব কী? সাধু অপ্রতিভ হয়ে গেল। বললে, 'এক কৌপীনকা ওয়াস্তে।'

এক কোপনির জন্যে এত কষ্ট! আর সংসারী লোকের স্ত্রী-পুত্র, চাকরি-বাকরি, ঘর-বাড়ি, জিনিস-পত্র, টাকা-পয়সা, লোক-লৌকিকতা—যন্ত্রণার কি অন্ত আছে?

তাই তো চৈতন্যদেব বলেছেন, 'শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই, সংসারী জীবের কভু গতি নাই।'

তবে তাদের উপায় ? হাসল রামকৃষ্ণ। বললে, উপায় তুমি।

হ্যাঁ, তুমি। তুমিই সমস্ত জীবের জননী। তুমি সংসারসারভূতা সুরেশ্বরী।

কিন্তু এ সব কথায় সারদার ষোলো আনা সুখ কই ? তাকে যে পাড়ার সকলে 'পাগলের বউ' বলে খেপায়। স্বামিনিন্দা সহ্য করতে পারে না কিশোরী। পাছে বাড়িতে থাকলে পাড়া-বেড়ানো মেয়েদের মুখে স্বামিনিন্দা শুনতে হয়, সারদা চুপি-চুপি ভানু পিসির বাড়িতে চলে আসে। তার দাওয়ায় আঁচল বিছিয়ে শুয়ে থাকে নিরিবিলি। জয়রামবাটির ক্ষেত্র বিশ্বাসের মেয়ে এই ভানু পিসি। কুড়ি বছর বয়সে বিধবা হয়ে চলে আসে বাপের বাড়িতে। সেই থেকেই আছে একটানা। সারদার উপরে বড় টান। তার পর রামকৃষ্ণ যখন আসে শ্বশুরবাড়ি, তখন আর-আর মেয়েরা তাকে 'খ্যাপা জামাই' বলে খেপালেও সে কিছুই বলতে পারে না, মুগ্ধের মত চেয়ে থাকে স্তব্ধ হয়ে।

খ্যাপা যখন তখন মুখের আর আগল কি। এমন সব কথা বলে রামকৃষ্ণ, হাসতে-হাসতে মেয়েদের পেট ছিঁড়ে যায়, লজ্জায় পালাবার পথ পায় না।

'বেশ হল, আগড়াগুলো সব উড়ে গেল।' বললে রামকৃষ্ণ। 'এবার বোসো তবে তোমরা গোল হয়ে। কথা হবে।'

খ্যাপা বাতাস না এলে কি আর আতপের দিন স্নিগ্ধ হয় ?

এক দিন ভানু পিসিকে জিগ্গেস করলে রামকৃষ্ণ, 'তোমার নাম কি ?'

'মানগরবিণী।'

সারদাকে নির্দেশ করল রামকৃষ্ণ। 'এ তোমার কি হয় ? কি বলে ডাকে ?'

'পিসি বলে।'

'তবে আজ থেকে তোমার নাম হল ভানু পিসি।' বলেই গান ধরল রামকৃষ্ণ : 'গরবিণী নাম ঘুচেছে।'

মুখুজ্জেদের পাগলা-জামাইয়ের কাছে ভানু পিসি যায়, এতে তার গৌর-দাদার বড় আপত্তি। কথা বলছে কথা বলছে, হঠাৎ এক সময় চেঁচিয়ে ওঠে রামকৃষ্ণ—'ঐ গৌরদাদা এল !' অমনি ভয়ে পুঁটলি পাকিয়ে যায় ভানু পিসি ; দেখে রামকৃষ্ণ হাসে আর বলে, 'লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়।'

'আপনার কাছে আসি বলে আমার অনেক সইতে হয়।' ম্লান মুখে বললে ভানু পিসি।

'বেশ তো, যখন গৌরদাদা শাসতে আসবে তখন দু'হাত তুলে নাচবি আর বলবি—ভজ মন গৌর নিতাই। গৌরদাদা ভাববে তুই পাগল হয়ে গিয়েছিস, আর তোকে কিছু বলবে না।'

জয়রামবাটি থেকে কামারপুকুরে ফিরছে রামকৃষ্ণ। হঠাৎ ভানুর সঙ্গে দেখা। বললে, 'আমাকে খিলি তৈরি করে খাওয়াতে পারিস ?'

অমনি পান সাজতে ছুটল ভানু পিসি। পান নিয়ে ফিরে এসে দেখে, রামকৃষ্ণ অনেক দূরে চলে গিয়েছে। ভানু পিসি পিছু-পিছু ছুটতে লাগল। কিন্তু

মেয়েমানুষ কত দূরে ছুটবে? তা ছাড়া রামকৃষ্ণ চলেছে জোর কদমে, যেমন তার অভ্যেস। পিছন থেকে নাম ধরে ডাকে এমনও সাহস নেই। তবু থামছে না ভানু পিসি, গোঁ-ভরে ছুটে চলেছে। দু-একখানা গ্রাম বুঝি পার হয়ে গেল, তবু নিবৃত্তি নেই। হঠাৎ, কেন কে জানে, রামকৃষ্ণ পিছন ফিরে দাঁড়াল। ভানু পিসিকে দেখে চক্ষুস্থির।

'এ কি, তুই এত দূর এসেছিস?'

'আপনি যে তখন পান খেতে চাইলেন, তাই নিয়ে এসেছি।' আনন্দে পরিপূর্ণ ভানু পিসি।

ততোধিক আনন্দ রামকৃষ্ণের। বললে, 'তোর হবে—তোর হবে।' বলে হাতে পান নিয়ে হাসিমুখে বললে, 'কী হবে বল দিকি?'

ভানু পিসি চোখ নামাল। তার সে কী জানে।

'তোর আজ ঠেঙানি হবে। মেয়েমানুষ হয়ে এত দূর এলি, এখন বাড়ি ফিরে গেলে গোবেডেন খাবি। এক কাজ কর। কুমোরবাড়ি থেকে একটা হাঁড়ি হাতে করে নিয়ে বাড়ি যা। তা হলে সবাই ভাববে কুমোরবাড়ি গিয়েছিলি।'

সেই থেকে ভক্তদের পান খাইয়ে এসেছে ভানু পিসি। বলেছে, ঠাকুরের প্রসাদী পান। ঠাকুর বলে গেছেন, তুমি আমাকে পান খাওয়াবে নিত্যি। ভক্তসেবাই আমার ঠাকুরসেবা।

শ্যামাসুন্দরী, সারদার মা—সেও আস্তে-আস্তে ঘুরে দাঁড়াল। নির্জনে বসল গিয়ে ঠাকুরের আরাধনায়। ভানু পিসি বিদ্রূপে ঝলসে উঠল: 'কি গো, তখন না বলতে, খ্যাপা জামাই! কি আকাটের হাতে মেয়ে দিলুম—সারদার কত কষ্ট! এখন কেন? এখন কেন সেই খ্যাপা জামাইয়ের পট পুজো করছ?'

শ্যামাসুন্দরীর বাক্য স্তব্ধ। চক্ষু নিষ্পলক! মেনকাও এক দিন বসেছিল শিবের আরাধনায়।

কামারপুকুর থেকে একবার শিওড়ে গিয়েছে রামকৃষ্ণ, হৃদের বাড়িতে। দিদি হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে গিয়ে এক মহা ফ্যাসাদ! দিদি কতগুলো ফুল যোগাড় করেছে, বলছে তোমার পাদপদ্ম বন্দনা করব।

কোনো বারণ শোনে না। ভোলে না ছদ্মবেশে। বলে, গরিবের ঘরে কাঙালের ঠাকুর এসেছ, তোমাকে ছাড়ব না কিছুতেই। জলে পা ধুয়ে দিয়ে চুল দিয়ে মুছে দেব। একটা শুধু বর দাও যেন কাশীতে গিয়ে প্রাণ যায়।

তথাস্তু। সজ্ঞানে কাশীতেই প্রাণত্যাগ করল হেমাঙ্গিনী।

'কিন্তু আমার কেন ঘুম আসে না বলতে পারো?' মধ্যরাত্রের অন্ধকারে বায়ু-রোগগ্রস্ত ভানু পিসি কেঁদে ওঠে।

'ঘুম আসে না, ঘুমের ওষুধ তো আছে।' কে যেন বলে ওঠে অন্ধকারে।

'কি ওষুধ?'

'সেই যে ভজ-মন-গৌরনিতাই।'

মনে পড়ে যায় ভানু পিসির। অন্ধকারে উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে। দু'হাত তুলে নাচ শুরু করে আর বলে, ভজ মন গৌরনিতাই। বলে, 'ঠাকুর তুমি দেখ আর আমি নাচি।'

তুমি দেখ আর আমি নাচি। তুমি করাও আমি করি। কর্ম না করলে দর্শন হবে কি করে? পানা না ঠেললে জল দেখব কি করে? তুমি আছ, শুধু এ জেনে কি বসে থাকলে চলবে? কাঠে আগুন আছে, শুধু এ তত্ত্বে কি ভাত রান্না হবে? পুকুরপাড়ে বসে থাকলেই কি মাছ পাব? কর্ম করো। কর্মই ফল। খেলাই আসল, হার-জিৎ কিছু নয়। কর্মেই কৃপা। কর্মেই ভক্তি। কর্ম করতে-করতেই কর্মত্যাগ। এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে আরেক হাতে কাজ করছ, শেষকালে এক দিন দু'হাতেই ঈশ্বরকে আঁকড়ে ধরবে। যদি একবার ভক্তি লাভ হয় তবে বিষয়কর্ম বিস্বাদ হয়ে যাবে। ওলা মিছরির পানা পেলে চিটে গুড়ের পানা কে খেতে চায়? তাই তুমি দেখ আর আমি নাচি।

কামারপুকুরে থেকে স্বাস্থ্য ফিরেছে রামকৃষ্ণের। এবার ফিরতে হয় দক্ষিণেশ্বরে। চল রে হৃদু, মা'র কাছে যাই।

বর্ধমানের কাছাকাছি এসে এক মাঠের মধ্যে বসে পড়ল রামকৃষ্ণ।

ওখানে কি?

দেখছিস না, মাঠময় কেমন কাঁটাফুল ফুটে আছে। জানিস না ঐ কাঁটাফুল মহাদেবের পছন্দ। ঐ কাঁটাফুলে পুজো করলে শূলপাণি প্রসন্ন হন।

কিন্তু মাঠময় তো শুধু বিষ্ঠা দেখতে পাচ্ছি। হৃদয় ধমকে উঠল।

বিষ্ঠা-চন্দনে ভেদ নেই রামকৃষ্ণের। সেই মাঠের মধ্যেই বসে পড়ল শিবপুজায়।

এ ভালো হচ্ছে না মামা। কলকাতায় যাবার এই একখানা মাত্র আজ ট্রেন। সারা রাত আজ আর ট্রেন নেই। যদি ঐ দুপুরের গাড়ি এখন ধরতে না পারি, তবে সারা দিন-রাত স্টেশনে পড়ে থাকতে হবে। কে শোনে কার কথা। রামকৃষ্ণ শিবধ্যানে সমাহিত হয়ে রইল।

শুচি-অশুচি জ্ঞান নেই—এ কেমনতরো উন্মাদ! ভীষণ বিরক্ত হল হৃদয়। এখন গাড়ি যদি ফসকে যায় উপায় কি হবে? হঠাৎ হৃদয়ের সেই সাধুর কথা মনে পড়ে গেল, সেই জ্ঞানোন্মাদ সাধু। উলংগ, গায়ে-মাথায় ধুলো, বড়-বড় নখ-চুল-দাড়ি, কাঁধে মড়ার কাঁথার মত একটা ছেঁড়া কাঁথা। কালীঘরের সামনে দাঁড়িয়ে গমগমে গলায় এমন স্তব পড়লে যে মন্দিরটা পর্যন্ত কাঁপতে লাগল থরথর করে। প্রসাদ পেতে কাঙালীরা যেখানে বসেছে পাত পেড়ে সেখানে গিয়ে বসলে। তাড়িয়ে দিলে কাঙালীরা, চেহারায়-পোশাকে সে কাঙালীদের চেয়েও অধম। তাড়িয়ে দিলে বটে কিন্তু উপবাসী রইল না। যেখানে উচ্ছিষ্ট পাতাগুলো ফেলেছে সেখান থেকে কুকুরদের সংগে ভাগ করে এঁটো ভাত খেতে লাগল—

মামা বললে, ওরে হৃদু, এ যে-সে উন্মাদ নয়, এ জ্ঞানোন্মাদ।

তাই শুনে হৃদয় দেখতে ছুটল। বাগান পেরিয়ে চলে যাচ্ছে সাধু, হৃদয় তার পিছু নিলে। বললে, মহারাজ, ভগবানকে কেমন করে পাব কিছু বলে দিয়ে যান—

পাগলের দৃক্‌পাতও নেই। হৃদয়ও নাছোড়বান্দা। সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে, আর মুখে সেই এক বুলি। ভগবানকে কেমন করে পাব, কোথায় পাব?

হঠাৎ রুখে দাঁড়াল পাগল। পথের ধারে নর্দমা ছিল তারই জল দেখিয়ে বললে, 'এই নর্দমার জল আর ঐ গঙ্গার জল যখন এক বোধ হবে তখন পাবি।'

তখন? এ কি একটা মনের মতন কথা হল? নিশ্চয়ই আরো অনেক তর্ক-তত্ত্ব আছে। হৃদয় ফের পিছু নিল। বললে, 'মহারাজ, আমাকে আপনার চেলা করে সঙ্গে নিন।'

তবে রে? মাটি থেকে একটা ইট তুলে নিল পাগল। হৃদয়কে মারতে তাড়া করলে। হৃদয় ছুটে পালাল, দেখতেও পেল না কোন দিকে চলে গেল সেই জ্ঞানোন্মাদ।

মামারও এখন দেখি সেই অবস্থা। নইলে মাঠময় বিষ্ঠার মধ্যে বসে শিবপূজো। শুচি-অশুচি জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যেতে না পারলে ভগবানের স্পর্শ পাওয়া যাবে না। ঐ দ্বন্দ্ববোধের ঊর্ধ্বেই তো সেই ভূমা-ভূমি। 'শুচি-অশুচিরে লয়ে দিব্যঘরে কবে শুবি। তাদের দুই সতীনে পিরীত হলে তবে শ্যামা মারে পাবি।' পুজো শেষ করে ইস্টিশানে পৌঁছে দেখে—যা ভেবেছিল হৃদয়—কলকাতার ট্রেন চলে গিয়েছে। দিনে-রাতে আর ট্রেন নেই।

'তখন বলেছিলাম না?' হৃদয় খিঁচিয়ে উঠল: 'এখন কি করবে কোথায় থাকবে, দেখ। চেনাশোনা আত্মীয়বন্ধু কেউ নেই এখানে যেখানে থাকা যায়, খাওয়া যায় দুটি পেট ভরে।'

রামকৃষ্ণ নিরুত্তর। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্ট। স্থিতি-গতি উদ্যতি-বিরতি সব সমান। ইস্টিশানের অফিসে খোঁজ নিতে গেল হৃদয়। বাঁধাধরা ট্রেন আর নেই বটে তবে একটা সুবিধে হতে পারে। বললে স্টেশন-মাস্টার। কাশী থেকে একটা স্পেশাল গাড়ি আসছে খানিক পরেই—উর্ধ্বতন এক কর্মচারীর স্পেশাল—দেখি তার মধ্যে কোনো এক ফাঁকে জায়গা করে দিতে পারি কিনা। গাড়ি কলকাতায়ই যাচ্ছে, ভয় নেই। সাধারণ যাত্রীর অধিকার নেই সেই গাড়িতে কিন্তু স্টেশন-মাস্টারের মধ্যে কি ভাব চলে এল কে জানে, মামা-ভাগ্নেকে একটা নিরালা কামরায় চড়িয়ে দিলে নির্ভাবনায়। হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে হাসল একবার রামকৃষ্ণ।

দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসে শুনল মথুরবাবু আর তাঁর স্ত্রী তীর্থে যাবেন বলে ধুয়ো তুলেছেন। তাঁদের সাধ রামকৃষ্ণও তাঁদের সঙ্গে যাক। যাবে?

মন্দ কি। যেখানে অনেক লোক একত্র হয়ে অনেক দিন ধরে ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুল হয়ে জমায়েত হচ্ছে সেখানে ঈশ্বর নিশ্চয় প্রকাশিত। এত সাধু ভক্ত যোগী সন্ন্যাসী যেখানে গিয়ে ঈশ্বরভাবে উদ্দীপ্ত হচ্ছে তার মাহাত্ম্য কে অস্বীকার করবে? মাটি খুঁড়লে সব জায়গায়ই জল পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যেখানে পাতকো-ডোবা পুকুর-পুষ্করিণী আছে সেখানে জল সহজে মেলে, সেখানে আর খুঁড়তে হয় না মেহনৎ করে। যেখানে-সেখানেই রান্না করা যায় বটে কিন্তু রান্নাঘরে বেশি সুবিধে।

আমি গেলে আমার সঙ্গে যাবে কিন্তু হৃদয়রাম।

নিশ্চয়ই যাবে। স-শো লোক চলেছে একসঙ্গে—দস্তুরমত একটা বাহিনী

বলতে পারো। থার্ড ক্লাস তিনখানি আর সেকেণ্ড ক্লাশ একখানি গাড়ি রিজার্ভ হয়েছে। যে কোনো স্টেশনে ইচ্ছেমত কাটিয়ে নেওয়া যাবে। গাড়ির শেষ গন্তব্য কাশীধাম। কা শীতলা গঙ্গা ? কাশীতলা গঙ্গা। সেই কাশী।

মাঘ মাস, ১৮৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে তীর্থভ্রমণে বেরুল রামকৃষ্ণ। যাবার আগে ভবতারিণীকে প্রণাম করলে। বললে, 'মা গো, তোকে আরেক বেশে আরেক দেশে দেখে আসি। বেদে যার কথা তন্ত্রেও তার কথা পুরাণেও তারই কথা। সবই তুই। তোর শুধু ভোল ফিরিয়ে মন ভোলানো!'

হলধারী কবেই পূজকের পদ থেকে অবসর নিয়েছে, এখন অক্ষয় বসেছে মন্দিরে। যে খুশি তোর পূজো করুক, আমি এখন পরিত্যক্তকর্মা পরমাত্মা।

বৈদ্যনাথধামে নামল প্রথম তীর্থযাত্রীরা।

কিন্তু রামকৃষ্ণের চোখ পড়ল অনাথ-দরিদ্রের দিকে। কোন এক গ্রাম অতিক্রম করে যাচ্ছে, দেখল গ্রামবাসীদের পরনে কাপড় নেই, মাথায় তেল নেই এক ফোঁটা। চলতে-চলতে থেমে পড়ল রামকৃষ্ণ। বললে, কোন বৈদ্যনাথকে দেখতে চলেছি ? কত দূরে ? বৈদ্যনাথকে তোরা চিনবি না। দেখে নে একবার এই অনাথের নাথকে।

'তুমি তো মা'র দেওয়ান।' রামকৃষ্ণ ধরল মথুরকে, 'এদেরকে এক মাথা করে তেল আর একখানা করে কাপড় দাও। আর পেট ভরে খাইয়ে দাও এক দিন।'

মথুরবাবু গাঁইগুঁই করতে লাগলেন। 'বাবা, তীর্থে অনেক খরচ হবে। এতগুলি লোক খাওয়াতে-দাওয়াতে গেলে টাকার টানাটানি পড়ে যাবে, সামলাতে পারবো না।'

করুণায় কোমল রামকৃষ্ণ প্রচণ্ড নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। বললে, 'দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না। তুই যা তোর দলবল নিয়ে। আমি এদের কাছেই থাকব, এদেরে ছেড়ে যাব না কিছুতেই।'

সেই অটল প্রতিজ্ঞার কাছে নত হলেন মথুরবাবু। কলকাতা থেকে কাপড় আনালেন, স্থানীয় বাজার থেকে তেল কেনালেন, পাঁটাও। মহাপ্রসাদের ভোগ লাগিয়ে দিলেন একদিন। গ্রামবাসীর আনন্দেই রামকৃষ্ণের আনন্দ। যদি তুমি দারিদ্র্যমোচন না করো, তবে তুমি কিসের বৈদ্যনাথ ?

সাতদিন দেরি হয়ে গেল কাশী যেতে। তা হোক। তবু মা, তুই আমাকে শুকনো সন্ন্যাসী করিস নে। আমাকে করুণা-কোমলতা দে। আমাকে রসে-বশে রাখ। আমি চিনি খাব, চিনি হব কেন ? একটুখানি অহং আমার রেখে দে। সোনার একটু কণা, আগুনের একটি ফিনকি। ওটুকু অহং না থাকলে বিলাস করব কি করে ? তুমি-আমি আস্বাদন করব কি করে ? কি করে ভক্তের রাজা হব ?

দূর থেকে দেখা যাচ্ছে কাশী। 'কাশী সর্বপ্রকাশিকা।' 'যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ।'

নৌকো করে ঢুকতে হল কাশীতে। ভাবনেত্রে রামকৃষ্ণ দেখল কাশী স্বর্ণময়ী। ইটকাঠমাটিপাথর কিছুই নেই। আগাগোড়া সুবর্ণমণ্ডিত। তার মানে অক্ষয় নিত্যধাম এই কাশীধাম—জ্যোতির্ময় সব ভাব আর ভক্তি একে কনকান্বিত করে রেখেছে।

কিন্তু ক'দিন পরেই বললে হৃদয়কে, 'ওরে এখানেও যা সেখানেও তাই। সেখানকার আমগাছ তেঁতুলগাছ বাঁশঝাড়টি যেমন এখানকার সেগুলিও তেমনি। এখানে তবে আর কি দেখতে এলুম রে? সেখানেও যা এখানেও তাই।'

পরে ভক্তদের তাই বলতেন ঠাকুর, 'ওরে যার হেথায় আছে—তার সেথায় আছে। যার হেথায় নেই তার সেথায়ও নেই।'

"যদেতেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।" যা এখানে তাই সেখানে, যা সেখানে তাই এখানে! "তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।"

কেদারঘাটের পাশে দুখানি বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন মথুরবাবু। কাশীতে এসেও তাঁর রাজসিকতার অন্ত নেই। মাথায় রুপোর ছাতা, সঙ্গে আসাবরদার—চলেছেন যেন কোন রাজারাজড়া। বাইরে ঐশ্বর্যের জেল্লা কিন্তু অন্তরে দীনবন্ধুর দাক্ষিণ্য। রোজ পানসিতে চেপে বিশ্বনাথ দর্শনে যায় রামকৃষ্ণ। সেদিনও তেমনি যাচ্ছে। মণিকর্ণিকার পাশে শ্মশান। সেখান দিয়ে যাবার সময় দেখল চিতায় মড়া পোড়ানো হচ্ছে, ধোঁয়ায় দিক-পাশ আচ্ছন্ন। দেখেই উৎফুল্ল হয়ে নৌকোর বাইরে চলে এল রামকৃষ্ণ, দিব্যভাবে সমাধিস্থ হয়ে গেল। টলে পড়ে যাচ্ছিল বুঝি, ধরতে এল মাঝি-মাল্লারা। কাউকে ধরতে হল না। রামকৃষ্ণ নিজেই নিশ্চেষ্টতার মধ্যে স্থির হয়ে আছে। মুখে দিব্য দীপ্তির প্রসাদ।

কি দেখলাম জানিস? ধ্যান ভাঙবার পর বললে রামকৃষ্ণ। দেখলাম প্রকাণ্ড এক সিতগাত্র পুরুষ শ্মশানে প্রত্যেক শবের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। প্রত্যেককে তুলে নিচ্ছে হাতে করে আর তার কানে তারকব্রহ্ম-মন্ত্র উচ্চারণ করছে। শবের অন্য পাশে বসে আছে শক্তিময়ী মহাকালী—একে-একে জীবের সকল সংস্কার-বন্ধন খুলে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, নির্বাণের দ্বার খুলে দিয়ে অখণ্ডের ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছে তাকে। যা বহু জন্মের যোগসাধনায় পাওয়া যায় তা শুধু কাশীতে মরে বিশ্বনাথের থেকে আদায় করে নিচ্ছে।

কাশীতে মৃত্যু মানেই নির্বাণপদবী।

কাশীতে এক দিন ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে দেখা। সেই ত্রৈলঙ্গ স্বামী! মা'কে শ্মশানে পোড়াতে এসে যে আর ঘরে ফিরল না, সেই শ্মশানেই থেকে গেল। কাশীতে একবার পদ্মাসনে গঙ্গার উপর বসে ছিল ত্রৈলঙ্গ স্বামী। নৌকো করে এক ম্যাজিস্ট্রেট যাচ্ছিল সেখান দিয়ে। দৃশ্য দেখে তার চোখ তো চড়ক গাছ। নৌকোয় তুলে নিল সাধুকে। কত আলাপ-বিলাপ শুরু করল, কিন্তু সাধু মৌনী। কোমরে একটা তরোয়াল ঝুলছিল ম্যাজিস্ট্রেটের। ত্রৈলঙ্গ স্বামী তা দেখতে চাইলে। কেন চাইলে কে জানে। হঠাৎ সাধুর হাত ফসকে জলের মধ্যে পড়ে গেল তরোয়াল। এখন উপায়? ভীষণ চটে উঠল ম্যাজিস্ট্রেট। খুব বকতে লাগল সাধুকে। ঠিক করল পারে গিয়েই পুলিশে দেবে। পারে এসে নৌকো লাগতেই জলের মধ্যে হাত ডোবাল সাধু। একখানি নয় তিন-তিনখানি তরোয়াল উঠে এল জলের থেকে। তোমার কোনটা? ম্যাজিস্ট্রেট তো অবাক। এইটে তোমার। যেখানা তার ঠিক তা বেছে দিয়ে দিলে ম্যাজিস্ট্রেটকে। বাকি দু'খানা ফেলে দিলে জলের মধ্যে।

আরেক বার উলঙ্গ হয়ে গঙ্গাতীরে বসে আছে ত্রৈলঙ্গ স্বামী। ম্যাজিস্ট্রেটের

হুকুমে পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেল। উলঙ্গ হয়ে থাকা অপরাধ। বারে-বারে আইন লঙ্ঘন করছে সাধু, একেবারে হাজতে ঢুকিয়ে দাও। কিন্তু কতক্ষণ পরে ম্যাজিস্ট্রেট দেখে গঙ্গাতীরে তেমনি উলঙ্গ হয়ে ত্রৈলঙ্গ স্বামী বসে আছে। এ কি, ঘুষ খেয়ে পুলিশ তাকে ছেড়ে দিলে নাকি হাজত থেকে? ম্যাজিস্ট্রেট ছুটল অমনি হাজত দেখতে। এ কি! হাজতের মধ্যেই তো বসে আছে ত্রৈলঙ্গ স্বামী। অমনি আবার ছুটল গঙ্গাতীরে। গঙ্গাতীরেই তো ত্রৈলঙ্গ স্বামী বসে আছে উলঙ্গ হয়ে।

তাকে খালাস দিয়ে দিল। কারাগারের দেয়াল যাকে আবদ্ধ করতে পারে না, বসন তাকে কি করে আবৃত করবে?

সেই ত্রৈলঙ্গ স্বামী।

রামকৃষ্ণ দেখল সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ। সাক্ষাৎ শ্বেতশিখা। সমস্ত কাশীধাম উজ্জ্বল করে আছে। শরীরে কোনো হুঁস নেই। তপ্ত বালিতে পা রাখা যায় না, তারই উপর সুখে শুয়ে আছে। যদি বৃষ্টি পড়ে তেমনি শুয়ে থাকবে নিশ্চিন্ত হয়ে।

এক দিন নিজ হাতে পায়েস রেঁধে খাইয়ে এল রামকৃষ্ণ। মৌনাবলম্বন করে রয়েছে, তাই কথা হল না। মুখের কথা না হোক, ইশারা-ইঙ্গিতে আলাপ করতে লাগল দুজনে। যেন এক দেশের মানুষ। একই ভাষাভাষী। যেন কত আগের চেনা। রামকৃষ্ণ প্রশ্ন করল ইশারায়: 'ঈশ্বর এক না অনেক?'

ইশারায়ই উত্তর দিল ত্রৈলঙ্গ স্বামী: 'যদি সমাধিতে দেখ তবে এক, আর যদি জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখ তবে বহু। আমি তুমি জীব জগৎ সমস্ত।'

স্বর এক। শুধু রাগরাগিণীর নানা নাম। সদ্বস্তু এক, তার বর্ণনা বিচিত্র। 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।'

'বুঝলি?' হৃদয়কে বললে রামকৃষ্ণ, 'একেই বলে ঠিক-ঠিক পরমহংস অবস্থা।'

* ৩৭ *

কাশীর থেকে প্রয়াগ। পুণ্য সঙ্গমে স্নান আর তিন রাত্রি বাস চাই প্রয়াগে। মথুরবাবুরা সেখানে মাথা মুড়লেন। রামকৃষ্ণ বললে, আমার দরকার নেই।

আমার শরীর কাশীক্ষেত্র। ত্রিভুবনজননী গঙ্গা আমার জ্ঞানগঙ্গা। ভক্তি-শ্রদ্ধা আমার গয়া। গুরুচরণধ্যানযোগ আমার প্রয়াগ। আর যিনি সকলজনমনসাক্ষী তিনি আমার অন্তরাত্মা। "দেহে সর্বং মদীয়ে যদি বসতি পুনস্তীর্থমন্যৎ কিমস্তি।" আমার দেহেই যখন সকলে বাস করছে তখন আমার আবার তীর্থান্তর কী!

প্রয়াগ থেকে ফের সকলে ফিরল বারাণসী। 'বিরিঞ্চি-বিরচিতা বারাণসী'।

এক দিন চৌষট্টি-যোগিনী পাড়া দিয়ে যাচ্ছে রামকৃষ্ণ, সঙ্গে হৃদয়, কাকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

'ওরে হৃদু, ও আমাদের সেই বামনি না?'

সত্যিই তো, সেই যোগেশ্বরী ভৈরবী। কী আশ্চর্য, এখানে কোথায় আছ ?

আছি এ পাড়ায়, মোক্ষদার বাড়িতে। মোক্ষদা আমার মূর্তিমতী প্রণতি।

'তুমি আমাদের সঙ্গে বৃন্দাবন চলো।'

'চলো।'

গঙ্গাতীরে এসে দাঁড়াল রামকৃষ্ণ। বললে, মা, তোকে ছেড়ে এখন যমুনায় চলেছি। সেই মুরারিকায়কালিমাময়ী সদাসিতা যমুনা। মা গো, তুই দুর্গা, গঙ্গা, গগন-বাসিনী। তুই পাষাণভেদিনী খড়্গহস্তা। জন্মপ্রবাহহরণী পারায়ণপরায়ণা। আর যমুনা মধুবনচারিণী রাসেশ্বরী। অশেষনায়িকা কৃষ্ণকান্তা। দুজনেই মা, মহানন্দা মোক্ষদাত্রী। দুজনেই প্রাণদা প্রাণনীয়া।

নিধুবনের কাছে বাড়ি ভাড়া করলেন মথুর। কিন্তু চার দিকে চোখ চেয়ে এ সব কী দেখছে রামকৃষ্ণ! দেখছে না কাঁদছে। চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। বলছে, 'কৃষ্ণ রে, সবই তো রয়েছে, কেবল তোকে দেখতে পাচ্ছি না।'

বাঁকাবিহারীর মূর্তি দেখে বিহ্বল হয়ে গেল। ছুটল আলিঙ্গন করতে। গোবর্ধন দেখে আবার ভাবাবেশ। ভাবাবেশে উঠল গিয়ে একেবারে গিরিচূড়ায়। আর নামে না। তখন ব্রজবাসীদের পাঠিয়ে নামিয়ে আনলেন মথুরবাবু।

সন্ধের দিকে যমুনাতীরে বেড়ায় আর কলিন্দনন্দিনীর গুণগান করে। যমুনার চড়ার উপর দিয়ে গরু নিয়ে বাড়ি ফিরছে রাখালেরা। দেখেই কৃষ্ণের উদ্দীপনা উপস্থিত। 'কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই' বলতে-বলতে ছুটল তাদের পিছু-পিছু। ওরে, তোরাই আমার সেই লীলামানুষবিগ্রহ নারায়ণ।

কালীয়দমনের ঘাটে এসে আবার ভাবাবেশ। স্নান করবে কিন্তু শরীরে বশ নেই। ছোট ছেলেটিকে যেমন করে নাওয়ায় তেমনি করে নাইয়ে দিলে হৃদয়।

এইখানেই গঙ্গামায়ীর সঙ্গে দেখা।

ষাট বছর বয়স, নিধুবনের কাছে কুটির বেঁধে একলাটি থাকে গঙ্গামায়ী। ললিতা সখী হয়ে রাধিকার সেবাচর্যা করে। প্রেমরূপা যে ভক্তি করে তার সাধন-মোদন।

দুজন দুজনকে চিনে ফেলল। রামকৃষ্ণ বললে, তুমি ললিতা-সখী। গঙ্গামায়ী বললে, তুমি রাসেশ্বরী রাধিকা। তুমি আমার দুলালী, রাজদুলালী।

রামকৃষ্ণকে গঙ্গামায়ী দুলালী বলে ডাকে। কৃষ্ণপ্রাণাধিকা বিষ্ণুমায়া!

গঙ্গামায়ীকে পেয়ে সব ভুল হয়ে যায় রামকৃষ্ণের। কখন বা খাওয়া-দাওয়া, কখন বা বাড়ি ফিরে যাওয়া। কোথায় বাড়ি, কি বা আহার! ভোক্তাও নেই ভোজ্যও নেই, চলেছে তবু ভোজনের আস্বাদ। এক-এক দিন বাসা থেকে খাবার নিয়ে এসে খাইয়ে যায় হৃদয়। কোনো-কোনো দিন গঙ্গামায়ীই খাইয়ে দেয় রান্না করে। থেকে-থেকে ভাব হয় গঙ্গামায়ীর। সে ভাব দেখবার জন্যে ভিড় জমে চার দিকে। এক দিন হল কি, ভাবাবেশে গঙ্গামায়ী হৃদয়ের কাঁধের উপর চড়ে বসল।

'এ তো বড় বিপদ হল দেখছি।' হৃদয় ঝটকা মারল, কড়া গলায় বললে রামকৃষ্ণকে, 'তুমি চলো এখান থেকে। একেবারে সটান দক্ষিণেশ্বর। বিন্দেবনে আর কাজ নেই।'

কিন্তু রামকৃষ্ণ ঠিক করল আর ফিরবে না। গঙ্গাময়ীর আশ্রমে থেকে যাবে ব্রজধামে। শ্রীমতী হয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করবে। মথুরবাবু ভাবনায় পড়লেন। ডাকতে বসলেন মহামায়াকে। মা গো, আমার দক্ষিণেশ্বর কি দক্ষিণাহীন হয়ে যাবে?

হৃদয় ধমকে উঠল, 'তোমার এত পেটের অসুখ, তোমাকে এখানে দেখবে কে?'

'কেন, আমি দেখব। আমি সেবা করব।' বললে গঙ্গাময়ী।

কিন্তু খাবে কি? শোবে কোথায়?

'সেদ্ধ চালের ভাত খাব। শোব এই গঙ্গাময়ীর ঘরেই। গঙ্গাময়ীর বিছানা ঘরের ওদিকে হবে, আমারটা এদিকে হবে। ভাবনা কি।'

'ওসব চলবে না চালাকি।' হৃদয় রামকৃষ্ণের হাত ধরে টানতে লাগল: 'ওঠো। চলো।'

আরেক হাত ধরে টানতে লাগল গঙ্গাময়ী। বললে, 'না, দেব না। কিছুতেই যেতে দেব না।'

দুজনের টানাটানিতে রামকৃষ্ণ নাজেহাল। এক দিকে রাধিকা অন্য দিকে কালী। এক দিকে মহাভাব অন্য দিকে মহামায়া। সেই টানাটানিতে মা'র কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল রামকৃষ্ণের। মা'র কথা মানে চন্দ্রমণির কথা। মা সেই কালীবাড়ির নবতে বসে আছেন একলাটি। বসে আছেন রামকৃষ্ণের পথ চেয়ে। মন স্থির করতে আর দেরি হল না রামকৃষ্ণের। বললে, 'না, আমার আর এখানে থাকা হবে না। আমাকে মা ডাকছেন।'

মা সকল তীর্থের ঊর্ধ্বে। মা স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী।

ওরে, সংসারে বাপ-মা পরম গুরু, যথাসাধ্য ওঁদের সেবা করতে হয়। যে চরম দরিদ্র, যার শ্রাদ্ধ করবারও ক্ষমতা নেই সে অন্তত বনে গিয়ে তাঁদের কথা মনে করে কাঁদবে। কেবল ঈশ্বরের জন্যে বাপ-মা'র আদেশ লঙ্ঘন করা চলে—আর কিছুতে নয়। বাপের কথায় প্রহ্লাদ ছাড়েনি কৃষ্ণনাম। কৈকেয়ীর কথায় ভরত ছাড়েনি রামসেবা। মা বারণ করলেও ধ্রুব বনে গিয়েছিল তপস্যা করতে। রামের জন্যে রাবণের কথা শোনেনি বিভীষণ। ভগবানের জন্যে বলি তার গুরু শুক্রাচার্যকে অমান্য করেছে। আর কৃষ্ণকামিনী গোপিনীরা মানেনি তাদের পতির আধিপত্য। মা কি কম জিনিস গা? শচী বললেন, কেশব ভারতীকে কাটব। চৈতন্যদেব অনেক করে বোঝালেন। বললেন, 'মা, তুমি অনুমতি না দিলে আমি যাব না। তবে জানো তো, সংসারে আমি যদি থাকি, তবে আমার দেহ আর থাকবে না। তবে একটু বলে দিচ্ছি মা, যখনই মনে করবে, আমাকে দেখতে পাবে। আমি তোমার কাছে-কাছেই থাকব।' তবে শচীমাতা অনুমতি দিলেন।

আর, নারদের কথা জানো না? মা তাঁর যত দিন বেঁচে ছিল সে তপস্যায় যেতে পারেনি। সে নইলে মা'র সেবা করবে কে? মা'র দেহত্যাগ হল, তবে বেরুল হরিসাধনে।

'টানাটানিতে মা'র কথা মনে পড়ে গেল। অমনি বদলে গেল সমস্ত। ভাবলুম, মা বুড়ো হয়েছেন, মা'র চিন্তা থাকলে ঈশ্বর-ফিশ্বর সব ঘুরে যাবে। তার চেয়ে তাঁর কাছেই যাই। গিয়ে সেখানেই ঈশ্বরচিন্তা করি নিশ্চিন্ত হয়ে।'

হাজরার মা রামলালকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে দক্ষিণেশ্বরে, রামলালের খুড়োমশায় যেন হাজরাকে একবার পাঠিয়ে দেন তাঁর কাছে।

ঠাকুর বললেন হাজরাকে, 'বুড়ো মা, যাও, একবার দেখা দিয়ে এস।'

কিছুতেই গেল না হাজরা। তার মা কেঁদে-কেঁদে মরে গেল।

নরেন বললে, 'এবারে হাজরা দেশে যাবে।'

'এখন দেশে যাবে, ড্যামনা—শালা। দূর—'

আচ্ছা, নিজের মা'র রূপ কি ধ্যান করতে পারা যায়? এক দিন জিগগেস করল মণি মল্লিক।

'হ্যাঁ, মা গুরু। ব্রহ্মময়ীস্বরূপা। মাকেই ধ্যান করবি।'

মা ধরিত্রী জননী দয়ার্দ্রহৃদয়া নির্দোষা সর্বদুঃখহা। পরমা মায়া পরমা ক্ষমা পরমা শান্তি। মা'র মত এমন ধ্যানের মূর্তি আর কী আছে?

গিরিশ ঘোষ বসল এসে ঠাকুরের পদচ্ছায়ে। বললে, আমাকে ত্রাণ করুন।

আমি ত্রাণ করবার কে?

মনে আছে কামারপুকুরের সেই মাগুর মাছটাকে আপনি পায়ে ঠেলে-ঠেলে জলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মাছটা নিরাশ্রয় হয়ে চলে এসেছিল মাটিতে। আপনি তাকে স্বধামে পাঠিয়ে দিলেন। তেমনি যদি পাপার্ত জীব আপনার পায়ে এসে পড়ে, আপনি তাকে ঠেলে-ঠেলে নিয়ে যাবেন না মোক্ষধামে?

আমি পাপ মানি না। পাপী বলে বিশ্বাস করি না কাউকে। আমার যেমন সাধুরূপী নারায়ণ তেমনি আবার ছলরূপী নারায়ণ, লুচ্চারূপী নারায়ণ—মুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল গিরিশ ঘোষ।

'গাড়ি করে যাচ্ছি, বারান্দার উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম দুই বেশ্যা। দেখলাম সাক্ষাৎ ভগবতী—দেখে প্রণাম করলাম। শোন, বলি তোকে, কাঁদতে হবে। মল্লিকের মা জিগগেস করলে, ওদের কি কোনো মতেই উদ্ধার হবে না? নিজে আগে-আগে অনেক রকম করেছে কিনা! বললুম, হ্যাঁ, হবে—যদি আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে কাঁদে। শুধু হরিনাম করলে কি হবে, আন্তরিক কাঁদা চাই। তাই তোকে বলি, তুই কেঁদে-কেঁদে মাকে একবার ডাক মনের থেকে। যতই তোর পাপ হোক, যতই তুই ক্লেদে-আবর্জনায় ডুবে থাক, মাকে ডাকলে মা এসে তোকে মুক্ত করে দেবেনই—'

তেমনি গিরিশ গেল আবার শ্রীমার পদাশ্রয়ে। বললে, আমাকে ত্রাণ করুন।

আমি ত্রাণ করবার কে?

মনে আছে জয়রামবাটিতে একটা বাছুরের কান্না শুনে আপনি তার বাঁধন খুলে দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন তাকে তার অমৃতলাভের অধিকার। তেমনি, মা, কত বাসনা-কামনার বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছি। স্বহস্তে খুলে দিন শৃঙ্খল। বুঝতে দিন পরমার্থের আস্বাদ।

'ঠাকুর বলতেন বিচি খোলা বাদ দিলে সব বেলটা পাওয়া যায় না। তুমি তো সম্পূর্ণ বেল। তুমি তো ভৈরব। তোমার তবে আর ভয় কি।'

গিরিশ ঘোষ স্তব করতে বসল।

"জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।"

মথুরায় গেল রামকৃষ্ণ। দাঁড়াল ধ্রুব ঘাটে। স্পষ্ট দেখল সেই জন্মাষ্টমীর দৃশ্য ঃ শিশু-কৃষ্ণকে বুকে করে যমুনা পার হয়ে যাচ্ছে বসুদেব।

দিন পনেরো ছিল মোট বৃন্দাবনে। ছিল বৈষ্ণববেশে। গায়ে আলখাল্লা, পরনে ডোর-কোপীন। কপালে-গলায় বুকে-বাহুতে তিলক আঁকা। কাঁধে কাঁথার ঝুলি। কণ্ঠে তুলসী কাঠের মালা।

বামনিকে বললে, 'কোথায় মরবে ? কাশী না বৃন্দাবন ?'

'কাশী।'

তবে ফিরে চলো কাশীতে। স্বস্থানে গিয়ে অধিষ্ঠিত হও।

কাশীতে এসে রামকৃষ্ণ বললে, 'বীণ শুনব।'

মদনপুরায় মহেশ সরকার ওস্তাদ বীণকার। দেশ-বিদেশে প্রচণ্ড নাম-ডাক। হৃদয় খবর নিয়ে এল। চল্ তবে যাই ওস্তাদের বাড়িতে। বীণ শুনে আসি।

মথুরবাবু বললেন, 'ওখানে যাবে কেন ? তাঁকে এখানে ডেকে আনি, ফরমাস মতো শোনো তোমার যতো ইচ্ছে—'

রাখো তোমার মিথ্যে মর্যাদার চটকদারি। এত বড় যে বাজিয়ে সে তো প্রকাণ্ড সাধক, তার খেয়াল রাখো ? স্বয়ং বিশ্বযন্ত্রী ঈশ্বর তার স্পর্শে এসে ঝংকৃত হচ্ছেন। সে তো বিভূতি-ভূষিত। চল রে হৃদু, শুনে আসি। যা-ই শোনা তাই দেখা। "যাহা শুনি কর্ণপুটে সকলি মা'র মন্ত্র বটে।"

দুজনে এসে হাজির হল মদনপুরায়। সটান মহেশ সরকারের বাড়িতে। মহেশ সরকার বাইরের ঘরেই বসেছিল। 'রামকৃষ্ণ বললে, 'বীণ শোনাও।' এ যেন স্বয়ং বীণাবাদিনীর আদেশ। মহেশ সরকার বীণ তুলে নিল। ঝংকার তুললে।

সুর-সাগরে অমৃতের ঢেউ খেলে গেল। মুহূর্তে ভাবাবেশে বিহ্বল হয়ে পড়ল রামকৃষ্ণ। বললে, 'মা গো, আমায় বেহুঁস করে রাখিস নে, আমায় হুঁস দে ! আমি ভালো করে বীণা শুনি।'

রামকৃষ্ণ সমাধি-ভূমি থেকে নেমে এল। নেমে এল অনুভূতির ভূমিতে। বাহ্য-জ্ঞানের শেষ প্রান্তে। ঠায় তিন ঘণ্টা বীণ শুনলে একটানা। শুধু কি বীণা শুনলাম ? শুনলাম এই সমস্ত বিশ্বসৃষ্টিটাই একটা অপূর্ব সুর-ঝংকার। গ্রহে-নক্ষত্রে বৃক্ষে-তৃণে, নীহারিকা থেকে ধূলিকণায়, প্রত্যেকটি পলায়মান মুহূর্তকণায়, বাজছে এই গীতছন্দ। ছুটেছে ভুবনপ্লাবিনী সুরশৈবলিনী।

যা শোনা তাই আবার দেখা।

রামকৃষ্ণ দেখল সেই সুরশব্দ যেন একটা উজ্জ্বল চৈতন্যের মত প্রতিভাত। যেন সূর্য উঠেছে রাত্রির আকাশে ! ইন্দ্রিয়ের জগতে চৈতন্যের আবির্ভাব। হৃদাকাশে চিদাদিত্য। বীণার সংগে-সংগে রামকৃষ্ণ গলা মিলিয়ে গান ধরল।

মথুরবাবু বললেন, 'এবার গয়া যাব। তুমি যাবে ?'

সর্বনাশ ! গয়ায় গেলে এ দেহ কি আর থাকবে ? জানো না আমার বাবার সেই

স্বপ্নের কথা ? তাই গয়ায় আর নামলেন না মথুরবাবু। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সবাইকে নিয়ে ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বর। আবার সেই অনন্ত আনন্দ-তীর্থ।

রামপ্রসাদ গেয়েছে, এ সংসার ধোঁকার টাটি। রামকৃষ্ণ গাইলে, 'এ সংসার মজার কুটি। ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি।'

বৃন্দাবনের রাধাকুন্ড আর শ্যামকুণ্ড থেকে ধুলো নিয়ে এসেছে রামকৃষ্ণ। কিছুটা পঞ্চবটীর চার দিকে ছড়িয়ে দিল আর কতক পুঁতলে তার সাধন-কুটিরের মধ্যে। এই সেই কুটির যেখানে বসে হয়েছিল তার নির্বিকল্পসমাধি। হয়েছিল ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার।

'ব্রহ্ম কেমন বল না ?'

ঘি খেয়েছিস তো ? বল তো কেমন ঘি ? কেমন ঘি, না, যেমন ঘি ! তেমনি ব্রহ্মের উপমা ব্রহ্ম। তাকে বোঝাব কি দিয়ে ? সেই পণ্ডিতের গল্প জানো না ? এক রাজাকে রোজ ভাগবত শোনাত। আর পড়ার শেষে রোজই রাজাকে জিগগেস করত, রাজা, বুঝেছ ? আর রাজাও রোজ বলত, আগে তুমি বোঝো। পণ্ডিত বাড়ি গিয়ে ভাবত, রাজা অমনধারা রোজ বলে কেন ? ভাবতে ভাবতে জ্ঞান হয়ে গেল—শাস্ত্র-পাণ্ডিত্য সব মিথ্যে, আসল হচ্ছে হরি-পাদপদ্ম। বিবাগী হয়ে চলে গেল সংসার ছেড়ে। রোজ কত বক্তৃতা ঝাড়ত, আজ যাবার আগে বলে গেল দুটি কথা : 'এবার বুঝেছি।'

তাই বলি, কলকলানি ছাড়ো। যতক্ষণ ঘি কাঁচা থাকে ততক্ষণই কলকল করে। পাকা ঘিয়ে আর শব্দ নেই। খালি গাড়ুতে জল ভরতে গেলেই ভকভকানি ওঠে। কিন্তু ভরে গেলে আর শব্দ হয় না। বিচারবুদ্ধি কতক্ষণ ? যতক্ষণ না তাঁর আনন্দের খবর পাওয়া যায়। মধুপানের আনন্দ পেলে মৌমাছি আর ভনভন করে না।

'আমি কাঁদতাম আর বলতাম, মা, বিচারবুদ্ধিতে বজ্রাঘাত হোক।'

শশধর পণ্ডিত জ্ঞানমার্গের পন্থী। বললে, 'সে কি ? আপনারো তবে ছিল বিচারবুদ্ধি ?'

'তা, একটু-আধটু ছিল বৈ কি।'

উৎফুল্ল হয়ে উঠল শশধর। বললে, 'তবে বলে দিন আমাদেরো যাবে। আপনার কেমন করে গেল ?'

ঠাকুর বললে, 'অমনি এক রকম করে গেল।'

আমি দু হাত ছেড়ে দিয়েছি। আমি বগলে হাত দিয়ে টিপি না।

সেই এক বেয়ান এসেছিল আরেক বেয়ানের সংগে দেখা করতে। ঘরের বেয়ান তখন নানা রঙের সুতো কাটছে, বাইরের বেয়ানকে দেখে ভারি খুশি। কত দিন পরে এলে, যাই তোমার জন্যে কিছু জল-খাবার আনি গে। যেই জল-খাবার আনতে গেছে সেই ফাঁকে বাইরের বেয়ান এক তাড়া রঙিন সুতো বগলের তলায় লুকিয়ে ফেললে। জলখাবার নিয়ে এসে ঘরের বেয়ান বুঝতে পারলে বাইরের বেয়ানের কাণ্ডখানা। তখন সে এক ফন্দি ঠাওরালে। বললে, কত দিন পরে এলে, এস আজ দুজনে একটু আনন্দ করি। কি আনন্দ ? এস দুই বেয়ানে নৃত্য করি। ভালো

কথা। দুই বেয়ানে নাচতে লাগল। ঘরের বেয়ান দেখল বাইরের বেয়ান হাত না তুলেই নৃত্য করছে। হাত না তুলে নাচ কি একটা নাচ ? ঘরে বেয়ান তখন বললে, এমন আনন্দের দিনে এস আজ হাত তুলে নাচি। ভালো কথা। কিন্তু বাইরের বেয়ান এক হাতে বগল টিপে আরেক হাত তুলে নাচতে লাগল। ও আবার কেমন নৃত্য ? এস, দু হাত তুলে নাচি। এই দেখ—ঘরের বেয়ান দুহাত তুললে। বাইরের বেয়ান যে-কে-সে। তেমনি বগল টিপে এক হাত তুলেই সে নাচতে লাগল। বললে, যে যেমন জানে বেয়ান—

আমি কিছুই জানি না। আমি তাই দু হাত ছেড়ে দিয়েছি। আমার সরল শরণাগতি।

তীর্থ থেকে ফিরে এসে রামকৃষ্ণের শুধু সেই তীর্থ ভ্রমণের কথা। তা ছাড়া আবার কি। মাতাল মদ খাওয়াব পর কেবল আনন্দেরই কথা কয়।

কী পেলেন তীর্থ করে ?

কী পেলাম ? জ্ঞান পেলাম। যতক্ষণ বোধ যে ঈশ্বর সেথা ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন হেথা হেথা, তখনই জ্ঞান। যা মন চায় তারই পিছে ধায়। কিন্তু ছুটতে হবে কেন ? যা মন চায় তাই মনের মাঝখানে। যা হাত চায় ধরতে তাই হাতের কাছাকাছি।

তামাক খাবে, তাই গেছে প্রতিবেশীর বাড়ি টিকে ধরাতে। ঢের বাত হয়েছে, প্রতিবেশী ঘুমে অচেতন। অনেক ধাক্কাধুক্কি, অনেক হাঁক-ডাক। ঘুম ভেঙে গেল প্রতিবেশীর। দরজা খুলে অবাক হয়ে গেল—এ কি, এত রাতে কি মনে ক'রে। আর কি মনে ক'রে! তামাক খাব কিন্তু টিকে ধরাবার দেশলাই নেই। তারি জন্যে এত কষ্ট, এত হৈ-হল্লা! তোমার হাতে যে লণ্ঠন রয়েছে—সে আছে কি করতে ? হৃদাকাশে চিদাদিত্য। চলেছি আমরা তবে আর কোন দেশে কোন সূর্যের সন্ধানে ?

কথাটা এই, বুড়ি ছুঁয়ে যা ইচ্ছে কর। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে তার পর লীলা আস্বাদন করে বেড়াও। সাধু শহরে এসে হেথা-হোথা ঘোরাঘুরি করে নানা রকম আমোদ করে বেড়াচ্ছে। পথে আরেক মুসাফির সাধুর সঙ্গে দেখা। মুসাফির বললে, এত যে চার দিকে রঙ দেখে বেড়াচ্ছ, তা তোমার পোঁটলাপুঁটলি কোথায় রাখলে ? কেন—আগে বাসা ঠিক করলাম, তালা-চাবি কিনলাম, পরে পোঁটলাপুঁটলি ঘরের মধ্যে চাবি দিয়ে বন্ধ করলাম। বন্ধ করে রেখে তবে আমোদ করতে বেরিয়েছি।

জানো, শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলুম। সেখানে খুব সংকীর্তন হল। বহু লোকের আসর বসল। মাকে বললুম, মা এ সব কি সত্য ? সত্য যদি হয় তবে দেশের জমিদার কেন আসবে না ? এসে গেল জমিদার। সেধে গায়ে পড়ে আদর করে কথা কইলে।

ওরে হৃদু, একটি সুন্দরী ধরে নিয়ে আয়।

হৃদয় তো অবাক।

ওরে নিয়ে আয়। আমি পুজো করব।

বুঝি মামীর কথা মনে পড়ল হৃদয়ের। সেই তার পদ্মদল দিয়ে পাদপদ্ম পুজো

করার কথা। কিন্তু কোথায় মামী! চৌদ্দ বছরের একটি সুন্দরী সধবা কন্যা যোগাড় করল হৃদয়। কোনো বাড়ির বউ বা মেয়ে।

কিন্তু রামকৃষ্ণ দেখল সাক্ষাৎ ভগবতী। পুজো করলে। প্রণাম করলে। ওরে, তোরা কেউ প্রণামীর টাকা এনে দে মাকে। তাতেও তৃপ্তি নেই রামকৃষ্ণের। যখন যে কুমারী মেয়ে কাছে পায় তাকে ধরে এনে পুজো করে। হোক সে যত অকুলীন যত অপরিচ্ছন্ন। শুদ্ধাত্মা কুমারীতেই ভগবতীর বেশি প্রকাশ।

রামলীলা দেখতে গেল রামকৃষ্ণ। যারা রাম-লক্ষ্মণ সেজেছিল, হনুমান-বিভীষণ সেজেছিল সবাইকে পুজো করতে বসল। মনে হল আসলে-নকলে ভেদ নেই। নারায়ণই এ সব মানুষের রূপ ধরে রয়েছেন।

বৈষ্ণবচরণও তাই বলত। বলত, নরলীলায় বিশ্বাস হলেই তবে পূর্ণ জ্ঞান হবে। বকুলতলার ঘাটের কাছে এক দিন দেখল নীলাম্বরী পরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের মেয়ে না পথের মেয়ে নজর করে দেখতেও চাইল না। মুহূর্তে সীতার উদ্দীপনা এসে গেল। দেখল সীতা লঙ্কা থেকে উদ্ধার পেয়ে রামের কাছে যাচ্ছে।

'এমন ভাবও দেখিনি, এমন রোগও দেখিনি।' বলে হৃদয়রাম।

বললে কি হয়, কেবল জমি-জমি করে। এত যার সেবা-পুজো করছে তার সংগ-স্পর্শেও যেন কিছু সুফল হচ্ছে না। রামকৃষ্ণ তার হাতের জিনিস, রামকৃষ্ণের পায়ে কাউকে হাত ঠেকাতে দিতে পর্যন্ত সে নারাজ, তবু হাতে পেয়েও আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে রামকৃষ্ণ। হৃদয় টাকা খুঁজছে, জমি খুঁজছে, গরু খুঁজছে। এক দিন ধরল গিয়ে শম্ভু মল্লিককে। বললে, 'আমায় কিছু টাকা দাও।'

শম্ভু মল্লিকের ইংরিজি মত। বললে, 'তোমায় কেন টাকা দিতে যাব? তোমার তো দিব্যি শরীর আছে, তুমি তো খেটে খেতে পারো।'

'দিব্যি শরীর?'

'যা হোক কিছু রোজগার তো করছ। তোমায় দেব কেন? যারা খুব গরিব, কিংবা কানা-খোঁড়া তাদের দিলে কাজ হয়।'

'থাক মশাই, ঢের হয়েছে।' হৃদয় ঝলসে উঠল: 'আমার টাকায় কাজ নেই। ঈশ্বর করুন আমায় যেন কানা-খোঁড়া হতদরিদ্দির না হতে হয়। আপনারো দিয়ে কাজ নেই, আমারো নিয়ে কাজ নেই। খুরে দণ্ডবৎ মশাই।'

রামকৃষ্ণকে গিয়ে ধরল। কি এমন ভাবের ঢেউ দিয়েছ! তোমার মা'র কাছে গিয়ে কিছু সিদ্ধাই চাইতে পার না? যাতে করে কিছু খাঁটি দ্রব্য লাভ হয় তার দিকে দৃষ্টি দিতে পারো না? তোমার এ ভাব দিয়ে কি অভাব মিটবে?

আবার? ধমকে উঠল রামকৃষ্ণ। তোর পাল্লায় পড়ে সিদ্ধাই চাইতে গিয়ে আমি যা দেখেছিলাম তা আমি ভুলিনি। জানিস তো, 'মাগনেসে ছোটা হো যাতা।' এমন যিনি ভগবান তিনি যখন ভিক্ষে করতে বেরিয়েছিলেন, তাঁকে বামন রূপ ধরতে হয়েছিল। কেন মিছিমিছি চাইতে গিয়ে ছোট হবি?

রাখো ওসব তত্ত্ব কথা। তত্ত্ব কথায় পেট ভরে না। হৃদয় একটা এঁড়ে বাছুর কিনলে। ঘাস খাওয়াবার জন্যে নিত্যি সেটাকে বাগানে বেঁধে রাখে। কত যত্ন-আত্তি করে। সোহাগ করে গলায়-পিঠে হাত বুলোয়।

'রোজ ওটাকে ওখানে বেঁধে রাখিস কেন রে?' জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ।

'ওটাকে দেশে পাঠিয়ে দেব।'

'কেন, সেখানে কী?'

'বড় হলে সেখানে ও লাঙল টানবে।'

কোথায় কামারপুকুর, শিওড়, আর কোথায় কলকাতা। বাছুরটা সেখানে যাবে ঐ পথ ভেঙে! সেখানে গিয়ে বড় হবে! বড় হয়ে লাঙল টানবে!

মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল রামকৃষ্ণ।

এরই নাম মায়া, এরই নাম সংসার।

চালের আড়তে বড়-বড় ঠেকের মধ্যে চাল থাকে। যাতে ইঁদুর ঐ চালের সন্ধান না পায়, আড়তদার একটা কুলোতে করে খই-মুড়কি রেখে দেয়। ঐ খই-মুড়কি খেতে মিষ্টি, ইঁদুরগুলো তাই সমস্ত রাত কড়র-মড়র করে খায়। চালের সন্ধান আর পায় না।

ওরে, মায়াকে চিনতে চেষ্টা কর। মায়াকে যদি চিনতে পারিস, মায়া আপনি লজ্জায় পালাবে। হরিদাস বাঘের ছাল পরে একটা ছেলেকে ভয় দেখাচ্ছিল। ছেলেটি বললে, আমি চিনেছি, তুমি আমাদের হরে। হরিদাস হাসতে-হাসতে চলে গেল।

হরিদাসকে চিনবে না হৃদয়। তার বাঘের ছালেই সে মাতোয়ারা।

* ৩৯ *

আমার তো মামাই আছে। আমার আবার ভাবনা কী! আমার আবার কিসের সাধন-ভজন!

হৃদয় ডঙ্কা মেরে বেড়ায় আর বিষয়-আশয়ের ফিকির খোঁজে। কোথায় একখানা জমি, কোথায় একটা গরু, কোথায় কটা টাকা! পরিবারের জন্য একখানা গয়না, নিজের জন্যে একখানা শাল।

সাধক-ভক্তদের কাছ থেকে শোনে যখন রামকৃষ্ণের অলৌকিকত্বের কথা, তখন বলে, ভালোই তো, আমার মেহনৎ কমল। ঐ যে কথায় বলে না, মামার হলেই ভাগনের হল। আমারো হয়েছে তাই। ওর হওয়াতেই আমার ষোলো আনা হয়ে আছে। মহাদেব যখন পার হবেন তখন নন্দী-ভৃঙ্গীকেও নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে। তার পরে পরিচর্যা কম করছি? আমি না হলে ওর সাধুগিরি বেরিয়ে যেত! আমি আছি বলেই ওর এত জেল্লা-জমক। আমাকে কি আর ও ফেলতে পারে? আমি তাই খাই-দাই আর তুড়ি মারি। আর যদি পারি তো এই ফাঁকে কিছু গুছিয়ে নিই চাল-কলা।

এমনি সময় তার স্ত্রী মরল।

মুহূর্তে মন কেমন উলটো-মুখো হয়ে গেল। সংসার যেন উড়ে গেল তাসের ঘরের মত। টাকার তোড়া মনে হল ধুলোর থোড়ার মত।

সেও খুলে ফেলল পরনের কাপড়, ছুঁড়ে ফেলল গলার পৈতে। উগ্র ভঙ্গি করে বসল ধ্যানাসনে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। শেষে এক দিন ধরল গিয়ে রামকৃষ্ণকে। বললে, 'তোমার যেমন ভাব-টাব হত, তেমনি আমার করে দাও। আমাকে ডুবিয়ে দেও অতলে। দেখাও তোমার মহামায়াকে—'

রামকৃষ্ণ বললে, 'তোর ও সবে দরকার নেই।'

'আলবৎ আছে।' গর্জে উঠল হৃদয়। বললে, 'তুমিই ফল পাবে আর কেউ পাবে না ? মা কি তোমার একলার ?'

'ওরে, শুধু আমাকে সেবা করলেই তোর ফল হবে।'

'ঢের সেবা করেছি এত দিন। কিছু হয়নি। আমার এখন ভাব চাই। আমাকে ভাব দাও।'

'কী বলিস পাগলের মত !' রামকৃষ্ণ তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল। 'আমরা যদি দুজনেই ভাবে বিভোর হয়ে থাকি, তখন কে কাকে দেখবে ?'

'তা আমি জানি না।' হৃদয় ছাড়বার পাত্র নয়। তাকে তখন বৈরাগ্যে পেয়ে বসেছে। বললে, 'আমাকে তুমি বলে দিয়ে যাও, কি করে কি হবে—'

'আমার ইচ্ছায় কিছুই হবার নয়। সব মা'র ইচ্ছে। মাকে গিয়ে ধর, মা'র যদি ইচ্ছে হয়, তোরও হবে। যদি ইচ্ছে করেন নিঃস্বকেও তিনি বিশ্বজয়ী করতে পারেন।' বেশ, তবে মাকেই ধরব। এই ধরলাম। এই বসলাম দৃঢ়াসনে।

আস্তে-আস্তে দর্শন হতে লাগল হৃদয়ের। পূজায় বা ধ্যানে বসে শুরু হল অর্ধবাহ্যদশা। কখনো বা নিবিড় ভাবাবেশ।

মথুরবাবু প্রমাদ গণলেন। জিগগেস করলেন রামকৃষ্ণকে, 'হৃদয়ের আবার এ-সব কী হচ্ছে ? ঢং না কি ?'

'না। খুব ব্যাকুল হয়ে মাকে ধরেছিল, মা-ই এই ভাব এনে দিয়েছেন।'

'সর্বনাশ। তা হ'লে কী হবে হৃদয়ের ?'

'কিছু ভয় নেই। মা-ই সব দেখিয়ে-বুঝিয়ে দু দিনে তাকে ঠাণ্ডা করে দেবেন।'

মথুরবাবু বুঝলেন এ সবই রামকৃষ্ণের খেলা। বললেন, 'বাবা, তুমিই ওকে ভাব দিয়েছ, তুমিই আবার ওকে ঠাণ্ডা করে দাও। আমরা তোমার দুই ভৃত্য, নন্দী আর ভৃঙ্গী, আমরা তোমার কাছে-কাছে থাকব, তোমার সেবা-চর্যা করব। আমাদের আবার এ ছাড়া ভাব কি, এ ছাড়া কাজ কি। আমাদের আবার কিসের অদ্বৈত অবস্থা !'

পঞ্চবটীর দিকে চলেছে রামকৃষ্ণ। হয় তো দরকার হতে পারে, হৃদয় গাড়ু-গামছা নিয়ে চলল পিছু-পিছু। যেতে-যেতে অপূর্ব দর্শন হল তার। আলোক-অবলোকিত দর্শন। দেখল রামকৃষ্ণ দেহধারী মানুষ নয়, একটি চলমান জ্যোতি-বর্তিকা। দিব্যকলেবরে অরুণরক্তিমরুচি। সেই আলোতে পঞ্চবটী প্লাবিত, উদ্ভাসিত হয়ে গেছে। রামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় দুখানি পা যেন মাটি স্পর্শ করছে না, শূন্যের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। যেন শূন্য সরোবরে রক্ত পদ্ম চলেছে ফুটতে-ফুটতে।

হৃদয় চোখ মুছল। সব ঠিক আছে। শুধু রামকৃষ্ণই আর দেহে নেই, শিখাময় হয়ে গিয়েছে। তাকালো সে নিজের দিকে। এ কি! তারও দেখি দিব্যসত্তা, সেও দেখি নিরঙ্গ-উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে যেন ঐ সম্মুখবর্তী দিব্য-অঙ্গেরই অংশস্বরূপ। দেবতার পশ্চাতে দেবানুচর। দেবতার সেবা-সঙ্গ করবার জন্যে দেববেশে তার এই পৃথকস্থিতি।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল হৃদয়, 'ও রামকৃষ্ণ! শুনছ? আমরা মানুষ নই, আমরা দেবতা।'

একবার চেঁচিয়ে ক্ষান্তি নেই হৃদয়ের। দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে আবার সে চেঁচিয়ে উঠল অবোধের মত: 'ও রামকৃষ্ণ! দাঁড়াও! দেখছ আমরা কে! আমরা তবে কেন এখানে পড়ে আছি?'

'ওরে থাম, থাম—চেঁচাস নে—' রামকৃষ্ণ মিনতি করল।

'কেন থামতে যাব? তুমিও যা আমিও তাই। আমরা দু জনেই অবতার।'

'ওরে থাম, লোকজন সব এখুনি ছুটে আসবে।'

'আসুক না লোকজন।' হৃদয় তবু থামবে না কিছুতেই। সমানে চেঁচাতে লাগল।

'এ দেশে থেকে আর আমাদের লাভ কি? চলো অন্য দেশে যাই। দেশে দেশে গিয়ে জীবোদ্ধার করি।'

কিছুতেই স্তব্ধ হবে না হৃদয়।

রামকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি ছুটে এল হৃদয়ের কাছে। তার বুকে হাত ঠেকিয়ে দিলে। বললে, 'দে মা, শালাকে জড় করে দে।'

দিব্যদর্শন ছুটে গেল মুহূর্তে। আনন্দের সাগর এক শ্বাসে শুকিয়ে গেল। সেই শরীরী শিখা নিবে গিয়ে মূর্ত হল রক্ত-মাংসের দেহ।

'মামা, এ কী করলে?' কেঁদে ফেলল হৃদয়। 'আমাকে জড় বানিয়ে দিলে?'

'তোকে শুধু একটু স্তব্ধ করে দিলাম।'

'আমি আর দেখতে পাব না সেই দৃশ্য?' নিঃস্বের মত তাকিয়ে রইল হৃদয়।

'তুই যে বড্ড গোল করিস। একটু কি দর্শন পেয়েই একেবারে দিশেহারা হয়ে গেলি। দেশশুদ্ধ লোক ডেকে হাট বাধাবার যোগাড়।'

দরকার নেই রামকৃষ্ণে। আমি একাই পারব। রামকৃষ্ণ যদি পেরে থাকে, আমিই বা কম কিসে। ধ্যান-জপের মাত্রা বাড়িয়ে দিল হৃদয়। গভীর রাত্রে উঠে-উঠে যেতে লাগল পঞ্চবটী।

ঠিক করল রামকৃষ্ণ যেখানে বসে জপধ্যান করত সেখানেই আসন করতে হবে। হয় তো সেই জায়গাটিই পয়মন্ত। হয় তো মাটির কোনো গুণ আছে। দেখি না কি ফল হয়!

যেই সেই জায়গাটিতে বসেছে আসন করে, অমনি চীৎকার করে উঠল: 'মামা গো, পুড়ে মলাম, পুড়ে মলাম। শিগগির বাঁচাও।'

সে আর্তনাদ শুনতে পেল রামকৃষ্ণ। ত্রস্ত পায়ে ছুটে এল ঘর ছেড়ে। মুখে এক করুণ জিজ্ঞাসা: 'কি রে, কি হয়েছে?'

'এইখানে ধ্যান করতে বসা মাত্র কে যেন এক মালসা আগুন গায়ে ঢেলে দিলে।' যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল হৃদয়। 'সারা গা জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে।'

'তুই কেন এ সব করিস বল তো? তোকে বলেছি না আমার সেবা করলেই তোর সব হবে। কেন তবে এ সব ঝামেলা করছিস? নে, ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি তোকে—' রামকৃষ্ণ তার গায়ে স্নেহকরুণ হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

সেই স্পর্শে শান্তি হয়ে গেল হৃদয়ের। গঙ্গাস্নানের মত এল যেন শীতল নির্মলতা। বুঝলে সেবা ছাড়া আর তার পথ নেই। শুশ্রূষা ছাড়া নেই তার আর কোনো জিজ্ঞাসা।

বেশ আছি। যেখানে আছি, সেখানেই আমার রামের অযোধ্যা। 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে হাততালি দিয়ে সকাল-সন্ধ্যায় আমার শুধু হরিনাম। তা হলেই সব পাপ-তাপ চলে যাবে। পাপ-হরণ করেন বলেই তো তিনি হরি। দেহবৃক্ষে পাপ হচ্ছে পাখি আর নামকীর্তন হচ্ছে হাততালি। যেমন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে হাততালি দিলে পাখি উড়ে যায়, তেমনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করলে দেহ থেকে পালিয়ে যায় অবিদ্যা। যা আমার হবার নয় তার পিছনে ছুটি কেন? আমার শুধু ডাকের আশায় দাঁড়িয়ে থাকা। "হুজুরেতে আরজি দিয়ে মা দাঁড়িয়ে আছি করপুটে।"

এই সব ভাবে বটে কিন্তু মনের আনাচে কোথায় একটু অহং থেকে যায়। কার্নিশের ফাঁকে লুকিয়ে থাকে অশ্বত্থের বীজ, তা থেকে ফেঁকড়ি বেরোয়।

হৃদয় বললে, বাড়িতে এবার দুর্গোৎসব করব। মা আমার পুজো নেন কি না দেখতে হবে। মথুরবাবুকে বললে, 'কিছু টাকা দিন।'

'তা দিচ্ছি।' মথুরবাবু রাজি হলেন একবাক্যে। বললেন, 'কিন্তু বাবাকে নিয়ে যেতে পাবে না।'

সে কি কথা? আমার বাড়িতে প্রথম পুজো, মামা থাকবে না?

'নাই বা থাকলাম। তুই তার জন্যে ক্ষুণ্ণ হোস নে হৃদু।' সান্ত্বনা দিল রামকৃষ্ণ। বললে, 'আমি রোজ সূক্ষ্ম দেহে তোর পুজো দেখতে যাব। আর তোকে বলছি, আর-কেউ দেখতে পাবে না আমাকে, কিন্তু তুই পাবি।'

আরো শোন, বলে দিই, কাকে দিয়ে প্রতিমা গড়াবি, কে হবে তন্ত্রধারক। নিজের ভাবে নিজেই পুজো করবি। আর শোন, একেবারে উপোস করে থাকিস না, দুধ গঙ্গাজল আর মিছরির সরবৎ খাবি। বুঝলি?

হলও তাই। রোজ পুজো-সাঙ্গের পর রাতে আরতি করবার সময় হৃদয় দেখতে পেত রামকৃষ্ণ এসে দাঁড়িয়েছে প্রতিমার পাশে। আশ্চর্য, প্রতিমা প্রতিমাই থাকে। কিন্তু করুণাঘন রামকৃষ্ণ দাঁড়ায় এসে ভক্তের আঙিনায়।

চল তবে সেই করুণা-নিলয়ের কাছে। সেখানে গিয়ে তারই সেবারাধনায় মন দিই। হৃদয়ও তাই ফিরে গেল দক্ষিণেশ্বরে। শুধু মাঝখান থেকে আরেকবার বিয়ে করে নিলে।

সতেরো বছরের সুরূপ ছেলে এই অক্ষয়। মা-বাপ-মরা ছেলে। বসেছে বিষ্ণু-মন্দিরের পূজারি হয়ে। ধ্যান নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকে দু-তিন ঘণ্টা। নিজের হাতে রান্না করে খায়। সারা দিন গীতা পড়ে।

সেই অক্ষয়ের বিয়ে হল। বিয়ের পরেই অসুখে পড়ল। ডাক্তার বললে, সামান্য জ্বর, সেরে যাবে। শুধু ভাই-পো বলে নয়, ভক্তির জোর দেখে তাকে বড় ভালোবাসে রামকৃষ্ণ। কিন্তু হৃদয়কে ডেকে নিয়ে বললে রামকৃষ্ণ, 'হৃদু, লক্ষণ বড় খারাপ। ছোঁড়া বাঁচবে না।'

'ছি মামা! তোমার মুখ দিয়ে এ কথা বেরুলো কেন?'

'তার আমি কি জানি! মা যেমন বলান তেমনি বলি। নইলে, বল্, আমার কি-ইচ্ছা অক্ষয় চলে যায়?'

হৃদয় উঠে-পড়ে লাগল কি করে ভালো করা যায় অক্ষয়কে। যত ডাক্তার আছে কাউকে বাদ দিলে না। কিন্তু যার ডাক পড়েছে ডাক্তার তার কী করবে। মাস খানেক ভুগে এমন জায়গায় এসে ঠেকল যখন সলতে আর উস্কে দেওয়া যায় না। এল সেই অন্তিম মুহূর্ত। রামকৃষ্ণ পাশে বসে অক্ষয়কে সম্বোধন করে বললে গাঢ়স্বরে, 'অক্ষয়, বলো, গঙ্গা, নারায়ণ, ওঁ রাম।' ঐ মন্ত্র তিন-তিন বার আবৃত্তি করল অক্ষয়। তার পর ধীরে-ধীরে লীন হয়ে গেল।

মাটিতে আছাড় খেয়ে কাঁদতে লাগল হৃদয়। রামকৃষ্ণ চলে গিয়েছে ভাব-ভূমিতে। হৃদয় যত কাঁদে, তত হাসে রামকৃষ্ণ। নাচে, গান গায়। অমৃততীর্থে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে অক্ষয়। ক্ষয়হীন আনন্দধামে। এ দেখে যদি আনন্দ না হয় তবে কী দেখে হবে! দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বেশ স্পষ্ট দেখল চোখের উপর। দেখল কি করে মানুষ মরে, কি করে আত্মা বেরিয়ে আসে দেহ থেকে, কোথায় যায় সে আত্মা। দেখল খাপের ভিতর থেকে ঝকঝকে তরোয়াল এল বেরিয়ে। তরোয়ালের কিছু হল না, শুধু খাপটা পড়ে রইল। সেই উজ্জ্বল নির্ভীক তরোয়াল এই মায়া-মিথ্যার তমসা ভেদ করে চলে গেল লোকাতীত আলোকতীর্থে।

কিন্তু সেই ভাবলোক ছেড়ে নেমে আসতে হল ফের স্থূলে মাটিতে। পর দিন কালীবাড়ির উঠোনের সামনের বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে আছে রামকৃষ্ণ, দেখল, অক্ষয়ের নর-দেহ পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে ফিরে আসছে শ্মশানযাত্রীরা। যেমনি দেখা অমনি বুকফাটা কান্না পেল রামকৃষ্ণের। গামছা যেমন নিঙড়োয়, মনে হল বুকের ভিতরটা তেমনি কে নিঙড়োচ্ছে। সমস্ত দুঃখ অবুঝ অশ্রুর উচ্ছ্বাসে উথলে উঠল। সে জলতরঙ্গ কে রোধ করে।

'মা, এখানে পরনের কাপড়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ নেই, তা ভাইপোর সঙ্গে তো কতই ছিল। এখানেই যখন এ রকম হচ্ছে তখন গৃহীদের শোকে কী না হয়! তাই দেখাচ্ছিস বটে।'

কখনো আমি-আমার বলে না রামকৃষ্ণ। সব 'এখানে', 'এখানকার'।

'আমি গেলে ঘুচিবে জঞ্জাল।'

'কৃষ্ণকিশোরের ভবনাথের মত দুই ছেলে। দুটো-আড়াইটে পাশ। মারা গেল। অতো বড়ো জ্ঞানী। প্রথম-প্রথম সামলাতে পারলে না! আমায় ভাগিস ঈশ্বর দেননি।' ঠাকুর বললেন আত্মগতের মত।

কে এক জন ভক্ত বললে, 'ঈশ্বরে খুব ভক্তি হয় তো বেশ হয়। শোক-টোক থাকে না।'

'উঁহু। শোক ঠেলে দেয় ভক্তিকে।'

বিধবা ব্রাহ্মণী—তার একমাত্র মেয়ে, নাম চণ্ডী। খুব বড় ঘরে বিয়ে দিয়েছে মেয়ের। জামাই প্রকাণ্ড জমিদার, খেতাব পেয়েছে রাজা বলে। থাকে কলকাতায়, জাঁক-জমকের সংসার। মেয়েটি যখন বাপের বাড়ি আসে, সামনে-পিছে সেপাই-শান্ত্রী নিয়ে আসে। মায়ের বুক দশ হাত হয়। কিন্তু পলতের বাতি নিবে গেল এক ফুঁয়ে। কি একটা সামান্য অসুখে অল্প কদিন ভুগে মেয়েটি চোখ বুজল। বিধবা থাকে সেই বাগবাজার। কি করে এই অসাধ্য শোক শান্ত করবে তারই জন্যে বাগবাজার থেকে থেকে-থেকে ছুটে আসে পাগলের মত। যদি ঠাকুর কিছু উপায় বলে দেন! যদি সেই শীতল শান্তমূর্তি দেখে বুক জুড়োয়।

ব্রাহ্মণীর দিকে তাকালেন একবার ঠাকুর। বললেন, 'সেদিন একজন মজার লোক এসেছিল। খানিকক্ষণ বসে থেকে বললে, যাই এখন একবার ছেলের চাঁদমুখটি দেখি গে। আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, তবে রে শালা! ওঠ এখান থেকে। ঈশ্বরের চাঁদমুখের চেয়ে ছেলের চাঁদমুখ?'

বাগবাজারে নন্দ বোসের বাড়ি বেড়াতে এসেছেন ঠাকুর। কথা আছে নন্দ বোসের বাড়ি থেকে যাবেন ব্রাহ্মণীর বাড়ি। সেই ঠাকুর আর আসেন না। ব্রাহ্মণী কেবল ঘর-বার করছে। বোধ হয় আর এলেন না। অভাগিনীর অংগনে কি ভগবানের পদার্পণের স্থান আছে?

শেষকালে উচাটন হয় বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। গেল সটান নন্দ বোসের বাড়ির দিকে। খবর নিতে, চলে গেলেন না কি দক্ষিণেশ্বর? না কি নন্দ বোসের আনন্দ-ভবন পেয়ে ভুলে গেলেন দুঃখিনীর শোকম্লান ঘরের কোণটি?

ব্রাহ্মণীও গেছে, আর অমনি ঠাকুর এসে পড়ল ভক্তদের নিয়ে।

বাড়িতে ব্রাহ্মণীর ছোট বোন, সেও বিধবা। বললে, 'দিদি এই গেলেন নন্দ বোসের বাড়ি খবর নিতে। এই এলেন বলে।'

ছাদের উপর সবাইকে নিয়ে বসেছেন ঠাকুর। ছেলে বুড়ো পুরুষ মেয়ে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাণে-প্রাণে বয়ে চলেছে ভক্তির স্রোতস্বতী। এত লোক, তবু মনে হচ্ছে, এক জন কে নেই।

'ঐ দিদি আসছেন।' ছোট বোন উছলে উঠল।

ছাদে উঠে ঠাকুরকে দেখে ব্রাহ্মণী কি বলবে কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারছে না। অস্থিরের মত এদিক-ওদিক করছে। বলছে, 'আমি নিশিদিশি কাঁদি, কিন্তু ওগো, আমি যে এখন আহ্লাদে আর বাঁচি না। তোমরা সব বল গো আমি কেমন করে বাঁচি! ওগো, আমার চণ্ডী যখন এসেছিল—সঙ্গের সেপাই-শান্ত্রী পাহারা

দিচ্ছিল বাড়ির দরজায়, তখনো যে আমার এত আহ্লাদ হয়নি গো। আমার এ কি হোল, চণ্ডীর শোক আর আমার এখন একটুও নেই গো! মনে করেছিলাম তিনি যেকালে এলেন না, যা আয়োজন করেছি সব গঙ্গার জলে ফেলে দেব। আর ওঁর সঙ্গে আলাপ করব না, যেখানে আসবেন একবার অন্তর থেকে দেখে আসব। তাই, সকলকে বলি, আয় রে আমার সুখ দেখে যা, আমার ভাগ্যি দেখে যা। দেখে যা আমার ঘরে আজ কে এসেছে! ওগো, আমি মরে যাব, আমার এত সুখ সইবে না। তোমরা সবাই মিলে আশীর্বাদ করো আমাকে, নইলে মরে যাব সত্যি-সত্যি—'

অক্ষয়ের মৃত্যুর পর থেকে রামকৃষ্ণ কেমন বিষণ্ণ। মথুরবাবু বললেন, চলো একবার আমার জমিদারিটা ঘুরে আসবে।

তাই চলো। ওরে হৃদু, জমিদারি দেখবি চল।

চূর্ণীর খালে নৌকোয় করে বেড়াচ্ছে তিন জন। রাণাঘাটের কাছাকাছি কলাই-ঘাটায় এসে রামকৃষ্ণের চোখ পড়ল দারিদ্র্যদলিত জনগণের উপর। রামকৃষ্ণ বললে, 'এই তোমার জমিদারির চেহারা? এই হাল তোমার মহালের?'

কেন, কী হল?

দেখ দেখি ঐ লোকগুলোর দিকে। পরনে ট্যানা, পেটে-পিঠে এক হয়ে রয়েছে। শোনো, সবাইকে একখানা করে কাপড় দাও, আর খাইয়ে দাও এক বেলা।

যেমন চিরদিনের অভ্যেস, তা-না-না-না করতে লাগলেন মথুরবাবু।

তবে তোমার জমিদারি জাহান্নমে যাক। চল রে হৃদু, আর জমিদারি দেখে না। ফিরে চল দক্ষিণেশ্বর।

মথুরবাবুকে আবার তাঁর থলের মুখ ফাঁদালো করতে হল। গ্রামের লোকদের অন্নবস্ত্র বিতরণ করলেন।

সাতক্ষীরার কাছে সোনাবেড়ে গ্রামে মথুরবাবুর পৈত্রিক ভিটে। তারই কাছাকাছি তালামাগরো গ্রাম। সে-গ্রামে তাঁর গুরুঘর। গুরুবংশে সরিকি অংশ নিয়ে ঝগড়া বেধেছে। আপোষনিষ্পত্তি করবার জন্যে তলব পড়েছে মথুরবাবুর। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা। রামকৃষ্ণ আর হৃদয় চলেছে পাল্কিতে। আর মথুরবাবু হাতির হাওদায়।

সহসা শিশুর মত হয়ে গেল রামকৃষ্ণ। বললে, 'আমি হাতি চড়ব।'

মথুরবাবু বাহন বদলালেন। রামকৃষ্ণ আর হৃদয়কে হাতিতে চাপিয়ে নিজে এলেন পাল্কিতে। হাতিতে চড়ে রামকৃষ্ণের আনন্দ তখন দেখে কে!

সর্বভূতে নারায়ণের গল্প জানিস তো? গুরু শিখিয়ে দিয়েছে শিষ্যকে, শিষ্যকে আর পায় কে। পথ দিয়ে হাতি চলেছে, উপর থেকে মাহুত বললে, সরে যাও। শিষ্যের তখন সর্বভূতে নারায়ণ—সে ভাবলে, সরব কেন? আমিও নারায়ণ, হাতিও নারায়ণ, আমাদের মধ্যে বিরোধ নেই। সরাসরি হাতির সামনে এসে দাঁড়াল, সরল না এক চুল। হাতি তাকে শুঁড়ে করে ধরে দূরে ছুঁড়ে ফেললে। ঘা-ব্যথা সারবার পর গুরুর কাছে এসে নালিশ করলে। গুরু বললে—ভালো কথা, তুমিও নারায়ণ হাতিও নারায়ণ, আর মাহুতটি নারায়ণ নয়? মাহুত নারায়ণের কথা শুনবে না?

দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এল দলবল। কলুটোলায় কালী দত্তর বাড়ি বৈষ্ণবদের

প্রকাণ্ড হরিসভা বসে। সেখানে এক দিন নেমন্তন্ন হল রামকৃষ্ণের। আর, যেখানেই রামকৃষ্ণ, সেখানেই তরুচ্ছায়ার মত হৃদয়রাম। ভাগবত পাঠ হচ্ছে। তন্ময় হয়ে শুনছে সবাই ভাগবত। রামকৃষ্ণও বসে পড়ল একধারে।

সামনে মহাপ্রভুর আসন। তার মানে বেদীতে যে আসন বিছানো তা হচ্ছে শ্রীচৈতন্যের আসন। বৈষ্ণবদের পূজা-পাঠের সময় থাকে এমনি আসন বিছানো। কল্পনা করা হয় সেখানে গৌরাঙ্গদেব এসে বসেছেন, শুনছেন হরিকথা। ভক্তের মধ্যেই ভগবানের অধিষ্ঠান এই ভাবটিরই প্রতীক ঐ আসনখানি।

রামকৃষ্ণকে পেয়ে ভক্তির স্রোত আরো উত্তরঙ্গ হয়ে উঠল। হরিকথায় এল আরো অতলতরো অনুরক্তি। কোথা থেকে কি হয়ে গেল কেউ টের পেল না, রামকৃষ্ণ হঠাৎ সেই চৈতন্যাসনের উপর গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েই সমাধিস্থ। একখানি হাত ঊর্ধ্বে তোলা আর তার আঙুলে সেই বাক্যাতীত ভাবলোকের নির্দেশ। সর্বাঙ্গ নির্বায়ু-নিশ্চল দীপশিখার মত স্থির, মুখে প্রেমপূর্ণ প্রসাদ-শান্তি। চৈতন্যদেবের সমস্ত চিহ্ন অঙ্গে-ভঙ্গে দেদীপ্যমান।

শ্রোতা-বা সকলেই স্তম্ভিত হয়ে রইল। ভালো-মন্দ কোনো কথাই কারু মুখ দিয়ে বেরুল না। ভয়ে-বিস্ময়ে কাঠ হয়ে রইল সবাই। এ কি অঘটন! জনতার উগ্র দৃষ্টি শান্ত হয়ে এল ক্রমে ক্রমে। বিমূঢ় দৃষ্টিতে এল কোমল মুগ্ধতা।

যেই নাম শুনে সমাধি সেই নাম শুনেই আবার বহির্জ্ঞান। সুতরাং কীর্তন লাগাও। কীর্তন শুনিয়ে প্রভুর ধ্যান ভাঙাও। বৈষ্ণবের দল কীর্তন শুরু করল। নাম-ঝংকারে সংজ্ঞা এল রামকৃষ্ণের। দু হাত তুলে শুরু করল নাচতে। মাধুর্যে উচ্ছল আবার উদ্দামতায় উত্তাল সেই যে নৃত্য সে-নৃত্য নটশ্রেষ্ঠ মহাদেবের। সবাই নামসৌরভে বিভোর হয়ে উঠল, নয়নরঞ্জনকে দেখে হয়ে রইল নিষ্পলক।

চৈতন্যদেবের আসন অধিকার করা রামকৃষ্ণের পক্ষে ন্যায় হয়েছে কি অন্যায় হয়েছে এ প্রশ্নের বাষ্পটুকুও কারু মনে রইল না।

কিন্তু ভাবের গিরিচূড়ায় কতক্ষণ থাকবে। নেমে আসতে হল দৈনন্দিন জীবনের সমতলতায়। তখন তর্ক উঠল এই আসন-অধিকারের ঔচিত্য নিয়ে। এক দল বললে, ঘোরতর অন্যায় হয়েছে। শুধু অন্যায় নয়, আস্পর্ধা। আরেক দল বললে, প্রাণ যেমন চায় ঠিক তেমনটি হয়েছে। শুধু ন্যায্য নয়, বাঞ্ছনীয়।

মীমাংসা হল না। সমস্ত বৈষ্ণব সমাজে বিষম আলোড়ন উঠল। এ যে ধর্মের কলঙ্কীকরণ। এর প্রতিকার কি? সবাই গেল তখন কালনায়, ভগবানদাস বাবাজীর কাছে। ঘটনা শুনে ভগবানদাস তো রেগে কাঁই।

'ভণ্ড, ধূর্ত কোথাকার।' রামকৃষ্ণের উদ্দেশে তপ্ত-অঙ্গার গালাগাল ছুঁড়তে লাগল বাবাজী। পারে তো নখে-দাঁতে ছিঁড়ে ফেলে। বললে, 'আর কোনো দিন ঢুকতে দিও না ওকে হরিসভায়।'

এ কি অঘটন!

আর যে অঘটনের ঘটয়িতা, রামকৃষ্ণ, সে সাতেও নেই পাঁচেও নেই। সে কিছু জানতেও পেল না।

সে এখন বসে আছে তৃণাসনে। সমস্ত তৃণাসনই তার চৈতন্যাসন।

'আশ্রমে কে এল বল দেখি।' ভগবানদাস বাবাজী তাকাতে লাগলেন চার দিকে। কে আবার আসবে!

'না, একজন কে মহাপুরুষ এসেছেন আশ্রমে। নিশ্বাসে তাঁর সুগন্ধ টের পাচ্ছি। তোরা সব একটু দ্যাখ দেখি এগিয়ে।'

কত লোকেই তো আসছে-যাচ্ছে আশ্রমে। কালনার সিদ্ধবাবাজীর নাম ভারত-প্রসিদ্ধ। এমন কৃষ্ণভক্ত থাকতে আবার কার গায়ের গন্ধে বাতাস আমোদ হবে। কত ঢঙের মানুষই আসে আজকাল। কে একজন দেখ না এসেছে একেবারে কাপড়ে মুড়িসুড়ি দিয়ে। মুখ-হাত-গা কিছুই দেখবার উপায় নেই। পুরুষমানুষের আবার এ কোন ছিরি! কোনো অসুখ-বিসুখ নাকি?

'না, এটা ওঁর ভয়-লজ্জার ভাব।' সঙ্গের লোকটি বললে। 'ওঁর বালকস্বভাব কিনা। অচেনা নতুন জায়গায় এলে এমনি ওঁর ভাব হয়।'

'তোমার কে হন?' জিগগেস করলেন বাবাজী।

'আমার মামা। সারাক্ষণ ঈশ্বরভাবেই আছেন। আপনার এ আশ্রম ঈশ্বর-ভাবের আশ্রম—আপনার নামটিও ভগবান। দেখতে এসেছেন আপনাকে।'

বোসো এক পাশে। কত ভাবের লোকই আসে আজকাল। কী-না-কী একটু ভাব হল, অমনি ঈশ্বরভাব! মোগল-পাঠান হদ্দ হল ফারসি পড়ে তাঁতী!

'কিন্তু কে এল বল তো আশ্রমে! এমন দিব্যসৌরভ টের পাচ্ছি কেন?' বাবাজী উন্মনা হয়ে উঠলেন।

কোথায় কে! তেমনি আবার কে আসবে আচমকা!

বাবাজীকে প্রণাম করে এক পাশে বসল দুজনে। হৃদয় আর রামকৃষ্ণ। বসল একান্ত দীনভাবে। বিনম্র-বিনত হয়ে।

দিব্য গন্ধের উৎস কোথায় বুঝতে পারলেন না বাবাজী।

যাক, উপস্থিত প্রসঙ্গেই নেমে আসা যাক। হ্যাঁ, যা নিয়ে কথা চলছিল এতক্ষণ। সেই বৈষ্ণব সাধুটির কথা। যে গর্হিত কাণ্ড সে করে বসেছে তার সম্বন্ধে এখন কি করা উচিত। কোন শাস্তিটি বিধেয়?

'আমি বলি কি', ভগবানদাসের কণ্ঠে শাসক-রোষ গর্জে উঠল: 'আমি বলি কি, ওর গলার কণ্ঠি কেড়ে নিয়ে ওকে দল থেকে বার করে দাও।'

বাবাজীর যা অভিমত, তাই প্রত্যাদেশ।

মালা ফেরাচ্ছেন বাবাজী।

'আপনি আর অকারণ মালা রেখেছেন কেন?' জিগগেস করলে হৃদয়: 'আপনার সিদ্ধিলাভ তো কবেই হয়ে গেছে।'

এ প্রশ্ন কি হৃদয় করল না, আর কেউ করাল তাকে দিয়ে?

'নিজের জন্যে কি আর করি? লোকশিক্ষা তো দিতে হবে আমাকে।'

'লোকশিক্ষা?'

'তা ছাড়া আবার কি। তারি জন্যেই তো আছি। আমাকে দেখে আর সবাই যদি অমনি মালা-তিলক ছেড়ে দেয় তবে দল-কে-দল গোল্লায় যাবে।'

ওরে, এ যে সোঽহং বলছে। কী সর্বনাশ! ওরে, দা লাগা! দা বসা! সোঽহং-এর আগে দা জুড়ে দে। বল দাসোঽহং। দেহবুদ্ধিতে দাসোঽহং ছাড়া পথ নেই।

বল আমি দাস, আমি ভক্ত, আমি বালক। জ্ঞান হলে আবার অহং কি! সূর্য যদি ঠিক মাথার উপর থাকে তবে আর ছায়া কোথায়? কিন্তু অন্য সময়? সূর্য যখন এদিকে-ওদিকে? যখন চলছে দেহের ছায়াবাজি? যখন আর জ্ঞান নেই? তখন? তখন ভক্তি, তখন প্রেম, তখন সেবা। সেবা-প্রেম না নিয়ে মানুষ কী নিয়ে থাকবে? কী করে তবে তার দিন কাটে?

যার অটল আছে তার আবার টলও আছে। এই আছিস স্থির হয়ে অমনি আবার তুই কাজ করছিস। তোর স্থিরতা কতটুকু? তোর চাঞ্চল্যই বেশি। সূর্য মাথার ওপর কতক্ষণ? বেশিক্ষণই সে ডাইনে-বাঁয়ে। তাই জ্ঞান নিয়ে কতক্ষণ বসে থাকবি? ভক্তিতে ছুটে চল। ভক্তিতে গলে যা। ওরে যা জ্ঞান তাই ভক্তি। জ্ঞান বলে, এ জল; ভক্তি বলে, জানি না কে—এ শুধু শীতলতা। একে ছুঁতে ঠাণ্ডা, খেতে ঠাণ্ডা।

জ্ঞান বস্তু, ভক্তি স্বাদ। কিন্তু যেখানে একা-একা নয়, জীব-জগৎ নিয়ে থাকবি সেখানে স্বাদ দিয়ে যা জনে-জনে। স্বাদ নিয়ে যা ক্ষণে-ক্ষণে।

তাই বলে এই অহঙ্কার! এত প্রতপ্ততা! নিমেষে কি হয়ে গেল কে বলবে। মুখের কাপড় খসে পড়ল রামকৃষ্ণের। রাগের ঝঙ্কার দিয়ে উঠে দাঁড়াল আগুনের মত। বললে, 'তুমি লোকশিক্ষা দেবে? তুমি লোক তাড়াবে? তুমি ধরবে-ছাড়বে? কে তুমি? যাঁর এই জগৎসংসার তিনি যদি না শেখান, তিনি যদি না তাড়ান, তিনি যদি না ধরেন-ছাড়েন, তোমার সাধ্য কি! কেন, কিসের এত অহঙ্কার?'

কটিতট থেকে খসে পড়ল বস্ত্রখণ্ড। মুখে দিব্য জ্যোতি, দেহে দিব্য তেজ, কণ্ঠে দিব্য বাণী। সমাধিস্থ রামকৃষ্ণ। চোখ মেলে তাকালেন একবার বাবাজী। নিশ্বাস নিলেন বুক ভরে। বুঝলেন সেই দিব্য গন্ধের উৎস কোথায়।

এ সংসারে কেউ কোনো দিন তাঁর মুখের উপর কথা বলেনি। সাহস পায়নি প্রতিবাদ করতে। তিনি যা বলেছেন তাই সবাই মেনে নিয়েছে হেঁটমুণ্ডে। কিন্তু কে এই উদ্যতদণ্ড মহাশাসন? অথচ এর প্রতি সেই স্বাভাবিক ক্রোধ হচ্ছে না কেন? কেন জাগছে না প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি? আমি কি বদলে গেলাম নিমেষে? কিন্তু এ কে? এ সেই বিশ্বভুবনের তমোহর। তোমার অভিমানের তমোনাশ করতে এসেছেন। এসেছেন তোমার অন্তশ্চক্ষু ফুটিয়ে দিতে। বুঝিয়ে দিতে তুমি কে, তুমি কতটুকু! তোমাকে ঠাণ্ডা করে দিতে।

ভাবমোহিত হয়ে গেলেন ভগবান। বললেন, কণ্ঠে বিনয়নম্র মধুরতা: 'আমার এমনি নাম ভগবান বটে কিন্তু আজ থেকে আমার আসল নাম ভাগ্যবান। ভাগ্যবান বলেই আমি আপনাকে পেয়েছি, আমাকে দেখা দিয়েছেন—'

সত্যিই দেখা দিয়েছেন ! বাবাজী দেখলেন, মহাপ্রভুর মহাভাবের যে লীলাবর্ণন আছে তাই ওঁর দিব্য অঙ্গে প্রকাশিত।

বন্দনার আনন্দস্রোত বইতে লাগল আশ্রমে।

কে এ? কে এ বন্ধনমুক্ত বিভাবসু? অহঙ্কারের সংহত তুষারকে গলিয়ে দিলেন ভক্তির স্রোতস্বিনীতে!

উনিই সেই দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস। কলুটোলার হরিসভায় উনিই সেদিন ভাবাবেশে দাঁড়িয়েছিলেন চৈতন্যাসনে।

করজোড়ে ক্ষমা চাইলেন বাবাজী। বহু কটু-কাটব্য করেছি সেদিন। বুঝতে পারিনি। যিনি সমস্ত জীবের চৈতন্য এনে দিয়েছেন চৈতন্যাসনে তো তাঁরই একমাত্র অধিকার।

মথুরবাবু আর হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে কালনায় বেড়াতে এসেছিল রামকৃষ্ণ। এসেছিল নৌকো করে। কেন এসেছিল কেউ জানেনি। মথুরবাবু গেলেন বাসা দেখতে, রামকৃষ্ণ বললে, চল রে, হৃদু, শহরটা একবার ঘুরে আসি। কত দূর এসেই পথের লোককে ডেকে জিগগেস করলে। 'আচ্ছা মশাই, ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রমটি কোন দিকে?'

সেই আশ্রমে এসে এই কাণ্ড।

তোতাপুরীকে ক্রোধ জয় করতে শিখিয়ে দিয়েছিল, ভগবানদাস বাবাজীকে শিখিয়ে দিল অহঙ্কার জয় করতে, প্রতিহিংসা জয় করতে।

মথুরবাবুকে বললে, 'এইখানে একটি মচ্ছব লাগিয়ে দাও।'

মথুরবাবু বললেন, 'তথাস্তু।'

সেখান থেকে চলো এবার নবদ্বীপ। চলো একবার দেখে আসি নিমাইয়ের জন্মভূমি। কেউ বলে নিম গাছের নিচে জন্মেছিল বলে নিমাই। কেউ বলে যমের মুখে তেতো লাগবে বলে নিমাই। কেউ বলে আট-আটটি কন্যা মরে যাবার পর নবম গর্ভে জন্মেছিল বলে নিমাই।

কিন্তু এমন কাঁদুনে ছেলে, কিছুতেই শান্ত হতে চায় না। পাড়ার স্ত্রীলোকদের কত জনের কত রকম চেষ্টা, কিছুতেই নিবৃত্তি নেই। অগত্যা অনুপায় হয়ে হরিনাম শুরু করে দেয় সবাই। ব্যস, শিশুর মুখের খিলখিল হাসি।

পরম সংকেত পেয়ে গেল সকলে। শিশু কাঁদলেই হরিনাম করতে হবে। আর শিশুও এমনি দুঁদে, তার কেবল থেকে-থেকে কান্না।

কিন্তু নেড়া-নেড়ীদের এ সব কী কাণ্ড বলো দেখি? সত্যিই কি চৈতন্য অবতার? না, নেড়া-নেড়ীরাই টেনে-বুনে বানিয়েছে একটা? চলো নিজে গিয়ে দেখে আসি। হ্যাঁ নিজে সেখানে গেলেই ঠিকঠাক বোঝা যাবে। চৈতন্য যদি অবতার হয়ই তবে সেখানে কিছু-না-কিছু প্রকাশ থাকবেই, আর ইশারা ঠিক মিলে যাবে চট করে।

রামকৃষ্ণ এল নবদ্বীপে। বড় গোঁসাইয়ের বাড়ি, ছোট গোঁসাইয়ের বাড়ি দেখতে লাগল ঘুরে-ঘুরে। হেথা-হোথা হেন-তেন কত ঠাকুর-দেবতার থান। কোথাও কিছু দেখতে পেল না। সর্বত্রই শুকনো হাঁড়ি ঠনঠন করছে। কোথাও দেবভাব

নেই। সব জায়গাতেই এক-এক কাঠের মুরদ হাত তুলে খাড়া হয়ে আছে শুধু। দূর! এখানে তবে এলুম কি করতে! চল্ ফিরে চল্ নৌকোয়।

তাই সই। ফিরে চলো।

কিন্তু নৌকোয় যেই উঠেছে রামকৃষ্ণ, অমনি বদলে গেল দৃশ্যপট। অলৌকিক দর্শন হল তার। ঐ এলো, ঐ এলো—বলতে বলতে চকিতে সমাধিস্থ হয়ে গেল। জলে পড়ে যাচ্ছিল, হৃদয় ধরে ফেললে।

কী দেখলে অকস্মাৎ?

'দেখলুম দুটি সুন্দর ছেলে—আহা, এমন রূপ কখনো দেখিনি, তপ্ত কাঞ্চনের মত রং, কিশোর বয়স, মাথায় একটা করে জ্যোতির মণ্ডল, হাত তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে আকাশপথ দিয়ে ছুটে আসছে। এসেই একেবারে এই খোলটার মধ্যে ঢুকে গেল, আর আমার কিছু হুঁস রইল না। ওরে, ওরাই হচ্ছে নিমাই-নিতাই। নিমাই যে অবতার, তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে?'

কিন্তু এ ভাব নবদ্বীপে না এসে এই গঙ্গাবক্ষে এল কেন?

মথুরবাবু বললেন, 'যে নবদ্বীপে মহাপ্রভুর জন্ম তা গঙ্গায় ভেঙে গেছে। এই যে বালুর চড়া দেখতে পাচ্ছ এই ছিল আসল নবদ্বীপ। তাই হালের শহরে না হয়ে এই বালুর চড়ার কাছে এসে তোমার ভাব হল।'

তুমি ভাবাম্বুনিধি। তুমি সর্বগুণেশ্বর।

আমি কেউ নই। আমি আবার কে!

* ৪২ *

কর্মযোগে অঙ্গারও হীরক হয়।

মথুরবাবুও ভক্তিতে-বিশ্বাসে অত্যুজ্জ্বল হয়ে উঠলেন।

সকাতরে বললেন রামকৃষ্ণকে, 'বাবা, আমাকে ভাবসমাধি দাও।'

হাসল রামকৃষ্ণ। বললে, 'দিব্যি তো আছিস। সুখে থাকতে ভূতের কিল খাবি কেন?'

'না, ও সব শুনছি না আমি—'

'না শুনলে চলবে কেন? তোর এদিক-ওদিক দুদিক চলছে। ভাব হলে যে অথৈ জলে পড়বি। সংসার থেকে মন যে তখন উঠে যাবে। তখন তোর বিষয়-আশয় কে দেখবে-শুনবে? বারো ভূতে যে লুটে খাবে সর্বস্ব।'

মথুরবাবু তবুও নাছোড়বান্দা।

'ওরে কালে হবে, কালে হবে। একটা বিচি পুঁততে-পুঁততেই কি গাছ হয়? আর গাছ হয়েই কি ফল পাওয়া যায়?'

ভক্ত ভৃত্য আর ভাণ্ডারী এই মথুরবাবু। কখনো প্রভুজ্ঞানে ইষ্টপূজা, কখনো বা সন্তানভাবে স্নেহশ্রাবণ। কখনো অভিভাবক জ্ঞানে সতর্ক সন্ধান, কখনো বা

মিত্র-বন্ধুতে সমতা-মমতা। আর যিনি বিশ্বজনকে, যিনি আত্মীয়ের চেয়েও আত্মীয়, সর্বত্র যাঁর ক্ষমা, দয়া, বিশ্বাস আর আশীর্বাদ, তাঁকেই মাঝখানে রেখে দুই পাশে শুয়েছেন দুই জনে। মথুরবাবু আর জগদম্বা। একই ধৈর্যের শয্যায়।

রামকৃষ্ণ ভাব দিতে রাজি হল না বলে মরমে মরে রইলেন মথুরবাবু। মাকে বললেন, মা, আমাকে বঞ্চনা করে তোর লাভ কি।

কি খেলা দেখাবার জন্যে মথুরবাবুকে মা নিয়ে এসেছিল রামকৃষ্ণের কাছে তা কি মথুরবাবু জানেন ? বারে-বারে রামকৃষ্ণকে যাচাই করে দেখবার জন্যে। সাধে কি আর মথুরবাবু লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে ? দেখলেন যতই আগুন আনেন ততই সোনা টকটকে রং ধরে। একলা ঘরে সুন্দরী মেয়েমানুষ এনে দিলেন, রামকৃষ্ণ দুর্গাস্তব শুরু করলে। শাল-দোশালা চাপিয়ে দিলেন গায়ে, তার গায়ে থুতু ছিটোতে লাগল। রুপোর সাজ আর গড়গড়া দিলেন কিনে, বললে গামছা পরে ডাবা হুঁকো খেতে দোষ হল কি ! বিষয় দিতে চাইলেন, এই মারে তো সেই মারে ! তাঁর নিজের সংসারের উপরে দিলেন তাকে অপ্রতিহত প্রভুত্বের অধিকার, এক নজর তাকিয়েও দেখল না। কামারপুকুরের সংসারের জন্য কত অর্থব্যয় করলেন, এতটুকু কাতরতা-কৃতজ্ঞতা নেই !

এ কে তুমি বৈরাগ্যবারিনিধি ! আমি অনেক দুষ্কার্য করেছি, জমিদারি বজায় রাখতে খুনখারাপি করতেও কসুর করিনি, এবার দাও আমাকে নৈষ্কর্ম্যের নিষ্কৃতি। আমাকে ভাব দাও।

তদ্‌ভাবে তদ্‌ভাবঃ, তদ্‌ভাবে তদ্‌ভাবঃ।

'ওরে ঠিক-ঠিক যে ভক্ত সে কি তাঁকে দেখতে চায় ? সে শুধু তাঁর সেবা করে।' প্রবোধ দিল রামকৃষ্ণ। 'তাঁর সেবাতেই তার পরমানন্দ। তার বেশি আর সে কিছু চায় না।'

তবু মন ওঠে না মথুরবাবুর।

'তা কি জানি বাপু ! মাকে তবে গিয়ে বলি ! দেখি তাঁর কি ইচ্ছে।'

এর দিন কয়েক পরেই হঠাৎ একদিন মথুরবাবুর ভাবসমাধি উপস্থিত। তিন দিন ধরে ঠায় জড় অবস্থা।

ডেকে পাঠালেন রামকৃষ্ণকে। দেখে যাও কোথায় এসে উঠেছি শেষ পর্যন্ত।

রামকৃষ্ণ দেখল, আশ্চর্য, এ কী হয়ে গিয়েছে মথুর ! যেন আরেক দেশের মানুষ। চেনা যায় না চট করে। দু' চোখ লাল, কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। মুখে শুধু ঈশ্বরের কথা। শুধু অধ্যাত্মরতি।

কিন্তু রামকৃষ্ণকে দেখেই দু' পা জড়িয়ে ধরলেন মথুরবাবু। আকুল কণ্ঠে বললেন, 'বাবা, ঘাট হয়েছে। তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও।'

'কেন, কি হল ?'

'সব তছনছ হয়ে গেল। তিন দিন ধরে এই অবস্থা, বিষয়কর্মে মন দিতে পারছি না, চেষ্টা করলেও মন উঠে-উঠে যাচ্ছে। তিন দিনই বারো ভূত ছেড়ে তেত্রিশ ভূত এসে লেগেছে—'

'কেন, তখন যে খুব ভাব চেয়েছিলে শখ করে? এখন ফেরৎ দিলে চলবে কেন?'

'এদিকে সব যে যায়!'

'কেন, আনন্দ নেই?'

'আছে, কিন্তু সে আনন্দ, যিনি নিত্যানন্দ, তোমারই সাজে। আমাদের ও সবে কাজ নেই। আমাদের পদসেবা। পর-জ্ঞানে পরা-সেবা।'

হাসতে লাগল রামকৃষ্ণ। বললে, 'তাই তো বলেছিলাম আগে।'

'তখন কি অতশত বুঝেছি? তখন কি জানতাম যে ভাবের গোঁয়ে চব্বিশ ঘণ্টাই ফিরতে হবে? ইচ্ছে করলেও আর কিছুতেই মন দিতে পারব না?'

তখন আর রামকৃষ্ণ কি করে। মথুরবাবুর বুকে স্নেহের হাত বুলিয়ে দিলে। ধাতস্থ হলেন মথুরবাবু।

ওরে, কী হবে ও সব ভাব-টাবে। শুধু তাঁর নাম কর, তাঁর দয়ায় বিশ্বাস কর। ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর তাঁর কাছে। কী চাইবি? শুধু আশ্রয়, শুধু শান্তি, শুধু প্রসন্নতা। ওরে, ধেয়ান ধর, প্রেম লাগা।

সাধন-ভজন কেবল ডানা বেদনা করবার জন্যে। আকাশে উড়তে-উড়তে ডানায় ব্যথা হলেই পাখি কোথাও কোনো উঁচু জায়গায় এসে বসে। সেই উঁচু জায়গাটিই তিনি। আর তাঁরই জন্যে সাধন।

চিঁড়ে কোটো, মন রেখো ঢেঁকির মুষলের দিকে। তুলসীদাস পড়েছিস? তুলসী, য়্যাসা ধেয়ান ধর, য্যাসা বিয়ানকা গাই। মু মে তৃণ চানা টুটে চেৎ রাখয়ে বাছাই। প্রসূতি গাভী মুখে ঘাস খেলেও যেমন তার মন পড়ে থাকে বাছুরের উপর, তেমনি সংসারকর্মে লেগে থাকলেও মন ফেলে রাখ ঈশ্বরে।

মথুরবাবুর অসুখ, ফোড়ার যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। হৃদয়কে দিয়ে বলে পাঠালেন, বাবা যেন একবারটি আসেন।

রামকৃষ্ণ বললে, 'আমি গিয়ে কি করব! আমি কি তার ফোড়া ভালো করতে পারব?' গেল না রামকৃষ্ণ।

মথুরবাবু আবার লোক পাঠালেন। বাতাসে পাঠালেন তাঁর যন্ত্রণার কাতরতা। অগত্যা যেতে হল রামকৃষ্ণকে।

অনেক কষ্টে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে উঠে বসলেন মথুরবাবু। বললেন, 'বাবা এসেছ? আমাকে একটু পায়ের ধুলো দাও।'

'তুমি কি ভেবেছ আমার পায়ের ধুলোয় তোমার ফোড়া ভালো হবে?'

সারা অন্তরে ছি-ছি করে উঠলেন মথুরবাবু। বললেন, 'বাবা আমি কি এমনি? আমি কি আমার ফোড়ার জন্যে তোমার পায়ের ধুলো চাই?' দুই চোখ দিয়ে অশ্রুধারা নেমে এল। 'আমার ফোড়ার জন্যে তো ডাক্তার আছে। আমি তোমার শ্রীচরণের ধুলো চাই এই ভবসাগর পার হবার জন্যে।'

শুনতে শুনতে ভাবাবেশ হল রামকৃষ্ণের। স্বচ্ছ ভক্তির স্পর্শে উথলে উঠল ভাবতরঙ্গ। সেই সুযোগে মথুরবাবু রামকৃষ্ণের যুগ্মপদে মাথা ঠেকালেন। দেহের চিকিৎসার জন্যে আয়ুর্বেদী আছে, তুমি ভবরোগবৈদ্য।

তুমি অতীন্দ্রিয় রাজ্যের স্বরাট-বিরাট সম্রাট হয়ে আবার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের অধিপতি। তুমি স্নেহে মাতা, পালনে পিতা, জীবনের খেলার সাথী।

একেক সময় একটা গোঁ আসে মথুরবাবুর। যেমন সেইবার এসেছিল। বিজয়াদশমীর দিন বলে বসলেন, প্রতিমা বিসর্জন দেব না, নিত্যপূজা করব। কারু কথায়ই কান পাতেন না। স্ত্রীর কথা পর্যন্ত উড়িয়ে দিলেন। বিপদ বুঝে রামকৃষ্ণকে ডেকে পাঠালেন জগদম্বা। স্বামীর নিশ্চয় মাথা বিগড়েছে। নইলে এমনতরো চেহারা হয় আকস্মিক?

মুখ-চোখ লাল, কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এদিক-ওদিক। না, কিছুতেই ফেলে দিতে পারব না মাকে। মাকে ছাড়া বাঁচতে পারব না।

রামকৃষ্ণের অনুরোধ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। 'মাকে ছেড়ে বাঁচতে পারব না। যতক্ষণ আমার প্রাণ আছে ততক্ষণ কেউ নিয়ে যেতে পারবে না মাকে।'

রামকৃষ্ণ তখন তাঁর বুকে হাত বুলুতে লাগলেন। বললেন, 'মাকে ছেড়ে তোমাকে থাকতে হবে এ কথা কে বললে? আর বিসর্জন দিলেই বা মা যাবেন কোথায়? ছেলেকে ছেড়ে মা কি থাকতে পারেন কখনো? তিন দিন বাইরের দালানে বসে পুজো নিয়েছেন, আজ থেকে একেবারে ভিতরের দালানে বসে পুজো নেবেন। হ্যাঁ, ভিতরের দালান। তোমার অন্তর মহল। আরো নিকট হবেন তিনি। বসবেন এসে তোমার অন্তরের অন্দরে।'

ব্যস, হাতের ছোঁয়ায় নরম হয়ে গেলেন মথুরবাবু। সত্যদৃষ্টির সৌম্য শান্তি নেমে এল দু চোখে।

'কথা কইতে-কইতে অমন করে ছুঁয়ে দি কেন জানিস?' ভক্তদের বললেন এক দিন ঠাকুর, 'যে শক্তিতে ওদের ওই গোঁ-টা থাকে, সেইটের জোর কমে গিয়ে ঠিক-ঠিক সত্য বুঝতে পারবে বলে।'

১২৭৮ সালের আষাঢ় মাসের শেষের দিকে মথুরবাবু জ্বরে পড়লেন। দেখতে-দেখতেই বিকারে দাঁড়িয়ে গেল জ্বর।

রামকৃষ্ণ গিয়েছে দেখা করতে।

মথুরবাবু বললেন, 'আচ্ছা বাবা, সেই যে তুমি বলেছিলে তোমার অনেক ভক্ত আসবে, কই, তারা তো আজো এল না?'

'কি জানি বাপু, কত দিনে আসবে সব। মা যত কিছু দেখিয়েছেন সব ফলেছে, শুধু এইটেই বুঝি ফলল না!' রামকৃষ্ণের মুখে পড়ল ঈষৎ বিষাদ-ছায়া।

জানো না সেই ভূতের সংগী খোঁজা। ভূত একা-একা ঘোরে, সংগী-সাথী জুটছে না একটাও। শনি-মঙ্গলবারে কেউ যদি অপঘাতে মরে, তাকে ধরে আনবার জন্যে দৌড়ে যায়। ভাবে, যেহেতু শনি-মঙ্গলবারে মরেছে ভূত হবে নির্ঘাৎ। সংগী পাওয়া যাবে এত দিনে। কিন্তু যেই সামনে ছুটে যায়, দেখে, হয় লোকটা শেষ পর্যন্ত মরেনি, নয়তো বার গুনতে ভুল হয়েছে। ভূতের আর সংগী মেলে না।

আমারো হয়েছে সেই দশা। আমার কথা নেবে কে? আমি তাই সংগী খুঁজছি

—খুঁজছি আমার ভাবের লোক। খুব ভক্ত দেখলে মনে হয় এই বুঝি আমার ভাব নিতে পারবে। কিন্তু না, কত দিন হতেই সে আরেক রকম হয়ে যায়। তরোয়াল দিয়ে সে দাঁড় চাঁছে।

'মনের কথা কইব কি সই, কইতে মানা। দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।'

কথায় কেমন যেন একটা করুণ বেদনা। মথুরবাবু বললেন, 'তারা আসুক আর না আসুক, আমি আছি। আমি একাই একশো ভক্তের সমান। তাই মা হয়তো আমাকে দেখিয়েই তোমাকে বলেছিলেন অনেক ভক্ত আসবে—'

'কে জানে বাপু, মা-ই জানেন।'

কিন্তু রামকৃষ্ণ বুঝতে পারল মা-ই এবার নিজে এসেছেন মথুরকে নিয়ে যেতে। যা, মা'র কাছেই যা। দেখ গে সেই দেবীলোক।

নিজে আর এল না রামকৃষ্ণ। খোঁজে নিতে রোজ পাঠায় হৃদয়কে। কাশীতে রামকৃষ্ণের অনুরোধে মথুরবাবু কল্পতরু সেজেছিলেন। যে যা চাইল তাই দান করলেন অকাতরে!

রামকৃষ্ণকে বললেন, 'তুমি কিছু চাও।'

চন্দ্রমণি এক আনার দোক্তা চেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ বললে, 'আমাকে একটি কমণ্ডলু দাও।'

সেই কমণ্ডলু করে আমাকে একটু এখন গঙ্গাজল দেবে না? কৃপণ মথুরকে মুক্তহস্ত করে দিয়ে, হে কৃপানিধি, তুমি আজ নিজে কৃপণ হয়ে গেলে?

কোনো দরকার নেই। স্বয়ং গঙ্গা আসছেন তোকে নিয়ে যেতে। আসছেন সেই বেদময়ী শব্দময়ী গঙ্গা। তৃপ্তিকর্ত্রী ভবতারিণী। তাঁর এগিয়ে আসার শব্দ শুনতে পাচ্ছিস না?

পয়লা শ্রাবণ, আজ মথুরবাবুর শেষ দিন। আজো রামকৃষ্ণ গেল না জানবাজারে। তোর ভক্তিব্রত উদ্‌যাপন হয়েছে, মা তোকে কোলে তুলে নিতে নিজে এসেছেন।

কালীঘাটে নিয়ে গেল মথুরবাবুকে। ঘনিয়ে এসেছে জীবনের অন্তিমা।

রামকৃষ্ণ তখন দক্ষিণেশ্বরে সমাধিস্থ। তার সূক্ষ্ম দেহ জ্যোতির পথ ধরে চলে এল মথুরের শয্যাপার্শ্বে। চোখের পাতা শেষ বারের মত বোজবার আগে মথুর-বাবু দেখলেন রামকৃষ্ণকে।

বিকেল পাঁচটার সময় ধ্যান ভাঙল। হৃদয়কে ডেকে বললে, 'ওরে, মথুর রথে উঠল। খুব বেগে উড়ে গেল সেই রথ। চলে গেল দেবীলোকে।'

অনেক রাতে খবর এল দক্ষিণেশ্বরে, বিকেল পাঁচটার সময় মথুরবাবু লোকান্তরিত হয়েছেন।

'আমাকে দেখে সে কি বলত জানিস?' ঠাকুর এক দিন বললেন ভক্তদের, 'বলত, বাবা, তোমার ভেতরে আর কিছু নেই—শুধু সেই ঈশ্বর আছেন। দেহটা একটা খোল, বাইরে কুমড়োর আকার, কিন্তু ভেতরের শাঁস-বিচি কিছু নেই। তোমায় দেখলাম, যেন কেউ ঘোমটা দিয়ে চলে যাচ্ছে।'

তবু তুমি মনে করো না, সেজবাবু, তুমি একটা বড় মানুষ আমায় মানছ বলে

আমি কৃতার্থ হয়ে গেছি। মানুষ কি করবে! ঈশ্বরই তাকে মানাবেন। ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ খড়-কুটো।

কী জ্বলন্ত বিশ্বাসই ছিল! কী উর্জা ভক্তি! কর্ম করতে গেলে আগে একটি বিশ্বাস চাই। একটি আনন্দময় বিশ্বাস। মাটির নিচে মোহরের ঘড়া আছে এই আনন্দময় বিশ্বাস থাকলেই তো মাটি খুঁড়ব। খুঁড়তে-খুঁড়তে যদি ঠং করে একটা শব্দ হয়, বুকের ভিতরটাও আনন্দে টং করে ওঠে। তার পর যদি ঘড়ার কানা দেখা যায়, তা হলে তীব্রতর আনন্দ। খোঁড়ার বেগ তখন আরো বাড়ে। সাধু গাঁজা সাজছে, তার সাজতে-সাজতে আনন্দ। টানবার আগে থেকেই আনন্দ।

হনুমানের রাম নামে বিশ্বাস। বিশ্বাসের গুণে সে সাগর লঙ্ঘন করলে। আর স্বয়ং রামচন্দ্র, তাঁকে সাগর বাঁধতে হল!

'আচ্ছা, মশাই, মৃত্যুর পর মথুরের কী হল?' এক দিন কে এক জন জিগগেস করল ঠাকুরকে।

'তার নিশ্চয়ই আর জন্মাতে হবে না।'

'কে বললে? সে নিশ্চয়ই কোথাও একটা রাজাটাজা হয়ে জন্মেছে। তার মধ্যে যে ভোগবাসনা ছিল!'

যোগভ্রষ্ট হলে ভাগ্যবানের ঘরে জন্ম হয়—তার পরে আবার ঈশ্বরের জন্যে সাধনা করে। পূর্বজন্মে ঈশ্বর চিন্তা করতে-করতে হঠাৎ হয় তো ভোগ করবার লালসা হয়েছে। তাকেই বলে যোগভ্রষ্ট। কামনা থাকতে, লালসা থাকতে মুক্তি নেই।

'ওরে বাসনায় আগুন দে।' এই কথা শুনেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন লালাবাবু। সাত লাখ টাকার আয়ের সম্পত্তি ছেড়ে চলে গেলেন বৃন্দাবনে।

ধর্মের সূক্ষ্ম গতি। ছুঁচে সুতো পরাচ্ছ, সুতোর মধ্যে একটু আঁশ থাকলে ছুঁচের ভিতর আর ঢোকে না। কামনা থাকলে আর ভগবান নেই।

কী চাইবি ভগবানের কাছে? ভক্তি-মুক্তি, জ্ঞান-বৈরাগ্য—ও সব কিছু নয়। শ্রীমা বললেন, 'চাইবি শুধু নির্বাসনা।'

* ৪৩ *

'তোমরা সব কোথায় চলেছ?'

'কলকাতায় গঙ্গাস্নানে যাচ্ছি।'

'কলকাতায়?'

'হ্যাঁ, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় প্রকাণ্ড যোগ সেখানে। ঐ দিন জন্মেছেন গৌরাঙ্গদেব।'

'আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে?'

'ও মা, স্নানে যাবি তুই?' আত্মীয়া বয়স্কা মহিলারা কৌতূহলী হয়ে উঠল।

'না, একবারটি দক্ষিণেশ্বরে যাব। তাঁকে দেখতে বড় মন কেমন করছে।'

'তোর বাবাকে গিয়ে বল। তোর বাবা না বললে যাবি কি করে?'

লজ্জায় মরে গেল সারদা। একটু বা ভয়-ভয় করতে লাগল। যদি বাবার কানে ওঠে! ছি ছি, বাবার কানে গেলে তিনি কি ভাববেন। সেই কত দিন আগে দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। চার বছর আগে। গেল পৌষে সারদার আঠারো বছর পূর্ণ হয়েছে। ভরন্ত বয়সের চটুল চাপল্য নেই, স্বভাবটি প্রশান্ত গম্ভীর। হৃদয়ের মধ্যে সব সময়ে আনন্দের একটি পূর্ণঘট বসানো। উল্লাসটি উচ্ছলিত নয়, উল্লাসটি নিয়তনিশ্চল।

সত্যি-সত্যি বাবার কানে উঠল কথাটা। সারদা দক্ষিণেশ্বরে যেতে চায়। মিলতে চায় তার স্বামীর সঙ্গে। তার পুরুষের সঙ্গে। লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করল। মনে-মনে বললে, তোমার কাছে যেতে চাই, তুমিই আমাকে রক্ষা করো।

রামচন্দ্র ডেকে পাঠালেন সারদাকে। বললেন, 'বেশ তো। যাবে। আমিই তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। গোছগাছ করে নাও চট করে।'

হৃদয়স্থ আনন্দঘটের দিকে সারদা তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। কৃতজ্ঞকরুণ চোখে প্রতীক্ষার প্রশান্তি।

কোথায় জয়রামবাটি আর কোথায় কলকাতা! পায়ে হাঁটা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। সাত রাজ্যে ইঞ্জিনের বাঁশি শোনেনি কেউ। এদিকে বিষ্ণুপুর, ওদিকে তারকেশ্বর—সব ঝাঁঝাঁ করছে। ঘাটালের যে নদী সেখানেও ইস্টিমার আসেনি। সর্বদিকে একটা স্থান আর সময়ের বিস্তীর্ণ হাহাকার। কোথা দিয়ে কোথায় যাব, কত দিনে কোন দিকে গিয়ে পৌঁছুব—সমস্ত একটা ধূসর অস্পষ্টতা। কিছুই ধরা-ছোঁয়ার নেই, সব যেন ঐ দিগন্তের কাছাকাছি।

তবু চলো। চলা ছাড়া অনুপায়ের আর উপায় কি! শুধু এগিয়ে চলো। যেমন পদে-পদে বিপদ, তেমনি পায়ে-পায়ে উপায়। সারদা শুধু স্বামীদর্শনে যাচ্ছে না, সে যাচ্ছে তীর্থদর্শনে। হিমালয় ডিঙিয়ে মানস সরোবরে। কোনো দিন পথে বেরোয়নি সারদা। হাঁটেনি কোনোদিন দূরের পাড়িতে। তবু ভয় পাবে না সে। থাকবে না পেছিয়ে পড়ে। যিনি তীর্থপতি তিনিই তীর্থ-পথিককে টেনে নেবেন।

কোথাও-কোথাও রাস্তার খেই হারিয়ে গেছে। ধান কাটা হয়ে গিয়েছে মাঠে, কোথাও বা সেই শুকনো মাঠ ভাঙো। ঢেলা মাড়িয়ে-মাড়িয়ে চলো। গাছের ছায়া পাও তো, জিরিয়ে নাও একটু। তালপুকুর মিলেছে কোথাও, জল খেয়ে নাও পেট ভরে। সূর্যদেব গো, তোমার রশ্মিজাল একটু স্তিমিত করো।

কমলকোমল পা ফেলে-ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে সারদা। মুখখানি রোদে আমলে গেছে, আর যেন পারছে না চলতে। পা ভেঙে পড়ছে পথশ্রমে। শরীর ঝিমিয়ে পড়ছে। 'চলতে কষ্ট হচ্ছে রে সারু?' জিগগেস করেন রামচন্দ্র।

'না, বাবা।' মুখে হাসি আনে সারদা, পা দুটোকে টানে জোর করে।

'তবে অমন পিছিয়ে পড়ছিস কেন?'

'এই একটু দেখতে দেখতে চলেছি সব—'

মেয়ের মুখের দিকে তাকান রামচন্দ্র। ঝামরে গেছে মুখ-চোখ। যেন টলে-টলে পড়ছে। দু-তিন দিনেই এই, এখনো আছে আরো কত দিনের দীর্ঘ শ্রম। উপায় কি, এমনি করেই চটি থেকে চটিতে বিশ্রাম নিতে-নিতে এগুতে হবে। বিশ্রামটা না-হয় আরো একটু বড় করা যায়, কিন্তু পথ তো আর ছোট করা যাবে না। হু-হু করে জ্বর এসে গেল সারদার। মেয়ে পথের মধ্যেই এলিয়ে পড়ল। চোখে আঁধার দেখলেন রামচন্দ্র। মেয়েকে নিয়ে এখন করি কি।

আর সব সহযাত্রীরা থামতে চাইল না। তোমার মেয়ের জন্যে আমাদের গঙ্গা-স্নান মারা যাক আর কি। আমরা চললুম এগিয়ে। তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে সামনের চটিতে গিয়ে ওঠো। তা ছাড়া আর পথ নেই। রুগী মেয়ে হাঁটবে কি করে? পালকি কই এ অঞ্চলে? অগত্যা রামচন্দ্র সারদাকে নিয়ে সামনের এক চটিতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

দুঃখের আর অবধি নেই সারদার। নিজে তো অসুখে পড়লুমই, বাবাকেও বিপদে ফেললুম। তোমাকে দেখবার দিনটিও পিছিয়ে গেল।

গ্রাম্য বধূ, লজ্জা-সরমের কত ছিরি-ছাঁদ। এখন জ্বরে বেহুঁস হয়ে বিদেশের চটিতে সব জলাঞ্জলি গিয়েছে। লজ্জানিবারণ হরি, তাঁর স্নেহদৃষ্টির ছায়ায়ই তার আচ্ছাদন। সারদা দেখল, কে একটি মেয়ে তার পাশে এসে বসল। গায়ের রংটি কালো, কিন্তু কালো অমন অপরূপ হয়, কালোর যে অমন আলো থাকে, স্বপ্নেও কোনো দিন দেখেনি সারদা। মেয়েটি পাশে বসে ঠাণ্ডা স্নেহে সারদার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। নরম হাতের ছোঁয়ায় মুছে দিতে লাগল তপ্ত গায়ের দাহ। দুটি টানা-টানা বিশাল চোখের মমতাটিও কত ঠাণ্ডা!

সারদা জিগ্গেস করলে, 'তুমি কোথা থেকে আসছ গা?'

'দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি।'

'বলো কি? দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমিও ভেবেছিলুম দক্ষিণেশ্বরে যাব। সেই আশা করেই বেরিয়েছিলুম বাড়ি থেকে। তায় রাস্তায় এই জ্বর। আচ্ছা, তুমি দক্ষিণেশ্বরে তাঁকে দেখেছ? ঠাকুরকে?'

'দেখেছি বই কি।'

'বড় সাধ ছিল, তাঁকে দেখব তাঁর সেবা করব। আমার ভাগ্যে সে আশা আর মিটল না। জ্বর এসে আমার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে দিলে।'

মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে বললে, 'না, না, তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বই কি। তুমি ভালো হবে, সেখানে গিয়ে দেখবে তাঁকে। তোমার জন্যেই তো তাঁকে আটকে রেখেছি সেখানে।'

'বটে? ভালো হয়ে সেখানে গিয়ে তাঁকে দেখব?' সারদা তাকাল একবার সেই মমতাময়ীর দিকে। 'তুমি আমাদের কে হও গা?'

'আমি তোমার বোন হই।'

'সত্যি? তাই বুঝি তুমি এসেছ আমার অসুখ শুনে? বাঃ, বেশ!' বলতে-বলতে ঘুমিয়ে পড়ল সারদা।

সকালে ঘুম ভেঙে দেখল বোন কোথায় চলে গেছে। বোনের সঙ্গে-সঙ্গে

জ্বরও অন্তর্হিত। আবার শুরু হল পথ হাঁটা। কত দূর এসে, কি আশ্চর্য, একটা পালকি মিলে গেল। বোনটিই হয়তো পাশের কোনো গাঁ থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে পালকি।

আবার জ্বর এল দুপুরের দিকে।

'কেমন আছিস রে সারু?'

'বেশ, ভালো আছি বাবা।' পালকি পেয়েছে, আবার রোগ-বালাই কী সারদার! চলেছি তো এখন সর্বরোগপাবনের কাছে।

পথের শেষ হল এক সময়। রাত নটার সময় দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে নৌকো লাগল। রামকৃষ্ণের কাছে খবর পৌঁছুল। রামকৃষ্ণ ডেকে পাঠাল হৃদয়কে। বললে, 'ও হৃদু, বারবেলা নেই তো? প্রথম বার আসছে।'

এ কথা হয়ে গেছে আগেই। সারদা গঙ্গার উপরেই নৌকোতে বারবেলা কাটিয়ে এসেছে। আর সকলে এদিক-ওদিক গেল—নহবতের ঘরে চন্দ্রমণি আছেন, সেখানে কেউ-কেউ। সারদা সটান চলে এল রামকৃষ্ণের ঘরে। মুখে সেই সলজ্জ ঘোমটা।

'তুমি এসেছ?' উৎফুল্ল হয়ে উঠল রামকৃষ্ণ। 'বেশ করেছ।' বলেই ব্যস্ত হয়ে উঠল: 'ওরে, ওকে একখানা মাদুর পেতে দে। কত দূর থেকে আসছে। তার পরে আবার অসুখ করে এসেছে!' বলেই নিজের মনে খেদ করতে লাগল: 'এখন কি আর আমার সেজবাবু আছে যে, তোমাকে যত্ন করবে? আমার ডান হাত ভেঙে গেছে। তোমাকে আমি এখন কোথায় রাখি? আমার সেজবাবু হলে তোমাকে অট্টালিকায় রাখতেন। এলে তো এত দেরি করে এলে। আমার সেজবাবুকে দেখতে পেলে না।'

মাদুর বিছিয়ে দিল হৃদয়। জড়সড় হয়ে বসল তাতে সারদা।

চোখ-কানের বিবাদ ভঞ্জন করল। কত কি শুনেছিল দেশে থাকতে। পাগল হয়ে গিয়েছেন, পরনে কাপড় নেই, মুখে শুধু অসম্বন্ধ প্রলাপ। তাঁর সম্বন্ধে এই বিবরণটাই তো পাগলের বিবরণ। একেবারে পরমানন্দ মহাপুরুষের মত বিরাজ করছেন। আশ্চর্য, সারদাকে তিনি ভোলেননি, ঠিক মনে করে রেখেছেন। শুধু মনে করে রাখেননি নয়, তার প্রতি করুণায় অজস্র হয়ে আছেন।

ঘর ছেড়ে উঠে যেতে ইচ্ছে করে না সারদার। তবু বললে, 'আমি মা'র কাছে নবতের ঘরেই যাই।'

'না, না, ওখানে ডাক্তার দেখাতে অসুবিধা হবে।' রামকৃষ্ণ ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'তুমি এ ঘরেই থাকো। আমি নইলে ওষুধ-পথ্য দেবে কে?'

চন্দ্রমণি আগে কুঠিঘরের একটি কোঠায় থাকতেন, অক্ষয়ও থাকত তাঁর সঙ্গে। সেই ঘরেই অক্ষয় মারা যায়। অক্ষয় মারা গেলে চন্দ্রমণি ছেড়ে দিলেন সেই কুঠিঘর। বললে, 'আর আমি ওখানে থাকব না। আমি নিচে এই নবতের ঘরেই থাকব। গঙ্গা পানে মুখ করে রইব। কুঠিতে আর আমার দরকার নেই।'

তখন রাতের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছে। দু-তিন ধামা মুড়ি নিয়ে এল হৃদয়। যেমন অসময়ে এসেছ তেমনি মুড়ি চিবোও বসে-বসে।

রাতে সেই ঘরেই শুলো সারদা। শুলো ভিন্ন শয্যায়, সঙ্গে আরেকটি মেয়ে নিয়ে। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে ভাবল সারদা, এ কি ঘুম, না, জাগরণ!

পর দিনেই ডাক্তার আনালো রামকৃষ্ণ। তিনচার দিন সারদাকে রাখল তার খবরদারিতে। নিজের হাতে খাওয়াতে লাগল পথ্য। ঘড়ি ধরে ওষুধ। নিজের সেবা-যত্নে ভালো করে তুলল। বললে, 'এবার তুমি যেতে পারো মা'র কাছে।'

নহবতে চলে এল সারদা। লাগল শাশুড়ির সেবায়। যতটুকু উনি নেন ততটুকু রামকৃষ্ণের সেবায়। সেবার মত আনন্দ আর কী আছে! সেবা ছাড়া আর কী আছে জীবনের কবিতা! রামচন্দ্র দেখে বড় শান্তি পেলেন। ফিরে গেলেন স্বস্থানে।

কিন্তু সারদাকে নহবতে পাঠিয়েই রামকৃষ্ণের মনে হল, কেন, কেন ওকে দূরে সরিয়ে রাখব। ওকে কি আমার ভয়, না, ঘৃণা? ও কি আমার তাচ্ছিল্যের, না, অনুকম্পার? প্রতিমায় ঈশ্বর পূজা হয় আর জীয়ন্ত মানুষে হবে না? আমি কি ফুটো কলসী যে জল রাখলে জল সব বেরিয়ে যাবে? আমি কি বালির বাঁধ যে আষাঢ়ের বন্যাকে রোধ করতে পারব না? মনে পড়ল তোতাপুরীর কথা। তোতাপুরী বলেছিল, 'তুমি যে কাম জয় করেছ তার প্রমাণ কি? স্ত্রীকে দেশের বাড়িতে রেখে এখানে বনবাসে থেকে কামজয়ের কথা বলা সোজা। স্ত্রীকে কাছে রেখে বলতে পারো তবে বুঝি।'

এবার তো সেই পরীক্ষার সুযোগ এসেছে। জোর করে নিজের বীরত্ব জাহির করবার জন্যে তো তিনি করছেন না, তাঁর কাছে সুযোগ এসেছে বলেই তিনি পরীক্ষা করছেন। সমস্তই মহামায়ার ইঙ্গিত।

রামকৃষ্ণ বলে পাঠালো, 'সারদা আমার ঘরে এসে শোবে।'

সারদার ভয় করতে লাগল। এ আবার কি হল রামকৃষ্ণের! কিন্তু 'না' বলবার উপায় নেই। শাশুড়ী বললেন, 'যাও যখন ও বলছে।'

ঘরের মধ্যে একান্তে ডেকে এনে রামকৃষ্ণ জিগগেস করলে সারদাকে, 'তুমি কি আমাকে সংসার পথে টেনে নিতে এসেছ?'

ঘোমটা-ঢাকা মুখে হেঁট হয়ে দাঁড়াল সারদা। বললে, 'না। তোমাকে সংসার পথে কেন টানতে যাব? তোমাকে ইষ্ট পথেই সাহায্য করতে এসেছি।'

তবে বোস পাশটিতে, শোনো।

খই ভাজবার সময় যে খৈটি খোলার উপর থেকে ঠিকরে বাইরে পড়ে তাতে কোনো দাগ লাগে না, কিন্তু গরম বালির খোলায় থাকলে কোনো না কোনো জায়গায় কালো দাগ লাগবেই। যা ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন বলে বোধ হবে তা মা-ই হোক আর স্ত্রী-ই হোক, তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে হবে। ঈশ্বরের মতন কিছু নেই।

রাবণ সীতার জন্যে মায়ার নানারূপ ধারণ করছে, তবু সীতা টলে না। এক জন বললে, 'একবার রামরূপ ধরে যাও না কেন?'

রাবণ বললে, 'রামরূপ একবার হৃদয়ে ধরলে ব্রহ্মপদই তুচ্ছ হয়, পরস্ত্রী তো কোন ছার! তা রামরূপ কি ধরবো!'

'কিন্তু আমি তোমার কে?' গভীর-সরল অন্তরে জিগগেস করলে সারদা।

'তুমি আমার বিদ্যা। তুমি সারদা, সরস্বতী। তুমি রূপ নিয়ে আসোনি, বিদ্যা

নিয়ে এসেছ। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয় তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছ। এসেছ বিদ্যার আলো জ্বালিয়ে। তুমি জ্ঞানদাত্রী।'

অত-শত কি বোঝে সারদা? বুঝে কাজ নেই কানাকড়ি। তার চেয়ে সেবা করি। জ্ঞান বুঝি না, বুঝি ভক্তি, বুঝি সেবা। রামকৃষ্ণের পা টিপতে বসল সারদা।

পা টেপবার পর সারদাকে রামকৃষ্ণ প্রণাম করল।

ও কি! ছি! সর্বাঙ্গে কুণ্ঠিত হল সারদা। বললে, 'আমি তোমার দাসী।'

'তুমি আমার আনন্দময়ী। যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন। তিনিই সম্প্রতি আছেন নবতে আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। তুমি কি শুধু এই ঘরের মধ্যে আছ? তুমি আছ আমার বিশ্বব্যাপিনী হয়ে।'

* ৪৪ *

'মন রে, চেয়ে দ্যাখ। দেখছিস?'

বড় তক্তপোশটিতে বসে আছে রামকৃষ্ণ! একসঙ্গে লাগানো ছোট খাটটিতে শুয়ে আছে সারদা। শুয়ে আছে লজ্জায় জড়সড় হয়ে। আগাগোড়া গা ঢেকে। শুধু পদতল দুটি অনাবৃত। পদ্মদলের মত পদতল। তাতে পদ্মরাগের আভা। ঘরে দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। দরজায় খিল দেওয়া। থমথম করছে নিশুতি মধ্যরাত। বসন্ত কাল না? "ঋতূণাং কুসুমাকরঃ"—সেই মধু-ঋতু না এখন? দক্ষিণেশ্বরের বাগানে গন্ধদ-গন্ধ ফুল ফুটেছে অনেক। গঙ্গার উপরে বাতাস মন্থর হয়ে এসেছে।

'দ্যাখ চোখ ভরে। দেখছিস?'

ঘরের কোণে প্রদীপ জ্বলছে না একটা? জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েনি? দেখতে পাচ্ছিস না তোর অনুভূতির অন্তর্গূঢ় অন্ধকারে!

'পাচ্ছি।'

'কী দেখছিস?'

'একটি অমল ও অনুপম সৌন্দর্য। একটি অনাঘ্রাত কুসুম। একটি সর্বতোমুখী শ্রী।'

'চোখে কাব্যের অঞ্জন লাগিয়ে দেখতে হবে না। চেয়ে দ্যাখ চর্মচক্ষে। কী দেখছিস?'

'একটি উদ্ভিন্নযৌবনা নারী। লাবণ্য-ঊর্মিলা স্রোতস্বতী।'

'শুধু তাই?'

'স্বাস্থ্য সারল্য আর পবিত্রতার সমাবেশ। অস্পৃষ্ট, অনুপভুক্ত। বিরজ-বিশুদ্ধ বিশদ-বিশোক।'

'কে হয় বল দেখি তোর?'

'স্ত্রী হয়। যার সম্বন্ধে কোনো নিষেধ নেই, নিবারণ নেই। বরং যার পক্ষে শাস্ত্র, যার পক্ষে সংসারসৃষ্টি।'

'সেই স্ত্রী আজ তোর নিভৃত শয্যায় এসে শুয়েছে। যে বেষ্টন করে দীপ্তি পায় সে-ই স্ত্রী। যাতে নতুন করে নিজেকে জন্মগ্রহণ করানো যায় সেই জায়া। চেয়ে দ্যাখ। সদ্য-প্রাণকরা স্ত্রী। এ সম্পূর্ণ তোর। তোর আয়ত্তের মধ্যে।'

'দেখছি। অনিন্দ্যকান্তি। অপরূপ-সুন্দর।'

'হ্যাঁ, একেই বলে স্ত্রী-শরীর।' রামকৃষ্ণ মনের কাছে আরো উন্মুক্ত হল। বললে, 'লোকে বলে এর চেয়ে ভোগ্য এর চেয়ে উপাদেয় কিছু আর নেই পৃথিবীতে। কি, গ্রহণ করবি?'

'কিন্তু—' উন্মনা মন বিমনা হয়ে রইল।

'হ্যাঁ, তবে ঐ দেহেই যদি আবদ্ধ হয়ে থাকিস তবে আর সচ্চিদানন্দঘন ঈশ্বরকে পাবি না। দ্যাখ বিবেচনা করে। নারী চাস না নারায়ণী চাস?'

মন খুঁতখুঁত করে। তৃষ্ণার কুয়াশা সঞ্চিত হতে-না-হতেই জেগে ওঠে বৈরাগ্যের ত্বিষাম্পতি। বললে, 'কিন্তু কাম ভোগ করে কি কামের নিবৃত্তি হবে?'

'তা হবে না। সেই জানিস না যযাতি কী বলেছিল? পুত্রের যৌবন চেয়ে নিয়েও তার কামের উপশম হল না। ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। যতই আহুতি ততই আকৃতি।'

'আর ঈশ্বরানন্দ?'

'ঈশ্বরানন্দ! এখানেও যত পান তত পিপাসা। তফাৎ এই, ওখানে ক্ষয়, গ্লানি, ক্লান্তি, খেদ, আর এখানে নিরংশ, নিরন্তর, নিরতিশয় আনন্দ। সেই যা বলেছিস বিরজ-বিশোক, বিশদ-বিশুদ্ধ—'

'আমি ঈশ্বরানন্দ চাই।' মন মুখ ফেরাল।

'দেখিস, ভাবের ঘরে চুরি করিস নে। পেটেমুখে এক হ। মুখে বাহাদুরি মারবি আর পেটে খিদে থাকবে তা হতে পারবে না। যদি চাস সোজাসুজি টেনে নে স্বচ্ছন্দে। তোর হাতের নাগালের মধ্যেই তো আছে। আছে তোর অধিকারের গণ্ডিতে। লুকোচুরির দরকার নেই।'

মন উসখুস করে উঠল। সারদার অংগ স্পর্শ করবার জন্যে হাত বাড়াল রামকৃষ্ণ। সেই উদ্যতিতেই মন বেঁকে বসল। ধীরে-ধীরে কোথায় ডুব দিল অতলে। লীন হয়ে গেল আত্মস্বরূপে। দেহমনোহীন অনাদ্যন্ত সচ্চিদানন্দে। যে হৃদয়োৎসবরূপা সমানমনোরমা, সে কি এতই অল্প, এতই লঘু, এতই সহজ-লভ্য? তাকে আমি কী মূল্য দিলাম, তার পরীক্ষা হবে কিসে? তাকে আমি কোথায় এনে প্রতিষ্ঠিত করলাম—তাতে। তার মূল্যেই আমি মূল্যবান। তার মহত্ত্বেই আমি মহনীয়।

ধড়মড় করে উঠে বসল সারদা। কে যেন তাকে তুলে দিলে জোর করে।

এ কি! তিনি এখনো শোননি? বিছানার উপরে ঠায় বসে আছেন? বসে আছেন নিশ্চল, নিঃসংজ্ঞ হয়ে। রাত এখন কটা হল না-জানি। কতক্ষণ এমনি বসে থাকবেন! ভোর হতে বাকি কত?

এমন ভাবারূঢ় কূটস্থ মূর্তি আর দেখেনি সারদা। তার ভয় করতে লাগল। জ্যোতিঃপুঞ্জময় দিব্যমূর্তি স্পর্শ করতে তার সাহস হয় না। কিন্তু কি করে এই ভাব ভাঙাবে রামকৃষ্ণের? কি করে নিয়ে আসবে তাকে তার স্বচ্ছ স্বাভাবিকতায়? এমনি বসে থেকে-থেকেই চলে যাবেন নাকি শেষকালে?

ব্যস্ত হয়ে ঘরের বার হল সারদা। ঝি কালীর মাকে কাছেই পাওয়া গেল। আকুল হয়ে বললে, 'শিগগির ভাগ্নেকে ডেকে আনো। উনি যেন কেমন হয়ে গিয়েছেন।' কালীর মা গিয়ে ডাকাডাকি করে তুললে হৃদয়কে।

কেমন আর হবেন! ভাবের ঘরে বাস করেন, ভাবের ঘোরে ভব হয়ে গিয়েছেন। নিজে ভবানী হয়ে এত ভাবিনী হবার কি দরকার!

হৃদয় গিয়ে রামকৃষ্ণকে নাম শোনাতে বসল।

যে নামে টান, সেই নামে জ্ঞান। আবার সেই নামেই পরিত্রাণ।

'আমার প্রাণ-পিঞ্জরের পাখি, গাও না রে,
ব্রহ্মকল্পতরুশাখে বসে রে পাখি, বিভুগুণগান গাও দেখি,
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সুপক্ব ফল খাও না রে॥'

কাশীপুরের মহিমাচরণ চক্রবর্তী ঠাকুরের ভক্ত। কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমানই সব পণ্ড করেছে। ভক্তির চেয়ে শাস্ত্রের প্রতি বেশি পক্ষপাত। খুব পড়াশোনা করেছে এমনি একটা ভাব দেখাতে সদা-ব্যস্ত। ইংরিজি আর সংস্কৃত বুকনি সর্বদা তার মুখে ফুটছে। শব্দাড়ম্বরের প্রতি তার মুগ্ধ দৃষ্টি। সে এক ইস্কুল করেছে, তার নাম প্রাচ্য-আর্য-শিক্ষা-কাণ্ড-পরিষৎ। তার ছেলের নাম রেখেছে মৃগাঙ্কমৌলি পতিতুণ্ড। হরিণের নাম রেখেছে কপিঞ্জল। আর তার গুরুর নাম আগমাচার্য ডমরুবল্লভ।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে আসতে ঠাকুর বলে উঠলেন: 'এ কি! এখানে জাহাজ এসে উপস্থিত! এখানে ছোটখাটো ডিঙি-টিঙি আসতে পারে। এ যে একেবারে জাহাজ!

এ শুধু তার পণ্ডিতম্মন্যতার প্রতি কটাক্ষ। সকলে হেসে উঠলেও মহিমাচরণ হয়তো খুশিই হল। সে নৌকো নয়, সে জাহাজ!

এ জাহাজকে সহজ করে দিতে চাইলেন ঠাকুর। বললেন, নাম করো। নাম করলে অহঙ্কার দূরে যাবে। পাণ্ডিত্যের বাইরে সুধাভাণ্ডটিকে দেখতে পাবে তখন।

গেরুয়া আর রুদ্রাক্ষ পরে একেক দিন চলে আসে মহিমাচরণ। বাঘের ছাল পেতে বসে পঞ্চবটীতে। রুদ্রাক্ষের মালা ফিরিয়ে জপ করে। কখনো একটা তানপুরা নিয়ে গান গায়। যেন কত বড় একজন তন্ময় সাধক!

বাড়ি যাবার আগে বাঘের ছালটি ঠাকুরের ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখে।

'এ কেন রাখে জানিস? দেখলেই লোকে জিগগেস করবে এ বাঘের ছাল আবার কার! তখন আমি বলব, মহিমাচরণের, আর তাতেই ওর মান বাড়বে!'

কেবল নিজের নাম, নিজের মান। ওরে, তাঁর নাম কর। তাঁর মান রাখ। তাঁর নামেই বন্ধনমোচন হবে। বটের বীজ দেখেছিস? লাল শাকের বীজের চেয়েও

ছোট। তা, ভগবানের নামের বীজ কতটুকু ? হয় একটি অক্ষর নয় দুটি অক্ষর। তা থেকেই কালে ভাব, ভক্তি, প্রেম—কত কি ! সেই নামের মন্ত্রই দিলেন মহিমাচরণকে। সহজ হবার সহজ নিয়ম। মুক্ত হবার সরল সূক্ত।

'শুধু এগিয়ে পড়ো। আরো এগোও। পাবে চন্দন কাঠ, কিন্তু ওখানে থামলে চলবে না, আরো এগোও। পাবে রুপোর খনি, থামলে চলবে না, আরো এগোও। তার পরে, সোনার খনি, পাবে হীরে-মানিকের খনি—তবু থামা নেই। এগিয়ে পড়ো। এহ বাহ্য, আগে কহ আর—'

মহিমাচরণ কাতর স্বরে বললে, 'আজ্ঞে, টেনে রাখে যে। এগুতে দেয় না।'

'কেন, লাগাম কাটো। ঘোড়া ছুটিয়ে দাও।'

'কি ভাবে কাটব ?'

'শুধু তাঁর নামের গুণে কাটো। কালীর নামে যে কালপাশ কাটে।'

আর কিছু নয়, শুধু তাঁর নাম করো। একটু স্থির হয়ে বসে তাঁকে স্মরণ করো, আহ্বান করো। যে নাম-দাতা সেই আবার নাম-শ্রোতা। হৃদয় নাম শোনাতে লাগল। ভাবভূমি থেকে সারা রাত আর নামল না রামকৃষ্ণ। নামধ্বনিতে সমাধি ভাঙল শেষকালে। প্রভাতের সীমানায় এসে।

সারদাকে কাছে ডেকে নিল রামকৃষ্ণ।

'একা-একা ঘরে আমাকে অমনি কাঠ হয়ে বসে থাকতে দেখে তোমার খুব ভয় করছিল, না ?'

তা আর বিচিত্র কি ! কোথায় শান্তিতে একটু ঘুমুবে, তা নয়, তোমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আসলে ভয় নয়, আসলে আনন্দ !

'শোনো, আরো অনেক রকম হয়তো ভাব হবে রাত্রে। ভয় পাবে না। কোন ভাবে কোন মন্ত্র শুনিয়ে আমার বাহ্যজ্ঞান আনতে হবে তোমাকে সব শিখিয়ে দিচ্ছি।'

সারদা যেন ভরসা পেল।

কিন্তু, জানো, ভাব ছাড়া লাভ নেই। 'সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে ? হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে।'

আমি লোহা, তিনি চুম্বক। তিনিই আমাকে ধরেছেন। মর্ত্যশয়ন থেকে নিয়ে যাচ্ছেন সেই অনন্তশয়নে। যেখানে অনন্তনাগের উপরে বিষ্ণু শয়ান।

* ৪৫ *

শুধু প্রথম রাত্রি নয়, প্রতি রাত্রি।

ঘোমটাতে মুখখানি ঢেকে সর্বাঙ্গে কুণ্ঠিত হয়ে নিঃশব্দে শুয়ে থাকে সারদা। শুয়ে থাকে তরলিত সরলতায়। সমর্পিত প্রশান্তিতে। স্পৃহা নেই প্রতিবাদ নেই, প্রতীক্ষা করে আছে ধৈর্যের মত, তিতিক্ষার মত। তপস্যার মত।

নিদ্রাহীন নিশীথ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। শোনা যাচ্ছে গঙ্গার কলস্বর। হাত বাড়িয়ে ধরলেই হয়। টেনে নিলেই হয় আলিঙ্গনে। বৃন্ত থেকে কুসুম-চয়নে এতটুকু কণ্টক নেই। স্নানাবতরণে নেই এতটুকু পদস্খলন। কিন্তু আমি তো জৈব প্রয়োজনে নয়, আমি দৈব প্রয়োজনে। আমি ষোলো আনা করলে মানুষে যদি এক পয়সা করে।

তাই বলে গোঁ ধরে কিছু করে না। করে না কোনো অন্ধ একরোকোমি। সদসৎ বিবেচনা ক'রে করে। সারাক্ষণ মনের সঙ্গে চলে কঠিন বোঝাপড়া। চলে জটিল বাদানুবাদ, সূক্ষ্ম বিচারমীমাংসা। মনকে সম্পূর্ণ ছুটি দেয়, নিষ্ঠুর হাতে তার টুঁটি টিপে ধরে না! বল না কি বলবি, যা না কোথায় যাবি, নে না যা তুই চাস। কিন্তু তার আগে আমার পাশে বোস একটু শান্ত হয়ে। আমার সঙ্গে দুটো কথা ক। গোঁয়ারের মতন অমন গোঁজ হয়ে থাকিস নে। স্ফূর্তি করে তর্ক কর আমার সঙ্গে। মামলায় যদি তুই জিতিস আমাকে তুই বেঁধে নিয়ে যাস জেলখানায়।

জানি, তুই কি বলবি। কিন্তু কত দিন ধরে করতে পারবি এই দেহস্তব, তাই শুধু আমাকে বল। লতাপাতাঘেরা শান্তশীতল মাটির কুটিরে যে যেতে চাস তার মাধুর্য কি আমি জানি না? কিন্তু তার চেয়ে—তাকিয়ে দ্যাখ দেখি এই রাত্রির আকাশের দিকে, এই অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারের দিকে,—এই মহামৌনের মধ্যে ঈশ্বরের মন্দিরটি কি বেশি রমণীয়, বেশি মোহনীয় নয়? আর কী তুই চাস এই শ্মশান-নাট্যের রঙ্গশালায়? যুবতীর চর্ম-মাংস-রক্ত-বাষ্প? যোগবাশিষ্ঠ পড়িসনি? রামচন্দ্র কী বলছেন? বলছেন, যুবতীর চর্ম-মাংস-রক্ত-বাষ্প যদি আলাদা-আলাদা করে রেখে সৌন্দর্য দেখতে পাও, তবে দেখ তাই একদৃষ্টে। নইলে মিছে আর কেন মুগ্ধ হওয়া? জোয়ারের জলের মতন এই যৌবন। অল্পোচ্ছ্বসিত, অচিরস্থায়ী। কিন্তু ভুবন-ব্যাপী এই ঈশ্বরসিন্ধু। এ চিরকাল সমানস্রোত, অচ্ছিন্নপ্রবাহ। বল, স্নানের জন্যে কোন ঘাটে তুই অবতরণ করবি? তোর উপরে আমি জোর খাটাতে চাই না। তুই জাগ্রত, বুদ্ধিমান, কুশাগ্রতীক্ষ্ম। তুই নিজেই হিসেব করে দ্যাখ। ক্ষয়দ্বারে যাবি, না, যাবি অক্ষয় মন্দিরে?

বুদ্ধদেবের সংসারত্যাগের আগে কতগুলি সুন্দরী যুবতী এসেছিল তাঁকে প্রলুব্ধ করতে, প্রতিনিবৃত্ত করতে। দীর্ঘ রাত প্রমোদোৎসবে মাতামাতি করে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে। তাদের দিকে তাকালেন বুদ্ধদেব। নিদ্রার বিকৃতিতে কী কুৎসিত দেখাচ্ছে মেয়েগুলোকে। বুদ্ধদেব দেখলেন এ তো শ্মশান, এখানে আবার প্রমোদলীলা কোথায়!

মন, তাই বলি, তুই কি এক বেলার কাঙালীভোজনে যাবি, না, যাবি চিরন্তন অমৃতের নিমন্ত্রণে?

ভিক্ষু মহাতিসস পর্বতচূড়ায় বসে তপস্যা করেন। পাহাড় থেকে নেমে সেদিন চলেছেন অনুরাধাপুর গ্রামের দিকে। সেই গ্রামের এক সুন্দরী যুবতী স্বামীত্যাগ করে সেদিন পথে বেরিয়েছে। সহসা দেখা হল সেই সৌম্যদর্শন ভিক্ষুর সঙ্গে। যুবতী বিলোল কটাক্ষ করে মদির অধরে হেসে উঠল। ভিক্ষু তাকালেন তার দিকে। দেখলেন বিকশিত মল্লিকার মত সুন্দর দন্তপঙ্‌ক্তি। কিন্তু মনে হল যেন কঙ্কালের হাসি! এক অস্থিসার কঙ্কাল তাঁর দিকে চেয়ে বিকটবদনে হাসছে।

কিছুক্ষণ পরে সেই যুবতীর স্বামীর সঙ্গে দেখা। স্বামী জিগগেস করলে, 'এই পথে কোনো নারীকে আপনি দেখেছেন ?'

'নারী ?' ভিক্ষু উদাসীনের মত বললেন, 'নারী না পুরুষ বলতে পারব না। দেখলাম একটা কঙ্কাল হেঁটে যাচ্ছে।'

মন, বল, নারীকে কঙ্কালে নিয়ে যাবি, না, তাকে মনোময়ী প্রতিমা করে বসাবি হৃদয়ের পদ্মাসনে ?

যুবতীর মাথার খুলিটি একবার কল্পনা কর। সেই তো তোর মহামোহের ফাঁদ। কিন্তু সেই যে মুখারবিন্দ সে এখন কোথায় ? কোথায় সেই অধরমধু ? কোথায় সেই আয়ত কুটিল কটাক্ষ ? কোথায় সেই দন্তরুচিকৌমুদী ? কোথায় বা সেই মঞ্জুগুঞ্জ আলাপন ? কোথায় বা সেই মদনধনুর মত ভঙ্গুর ভ্রূবিলাস ? এই করোটির বাটিতে তুই আর কী মদিরা পান করবি ?

মন, শোন. একটু অমৃত-মদ খাবি ? পাত্র খুঁজছিস ? খুরি-খুলি লাগবে না। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই সেই অমৃতের ভাণ্ড।

রামকৃষ্ণ আবার সমাধিতে বিলীন হল। নিস্তব্ধতারও বুঝি ডাক আছে। সেই মৌনের ডাকে জেগে উঠল সারদা। দেখল যেন কর্পূরগৌর মহাদেব বসে আছেন। পর্বতের মধ্যে মহামেরু, সরোবরের মধ্যে মহাসাগর।

তুমি সর্বধাত্রী ধরিত্রী। আমি ঋত, সত্য, ধৈর্য, শ্রেয়, শৌচ, সন্তোষ। তুমি দয়া ক্ষমা নীতি কান্তি লজ্জা সহিষ্ণুতা। আমি বিগত-বিষয়-রসরাগ। তুমি সর্বরাগস্বরূপিণী। তুমি দিব্যাম্বরা, আর আমি দিগম্বর।

ঠিক-ঠিক নামটি মনে আছে সারদার। এই ভাবে কোন মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাই সে নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে উচ্চারণ করতে লাগল। সেই উচ্চারণে মিশল এসে তার ধৈর্যের মাধুর্য, তার সম্মতির স্নিগ্ধতা।

তুমি স্মৃতি তুমি মেধা তুমি বাক্য।

আমি উপলব্ধি আর তুমি উচ্চারণ।

সমাধি ভাঙল রামকৃষ্ণের। ঘোমটা সরিয়ে পরিপূর্ণ চোখে দেখছিল বুঝি সারদা। রামকৃষ্ণের ধ্যান ভাঙতেই ত্রস্ত হাতে মুখের উপর আবার ঘোমটা টেনে দিলে।

রামকৃষ্ণ বললে, 'এবার তুমি একটু শোও। রাত পোহাতে এখনো খানিক দেরি আছে।'

কিন্তু এমনি করেই কি কাটবে রাতের পর রাত ?

কে একজন স্ত্রীলোক ধরে বসল সারদাকে। তুমি কি ন্যাকা না বোকা ?

'কেন, কী হয়েছে ?' সারদা অবাক হয়ে রইল।

'তুই কি ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানিস না ?' স্ত্রীলোকটি বিদ্রূপ করে উঠল : 'গাঁয়ের মেয়ে বলে কি তুই এমনি আহাম্মক হবি ? গাঁয়ের মেয়ে কি আর বিয়ে করে না ? স্বামী নিয়ে ঘরসংসার করে না ? তাদের ছেলেপুলে হয় না ?'

'তা, আমি কী করলাম !'

'তুমি হাঁদী, তুমি আবার কী করবে? বলি, তোর স্বামীকে কি তুই ভেসে যেতে দিবি? সংসারে তার মন নেই, সে মন তুই জাগিয়ে দিবি নে? ভোগের দিকে তাকে টেনে আনবি নে? তোর কপাল তুই চিবিয়ে খাবি? ধর্মপত্নী হয়ে এমন অধর্ম ঘটাবি তুই?'

বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল সারদা। অধর্ম! তার ঠাকুর তাকে দিয়ে অধর্মের অভিনয় করিয়ে নিচ্ছেন?

'তা ছাড়া আবার কি? তোকে বিয়ে করেছে অথচ তোকে তোর সংসারধর্ম করতে দিচ্ছে না, এ তো ঘোরতর অধর্ম! তুই স্ত্রী হয়েছিস, তুই এবার মা হবি নে? তুই তোর পাওনা-গণ্ডা ছাড়বি কেন? স্বামীর কাছ থেকে আদায় করে নিবি ষোলো আনা। বলবি গিয়ে সোজাসুজি—আমি সন্তান চাই। আমি মা হব।'

সরলতার প্রতিমূর্তি সারদা।

রামকৃষ্ণকে সেই রাত্রে বললে তাই সে স্পষ্ট করে। ঘোমটা-ঢাকা মুখের মধ্য থেকে কেমন অদ্ভুত শোনাল কথাগুলি।

'সবাই বলছে, আমার একটাও ছেলেপুলে হবে নি? বিয়ে হয়েছে আমার, তা নইলে সংসারধর্ম বজায় থাকবে কিসে?'

কথা শুনে চমকে উঠল রামকৃষ্ণ। সারদার মুখে এ কী কথা!

সারদা উপযাচিকা হয়ে পা টিপতে লাগল রামকৃষ্ণের। ছোট খাটটিতে তার শোবার কথা, বড় তক্তপোশটিতে এসে বসল।

মহামায়ার চাতুরী বুঝতে পেরেছে রামকৃষ্ণ। সে হাসল মনে-মনে। মন্দিরের ভবতারিণীকে উদ্দেশ করে বললে, 'তোর চালাকি ধরতে পেরেছি। তুই এত দিন নিজের মূর্তিতে এখানে ছিলি, আজ তোর কী খেয়াল হল, স্ত্রীর মূর্তি ধরে এলি আমার কাছে। তুই যদি তাই আসতে পারিস আয় আমার কাছে। তুই আসতে পারলে আমার ভয় কী!'

সারদা আড়ষ্ট হয়ে রইল। চকিতে কেমন যেন হয়ে গেল আরেক রকম।

রামকৃষ্ণ বললে, 'তুমি মা হতে চাও? তা মোটে একটি ছেলে খুঁজছ কি গো? দেশ-দেশান্তর থেকে তোমার কত ছেলে আসবে, সব মাতৃমন্ত্রে মাতোয়ারা। তুমি যে তখন মা-ডাকে তিষ্ঠোতে পারবে না।'

সারদার মুখে আর কথা নেই। দেহে আর দেহবোধ নেই।

ঠিকই হয়েছে। মহামায়া ঠিক ভাবটিই এনে দিয়েছেন তোমার মধ্যে। তুমি জীবের জননী হবে। যে বিশ্বজনের জননী হবে তার মধ্যে এই সন্তানকামনাটি না এলে চলবে কেন? তোমার তো এ শুধু দেহসুখের ছলনা নয়, তোমার এ শুধু মাতৃস্বভাতি। ঈশ্বরের এই সংসারে, এই পরমানন্দের মন্দিরে, তুমি লীলা-লাবণ্যকল্যাণী শ্রীমতী মাতা।

সারদা সরে গেল নিজের খাটে। আত্মানন্দে ঘুমিয়ে পড়ল।

রাতের পর রাত চলতে লাগল এই রতিহীন বিরতির পরীক্ষা। এই বিরতি দিয়ে ঈশ্বরের আরতি। একেই বলে সহজ-অটুট অবস্থা। সহজ, কেননা স্বস্থানে নিয়তস্থিত; আর অটুট, কেননা ব্রহ্মচর্য থেকে বিচ্যুতি নেই এক বিন্দু। এ হচ্ছে

সেই অবস্থা—'রমণীর সঙ্গে থাকে না করে রমণ।' ঈশ্বর দর্শন হলে রমণ-সুখের কোটি গুণ আনন্দ হয়। গৌরীচরণ বলত, মহাভাব হলে শরীরের রোমকূপ পর্যন্ত মহাযোনি হয়ে যায়। একেকটি রোমকূপে আত্মার সহিত মহারমণ হয়।

পতঞ্জলি বলেছে, ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠাতেই বীর্য লাভ। যার বীর্য আছে তারই ভক্তি আছে। যার বীর্য আছে তারই আছে বজ্রবন্ধন। তারই আছে অনন্যচিত্ততা।

রামকৃষ্ণ উত্তীর্ণ হল সেই বীর্যের পরীক্ষায়। সেই স্থৈর্যের পরীক্ষায়।

"রাঁধুনি হইবি ব্যঞ্জন রাঁধিবি হাঁড়ি না ছুঁইবি তায়,
সাপের মুখেতে ভেকের নাচাবি সাপ না গিলিবে তায়।
অমিয় সাগরে সিনান করিবি কেশ না ভিজিবে তায়॥"

উত্তীর্ণ হলেন সেই নির্বিকল্পের সাধনায়।

তুমি বীর্যবতী বিদ্যা। তুমি বলবতী মেধা। তুমি ধারণাবতী স্মৃতি।

সারদাকে ডেকে তুলল রামকৃষ্ণ। বললে, 'তোমাকে আবার সেই কথা জিগগেস করছি, সারদা! তুমি কি আমাকে সংসারপথে টেনে নিতে চাও?'

'না।' সারদা বললে, 'তোমাকে তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে চাই।'

'বেশ।' তৃপ্তির প্রসাদে বুক ভরে গেল রামকৃষ্ণের। বললেন, 'এবার তবে ঘুমোও নিশ্চিন্ত হয়ে।'

কতক্ষণ পরে আবার ডেকে তুলল সারদাকে। বললে, 'সত্যি করে বলো তো, তোমার কী মনে হয়, আমি কি তোমাকে ত্যাগ করেছি?'

'না, তা কেন মনে হবে? আমাকে তুমি গ্রহণ করেছ।' শান্ত সমর্পণে ঘুমুল সারদা। এ অর্পণ কে বলে? এ অর্চনা।

রামকৃষ্ণ বললে, তুমি বাণী। তুমি করুণা। তুমি আমার নামস্বাদময়ী ভিক্ষা।

যোগেন-মা বড়লোকের ঘরের বউ, কিন্তু সংসারের জ্বালায় বড় জ্বলছে। তাপ-হরণের খবর পেয়ে সটান চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। রামকৃষ্ণ তাকে স্থান দিলে। বললে, সারদার কাছে যাও। শান্তির স্পর্শটি ওর কাছে।

দুদিনেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল যোগেন-মা। যেখানে একনিষ্ঠ সেখানেই ঘনিষ্ঠ!

তার কাছে সারদা আক্ষেপ করল, 'ওঁর কেমন ভাব হয় দেখলে!'

'দেখলুম।'

'আমার ইচ্ছে হয় আমারো এমনি ভাব হোক। তুমি ওঁকে গিয়ে একটু বলবে?'

'কি বলব?' যোগেন-মা তো অবাক।

'যাতে আমাকে একটু ভাব-টাব দেন। আমার নিজের বলতে বড় লজ্জা করে।'

একা তক্তপোশে বসে আছে রামকৃষ্ণ, যোগেন-মা প্রণাম করে দাঁড়াল এক পাশে। সারদা কি বলেছে বললে-সরলের মত।

রামকৃষ্ণ কথা বলল না। গম্ভীর হয়ে রইল।

নহবতে ফিরে এল যোগেন-মা। দেখল সারদা পুজায় বসেছে। সন্তর্পণে দরজাটা একটু ফাঁক করল। দেখল আপন মনে হাসছে সারদা। কতক্ষণ পরেই আবার দরবিগলিতধারে কান্না! কতক্ষণ পরে একেবারে সমাধিস্থা।

'তবে না তোমার নাকি ভাব হয় না?' সমাধিশেষে সানন্দ কণ্ঠে প্রশ্ন করল যোগেন-মা।

সলজ্জ মুখে হাসল একটু সারদা। বললে, 'কি জানি যোগেন, কেমনতর হয়ে গেল। একটা মহানন্দের মধ্যে গিয়ে পড়লুম। আর ভাবের ঢেউ এসে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তিনি আমার চর্মস্পর্শ করেননি বটে, কিন্তু তিনি যে আমার মর্মস্পর্শ করেছেন।'

তুমিই নিতে পারবে আমার ভাব। তুমিই ভবভয়শমনী সর্বসিদ্ধিপ্রদাত্রী।

* ৪৬ *

আর আমাকে ছলনা করিস নে মা। আমি তো কামজয় করেছি, কিন্তু ওর মধ্যে কামভাব আনিস নে। আকুল হয়ে প্রার্থনা করে রামকৃষ্ণ। ও যদি কামময়ী কামিনী হয়ে ওঠে, তা হলে, কে জানে আমার এই তেজ-বীর্য ধুয়ে যাবে কি না। কে জানে, সংযমের বাঁধ ভেঙে জাগবে কি না দেহবুদ্ধি। তাই মা, আমি তোর দুয়ার ধরে পড়ে আছি, আমাকে কৃপা কর। সারদাকে তুই সারভূতা করে দে। আমি যদি মা প্রেম, সারদা পবিত্রতা!

সংসাররঙ্গমঞ্চে এ কী অদ্ভুত প্রার্থনা। নবীনযৌবনা স্ত্রীকে সামনে রেখে এক জন সমর্থ-সুস্থ বীর্যবান যুবকের অসাধারণ আরাধনা! আমার স্ত্রীকে কামমোহিনী করিস নে, কালমোহিনী করে দে।

আমি আর কিছু চিনি না। আমি শুধু তোকে চিনি। 'আমার মা আছেন আর আমি আছি।' আমাকে কে টলাবে? 'ঝড়ে গাছ নড়ে যত, তরু, বদ্ধমূল তত।'

মা কৃপা করলেন। ধরা দিলেন সেই ঘরে এসে। ধরা দিলেন সারদার মধ্যে।

লবকুশ হনুমানকে খুব কষে বাঁধলে দড়ি দিয়ে। ছোট্টটি হয়ে হনুমান বাঁধন নিলে সর্বাঙ্গে। দেখে লবকুশের মহাখুশি। মহাবীর ধরা পড়েছে।

তখন হনুমান বললে:

'ওরে কুশীলব করিস কি গৌরব
ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে?'

কৃপা করে মা-ই ধরা দিয়েছেন। করালেনও তিনি, পাওয়ালেনও তিনি। তিনিই সারদার মধ্যে দেখালেন জগদীশ্বরীকে।

আট মাস এক শয্যায় রাত কাটাল দুজনে। সে এক বিচিত্র সাধনা। শবসাধনার চেয়ে ভীষণতরো কঠিনতরো সাধনা—এই সজীব সাধনা। আগুন যত জ্বলে ঘি তত জমাট হয়। সূর্য যত জ্বলে তত সংহত হয় তুষার। চন্দ্র যত পূর্ণ হয় তত শান্ত হয় সমুদ্র। এ এক অভিনব সাধনা। শবসাধনা নয়, নব সাধনা।

'আমার অন্তরে আনন্দময়ী সদা করিতেছেন কেলি,
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি নামটি কভু নাহি ভুলি।
আবার দু আঁখি মুদিলে দেখি অন্তরেতে মুণ্ডমালী ॥'

সাধন শেষে রামকৃষ্ণ ঠিক করল সমারোহে একবার কালীপুজো করব। জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা—১২৮০ সাল—ফলহারিণী কালীপুজোর দিন। সেই দিনটিই প্রশস্ত। কিন্তু কালীপুজো মন্দিরে হবে না! কালীর যে 'গুপ্ত ভাবে আপ্তলীলা।' তাই তার পুজোও হবে গুপ্ত ভাবে। রামকৃষ্ণের নিজের ঘরে। পুজো হবে স্ত্রীর। ষোড়শীরূপিনী সারদার।

'মা বিরাজে ঘরে ঘরে
জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে।'

মন্দিরে জাঁকজমক করে মামুলি পুজো হচ্ছে। সে পুজোর পুজারি হৃদয়। তাই নিয়ে সে শশব্যস্ত। রামকৃষ্ণ বললে, 'এ দিকে একটু দৃষ্টি রাখিস।'

ঠিক আছে। সব যোগাড়যন্ত্র করে দিয়েছে হৃদয়। দীনু বলে একটি ছেলে, জ্ঞাতিসম্পর্কে ভাই-পো হয়, রাধাগোবিন্দের মন্দিরে পুজো করে, ফুল-বেলপাতা যোগাড় করে আনলে। জিগ্‌গেস করলে, এ কেমনতরো পুজা?

রামকৃষ্ণ বললে, 'এ রহস্যপুজা।'

রাত নটা কালীবাড়িতে নানা গান-বাজনা হচ্ছে, সর্বত্র হৈ-রৈ। রামকৃষ্ণের ঘর বন্ধ। রামকৃষ্ণ অনুপস্থিত। তার খোঁজ আর কে নেয়!

সারদাকে বলা ছিল আগের থেকে। যেমন-কে-তেমন সাধারণ বেশে মুখে ঘোমটা টেনে রাত নটার সময় ঠিক এসে ভেজানো দরজায় ঘা দিলে। রামকৃষ্ণ তাকে এনে বসাল পিঁড়ির উপর। পিঁড়ির উপরে আলপনা-আঁকা। সামনে-পাশে পুজার সমস্ত উপকরণ সাজানো।

রামকৃষ্ণ বললে, 'বোসো। পশ্চিমমুখো হয়ে বোসো।' বলতে-বলতেই বন্ধ করে দিলে দরজা।

রামকৃষ্ণের তক্তপোশের উত্তর পাশে গঙ্গাজলের যে জালা ছিল তার দিকে মুখ করে বসল সারদা। রামকৃষ্ণ বসল পুবমুখো হয়ে। যেখানে পশ্চিম দিকের দরজা তার কাছে।

প্রথমে সারদার পায়ে আলতা পরিয়ে দিল রামকৃষ্ণ। কপালে-মাথায় সিঁদুর মাখিয়ে দিল। স্পর্শেই সারদার অর্ধবাহ্যদশা হয়ে গেল।

তার পর পরনের শাড়ি ছাড়িয়ে নিয়ে পরিয়ে দিল নববস্ত্র। থালায় করে মিষ্টি দিল খেতে। বললে, খাও। খাবার পরে পান দিল মুখে।

ষোড়শোপচারে পুজা হচ্ছে 'ষোড়শীর'। পুজার উপকরণগুলি সংশোধিত হল। মন্ত্রপূত জল ছিল সামনের কলসে, যথাবিধানে অভিষিক্ত করল সারদাকে। ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ—প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল রামকৃষ্ণ:

'হে কালিকা, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী জননী, হে ত্রিপুরসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত করো। এর দেহমন পবিত্র করে এতে আবির্ভূত হও, এতে বিরাজিত থাকো। জগৎসংসারের সর্বকল্যাণকরণ সম্পূর্ণ করো।'

হে কপালিনী, আমাকে ভার্যা দাও মনোরমা। শুধু মনোরমা নয়, মনোবৃত্তি-অনুসারিণী। আমি যদি ভাবাতীত হই, ও-ও হোক তদ্‌ভাবভাবিত। আমাদের দৈহিক বিবাহ নয়, আত্মিক বিবাহ। আমাদের আত্মানন্দ।

পুজার চরম উপচার প্রণাম। জপ ধ্যান প্রার্থনা উপাসনা—সমস্ত কিছুই এই শেষ প্রণামটির জন্যে। এ প্রণিপাতটিই শেষ অর্ঘ্য। রামকৃষ্ণ বিল্বপত্রে নাম লিখল। আগে-আগে যত সাধন-ভজন করেছে তার সব বেশবাস তোলা ছিল সযত্নে—তাই নামিয়ে একসংগে করলে। রুদ্রাক্ষের মালা, কবচ, যা কিছু সাজ-সরঞ্জাম ছিল, তাও বাদ দিলে না। সকল আবরণ-আভরণ, সকল সাধনসিদ্ধির ধন একত্র করে সারদার পায়ে অঞ্জলি দিলে। বললে, 'যত জপ-তপ সাধন-ভজন যত আচার-বিচার, যত কর্মকাণ্ডের মালা—সব তোমার দুটি পায়ে অর্পণ করলাম। এ পুজাতেই আমার সমস্ত পুজার ইতি হল।'

বলে সারদাকে প্রণাম করল রামকৃষ্ণ।

সারদা দেখছে সব চোখ মেলে। কিন্তু সাড় নেই, মুখে কথা ফুটছে না। মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী করেছিল এক দিন। আজ আবার অপ্রমেয়াকে প্রতিমায় নিয়ে এল। সারদা শঙ্খকঙ্কণধারিণী লোকমাতা।

'হে সর্বমংগলস্বরূপা সবার্থসাধিকা, হে শরণদায়িনি ত্রিনয়নী, সনাতনী নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।'

আত্মনিবেদন করে রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়ে গেল।

রাত্রি প্রায় তিন প্রহর, ধ্যান ভাঙল রামকৃষ্ণের। সারদা তখনো নিশ্চল হয়ে বসে আছে পিঁড়িতে। তদগত তন্ময় হয়ে।

রামকৃষ্ণ বললে, 'পুজা শেষ হয়েছে। এবার যেতে পারো নবতে।'

সারদা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল পিঁড়ি ছেড়ে। উঠেই নহবতের দিকে ছুট দিলে। একটা প্রণাম করে আসা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারল না। ছি, ছি, নিশ্চয়ই ঠিক ছিল। মনে-মনে তাই এখন প্রণাম করলে রামকৃষ্ণকে। পুজ্য-পুজকে ভেদ নেই সেই ভাবাতীতের রাজ্যে।

লক্ষ্মী বললে, 'তোমার এত লজ্জা, তুমি কাপড় পরাতে দিলে কি গো!'

'কি জানি, আমি তখন যেন কি রকম হয়ে গিয়েছিলুম!'

'তার পর উনি তোমাকে মিষ্টি খাওয়ালেন, পায়ে ফুল দিলেন, হাত দিলেন, তুমি ঠায় বসে রইলে?'

'কি জানি বাপু, বসে রইলুম। সব দেখছি বটে, কিন্তু কথা বলতে পারছি না, নড়তে-চড়তে পারছি না।'

'আর কেউ টের পেল না?'

'কি করে পাবে! দরজা বন্ধ যে।'

'তুমি মহাশক্তি। মহাশক্তি না হলে এ পুজা গ্রহণ করে এমন শক্তি কার?'

সেই থেকেই ভাব হয় সারদার।

নহবতের ঘরটিতে শুয়ে আছে সারদা, তারই বিছানার এক পাশে যোগেন-মা ঘুমুচ্ছে। রাত্রে কোথাও হঠাৎ বাঁশি বেজে উঠল। বাঁশির স্বরে ভাব হল সারদার।

যেন সে বেণুবিনোদিনী রাধিকা হয়ে গেছে। থেকে-থেকে হাসতে লাগল আপন-মনে। দেখতে লাগল বুঝি বা সেই বংশী-বটবিহারীকে।

বিছানার এক কোণে তাড়াতাড়ি সরে বসল যোগেন-মা। বসেই রইল যতক্ষণ না ভাব ভাঙে। ভক্তিমতী হলে কি হয়, সংসারের মধ্যে তো আছে, যোগেন-মা ভাবল যদি তার ছোঁয়া লেগে সারদার ভাব কেটে যায়!

সেই ভাবের চরম হল নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে। ছাদে বসে ধ্যান করছিলেন শ্রীমা, পাশে গোলাপ-মা, যোগেন-মা বসে। ধ্যানের পর আর সমাধি ভাঙে না শ্রীমা'র। অনেক নাম শোনাবার পর হুঁস যদি বা হল, শ্রীমা উদ্‌ভ্রান্তের মত বলতে লাগলেন, 'ও যোগেন, আমার হাত কই, আমার পা কই? আমি কি করে ঢুকবো এই শরীরের মধ্যে?'

স্ত্রী-ভক্তেরা শ্রীমা'র হাত-পা টিপে দিতে লাগল—এই যে পা, এই যে হাত। তবু, দেহটা যে কোথায় পড়ে রয়েছে, চট করে খুঁজে পাচ্ছেন না।

সারদা চলে গেল নহবতে। রামকৃষ্ণ বললে, 'এবার শান্তিতে ঘুমোও গা মেলে। আমার কাছে থাকতে, আর সারা রাত বসে থাকতে জেগে, কখন কী ভাব হয় আমার আর কখন কী নাম-মন্ত্র বলে আমাকে সচেতন করো! এতে কী কারু স্বাস্থ্য থাকে না শরীর থাকে? তুমি মা'র কোলে নহবতে গিয়ে ঘুমোও।'

তাই যাব। তুমি যেমন নাচাও তেমনি নাচি। যাব বিরহের মন্দিরে, সেখানেই বিশ্বনাথের আরতি করব। আমার বসন নিয়েছ, তুমি নাও আমার সমস্ত বাসনা।

বিদুরের স্ত্রী স্নান করছে, ঘরের বাইরে কৃষ্ণের ডাক শোনা গেল: বিদুর! বিদুর! কৃষ্ণকণ্ঠের স্বর শুনে বিহ্বল-ব্যাকুল হয়ে বিদুর-পত্নী ছুটে এল গৃহদ্বারে। কিন্তু, কি লজ্জা, ব্যাকুলতায় বসনখানিই ফেলে এসেছে ভুল করে। তখন আর পিছু সরবার পথ নেই, কৃষ্ণের কাছে সে সম্পূর্ণ উন্মোচিত। কৃষ্ণ তক্ষুনি তার নিজের উত্তরীয় বিদুর-পত্নীর গায়ে ছুঁড়ে দিল। ত্রস্ত হাতে তাই দিয়ে কোনো রকমে গা ঢাকবার চেষ্টা করলে, কিন্তু কৃষ্ণের চেয়ে লজ্জা তার বেশি নয়। কৃষ্ণকে ঘরে নিয়ে এল। কিন্তু কী যে খেতে দেবে ভেবে পেল না। দেখল বাড়িতে শুধু পাকা কলা ছাড়া কিছু নেই। তাই একটা ছিঁড়ে খেতে দিল কৃষ্ণকে। কিন্তু ভাবে-ভক্তিতে এমনি বিবশ হয়ে গিয়েছে যে, কলা না দিয়ে খোসা দিয়ে ফেলেছে। আর তাই কৃষ্ণ খাচ্ছে তৃপ্তি করে। ভক্তের কলা আর খোসা দুই-ই সমান ভগবানের কাছে।

আমারও তেমনি ভক্তি, তেমনি প্রীতি, তেমনি ব্যাকুলতা। হয়তো তোমাকে খোসা দিয়ে ফেলেছি, কিন্তু তুমি সর্বস্বাদগ্রাহী, তুমি দেখ তা ভাবের রসে স্বাদু কিনা। প্রভু, তুমি যদি নাও, তবেই আমি পূর্ণ হব। তুমি যদি খাও তবেই আমার খিদে মিটবে।

গোলাপ-মা'র ভালো নাম অন্নপূর্ণা। মাঝবয়সী বিধবা। একটি মাত্র মেয়ে মারা যাবার পর দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরের পায়ের কাছে কেঁদে পড়ল।

ঠাকুরের ভাব হল। বললেন, 'তুমি তো মহা ভাগ্যবতী।' গোলাপ-মা থমকে রইল। 'সংসারে যাদের কেউ নেই কিছু নেই ঈশ্বর তো তাদেরই সহায়।'

অশরণের আশ্রয়স্থল তুমি। গোলাপ-মা বসে পড়ল পদচ্ছায়ে।

ঠাকুরের তখন অসুখ, গোলাপ-মা বললে, কলকাতায় তার এক জানাশোনা ডাক্তার আছে, সে নির্ঘাৎ সারিয়ে দিতে পারবে। ছোট ছেলের মত লাফিয়ে উঠলেন ঠাকুর, বললেন, কালই চলো। পর দিন ভোরেই রওনা হলেন নৌকো করে, সঙ্গে গোলাপ-মা, লাটু আর কালী। সারা দুপুর কেটে গেল এই ডাক্তারির ধান্দায়। ফেরবার পথে বেজায় খিদে পেল সবাইকার। সেই কোন সকালে বেরিয়েছে সকলে। এখন দুপুর প্রায় গড়িয়ে গেছে। ঠাকুর জিগ্গেস করলেন, কারু কাছে পয়সা আছে কি না। কেবল গোলাপ-মা'র কাছে আছে। তাও, চারটি মোটে পয়সা!

তাই সই। ঠাকুর কালীকে বললেন, বরানগরের বাজার থেকে মিষ্টি কিনে নিয়ে আয়।

ঠোঙায় করে তাই নিয়ে এল কালী। কিন্তু, কি আশ্চর্য, কাউকে কিছু না দিয়ে সমস্ত মিষ্টিটা ঠাকুর একাই খেয়ে ফেললেন। তার পরে গঙ্গার জল খেলেন অঞ্জলি ভরে। বললেন, 'আঃ, খিদে মিটল।'

অবাক কাণ্ড। আর তিন জনেরও খিদে মিটে গেল সেই সঙ্গে। কিছু নিল না, খেল না, অথচ কারু খিদে নেই এক ফোঁটা। সেই বন্য ক্ষুধা মুহূর্তে তৃপ্ত হল কি করে?

তুমি কি সেই মহাভারতের কৃষ্ণ? তুমি তৃষাহর। তুমি তৃপ্তিকর।

নবতের সরু বারান্দায় চিকের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে সারদা। অতৃপ্ত চোখে চেয়ে থাকে যদি কখনো কোনো ফাঁকে দেখা যায় সেই তৃপ্তিকরকে!

রামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি দেখে সারদাকে ঠাট্টা করে হৃদয়। বলে, 'সবাই তো মামাকে বাবা বলছে। তুমিও তবে বাবা বলে ডাকো না।'

এতটুকু রুষ্ট বা অপ্রতিভ হল না সারদা। নিবিড় ভক্তির সঙ্গে গভীর প্রীতি মিশিয়ে বললে, 'উনি বাবা কী বলছ! উনি বাবা-মা বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন, সমস্ত। যেখানে, যে সম্পর্কে যতটুকু আনন্দ আছে, সমস্তই উনি! উনি আনন্দময়।'

সেই গান্ধারীর কথা মনে করো:

> 'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
> ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
> ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
> ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব॥'

তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছ, কিন্তু জেনো, আমি তোমার দুয়ারেই পড়ে আছি।

পরমপুরুষ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

দ্বিতীয় খণ্ড

"তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরের প্রতি মন রেখেছ, এ কি কম কথা? যে সংসারত্যাগী সে তো ঈশ্বরকে ডাকবেই। তাতে আর বাহাদুরি কি! সংসারে থেকে যে ডাকে সেই ধন্য। সে বিশমণ পাথর সরিয়ে তবে দেখে।"—**শ্রীরামকৃষ্ণ**

"যস্য বীর্যেণ কৃতিনো বয়ং চ ভুবনানি চ।
রামকৃষ্ণং সদা বন্দে শর্ব্বং স্বতন্ত্রমীশ্বরম্॥
যাঁর শক্তিতে আমরা ও সমুদয় জগৎ কৃতার্থ সেই শিবস্বরূপ স্বাধীন ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি সদা বন্দনা করি।"—**স্বামী বিবেকানন্দ**

"শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতবর্ষের সমগ্র অতীত ধর্ম-চিন্তার সাকার বিগ্রহস্বরূপ। যে তাঁকে নমস্কার করবে সে সেই মুহূর্তে সোনা হয়ে যাবে।"—**স্বামী বিবেকানন্দ**

।। ওঁ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ ।।

* ভূমিকা *

প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় যা লিখেছি দ্বিতীয় খণ্ডেরও সেই কথা। দিয়াশলাই জেবলে সূর্যকে দেখানো যায় না, কিন্তু গৃহকোণে পূজার প্রদীপটি হয়তো জবালানো যায়। আমার এ বই শুধু সেই দীপ-জবালানো পূজা, দীপ-জবালানো আরতি।

এ বইয়ের যত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে সবই কোনো না কোনো পূর্বলিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ থেকে আহৃত। কোনো তথ্যই আমার কপোলকল্পনা নয়।

বাক্য ঈশ্বরের বিভূতি, কিন্তু ঈশ্বর আবার সমস্ত বাক্যের অতীত। অথচ বচন ছাড়া সে অনির্বচনীয়ের আভাস আনি কি করে? শব্দ ছাড়া কি করে বোঝাই আমার কান্না? কিন্তু সব সময়ে ভয়, বাক্য বুঝি আভরণ না হয়ে আবর্জনা হয়ে উঠল! আর, আভরণ হলেই বা কি, আভরণ দিয়েই কি রূপ বোঝানো যায়? বর্ণ দিয়ে কি বোঝানো যায় অবর্ণনীয়কে? তবু ভয়, এই বুঝি মহিমান্বিতকে খর্ব করে ফেললাম!

কিন্তু ভগবানকে ছোট করি এমন আমাদের সাধ্য কি! তিনি নিজের থেকেই ছোট হয়েছেন ভক্তের জন্যে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন; ভক্তের কাছে ঈশ্বর ছোট হয়ে যান, যেমন ঠিক অরুণোদয়ের সূর্য। তিনি ছোট না হলে তাঁকে ধরি কি করে? মধ্যাহ্নের সূর্যের তেজে চোখ যে ঝলসে যাবে। ধরা দেবার জন্যে তিনি স্বেচ্ছায় ছোট হয়েছেন। সুলভ হয়েছেন আমরা দুর্বল বলে। সুকোমল হয়েছেন যেহেতু আমরা ভঙ্গুর। রিক্ত হয়েছেন যেহেতু আমরা নিঃসম্বল। বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'ভক্তের জন্যে ভগবানের নরম ভাব হয়ে যায়, তিনি ঐশ্বর্য ত্যাগ করে আসেন।'

তিনি তো খাজনা আদায় করতে আসেননি, তিনি প্রেম ভিক্ষা করতে এসেছেন। বালগোপাল হয়ে এসেছেন ননী ভিক্ষা করতে। তাই দুয়ারের বাইরে ফেলে এসেছেন তাঁর প্রতাপের রাজমুকুট, তাঁর ঐশ্বর্যের সাজসজ্জা। প্রবঞ্চিতের বন্ধু বলে নিষ্কিঞ্চন হয়ে এসেছেন। রাজ্যেশ্বর হয়ে ফিরছেন কাঙালের মত! 'ওরে, তারে কেউ চিনলি না রে,' বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ: 'সে পাগলের বেশে দীন হীন কাঙালের বেশে ফিরছে জীবের ঘরে-ঘরে।' যে কাঙাল তার কী আর আছে যে কেড়ে নেব?

'ভক্তি তাঁর কেমন প্রিয় ?' বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ : 'খোল দিয়ে জাব যেমন গরুর প্রিয়।' শুধু দেখতে হবে জাবে খোল মেশানো হল কিনা। বাক্যের মধ্যে আন্তরিকতা আছে কিনা, ডাকের মধ্যে আছে কিনা অন্তরঙ্গতার স্বর। নিমন্ত্রণের মধ্যে আছে কিনা আতিথেয়তার আস্বাদ।

কাঁদতে-কাঁদতে যেমন শোক হয়, তেমনি নাম করতে-করতে প্রেম জাগুক। পঙ্কশয্যা থেকে জাগুক এবার নিষ্কলঙ্ক শতদল। জীবনের নির্বাসনে আসুক এবার মুক্তির সুসংবাদ—নির্বাসনার স্বাক্ষরে। সমস্ত অন্ধকারে জ্বলুক এই প্রার্থনার দীপশিখা।

৬ই ফাল্গুন ১৩৫৯ অচিন্ত্যকুমার

সমস্ত সাধনার ইতি করে দিলে রামকৃষ্ণ।

আর পাখা চালিয়ে কী হবে? দক্ষিণ থেকে চলে এসেছে মলয় হাওয়া। আর কী হবে দাঁড় টেনে? ব্যাঁক কাটিয়ে অনুকূল বায়ুতে পাল তুলে দে নৌকোর। সাধনের প্রথম অবস্থাতেই খাটনি। তার পরে পেনসন। প্রথমে সিঁড়ি ভাঙা, পরে পাহাড়ের চূড়ায় পরেশনাথের মন্দির। সিদ্ধি-সিদ্ধি বললে কি হয়? সিদ্ধি গায়ে মাখলেও নেশা হয় না। খেতে হয় একটু। দুধে মাখন আছে বললেই কি মাখন হবে? দুধকে দই পেতে মন্থন করো নির্জনে।

'হরিসে লাগি রহ রে ভাই। তেরা বনত বনত বনি যাই।' হরিতে লেগে থাকো। লেগে থাকতে-থাকতেই হরি হয়ে যাবে। বলতে-বলতেই হরি ব'নে যাবে।

রামকৃষ্ণ হরি হয়ে গেছে। যে আছে সে-ই হয়েছে। এই হওয়া অর্থ থাকাটিকেই প্রকাশিত করা। এর পর আবার সাধন কি?

বাউল বৈষ্ণবরা বলে, সাঁই। 'সাঁইয়ের পর আর কিছু নাই।'

রামকৃষ্ণেরও আর কিছু নেই। রামকৃষ্ণের পরেও আর কিছু নেই।

বৈষ্ণব বাউলরা একেই বলে সহজ অবস্থা। সহজ অবস্থার দুটি লক্ষণ। প্রথম, কৃষ্ণগন্ধ গায়ে নেই। তার মানে ঈশ্বরের ভাব অন্তরে ওতপ্রোত, বাইরে কোনো চিহ্ন নেই, মুখে হরিনাম পর্যন্ত বলছে না। আর দ্বিতীয়, পদ্মের উপরে অলি বসবে অথচ মধু খাবে না। তার মানে, জিতেন্দ্রিয়, কাম-কাঞ্চনে স্পৃহা নেই। রামকৃষ্ণের এখন সেই সহজ অবস্থা।

অনেক পিত্ত জমলে ন্যাবা লাগে, তখন চার দিকে হলদে দেখায়। অনেক ভক্তি জমলে মধু লাগে, তখন চার দিক হরি দেখায়। শ্রীমতী যখন শ্যামকে ভাবলে, সমস্ত শ্যামময় দেখলে। আর নিজেকেও শ্যাম বোধ হল। রামকৃষ্ণ সমস্ত বিশ্ব ঈশ্বরময় দেখল, দেখল সেও ঈশ্বর। পারার হ্রদে শিশে অনেক দিন থাকলে শিশেও পারা হয়ে যায়। রামকৃষ্ণ ভগবানের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে থেকে ভগবান হয়ে গেল। কুমুরে পোকা ভাবতে-ভাবতে আরশুলা নিশ্চল হয়ে যায়, নড়ে না, শেষে তাকে আস্তে-আস্তে কুমুরে পোকাই হতে হয়। রামকৃষ্ণ ব্রহ্ম ভাবতে-ভাবতে ব্রহ্ম হয়ে গেল। যে নিরাকার ছিল সে হয়ে দাঁড়াল নরাকার। তার আবার সাধন ভজন কি! হরি আবার কবে হরিনাম করে! যার খোলা নেমেছে তার আবার জ্বাল কিসের?

কিন্তু খোলা নামবে কখন? এক জন বাউল এসেছে রামকৃষ্ণের কাছে। রামকৃষ্ণ তাকে শুধোল: 'তোমার খোলা নেমেছে?'

বাউল তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে।

'বলি রসের কাজ সব শেষ হয়ে গেছে? যত জ্বাল দেবে তত "রেফাইন" হবে রস। প্রথম আকের রস, পরে গুড়, পরে দোলো, পরে চিনি—তার পর মিছরি—কিন্তু জিগ্গেস করি, খোলা নামবে কখন? অর্থাৎ সাধন কবে শেষ হবে?'

বাউল শুনতে লাগল মন্ত্রমুগ্ধের মত।

'যখন ইন্দ্রিয় জয় হবে। তার আগে নয়। যেমন জোঁকের উপর চুন দিলে জোঁক আপনি খুলে পড়ে যায় তেমনি শিথিল হয়ে যাবে ইন্দ্রিয়। তার আগে নয়।'

জ্বাল নিভিয়ে খোলা নামিয়ে বসে আছে রামকৃষ্ণ। সে এখন আকাশের মৌন। সমুদ্রের শান্তি। ধরিত্রীর সমর্পণ।

ওঁকার ধনু, আত্মা শর আর ব্রহ্ম লক্ষ্য। নির্ভুল চোখে লক্ষ্য ভেদ করতে হবে, তার পর তীরের মুখে লক্ষ্যের সঙ্গে তন্ময় হতে হবে। ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।

'কিন্তু জানিস, তাঁকে যখন লাভ হয়, তখন আর ওঁ উচ্চারণ করবারও যো নেই। সমাধি থেকে অনেক নিচে নেমে না এলে ওঁ বলতে পারি না।'

শাস্ত্রে যেমন বলা আছে তেমনি দর্শন হয় রামকৃষ্ণের। কখনো দেখে জগৎময় আগুনের স্ফুলিঙ্গ। কখনো দেখে চার দিকে যেন পারার হ্রদ ঝকঝক করছে। কখনো বা গলিত রুপোর স্রোত। কখনো বা গ্রহতারায় রংমশালের ফুলঝুরি। নীলিমাভ্রমের উর্ধ্বে কখনো বা অন্তহীন অন্তরীক্ষের শুভ্রতা। রামকৃষ্ণ এখন একটি অখণ্ড প্রাপ্তি, একটি অখণ্ড প্রত্যুত্তর। একটি আকাশবিস্তীর্ণ প্রশান্ত স্তব্ধতা।

কিন্তু ব্রহ্ম নিয়ে আমি কতক্ষণ থাকব? ছাদে উঠে আবার সিঁড়িতে নামা। কখনো লীলায় কখনো নিত্যে—যেন ঢেঁকির পাটে ওঠা-নামা করছি। এক দিক নিচু হয় তো আরেক দিক লাফিয়ে ওঠে। যেদিকে তাকাই সেদিকে তিনি। অন্তর্মুখে সমাধিস্থ হয়ে আছি তখনো তিনি, বহির্মুখে জীবজগৎ নিয়ে আছি তখনো তিনি। যখন আরশির এ পিঠ দেখছি তখনো তিনি, আবার যখন উলটো পিঠ দেখছি তখনো তিনি। শিব হয়ে আছি, তিনি। জীব হয়ে আছি, তিনি।

তুষের দ্বারা আবৃত থাকলেই ধান্য, তুষ থেকে মুক্ত হলেই তণ্ডুল। জীবে-শিবে ভেদ নেই। ভেদ হচ্ছে ভ্রান্তির ফল। কোরকে যেমন পুষ্পভাব, প্রস্ফুটিত পুষ্পেও তেমনি কোরকত্ব। ঈশ্বরে যেমন জীবভাব, জীবে তেমনি ঈশ্বরভাব।

কিন্তু যাই বলো বাপু, নির্বিকল্প ব্রহ্ম হয়ে বসে থাকতে পারব না। বালকের মতন থেকেছি, থেকেছি উন্মাদের মত। কখনো জড় হয়েছি, কখনো পিশাচ। তারপর আবার নিত্য থেকে চলে এসেছি লীলায়। রামলালাকে কোলে নিয়ে বেড়িয়েছি, নাইয়েছি-খাইয়েছি। হনুমান সেজে গাছে উঠে বসেছি, আস্ত-আস্ত ফল খেয়েছি। তারপর শ্রীমতী হয়ে কৃষ্ণময় হয়ে গেলাম। আবার লীলা ছেড়ে নিত্যে মন উঠে গেল। ত্যাজ্য-গ্রাহ্য রইল না। সজনে তুলসী সব এক হয়ে গেল! যত ঈশ্বরীয় পট বা ছবি ছিল সব খুলে ফেললাম। হয়ে গেলাম সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ আদি পুরুষ। সেই আদি যার আর অন্ত নেই। সব রকম সাধনই করেছি। তামসিক, রাজসিক আর সাত্ত্বিক। জয় মা কালী, দেখা দিবিনে? দেখা যদি না দিবি তো গলায় ছুরি দেব। এই হল তামসিক সাধন। রাজসিক সাধনে নানারকম ক্রিয়াকলাপ, অনুষ্ঠানের সমারোহ। এত তীর্থ করতে হবে, এত পুরশ্চরণ, এত পঞ্চতপা! আর সাত্ত্বিক সাধনা শান্তশীলের সাধনা। ফলাকাঙ্ক্ষা নেই, শুধু নামটি নিয়ে নির্নিমেষ হয়ে পড়ে থাকো। নাম দিয়ে-দিয়ে কাম ধুয়ে ফেল। আর কাম ঘুচলেই মনস্কাম।

আমারই মতন রূপ কে একজন প্রবেশ করলে আমার মধ্যে। দেহের ঘটপদ্ম ফুটে উঠল তার আবির্ভাবে। নিম্নমুখ ছিল, উর্ধ্বমুখ হয়ে উঠল। আমি জীবের জন্যে এসেছি জীবের মধ্যেই থাকব। থাকব 'ডাইলিউট' হয়ে। আমার আপন জন কত আসবে আমার কাছে, কত আহ্লাদের দিন আছে, কত ভাবের আস্বাদের দিন। গাঁজাখোরকে দেখলে গাঁজাখোরই আহ্লাদ করে। গায়ে পড়ে কোলাকুলি করে। অন্য লোক দেখলে মুখ লুকোয়। গরু আপন জনকে দেখলে গা চাটে, অন্য লোক দেখলে ঢুঁ মারে। আমার আপন জন সব যখন আসবে তখন আমাকে আপন ভাষায় কথা বলতে হবে। ব্রহ্ম হয়ে বোবা হয়ে থাকলে আমার চলবে কেন? পাকা ঘির কোনো শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন আবার পাকা ঘিয়ে কাঁচা লুচি পড়ে, তখন একবার কলকল করে ওঠে। কাঁচা লুচিকে পাকা করে আবার সে চুপ হয়ে যায়। এই ঘিয়ে পড়বে অনেক কাঁচা লুচি। তাই একটু কলকল না করে উপায় নেই।

মৌমাছি যতক্ষণ ফুলে না বসে ভনভন করে। ফুলে বসে মধু খেতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধু খেয়ে যখন মাতাল হয় তখন আবার আনন্দে গুনগুন করে।

তাই আমাকে গুনগুন করতে দিস। গান গাইতে দিস প্রাণ ভরে।

'ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী
　　পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়?
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে
　　কভু সন্ধি নাহি পায়।'

পুকুরে কলসীতে জল ভরবার সময় একবার ভক-ভক করে। পূর্ণ হয়ে গেলে আর শব্দ হয় না। কিন্তু আরেক কলসীতে যদি ঢালাঢালি হয় তখন আবার শব্দ ওঠে।

স্তব্ধতায় ব্রহ্ম, আবার শব্দেও ব্রহ্ম। আমাকে এখন একটু শব্দ করতে দে। আমার আপন লোকেরা সব আসবে, তাদের সংগে আমি নৃত্য করব না?

আগেকার লোক বলত, কালাপানিতে জাহাজ গেলে ফেরে না। ওরে, ভয় নেই, আমার রিটার্ন টিকিট কাটা আছে। আমি বারে-বারে ফিরে-ফিরে আসি।

'হা'-র পর একবার ডুব দিয়ে ফের ফিরে আসি 'নি'-তে। জানিস না সেই কিত্তনের কাণ্ড? কিত্তনে প্রথমে গান ধরে 'নিতাই আমার মাতা হাতি! নিতাই আমার মাতা হাতি!' তারপর ভাব যখন জমে, তখন শুধু বলে, 'হাতি! হাতি!' তার পর কেবল 'হাতি!' শেষকালে 'হা'। বলতে-বলতে সমাধি, একদম চুপচাপ।

কিন্তু আমি 'হা'-র পর আবার 'নি'-তে ফিরে আসি। শোনবার জন্যে তোরা যে সব রয়েছিস উৎকর্ণ হয়ে। তোদের তৃষিত কর্ণে আমাকে যে নাম দিতে হবে। আমার কি ফাঁকি দিলে চলবে? শ্যামপুকুরে পেঁাছেছি বলে কি আমি তেলি-পাড়ার খবর রাখব না?

শোন, দুটি ভাব নিয়ে থাকবি। এক দাসভাব, আরেক সন্তানভাব। অহং তো

আর যায় না, হাজার বিচার করো, ঘুরে-ফিরে ফের এসে উঁকি মারে। আজ অশ্বত্থ গাছ কেটে দাও, কাল আবার ফেঁকড়ি বেরুবে। উপায় কি? উপায় হচ্ছে, আমি ভক্ত, আমি দাস, আমি বালক এই ভাবটি আরোপ করা। মিষ্টি খেলে অম্বল হয় কিন্তু মিছরির মিষ্টিতে হয় না। অকামো বিষ্ণুকামো বা। বিষ্ণুকামনা কামনা নয়। আর শেষ ভাব, মুখ্য ভাব—সন্তানভাব। পূজায় আদ্যাশক্তিকে প্রসন্ন করতে না পারলে কিছুই হবে না। সেই ব্রহ্মময়ীর প্রতিমাই তো স্ত্রীজাতি। মাতৃভাবই তাই শুদ্ধ ভাব। সে ভাবেই তাদের প্রাণময় অভিষেক। আর কোনো ভাবে নয়। আমি মাতৃভাবেই ষোড়শী পূজা করেছিলাম। দেখলাম স্তন মাতৃস্তন, যোনি মাতৃযোনি।

শ্রীমাকে জিগ্‌গেস করল এক জন ভক্ত: 'মা, আপনি ঠাকুরকে কি ভাবে দেখেন?'

শ্রীমা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকলেন। পরে গম্ভীর মুখে বললেন, 'সন্তানের মত দেখি।'

ওরে এইটিই মহাভাব।

সারাৎসার বস্তু হয়েও ঈশ্বর ভাবরূপ ধরে রয়েছেন। আমাকেও থাকতে দে ভাবমুখে।

'এবার ভালো ভাব পেয়েছি।
ভবের কাছে পেয়ে ভাব
ভবীকে ভালো ভুলায়েছি।'

* ৪৮ *

জ্যৈষ্ঠ মাসে ষোড়শী পূজা হল, আশ্বিন কি কার্তিকেই সারদা ফিরে গেল কামারপুকুর। শাশুড়ি বললেন ফিরে যেতে। ভাবের সংসার তো দেখলে এবার একটু অভাবের সংসারটা দেখে এস।

রামেশ্বর বুঝতে পারছে তার দিন আর বেশি নেই। বাড়ির সামনে একটা আমগাছ কাটছে, রামেশ্বর বললে, ভালোই হল আমার কাজে লাগবে। পাঁচ-সাত দিন পরে, অগ্রহায়ণ মাসে, চোখ বুজল রামেশ্বর।

গাঁয়ের গোপাল কাছাকাছিই থাকে। রাত্রে হঠাৎ তার বাড়ির দরজায় একটা শব্দ হল।

'কে?'

'আমি রামেশ্বর।'

'এত রাত্রে?'

'গঙ্গাস্নানে যাচ্ছি। বাড়িতে রঘুবীর রইল, তার সেবায় যাতে গোল না হয় দেখো।'

দরজা খুলতে এগিয়ে গেল গোপাল।

'দোর খুলে কী হবে ? আমার শরীব নেই, আমাকে দেখতে পাবে না।'

খবর এসে পেঁছিুল দক্ষিণেশ্বরে। রামকৃষ্ণের ভাবনা ধরল এ দুঃসংবাদ মাকে কি করে শোনাই ! এ শোক মা সামলাতে পারবেন না। সর্বপ্রথমে জগদম্বাকে শোনাই।

মন্দিরে গেল রামকৃষ্ণ। বললে, অবস্থা যা করেছিস এবার ব্যবস্থা করে দে। পুত্রশোক দিয়েছিস এবার সহ্য করবার মতো শক্তি দে, সান্ত্বনা দে। এক হাতে নিবি আরেক হাতে দিবি নে, তা হতে পারবে না।

নহবতে গিয়ে চন্দ্রমণিকে বললে রামকৃষ্ণ।

ভেবেছিল চন্দ্রমণি শোকে বিহ্বল হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়বে। কিন্তু চন্দ্রমণি বিশেষ বিচলিত হলেন না। চোখের কোণের জলটুকু মুছে নিয়ে বললেন, 'সংসার অনিত্য। মৃত্যু নিশ্চিত। তাই শোক করা অনর্থক।' রামকৃষ্ণের দিকে তাকালেন উৎসুক হয়ে। বললেন, 'সে কি, তুই কাঁদছিস কেন ? এত সব বুঝিয়ে নিজেই শেষে অবুঝ হোস ?'

না, কোথায় চোখের জল ? সর্বত্র আনন্দভাতি।

জগম্মাতাকে উদ্দেশ করে বারে-বারে প্রণাম করতে লাগল রামকৃষ্ণ। যেমন দহনে আছিস তেমনি আছিস সহনে। যেমন আছিস ভাবনে তেমনি আছিস পাবনে।

মথুরবাবু গেছেন, এসেছেন শম্ভু মল্লিক। সিঁদুরেপটির শম্ভু মল্লিক। সদাগরী আপিসে মুচ্ছুদ্দির কাজ করে, অঢেল পয়সা। গোড়ায়-গোড়ায় খুব রাজসিক ভাব, ইস্কুল করব, হাসপাতাল করব, রাস্তা-পুষ্করণী করব। শেষকালে বিগলিত সমর্পণ : 'আশীর্বাদ করো যাতে এই ঐশ্বর্য তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে মরতে পারি।'

দক্ষিণেশ্বরের কাছেই বাগানবাড়ি, কি ভাবে এক দিন এসে পড়ল পথ ভুলে। ব্রাহ্মধর্মে মতি, ভাবখানা আধা-সাহেবি, কিন্তু রামকৃষ্ণের কাছটিতে এসে আর যেতে চায় না। যে কালে হাসপাতালে এসে নাম লিখিয়েছ, রোগের যতক্ষণ কসুর থাকবে ছাড়বে না ডাক্তার সাহেব। আর ছাড়ান-ছোড়ান নেই। তুমি নাম লেখালে কেন ?

রামকৃষ্ণের দ্বিতীয় রসদদার। বলে, 'আর কিছু বুঝি না, তুমি আমার গুরু। আমার গুরুজী।'

'কে কার গুরু !' রামকৃষ্ণ হাসে। করজোড় করে বলে, 'তুমি আমার গুরু।'

শম্ভুর স্ত্রী আবার আরেক কাঠি উপরে। প্রতি মঙ্গলবার সারদাকে তার বাড়ি নিয়ে আসে। যোড়শোপচারে পুজা করে তার পা দুখানি। মঙ্গলাচরণে মঙ্গল চরণ। জ্বলন্ত বিশ্বাস। অন্ধকার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ চলে শম্ভু। বলে, তাঁর নাম করে বেরিয়েছি, আমার আবার বিপদ কিসের ! ক্রমে-ক্রমে পার্থিব বিষয়ে ঔদাসীন্য। রামকৃষ্ণকে বলে, তুমি ন্যাংটা, তোমারই অখন্ড আরাম। আমরা এ গ্রন্থি খুলি তো ও গ্রন্থিতে পাক দিই।

'তোমরা যে অনেক গ্রন্থ পড়েছ। গ্রন্থই তো গ্রন্থি। আমি গ্রন্থের গ-ও জানি না। আমি খাই-দাই আর বগল বাজাই। ন্যাংটার নেই বাটপাড়ে ভয়।'

তোমার মত সরলই যে হতে পারি না। সরল ভাবে ডাকলে কি তিনি না শুনে

পারেন ? শম্ভুর এখন সেই সরল অশ্রু। বলে, সরল হওয়ার সাধনই তো সব চেয়ে কঠিন সাধন। সামান্য গা খালি করতে পারি না তো মন খালি করব। জমিকে নিষ্কণ্টক করি কি করে ? জমি পাট করতে পারলেই তো বীজ পড়বে, আঁকুর বেরুবে। এ সব জমি যে কাঁকুরে জমি।

রামকৃষ্ণের মুখে শুধু একটি হাসির সারল্য।

তুমি আমার যেমন দেখতে সরল তেমনি তোমাকে বুঝতে সরল।

রামকৃষ্ণের তখন খুব পেটের অসুখ, শম্ভুবাবু পরামর্শ দিলেন, একটু আফিং খাও। রামকৃষ্ণ গিয়েছে তার বাগানবাড়িতে, বাগানবাড়ির সামনেই শম্ভুবাবুর ডিসপেনসারি। বললেন, রাসমণির বাগানে ফেরবার সময় আমার থেকে নিয়ে যেও আফিংটুকু। কথায়-কথায় ভুলে গিয়েছে আফিঙের কথা। পথে এসে রামকৃষ্ণের মনে পড়ল, ঐ যাঃ, আফিংটুকুই নিয়ে আসা হয়নি। অমনি ফিরে গেল শম্ভুর বাগান বাড়িতে। শম্ভু তখন অন্দরে চলে গিয়েছে, যাক, ডাকাডাকি করে আর কাজ নেই। ডিসপেনসারির কম্পাউণ্ডারের থেকে চেয়ে নিলেই হবে। কম্পাউণ্ডার তক্ষুনি কাগজে মুড়ে দিয়ে দিল এক দলা। ফেরবার পথে রামকৃষ্ণ দেখল তার আর পা চলছে না, কে যেন তার পা টেনে ধরে রয়েছে। রাস্তায় না উঠে পা এগিয়ে যাচ্ছে ড্রেনের দিকে। এ কি, এ কোন পথে চলেছি ? পথ কই গৃহে ফেরবার ? পথ সব মুছে গেল নাকি ? অথচ পিছন ফিরে শম্ভুবাবুর বাড়ির দিকে তাকিয়ে পথ তো দেখতে পারছি দিব্যি। তবে এ কী পথভ্রম !

রামকৃষ্ণ ফের শম্ভুবাবুর বাড়ির ফটকের কাছে ফিরে এল। এইবার ঠিক হদিস হবে পথের। সামনে গিয়ে ডাইনে। পথঘাট তো মুখস্থ। তবে কেন বেচালে পা পড়বে ? আফিঙের পুঁটলি ট্যাঁকে গুঁজে রামকৃষ্ণ আবার রওনা হল। আস্তে-আস্তে এক পা দু পা করে, মুখস্থের জের টেনে-টেনে। কিন্তু যথাপূর্বং তথাপরং। আরার দিকভ্রম আবার পথলুপ্তি। আবার কে পা ধরে টানতে লাগল পিছন দিকে। কি, কোথায় কী ভুল হল আমার। হঠাৎ মনে পড়ে গেল রামকৃষ্ণের। শম্ভু বলেছিল, আমার থেকে নিয়ে যেও, তাকে না বলে আমি তার কম্পাউণ্ডারের থেকে চেয়ে নিয়ে গেছি। তাই মা আমাকে যেতে দিচ্ছেন না ! ঘুরিয়ে মারছেন। আমার যে সত্যচ্যুতি হয়েছে। এ ভাবে নেওয়া তো চুরি করার সামিল।

অমনি ফিরে গেল রামকৃষ্ণ। ডিসপেনসারিতে গিয়ে দেখে সেই কম্পাউণ্ডারও নেই। দরজা বন্ধ নাকি ? কে জানে। জানলা একটা খোলা আছে। সেই জানলা দিয়ে আফিঙের পুঁটলিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ভিতরে। বললে, 'ওগো, এই তোমাদের আফিং রইল।'

বলে ফের মন্দিরের দিকে পা বাড়াল রামকৃষ্ণ। সমস্ত পথ এখন সড়গড়। আর কেউ টানছে না পা ধরে, ঠেলছে না এদিকে-ওদিকে। চোখের দৃষ্টি ফর্সা হয়ে গিয়েছে।

আমার মা আছে আর আমি আছি। আমি তো মা'র হাত ধরিনি, মা-ই আমার হাত ধরেছেন। নিজে না ধরে তাঁকে দিয়েই ধরিয়েছি আমাকে। তাই পা এতটুকু পড়তে দেন না বেচালে।

আমি তোমাকে ছেড়ে থাকি, কিন্তু মা, তুমি আমাকে ছেড়ে থেকো না। 'মুঝে তুম মৎ ছোড়ো।'

ওরে শোন, বাঁদরের বাচ্চা হবি না, বেড়ালের বাচ্চা হবি। বাঁদরের বাচ্চা তার মাকে ধরে, মা যখন এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফায়, কখনো ছিটকে পড়ে যায় বাচ্চা। আর বেড়ালের বাচ্চাকে তার মা ঘাড়ে কামড়ে ধরে, বেড়ালের বাচ্চার আর ভয় নেই। মা-ই তাকে আঁকড়ে ধরে নিয়ে যাবে যেখানে খুশি। কভু আখার ধারে, কভু বা ছাইয়ের গাদায়, কভু বা বাবুদের বিছানায়।

তুমি কোথায়, তোমাকে ধরতে পারছি না। এই হাত বাড়িয়ে দিলাম, তুমি আমাকে ধরো।

মাঠের মাঝে আলপথ, এক গাঁ থেকে আরেক গাঁ। বাপ তার দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে সেই আলপথ দিয়ে, গ্রামান্তরে। ছোট ছেলেটিকে বাপ কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে। বড়টি সেয়ানা, সে নিজেই বাপের হাত ধরে চলেছে। সরু পথ, পড়ে যাবার ভয়, তাই দু ছেলেই বাপের আশ্রয় নিয়েছে। যাচ্ছে-যাচ্ছে, হঠাৎ একটা শঙ্খচিল উড়ে যেতে দেখল, একেবারে ঠিক মাথার উপর দিয়ে। দেখেই দু ছেলের মহা আহ্লাদ। দুজনেই আপনা ভুলে হাততালি দিয়ে উঠল। ছোট ছেলেটা জানে, বাপ আমাকে ধরে আছে, আমার ভয় কি, আমি আনন্দে হাততালি দিই। কিন্তু বড় ছেলেটি যেই বাপের হাত ছেড়ে হাততালি দিতে গেল, অমনি পড়ে গেল নিচে, ঘা খেয়ে কেঁদে উঠল।

মাকে অমনি কোলে নিতে বল। মা'র কোলে বসে হাত ছেড়ে দে।

সারদার বাবা রামচন্দ্র রামনবমী তিথিতে মারা গেলেন। সারদার মন ভেঙে পড়ল। ভাবল আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাই। বৈশাখ মাস, ১২৮১ সাল, সারদা আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এল। কিন্তু থাকে কোথায়? আব কোথায়! সেই সংকীর্ণ নহবত ঘরে। চন্দ্রমণির সঙ্গে।

একরতি ঘর। একটুখানি দরজা। ঢুকতে-বেরুতে মাথা ঠুকে যায়। একজনে থাকবার মতও তাতে জায়গা হয় না—তা দুজনে, শাশুড়ি-বৌয়ে। এটুকু ঘরের মধ্যেই হাঁড়ি-কুঁড়ি, পোঁটলা-পুঁটলি। যত হাবজা-গোবজা। শিকেয় ঝুলছে যত কড়া-ডেকচি। রামকৃষ্ণের জন্যে জিয়ানো মাছ পর্যন্ত। এখানে থাকতে বউয়ের যে বেজায় কষ্ট হবে।

কথাটা শম্ভু মল্লিকের কানে উঠল। মথুর হলে হয়তো অট্টালিকায় রাখতেন, শম্ভু মল্লিক মন্দিরের কাছে সারদার জন্যে একখানা চালাঘর তুলে দিলেন। তার জন্যে জমি নিতে হল মৌরসী স্বত্বে। আড়াই শো টাকা সেলামী দিলেন শম্ভু। জমি তো হল কিন্তু কাঠ কই?

কাঠ যোগাল কাপ্তেন। বিশ্বনাথ উপাধ্যায়। বিশ্বনাথ নেপালরাজের কর্মচারী। কলকাতায় ও মফস্বলে নেপালের শাল কাঠের সে যোগানদার। বেলুড়ে তার কাঠের গদি। বললে, 'যত লাগে পাঠিয়ে দেব শালের চকোর।'

লড়াইয়ে বামুনের ঘরের ছেলে। বাপ ভারতীয় ফৌজের সুবাদার। এরা লড়াইও করে আবার পুজোও করে। যুদ্ধক্ষেত্রে শিব নিয়ে যায়। এক হাতে শিব

অন্য হাতে তরবার। বেদ-বেদান্ত গীতা-ভাগবত সব কণ্ঠস্থ। তারপর ভক্তি কত! যখন পুজো করে কর্পূরের আরতি করে। পুজো করতে-করতে স্তব করে আসনে বসে। সে আরেক মানুষ। পুজো করার সময় চোখের ভাব ঠিক যেন বোলতা কামড়েছে। কী ভক্তি! নিজের মা'র কাছে নিচে বসে। মা যে আসনে বসে তার চেয়ে নিচু আসন। কিংবা যে আসনে সে বসবে তার চেয়ে উঁচু আসনে মাকে বসাবে।

কী ভক্তি! রামকৃষ্ণ বরানগরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, ছুটে এসে মাথার উপরে ছাতা ধরে। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নানা তরকারি রেঁধে খাওয়ায়। যেখানে খাওয়ায় সেখানেই আঁচাবার ব্যবস্থা করে, উঠতে দেয় না। বাতাস করে, পা টিপে দেয়। ওদের বাড়িতে গিয়ে পাইখানায় বেহুঁশ হয়ে পড়েছে রামকৃষ্ণ—এত আচারী, তবু পাইখানায় গিয়ে ঠিকমত বসিয়ে দিয়ে এল। যদি কখনো সমাধি হয় রামকৃষ্ণের, কাপ্তেন মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। সে এককালে হঠযোগ করত। তাই গুণ আছে তার হাতে।

শালের চকোর পাঠিয়ে দিল বিশ্বনাথ। একখানা আবার গঙ্গার জোয়ারে ভেসে গেল একদিন। হৃদয় দুঃখ করে বললে সারদাকে, 'তোমার যেমন অদেষ্ট, একটা শালকাঠও ঠিকমত জোটে না।'

সারদা শুধু একটু হাসল উদাসীনের মত।

গেছে-গেছে ও শালকাঠ। বিশ্বনাথ আবার নতুন পাঠিয়ে দিলে। ঘর উঠল, সারদার চালাঘর। শালকাঠ নিয়ে বিশ্বনাথেরও বিপদ কম নয়। গঙ্গার জোয়ারে অনেকগুলি কাঠ তার ভেসে গেছে। রাজসরকারের দারুণ ক্ষতি। এখন কী কৈফিয়ৎ দেয়া যাবে এর জন্যে, কে বলবে? কাঠের হিসেব পাঠালে না এবার বিশ্বনাথ। ঠিক করলে পরের বছরের লাভে এ লোকসানের পূরণ করবে। কিন্তু হঠাৎ কাঠমুণ্ডু থেকে তার তলব এল। বিকৃত কি রিপোর্ট গেছে রাজধানীতে, বিশ্বনাথের চাকরি নিয়ে টানাটানি। সংসারী লোক, ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। নেপালে যাবার আগে এল সে দক্ষিণেশ্বরে। সেই সরল সত্যশরণের কাছে।

বললে, 'এখন উপায় বলুন।'

'উপায় খুব সোজা।' বললে রামকৃষ্ণ। 'এর চেয়ে সোজা আর হতে পারে না।'

'কি?'

'সত্য কথা বলবে। কাঠ তো আর তুমি নাওনি, গঙ্গায় নিয়েছে। তাই বলবে গিয়ে দরবারে। তোমার কিছু হবে না। মা তোমাকে, তোমার সত্যকে রক্ষা করবেন। সত্যের মত সহজ আর কিছু নেই।'

বুকের ভার নেমে গেল বিশ্বনাথের। সোজা সত্য কথা বলব এ সব চেয়ে বড় আশ্বাস। অতলস্পর্শ শান্তি। হলও তাই। সত্য কথা বলায় তার দোষক্ষালন তো হলই, তার প্রমোশন হল। কাপ্তেন ছিল, কর্ণেল হল। ফিরে এল কলকাতায় নেপালের রাষ্ট্রদূত হয়ে।

বাঙালীদের নিন্দা করে বিশ্বনাথ। নিন্দা করে ইংরিজি-পড়ুয়াদের। ঠাকুরের পায়ের কাছে বসে বলে, 'এমন মানিককে ওরা চিনল না।'

সংসারে থাকতে গেলে সত্য কথার খুব আঁট চাই। আর এই সত্যেই ভগবান। সত্য কথাই কলির তপস্যা। কায়মনোবাক্যে বারো বছর সত্য পালন করলে মানুষ সত্য-সঙ্কল্প হয়ে যায়।

'আমি মাকে সব দিয়েছিলুম। জ্ঞান-অজ্ঞান, অর্ধ-অধর্ম, পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ, শুচি-অশুচি, সব। কিন্তু সত্য মাকে দিতে পারলুম না। বলতে পারলুম না, এই নে তোর সত্য, এই নে তোর অসত্য। ঐ সত্য যদি ত্যাগ করি তবে মাকে যে সর্বস্ব অর্পণ করলুম সেই সত্য রাখি কিসে? সত্য ভগবানকেও দেয়া যায় না। সত্যই তো ভগবান। তা আবার দেব কাকে?'

সেই শালকাঠের ঘরে বাস করতে লাগল সারদা। একটি মেয়ে রইল তার তত্ত্ব করতে। সেই ঘরেই রাঁধে সারদা—রামকৃষ্ণের সেই ছিনাথ হাতুড়ে। থালা-বাটি সাজিয়ে নিয়ে যায় মন্দিরে। কাছে বসিয়ে রামকৃষ্ণকে খাইয়ে আসে। মাথা থেকে ঘোমটাটি সরে না হাওয়ায়।

দিনে-দুপুরে রামকৃষ্ণ মাঝে-মাঝে যায় সেই চালাঘরে। খোঁজ-খবর নিয়ে আসে। ঘোমটার ভিতর থেকে কথা কয় সারদা। একদিন হল কি, বিকেলের দিকে গিয়েছে রামকৃষ্ণ। আর যেমনি যাওয়া অমনি মুষলধারে বর্ষণ। সে বর্ষণ আর থামে না। মন্দিরে এখন ফিরে যাই কি করে?

না, যাব না মন্দিরে। তোমার চালাঘরটিতেই থাকব আজ। কি খাওয়াবে আজ বলো?

ঝোল-ভাত তোমার পথ্য, ঝোল-ভাতই খাবে। সারদা রেঁধে দিল ঝোল-ভাত। খেতে-খেতে রামকৃষ্ণ বললে, 'এ কেমনতরো হল? কালীঘরের বামুনরা যেমন রাত্রে বাড়ি আসে এ যেন আমি তেমনি এসেছি।'

চালাঘরেই রাত কাটাল রামকৃষ্ণ। চালাঘর নয়, কালীঘর।

* ৪৯ *

চালাঘরে থেকে সারদার কঠিন আমাশা হল।

শম্ভুবাবু প্রসাদ ডাক্তারকে নিয়ে এলেন। খাওয়ালেন অনেক ওষুধপত্র। কিন্তু রোগের কিছুতেই আরাম হয় না। সবাই বলে, দেশে ফিরে যাক। সেখানকার খোলা হাওয়া আর মিঠে জল ছাড়া সারবে না অসুখ।

জয়রামবাটিতে ফিরে গেল সারদা। আশ্বিন মাস, ১২৮২ সাল। শ্যামাসুন্দরী তাকে টেনে নিলেন বুকের মধ্যে।

অসুখ বেড়েই চলল। কোথায় মুক্ত হাওয়া, কোথায় মিষ্টি জল! সারদা মিশে গেল বিছানার সংগে। শ্যামাসুন্দরী চোখে আঁধার দেখলেন। দেশের হাতুড়ে-রোজাদের ডাকেন এমনও বুঝি তাঁর সংস্থান নেই। আছেন শুধু দয়াময়। সারদার দেহ বুঝি আর থাকে না। খবর পৌঁছুল রামকৃষ্ণের কাছে।

'তাই তো রে হৃদু, সারদা কেবল আসবে আর যাবে।' শান্ত স্বরে বললেন রামকৃষ্ণ, 'মনুষ্যজন্মের কিছুই তার করা হবে না।'

বিছানার থেকে আস্তে-আস্তে উঠে বসল সারদা। কাছেই গ্রামদেবী সিংহবাহিনীর মন্দির। ঠিক করল সিংহবাহিনীর মাড়ে গিয়ে হত্যা দেবে। হয় রোগ নাও, নয় আমাকে নাও। গ্রামদেবীর কোনো নাম-ডাক নেই। কিন্তু আমার ডাকেই তার নাম হবে। মা-ভাইয়েরা যেন জানতে না পারে। চুপি-চুপি যেতে হবে মন্দিরে। কিন্তু যেতে পারব তো একা-একা? নিজের পায়ে ভর করে? কে যেন তাকে হাত ধরে নিয়ে গেল ধীরে-ধীরে। মা-ভাইয়েরা জানতেও পেল না। সিংহবাহিনীর মাড়ে হত্যে দিয়ে পড়ল সারদা।

খানিকক্ষণ পড়ে থাকবার পরেই সিংহবাহিনী নেমে এল সিংহাসন থেকে। বললে, 'তুমি কেন পড়ে আছ গো?' বলে হাত ধরে তাকে তুলে দিল। 'ওলতলার মাটি একটু খাও গে, আধি-ব্যাধি সেরে যাবে।'

মাটি খেয়ে অসুখ সেরে গেল সারদার। জীর্ণ দেহ সবল হয়ে উঠল।

গ্রামে-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ল সিংহবাহিনীর মাহাত্ম্য। দূর-দূরান্তর থেকে আসতে লাগল আর্ত-আতুর। কেউ আমরা আগে জানিনি, আগে বুঝিনি, খোঁজ করিনি আমাদের গ্রামদেবীকে। সাপের বিষ পর্যন্ত নাশ হয় ঐ মাটির ছোঁয়ায়। চল-চল যাই সিংহবাহিনীর দুয়ারে।

লোকমাতা লোকের কল্যাণের জন্যে ঘুমন্ত দেবীকে জাগিয়ে দিলেন। যেমন জগতের প্রভু ভুবনের কল্যাণের জন্যে জাগিয়ে দিয়েছিলেন ভবতারিণীকে।

এ দিকে শম্ভু মল্লিকের অবস্থা সঙিন হয়ে উঠেছে। ঘোর বিকার। সর্বাধিকারী এসে দেখে বললে, 'ওষুধের গরম।'

দেখতে গেল রামকৃষ্ণ। শম্ভুর বিকারাচ্ছন্ন মুখে ভেসে উঠল তৃপ্তির প্রশান্তি। 'শম্ভুর প্রদীপে আর তেল নেই।'

অসুখের গোড়ার দিকে শম্ভু বলেছিল একদিন হৃদয়কে: 'হৃদু, পোঁটলা বেঁধে বসে আছি। কাণ্ডারী এলে তার হাতে তুলে দেব পোঁটলা। বলব ফেলে দাও ভবনদীতে। ভার হালকা করো।'

ঐশ্বর্য ছিল, আসক্তি ছিল না। সংসারে টাকার দরকার বটে, কিন্তু ওগুলোর জন্যে ভাববে কে বসে-বসে? যখন আসে আসবে যখন যাবার যাবে! যদৃচ্ছা লাভ। ঈশ্বরের যারা ভক্ত ঈশ্বরের যারা শরণাগত, তারা কিছু ভাবে না, তাদের যদৃচ্ছা লাভ। যত্র আয় তত্র ব্যয়। এক দিক থেকে আসে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। বৈরাগ্য মানে তো শুধু সংসারে বিরাগ নয়, বৈরাগ্য মানে ঈশ্বরে অনুরাগ। যার ঈশ্বরে অনুরাগ আছে তার অন্য অংগরাগে দরকার নেই।

জানিস যারা ভক্ত, তারা হচ্ছে ঈশ্বরের আত্মীয়, ঈশ্বরের সংগে তাদের রক্ত-মাংসের সম্বন্ধ। ঈশ্বরই তাদের টেনে নেন। দুর্যোধনেরা যখন গন্ধর্বের কাছে বন্দী হল যুধিষ্ঠিরই তাদের উদ্ধার করলেন। বললেন, আত্মীয়দের ঐ অবস্থা হলে আমাদেরই কলঙ্ক। ভক্তের আবার ভয় কি! অভাবের ভয়, না, আঘাতের ভয়? না, মরণের ভয়? ওরে ভক্তের নাশ নেই। 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'।

শম্ভু চলে গেল। এখন কে হবে রসদদার?

ঝি কালীর মা সেবা করে চন্দ্রমণিকে। নব্বুয়ের উপর বয়স হয়েছে চন্দ্রমণির। বুদ্ধির জড়তা এসে গিয়েছে। হৃদয়কে দেখতে পারেন না দু চক্ষে। কি করে তাঁর ধারণা হয়েছে অক্ষয়কে ওই মেরে ফেলেছে। এখন বলছেন, রামকৃষ্ণ আর সারদাকে সে মেরে ফেলবে। মাঝে-মাঝে রামকৃষ্ণকে বলেন গলা নামিয়ে, 'হৃদয়ের কথা কখখনো শুনবি না। ও শত্তুর।'

রাসমণির বাগানের কাছেই আলমবাজারের পাটের কল। দুপুরে কলে সিটি বাজে। সেই সিটিকে চন্দ্রমণি বৈকুণ্ঠের শঙ্খধ্বনি বলেন। ঐ সিটি না শোনা পর্যন্ত খেতে বসেন না। কেউ অনুরোধ করলে বলেন, 'এখন কী খাব গো? লক্ষ্মীনারায়ণের ভোগ হয়নি, বৈকুণ্ঠের শঙ্খ বাজেনি, এখন কি খাওয়া যায়?' যেদিন কলের ছুটি থাকে সেদিন আর বাঁশি বাজে না। সেদিন চন্দ্রমণিকে খাওয়ানো শক্ত হয়ে ওঠে। বৈকুণ্ঠের শঙ্খ নেই আমারও খাওয়া নেই। রামকৃষ্ণ তখন নানারকম কৌশল করে। ছোট মেয়েকে যেমন করে ভোলায় তেমনি করে পাশে বসিয়ে খাওয়ায় মাকে। রোজ ভোরে উঠে মাকে দর্শন করা চাই রামকৃষ্ণের। কিছুক্ষণের জন্যে তাঁর কাছে থেকে তাঁকে সেবা করা চাই স্বহস্তে। আর কত দিন মা'র পাদপদ্ম স্পর্শ করা যাবে মা-ই জানেন।

হৃদয় দেশে যাবার জন্যে তোড়জোড় করছে। বাঁধছে বোঁচকা- বুঁচকি। হাটের থেকে নানা দ্রব্য কিনে এনেছে। না গেলেই নয়। শুনতে পেয়েছে দেশে কি-এক বেধেছে মোকদ্দমা। রামকৃষ্ণের কাছে গেল অনুমতি চাইতে।

'মামা, যাব?'

'না।' রামকৃষ্ণ বারণ করল।

'কেন বারণ করছ?'

রামকৃষ্ণ কারণ বললে না। হৃদয় যত জেদ করে, রামকৃষ্ণ তত স্তব্ধ হয়।

শেষকালে হৃদয় গেল খাজাঞ্চির কাছে। মামা না বললে কি হয় খাজাঞ্চি যদি ছুটি দেয়, তবেই হল। খাজাঞ্চি ছুটি মঞ্জুর করল। আর হৃদয়কে পায় কে?

সন্ধের সময় রামকৃষ্ণ নহবতে এল। এল মা'র কাছটিতে। শুরু করল যত সব পুরোনো কথা, গাঁ-ঘরের কথা, পাড়া-পড়শীর কথা। পুরোনো কথার মত এমন আর কী ভালো লাগে মায়েদের। ছেলেদের ছেলেবেলার কথায় এলে মায়েদের আর থামায় কে! রাত বাড়ছে, তবু কথায় মত্ত মায়ে-পোয়ে।

মন্দির থেকে হৃদয় ডাকাডাকি শুরু করল। কি গো মামা, খাবে না? খেতে এস। মাকে ছেড়ে তবু উঠে যেতে মন ওঠে না রামকৃষ্ণের। মা'র কাছটিই যেন কাশীধাম। হৃদয়ের চীৎকার তীব্রতর হল।

'আমারটা রেখে তোরা দুজনে খা গে।' বললে রামকৃষ্ণ।

তোরা দুজনে মানে হৃদয় আর রামলাল। রামেশ্বরের মৃত্যুর পর রামলাল এসে পুজারী হয়েছে দক্ষিণেশ্বরে।

আমি আরো একটু বসি মা'র কোল ঘেঁষে। আরো একটু কথা শুনি। রাত

প্রায় দুপুরে, মাকে ঘুম পাড়িয়ে রামকৃষ্ণ ফিরে এল নিজের ঘরে। খেয়ে-দেয়ে শুলো নিজের বিছানায়।

কিন্তু হৃদয়ের চোখে ঘুম নেই। কেবল এ পাশ ও পাশ করছে। রাত যত বাড়ছে তত বাড়ছে হৃদয়ের ছটফটানি। কে যেন আষ্টেপৃষ্টে তাকে বেঁধে ধরেছে বিছানায়। ছাড়া পাবার জন্যে হাত-পা ছুঁড়ছে ক্ষণে-ক্ষণে। রামকৃষ্ণের পাশের বিছানা হৃদয়ের। রামকৃষ্ণ দেখেও দেখছে না। এক ঝটকায় উঠে পড়ল হৃদয়। ঘরের কোণে গাঁঠরি বাঁধা, কাল ভোরেই সে রওনা হবে ঠিকঠাক। সহসা সে ক্ষিপ্র হাতে গাঁঠরির বাঁধনগুলি খুলে ফেলতে লাগল। আর বাঁধনও কি একটা দুটো! যেমন যত রাজ্যের জিনিস পেয়েছে পুরেছে তেমনি এঁটেছে দড়িদড়ার ঘোরপ্যাঁচ। টেনে খিঁচে ছিঁড়ে খুলতে লাগল দড়ির জট।

রামকৃষ্ণ জিগ্যেস করল, 'কি হল?'

'কী হল! বিছানায় শুতে পাচ্ছি না। যতক্ষণ এ বাঁধনগুলো না যাচ্ছে ততক্ষণ আমার শান্তি নেই। গাঁঠরির মতই দড়ি দিয়ে কে আমাকে বেঁধেছে নাগপাশে—'

'বাড়ি যাবি না?'

'আর গেছি! মনে একটা ইচ্ছে হলেই যদি কেউ বাগড়া দেয়, তাহলে বাঁচি কি করে?' বন্ধনমুক্ত হয়ে হৃদয় ফের ফিরে এল বিছানায়। বললে, 'কিন্তু কেন যে বাড়ি যেতে দিলে না বুঝতে পারলুম না।'

'পারবি। ভোর হোক।'

নিজে আগে ভোরে উঠে কালীর মাকে জাগিয়ে দেন চন্দ্রমণি। সেদিন কালীর মা-ই আগে উঠল। বেলা এক-গা হতে চলল তবু চন্দ্রমণির সাড়া নেই। ডাকাডাকি করতে লাগল কালীর মা। তবু দরজা খোলেন না। দরজায় কান পেতে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল কালীর মা। শুনতে পেল গলার একটা ঘড়ঘড় শব্দ। ছুটে গেল হৃদয়কে খবর দিতে। বার থেকে কী কৌশলে হৃদয় খুলে ফেলল হুড়কো। দেখল চন্দ্রমণির শেষ অবস্থা। ওষুধ আর গঙ্গাজল দিতে লাগল ফোঁটা-ফোঁটা করে। তিন দিন কাটল এমনি অবস্থায়। হৃদয় অসুরের মত যুঝতে লাগল যমের সঙ্গে।

রামকৃষ্ণ বললে, এবার অন্তর্জলি করা হোক। চন্দ্রমণিকে নিয়ে চলল গঙ্গায়। যাবার আগে ফুল চন্দন আর তুলসী দিয়ে মা'র পায়ে অঞ্জলি দিলে রামকৃষ্ণ।

পুত্রকে শিয়রে রেখে মা চোখ বুজলেন।

রামলাল ফুল নিয়ে এল, হৃদয় নিয়ে এল শ্বেত চন্দন। মা'র পা দুখানি গঙ্গা-জলে ধুয়ে তাতে রামকৃষ্ণ ঘন করে চন্দন মাখিয়ে দিল। এ জল চোখের জল আর এ চন্দন ভক্তির চন্দন, ভালোবাসার চন্দন।

'যে দেহ থেকে আমার দেহের প্রকাশ সেই দেহ আজ মিশে গেল পঞ্চভূতে।'

এঁড়েদার শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল চন্দ্রমণিকে। রামলাল মুখাগ্নি করলে, সৎকার করলে। রামকৃষ্ণ যে সন্ন্যাসী। রামলালই শ্রাদ্ধ করল বৃষোৎসর্গ।

রামকৃষ্ণ অশৌচ পর্যন্ত পালন করেনি। প্রেতপিণ্ড দেওয়া তো দূরের কথা। পুত্রোচিত কোনো কার্যই করলাম না মা'র জন্যে। মনের ভিতরটা খচখচ করছে

রামকৃষ্ণের। অন্তত একটু তর্পণ করি মাকে। গঙ্গায় নামল রামকৃষ্ণ। পিছনে অগণন লোক। রামকৃষ্ণের মাতৃতর্পণ দেখবে।

জলের অঞ্জলি নেবার জন্যে গঙ্গায় হাত ডোবাল রামকৃষ্ণ। কিন্তু যেই অঞ্জলিবদ্ধ হাত উপরে তুললে অমনি হাতের আঙুলগুলি অসাড়, শিথিল হয়ে গেল। এঁকে বেঁকে ফাঁক হয়ে গেল। সব জল পড়ে গেল ফাঁক দিয়ে। যতক্ষণ জলের মধ্যে থাকে হাত ঠিক বদ্ধাঞ্জলি থাকে, যেই জল নিয়ে উপরে ওঠে আঙুলগুলি অমনি কাঠির মতন শক্ত হয়ে প্রসারিত হয়ে পড়ে। এক বিন্দু জল বন্দী হয় না। বারবার চেষ্টা করেও পারছে না কিছুতেই।

ডুকরে কেঁদে উঠল রামকৃষ্ণ। 'মা গো, তোমার জন্যে কি কিছুই করতে পারব না?' কোনো দোষ স্পর্শেনি তোমাকে। তুমি গলিত-হস্ত। বললে এসে পণ্ডিতেরা। তুমি অধ্যাত্মসাধনার চূড়ায় এসে উঠেছ। তুমিই 'শ্রদ্ধায়াগ্নি সমিধ্যতে।' তুমি 'শ্রদ্ধয়া হূয়তে হবিঃ।'

* ৫০ *

মথুরবাবু তখন বেঁচে, রামকৃষ্ণ তাঁকে এক দিন ধরে বসল : 'দেবেন ঠাকুরের বাড়ি যাব।'

মথুরবাবু অভিমানী লোক, আগু-পিছু করতে লাগলেন। আমরা কেন সেধে তার বাড়ি যাই? সে নিজে আসতে পারে না?

'ওগো দেবেন্দ্র যে ঈশ্বরের নাম করে।'

নাম তো তুমিও করো। সে আসতে পারে না তোমার এখানে?

আমি নাম করলে কি হয়, আমার নিজের কি কোনো নাম আছে? তাঁর নাম দিয়ে নিজের নামটাকে মুছে ফেলেছি। তাঁর নামেই নিজের নামের নাশ হয়েছে। দেবেন্দ্রের কত বিদ্যে, কত ঐশ্বর্য। সে তো কলির জনক। সে এ-দিক ও-দিক দু দিক রেখে দুধের বাটি খায়। সে ভোগেও আছে যোগেও আছে, রাজত্ব করছে দাসত্বও করছে। সে একটা মহাতীর্থ। তাকে এখানে আসতে না দিয়ে আমার ওখানে যাওয়াই তো আমার লাভ। আমি অমন একটা তীর্থ করব না? যেখানে ঈশ্বরের নাম সেখানেই আমি আছি। তাঁকে যে ডাকে সে যে আমাকেও ডাকে!

দেবেন্দ্র আর মথুর একসঙ্গে পড়তেন হিন্দু কলেজে। সেই সুবাদে যাওয়া সহজ হয়ে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেলেন রামকৃষ্ণকে। দেবেন্দ্রনাথের তখন দেশজোড়া নাম। খৃষ্টানি থেকে দেশকে উদ্ধার করার জন্যে তিনি ব্রাহ্মধর্ম আর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করলেন। রাজা রামমোহন এসে বোঝালেন বেদান্ত-প্রতিপাদিত ধর্মই সত্যধর্ম আর তাই প্রচার করবার জন্যে স্থাপন করলেন ব্রহ্মসভা। দেবেন্দ্রনাথের সাধনায় সেই ধর্মই হয়ে দাঁড়াল ব্রাহ্মধর্ম, আর সেই সভাই হয়ে দাঁড়াল ব্রাহ্মসমাজ।

বিদেশের গুরুর কাছে গোটা দেশ যখন ধর্মে দীক্ষা নিতে যাচ্ছিল তখন রাজা

রামমোহন দেখালেন তাকে তার আপন সত্যসম্পদ। সেই দেখানোর কাজে দেবেন্দ্রনাথ একটি দিব্য শিখা। ব্রহ্মকে তিনি শুধু অনুষ্ঠানে রাখেননি নিয়ে এসেছেন জীবনের অধিষ্ঠানে। তিনি প্রত্যাগাত্মা। তিনি ঈশ্বরদর্শী।

দিব্যি ভুঁড়ি হয়েছে মথুরবাবুর, তবু তাঁকে চিনতে পারলেন দেবেন্দ্রনাথ। বিনয় বচনে জিগগেস করলেন, 'সঙ্গে ইনি কে ?'

কথার সুরে একটি প্রসন্ন বিস্ময়। চোখের সম্মুখে হঠাৎ যেন দেখতে পেয়েছেন সুন্দরের মহামহিম প্রকাশ। একটি বিভান্বিত বিভূতি।

'এই এক জন আত্মভোলা মানুষ। ঈশ্বর-ঈশ্বর করে পাগল।' মথুরবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন।

যেন শুধু এইটুকুই পরিচয় নয়। পাগল নয়, পারঙ্গম ; অনন্তগুণগম্ভীর। মানুষ নয়, লীলামানুষবিগ্রহ। তাকিয়ে রইলেন দেবেন্দ্রনাথ।

'সংসারে থেকে তুমি ঈশ্বরে মন রেখেছ, তাই তোমাকে দেখতে এসেছি।' বললে রামকৃষ্ণ। 'তুমি জনক রাজার মত দুখানা তরোয়াল ঘোরাও, একখানা জ্ঞানের একখানা কর্মের। তুমি পাকা খেলোয়াড়।'

স্মিতশান্ত নেত্রে হাসলেন দেবেন্দ্রনাথ।

'কিন্তু এ দেখায় চলবে না। দেখি তোমার গা দেখি।'

সহজ-সুন্দর মানুষটি। এ অনুরোধ যেন গুহাহিত প্রত্যাগাত্মার আদেশ। এ আবরণমুক্ত হওয়া মানেই ভারমুক্ত হওয়া, মালিন্যমুক্ত হওয়া। আবরণ খুলে ফেলতে পারলেই রইল না আর অহঙ্কার, রইল না আর অসন্তোষ।

গায়ের জামা খুলে ফেললেন দেবেন্দ্রনাথ। রামকৃষ্ণ দেখল সেই 'প্রলম্ববাহুঃ পৃথুতুঙ্গবক্ষঃ'কে। দেখল তাঁর গৌরবর্ণের উপর কে সিঁদুর ছড়িয়ে দিয়েছে। বুঝল ঈশ্বর স্পর্শ করেছে দেবেন্দ্রনাথকে। তাঁর মর্ত তনু ভাগবতী তনু হয়ে উঠেছে। দেখে খুশি আর ধরে না রামকৃষ্ণের। তুমি তো তবে আমার দেশের লোক, আমার স্বজন-বান্ধব। রামকৃষ্ণ চেপে ধরল দেবেন্দ্রনাথকে। 'তবে আমাকে কিছু ঈশ্বরীয় কথা শোনাও।'

বেদ থেকে কিছু-কিছু শোনালেন দেবেন্দ্রনাথ। এই বিশ্বজগৎ প্রকাণ্ড একটা ঝাড়-লণ্ঠনের মতো। প্রত্যেকটি জীব ঝাড়-লণ্ঠনের বাতি এক-একটি। শুধু নিজেরা জ্বলছে না, সমস্ত কিছুকে উজ্জ্বল করে রেখেছে।

কী আশ্চর্য ! আমি যে অমনি দেখেছিলুম একদিন পঞ্চবটীতে। তোমার সঙ্গে আমার যে তা হলে মিল গো ! কিন্তু বিষয়টার ব্যাখ্যা কি ?

'ঝাড়-লণ্ঠন না হলে কে জানত কে দেখত এই জগৎসংসারকে ?' দেবেন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। 'ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন শুধু নিজেদের দেখাতে নয়, ঈশ্বরকে দেখাতে। শুধু নিজেদের গৌরব প্রচার করতে নয়, ঈশ্বরের গৌরবের প্রচার করতে। মানুষ ছাড়া ঈশ্বরকে বোঝেই বা কে, বোঝায়ই বা কাকে। ঝাড়ের আলো না থাকলে সব-কিছু অন্ধকার, স্বয়ং ঝাড় পর্যন্ত দেখা যায় না।'

বড় সুন্দর করে বললে তো। একই বহুধা হয়েছেন। গণনাহীন অনৈক্য দিয়ে দেখাচ্ছেন সেই এককে। সেই সমগ্রকে। সেই অখণ্ডকে। তিনি যে অখণ্ডৈকরস।

'আমি'-র মধ্যে কিছু নেই। আমার মধ্যেই সমস্ত রয়েছে।

আলাপ করে উল্লাস হল দেবেন্দ্রনাথের। বললেন, 'আমাদের উৎসবে কিন্তু আসতে হবে।'

'সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।' উদাসীন রামকৃষ্ণ।

'না, আপনি আসবেন।'

'কিন্তু দেখছ তো আমার অবস্থা। আমার কাপড়-চোপড়ের আঁট নেই। কখন কি ভাবে তিনি রাখবেন তিনিই জানেন।'

'না, আসতে হবে!' দেবেন্দ্রনাথ পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। 'শুধু একটা ধুতি আর উড়ুনি পরে আসবেন। আপনাকে এলোমেলো দেখে কেউ যদি কিছু বলে আমার কষ্ট হবে।'

'না বাপু, আমি তা পারব না। বাবু হতে পারব না আমি।'

দেবেন্দ্রনাথ শুধু অর্ধবস্ত্র উন্মোচন করেছিলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ মুক্তসমস্তসংগ। রামকৃষ্ণ সর্ববিকারবর্জিত। নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব। তার কাপড় থাকলেই বা কি, না-থাকলেই বা কি। নগ্ন বলেই তো সে পূর্ণ। চরম বলেই তো সে পরম।

কিন্তু শালীনতায় বাধল দেবেন্দ্রনাথের। পর দিন মথুরবাবুকে চিঠি লিখে পাঠালেন। একেবারে খালিগায়ে এলে ভালো দেখাবে না। গায়ে অন্তত একখানা উড়ুনি—

ওরে, ওরা এখনো বস্তুকে দেখে, সত্যকে দেখে না। আমাকে দেখে না, আমার কাপড় দেখে। ওরে, এ সে হরির শরীর। হরির শরীরের জন্যে ক হাত কাপড় কিনবি, কোন বাজারে? হরিই জগৎ, জগৎই হরি—এর বাইরে আর শরীর কই? হরিরেব জগৎ, জগদেব হরিঃ, হরিতো জগতো ন নহি ভিন্ন তনুঃ।

'দেবেন্দ্র এখনো ভোগে আছে। তাই সে ভাগেও আছে।' আমার ভোগও নেই, তাই ভাগও নেই। আমার ইয়ত্তাও নেই, পরিচ্ছেদও নেই। আমি সর্বোপাধিশূন্য।

'কিন্তু গৃহস্থেরা কি একেবারে ডুবে যেতে পারে না?' জিগ্গেস করল কেশব সেন।

'তোমরা ডুবে যাবে-কি গো? তোমরা একবার ডুব দেবে আবার উঠবে।' হাসল রামকৃষ্ণ। 'তোমরা ঈশ্বরকোটি নও, তোমরা পানকৌটি।'

'কিন্তু, কেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর?'

মহর্ষি বলতে পারো, কিন্তু আসলে রাজর্ষি। রাজর্ষি জনক। সংসারে থেকেও থাকতেন অরণ্যে। অরণ্যের নির্জনতায়।

'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর? দেবেন্দ্র? দেবেন্দ্র?' দেবেন্দ্রনাথের উদ্দেশে প্রণাম করল রামকৃষ্ণ। বললে, 'তবে কি জানো, পর্যাপ্তকাম হতে হয়। এক জনের বাড়িতে দুর্গাপুজার সময় উদয়াস্ত পাঁঠাবলি হত। এখন আর বলির সে ধুমধাম নেই। এক জন জিগ্গেস করলে, মশাই আপনার বাড়িতে আর বলির সে ধুমধাম কই? বাবু বললে, 'আরে, এখন যে দাঁত পড়ে গিয়েছে।' থেমে আবার বললে রামকৃষ্ণ, 'দেবেন্দ্রনাথ খুব মানুষ। হাতে তেল মেখে নিয়ে কাঁঠাল ভাঙছে। হাতে তেল মেখে নিয়ে কাঁঠাল ভাঙলে হাতে আর আঠা লাগে না।' ওরে একবার পরশমানিককে

ছুঁয়ে সোনা হ। তার পর হাজার বছর ধরে মাটিতে পোঁতা থাক, যে-সোনা সে সোনাই থেকে যাবি।

মথুরবাবুকে আবার ডাকল রামকৃষ্ণ। বললে, চলো এবার আরেক তীর্থে।

সে আবার কোথায় ?

দীননাথ মুখুজ্জের বাড়ি। বাগবাজারের পোলের কাছে থাকে। লোকটি বড় ভালো।

ভালো লোক হলেই তার বাড়িতে যেতে হবে ? মথুরবাবু ঝাড়া দিয়ে উঠলেন।

শুধু ভালো নয়, ভক্ত। সব সময়ে তাঁতে আছে, মন-প্রাণ সব তাঁতে গত হয়েছে। এমন লোককে আমি দেখতে যাব না ? ভক্তকে দেখা তো তাঁকেই দেখা।

দুনিয়ার অলিতে-গলিতে কত এমন ভক্ত আছে। তাই বলে সবাইকার বাড়ি-বাড়ি ধাওয়া করতে হবে না কি ?

আমাকে সে সব অলি-গলির ঠিকানা এনে দাও। আমি জনে-জনে গিয়ে প্রণাম করে আসব। ভক্ত হচ্ছে ভগবানের বৈঠকখানা। সেখানেই তিনি বিশেষরূপে প্রকাশিত। বিশেষরূপে তরঙ্গায়িত, তরলীকৃত। বৈঠকখানাতেই তো বাবু আছেন খুশমেজাজে, দিলদরিয়া হয়ে। মজা ওড়াবার মজলিশ চালাচ্ছেন চব্বিশ ঘণ্টা। আমাকে সেই আখড়ার আড্ডাধারী করে দাও।

ভক্ত ছাড়া তীর্থ নেই মহীতলে। ষোলো টাকার পয়সা এক কাঁড়ি, কিন্তু ষোলোটি টাকা যখন একত্র করো তখন আর কাঁড়ি দেখায় না। ষোলো টাকার বদলে যদি একটি মোহর করো তখন আরো কত ছোট হয়ে গেল। আবার সেটির বদলে যদি এক কণা হীরে করো, তা হলে লোকে টেরই পায় না।

ভক্ত ছোট্টটি হয়ে আছে। শুধু ঈশ্বরের নামটি ধরে বসে আছে। তীর্থভ্রমণ, গলার মালা ভেক-আচার কিছু নেয় না, শুধু ভক্তি নিয়ে পড়ে থাকে। ভার নেয় সার নেয়। জীবনে শুধু একখানি দলিল লিখে চুকিয়ে দেয় লেখা-পড়া। সে দলিল উইল বা দানপত্র নয়, নয় কোনো বন্ধক-তমশুক, শুধু একখানি আমমোক্তারি ! ভক্ত ঈশ্বরকে আমমোক্তারি দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে বসে থাকে। সে আমমোক্তারি বিশ্বাসের খাতায় রেজেস্টারি করা। রদ-রহিত নেই কোনো কালে। তাঁর নাম আর তিনি তো অভেদ। যা রাম তাই নাম। তেমনি যা ভগবান তাই ভক্ত।

মথুরবাবু গাড়ি নিয়ে এলেন। তীর্থদর্শনে বেরুল রামকৃষ্ণ।

সেদিন দীননাথের বাড়িতে দীননাথের এক ছেলের পৈতে হচ্ছে। বাড়িটি ছোট, কিন্তু হৈ-চৈ প্রচণ্ড। তার উপর কে এক জন বড়লোক এসেছে ল্যাণ্ডো করে, তাকে নিয়ে দীননাথের ঘরগুষ্টি ভীষণ ব্যস্ত। এমন সময় এদের দেখে ওদের অপ্রস্তুত অবস্থা। কোথায় বসায় এই অনাহূতকে ? নিমন্ত্রণ না করলেও যে চলে আসে পথ চিনে, প্রার্থনার অপেক্ষা না করে ? কোথায় বসাই ? ঘরে যে অনেক জিনিস, অনেক আসবাব, সেখানে জায়গা কোথায় ?

পাশের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন মথুরবাবু, ওপাশ থেকে কে ঝাঁজিয়ে উঠল : 'ও-ঘরে হবে না, ও-ঘরে সব মেয়েরা আছেন।'

মহা অপ্রস্তুত। জায়গা হল না রামকৃষ্ণের। তাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন মথুরবাবু।

'কেমন? দেখলে?' চটে গিয়েছেন মথুরবাবু।

রামকৃষ্ণ হাসতে লাগল। বললে, 'কেন, দীননাথকেই দেখলাম। তিনি দীননাথ, তিনি কি আমাকে ফাঁকি দিতে পারেন!'

'আর বোলো না। বসতে জায়গা দিল ঘরে?'

'ঘরে জায়গা না দিক, হৃদয়ে দিয়েছে।'

'তোমার কথা আর শুনব না। তোমার সঙ্গে যাব না আর কোথাও।' তবু রাগ যায় না মথুরবাবুর। 'তোমাকে যারা স্থান না দেয়—'

'আমাকে স্থান না দিলে স্থান কোথায় আর সংসারে?' দীননাথের মতই হাসতে লাগল রামকৃষ্ণ। তুমি, মথুরবাবু, তুমি আর নেই। তবে আমাকে এখন বেলঘরের বাগানে কেশব সেনের কাছে কে নিয়ে যাবে?

আমি আছি—এগিয়ে এল কাপ্তেন। সঙ্গে সর্বত্রই হৃদয়।

কিন্তু গাড়ি?

গাড়ি আমি দেব। কাপ্তেন বললে।

কাপ্তেনের সঙ্গে তার গাড়িতে চড়ে চলল রামকৃষ্ণ। চলল মাইল দুই দূরে বেলঘরে জয়গোপাল সেনের বাগানবাড়িতে। সেইখানেই কেশব এসেছে। ভক্তদল নিয়ে মেতেছে সাধন-ভজনে। চলো হরিকথা শুনে আসি। মা হাতছানি দিয়ে ডাকছেন সেখানে।

রামকৃষ্ণের পরনে শুধু লালপেড়ে একটি ধুতি। কোঁচার খুঁটটি বাঁ-কাঁধের উপর ফেলা। কালো বার্নিস-করা চটি পায়ে। চলেছে জ্ঞানীগুণীদের মজলিশে। যেখানে হরিগুণগান, সেখানে গুণই বা কি, আর জ্ঞানই বা কি।

* ৫১ *

দেবেন্দ্রনাথের ডান হাত কেশব সেন। চমৎকার চেহারা। সৌম্য, প্রশান্ত, ওজঃপূর্ণ। মুখশ্রীতে ঈশ্বরবিশ্বাসের লাবণ্য মাখানো। কণ্ঠস্বরে যেমন ভক্তির মধুরতা তেমনি প্রতিজ্ঞার তেজ। দার্ঢ্য আর দীপ্তির সমাহার। বাগ্‌বজ্রে বংশীধ্বনি। চমৎকার বক্তৃতা দেয় কেশব। যেমন ইংরিজি তেমনি বাংলা। প্রথমে-প্রথমে ইংরিজি, শেষ দিকে কেবল বাংলা। সে বক্তৃতার কী বর্ণচ্ছটা। কী বিন্যাসচাতুর্য। যে শোনে সে-ই তন্ময় হয়। সত্য পথের ধ্রুব জ্যোতিটি চোখের সামনে জ্বলতে দেখে।

দেশ তখন ভেসে যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে মদে, খৃস্টানিতে, ইংরিজিয়ানায়। উচ্ছন্নে যাবার জন্যে পাগল হয়ে ছুটোছুটি করছে চার দিকে। ছুটতে বা পারছে কই, নর্দমায় টলে পড়ছে। কাঁচা নর্দমার পাঁকের মধ্যে সার-সার শুয়ে আছে মাতালেরা। ধাঙড়দের ঝোড়াগুলোকে মাথার বালিশ করেছে। যেন একেক জন

কত বড় বাহাদুর। পাহারাওয়ালা এলে বলছে, 'এ বাবা, নর্দমায়, মিউনিসি-প্যালিটিতে আছি, পুলিস জুরিসডিকশানের বাইরে। টিকিটিও ধরতে পাবে না।'

"সধবার একাদশী"র নিমচাঁদ বলে, সেকালে ভূতে পেত, একালে আমাদের মদে পেয়েছে। ব্রাণ্ডির নাম বোতলচারুহাসিনী। আমি তাকে ছাড়তে পারি কিন্তু সে আমাকে ছাড়ে কই? যদি 'রাইম' করতে চাও তো মদ খাও। সে যুগে মদ না খাওয়া মানে শিক্ষিত বলে কলকে না পাওয়া। যে-কলেজ থেকে বেরিয়েছে পাশ করে তার নাম ডোবানো। স্বনামধন্য রামগোপাল ঘোষের ভাগ্নে গ্রাজুয়েট হয়েছে কিন্তু মদ খায় না। ঘোষ মশায় দুঃখ করে তাকে বলছেন, 'তুই মদ খেতে শিখলি না, তোকে আমি সমাজে বার করি কি করে?'

প্যারীচরণ সরকার "সুরাপাননিবারণী সভা" স্থাপন করলেন। মদিরার স্রোত তবু বন্ধ হয় না। নিমে দত্ত বলছে, ও সভা যদি ত্বরায় না নিপাত হয় আমি নিপাত হব। বড়মানুষের ছেলে-ব্যাটারা এক-একটি করে সভ্য হবে আর আমি ধেনো খেয়ে মরব এ হতে দেব না। এক ব্যাটা বড়মানুষের ছেলে মদ ধরলে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়—

গিরীশ ঘোষ মদ খায়। তা নইলে না কি তার নেশা হয় না।

ঠাকুর বলেন, 'খা না—কত খাবি? কত দিন খাবি? শেষে যখন তোকে সে-নেশা ভগবৎ-নেশায় পেয়ে বসবে তখন মদ কোথায় পড়ে থাকবে টেরও পাবি না।' সে-নেশা মদের চেয়েও দুর্মদ। সে-নেশাই সর্বনাশের নেশা।

তা ছাড়া, আরেক লক্ষণ, শিক্ষিত সমাজ সদলবলে সাহেবিয়ানার মোসাহেবি শুরু করে দিয়েছে। গায়ে বিলিতি খেলাত, মুখে বিলিতি বকুনি। যা কিছু ইংরেজি, যেমন কিছু সাহেবি তাই ওঠ-বোস মক্স করো। ইংরেজের পায়ে দেশ বিকিয়ে দিয়েছে, ভাব-ভাষাও বিলিয়ে দাও। নিমে দত্ত বলছে, আই রীড ইংলিশ, রাইট ইংলিশ, টক ইংলিশ, স্পীচিফাই ইন ইংলিশ, থিঙ্ক্ ইন ইংলিশ, ড্রীম ইন ইংলিশ।

সেইখানে ঠাকুর এলেন খাঁটি দিশি বাংলার জয়ধ্বজা উড়িয়ে। বললেন, 'চার দিকে বড় গোলমাল। কিন্তু গোলমালেও মাল আছে। গোল গেল ছেড়ে মালটি নেবে।'

ঠাকুর যেমন আপনি অপকট তেমনি ভাষাও অকপট।

বললেন, 'তিনটে "স" হয়েছে কেন বলতে পারিস? শ, ষ, স—এই তিন "স" কেন? এই তিন "স"-র মানে হচ্ছে, স, স, স। মানে সহ্য কর্, সহ্য কর্, সহ্য কর্। যে কোনো কাজে হাত দিস, বসিস যে কোনো সাধনায়, সহ্য করতে হবে। সহ্য না করলে সিদ্ধি নেই। এই সওয়ার বা সহ্য করার উপরে জোর দেবার জন্যেই তিনটে "স" হয়েছে।' বলেই একটি ছন্দ গাঁথলেন: 'যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।'

আগে লোকে বলত, উপমা কালিদাসস্য, এখন দেখেছ, উপমা রামকৃষ্ণস্য!

তার পর পোশাকটি দেখ।

এক দিকে চাঁদনির সাহেব আরেক দিকে বাগবাজারের বাবু।

বাবুর বর্ণনা দিচ্ছে নিমচাঁদ। ভোলাচাঁদকে দেখে বলছে, 'তুমি যে বাবু সেজে

বাহার দিয়ে এসেছ। মাথার মাঝখানে সিঁতে, গায় নিমুর হাফচাপকান, গলায় বিলাতী ঢাকাই চাদর, বিদ্যাসাগরপেড়ে ধুতি পরা, গরমি কালে হোল্ মোজা পায়, তাতে আবার ফুল-কাটা গার্টার, জুতোর ফিতের বদলে রুপার বগলস, হাতে হাড়ের হ্যাণ্ডেল বেতের ছড়ি, আংগুলে দুটি আংটি—'

ভোলাচাঁদ ইংরেজিতে বলছে 'ফাদার ইনলা গিভ সার—উই মাই ফাদার ইনলা সার—'

আর রামকৃষ্ণের পরনে লালপেড়ে ধুতি, গায়ে বড় জোর একটি মার্কিনের জামা, পায়ে কালোবার্নিশ-করা চটি, বড় জোর কখনো কদাচিৎ হাফ-মোজা।

মাস্টারকে বললেন, 'গোটা দু-এক মার্কিনের জামা দিও। সকলের জামা তো পারি না! কাপ্তেনকে বলব মনে করেছিলাম, তা তুমিই দিও।'

মাস্টার বসে ছিল, উঠে দাঁড়াল। কৃতার্থের মত বললে, 'যে আজ্ঞে।'

কিন্তু ঠাকুর যখন ভদ্রলোক ছেড়ে ভাবলোকে আসেন তখন তিনি একেবারে দিগম্বর! তখন তিনি মংগলায়তন হরি। তখন তিনি সকলেশ্বর। তাঁর ললাটফলকে কস্তুরীতিলক, বক্ষস্থলে কৌস্তুভ, নাসাগ্রে নবমৌক্তিক, করতলে বেণু, সর্বাংগে হরিচন্দ। তিনি অহেতুক-দয়ানিধি।

তখনকার দিনের লোকেরা প্রণাম করে না। প্রণাম করাকে কুসংস্কার বলে। প্রণাম না করে বলে, গুড মর্ণিং। বলবার সময় তর্জনীটা একবার একটু কপালে ঠেকায়। ঘাড়টা মোটা করে রাখে, কারু কাছে মাথা নোয়ায় না। মাথা নোয়ালেই যেন মানটি খোয়া যাবে।

ওরে, মাথা নত কর। যেখানে যেটুকু গুণ দেখছিস সেখানেই তো ঈশ্বরকে দেখছিস। ঈশ্বর যে গুণগুরু। গুণাতীত হয়েও তিনি যে গুণবর্ধক। সে গুণের কাছে মাথা নোয়া। ঈশ্বরকে স্বীকার করলেই তো নিজেকে মান দিলি। যার এই মান সম্বন্ধে হুঁশ আছে সেই তো মানুষ। যে বোঝে সে অনৃতের সন্তান নয়, অমৃতের সন্তান, সেই তো যথার্থ মানী।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির মানে প্রণাম শেখার পাঠশালা।

বাগবাজারে বোসপাড়া গলির মোড়ে বসে আছে গিরীশ ঘোষ, ঠাকুর গাড়ি করে যাচ্ছেন সেখান দিয়ে। গিরীশকে দেখেই ঠাকুর প্রথমে প্রণাম করলেন। প্রণাম ফিরিয়ে দিল গিরীশ। ঠাকুর আবার প্রণাম করলেন তক্ষুনি। যতবার গিরীশ প্রণাম ফেরায় ততবার ঠাকুর আগ বাড়িয়ে নতুন আরেকটা প্রণাম করে বসেন। কাঁহাতক চালানো যায় এই প্রণামের প্রতিযোগিতা? ক্ষান্ত হল গিরীশ ঘোষ। কিন্তু প্রণামে ঠাকুরের নিবৃত্তি নেই। গিরীশের থামবার পরেও আরেক বার প্রণাম করলেন ঠাকুর।

গিরীশ ঘোষ বললেন, 'দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুনটার সংগে প্রণামে আর টক্কর দেওয়া চলে না। ওর ঘাড় ব্যথা হয় না কিছুতে।'

ঠাকুর জগন্মাতাকে প্রণাম করছেন আর বলছেন, 'ভাগবত, ভক্ত, ভগবান, জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাকারবাদীর চরণে প্রণাম, নিরাকারবাদীর চরণে প্রণাম। সর্বতীর্থময় হরি। সর্বভূতে, সর্বজীবে প্রণাম।'

গিরীশ ঘোষ বলে, 'রাম অবতারে ধনুর্বাণ নিয়ে জগৎজয় হয়েছিল, কৃষ্ণ অবতারে জগৎজয় হয়েছিল বংশীধ্বনিতে, আর রামকৃষ্ণ অবতারে জগৎজয় হবে প্রণাম-মন্ত্রে।'

নাম করো আর প্রণাম করো। প্রকৃষ্টরূপে নামই তো প্রণাম।

আরেক হাওয়া চলছিল সে যুগে—খৃস্টানির হাওয়া। যেহেতু ইংরেজের ধর্ম, সেহেতু আর কথা নেই, মেতে যাও। হিন্দুধর্ম মানে পুতুল পুজো, স্রেফ ছেলে-খেলা। শিক্ষার আলোতে এসে ও সব কুসংস্কার মানতে কেউ রাজী নয়।

গীতা-উপনিষদের কেউ নাম শোনেনি। চণ্ডী? সে আবার কী মাথামুণ্ডু? চৈতন্যদেবের বাড়ি কোথায় তা কে জানে? ভাগবত? ও তো 'কথকের কথা'। সে যুগে কথকের কথা মানে আষাঢ়ে গল্প। যদি কেউ কিছু আজগুবি কথা বলে, ভদ্রলোকেরা অমনি বলে বসে—এ কথকের কথা। ভদ্রলোকেরা শোনে না কথকতা। তার চেয়ে গাঁজায় দম দেওয়া ভালো।

তবে তোমরা পড় কি? পাদরিরা বাড়ি-বাড়ি বাইবেল দিয়ে গেছে, তাই পড়ি এক-আধটু। ইংরেজিতে লেখা, বেশ বোঝা যায় সহজে। দেশের কতকগুলো মাতাল লোক খৃস্টান হয়ে গেল। দেখাদেখি আরো অনেকে। যেন একটা হুজুগ পড়ে গেল। গা ভাসিয়ে দিল গড্ডলিকায়। বাঙালি পাদরির দল বেরুল গলির মোড়ে, হেদোর ধারে, কেষ্ট বন্দ্যোর গির্জের কোণে। কালাপাহাড় মুসলমান হয়েছিল, এরা হল সাদাপাহাড়। এদের ধর্মের মধ্যে কর্ম শুধু হিন্দু দেবদেবীকে গাল পাড়া। সব চেয়ে ঝাল বেশি কালী আর কৃষ্ণের উপর। কালী ন্যাংটা আর কৃষ্ণ ননীচোর। শ্রোতার দল মেতে ওঠে। এক কথায় বাপ-পিতেমোর ধর্মকে নাকচ করে দেয়।

হিন্দুধর্ম একটা কুসংস্কার। ছত্রিশ রকম জাত মানে। স্ত্রীলোকে আর বাসনকোসনে তফাৎ রাখে না। পালকিতে বসিয়ে পালকি-সুদ্ধ জলে ডুবিয়ে গংগাস্নান করায় মেয়েদের। যিনি অনন্ত তাকে কি না নিয়ে এসেছে ঘটে-পটে, মাটির ডেলায়। আর দেবতাও একটি-দুটি নয়, তেত্রিশ কোটি। অত হিসেব সামলাতে পারব না। পাদরির কথাই ঠিক ঈশ্বর এক আর নিরাকার। আর ঈশ্বরের অবতার যীশুখৃস্টই একমাত্র সমুদ্ধর্তা। গির্জের খাতায় নাম লেখাতে লাগল দলে-দলে। যেহেতু খৃস্টান হলাম সেহেতু সাহেব হয়ে গেলাম। তাই নিয়ে এসো মদ, নিয়ে এসো নিষিদ্ধ মাংস।

একেই বলেছে, 'জাত মাল্লে পাদরি এসে, প্যাট মাল্লে নীল বাঁদরে।'

এখন এর উপায় কি? সব যে যায়!

রামমোহন নিয়ে এলেন বেদান্তের বাণী, দেবেন ঠাকুর তাকে সংহত করলেন ব্রাহ্ম-ধর্মে। আর কেশব লেগে গেল প্রচারণায়। বক্তৃতা দিয়ে ফিরতে লাগল। শুধু বক্তৃতা নয়, বার করল একাধিক পত্রিকা।

উন্মার্গগামীরা একটু থমকে দাঁড়াল।

খৃস্টধর্ম আর হিন্দুধর্মের মধ্যে একটা আপস ঘটালো কেশব সেন। মূর্তি দূর করে দাও, নিয়ে থাকো ভক্তির ভাবটি। যীশুবিহীন যীশুর ধর্ম গ্রহণ করো। তুলে দাও জাতিভেদ, আর যদি দেশের মুক্তি, আত্মার মুক্তি চাও, মুক্তি দাও স্ত্রীজাতিকে।

বেশ ভাব। ইংরেজের ধর্ম খৃস্টানিও আছে, বাপ-পিতেমোর ধর্ম হিঁদুয়ানিও আছে। চলো ব্রাহ্মসমাজে গিয়েই নাম লেখাই।

কেনারাম ডেপুটিকে জিগগেস করছে নিমচাঁদ: 'তুমি তো ব্রাহ্ম হয়েছ, হিন্দুশাস্ত্রের তেত্রিশ কোটি দেবতার সব ত্যাগ করেছ, না দুটি-একটি রেখেছ, সাত দোহাই তোমার, যথার্থ করে বলো—'

কেনারাম বললে, 'আমি কেতাব না দেখে উত্তর দিতে পারি না। আপনি ভারি শক্ত প্রশ্ন করেছেন—'

'দূর ব্যাটা ঘটিরাম', নিমচাঁদ ঝাঁজিয়ে উঠল: 'তুমি ব্রাহ্মধর্ম যত বুঝেছ তা এক আঁচড়ে জানা গিয়েছে। যখন ব্রাহ্মধর্মের সর্ত হচ্ছে একমেবাদ্বিতীয়ম্, তখন তেত্রিশ কোটি দেবতার সব ত্যাগ করিচিস কি না, বলতে কতক্ষণ লাগে?'

কেনারাম চিন্তিত মুখে বললে, 'একটি-আধটি ঠাকুর হলে খপ করে বলা যায়, তেত্রিশ কোটির কথা ঝাঁ করে বলা যায় না—জানি কি, যদি দুটো-একটা রাখবার মত হয়!'

ব্রাহ্মধর্ম বুঝুক আর না বুঝুক, লোক তো আগে ফিরুক পাদরিদের খপ্পর থেকে। হুজুগটা তো বন্ধ হোক। কেশবের বাগ্মিতায় আর ধর্মসাধনায় বিশ্বাস ফিরে এল উদ্‌ভ্রান্তদের। ঝাড়াই-বাছাই করে যদি দেশের মাঠেই পাই তবে কেন আর যাই বিদেশের মাটিতে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে নাম লিখলেই তো শুধু চলবে না, নিতে হবে নীতি আর পবিত্রতার পাঠ, সত্যনিষ্ঠা আর পরোপকারের ব্রত। 'ব্যাণ্ড অফ হোপ' নামে এক দল খুলল কেশব। মদ-তামাক খাব না। ছোঁব না নিষিদ্ধ মাংস।

নিমচাঁদকে শাসালো রামধন: 'তুমি বসো, আমি তোমার শ্রাদ্ধের আয়োজন করে আসছি!'

নিমে বললে, 'ব্রাহ্মমতে কোরো বাবা। অনেক বৃষ পার করেছি, এখন আর বৃষ উৎসর্গ ভালো লাগবে না।'

এর পর আবার আরেক দল উঠল যারা ঠাকুর-দেবতাও মানে না নিরাকার ব্রহ্মও বোঝে না। তারা নাস্তিক, সংশয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। কোনটা যে ধরবে ঠিক করতে পারছে না। হাল-ছাড়া নৌকোর মতো দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরেক দল উঠল, যারা প্রত্যক্ষবাদী। ধর্ম-টর্ম ধার ধারে না, ইন্দ্রিয়ের বাইরে জানে না আর কোনো অনুভূতির অস্তিত্ব। চারদিকে বিশৃঙ্খলা, অশান্তি, একটা ঝোড়ো হাওয়ার এলোমেলো ধুলো। এমন সময় ঠাকুর এলেন। সনাতন ধর্মের শাশ্বত জ্যোতির স্নিগ্ধতা নিয়ে, বিশ্ববিস্তীর্ণ উদার উন্মুক্তি নিয়ে। হিন্দুধর্মের উজ্জ্বলন্ত প্রতীক হয়ে, নির্গলিত ভাষ্য হয়ে। নিয়ে এলেন শান্তি, সাম্য, সামঞ্জস্য। নিয়ে এলেন সংগতি, সংহতি, সমন্বয়। খণ্ডের ঘরে ক্ষুদ্রের ঘরে রইলেন না, এলেন একেবারে ভুবনজোড়া আসন মেলে। নিয়ে এলেন সত্য, শৌচ, দয়া, শান্তি, ত্যাগ, সন্তোষ আর আর্জব। শম দম তপ সাম্য তিতিক্ষা শ্রুত আর উপরতি। নিয়ে এলেন প্রেম। প্রেমের অমোঘ মহিমা।

ভগবান ভুতভাবন হিন্দুধর্মের মন্ত্রাঙ্কিত পতাকা নিয়ে অবতীর্ণ হলেন দক্ষিণেশ্বরে। যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত—হতপ্রভ সূর্য উদ্দীপিত

হল। ঠাকুর মৃতদেহে নিশ্বাস সঞ্চার করলেন। ক্রমে-ক্রমে সঞ্চার করলেন আশ্বাস। তার পর সকলে বিশ্বাসের বটপত্রে ভেসে-ভেসে চলল। ভেসে চলল সেই অমৃতের সমুদ্রে। দক্ষিণেশ্বরের দুর্গম অরণ্যে সরল একটি ফুল ফুটেছে। কিন্তু লোকে তার গন্ধটির খবর পায় কি করে? ফুল তো ফুটলেই চলে না, চাই গন্ধবহ সমীরণ। যে বলবে, দেখ, কেমন ফুল ফুটেছে; আর, শোনো, আমার সংগ ধরো, দেখবে চলো, কোথায় ফুটেছে এ ফুল! আমি নিয়ে এসেছি সেই কাননের ঠিকানা। কেশব সেনই সেই গন্ধবহ সমীরণ।

* ৫২ *

কেশব সেনকে রামকৃষ্ণ প্রথমে দেখে আদি সমাজে, সে অনেক আগে। মসজিদ ঘুরে, গির্জে ঘুরে গিয়েছিল এক দিন ব্রাহ্মসভায়! গিয়ে দেখে বেদীর উপর চার পাশে অনেক লোক, মাঝখানে কেশব। ধ্যান করছে চোখ বুজে।

'জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রের সমাজে গিয়ে দেখলাম, তাকের উপর ক'জন বসেছে, কেশব মাঝখানে। দেখলাম যেন কাষ্ঠবৎ। সেজবাবুকে বললাম, যত জন ধ্যান করছে তার মধ্যে ঐ কেশব ছোকরারই ফাতনা ডুবেছে। ও কি যে-সে ছেলে? লেখা পড়া নেই, বাপের ধার মেনে নিলে এক কথায়। অন্য ছেলে হলে মানত?'

কিন্তু চোখ বুজেই বা ধ্যান করতে হবে কেন? চোখ চেয়েও ধ্যান হয়। কথা কইছে তবু ধ্যান। যেমন ধরো দাঁতের ব্যথা। সব কাজ করছে কিন্তু মন রয়েছে দরদের দিকে। চোখ চেয়ে আছে, কথা কইছে, কাজ করছে, কিন্তু মন রয়েছে ভগবানে বিদ্ধ হয়ে। তিনিও আমাকে চান, আমিও তাঁকে চাই, তবু ধরতে পারছি না, মিলতে পারছি না—এ কি কম যন্ত্রণা?

এবার শুধু দূরে থেকে দেখা নয়, কাছে এসে বসা, আলাপ করা, অন্তরের অঙ্গ হয়ে যাওয়া। তার আগে কেশবকে এক দিন স্বপ্নে দেখেছিল রামকৃষ্ণ। মা-ই দেখিয়েছিলেন। কেশব যেন পেখম-মেলা ময়ূর, ময়ূরের মাথায় মুক্তো। মা-ই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। পেখম হচ্ছে কেশবের শিষ্যমণ্ডল আর মুক্তোটি হচ্ছে তার রাজসিকতার দীপ্তি।

সকাল বেলার দিকে কেশব তার শিষ্যবৃন্দ নিয়ে পুকুরের বাঁধাঘাটে বসে আছে, হৃদয় আস্তে-আস্তে কাছে এল। বললে, 'আমার মামা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

কে আপনার মামা?

ঐ দক্ষিণেশ্বরে থাকেন। হরিকথা শুনতে বড় ভালোবাসেন। সারা দিনরাত ডুবে আছেন এই হরিকথায়। যেখানে হরিনাম পান হরিভক্তি পান সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হন। হরিগুণগান শুনে তাঁর ভাবসমাধি হয়। আপনি এখানে হরিনাম করতে এসেছেন জেনে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

'কোথায় তিনি ?'

'গাড়িতে বসে আছেন।'

'নিয়ে আসুন নামিয়ে।' কেশব ব্যস্ত হয়ে উঠল।

হৃদয় গিয়ে নামিয়ে নিয়ে এল রামকৃষ্ণকে। সবাই রামকৃষ্ণকে দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে। দেখে হতাশ হবার ভাব করল। ও! এই? এ তো এক জন সাধারণ লোক। আজেবাজে পাঁচ জনেরই এক জন।

রামকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছেন কোন জন কেশব। বুকের ভিতরে তারে-তারে সুর বেজে উঠল। কেশবের কাছে আসবার আগে নারায়ণ শাস্ত্রীকে পাঠিয়েছিল একবার রামকৃষ্ণ। বলেছিল, তুমি একবার যাও, গিয়ে দেখে এস তো কেমন লোক। নারায়ণ দেখে এসে বলেছিল লোকটা জপে সিদ্ধ।

রামকৃষ্ণ কেশবের কাছটিতে চলে এল। বললে, 'বাবু, তোমাদের কাছে ঈশ্বরের কথা শুনতে এসেছি। তোমরা না কি দেখেছ ঈশ্বরকে? সে কেমনতরো দর্শন আমাকে একটু বলবে?'

কেশব তন্ময়ের মত তাকিয়ে রইল রামকৃষ্ণের দিকে। এ সে কি দেখছে? কাকে দেখছে? বললে, 'আপনি বলুন—'

আমি বলব? গলা ছেড়ে গান ধরল রামকৃষ্ণ।

> 'কে জানে কালী কেমন,
> ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন,
> মূলাধারে সহস্রারে
> সদাযোগী করে মনন।
> ঘটে ঘটে বিরাজ করেন,
> ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
> মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড
> প্রকাণ্ড তা জানে কেমন,
> মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম,
> অন্য কেবা জানে তেমন।
> প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে
> সন্তরণে সিন্ধু তরণ॥'

গাইতে-গাইতে রামকৃষ্ণের সমাধি হয়ে গেল। উপস্থিত সকলে ভাবলে এ বুঝি একটা ঢং, মস্তিষ্কের বিকার। কিংবা হয়তো লোকটার মৃগি আছে। রামকৃষ্ণের কানে হৃদয় প্রণব-মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল। হরি ওঁ! হরি ওঁ!

ধীরে-ধীরে রামকৃষ্ণের মুখ প্রসন্ন পবিত্র হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যে আস্বাদন করে এসেছে, অবগাহন করে এসেছে এ তার মুখ। এ মুখ উপলব্ধির সমাপত্তির। জ্ঞানানন্দ, বোধানন্দ আর মিলনানন্দের সংমিশ্রণ। এ মুখের বিভা দেখে অভিভূত হয়ে গেল সকলে। অন্ধেরা হাতি দেখে এল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে। এক জনের হাত পড়েছিল পায়ে, সে বললে, হাতি ঠিক থামের মতো। আরেক জনের

হাত পড়েছিল পেটে, সে বললে, জলের জালার মতো। দূর, কুলোর মতো—কানে হাত রেখেছিল যে তৃতীয় জন, সে বললে।

'ভাবলে ভাবের উদয় হয়।
যেমনি ভাব তেমনি লাভ মূল সে প্রত্যয়।'

গাছে এক গিরগিটি থাকে। একজন তাকে দেখে এসে বললে, একটা সুন্দর লাল রঙের জানোয়ার দেখলাম। আরেক জন বললে, ভুল দেখেছিস, লাল নয় নীল। তোরা তো খুব জানিস! আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি আজ সকালে, বিলকুল হলদে। বললে তৃতীয় জন। কাকে যে তোরা কি রঙ বলিস কিছু ঠিক নেই। বিদ্রূপ করে হেসে উঠল চতুর্থ জন। স্রেফ সবুজ, একেবারে কচু পাতার রঙ। মহাবিরোধ উপস্থিত। সবাই মিলে চলল সেই গাছের নিচে। গিয়ে দেখে একজন লোক বসে আছে সেখানে। তাকে সবাই ধরল। আপনি তো এখানকার বাসিন্দে, বলুন জানোয়ারটার কী রঙ? যে যেমন দেখ তেমনি। তোমাদের সকলের কথাই ঠিক, ও কখনো লাল কখনো নীল কখনো হলদে কখনো সবুজ। ওটা বহুরূপী। আবার কখনো-কখনো দেখা যাবে ওটার একদম রঙ নেই। ওটা বর্ণহীন, নির্গুণ।

সবাই তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল রামকৃষ্ণকে।

ভক্ত যে রূপটি ভালোবাসে ভগবান সেই রূপটি ধরে দেখা দেন। এক জনের এক গামলা রঙ ছিল। অনেকে আসত তার কাছে কাপড় রঙ করবার জন্যে। যে যে-রঙ চায় তার কাপড়ে সেই রঙে ছুপিয়ে দিত। একজন দেখছিল এই আশ্চর্য ব্যাপার। তাকে রঙওয়ালা জিগ্‌গেস করলে, তোমার কী রঙ চাই? সে বললে, 'ভাই, যে রঙে রঙেছ আমায় সেই রঙ দাও।'

কী গভীর কথা কেমন সরস করে বলছে রামকৃষ্ণ। স্নানাহারের বেলা হয়ে গেল তবু কারু ওঠবার নাম নেই। নিরাকার জ্ঞানের সাধন, সাকার ভক্তির। ভক্তির কাছে নিরাকার এনো না, কিছু দেখতে না পেলে ধরতে না পেলে তার ভক্তির হানি হবে। সাকার থেকে চলে আসবে সে নিরাকারে। আগে হয়তো দশভুজা নিলে—সে মূর্তিতে বেশি ঐশ্বর্য। তার পর চতুর্ভুজ। তার পর দ্বিভুজ। তার পর গোপাল —বালগোপাল। ঐশ্বর্যের বালাই নেই, কেবল একটি কচি ছেলের মূর্তি। তার পরে আরো ছোট হয়ে গেল—একটি শিবলিঙ্গ বা শালগ্রাম। তার পর? আর দরকার নেই রূপে। প্রতীক তখন প্রত্যক্ষের বাইরে। তখন মহাব্যোমে একটি অখণ্ড জ্যোতি। সেই জ্যোতি দর্শন করেই লয়। কিন্তু, তার পর? ধ্যান যখন ভাঙবে? জ্ঞানের পর কোথায় এসে দাঁড়াবে? দাঁড়াবে এসে প্রেম। তখন আবার সাকারে চলে আসবে। তখন দেখবে সমস্ত জীব ঈশ্বরের প্রতিভাস। জীবের আকারে ব্রহ্ম বিচরণ করছেন। তখন ব্রহ্মোপাসনা মানে জীবোপাসনা। আর জীবে যা প্রেম ঈশ্বরে তাই ভক্তি। আর, ভক্তির প্রগাঢ় পরিপক্ব অবস্থাই প্রেম।

উপাসনার ঘণ্টা বাজল। এখন উঠতে হয় এই আড্ডা ছেড়ে।

কে ওঠে! কোথায় আবার উপাসনা! ভগবানের কাছটিতে বসাই তো উপাসনা। এ কি আমরা ভগবানের কাছটিতে বসে নেই?

বেদান্তের বিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ। তাঁর কী স্বরূপ কেউ বলতে পারে না। কিন্তু

যতক্ষণ তুমি সত্য ততক্ষণ জগৎও সত্য ঈশ্বরের নানা রূপও সত্য। ঈশ্বরকে ব্যক্তিবোধও সত্য। দুই সত্য। নিরাকারও সত্য, সাকারও সত্য। কবীর বলত, নিরাকার আমার বাপ, সাকার আমার মা। তুমি কাকে ছেড়ে কাকে রাখবে? নানা রকম পূজা তিনিই আয়োজন করেছেন, অধিকারী ভেদে। যার যেমন পেটে সয় তেমনিই তো পরিবেশন করবেন। বাড়িতে যদি বড় মাছ আসে, মা নানা রকম মাছের তরকারি রাঁধেন—যার যেটি মুখে রোচে। কারু জন্যে মাছের টক, কারু জন্যে মাছের চচ্চড়ি, কারু জন্যে মাছ ভাজা। যেটি যার ভালো লাগে, যেটি যার পেটে সয়। সর্বত্রই সেই মৎস্যস্বাদ। আমাদের হলধারী দিনে সাকারে আর রাতে নিরাকারে থাকত। তা যে ভাবেই থাকো, ঠিক-ঠিক বিশ্বাস হলেই হল। বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস। গুরু বলে দিয়েছে, রামই সব হয়েছেন—'ওহি রাম ঘট ঘটমে লেটা।' কুকুর এসে রুটি খেয়ে যাচ্ছে। ভক্ত বলছে, 'রাম! দাঁড়াও, দাঁড়াও, রুটিতে ঘি মেখে দিই।' গুরুবাক্যে এমনি বিশ্বাস! কিন্তু যাই বলো, সাকারই বলো নিরাকারই বলো, তিনি রয়েছেন এই খোলের মধ্যেই। হরিণের নাভিতে কস্তুরী হয়, তখন গন্ধে হরিণগুলো দিকে-দিকে ছুটে বেড়ায়, জানে না কোত্থেকে গন্ধ আসছে। তেমনি ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন, মানুষ তাকে জানতে না পেয়ে ঘুরে-ঘুরে মরছে।

এ কি, আজ কি আর কোনো কাজ হবে না না নাকি? সবাই এমনি বসে থাকবে সারাক্ষণ? মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে আছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে আছে। চার দিকে শুধু আনন্দের ঢেউ।

'এ যেন গরুর পালে গরু এসেছে। ঝাঁকের কই মিশেছে ঝাঁকে এসে। তাই এত লহর পড়েছে চার দিকে।'

কেশব ভক্তিতে অভিভূত হয়ে পড়েছে। এমনটি তো সে কই ভাবেনি। এ যে একেবারে 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।' ভূমার অখণ্ড অভ্যুদয়। প্রণামের রসে আপ্লুত হল কেশব। নিজেকে বালকের মতন মনে হল। চিনির পাহাড়ের কাছে ক্ষুদ্র এক পিপীলিকা। নিশ্চয়ই ঈশ্বর দেখেছে, পেয়েছে, হয়েছে। নইলে এমন সব কথা কয়! কথায়-কথায় এমন একটি ভাব আনে! এমন সব সহজ করে দেয় সহজে। তর্কের জায়গা নেই, প্রশ্ন সব ঘুমিয়ে পড়েছে। সন্দেহ মাথা তুলতে পারছে না। চোখের সামনে বসে আছে যেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সর্বশেষ উপলব্ধি।

উঠল রামকৃষ্ণ। যাবার আগে কেশবকে বললে, 'তোমার ল্যাজ খসেছে।'

কেশব তো অবাক।

ব্যাঙাচির যদ্দিন ল্যাজ থাকে তদ্দিন জলেই থাকে, ডাঙায় উঠতে পারে না। কিন্তু ল্যাজ যখন খসে পড়ে তখন জলেও থাকতে পারে, ডাঙায়ও উঠতে পারে। তেমনি মানুষের যদ্দিন অবিদ্যার ল্যাজ থাকে তদ্দিন সে সংসার-জলেই থাকতে পারে, ব্রহ্মস্থলে উঠতে পারে না। ল্যাজ খসে পড়লেই সংসার ও সারাৎসার দুই জায়গায়ই সে থাকতে পারে। তুমি তেমনি সংসারেও আছ সচ্চিদানন্দেও আছ। সংসারে থেকে যে তাঁকে ডাকে সে বীরভক্ত। যে সংসার ছেড়ে এসেছে সে তো ডাকবেই—ডাকবার জন্যই এসেছে, তাতে তার বাহাদুরি কি। সংসারে থেকে যে

ডাকে, সে বিশ মণ পাথর ঠেলে দেখতে চায়, সেই ধন্য, সেই বাহাদুর, সেই বীরপুরুষ।

রামকৃষ্ণ চলে গেলে এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। এই সহজ সুন্দরটি কে? কে এই সদয়হৃদয়? কে এই মায়ামানুষবেশী? চলো যাই সভা করে সবাইকে বলি গে। অখিল মধুরের যিনি অধিপতি তিনি এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে।

তুমি কি তাঁকে চোখে দেখেছ? সবাই ঘিরে ধরে কেশবকে।

চোখে দেখেছি। দুই চোখে তাঁকে কুলোয় না। চল তোরাও দেখবি চল।

৫৩

দক্ষিণেশ্বরে চর পাঠিয়ে দিল কেশব। লক্ষ্য করবে রামকৃষ্ণকে। চোখে-চোখে রাখবে। রাত-দিন পাহারা দেবে। ঠিক-ঠিক খাঁটি কিনা, না আছে কিছু বুজরুকি।

হ্যাঁ, ভালো কথা, বাজিয়ে নাও, যাচাই করে নাও। পরের মুখের ঝাল খাবে কেন? কেন মেনে নেবে শোনা কথা? নিজে এসো, বসো, দেখ পরখ করে। তন্ন-তন্ন করে দেখ। কিন্তু পরীক্ষার পর প্রমাণে যদি পরিতৃপ্ত হও, তখন কী হবে? কোন দিকে যাত্রা করবে?

তিন জন ব্রাহ্ম-ভক্ত এল দক্ষিণেশ্বরে। তাদের মধ্যে এক জন প্রসন্ন। পালা করে রাত-দিন দেখবে রামকৃষ্ণকে আর কেশব সেনকে রিপোর্ট দেবে। পোশাকী আর আটপৌরে এমন কিছু ভেদ আছে নাকি রামকৃষ্ণের। সে মনে-মুখে এক কি না। সে কি সত্যিই জিতাসন, জিতশ্বাস, জিতেন্দ্রিয়? সে কি সত্যিই পরিমুক্তসংগ?

রামকৃষ্ণের ঘরের মধ্যে চলে এল সটান। বললে, 'রাত্রে আমরা ও-ঘরে শোব।'

বেশ তো, শোও না! ঢালাও নিমন্ত্রণ রামকৃষ্ণের।

কিন্তু শুবি তো চুপ করে শুয়ে থাক। তা না, কেবল 'দয়াময়', 'দয়াময়' করতে লাগল। নিরাকার কিনা, তাই ঈশ্বরের দয়া ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। তাঁর ঐশ্বর্যই তো দয়া। সূর্যের ঐশ্বর্যই যেমন আলো। সূর্যকে যদি 'আলোময়' 'আলোময়' বলা যায়, কিছুই বলা হয় না। নতুন কিছু বল। ডাকার মতন করে ডাক। যে-ডাকে শুধু দয়া দেখাতে আসবে না, ভালোবাসায় গলে জল হয়ে যাবে।

ব্রাহ্ম-ভক্তরা কেশবের স্তুতি আরম্ভ করল। বলল, 'কেশববাবুকে ধরো, তা হলেই তোমার ভালো হবে।'

'কিন্তু আমি যে সাকার মানি।' আমি যে মা বলে ডাকি। মাকে যদি নিরাকার করি তবে অমন কোলটুকু পাব কি করে? কি করে দেখব সেই সুখপ্রসন্ন বদনের স্নেহময় সুষমা? মা কি আমার সামান্য? মা আমার অনন্তরূপিণী। মা আমার

কালাভ্রশ্যামলাঙ্গী, বিগলিতচিকুরা, খড়্গমুণ্ডাভিরামা। মহামেঘপ্রভা, শ্মশানালয়-বাসিনী। বলতে চাও, এমন রূপটি আমি দেখব না নয়ন ভরে ? দেখব না তো, আমার নয়ন হল কেন ? শোনো, কমলাকান্ত কি বলছে। দেখো, শুনতে-শুনতে দেখো কিনা চোখের সামনে।

সমর আলো করে কার কামিনী !
সজল জলদ জিনিয়া কায়
দশনে প্রকাশে দামিনী ॥
এলায়ে চাঁচর চিকুর পাশ
সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস,
অট্টহাসে দানব নাশে
রণপ্রকাশে রঙ্গিণী ॥
কিবা শোভা করে শ্রমজ বিন্দু
ঘন তনু ঘেরি কুমুদবন্ধু
অমিয় সিন্ধু হেরিয়ে ইন্দু
মলিন, এ কোন মোহিনী ॥
এ কি অসম্ভব ভব-পরাভব
পদতলে শব সদৃশ নীরব
কমলাকান্ত কর অনুভব
কে বটে ও গজগামিনী ॥

এই রণরামা নীরদবরণীকে দেখব না আমি ? আহা, দেখ, দেখ, শোণিত-সায়রে যেন নীল নলিনী ভাসছে !

তবুও ব্রাহ্ম-ভক্তরা কেবল 'দয়াময়' 'দয়াময়' করে। ঘুমুতে দেবে না রামকৃষ্ণকে।

তখন রামকৃষ্ণের ভাবাবস্থা হল। সেই অবস্থায় আরূঢ় থেকে বললে সেই ভক্তদের : 'এ ঘর থেকে চলে যাও বলছি।'

যেন বজ্রঘোষের আদেশ। ভক্তরা তখন পালিয়ে যেতে পথ পায় না। ঘর ছেড়ে তখন বারান্দায় গিয়ে শুলো।

কাপ্তেনও এমনি পরীক্ষা করে নিয়েছিল। যেদিন দিনের বেলায় প্রথম দেখলে রামকৃষ্ণকে, ঠিক করলে রাতের বেলাও দেখে যেতে হবে। দেখে যেতে হবে রাতেও এ সূর্য সমপ্রভই থাকে কিনা। কোণটিতে চুপি-চুপি রইল চোখ মেলে। দেখল এ সূর্যের উদয়াচলই আছে, অস্তাচল নেই।

আমাকে শক্ত হাতে বাজিয়ে নিবি, যেমন করে শানের উপরে মহাজনে টাকা বাজায়। বেপারী যেমন তীক্ষ্ম চোখে দেখে নেয় মালের টুটা-ফুটা। ভক্ত হয়েছিস বলে বোকা হবি কেন ? বুঝে-সুঝে দেখে-শুনে নিবি। সন্দেহই যদি রাখবি তবে সন্ধান জানবি কি করে ?

নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে এসেছে। ঠাকুরের ঘরটিতে গিয়ে দেখে, ঠাকুর নেই। কোথায় তিনি ? কলকাতায় গিয়েছেন। ফিরবেন কখন ? এই এলেন বলে।

তা হোক, এই সোনার সময়। দেখা যাক কেমন তাঁর সোনার উপর বিতৃষ্ণা !

ঘর ফাঁকা হতেই পকেট থেকে একটা টাকা বের করলে নরেন। ঠাকুরের বিছানার নিচে আলগোছে লুকিয়ে রাখলে। সে-তল্লাটেই আর রইল না তার পর। সিধে চলে গেল পঞ্চবটী। কেউ যেন ঘুণাক্ষরে না টের পায়!

কতক্ষণ পরেই ফিরে এলেন ঠাকুর। দেখতে পেয়েই নরেন এগিয়ে এল তাড়াতাড়ি। এবার বোঝা যাবে কাঞ্চনত্যাগের মহিমা। ঘরের মধ্যে আগে-ভাগে ঢুকে ঠিক কোণটি বেছে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

যেমন নিত্য বসেন তেমনি বিছানায় এসে বসলেন ঠাকুর। কিন্তু গা ঠেকিয়েছেন কি না ঠেকিয়েছেন চীৎকার করে উঠলেন। যেন জ্বলন্ত অংগারের উপরে বসেছেন এমনি দগ্ধকর যন্ত্রণা। কী হল? ত্রস্তব্যস্ত হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল সকলে। বিষাক্ত কিছু দংশন করল নাকি? কই, বিছানায় কিছু দেখা যাচ্ছে না তো! ঠাকুর সরে দাঁড়ালেন খাটের থেকে। কাছাকাছি যারা ছিল সবল হাতে ঝাড়তে লাগল বিছানা। টং-টং করে হঠাৎ একটা আওয়াজ হল মেঝের উপর। ওটা কি? ওটা একটা টাকা দেখছি না? বিছানায় এল কি করে?

নরেন তাড়াতাড়ি চলে গেল ঘর ছেড়ে।

বুঝেছি, বুঝেছি। আনন্দে ঠাকুর বিহ্বল হয়ে উঠলেন। তুই আমাকে পরীক্ষা করছিস। বেশ তো, নিবিই তো পরীক্ষা করে। কত পরীক্ষা করেছেন মথুরবাবু। ফাঁকা ঘরে মেয়েমানুষ ঢুকিয়ে দিয়েছেন, বলেছেন জমিদারির খানিকটা তোমাকে লিখে দি। তোদের যার যেমন মন চায় যাচাই করে নে। যা চাই তা পাব কিনা—এ জিজ্ঞাসায় যখন এসেছিস তখন যাচাই করা ছাড়বি কেন? তোদের সকলের সন্দেহ নিরসন করে নে। চলে আয় সত্যের স্থিরতায়। সিদ্ধান্তের শান্তিতে।

দক্ষিণেশ্বরের জমিদার নবীন রায়চৌধুরীর ছেলে যোগীন। বিয়ে করেছে, তবু রোজ রাতে বাড়ি যায় না, প্রায়ই ঠাকুরের কাছটিতে পড়ে থাকে। যখন আর-আর ভক্তরা কাছে-ভিতে কেউ নেই, তখন ফাঁকতালে ঠাকুরের কোনো কাজে লেগে যেতে পারে কিনা, তারই আশায় জেগে থাকে। সেদিন সন্ধে হতে-না-হতেই ভক্তরা বিদায় নিয়েছে। যোগীন বসে আছে একলাটি।

'কি রে, বাড়ি যাবি না?'

'কেউ আজ নেই আপনার কাছে। ভাবছি, আমিই তবে থেকে যাই রাতখানা।'

ঠাকুর খুশি হলেন। রাত দশটা পর্যন্ত আলাপ করলেন একটানা। আলাপের বিষয়ও সেই একটানের বিষয়। অটনে-অনটনে সেই এই ঈশ্বরের টান।

রাত দশটায় জলযোগ করলেন ঠাকুর। যোগীনও খেয়ে নিল কালীঘরে। ঠাকুর শুয়ে পড়লেন তাঁর বড় খাটটিতে। সেই ঘরেই মেঝেতে বিছানা পাতল যোগীন। মাঝ রাত। ঠাকুরের একটিবার বাইরে যাবার দরকার হল। তিনি তাকালেন যোগীনের দিকে। অঘোরে ঘুমুচ্ছে ছেলেটা। কেমন মায়া হল ঠাকুরের, ডেকে ঘুম ভাঙালেন না। নিজেই দোর খুলে বেরিয়ে গেলেন। একা-একা চলে গেলেন ঝাউতলা। খানিক পরেই ঘুম ভেঙে গেল যোগীনের। এ কি, ঘরের দরজা খোলা কেন? ঠাকুর কোথায়? বিছানা শূন্য। এত রাত্রে কোথায় গেলেন তিনি একা-একা? গাড়ু-গামছা তো সব ঠিক-ঠিক জায়গায়ই আছে। আর, তাই যদি যাবে,

তবে তাকে দাঁড়িয়ে দিতে নিয়ে গেলেন না কেন সংগে করে? তবে বোধ হয় চাঁদের আলোয় একটু বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। গংগায় ঝিরঝিরে হাওয়া দিয়েছে।

কই, গংগার কাছাকাছি কোথাও তিনি নেই তো! যোগীন বাইরে এসে উৎসুক চোখে দেখতে লাগল চার দিক। কোথাও সাড়াও নেই শব্দও নেই। হঠাৎ বুকের মধ্যে ধাক্কা খেল যোগীন। ঠাকুর লুকিয়ে তাঁর স্ত্রীর কাছে নহবৎখানায় যাননি তো? ভয় করতে লাগল যোগীনের। দিনের বেলা তিনি যা বলেন রাতের বেলা তিনি তা পালন করেন না? ডুবে-ডুবে জল খান? না, এর একটা হেস্ত-নেস্ত দেখে যেতে হবে। নহবৎখানার কাছাকাছি এগিয়ে গেল যোগীন। নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল দরজার দিকে। ব্যাপারটা অন্যায় হচ্ছে তবু নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি নেই। দরজা খুলে ঠাকুর বেরিয়ে এলেই দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে সোজা বাড়ি চলে যাবে যোগীন। পথ ভুলেও আসবে না এ তল্লাটে। সমস্ত আকাশ-বাতাস যেন নিশ্বাস রুদ্ধ করে আছে। একটি গাছের পাতাও নড়ছে না। উৎসুক এক প্রতীক্ষা মুহূর্তের মালায় স্তব্ধতার মন্ত্র জপ করে চলেছে। যিনি অচ্যুত তিনি যেন এখুনি বিচ্যুত হয়ে পড়লেন!

চট-চট—চটি জুতোর আওয়াজ শোনা গেল। কে যেন আসছে পঞ্চবটীর ওদিক থেকে। কান খাড়া করল যোগীন। এ তো সেই পরিচিত পদশব্দ। সর্বাংগে শিউরে উঠে তাকাল চন্দ্রালোকে। সত্যিই তো, ঠাকুরই তো আসছেন। কে কাকে ধরে ফেলে! যোগীনের ইচ্ছে হল মাটির সংগে মিশে যাই। যে মাটিতে তিনি পা রেখেছেন সেই পদস্পর্শনের মাটিতে।

'কি রে এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে?' কাছে এসে প্রশান্ত বয়ানে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

অধোমুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল যোগীন। অন্তরদর্শী বুঝেছেন এক পলকে। তবু অপরাধ নেবার নাম নেই। তবু আশ্বাসের স্নেহছত্র মেলে ধরলেন স্বচ্ছন্দে। বললেন, 'বেশ, বেশ, এই তো চাই। সাধুকে সহজে বিশ্বাস করবি নে। সাধুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি। নে, চল, ঠিক করেছিস। এখন ঘরে আয়।'

ঠাকুরের পিছু-পিছু ঘরে ঢুকল যোগীন।. সারা রাত আর ঘুম এলো না যোগীনের। মনে-মনে বারংবার ক্ষমা চাইতে লাগলো সেই ক্ষমাময়ের কাছে। ভগবানকে ছোট করেছেন বলে ব্যাসদেব যেমন ক্ষমা চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, হে জগদীশ্বর, তুমি রূপবর্জিত, অথচ আমি ধ্যানে তোমার রূপকল্পনা করেছি। তুমি অখিলগুরু, বাক্যের অতীত, অথচ আমি স্তবস্তুতি করে তোমার অনির্বচনীয়তা নষ্ট করেছি। তুমি সর্বব্যাপী, অথচ আমি তীর্থভ্রমণ করে তোমার সেই সর্বব্যাপিত্ব খণ্ডন করেছি। আমি ঘোরতর অপরাধী। আমার এই বিকল্পতা-দোষত্রয় মার্জনা করো। তেমনি করেই আকুল অনিদ্রায় ক্ষমা চাইতে লাগলো যোগীন। তুমি সংশয়-পরিলেশশূন্য। অথচ আমি আমার আবিল মনের কুটিল সন্দেহের ছায়া ফেললাম তোমার উপর। প্রভু, আমাকে ক্ষমা করো। তোমার পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে আমাদের ঘনচ্ছন্ন দৃষ্টি সংশোধন করে দাও।

'কাকে সাধু বলে মশাই ?' এক প্রতিবেশী এসে জিগগেস করল রামকৃষ্ণকে।

'যার মন-প্রাণ-অন্তরাত্মা ঈশ্বরে নত হয়েছে তিনিই সাধু। যিনি কামকাঞ্চন-ত্যাগী। যিনি স্ত্রীলোককে মাতৃবৎ দেখেন, পুজো করেন। সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করেন, ঈশ্বরীয় কথা বই কথা কন না। আর সর্বভূতে ঈশ্বর আছে জেনে আপামর সকলের সেবা করেন।'

সাধুর আশা নেই, আসক্তি নেই। সে সতত সন্তুষ্ট। সে বহির্নিশ্চেষ্ট। তার আরম্ভ-উদ্যোগ নেই তার সর্বত্র সমবুদ্ধি। তার ফলেও যা অফলেও তাই। তার কাছে নিন্দা-নান্দী এক কথা। শত্রু-মিত্র এক জন। তার গতি চঞ্চল কিন্তু মতিটি স্থির। তার দ্বেষ-লেশ নেই। সে প্রহ্লাদ মূর্তি। হেতু নেই অথচ ভক্তি। অকারণে অবারণ ভক্তি। প্রহ্লাদকে যখন কৃষ্ণ বর দিতে চাইলেন, প্রহ্লাদ কী বললে ? বললে, 'যদি বর দেবেনই তবে এই বর দিন, আমায় যারা কষ্ট দিয়েছে, তাদের যেন অপরাধ না হয়। তারা যেন কষ্ট না পায়।' যে সাধু সে প্রহ্লাদের মতই সর্বভূতে হিতকামী।

তেমনি একজন সাধু এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। অক্ষতপুণ্যলেশ। অপঙ্কতোয় অচ্ছোদ সরোবর। তাঁর নাম রামকৃষ্ণ পরমহংস। অভয়প্রদ আশ্রয়কেতন। তাঁকে দেখবে চলো দলে-দলে। ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিতে লাগল কেশব সেন। সাধারণ বক্তৃতামঞ্চ থেকে, এমন কি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসে। স্বশান্তরূপ স্বরূপানন্দ রামকৃষ্ণ। একেবারে বালকস্বভাব। ঘরের কাছে এই অনন্ত ধনের খবর না নিয়ে যাবে তোমরা বিদেশের বিপণিতে ? শুধু রসনা নয়, তেজস্বিনী লেখনী চালালে কেশব। সুলভ সমাচার, সানডে মিরর আর থিইস্টিক কোয়ার্টার্লি রিভিয়ুতে লিখতে লাগল।

ওরে আর কেউ নয়, কেশব সেন বলছে, কেশব সেন লিখছে। যেমন তপ্ত ভাষা তেমনি দীপ্ত লেখা। এ কি ফেলা চলে ? দেখছিস, বলতে-বলতে কেশবের গৌর আনন কেমন আরক্ত হয়ে উঠছে। একেই বুঝি বলে প্রত্যয়প্রতিভা। কি রে, কি বলছিস, যাবি একবার দক্ষিণেশ্বর ? স্বচক্ষে দেখে আসবি ?

আর, ওদিকে রামকৃষ্ণ ডাকছে আকুল কণ্ঠে : ওরে, তোরা কোথায় ? তোদের ছাড়া আমি যে থাকতে পারছি না। আকাঠের মাঝে কোথায় তোরা সব চন্দন তরু ? ধীরতার মাঝে বেগ, জড়তার মাঝে বল, ভীরুতার মাঝে বীর্য—কোথায় তোরা সব সৈনিক সন্ন্যাসী। চলে আয় ! বন-জঙ্গল ভেদ করে নদীনালা সাঁতরে তীরবেগে বায়ুবেগে মনোবেগে চলে আয়। আমি তোদের জন্যে কত কথা কত ভাব কত ভালোবাসা নিয়ে বসে আছি। কত গান কত সুর কত নৃত্য। কত স্বাদ কত রুচি। চলে আয়, চলে আয়।

* ৫৪ *

কয়াপাটের হাটতলা। সারদাকে নিয়ে এসেছেন শ্যামাসুন্দরী। এসেছেন পিলে দাগাতে। শিবমন্দিরের অঙ্গনে বহু লোকের ভীড়। জ্বরে-জ্বরে সবাই সারা হয়ে

গেল। পিলে দাগানো লোকটিকে ঘিরে সবার কাতর ঔৎসুক্য। কার কখন ডাক পড়ে। সবাই পিলে দাগাবে। খানিকটা আগুন, লোহার শিক আর একটা কি পাতা। এই শুধু সরঞ্জাম। এতেই পিলে পালাবে দেশ ছেড়ে। আর মাথা তুলতে পাবে না। বেলা বেড়ে যাচ্ছে। আবার ফিরতে হবে বাড়ি। কত রাজ্যের পথ! শ্যামাসুন্দরী অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন।

'মেয়েকে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে আছি বাবা। যদি একটু এদিক পানে হাত দাও। মেয়ে আমার জ্বরে-জ্বরে ঝুর-ঝুর হল।'

'এই যে যাচ্ছি, মা। দেখছ তো গাহেকের ভিড়—'

'তোমার জন্যে একখানা নতুন কাপড় এনেছি। চান করে পরো। একটু জল খাও, তা-ও এনেছি তোমার জন্যে—'

লোকটি বুঝি এতক্ষণে সজাগ হল।

'কিন্তু নতুন পাতায় নতুন আগুন নাও। মেয়ে আমার গঙ্গাজলের মত শুচি।' তাই হল। পিলে দেগে দিল সারদার।

পিলে আরাম হল বটে, কিন্তু সংসারের দারিদ্র্য আর যায় না। শ্যামাসুন্দরী বাড়ুযেদের ধান ভানেন। ষোলো কুড়িতে এক আড়া। এক আড়া ধান ভেনে চার কুড়ি ধান পায়। মায়ের সঙ্গে সারদাও হাত লাগায়।

গাঁয়ে কালীপুজো হবে। বাড়ি-বাড়ি ঘুরে পুজোর চাল যোগাড় হচ্ছে। তাদের বাড়ির বরাদ্দ চাল যোগাড় করে রেখেছেন শ্যামাসুন্দরী। কিন্তু গাঁয়ের মোড়ল নব মুখুজ্যে নিলে না সে চাল। কি নিয়ে আড়াআড়ি হয়েছে কে জানে, শ্যামাসুন্দরীর পুজোর চাল ফিরিয়ে দিলে। শ্যামাসুন্দরী সমস্ত রাত কাঁদলেন। বললেন, 'কালীর জন্যে চাল করেছি, নিলে না, ফিরিয়ে দিলে? এখন এ চাল আমার কে খায়? কাকে দিই?'

কাঁদতে-কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে মাটির উপর শুয়ে পড়েছেন। রাত হয়েছে। হঠাৎ চোখ চেয়ে দেখেন দোরগোড়ায় কে এক জন সুন্দরী স্ত্রী বসে আছে চুপচাপ। বসে আছে পায়ের উপর পা দিয়ে। মুখ-হাত-পা সব লাল। প্রথম সূর্য উঠলে যেমন হয়, তেমনি অরুণ বর্ণের ঝলস দিয়েছে চার দিকে।

স্ত্রীলোকটি কাছে এসে গা চাপড়ে-চাপড়ে ওঠালেন শ্যামাসুন্দরীকে।

'তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কালীর চাল আমি খাব।'

শ্যামাসুন্দরী তো অবাক। মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শুধোলেন: 'তুমি কে?'

'ঐ যে গো—এর পরেই যার পুজো হয়। সেই আমি।'

পরদিন সারদাকে জিগগেস করলেন শ্যামাসুন্দরী: 'গায়ের রঙ লাল, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে—ও কোন ঠাকুর রে সারদা?'

'জগদ্ধাত্রী।'

'আমি জগদ্ধাত্রীর পুজো করব।'

কিন্তু ওটুকু চালে হবে না। আরো চাল লাগবে। বিশ্বাসদের থেকে দু আড়া ধান আনালেন শ্যামাসুন্দরী। ধান আনালেন তো বৃষ্টিও নামল অঝোরে। এক দিনও ফাঁক নেই, সূর্যি গিয়েছে বনবাসে। চাটাই বিছিয়ে ধান মেলে বসে আছি

কবে থেকে। শ্যামাসুন্দরী হতাশার সুর ধরলেন: 'কি করে তবে আর তোমার পুজো হবে মা ? ধানই শুকোতে পাল্লুম নি, তবে চাল করব কি করে ?'

চার দিকে বৃষ্টি, শ্যামাসুন্দরীর ধানের চাটাইয়ে রোদ। জগদ্ধাত্রীর আশীর্বাদ ! কাঠের আগুনে সেঁকে মূর্তি শুকিয়ে রঙ দেওয়া হল। পুজোর পর প্রতিমা বিসর্জনের সময় শ্যামাসুন্দরী মূর্তির কানে বলে দিলেন, 'মা জগাই, আবার আর বছর এসো। আমি বছর ভোর তোমার সব যোগাড় করে রাখব।'

জগদ্ধাত্রীর পুজো করেই শ্রী ফিরল সংসারের।

মেয়েকে শ্যামাসুন্দরী বললেন, 'তুমি কিছু দিও, আমার জগাইয়ের পুজো হবে।'

সারদা থমকে গেল। বললে, 'আমি আবার কি দেব ! ও সব ল্যাঠা আমি পারব নি। একবার পুজো তো হল, আবার কেন ?'

রাত্রে স্বপ্ন দেখল সারদা। তিন জন কে-কে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। বলছে, 'আমরা কি তবে যাব ?'

'কে তোমরা ?'

'আমি জগদ্ধাত্রী—আর এরা জয়া-বিজয়া।'

'না মা, তোমাদের যেতে বলিনি, কোথা যাবে তোমরা ? তোমরা থাকো, যেও না।' গলায় আঁচল দিয়ে জগদ্ধাত্রীর পায়ে গড় করল সারদা।

সারদা আর কি দেবে ! শ্রম দেবে, সেবা দেবে। অন্তরের নিষ্ঠা দেবে।

জগদ্ধাত্রীর পুজোর সময় সারদা গিয়ে তাই বাসন মেজে দেয়।

'সেই থেকে বরাবর জগদ্ধাত্রীর পুজোতে জয়রামবাটি যাই—বাসন মাজতে হয় কিনা।' বললেন শ্রীমা, 'শেষকালে যোগীন সব কাঠের বাসন করে দিলে। বললে, মা, তোমাকে আর যেতে হবে না বাসন মাজতে।'

প্রতিমা বিসর্জনের সময় জগদ্ধাত্রীর কানের গয়না একটি খুলে রাখলে।

'সেইটেই মনে করে মা আবার আসবেন পরের বছর।' বললেন শ্রীমা।

মা আমাদের রাজরাজেশ্বরী।

তাঁর ফিরে আসতে আভরণের আকর্ষণ লাগে না। তিনি যে দীন-দরিদ্রের মা। শুধু একটি কাতর 'মা' ডাক শুনলেই তিনি চলে আসেন। ডাকও লাগে না, অন্তরে আকুলতা থাকলেই হল। প্রার্থনার চেয়েও বড় হচ্ছে আকুলতা। মুখরের চেয়েও মৌন। মুখে বললেই শুনবেন, আর মনে বললে শুনবেন না, মা কি আমাদের বধির ? মা আমাদের অমৃতভাষিণী অন্নপূর্ণা। 'অচক্ষু সর্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান !' কোনো ভয় নেই। মা সর্বতন্ত্রেশ্বরী শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী।

* ৫৫ *

তৃতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছে সারদা। যাচ্ছে পদব্রজে। সঙ্গে ভুষণ মণ্ডলের মা ও আরো ক'জন বর্ষীয়সী মহিলা। আর যাচ্ছে লক্ষ্মী, আর তার ভাই শিবরাম।

কামারপুকুর থেকে আরামবাগ—আট মাইলের ধাক্কা। আরামবাগ পেরিয়েই তেলোভেলোর মাঠ। সে মাঠ পেরিয়ে তারকেশ্বর। তারপরে আবার আরেক মাঠ—কৈকলার মাঠ। কৈকলার মাঠ পেরিয়ে বৈদ্যবাটি। বৈদ্যবাটি থেকে গঙ্গা পেরিয়ে দক্ষিণেশ্বর।

তেলোভেলো আর কৈকলা এই দুই মাঠে ডাকাতের আস্তানা। আর ঐ মাঠ ছাড়াও পথ নেই। পথচারীদের উপর কখন যে হামলা হবে তা ডাকাতে-কালীই বলতে পারেন। তেলো আর ভেলো, পাশাপাশি দুই গ্রাম, মাঝখানের মাঠে এক ভীমদর্শনা করালবদনা কালীমূর্তি। ডাকাতে-কালী। দস্যুদের আরাধনীয়া। ধান্যদা। ধনদায়িনী। ডাক-নাম তেলোভেলোর ডাকাতে-কালী। ভূতপ্রমথসেবিকা ঘোরচণ্ডী। রণরামা।

শুধু লুণ্ঠন নয়, চক্ষের পলকে খুন করে ফেলা, লাশ লোপাট করে দেওয়া। যাকে বলে গায়েবী খুন। ডাকাতের সে লাঠি বজ্রের চেয়েও নৃশংস। টাকা কড়ি যা আছে খুলে দিচ্ছি ঝুলি ঝেড়ে—এটুকু প্রস্তুত হবারও সময় দেয় না। আগে লাঠি, শেষে লুঠ। কাড়ো আর মারো নয়, মারো আর কাড়ো। এর থেকে একমাত্র উপায় হচ্ছে দল পাকিয়ে পথ হাঁটা। দল দেখে ডাকাতেরা যদি ভয় পায়। দল থাকলে পথচারীদের অন্তত সাহস বাড়ে।

সন্ধের বেশ আগেই পৌঁচেছে আরামবাগ। চলতে-চলতে সারদার পা দুখানি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রাতটা আরামবাগে কোথাও বিশ্রাম করলে হয়! কিন্তু সঙ্গীরা নারাজ। তারা বলে, আঁধার লাগবার আগেই বেলাবেলি তেলোভেলোর মাঠ পেরিয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এখনো দিব্যি দিন আছে, সহজেই পেরিয়ে যেতে পারব। মিছিমিছি এক রাত নষ্ট করি কেন? পথক্লান্তির কথা কাউকেও বললে না সারদা। তোমরা যখন চলেছ, আমিও চলি তোমাদের পিছে-পিছে। কেবলই পিছিয়ে পড়ছে থেকে-থেকে। পা টেনে-টেনে তবু চলে এসেছে চার মাইল। কিন্তু তার সঙ্গীরা কোথায়? সঙ্গীরা থেমে পড়ছে বারে-বারে। থেমে পড়ছে যাতে পা চালিয়ে এসে সারদা তাদের সঙ্গ ধরতে পারে। কিছুতেই তাড়াতাড়ি চলতে পারছে না মেয়েটা।

'কাঁহাতক তোমার জন্যে এমনি করে দাঁড়াই বলো তো!' বিরক্তি জানায় সঙ্গীরা: 'বেলা ঢলে পড়ল, এখন একটু তাড়াতাড়ি পা চালাও।'

সাধ্যমত পদক্ষেপ দ্রুত করে সারদা। কিন্তু তার সাধ্য কি, সঙ্গীদের সঙ্গে তাল রাখে। আবার সে পিছিয়ে পড়েছে। বিশ-পঁচিশ হাত নয়, প্রায় সিকি মাইল।

'এমনি করে চললে কি করে চলবে?' আবার ধমকে ওঠে সঙ্গীরা: 'তোমার জন্যে কি সবাই শেষকালে ডাকাতের হাতে মারা পড়ব? পশ্চিমের আকাশখানা একবার দেখছ?'

সন্ধ্যার শেষ লালিমাটুকু মিলিয়ে যায় বুঝি।

সত্যিই তো! তার একলার অক্ষমতার জন্যে সবাই কেন বিপন্ন হবে? ওদের কি দোষ! ওদের দেহে যখন শক্তি আছে তখন ওরা যাবেই তো আগ বাড়িয়ে। নিজের সুবিধের জন্যে ওদের সে অসুবিধে ঘটাবে কেন?

'তোমরা আমার জন্যে আর দাঁড়িয়ো না—চলে যাও সোজাসুজি।' সংগশূন্যতার ভয়ে এতটুকু কাতর নয় সারদা। নেই এতটুকু অসহায়তার সুর। বললে, 'একেবারে তারকেশ্বরের চটিতে গিয়ে উঠো। আমি সেখানে গিয়েই ধরব তোমাদের। আমার শরীর আর বইছে না—আমি যাচ্ছি আস্তে-আস্তে।'

'যত শিগগির পারিস বেরিয়ে আয় তাড়াতাড়ি। চার দিক আঁধার হয়ে এল। মাঠের বড় দুর্নাম—'

পিছনে ফিরে তাকিয়েও দেখল না। সারদাকে ফেলেই দ্রুতবেগে এগিয়ে গেল সংগীরা। মিলিয়ে গেল চোখের বাইরে। জনমনুষ্যহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সারদা একা। শরীরে আর দিচ্ছে না, তবু কষ্টে পা টেনে-টেনে চলেছে। অন্ধকারে পথ-ঘাটের ইশারা পাচ্ছে না। কোথায় যেতে কোথায় চলে আসছে কে জানে।

'কে যায়!' কে-একজন বাঘের গলায় হুমকে উঠল।

প্রকাণ্ড একটা কালো লোক চোখের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দৈত্যের মতন চেহারা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, হাতে রুপোর বালা, কাঁধে মস্ত লাঠি।

'কে যায়!'

'তোমার মেয়ে গো—সারদা।'

নির্জন মাঠের মধ্যে, সন্ধ্যার অন্ধকারে, আমার মেয়ে! লোকটার কানে কেমন যেন অদ্ভুত শোনাল। এত বছর ধরে ডাকাতি করছি, কই, এমন কথা তো কখনো শুনিনি! সারদার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল ডাকাত। স্থির প্রতিমার মতই দাঁড়িয়ে রইল সারদা। প্রতিমার মতই স্থির নেত্রে।

'কে তুমি? এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'বাবা, দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছিলাম। চলতে পাচ্ছিলাম না, তাই আমার সংগীরা আমাকে ফেলে গিয়েছে। অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

'দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছ কেন?'

'দক্ষিণেশ্বরে যে তোমার জামাই থাকে। রানি রাসমণির কালীবাড়ি আছে না? সেই কালীবাড়িতে তিনি থাকেন। তাঁর কাছেই আমি যাচ্ছি।'

কেমন যেন মধুময় লাগল কণ্ঠস্বর। বাগদি ডাকাতের বুকের ভিতরটা আনচান করে উঠল। শুধু ডাকাতের নয়, সেই কণ্ঠস্বরের আমেজ এসে লাগল যেন আরো এক জনের কানে। কাছেই কোথায় ছিল, ছুটে এল সে ব্যাকুল পায়ে। সারদা তো অবাক, এ যে দেখি স্ত্রীলোক। দেখেই বুঝল, বাগদি-ডাকাতের স্ত্রী।

তার হাত দুখানা চেপে ধরল সারদা। যেন অকূলে কূল পেল।

'তুমি কে গা?' ডাকাত-পত্নীর চোখে স্নেহকরুণ জিজ্ঞাসা।

'তোমার মেয়ে সারদা। চিনতে পাচ্ছ না? যাচ্ছিলুম দক্ষিণেশ্বরে, তোমার জামাইয়ের কাছে। সংগীরা পিছে ফেলে আগে-আগে পালিয়ে গিয়েছে। ফাঁকা নির্জন মাঠে অন্ধকারের মধ্যে কী বিপদেই পড়েছিলুম, মা। তোমাদের পেয়ে ধড়ে প্রাণ এল। তোমাদের না পেলে কী সর্বনাশ যে হত কে জানে।'

প্রাণ জুড়িয়ে গেল। কঠিন পাথর ফেটে বেরুল সুধা-ধারা। দয়াহীন মরুভূমির আকাশে নম্র মেঘের মাধুর্য।

'মেয়ে আমার নেতিয়ে পড়েছে যে গো। কিছু ওকে খেতে দাও আগে।' ডাকাত-বউ বললে ডাকাতকে।

'না, আমি এগোই। তারকেশ্বরে গিয়ে ধরব আমার সংগীদের।'

অসম্ভব, পথের মাঝেই পড়বে টাল খেয়ে। বাপ হয়ে মেয়েকে কেউ পাঠাতে পারে না এ বিপদের মুখে। এ ঘোর অন্ধকারে, জনশূন্য মাঠের মধ্য দিয়ে। তার শরীরের এই অবসন্ন অবস্থায়। তার চেয়ে চলো, কাছে-পিঠে যে দোকান আছে, সেখানে তোমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করি। রাত ফুরুলে খোঁজা যাবে ফের পথের নিশানা। তোমার সংগীদের উদ্দেশ।

তেলোভেলোর ছোট একটি মুদি-দোকান। সেখানেই নিয়ে গেল সারদাকে। নিজের হাতে শয্যা রচনা করল ডাকাত-বউ। ডাকাত নিজে গিয়ে মুড়ি-মুড়কি কিনে আনল। বাপের দেওয়া খাবার তৃপ্তি করে খেল সারদা। মায়ের করা বিছানায় শুলে আরাম করে। ছোট মেয়েকে মা যেমন করে ঘুম পাড়ায় তেমনি করে ডাকাত-বউ ঘুম পাড়াল সারদাকে। আর সারা রাত লাঠি-হাতে দুয়ার আগলে দাঁড়িয়ে রইল ডাকাত-বাবা।

কোথায় সব কিছু লুটপাট করে, চাই কি গুম খুন করে ফেলবে—তা নয়, নিদ্রাহীন দীর্ঘ রাত্রি দুয়ারে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে!

উপায় কি! এ যে তার মেয়ে! যে মেয়ে সে-ই আবার মা!

ভোরে ঘুম ভাঙতেই মেয়েকে নিয়ে এগোলো তারকেশ্বরের পথে। ক্ষেতে কড়াই-শুঁটি ফলেছে। তাই ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ডাকাত-বউ দিতে লাগল সারদাকে। বললে, 'তোর খিদে পেয়েছে, খা।' মুখ ধোয়া হয়নি, তবু ছোট মেয়ের মত তাই খেতে লাগল সারদা। স্বাদে-অপূর্ব মাতৃস্নেহ। চার দণ্ড বেলা হয়েছে, পৌঁছুল তারকেশ্বর।

'আমার মেয়ে কাল সারা রাত কিছু খায়নি। যাও শিগগির-শিগগির বাবাকে পুজো দিয়ে বাজার করে নিয়ে এসো। মাছ-তরকারি দিয়ে মেয়েকে ভালো করে খাওয়াতে হবে।' ডাকাত-বউ তাগিদ দিল স্বামীকে।

বাগদি-ডাকাত বাজার করতে ছুটল। তার মেয়ে শ্বশুর-ঘরে যাচ্ছে। যাবার আগে বাপের বাড়িতে আজ তার শেষ খাওয়া।

সংগীদের সন্ধান পেল সারদা। 'ওমা, তুই বেঁচে আছিস? আসতে পেরেছিস পথ চিনে? কোথায় ছিলি তুই সারা রাত?'

বাবা-মা'র কাছে ছিলাম। ছিলাম নির্ভয়ের আশ্রমে, নিশ্চিন্তের ক্রোড়নীড়ে। বাৎসল্যরসের সরসীতে। খাওয়া-দাওয়ার পর বিদায়ের পালা এল। যাত্রীদল এবার বৈদ্যবাটির পথ ধরবে। বাগদি বাপ-মা কাঁদতে লাগল অঝোরে। মেয়ে সারদাও নিজেকে সামলাতে পারল না। সেও কান্নায় ভেঙে পড়ল। এক রাতের পরিচয়ে এক জন্মের সম্পর্ক। কণ্ঠের একটি মাতৃ-সম্বোধনেই অনন্ত জীবনের বন্ধন। এমন মেয়ের বিচ্ছেদ সয়ে কি করে বাঁচবে তারা? কাঁদতে-কাঁদতে অনেক দূর পর্যন্ত এগোল বাগদি-বাগদিনী। বাগদিনী কড়াইশুঁটি ছিঁড়ে মেয়ের আঁচলে বেঁধে দিল যত্ন করে। বললে, 'মা সারু, রাতে যখন মুড়ি খাবি, তখন এগুলো দিয়ে খাস।' বলতে-বলতে নিজের আঁচলে চোখ চেপে ধরল।

বাগদি বললে, 'যদি পায়ের বোঝা স্ত্রী না সঙ্গে থাকত, সোজা তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতাম। দেখে আসতাম জামাইকে।'

'কিন্তু বলো দক্ষিণেশ্বরে তুমি যাবে।' সারদা পীড়াপীড়ি করতে লাগল। রাজী করাল ডাকাত-বাবাকে। মাঝে-মাঝে গিয়ে মেয়েকে না দেখে এসে কি সে থাকতে পারবে? মা কি মেয়েকে পাঠিয়ে দেবে না তার নিজের হাতে গড়া মোয়া-নাড়ু?

পথ ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ডান দিকের রাস্তায় বাবা আর মা চলে গেল, সারদা আর সঙ্গীরা চলল বাঁ দিকে। যত দূর দেখা যায় বাবা আর মা ফিরে-ফিরে তাকায় আর কাঁদে। সারদাও থেকে-থেকে তাকায় পিছন ফিরে আর আঁচলে চোখ মোছে। ডাকাতের ছদ্মবেশে কে এরা বাগদি-বাগদিনী?

জানিস আমরা কী দেখলুম? গাঁয়ে ফিরে এসে বলতে লাগল বাগদি-দম্পতি। দেখলুম, স্বয়ং কালী এসে দাঁড়িয়েছেন। যে কালীর পুজো করি সেই কালী।

'বলো কি গো? দেখলে? ঠিক তাই দেখলে!'

সত্যি-সত্যিই দেখলুম। কিন্তু বেশিক্ষণ দেখি এমন সাধ্য কি। আমরা যে পাপী। আমরা পাপী বলে সে রূপ গোপন করে ফেললে। সারাক্ষণ দেখতে দিলে না।

চকিতে যখন একবার দেখেছ তখন পলকেই পাপ চলে গিয়েছে। চকিতের দেখাই অনন্ত কালের দেখা। যা চকিত তাই চিরকালিক।

* ৫৬ *

কেশবের ডাকে ইয়ং-বেঙ্গলে সাড়া পড়ে গেল। পল্লব-প্রফুল্ল বসন্তের শিহরণ জাগল অরণ্যে। কিন্তু যার ডাকে এই অবস্থা, তার নিজের অবস্থা কি!

জয়গোপাল সেনের বাগানে রামকৃষ্ণ লালপেড়ে কাপড় পরে গিয়েছিল।

কেশব বললে, 'আজ বড় যে রঙ। লালপাড়ের বাহার!'

রামকৃষ্ণ বললে, 'কেশবের মন ভোলাতে হবে, তাই বাহার দিয়ে এসেছি।'

রঙ লাগল কেশবের মনে। রসে ডুবে ভাসতে লাগল ভাবের জোয়ারে। হয়ে দাঁড়াল সে রামকৃষ্ণের মনের মানুষ।

'মনের মানুষ হয় যে জনা
ও তার নয়নেতে যায় গো চেনা।
সে দু-এক জনা।
ভাবে ভাসে রসে ডোবে
ও তার উজান পথে আনাগোনা।'

কিন্তু গোড়ার দিকে রাজসিকতার ভাবটা একটু সজাগ ছিল কেশবের। কেশবের কলুটোলার বাড়িতে গিয়েছে রামকৃষ্ণ, সঙ্গে হৃদয়। টেবিলের কাছে চেয়ারে বসে

কি-সব লিখছে কেশব। যে ঘরে বসে লিখছে সেই ঘরে এনেই বসাল রামকৃষ্ণকে। কিন্তু কেশবের চেয়ার ছেড়ে ওঠবার নাম নেই। একমনে লিখেই চলেছে। অনেক পরে লেখা শেষ করে চেয়ার ছেড়ে নেমে বসল। নেমে বসল বটে, কিন্তু রামকৃষ্ণকে একটা নমস্কার পর্যন্ত করলে না।

নমস্কার না করাটাই বুঝি সে যুগের জ্ঞানী-গুণীদের শালীনতা।

কিন্তু কেশব যখন এসেছে দক্ষিণেশ্বরে, রামকৃষ্ণ তাকে আনত হয়ে প্রণাম করলে। একবার নয়, যতবার এসেছে ততবার। যখন যে দলবল নিয়ে এসেছে, সবাইকে। তখন তারা আর করে কি। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে শিখলে। কঠিনকে নম্র করে দিলে রামকৃষ্ণ। অভিজাতকে নিরভিমান। রামকৃষ্ণের সমস্ত সাধনাই এই সহজের সাধনা। নিকটের সাধনা। নিকটে পাবার সহজ সাধনা।

বললে, 'যাঁকে তোমরা ব্রহ্ম বলো তাঁকেই আমি মা বলি। মা বড় মধুর নাম।'

আমি ঈশ্বর বুঝি না। আমি আমার মাকে বুঝি, মাকে ডাকি। আর কে আছে না আছে কে জানে, আমি আছি আর আমার মা আছে। ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের আমি তত্ত্ব করি আমার সাধ্য কি, আমার মা আছে এই আমার পরম ঐশ্বর্য।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে বেদীতে বসে উপাসনা করছে। কিন্তু ঈশ্বরকে ডাকছে 'মা' 'মা' বলে।

'তুমি তাঁকে "মা" "মা" বলে প্রার্থনা করছিলে। এ খুব ভালো। এ খুব ভালো।' বিজয়কৃষ্ণকে বললে রামকৃষ্ণ। 'কথায় বলে বাপের চেয়ে মায়ের টান বেশি। মায়ের উপর জোর চলে, বাপের উপর চলে না। ত্রৈলোক্যের মায়ের জমিদারি থেকে গাড়ি-গাড়ি ধন আসছিল, সংগে কত লাল-পাগড়িওয়ালা লাঠি-হাতে দারোয়ান। ত্রৈলোক্য রাস্তায় লোকজন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, জোর করে সব ধন কেড়ে নিলে। মায়ের ধনের উপর খুব জোর চলে। বলে নাকি ছেলের নামে মা'র তেমন নালিশ চলে না।'

> 'জানাইব কেমন ছেলে
> মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে,
> যখন গুরুদত্ত দস্তাবেজ
> গুজরাইব মিছিলকালে।
> মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা,
> ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে।
> আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায়
> শান্ত করে লবে কোলে॥'

মা কতক্ষণ মামলা চালাবে? কতক্ষণ মুখ ভার করে থাকবে? কখন নিজেই এক সময় বাহু মেলে নেবে কোলের মধ্যে।

আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরকে আমরা পিতা বলে কল্পনা করেছি। পিতা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা, লালনকর্তা, রক্ষণকর্তা। পিতার মধ্যে যে ভাবটি প্রকাশিত তা প্রতাপের ভাব, প্রভুত্বের ভাব। তিনি শুধু আমাদের পালন করেন না, চালনা করেন, পোষণ করেন না, শাসন করেন। তিনি জগৎসংসারের সর্বময় বিধাতা। একচ্ছত্র

একাধিপতি। বেদে বলেছে, পিতা নোঽসি। তুমি আমাদের পিতা হয়ে আছ। বলেছে, পিতা নো বোধি। তুমি যে আমাদের পিতা এই বোধের আলোকে আমাদের দু-চোখ উদ্ভাসিত হোক। এই জানা আর অনুভব করার মধ্যে পিতার সর্বসাম্রাজ্যময় বিরাটত্বকেই কল্পনা করা হয়েছে। যখনই বলেছে, শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ, তখন আমরা যাঁর পুত্র সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষকে দিব্যধামবাসী একনায়ক সম্রাট বলেই মেনে নিয়েছি। সমস্ত অন্ধকারের পরপারে সেই পিতা ভাস্বর ভাস্কর। এ ভাবটির মধ্যে যতই মহিমা থাক, কিছুটা যেন ভয় আছে। সম্ভ্রম তো আছেই, হয়তো বা রয়েছে একটু নিষ্ঠুরতা। পিতা আমাদের যতই প্রিয় হোন, তাঁর সঙ্গে কোথায় যেন রয়েছে একটু ব্যবধান। কোথায় যেন একটু আড়াল বাঁচিয়ে চলছি। যেন তাঁর চোখে চোখ রেখে মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি না, একটু পাশ কাটিয়ে পালিয়ে বেড়াই। যদি বা কখনো কাছে আসি সম্ভ্রমসূচক দূরত্ব বজায় রাখি। কখনো যদি অপরাধ করি, তবে তো আর কথাই নেই ; ভয় পাই, শাসনে যেন উদ্যতবজ্র হয়ে আছেন। কিন্তু মা—মা আমাদের কাঙালিনী। আমরা কাঙাল বলে মা-ও কাঙালিনী সেজেছেন। মা'র সঙ্গে আমাদের তন্তুমাত্র ব্যবধান নেই, নেই লেশমাত্র অন্তরাল। আমরা মা'র অঙ্গের অঙ্গ বলে তাঁর সঙ্গে আমাদের অন্তহীন অন্তরঙ্গতা। যতই অকিঞ্চন হই, আমরা মার অঞ্চলের নিধি। যতই ধুলোমাটি মাখি, মা'র অঞ্চলে আমাদের জন্যে অবারিত মার্জনা। যদি অপরাধ করি, মা-ও নিজেকে অপরাধী মনে করেন। সন্তানের দুঃখে তাঁর দুঃখ।

কোনো কুণ্ঠা নেই, লজ্জা নেই, শুধু ক্ষমা শুধু স্নেহ। শুধু পুষ্টি দেন না তুষ্টি দেন, শুধু পিপাসা মেটান না, নিয়ে আসেন পরিতৃপ্তির আস্বাদ। মা আমাদের মূর্তিমতী সরলতা, মা আমাদের অভয়ময়ী। পুত্র যত বৃদ্ধই হোক, মা'র কাছে সে শিশু, অর্বাচীন অপোগণ্ড শিশু। আর মা যত বৃদ্ধই হোক, ছেলের কাছে সে সনাতনী মা। পিতার জন্যে আমাদের শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম, আনুগত্য, কিন্তু মা'র জন্যে আমাদের ভালোবাসা, অবিরল অফুরন্ত ভালোবাসা। পিতার থেকে আমরা দূরে-দূরে থাকি, কিন্তু মা আমাদের একেবারে কোলের মধ্যে টেনে নেন। আর্ত হই বঞ্চিত হই পীড়িত হই পাপলিপ্ত হই, অকূলে মা'র কোল আছেই। পিতা আমাদের রাজচক্রবর্তী, মা আমাদের বিশ্বকল্যাণী।

দুর্গাচরণ নাগ ঠাকুরের নিদারুণ ভক্ত। অসুখের সময় আমলকী খাবার ইচ্ছে হয়েছিল ঠাকুরের। এমন সময় আমলকী কি কোথাও পাওয়া যায়? জিগগেস করলেন ঠাকুর। তখন শ্রাবণ মাস, আমলকীর পক্ষে অকাল। কিন্তু ঠাকুরের যখন ইচ্ছে হয়েছে, নিশ্চয়ই কোথাও পাওয়া যাবে আমলকী। দুর্গাচরণ বেরিয়ে পড়ল আমলকী খুঁজতে। বনে-বাগানে ঘুরে-ঘুরে তিন দিন পরে ঠিক আমলকী নিয়ে এল। সেই দুর্গাচরণকে শ্রীশ্রীমা একখানি কাপড় দিয়েছেন। সেই কাপড় না পরে মাথায় বেঁধে রাখে দুর্গাচরণ। আর আনন্দে ধ্বনি করে : 'বাপের চেয়ে মা দয়াল! বাপের চেয়ে মা দয়াল!'

শ্রীশ্রীমার তখন অসুখ। খুব যন্ত্রণা পাচ্ছেন। এক ভক্ত বললে, 'মা, আপনি এত কষ্ট পাচ্ছেন, কষ্টটা আমায় দিন না!'

মা চমকে উঠলেন। 'বল কি! ছেলে! মা কখনো ছেলেকে কষ্ট দিতে পারে? ছেলের কষ্ট হলে যে মার আরো বেশি কষ্ট।'

বিভূতি বলে একটি ছেলে আসত শ্রীমা'র কাছে। এলেই পেট ভরে খেয়ে যেত। এক দিন তার খাওয়া দেখে তার মা বললে, 'বিভূতি তো এখানে বেশ খায়। বাড়িতে মাত্র এত ক'টি খায়!'

অমনি শ্রীমা বললেন, 'আমার ছেলেকে তুমি খুঁড়ো না। আমি ভিখারীর রমণী, আমার ছেলেদিগে আমি যা খেতে দি, ছেলেরা আমার তাই আদর করে খায়।' চন্দ্র দত্ত উদ্বোধন-আফিসের কর্মচারী। এক দিন শ্রীমাকে বললে, 'মা, আপনাকে কত দূর দেশ থেকে কত লোক দর্শন করতে আসে। আপনি তো ঘরের ঠাকুরমার মত পান সাজেন, সুপুরি কাটেন, কখনো বা ঘর ঝাঁট দেন। আপনাকে দেখে আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না।'

মা বললেন, 'চন্দ্র, তুমি বেশ আছ। আমাকে তোমার বোঝবার দরকার নেই।'

স্বভাবে সহজ, করুণায় কোমল, স্নেহে সীমাহীন—এই আমাদের মাতৃপ্রতিমা। মাকে আমাদের বোঝবার দরকার নেই, ডাকবার দরকার। ডাক শুনে মা যখন ছুটে এসে কোলে নেবেন তখন সেই স্পর্শেই বুঝতে পারব, মা এসেছে রে, মা এসেছে।

যিনি অবাঙমনসোগোচর, অগম্য অপার, সমস্ত রুদ্ধ অন্ধকারের ওপারে যাঁর বাসা, তাঁকে নিকটতম, নিবিড়তম করে পাবার সাধনায় রামকৃষ্ণ নতুন মন্ত্র আবিষ্কার করলেন। ওঁ-এর মত এ মন্ত্রও একাক্ষর মন্ত্র। এ মন্ত্রের কথা হচ্ছে—'মা'। এ মন্ত্রের আকর্ষণে যা অত্যন্ত দূর তা নিমেষে কাছে চলে এল, যা অত্যন্ত দুরূহ তা হয়ে দাঁড়াল জলের মত সোজা। যা ছিল পর্বতশৃঙ্গে তাই বিগলিতধারে নেমে এল নির্ঝরিণী হয়ে। যা ঐশ্বর্যশালিনী শক্তি, তাই দেখা দিল দয়ারূপে ক্ষমারূপে, অমিয়ময়ী প্রশান্তিরূপে।

একেই বলে এক চালে মাৎ। এক বাণে জগজ্জয়। এক অক্ষরে পরা সিদ্ধি।

রামকৃষ্ণের সবই সহজ। তত্ত্ব সহজ, পদ্ধতিও সহজ। মানুষটি যেমন সহজ, মন্ত্রটিও তেমনি। একেই বলে তরঙ্গহীন স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপসমুদ্র। কিংবা, সহজ করে বলে, সহজানন্দ।

বিজয়কৃষ্ণকে বলে রামকৃষ্ণ, 'কারণের বোতল একজন এনেছিল, আমি ছুঁতে গিয়ে আর পারলুম না।'

বিজয় বললে, 'আহা!'

সহজানন্দ হলে অমনি নেশা হয়ে যায়। মদ খেতে হয় না। মা'র চরণামৃত দেখেই আমার নেশা হয়ে যায়। ঠিক যেমন পাঁচ বোতল মদ খেলে হয়।

কেশবকেও তেমনি সহজ করে দিল রামকৃষ্ণ। কেশব 'মা' ধরল। ঈশ্বরকে ডাকতে লাগল 'মা' বলে। ঈশ্বরকে 'মা' বলে ডাকে আর কেশবের দুই নয়নে ধারা নামে।

এ মাতৃসাধনার গোড়াপত্তন রামপ্রসাদ। তার পর তাতে সৌধ তুলল কমলাকান্ত। গরানহাটার দুর্গাচরণ মিত্তিরের বাড়িতে রামপ্রসাদ মুহুরির কাজ করে আর হিসেবের খাতায় দুর্গানাম কালীনাম লেখে। সমস্ত হিসেব বেহিসেব হয়ে যায়। পদে-পদে ত্রুটির কাঁটা খোঁচা মারে।

নালিশ গেল মনিবের কাছে। মনিব খাতা তলব করলেন। দেখলেন আষ্টেপৃষ্ঠে অঙ্কের আঁচড় নেই, কেবল দুর্গানাম কালীনাম। কেবল মাতৃসংগীত।

কি না-জানি আছে এই গানে! মনিব পড়তে লাগলেন। লোকটার আস্পর্ধা বটে। সামান্য মুহুরি হয়ে তবিলদারি চাইছে!

'আমায় দাও মা তবিলদারি,
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।
আমি বিনা মাহিনার চাকর,
কেবল চরণ-ধুলোর অধিকারী॥'

মনিব ছুটি দিয়ে দিলেন রামপ্রসাদকে, বললেন, 'তুমি বাড়ি যাও। এখানে যেমনি ত্রিশ টাকা মাইনে পেতে তেমনি পাবে তুমি বাড়ি বসে। তুমি মা'র নামের গান গাও।'

ছাড়া পেয়ে গেল রামপ্রসাদ। কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ডেকে পাঠালেন, রাজসভায় চাকরি দেবেন। আবার চাকরি! চরণ-ধুলোর জন্যে এই তো দিব্যি চাকর আছি বিনি-মাইনের। হলই বা না রাজসভা, মা'র শোভার কাছে আবার রাজসভা কি! মহারাজের অযাচিত দান প্রত্যাখ্যান করলে। এবার না কোপে পড়ে মহারাজার। মহারাজার কি মতি হল, রামপ্রসাদের বৈরাগ্য দেখে একশো বিঘে নিষ্কর জমি দান করে বসলেন।

'মন তুই কাঙালী কিসে।' রামপ্রসাদ গান ধরল: 'অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে-দেশে। ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি, দেখিস রে তুই বসে-বসে।'

মাকে নিয়ে সাধনায় বসল রামপ্রসাদ। কারু সাধনা জ্ঞানে, রামপ্রসাদের গানে। আর-সব সাধকেরা জ্ঞানানন্দ, রামপ্রসাদ গানানন্দ। মাকে নিয়ে তার নানান খেলা, নানান লুকোচুরি। কত নালিশ-আপত্তি, কত, অভিমান-অভিযোগ! কখনো ঝগড়া, কখনো মামলা-মোকদ্দমা, কখনো বা রফা-নিষ্পত্তি। কখনো রাগ, কখনো কান্না, কখনো অহঙ্কার, কখনো স্রেফ গায়ের জোর। সাধ্য নেই মা আর বসে থাকেন লুকিয়ে। কালী বটে, কিন্তু কালা তো নন। ডাকের মত ডাক হলে শুনতে পান ঠিকঠাক। কান্না শুনে না আসেন, আসবেন ধমক খেয়ে। ভালো-মানুষের মত না আসেন, আসবেন ভয়ে-ভয়ে।

'এবার কালী তোমায় খাব।
গণ্ড যোগে জনম নিলে
সে হয় যে মা-খেকো ছেলে,

এবার তুমি খাও কি আমি খাই
দুটার একটা করে যাব।
হাতে কালী মুখে কালী
সর্বাঙ্গে কালী মাখিব,
যখন আসবে শমন বাঁধবে কষে
সেই কালী তার মুখে দিব ॥'

মাকে লজ্জা দিতেও ছাড়ছে না রামপ্রসাদ! বিদ্রূপ করছে। অনুযোগ করছে।

'কে বলে তোরে দয়াময়ী।
কারো দুধেতে বাতাসা
আর আমার এমনি দশা
শাকে অন্ন মেলে কই ॥
কারো দিলে ধন-জন মা,
হস্তী অশ্ব রথচয়।
ওগো তারা কি তোর বাপের ঠাকুর
আমি কি তোর কেহ নই ॥'

কিংবা— 'বড়াই করো কিসে গো মা,
বড়াই করো কিসে।
আপনি ক্ষ্যাপা পতি ক্ষ্যাপা
থাকো ক্ষ্যাপা সহবাসে।
তোমার আদি মূল সকলি জানি
দাতা তুমি কোন পুরুষে ॥
মাগী-মিন্সে ঝগড়া করে
রইতে নার আপন বাসে।
মা গো তোমার ভাতার ভিক্ষা করে
ফেরে কেন দেশে দেশে ॥'

আবার বলছে— 'মা হওয়া কি মুখের কথা।
কেবল প্রসব করে হয় না মাতা।
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা ॥
দশ মাস দশ দিন যাতনা পেয়েছেন মাতা
এখন ক্ষুধার বেলায় শুধালে না
এল পুত্র গেল কোথা ॥'

শেষকালে অভিমানে ভেঙে পড়ছে রামপ্রসাদ—

'ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখো এলোকেশী।
দ্বারে দ্বারে যাব ভিক্ষা মাগি খাব
মা মলে কি তার সন্তান বাঁচে না।'

বাস্তুর পাশে ডোবা, ডোবার পাশে বাগান। সেই বাগানে রামপ্রসাদকে দেখা

দিলেন অন্নদা। দেখা না দিয়ে আর উপায় কি। এত ভাবে ডাকলে কি করে আর সরে থাকা যায়? শেষকালে কন্যা হয়ে ঘরের বেড়া বাঁধতে বসলেন। এই মাতৃসাধনা চরম হল রামকৃষ্ণে।

'মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, কমলাকান্তকে দেখা দিয়েছিস, আমায় কেন দেখা দিবি নে?'

এ আকুলতা শুধু মাকে লক্ষ্য করেই জানানো যায়। এ দাবি এ আবদার মা ছাড়া আর কে পূরণ করবে? দেখা দিবি নে? এই গলায় তবে ছুরি দেব। কোন মা ঘুমিয়ে থাকবে?

আবার বলছে, 'মা, আমি নরেন্দ্র ভবনাথ রাখাল কিছুই চাই না। কেবল তোমায় চাই। আমি মানুষ নিয়ে কি করব?'

'মা, পূজা উঠিয়েছ, সব বাসনা যেন যায় না। মা, পরমহংস তো বালক—বালকের মা চাই না? তাই তো তুমি মা, আর আমি তোমার ছেলে! মা'র ছেলে মাকে ছেড়ে কেমন করে থাকে?'

সাধ্য কি, এমন ছেলেকে মা কোলে না নেয়! রাত্রে একলা রাস্তায় কেঁদে-কেঁদে বেড়ায় রামকৃষ্ণ। আর বলে, 'মা, বিচার-বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও।'

বিচার-বিতর্ক ভেসে গেল। রইল শুধু ভক্তি আর ভালোবাসা। মাকে ভালোবাসতে পারলে আর ভাবনা নেই। আর, ভালোই যদি বাসবি, মা'র মতন আর কে আছে ভালোবাসবার?

কার্তিক-গণেশকে বললেন ভগবতী, যে আগে ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করে আসতে পারবে তাকে গলার এই রত্নহার দেব। কার্তিক তখুনি ময়ূরে চড়ে বেরিয়ে পড়ল। গণেশ শুধু মাকে একবার প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করলে। মা'র মধ্যেই তো ব্রহ্মাণ্ড। প্রসন্ন হয়ে গণেশকেই হার দিলেন ভগবতী। অনেক পরে ঘুরে এসে কার্তিকের তো চক্ষুস্থির। দাদা দিব্যি হার পরে বসে আছেন।

'মা, আমি বলবো তবে তুমি করবে—এ কথাই নয়। আচ্ছা মা, যদি না-বলতাম আমি খাবো, তা হলে কি যেমন খিদে তেমন খিদে থাকত না? তোমাকে বললেই তুমি শুনবে, আর ভিতরটা শুধু ব্যাকুল হলে তুমি শুনবে না—এ কখনো হতে পারে? তুমি যা আছ তাই আছ—তবে বলি কেন, প্রার্থনা করি কেন? ও! যেমন করাও তেমনি করি।'

এই সরলতা এই ব্যাকুলতা এই আন্তরিকতার কাছে মা কি ধরা না দিয়ে পারেন? মাতে ওতপ্রোত হয়ে আছে রামকৃষ্ণ। মা ছাড়া আর কিছু নেই জীবজগতে। মা-ই আমাদের একমাত্র মাধুরী। যিনি মানসী তিনিই আবার মানুষী। তাই যতক্ষণ গর্ভধারিণী মা আছেন ততদিন তাঁতেই জগজ্জননী আরোপ করতে হবে।

'আমি মাকে ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করতাম।' বললে রামকৃষ্ণ, 'সেই জগতের মা-ই মা হয়ে এসেছেন!'

কিন্তু যখন মা থাকবে না, কিংবা পূজা থাকবে না, তখন? তখন অন্য কথা। তখন মা'র মনোমূর্তি। তখন বিশ্বব্যাপিনী জগম্মাতা।

'মা, পুজো গেল, জপ গেল, দেখো মা যেন জড় কোরো না। সেব্য-সেবকভাবে রেখো। মা, যেন কথা কইতে পারি, যেন তোমার নাম করতে পারি—আর তোমার নামগুণ কীর্তন করব, গান করব মা। আর শরীরে একটু বল দাও, যেন আপনি একটু চলতে পারি। যেখানে তোমার কথা হচ্ছে, যেখানে তোমার ভক্তরা আছে, সেই সব জায়গায় যেতে পারি।'

শুধু গান নয়, নৃত্য করছে রামকৃষ্ণ। আমাদের নিত্যানন্দ ঠাকুর এখন নৃত্যানন্দ। মাকে কখনো আদর করছে, শাসন করছে কখনো। কখনো বিলাপ করছে, কখনো বা মুখ ভার করে থাকছে। কখনো মিনতি করছে, কখনো বা জোর ফলাচ্ছে। কখনো বা রঙ্গরসের তরঙ্গ তুলছে।

'কে মা এলি গো গিরে দাদার বেটি।
দোনো ছোকরা বি সাৎ
দোনো ছুকরি বি সাৎ
আর এক বেটা জুলপি-কাটা
বাঘটা কামড়ে নেছে টুঁটি॥
একবার নেমে দাঁড়া শ্যামা।
ভাঙল বুড়োর পাঁজর-কাঁটি।
শিব মলে অনাথ হবে
কার্তিক গণেশ ছেলে দুটি॥'

গালে হাত দিয়ে অবাকের ভাব করে নাচছে রামকৃষ্ণ।

'আই মা কি লাজের কথা
মিনসের উপরে মাগী।
বেটির পদতলে পড়ে ভোলা
অপরূপ এক যোগী॥
নয়নে মা দেখ চেয়ে
শিব আছেন শব হয়ে
আবার কে দেখেছে এমন মেয়ে
কুল-লজ্জা-ভয়-ত্যাগী॥'

আবার অন্য রকম তাল ধরছে:

'কোন হিসেবে হরহৃদে
দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে।
সাধ করে জিভ বাড়ায়েছ
যেন কত ন্যাকা মেয়ে॥
বল মা তোরে শুধাই তারা
এমনি কি তোর কাজের ধারা
তোর মা কি তোর বাপের বুকে
দাঁড়িয়েছিল অমনি করে?'

'রসো বৈ সঃ যে তিনি। নানা ভাবে তাঁর রস আস্বাদ করতে হবে, তবে তো

হবে।' বললেন রামকৃষ্ণ। 'নইলে কেশবদের মত খালি দয়াময়, প্রভু বললে কি রস হয়?'

রামকৃষ্ণে যেমন সর্বধর্মসমন্বয় তেমনি সর্বরসসমাশ্রয়। মা-ও রামকৃষ্ণকে দেখা দিলেন নানান ভাবে। নানান রস-বেশে। এক দিন মুসলমানের মেয়ে হয়ে চলে এলেন। ছ-সাত বছরের মেয়ে। মাথায় তিলক কিন্তু দিগম্বরী। রামকৃষ্ণের সংগে বেড়াতে লাগল আর ফিচকেমি করতে লাগল। একবার চোখ নাচাল, অমনি নীল আকাশে গ্রহ-তারা সব দুলে উঠল একসংগে। কালো পেড়ে কাপড় পরনে শ্রীগৌরাংগ হয়ে এক দিন দেখা দিলেন হৃদয়ের বাড়িতে।

তার পর, হলধারী যখন যন্ত্রণা দিচ্ছে আর বলছে রূপ-টুপ কিছু নেই, তখন এক দিন মা'র কাছে গিয়ে নালিশ করলে রামকৃষ্ণ। মা রতির মা'র বেশে দেখা দিলেন। বললেন, তুই ভাবেই থাক।

'এক-একবার ও-কথা ভুলে যাই বলে কষ্ট হয়। ভাবে না থেকে দাঁত ভেঙে গেল। তাই দৈববাণী যতক্ষণ না শুনছি বা প্রত্যক্ষ যতক্ষণ না হচ্ছে ভাবেই ডুবে থাকব, থাকব ভক্তি নিয়ে।'

সেই সহজ কথাই কেশবকে শেখাতে বসল।

'দুধ কেমন? না, ধোবো-ধোবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব যায় না। আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না। তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। যিনি নিত্য তিনিই ব্রহ্ম, যিনি লীলা তিনিই কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী।'

কালীতত্ত্ব জানবার জন্যে ধরে বসল কেশব। কালী অত কালো কেন?

'কালী কি কালো? দূরে, তাই কালো, জানতে পারলে কালো নয়।' বললে রামকৃষ্ণ। 'আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে গিয়ে দেখ, কোনো রঙ নেই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখ, কোনো রঙ নেই।'

ভাবে বিহ্বল হয়ে গান ধরল রামকৃষ্ণ।

'মা কি আমার কালো রে? কালরূপ দিগম্বরী, হৃৎপদ্ম করে আলো রে।'

মা'র একান্ত কাছটিতে সরে এসেছে রামকৃষ্ণ। কাছে এসে আলোয় আলোময় দেখছে। সরে আসতে-আসতে নিজেই মা-তে মিশে মা হয়ে গিয়েছে। 'শ্যামা পুরুষ না প্রকৃতি? এক জন ভক্ত পুজো করছিল। এক জন দর্শন করতে এসে দেখে মূর্তির গলায় পৈতে। তুমি মা'র গলায় পৈতে পরিয়েছ? দর্শক আপত্তি করলে। ভক্ত বললে, ভাই তুমিই চিনেছ। আমি এখনো চিনতে পারিনি, তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি। তাই পৈতে পরিয়েছি।'

তাকেই তো বলে যোগমায়া, অর্থাৎ পুরুষপ্রকৃতির যোগ। পুরুষ নিষ্ক্রিয় তাই শিব শব হয়ে আছেন। আর, পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করছে, হনন-পালন করছে। এক ছাড়া আর নেই। যা পুরুষ তাই প্রকৃতি। যা বিদ্যুৎ তাই বৈদ্যুত শক্তি। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিরও মানে ঐ। ঐ যোগের জন্যেই তো বঙ্কিম ভাব।

মনোমোহন মিত্তিরের বোনকে বিয়ে করেছে রাখাল। রাখালের বয়েস তখন

আঠারো। বিয়ের পর ভগ্নীপতিকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসেছে মনোমোহন। এ কে ? রাখালকে দেখে রামকৃষ্ণ তো অবাক।

ভাবমুখে থেকে মাকে একদিন বলেছিল রামকৃষ্ণ, 'মা গো, বিষয়ী-সংসারী লোকের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে জিভ জ্বলে গেল।'

মা বললেন, 'ভয় নেই। শুদ্ধসত্ত্ব ত্যাগী ভক্তেরা আসছে একে-একে।'

'এক জনকে সঙ্গী করে দাও আমার মত। আমার তো সন্তান হবে না, কিন্তু মা, ইচ্ছা করে, একটি শুদ্ধভক্ত ছেলে আমার সঙ্গে থাকে। সেইরূপ একটি ছেলে আমায় দাও।'

এর কিছু দিন পরে ভাবচক্ষে রামকৃষ্ণ দেখতে পেল, বটতলায় একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। কেন, ও ওখানে কেন ? এ কি কাণ্ড ?

হৃদয়কে বললে সেই দর্শনের কথা। হৃদয় আনন্দ করে উঠল। বললে, 'মামা, নিশ্চয়ই তোমার ছেলে হবে। তাই দেখেছ।'

'সে কি রে ?' চমকে উঠল রামকৃষ্ণ। 'সে কি রে ? আমার যে মাতৃযোনি। আমার ছেলে হবে কেমন করে ?'

রামকৃষ্ণ এক দিন বসে আছে নিরালায়, হঠাৎ মা এসে তার কোলের মধ্যে একটি ছেলে ফেলে দিয়ে গেলেন। বললেন, 'ছেলে চেয়েছিলে না ? এই তোমার ছেলে।'

সে কি ? আমার আবার ছেলে কি ?

মা বুঝিয়ে দিলেন, শরীরের পুত্র নয়, মানস পুত্র।

রাখালের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল রামকৃষ্ণ। এ যে সেই ছেলে।

'তোমার নামটি কি ?' তৃষিত কণ্ঠে জিগ্গেস করলে রামকৃষ্ণ।

'রাখালচন্দ্র ঘোষ।'

সমস্ত হৃদয় দুলে উঠল। সমস্ত সৃষ্টি ভরে গেল বাঁশির সুরে। নীল যমুনার জলে। 'সেই নাম ! রাখাল, ব্রজের রাখাল' ভাবে ডুবে গেল রামকৃষ্ণ। আর কোনো কথা নেই। আর শুধু একটি মাত্র স্নেহস্বর : 'এখানে আবার এক দিন এস। আবার এক দিন।'

আর রাখাল কী দেখল ? এ কে ? দিব্যদীপ্তি অঙ্গে নিয়ে এ কে বসে আছে তার চোখের সামনে ? রাখাল দেখল মা বসে আছে। মা, তার মা। জীব-জগতের মা।

তার পর আরো ক'দিন পর কলেজ ছুটির শেষে এক দিন একা-একা চলে এসেছে রাখাল।

'তোর এখানে আসতে এত দেরি হল কেন ?' আকুল হয়ে ডাকল রামকৃষ্ণ : 'আয় আয়, তুই আমার রাখাল, তুই আমার গোপাল, তুই আমার কৃষ্ণ।'

রাখালের মনে হল সে যেন তিন-চার বছরের ছেলে। আর তার সামনে বিশ্রামশান্ত কোল পেতে তার মা বসে আছেন। মা কালী, মহাকালী। শ্যামশ্রীতে স্নেহশ্রী।

রামকৃষ্ণের কোলের মধ্যে গিয়ে বসে পড়ল রাখাল। রামকৃষ্ণ সস্নেহে হাত বুলুতে লাগল সর্বাঙ্গে। আর রাখাল নিঃসঙ্কোচে রামকৃষ্ণের স্তনপান করতে লাগল। রামকৃষ্ণই মা। রামকৃষ্ণই মাতৃসাধনার চরম।

তাই তো মা বলে ডাকি। মা বলে যখন ডাকি তখন তোমাকেই ডাকি। আমরা কি কালী চিনি না দুর্গা চিনি? আমরা শুধু তোমাকে চিনি। আমরা মা বলে ডাকলে আর কেউ সাড়া না দিক, তুমি দেবে। তোমার ডাক, তুমিই তো ভালো চেন। তুমিই তো সংসারের কানে দিয়ে গেছ এই ডাক। এই সংক্ষিপ্ত একাক্ষর মন্ত্র। তাই তোমার সাধ্য কি, তুমি থাকো নিশ্চল হয়ে।

তার পর এক দিন নিজের ডাকে যদি নিজে সাড়া দাও, প্রভু, তবে আর আমাদের কালীই বা কি, ব্রহ্মই বা কি।

* ৫৮ *

বিজয়কৃষ্ণকে লিখে পাঠাল কেশব সেন : বন্ধু একবার রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখবে এস।

বন্ধু? তা ছাড়া আবার কি। হোক দলাদলি, হোক রেষারেষি, হোক বাদ-বিতণ্ডা, তারা সতীর্থ। তারা এক তীর্থের যাত্রী। যারা সমানতীর্থসেবী তারাই সতীর্থ। তারা এক গুরুর ছাত্র। এক পাঠশালার পড়ুয়া। তাদের দুজনের একই ঈশ্বর-সন্ধান।

তখন তাদের ঝগড়া চরমে উঠেছে। তবু লিখে পাঠাল কেশব : বন্ধু এমনটি তুমি আর দেখনি।

শান্তিপুরে প্রভু অদ্বৈতাচার্যের বংশে বিজয়কৃষ্ণের জন্ম। বাপের নাম আনন্দকিশোর গোস্বামী। নিত্যপূজার শালগ্রাম শিলা গলায় বেঁধে এক দিন হঠাৎ পুরীর দিকে যাত্রা করলেন আনন্দকিশোর। বাসনা জগন্নাথ দর্শন। যাত্রা করলেন পায়ে হেঁটে নয়, বুকে হেঁটে। গণ্ডি কেটে-কেটে। পুরী পেঁছুতে এক বছর লাগল। মাটির ঘষায় বুকে-পায়ে ঘা হয়ে গেছে তবু হটছেন না আনন্দকিশোর। ঘায়ের উপর ন্যাকড়া জড়িয়ে নিয়েছেন। ভক্তের যদি ন্যাকড়াও না জোটে, তবু ভক্ত ন্যাকড়ার আগুন।

জগন্নাথ স্বপ্ন দিলেন। 'তুই বাড়ি যা, আমি পুত্র হয়ে তোর ঘরে আসব।'

পুত্র? দু-দুবার বিয়ে করেছিলেন আনন্দকিশোর, দুই স্ত্রীই গত হয়েছেন নিঃসন্তান অবস্থায়। প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স হল, এখন আর তবে পুত্র কি! কিন্তু স্বপ্নবাক্য কি নিষ্ফল হবে? তৃতীয় বার বিয়ে করলেন আনন্দকিশোর। বিয়ে করলেন নদীয়া জেলার গৌরী জোদ্দারের মেয়ে স্বর্ণময়ীকে।

সেদিন ঝুলন-পূর্ণিমার রাত। পূর্ণিমার চন্দ্র, কিন্তু সবাই বলে কৃষ্ণচন্দ্র।

কিন্তু গৌরীপ্রসাদের ঘরে সেদিন বিপদ উপস্থিত। পরের দুঃখে মন কাঁদে, কোন এক দেনদারের জামিন হয়েছিলেন গৌরীপ্রসাদ। সেই দেনদার হঠাৎ ফেরার হয়েছে। তাই জামিনদারের বিরুদ্ধে ক্রোকী পরোয়ানা বেরিয়েছে আদালত থেকে। অস্থাবর ধরবার পরোয়ানা, আদালতের পেয়াদা চড়াও হয়েছে বাড়িতে।

সে সব দিনে আদালতের পেয়াদা মানে কৃতান্তের অনুচর। বাড়ির মেয়েরা পেয়াদা দেখে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। স্বর্ণময়ী পালাল বাড়ির পিছনে পিটুলি গাছের নিচে ঘন কচুবনের মধ্যে। স্বর্ণময়ী আসন্নপ্রসবা।

ক্রোকের হাংগামা চুকে গেল, বাড়ির মেয়েরা সব একে-একে ফিরল বাড়িতে। কিন্তু স্বর্ণময়ী কোথায়? স্বর্ণময়ী কোথায় গেল? খুঁজতে-খুঁজতে পেল তাকে কচুবনে। এ কি! তার কোলে প্রসন্নহাস হিরণ্ময়বপু শিশু!

বিপদ কোথায়! বিপদের দিনে বিপদভঞ্জন। বিপন্নপালক। এই শিশুই বিজয়কৃষ্ণ। নিম গাছের নিচে জন্মেছিলেন শ্রীচৈতন্য। পিটুলি গাছের নিচে জন্মালেন বিজয়কৃষ্ণ। আর আমাদের প্রভু রামকৃষ্ণ জন্মালেন ঢেঁকিশালে। জন্মেই উনুনেই ছাই মেখে বিভূতিভূষণ হলেন।

রামকৃষ্ণের রঘুবীর, বিজয়কৃষ্ণের শ্যামসুন্দর।

ভোর বেলা, মন্দিরের দরজা বন্ধ। পূজারী এসে দরজা খুলবে।

শিশু বিজয়কৃষ্ণ সেই দরজা ঠেলছে প্রাণপণে। কাঠের রঙিন বল্ নিয়ে সে খেলছিল, সে-বল্ সে খুঁজে পাচ্ছে না। খুঁজে পাচ্ছিস্ না তো এখানে কি!

'এই শ্যামসুন্দরই আমার বল্ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। ও-ও যে খেলছিল আমার সংগে।'

কে শোনে কার কথা! দরজা যখন খুলতে পারছে না গায়ের জোরে, তখন কাকুতিমিনতি করছে! দাও না আমার বল্। কেন বসে আছ দোর এঁটে? বাইরে বেরিয়ে এস না। দাঁড়াও। কতক্ষণ বন্ধ হয়ে থাকবে? শিশু বিজয়কৃষ্ণ এক লাঠি নিয়ে এসেছে। পূজারী এসে দরজা খুললেই দেখে নেব তোমাকে। কে তখন তোমাকে বাঁচায়। দেখব। দরজা খোলা হলেও মন্দিরে তাকে ঢুকতে দেওয়া হল না। তার যে এখনো পৈতে হয়নি। সারা দিন উপোস করে রইল বিজয়। মা এসে কত সাধ্যসাধনা করলেন, নরম হল না এতটুকু। শ্যামসুন্দরের উপর প্রতিশোধ না নিয়ে অন্নজল গ্রহণ করবে না সে। মা ঘরে ভাত রেখে শুয়ে পড়লেন। খিদের কাছেও যে হার মানে না সে কেমনতরো ছেলে!

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গেল স্বর্ণময়ীর। বিজয় যেন কথা কইছে কার সংগে। 'যাক, ঘাট মানলে। তাই ছেড়ে দিলাম। নইলে দেখাতাম একবার মজা।'

গলার স্বর বদলাল বিজয়।

'আমি না হয় তোমার উপর রাগ করে খাইনি। কিন্তু তাই বলে তুমি কেন খেলে না?'

স্বর্ণময়ী তো বাক্যহীন।

'বেশ, বেশ, দুজনে একসংগে খাই এস।'

ঢাকা তুলে ভাত খেতে লাগল বিজয়। তার সংগে আরো এক জন কে খাচ্ছে।

শিকারপুরের পাঠশালায় ভর্তি হয়েছে বিজয়। ভীষণ কলেরা লেগেছে শান্তিপুরে। চক্ষের পলকে বহু লোক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তার মধ্যে অনেকগুলো বিজয়ের সহপাঠী। বিজয়ের বেদনার চেয়ে বিস্ময় বেশি। যে মাদুরে তারা বসত সে মাদুর আছে, যে বই তারা পড়ত সেই বই আছে, যে জিনিস নিয়ে খেলাধুলো

করত সেই জিনিসগুলো আছে। অথচ তারা নেই। এ কখনো হতে পারে? এইটুকু শিশু মহা সমস্যায় পড়ে গেল। যা একবার থাকে তা কি আবার না-থাকে? যা একবার হয় তা কি আবার না-হয়? চিন্তায় হাবুডুবু খাচ্ছে শিশু। কে তাকে মীমাংসা করে দেবে? কে তার সেই গুরুমশাই?

এক দিন ভারি মন নিয়ে চলেছে পাঠশালায়। হঠাৎ তার সেই মৃত সহপাঠীরা দর্শন দিলে তাকে, দিনের আলোয়, পথের মধ্যে। বলে উঠল সমস্বরে: 'বিজয়, আমরা আছি। আমরা আছি।'

আমরা আছি? আমরা যদি আছি, তবে নিশ্চয়ই তিনিও আছেন।

পাঠশালায় চলে এল একছুটে। পাঠশালার গুরু ভগবান সরকার, তাঁকে বললে সব বিজয়। ভূতের গল্প বলে হেসে উড়িয়ে দিলেন গুরুমশাই। বিজয় জেদ ধরল, আপনি একবার চলুন আমার সঙ্গে। সেই ঝোপের পাশে, পথের উপর।

নেইআঁকড়ার পাল্লায় পড়েছেন গুরুমশাই। শেষে তিনি শক্ত হয়ে বললেন, 'ঠিক বলছিস? তাদের কথা তুই শোনাতে পারবি?'

'নিশ্চয়ই পারব।'

সেই চেনা জায়গায় নিয়ে এল গুরুমশাইকে। কিন্তু কোথায় সেই ছেলের দল? কোথায় তাদের সেই কাঁচ গলার কলস্বর?

ওরে তোরা কোথায়? তোরা কথা ক। আমরা শুধু আমাদের কথা কইছি। তোরা তোদের কথা ক। তোদের কথাই তাঁর কথা।

চার দিকে শুধু মৌনময় মুখরতা। এ কি গুরুমশাইদের কানে ঢোকে? তারা ইন্দ্রিয়ের প্রমাণ চায়। বলে, দেখাতে পারো? শোনাতে পারো?

'যত সব ফাজলামো—' ভগবান সরকার মারতে উঠলেন বিজয়কে।

হঠাৎ একসঙ্গে কতগুলি ছেলে কলধ্বনি করে উঠল: 'গুরুমশাই, মারবেন না বিজয়কে।'

উদ্যত হাত অসাড় হয়ে গেল। ব্যাকুল চোখে চার দিকে তাকাতে লাগলেন ভগবান সরকার।

'এই যে আমরা। এইখানে, এইখানে, এইখানে। সবখানে—'

বিজয়কে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ভগবান সরকার। কে কার গুরু? যে দেখায় আর শোনায় সেই তো আচার্য। সেই তো দ্রষ্টা, স্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা।

পুরন্দর পুজারী মরে ব্রহ্মদৈত্য হয়েছে। থাকে গাছের উপর। আগে শ্যামসুন্দরের পুজারী ছিল। পুজো করত আর জিনিস সরাত। ভোগ-নৈবেদ্য শুধু নয়, আরো কিছু মোটা জিনিস। তারই পাপে এই গতি। কিন্তু বিজয়ের উপর ভারি টান। তার সর্বত্র আপদে গতায়াত, তাই আপদে-বিপদে সব সময়ে সে বিজয়কে রক্ষা করে। থাকে তার সঙ্গে-সঙ্গে। কখনো দেখা দেয় কখনো বা দেয় না।

যাত্রা শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে বিজয়। আসর ভেঙে গিয়েছে। যে যার মনে কখন ফিরে গিয়েছে বাড়ি-ঘর। ফরাসের একধারে বিজয় শুধু একা ঘুমিয়ে। ঘুম ভেঙে চোখ চেয়ে তো তার চক্ষুস্থির। রাত ঝাঁ-ঝাঁ করছে, সঙ্গী-সাথী নেই কেউ ধারে-কাছে, এখন সে বাড়ি ফেরে কি করে?

খড়মের শব্দ শোনা গেল চটপট। হাতে লণ্ঠন আর লাঠি, কে এক জন কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, 'চল্ পৌঁছে দিয়ে আসি।'

এমনি আরো কয়েক বার সে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। বিপদে বা বিপথে পড়লেই লাঠি হাতে পুরন্দর এসে দেখা দেয়।

'ঐ লোকটা কে রে?' একদিন জিগ্গেস করলেন স্বর্ণময়ী।

'কোন লোক?'

'যে তোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায়?'

'বা, আমি তো জানি তুমিই পাঠিয়ে দাও ওকে। আমাকে ডেকে নিয়ে আসবার জন্যে বুঝি লোক রেখেছ। তবে—'

'শোন, ওর সংগ করবি নে। ও ব্রহ্মদত্যি।'

হোক ব্রহ্মদৈত্য। দৈত্য থেকেই ক্রমে এক দিনে ব্রহ্মে গিয়ে পৌঁছুবে।

বিজয় না চাইলে কি হবে, পুরন্দর তাকে ছাড়ে না। বলে, আমি যতদিন আছি, ততদিন তোকে আগলে যাব।

'কিন্তু মা বলেছে, গয়ায় যদি তোমার পিণ্ড দিই?'

ব্যস্, তা হলেই বন্ধন মুক্তি। তাহলেই উর্ধ্বযাত্রা। ক্রমোন্নয়ন।

'কিন্তু, দেখো, তোমরা যেন গয়ায় মরে ভূত হয়ো না।' হেসে উঠল পুরন্দর। সেদিন গান শুনে বাড়ি ফিরতে বেজায় দেরি হয়ে গিয়েছে। পুরন্দর বললে, 'এই পোড়ো বাড়ির আঙিনার ভেতর দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। গাছে বাঁদর আছে, ডালপালায় ঝুপঝাপ করলে ভয় পেয়ো না।'

অমনি গাছের উপর থেকে কে একজন বলে উঠল ব্যংগ করে: 'বেশ বলেছ যা হোক। গাছে যখন আছি তখন বাঁদর ছাড়া আর কি? কিন্তু ছেলেটার কাছে আসল কথাটা ফাঁস করে দেব না কি?'

তার মানে ছেলেটাকে ভয় দেখাবে। পুরন্দর তেড়ে এল। বললে, 'ঐ যে বলেছে মরলেও স্বভাব যায় না তোদের হয়েছে তাই।'

ঝগড়া বাধে দেখে বৃক্ষস্থ আরেক জন মধ্যস্থতা করতে এল। গম্ভীর গলায় বললে, 'পরলোক দেখ! পরলোক দেখ!'

শুধু পরলোক নয়, পরম লোককে দেখব। যা প্রেত ও প্রস্থিত তাই এক দিন মহা-স্থিতের কাছে পৌঁছে দেবে। সে তো আদি বাড়ি। সেখানেই তো আসল উপনয়ন।

ন বছর বয়সে উপনয়ন হল বিজয়ের। টোলে গিয়ে ঢুকল। এক বছরে মুগ্ধবোধ মুখস্থ করে ফেললে। তার পর নিয়ে পড়ল সাংখ্য আর বেদান্তদর্শন।

কিন্তু যতই পড়ো আর লড়ো, তার মুখে শুধু এক বুলি। সে বুলির নাম 'হরিবোল'। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী হরি-ভোলা সংসারে বাস করে না, বাস করে হরি-বোলা সংসারে।

দক্ষিণেশ্বরে যখন আসে তখনই মুখে ধ্বনি করে: 'হে শ্রীহরি—'

এই শ্রীহরি ডাকটিই পর-পর তিন বার তিন রকম সুরে সে উচ্চারণ করে। এমন করুণ এমন আর্দ্র সেই স্বর যে তপ্ত চিত্ত শীতল হয়, তৃষিত চিত্ত তৃপ্তিতে

ভরে ওঠে। মনে হয় সর্বতীর্থময় হরি যেন বাস করছেন এই দক্ষিণেশ্বর তীর্থে।

নামাগ্নিতে দগ্ধীভূত হয়ে যাচ্ছে—বিজয়কৃষ্ণকে চিনতে পারল রামকৃষ্ণ।

বিধৌত হয়ে যাচ্ছে পরমপাবনী ভক্তিতে। এসেছে সেই ক্ষমা, বৈরাগ্য আর মানশূন্যতা। সেই আশাবন্ধসমুৎকণ্ঠা, ভগবানকে পাবার জন্যে বেগবতী আশা আর না পাওয়ার জন্যে ঐকান্তিকী কাতরতা। সেই নামগানে সদারুচি। আসক্তিস্তৎ-গুণাখ্যানে, প্রীতিস্তৎবসতিস্থলে। বিজয়ের সর্বাঙ্গে সেই ভাবকদম্ব পরিস্ফুট। ঠাকুরের তখন হাত ভেঙে গেছে, খুব কষ্ট পাচ্ছেন।

একজন ব্রাহ্ম ভক্ত বললে, 'আপনি তো জীবন্মুক্ত, এই কষ্টটুকু ভুলতে পাচ্ছেন না?'

ঠাকুর বললেন, 'তোদের সঙ্গে কথা বলে ভুলব? তোদের বিজয়কে আন। তাকে দেখলে আমি আপনাকে ভুলে যাই।'

* ৫৯ *

কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হল বিজয়কৃষ্ণ। রামচন্দ্র ভাদুড়ীর মেয়ে যোগমায়াকে বিয়ে করলে। বিজয়ের বয়স আঠারো আর যোগমায়ার ছয়।

বিজয়ের দুই বন্ধু রামময় আর কৃষ্ণময় খৃস্টান হয়ে গেল।

বিরক্তিতে বিভ্রান্ত হল না বিজয়, বেদনায় ভাবতে বসল। হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠানে তুলসী-বিল্বপত্রের সঙ্গে অনেক আগাছা এসে ভিড়েছে। তাই লোকে আস্থা হারাচ্ছে। রাস্তা হারাচ্ছে। উন্মার্গগামী হচ্ছে। এখন উপায় কি।

রংপুরে শিষ্যবাড়ি গিয়েছিল, শিষ্য মন্ত্র আওড়ে পা-পুজো করলে। বললে, তুমি জ্ঞানবর্তিকা জেলে অজ্ঞানের চক্ষুরুন্মীলন করেছ, তোমাকে প্রণাম।

ছাই করেছি। কিছু করিনি। আমার নিজের চোখ কে খুলে দেয় তার ঠিক নেই, আমি গেছি পরের চোখ খুলতে। একেই বলে গয়ায় মরে ভুত হওয়া। করব না আর কপটাচরণ। যজমানগিরি ছেড়ে দিয়ে স্বাধীন ভাবে খেটে খাব কলকাতায়। পড়ব মেডিকেল কলেজে।

রংপুর থেকে বগুড়ায় এল বিজয়কৃষ্ণ। বগুড়ায় তিন জন ব্রাহ্মভক্তের সঙ্গে দেখা হল। এরা তো চমৎকার। যেমন শুনেছিলাম তেমন তো নয়। মদও খায় না, স্বেচ্ছাচারও করে না। শুধু ঈশ্বরের কথা হয়। সেই তো 'অমৃতস্য পরং সেতু'। বাক্যে তাঁর প্রকাশ হয় না অথচ বাক্যই তাঁর প্রকাশ।

কলকাতায় এসে ব্রাহ্মসমাজে হাজির হল এক দিন। সেদিন দেবেন ঠাকুর বক্তৃতা দিচ্ছেন। বক্তৃতার বিষয়—'পাপীর দুর্দশা ও ঈশ্বরের করুণা।' বক্তৃতা শুনে বিজয় অভিভূত, দ্রবীভূত হয়ে গেল। নিজেকে হঠাৎ মনে করল নিরাশ্রয় বলে। নির্জন, নিঃসহায় বলে। প্রার্থনা করতে বসল। 'এইমাত্র শুনলাম তুমি অনাথের

নাথ, তুমি দীন জনের বন্ধু। তবে আমাকে তুমি নাও, আমাকে তুমি রাখো। তোমাকে যে পায়নি তার মত দীন কে! তুমি আমার, এই নিকট অনুভূতি যার নেই সেই তো অনাথ। আমি আর কোথাও যাব না, আর কোথাও ঘুরব না, এই তোমার দুয়ার ধরে পড়ে রইলাম—'

তাঁর দরজায় তিনি যে আমাকে পড়ে থাকতে দেবেন এই তো তাঁর অনেক দয়া। ভিখারীকে দোরগোড়ায় স্থানটুকুই বা কে দেয়! শুধু শরণাগতিতেই শান্তি। সর্বসাধনস্তম্ভরূপা শরণাগতি। 'শান্তিরেব শান্তিঃ, সা মে শান্তিরেধি।' যা আপনাতেই শান্তি সেই শান্তিই আমার হোক।

ঠাকুর বললেন, 'কাঠ পোড়া শেষ হলে আর শব্দ থাকে না—উত্তাপও থাকে না। সব ঠাণ্ডা। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।'

মেডিকেল কলেজের বাংলা বিভাগে পড়ছে বিজয়কৃষ্ণ। সাহেব অধ্যক্ষের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষ বেধেছে। বিজয় সেই ছাত্রদলের পাণ্ডা। ব্যাপার কি? এক ছাত্রকে ওষুধচুরির অপবাদ দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছেন অধ্যক্ষ। শুধু তাই নয়, জাত তুলে বাঙালীদের গাল দিয়েছেন। আর যায় কোথা! বিজয়ের নেতৃত্বে ছাত্রেরা সব কলেজ ছেড়ে দিলে।

এই নিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা বিজয়কৃষ্ণের।

বিজয়কে দেখে বিদ্যাসাগরের আনন্দ ধরে না। দুই তেজস্বী চক্ষু সত্যের আলোতে জ্বলছে। দৃপ্ত ব্যক্তিত্বে অবক্র নির্ভীকতা। শুধু তাই নয়, সঙ্গে তীব্র ঈশ্বরানুরাগ।

বিজয় বললে, 'আপনার বোধোদয়ে সবই তো লিখেছেন, কিন্তু সত্যিকার বোধোদয় হয় যাঁকে আশ্রয় করে, তাঁর কথাই কিছু নেই।'

কোনো উত্তর খুঁজে পেল না বিদ্যাসাগর। বিদ্যার সে সাগর বটে কিন্তু তার নামের প্রথমেই যে ঈশ্বর তার দিকেই বুঝি তার চোখ পড়েনি। বোধোদয়ের পরের সংস্করণে 'ঈশ্বর' এল। নতুন পাঠ। কিন্তু নব-নবায়মান রস। পৈতে ফেলে দিয়ে ব্রাহ্ম হল বিজয়কৃষ্ণ। প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে লাগল। শুধু বক্তৃতা নয়, প্রচারণা। চাই ব্রহ্মবিদ্যা, পরা বিদ্যা। জড় ধর্ম থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানকে লাভ করার সারমর্মই হচ্ছে ব্রাহ্মধর্ম।

এই সময় কেশব সেনের সঙ্গে আলাপ হল বিজয়ের। আলাপের সঙ্গে-সঙ্গেই গভীর বন্ধুতা। একে অন্যের দর্পণ হয়ে দাঁড়াল। এ দর্পণে পরস্পরের মুখ দেখে না, পরাবরের মুখ দেখে।

মেডিকেল-কলেজের শেষ পরীক্ষা কাছে, বিজয় বললে, পরীক্ষা দেব না, ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করব। দেশে-দেশে দিকে-দিকে ঈশ্বরের নাম গেয়ে বেড়াব এই ব্যাকুলতাই আমার জীবনের আকর্ষণ। জীবিকার চেয়ে জীবন বড়। জীবনের চেয়ে জীবনবল্লভ।

কিন্তু প্রচার মুখের কথা নয়। কেশব বললে, দস্তুরমতো পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হবে।

'তাই করব।' পড়াশোনা করে পাশ করলে সহজেই। ধর্মের বৈজয়ন্তী নিয়ে বিজয় বেরুল দিগ্বিজয়ে।

'এ যে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।' আপত্তি করল বন্ধুরা। 'পেট চলবে কি করে?'

'যিনি মরুভূমিতে ঘাস বাঁচিয়ে রাখেন, তিনিই রাখবেন।'

মহর্ষি বললেন, 'নির্দিষ্ট কিছু বৃত্তি দেওয়া যাক তোমাকে।'

প্রবৃত্তির বৃত্তি করতে আসিনি। ঈশ্বরই আমার উদ্যম, ঈশ্বরই আমার উদ্দেশ্য। তাঁর উপরে যদি সত্যি আমার নির্ভর থাকে তা হলেই আমি অভীঃ।

সংসারে তার জায়গা হয়নি, তাই বলে সংসারকে ত্যাগ করেনি বিজয়কৃষ্ণ। শান্তিপুর তাকে তাড়িয়েছে কিন্তু বিজয় চলেছে আসল শান্তিপুরে। তার গতি দুর্গবিঘাতিনী, তার বাণী অপরাঙ্মুখী। কলকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য হল বিজয়।

বুধবার, উপাসনার দিন। প্রলয়ংকর ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। পথঘাট ডুবে গেছে, গাছ পড়েছে অনেক, গাড়ি-ঘোড়া জনমানবের চিহ্ন নেই। জলস্রোতে মৃতদেহ ভাসছে। ঘোর অন্ধকার। কার সাধ্য রাস্তায় বেরোয় এই দুঃসময়ে?

বিজয়ের সাধ্য। প্রথমে হাঁটুজল থেকে গলাজল। তার পরে সাঁতার। পথনদী পার হয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছুল মন্দিরে। কিন্তু হা হতোঽস্মি, এক জনও আসেনি, ব্যাকুলতার ঝড়ে ভক্তির নদী সাঁতরে। বিশ্বাসের ভেলায় ভেসে। অশ্রুজলের বর্ষণে।

মন্দিরের চাকরকে পাঠাল আচার্যের কাছে। আচার্য মানে দেবেন ঠাকুরের কাছে। তিনি লিখে পাঠালেন: প্রকৃতির আজ করালমূর্তি, আজ এর মধ্যেই পরমেশ্বরের লীলা দর্শন করো।

একাই উপাসনায় বসল বিজয়। বিজয় একাই একশো।

কতক্ষণ পরে কেশব এল পালকিতে করে। বসে পড়ল উপাসনায়। নীরন্ধ্র অন্ধকারে দুটি নিষ্কম্প দীপদ্যুতি—কেশব আর বিজয়। স্বস্থ, শান্ত, স্পন্দন-বিরহিত। ব্রহ্মনিষ্পন্ন।

বিজয়ের দিন কাটছে অর্ধাশনে, কখনো অনশনে। চাঁদার খাতায় চার আনা আট আনা ভিক্ষে করে। কখনো বা দেড় পয়সার মুড়ি খেয়ে। বাড়ির প্রাঙ্গণে কাঁটানটে শাক ফলেছে অজস্র, তাই দিয়ে ভাত মেখে। তাও না জোটে তেঁতুলগোলা দিয়ে। তবু ঈশ্বরস্খলন নেই, নেই স্বভাবচ্যুতি। কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি—এই কাম্যকর্মত্রয় বিজয়ের। 'অন্নচিন্তা চমৎকার'—এ যেন বিজয়ের পক্ষে খাটে না। সে জানে তৃষ্ণাসূত্র ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত জীবের সমস্তই দুঃখ, তৃষ্ণাচ্ছেদ থেকে যে কৈবল্য তাই একমাত্র আনন্দ। বিজয় আছে সেই বৃহদানন্দে, জগদানন্দে। যদি সে পৌত্তলিকতা বর্জন করে থাকে তবে সে সুখ-শান্তি অর্থ-আরাম যশ-মান—সমস্ত উপাধিই বর্জন করবে। উপাধিরই বিকার, উপাধিরই মৃত্যু, আত্মা স্থির, নির্বিচল। আত্মা প্রকাশক, জড় প্রকাশ্য। কেবল উপাধির যোগেই ভাবি আত্মাই বুঝি কর্তা, আত্মাই বুঝি ভোক্তা। অবিদ্যার বশেই নিজেকে দেহবান মনে করি। মন মায়া, আভাস মাত্র। আমাদের আসল অধিষ্ঠান চৈতন্যে। ঈশ্বর মায়ার অতীত। ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ। বিজয় সেই চৈতন্যের দ্যোতনা।

কেশব আর বিজয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারছে না পাদ্রিরা। খৃষ্টধর্মে আর

আকৃষ্ট হচ্ছে না বাঙালী, ব্রাহ্মধর্মেই পাচ্ছে তাদের পিপাসার পানীয়। এখন কি করা! পাদ্রিরা ঠিক করল তর্কসভায় ব্রাহ্ম-প্রচারকদের আহ্বান করা যাক। তাদের তর্কে পরাস্ত করতে পারলেই বিদ্বৎসমাজ কৃতনিশ্চয় হবে যে খৃষ্টধর্মই শ্রেষ্ঠধর্ম।

তখন কেশব বিজয় আর প্রতাপ এলাহাবাদে। উপাসনার পরে মন্দিরে এক দিন এসেছে এক পাদ্রি। মহাজ্ঞানী আর তর্কবীর বলে প্রখ্যাত। খোদ বিলেত থেকে এসেছে খৃষ্টান মিশনের প্রতিনিধি হয়ে। আগে পাদ্রি, পরে বেনে, শেষকালে সৈন্য। এই ইংরাজী কূটনীতি। আগে মিষ্টি বুলি, পরে টাকার টুং-টুং, শেষ-কালে অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা। সাদরে অভ্যর্থনা করল কেশব।

'তোমরা খৃষ্টধর্ম প্রচারে বাধা দিচ্ছ। সে বিষয়ে খোঁজ করতে এসেছি আমি। ধর্ম সম্বন্ধে আমি বিচার করতে চাই তোমাদের সংগে। কি তোমাদের বক্তব্য, কি বা তার ভাব—'

চার দিকে তাকাল পাদ্রি। কার সংগে কথা কইব? কে তোমাদের মধ্যে উপযুক্ত? যাকে ইচ্ছে তাকেই বেছে নাও। কিন্তু তোমাকে কে বাছল, তাই ভেবে পাচ্ছি না। 'ঐ যে এক জন বসে আছে স্থির হয়ে, উপাসনা শেষ হয়ে যাবার পরেও যে নড়ছে না, ওর নাম কি?'

'বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।'

'ওর সংগেই আমি কথা কইব। ওকে বলো না, চেয়ারে এসে বসবে, ও ভাবে পা মুড়ে বসবার আমার অভ্যেস নেই।'

বিজয়ের ধ্যান ভাঙল। জানল সাহেবের অভিপ্রায়।

বললে, 'সাহেব, পাণ্ডিত্য তো অগাধ সঞ্চয় করেছ। আমার পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর আগে দাও। প্রশ্ন থেকেই বুঝে নাও ভারতবর্ষের জিজ্ঞাসার গভীরতা। ধর্ম কি? তার উৎপত্তি কোথায়? আত্মা কাকে বলে আর তার স্বরূপ কি? সত্য কি জিনিস? কাকে মায়া বলে? পাপ কি, কেন?'

পাদ্রি সাহেব এ পাশ ও পাশ তাকাতে লাগল, বললে, 'এ সব প্রশ্ন তো কই শুনিনি কোথাও। এ আবার কি কথা। আমরা তো শুধু বাইবেল জানি, বাইবেলই পড়েছি—'

'সাহেব, এ দেশের নাম ভারতবর্ষ।' কেশব বললে, 'এ দেশ থেকেই ধর্ম আর সভ্যতা গ্রীস হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তোমাদের ইউরোপে। এ দেশকে জানো, বোঝো, তবে এসো এ দেশকে ধর্মে দীক্ষা দিতে। প্রশ্নের উত্তর তুমি যদি নিজে দিতে না পারো, তোমার দেশে ফিরে যাও, সেখান থেকে উত্তর নিয়ে এস।'

সৃষ্টির প্রথম প্রশ্নের ভারতবর্ষই শেষ উত্তর। ভারতবর্ষ বৃক্ষ, আর সব ছায়া। একে সেবা করো, উচ্ছিন্ন কোরো না। আমাদের সেবা মংগলরূপিণী। 'সেবিতব্যঃ মহাবৃক্ষঃ'। যখন তিনি দূরে তাঁকে আরাধনা করি আর যখন তিনি কাছে তখন তাঁকে সুখে সেবা করি। তিনি সুখসেব্য দূরারাধ্য। তিনি গুহ্যগভীরগহন হয়েও সহজ-সুন্দর। তুমি, সাহেব, বুঝবে না এ তত্ত্ব। আগে শ্রদ্ধা দিয়ে বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ করো। পরে দেখ ভারতবর্ষকে।

আর বাক্যস্ফুট না করে চম্পট দিলে পাদ্রি সাহেব।

শুষ্ক জ্ঞানে মন ভরে না বিজয়ের। মন ভক্তি চায় প্রীতি চায়। প্রীতিই একমাত্র মাধুর্যবিষয়িণী। আর ভাগবতী প্রীতিই ভক্তি। ভক্তিতেই সমস্ত জ্ঞানের অবসান।

ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার করতে-করতে বিজয় বৃন্দাবনে এসেছে। উপাসনার মধ্যে হঠাৎ কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার বর্ণনা শুরু করে দিলে। ব্রাহ্মরা যারা শুনছিল তারা চঞ্চল হয়ে উঠল। এ কি পথস্খলন!

'কে জানে! স্পষ্ট চোখের উপর দেখলাম কৃষ্ণ গোঠে গরু নিয়ে যাচ্ছে।'

শুধু তাই নয়, উপাসনায় বসে মাঝে-মাঝে 'মা' 'মা' করে ওঠে।

এ কী হচ্ছে! ক্ষুণ্ণ হয় ব্রাহ্মরা। এ কী ভগবতী না জগদ্ধাত্রীর আবাহন? কিন্তু সেই অধীর আর্তি স্পর্শ করে সবাইকে। এ তো বৈধী ভক্তি নয়, এ রাগানুগা ভক্তি। শাস্ত্রের শাসনে ঐশ্বর্যবানে যে ভক্তি তা বৈধী ভক্তি আর মাধুর্যময়ী স্বভাবরুচির ভক্তিই রাগানুগা ভক্তি। বৈধী ভক্তি পিতা, রাগানুগা ভক্তিই মা।

'জয় জয় বিজয়ের জয়!' কেশব চিঠি লিখছে বিজয়কে: 'ঈশ্বরকে একমাত্র নেতাজ্ঞানে উচ্চকণ্ঠে তাঁর নাম কীর্তন কর। বৈরাগী হয়ে পদানত কর সংসারকে। উৎসাহের উত্তাপ দিয়ে জাগাও প্রসুপ্তকে, এক প্রীতির বন্ধনে সবাইকে বেঁধে ফেল। যারা নিজেদের দরিদ্র বলে বোধ করছে, তাদের ভগবৎ-বিত্তে সম্রাটের চেয়েও ধনবান কর। দেশে-বিদেশে আমাদের রাজ্য বিস্তৃত হোক।'

বাইরে প্রচার হচ্ছে আর এদিকে ঘরের মধ্যে চেঁচামেচি। বিধবা-বিয়ে, অসবর্ণ বিয়ে, ব্রাহ্মমতে শ্রাদ্ধ—এই সব নিয়ে। তুমুল হট্টগোল। কেশবকে সবাই খৃষ্টান বলতে শুরু করে দিয়েছে। শুধু তাই নয় দিচ্ছে তাকে আরো অপকৃষ্ট অপবাদ। বইছে শুধু ঈর্ষার বিষবায়ু।

বিজয়ের মন বিমুখ হয়ে উঠল। আছি শ্রীপাদপদ্মবিষয়িণী ভক্তি নিয়ে, এ সব আবার কি সংস্কারের উৎপাত! যেন অধিষ্ঠানের চেয়ে অনুষ্ঠান বড়! বিজয় চলে এল কালনায়, ভগবান দাস বাবাজীর আশ্রমে। জল খেতে চাইল বিজয়। বললে, আমি ব্রহ্মজ্ঞানী, আমাকে কিন্তু আলাদা পাত্রে জল দেবে। বাবাজী বললে, 'যার জ্ঞান তারই তো ভক্তি। ভক্তি বাদ দিয়ে কি জ্ঞান সম্ভব? আমার পিপাসাও আজ চরিতার্থ করব। আমার কমণ্ডলুতেই জল খান।' বাবাজীর পাত্রেই জল খেল বিজয়।

এক ঢোঁকে বাকি জল খেয়ে নিলেন বাবাজী। কমণ্ডলু মাথায় ঠেকালেন।

'এ কি করলেন? ইনি যে ব্রাহ্ম।' কে একজন চেঁচিয়ে উঠল: 'এঁর যে পৈতে নেই।'

'আমার অদ্বৈতেরও ছিল না। ব্রাহ্মসমাজে গেছেন, কিন্তু সেখানেও আমার গোঁসাইই আচার্য।'

'আহা, আচার্যের কি বাহার! গায়ে জামা, পায়ে জুতো, আহা ফিটফাট ফুল-বাবুটি!' ব্যঙ্গ করে উঠল সেই অভক্ত।

'প্রভুকে আমার পরিপাটি করে সাজাও।' ভগবান দাস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন: 'আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার প্রভুর ললাটে তিলক, শিরে জটাজুট ও গলায় তুলসীর মালা। সর্বাঙ্গে বৈষ্ণব চিহ্ন।'

ব্রাহ্মমন্দিরে কীর্তন ঢোকাল বিজয়।

'কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ,
নেত্রের ভূষণ আমার সে রূপ দর্শন,
বদনের ভূষণ আমার সে রূপ কথন,
হস্তের ভূষণ আমার সে পদ সেবন,
(ভূষণের কি আর বাকি আছে)
আমি কৃষ্ণচন্দ্রহার পরেছি গলে ॥'

কেশবকে কীর্তনে দীক্ষিত করলেন ঠাকুর। কেশব গলায় খোল ঝোলালো। মাঝখানে ঠাকুরকে রেখে সকলে নাচছে। কেশবও শুরু করলে নাচতে। কেশব যেমন আসে তেমনি ঠাকুরও যান কেশবের বাড়িতে।

নিমাই সন্ন্যাস দেখতে কেশবের বাড়িতে গিয়েছেন ঠাকুর। কেশবের এক খোশামুদে শিষ্য কেশবকে বললে, 'কলির চৈতন্য হচ্ছেন আপনি।'

কেশব ঠাকুরের দিকে তাকাল। হাসতে-হাসতে বললে, 'তাহলে ইনি কি হলেন ?'

ঠাকুর বললেন, 'আমি তোমার দাসের দাস। রেণুর রেণু।'

কেশবকে বড় ভালোবাসে রামকৃষ্ণ। তার সঙ্গে তার অন্তরের মাখামাখি।

কিন্তু কাপ্তেন খড়্গহস্ত। সে বলে, কেশব ভ্রষ্টাচার, সাহেবের সঙ্গে খায়, ভিন্ন জাতে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। 'আমার সে সবে দরকার কি ? কেশব হরিনাম করে, দেখতে যাই, শুনতে যাই। আমি কুলটি খাই, কাঁটায় আমার কি কাজ ?'

কাপ্তেন ছাড়ে না তবু। 'কেশব সেনের ওখানে যাও কেন তুমি ?'

'আমি তো টাকার জন্যে যাই না। আমি হরিনাম শুনতে যাই। আর তুমি লাট সাহেবের বাড়িতে যাও কেমন করে ? তারা তো ম্লেচ্ছ—' তবে নিবৃত্ত হল কাপ্তেন।

কেশবকে লক্ষ্য করে রঙ্গরসের গান গায় রামকৃষ্ণ:

'জানি ওহে জানি বঁধু
তুমি কেমন রসিক সুজন,
বলি, আর কেন কর প্রাণ-জ্বালাতন।
নেচে ঘুরে ঘুরে
অভিমানে মুখ ফিরায়ে
বঁধু, আর কেন কর প্রাণ জ্বালাতন ॥
রমণীর মন ভুলাতে
নিতি হয় আসতে-যেতে
কেন এলে নিশি প্রভাতে
ওহে, মদনমোহন বংশীবদন ॥'

বিজয়কে কবে গান শোনাবে রামকৃষ্ণ ? কবে তাকে নাচতে শেখাবে ? কবে দেখবে তার গৈরিকবাস সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী মূর্তি ?

আর, বিজয়কৃষ্ণ কবে এসে রামকৃষ্ণের পদতলে পড়বে ? বক্ষে ধারণ করবে সেই পাদপদ্ম ?

আর, সেই তো পরং পদং, পরা কাষ্ঠা।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করছে বিজয়, আবার সেই সংগে চিকিৎসাও করছে। চার দিকে এত রুগী, চুপ করে বসে থাকলে চলে কি করে? যেটুকু জ্ঞান ভাণ্ডারে আছে তা পরিবেশন না করে শান্তি কই? দর্শনী ঠিক করল আট আনা। কিন্তু শুধু রোগ তো নয়, রোগের সংগে নিষ্ঠুরতম রোগ—দারিদ্র্য। তাই গরিব রুগীদের ওষুধ আর পথ্য জোগাতে গিয়ে দর্শনী অদৃশ্য হয়ে গেল। দর্শনী নেই বটে কিন্তু হতে লাগল অপূর্ব দর্শন।

রাত্রে প্রায়ই স্বপ্ন দেখে বিজয়। দেশনেতা সুরেন বাঁড়ুয্যের বাপ দুর্গাচরণ বাঁড়ুয্যে নামজাদা ডাক্তার। তিনি গত হয়েছেন বটে, কিন্তু স্বপ্নে প্রায়ই দেখা দেন বিজয়কে। কঠিন সব রোগের ব্যবস্থাপত্র দিয়ে যান। বিজয় তাই বিছানায় কাগজ ও পেন্সিল নিয়ে ঘুমোয়। স্বপ্নে-পাওয়া প্রেসক্রুপশান ভোরে উঠেই টুকে রাখে। সে অন্ধকারে-ঢিল-ছোঁড়া ওষুধ নয়, সে একেবারে বিশল্যকরণী। ডাক্তার হিসেবে বিজয়ের তাই জয়-জয়কার। শুধু ডাক্তার হিসেবে?

শান্তিপুরের ওপারে গুপ্তিপাড়া। সেখানকার এক রুগী এসেছে বিজয়ের হাতে। সকালে একবার দেখে এসেছে, এখন আবার বিকেলে গিয়ে খোঁজ নেওয়া দরকার। শুধু খোঁজ নেওয়া নয়, নতুন আরেক দফা ওষুধ দিতে হবে। কিন্তু যায় কি করে? বর্ষাকাল, নিদারুণ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়েছে। খেয়া বন্ধ, পাটনী রাজী নয় নৌকো ছাড়তে। তবে, উপায়? উপায় জগৎপিতা। কাপড়ের পাগড়ি করে ওষুধের শিশি মাথায় বাঁধল বিজয়, বর্ষার ভরা নদী পার হয়ে গেল সাঁতরে। রুগী চোখ চেয়ে দেখল, দুয়ারে ধন্বন্তরি দাঁড়িয়ে।

সেই দুর্গাচরণই শেষে আরেক দিন স্বপ্ন দেখালেন। বললেন, 'তুমি কি শুধু দেহের চিকিৎসা করেই দিন কাটাবে? অন্তরের চিকিৎসা করবে না? তুমি শুধু আয়ুর্বেদী নও, তুমি ভবরোগবৈদ্য।'

ডাক্তারি ছেড়ে দিল বিজয়। থাকে বন্ধু ব্রজসুন্দর মিত্রের বাড়িতে। তাকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লিখল তক্ষুনি: 'ভাই, আমার ভিখিরির ঘরে জন্ম, তাই আবার ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে তুলে নিলাম। ব্যবসা করা আমার পোষাল না। তাই তোমার আশ্রয় ছেড়ে চললাম আবার নিরুদ্দেশে। ঈশ্বরের পায়ে নিজেকে বহু দিন বেচে দিয়েছি, তাই তিনি আর আমাকে ত্যাগ করতে পারবেন না। ব্রাহ্মধর্মের জয় হোক। আমার শোণিত পোষণ করুক ব্রাহ্মধর্মকে। ব্রাহ্মধর্মই আচরণীয়। প্রচরণীয়।'

শান্তিপুরে নির্জনে এসে বাস করছে বিজয়। শুধু স্থানের নির্জনে নয়, গুহাশয়ী মনের নির্জনে। হঠাৎ একদিন সেখানে দেখা দিল শ্যামসুন্দর। বিজয় তাকে ত্যাগ করেছে বটে, কিন্তু শ্যামসুন্দর যে ত্যাগীকেও ত্যাগ করে না। ছাড়তে শিখিয়েও যে ধরে থাকে। পথহারা করিয়েও যে পথ দেখায়!

তোকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এলাম, নিয়ে এলাম মন্দির থেকে মুক্ত

প্রাঙ্গণে—' বললে শ্যামসুন্দর : 'আবার তুই এসে সেই ঘরে ঢুকেছিস ? ঢুকেছিস সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ? বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয় আগল ভেঙে—'

কে শোনে কার কথা ! বিজয় ভাবলে ছলনা। নিরংশ জ্ঞানের জগতে ভাবের কুজ্ঝটিকা।

আরেক দিন গভীর রাত্রে ব্রহ্মনাম সাধন করছে বিজয়, মনে হল রুদ্ধ দরজায় কে ঘা মারছে বাইরে থেকে। ভাবতন্দ্রা ঘুচে গেল বিজয়ের ! প্রশ্ন করলে : 'কে ?'

কোনো উত্তর নেই। শুধু দ্রুত করশব্দ। মনে হল এক জন নয়, বহু লোকের সমাগম হয়েছে বাইরে। খুলে দিল দরজা। এক দল জ্যোতির্ময় পুরুষ ঘরে ঢুকল একসঙ্গে। জ্যোতির প্লাবনে ভরে গেল গৃহাঙ্গন। তাদের মধ্য থেকে একজন এল এগিয়ে। বললে, 'আমি অদ্বৈত আচার্য। আর চেয়ে দেখ, ইনি মহাপ্রভু, ইনি নিত্যানন্দ, ইনি শ্রীবাস—'

প্রিয়তন্ময়তায় বিহ্বল হয়ে রইল বিজয়।

'তোমার ব্রাহ্মসমাজের কাজ শেষ হয়েছে।' বললে অদ্বৈত আচার্য : 'এবার মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হও। স্নান করে এসো চট করে। মহাপ্রভু দীক্ষা দেবেন তোমাকে। নাম দেবেন।'

কুয়োর ধারে চলে এল বিজয়। নিশীথ রাত্রে স্নান করলে। মহাপ্রভু তাকে দীক্ষা দিয়ে সদলবলে অন্তর্হিত হলেন।

পরদিন সকালে কুয়োতলায় ভিজে কাপড় দেখে যোগমায়া তো অবাক। স্বামীর দিকে জিজ্ঞাসু চোখ তুলতেই বললে সব বিজয়। শুধু স্ত্রীকেই নয়, কেশব সেনকেও বললে চুপিচুপি।

কেশব বললে, 'কাউকে বোলো না আর এ-কথা। কেউ বিশ্বাস করবে না। তোমাকে পাগল বলবে।'

নিজেরই পাগল বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে স্বপ্নজাল। ব্রাহ্মধর্মে তার ভক্তি অচলা কি না তাই পরীক্ষা করবার ভৌতিক ষড়যন্ত্র। কতগুলি প্রেতলোকবাসী আত্মা এসেছিল হয়তো, তাকে একটু দেখে গেল বাজিয়ে। দেখে গেল মন টলে কিনা। খাঁটি কি না সে তার ব্রহ্মৈক্যবাদে। বিজয় আছে বজ্রবন্ধনে। তার ব্রাহ্মী স্থিতি নিশ্চল স্থিতি। সে টলবার পাত্র নয়।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে কাশীতে এসেছে বিজয়। এসে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে দেখা। শুধু দেখা নয়, সাহচর্য। সঙ্গে-সঙ্গে থাকে আর দেখে তার কাণ্ড-কারখানা। নৈকট্যের তাপ নেয়। নেয় যোগামৃতরসের স্বাদ।

তখনো স্বামীজী অজগরবৃত্তি নেননি, কিন্তু মৌনাবলম্বন করে রয়েছেন। সারা দিন ধরে ঘুরছে-ফিরছে দুজনে, খাওয়া নেই। এক সময় হঠাৎ ইশারায় জিগগেস করলেন স্বামীজী, কিছু খাবে ? বিজয় হ্যাঁ করল। অমনি স্বামীজী ইশারা করলেন আরেক জনকে, বিজয়ের জন্যে কিছু খাবার নিয়ে এস। খাবার এসে গেল তক্ষুনি, কিন্তু পাঁচ-সাত জনের খাবার। বিজয় বললে, এত আমি খেতে পারব না। আপনি কিছু খাবেন ?

খাব। স্বামীজী হাঁ করলেন। ইশারায় বললেন, মুখের মধ্যে ফেলে দাও।

আস্তে-আস্তে সমস্ত খাবারই নিঃশেষ হবার যোগাড়। গ্রাস আর রুদ্ধ হয় না কিছুতেই। বিজয় দেখলে, সমূহ বিপদ। তার ভাগে আর থাকে না বুঝি এক মুঠ। তাড়াতাড়ি সে তার ভাগটা সরিয়ে রাখল চালাকি করে। ঠিক চোখ পড়েছে স্বামীজীর। স্বামীজী হাসলেন, লিখে দিলেন মাটিতে—বাচ্চা সাঁচ্চা হ্যায়।

এক দিন এক কালীমন্দিরে নিয়ে গেলেন বিজয়কে। প্রস্রাব করে কালীর গায়ে ছিটিয়ে দিতে লাগলেন। বিজয় তো হতভম্ব। জিগ্‌গেস করলে, এ কি?

মাটিতে লিখে দিলেন ত্রৈলঙ্গ স্বামী: 'গঙ্গোদকং।'

'কিন্তু গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেবার মানে?'

'পূজা—পূজা করছি।'

'এ পূজার দক্ষিণা কি?'

'দক্ষিণা? দক্ষিণা যমালয়।'

অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে যমালয়।

মন্দিরের পুরোত-পূজারীদের কাছে ব্যাপারটা প্রকাশ করে দিল বিজয়। তারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। বললে, 'তা তো ঠিকই। এঁর প্রস্রাব তো গঙ্গোদকই। ইনি যে সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ।'

এক দিন ত্রৈলঙ্গ স্বামী মৌনভঙ্গ করলেন। দশাশ্বমেধ ঘাটে এসে বললেন, 'আস্নান করো।'

নিজের হাতে ধরে স্নান করালেন বিজয়কে। বললেন, 'তোকে দীক্ষা দেব।'

বিজয় পরিহাস করে উঠল: 'আর রাজ্যে লোক নেই, আপনার কাছ থেকে দীক্ষা! আপনার গঙ্গোদকের যে নমুনা তাতে ভক্তি উড়ে গেছে।' পরে গম্ভীর হয়ে বললে, 'আমি ব্রহ্মজ্ঞানী। গুরুবাদ মানি না। মাপ করুন, পারব না দীক্ষা নিতে।'

'বাচ্চা সাঁচ্চা হ্যায়'—এবার মুখর হয়ে ঘোষণা করলেন স্বামীজী। পরে বললেন, 'শোন্, তোর গুরু আমি নই—সে আসবে ঠিক সময়ে। আমি শুধু তোর শরীর শুদ্ধ করে দেব। আমার উপরে তাই ভগবানের আদেশ।'

কানে মন্ত্র দিল বিজয়ের। বিজয় ভাবল একাকিনী গঙ্গা দিয়ে বুঝি হবে না। গঙ্গাকে এসে মিশতে হবে যমুনার সঙ্গে। জ্ঞানকে এসে মিলতে হবে ভক্তির নির্মল মুক্তিতে। জ্ঞান আত্মানন্দ, ভক্তি বিশ্বানন্দ। ভগবৎ-তত্ত্বের প্রকাশকারিণী শক্তির নামই ভক্তি। ভক্তিই ভগবৎ-অস্তিত্বের প্রমাণ। ভক্তিই বিশ্বাত্মতা। দেহে-গেহে ভক্তিই প্রীতি-প্রদীপ। ভক্তি ছাড়া সবই অন্ধকার।

লাহোরে এসেছে বিজয়, প্রচারের কাজে। হঠাৎ খবর পেল, তার মা, স্বর্ণময়ী পাগল হয়ে গেছেন। পাগল হয়ে কোন্ দিকে যে চলে গেছেন কেউ জানে না। তক্ষুনি বাড়ি ফিরল বিজয়। কিন্তু কোথায় মা! কে একজন কাঠুরে বললে, 'বাঘের গায়ে শিয়র দিয়ে ঘুমোচ্ছেন।'

বনগাঁয়ের কাছাকাছি দুর্ভেদ্য বন। মা'র খোঁজে সেখানেই ঢুকল বিজয়। এমন স্থান নেই যা বিজয়ের কাছে অজেয়। ঠিকই বলেছে কাঠুরে। বাঘের গায়ে মাথা রেখে মা ঘুমোচ্ছেন। মা'র বসন নেই, বাঘের নেই হিংসে। মা'র চোখ বোজা, কিন্তু বাঘ চেয়ে আছে মা'র দিকে। বশ্যতার তৃপ্তিতে।

লোকজন জড়ো করল বিজয়। বাঘকে তাড়িয়ে মাকে সরিয়ে আনতে হয়! কিন্তু কে এগোয়—কী নিয়ে এগোয়!

গোলমালে তন্দ্রা ভেঙে গেছে স্বর্ণময়ীর।

বাঘকে জিগ্গেস করছে, 'বাঘ, তুই কার?'

দুই চোখে ভয়ঙ্কর স্থৈর্য নিয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে বাঘ।

'বল্ সত্যি করে, তুই আমার? আমার যদি হোস, আমাকে তবে তোর পিঠে কর দিকিনি?'

নিশ্চল হয়ে বসে রইল বাঘ। একটা শুধু হাই তুলল।

'বুঝেছি, তুই আমার নোস। কি করেই বা আমার হবি? আমি যে উলঙ্গ কালী। আমি তো দশভুজা নই। দশভুজা দুর্গা যদি হতাম, তুই তবে আমায় পিঠে চড়াতিস।'

বাঘ তেমনি প্রশান্তদৃষ্টি।

'দাঁড়া, তোর জন্যে কিছু খাবার নিয়ে আসি।' বলেই স্বর্ণময়ী বেরুলেন বন থেকে। ছুটলেন নক্ষত্রগতিতে। চক্ষের পলকে বিজয় তাঁর পায়ে পড়ল।

'কে তুই?' থমকে দাঁড়ালেন স্বর্ণময়ী।

'আমি আপনার দাস।'

'দাস হওয়া কি মুখের কথা? কিন্তু দেখি তোর মুখখানি। কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।'

'আপনি চিনবেন না? বিশ্বভুবনের সমস্ত আপনি চেনেন, আর আমাকে চিনবেন না?'

'কে কাকে চেনে? কিন্তু তোকে কোথায় এর আগে দেখেছি বল্ তো? দেখেছি তো, আবার দেখিনি কেন? কোথায় ছিলি? সেখান থেকে আবার এলি কি করে এখানে?'

মাকে স্নান করাল বিজয়। পরিয়ে দিল নতুন কাপড়। বাড়িতে এনে তুলসী তলায় আসন পাতলে। সে-আসনে মাকে বসিয়ে বললে, 'মা, আহ্নিক করো।'

'আহ্নিক কাকে বলে?' স্বর্ণময়ী যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

'সে কি কথা? আহ্নিক তোমার মনে নেই? আমি বলে দেব?'

মৃদু-মৃদু হাসলেন স্বর্ণময়ী। 'বল্ তো—শুনি।'

কোন বাল্যকালে মন্ত্র দিয়েছিলেন মা, তাই মা'র কানে উচ্চারণ করলে বিজয়। শোনামাত্রই স্বর্ণময়ীর চোখ অশ্রুতে আচ্ছন্ন হয়ে এল। ভক্তির অশ্রু, আনন্দের অশ্রু! বিজয় এখনো তাহলে ভোলেনি। মুক্তির পথে বেরুলেও এখনো তার মাকে মনে আছে! আর, ভক্তিই তো মুক্তির মা। চিদ্‌বিলাসের সূচনাই ভক্তি, সমাপ্তিই প্রেম। সেই ভক্তির আভাস কি এখনো জাগবে না বিজয়ে?

প্রতিমায় কি শুধু শিলা? মন্ত্রে কি শুধু অক্ষরযোজনা? শুদ্ধ চেতনার চেয়ে আবেগানুরাগ কি বড় নয়? শুষ্ক একটা বিদ্যমানতার বোধে বুক ভরে কই? সেই বোধের বস্তুতে নিয়তচিত্ত থাকবার জন্যে চাই আতীব্র অনুরাগ। সুখকর অনুসরণ। সেই ঈশ্বরপ্রীতি-প্রার্থনাই ভক্তি। ভক্তিই জাগতিক ক্ষুধানাশক।

না, বিজয় আছে নির্বিশেষে জ্ঞানের স্বরাজ্যে। ঈশ্বরের অগাধবোধে।

তাই তার অসহ্য মনে হল যখন শুনল কেশব সেনকে ব্রাহ্মরা কেউ-কেউ অবতার বলে খাড়া করতে চাইছে। ঈশ্বরজ্ঞানে কেশবের পায়ের ধুলো নিচ্ছে ; শুধু তাই নয়—জল দিয়ে পা ধুয়ে দিচ্ছে নিজের হাতে। এ কী পৌত্তলিক তামসিকতা !

খেপে গেল বিজয়। সরাসরি গিয়ে পাকড়াও করল কেশবকে।

'এ সব কি হচ্ছে ? তুমি আর-সবাইর পুজো নিচ্ছ ?'

'তার আমি কি জানি !' কেশব পাশ কাটাতে চাইল কথাটার। বললে, 'লোকে কি করে না করে তাতে আমার কি যায়-আসে ! অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার আমার অধিকার কোথায় ?'

উত্তর মোটেই মনঃপুত হল না বিজয়ের। লোকে তোমাকে নিয়ে যদৃচ্ছা নাচবে, আর তুমি বলবে কি না স্বাধীনতা ! বিজয় লেখনীতে কশাঘাত শুরু করলে। সংবাদপত্রের কালো কালি লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। কেশবের দলের লোকেরা বিজয়কে নাস্তিক বলে গাল দিলে। কেউ-কেউ বা মারের ভয় দেখালে। বিজয়ের দল নেই। কোনো বন্ধনে সে বন্দীভূত নয়। হতশ্রী কোলাহল শুরু হয়ে গেল চার দিকে। কেশবের নিজেরই কেমন খারাপ লাগতে লাগল। আতিশয্যের মাঝে আর দেখতে পেল না ঐশ্বর্য। সর্বত্র অভ্যাসের শুষ্কতা। কে এক ভক্ত পায়ে ধরে কাঁদছে।

'এখানে কি ?' ধমকে উঠল কেশব। 'আমার কাছে কাঁদলে কি হবে ? ঈশ্বরের কাছে গিয়ে কাঁদুন।'

'আপনিই তো সেই ঈশ্বরের অবতার।'

'মিথ্যে কথা। আমি এক জন সামান্য মানুষ।'

সামান্য মানুষ ? ভক্তের দল চটে গেল। কেশবকে গাল পাড়তে শুরু করলে। বললে, ভণ্ড, মিথ্যেবাদী।

বিজয়ের সঙ্গে হাত মেলাল কেশব। আমরা কেউ কারু নিজের জয় চাই না। শুধু ঈশ্বরের জয় হোক। জয় হোক ব্রাহ্মধর্মের।

কিন্তু সেবারের ঝগড়া বুঝি আর মেটে না।

কেশবের আন্দোলনে ব্রাহ্মবিবাহ আইন পাশ হয়েছে। সে আইনে অন্যূন বয়স ধার্য হয়েছে, ছেলের পক্ষে আঠারো আর মেয়ের পক্ষে চৌদ্দ। বেদী থেকে ঘোষণা করল কেশব, এ বিধি কেবল রাজবিধি নয়, এ ঈশ্বরের বিধি।

কিন্তু ঘটল বিধি-বিড়ম্বনা। কুচবিহারের রাজার সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছে কেশব। কিন্তু মেয়ের বয়স চৌদ্দ হয়নি এখনো। তাতে কি ! রাজার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবে। আইন লঙ্ঘন হয় হোক, কেশব মানবে না সে-আইন। আবার ঘোষণা করল কেশব, এ বিয়ে ঈশ্বরের আদেশ। ঈশ্বরের আদেশের কাছে আবার আইন কি !

এ হচ্ছে সংকীর্ণ সুবিধাবাদীর ব্যবস্থা। বিজয় খেপে গেল। ফুলের চেয়ে সে মৃদু হোক, সে আবার বজ্রের চেয়েও কঠোর। ক্ষমায় সে পৃথিবীর সমান হোক কিন্তু তেজে সে কালানল। তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল। শুধু লেখনীতে নয়,

বক্তৃতায়। অন্যায় ও অসত্যের প্রতিবাদ না করা পাপ। আর নিজের যা স্খলন বা বিচ্যুতি তা ঈশ্বরের উপর আরোপ করা ঘোরতর দুষ্কৃতি।

তুমুল লড়াই শুরু হল। এ যদি মারে ঢিল ও ছোঁড়ে কাদা। শেষ পর্যন্ত বিজয়ের স্ত্রী যোগমায়াকে ভয় দেখিয়ে চিঠি। বিজয়কে ক্ষান্ত করুন, নইলে বিপদ অনিবার্য। চিঠি পড়ে হাসল বিজয়। বললে, 'কেশব কি আমার সৃষ্টিকর্তা না পালনকর্তা যে ও আমাকে বিপদে ফেলবে? আসুক বিপদ, তবু সত্যের অপমান আমি সইতে পারব না।'

মেয়ের বিয়ে শেষ পর্যন্ত হিন্দুমতেই দিতে হল কেশবকে। আহত ভুজংগের মত সে ফুঁসতে লাগল। 'নববিধান' নাম দিয়ে সে নতুন ব্রাহ্মসমাজ চালু করলে। বিজয়ের দলে শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু আর দুর্গামোহন দাশ। তারা স্থাপন করলে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।'

অসাধারণ ঝগড়া। আকাশ রইল আকাশের মনে, ঘট নিয়ে মারামারি।

কিন্তু কেশব যখন একবার রামকৃষ্ণের দেখা পেল তখন আর আবার ঝগড়া কি! কিসের বিবাদ-বচসা, কিসের মতভেদ! মনের মালিন্য মুছে গেল এক মুহূর্তে, বইতে লাগল প্রসন্নতার মুক্তবায়ু। চোখের সামনে জ্বলছে মূর্তিমান ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নি! এ আগুনের কাছে আবার শত্রু-মিত্র কি, মান-অপমান কি, নিন্দা-স্তুতি কি! শুধু নির্গলিত আনন্দ। অমৃতায়িত নির্মলতা।

এ আর কেউ নয়—জাজ্বল্যদর্শন রামকৃষ্ণ। সর্বকামদ কল্পতরু। অহেতুক-দয়ানিধি। এর খবর কি কেউ না দিয়ে থাকতে পারে? বিজয় গুরুর সন্ধানে বনে-বনে ঘুরছে। সে একবার দেখে যাক রামকৃষ্ণকে।

তাই কেশব লিখে পাঠাল: বন্ধু একবারটি দেখবে এস। এমনটি তুমি আর দেখনি। বিজয় ছুটে এল খবর পেয়ে। এসে কী দেখল?

কি দেখল কে জানে! রামকৃষ্ণের দুই পা বুকের মধ্যে চেপে ধরল। স্পর্শাতীতের জগতের স্পর্শমণিকে খুঁজে পেয়েছে। দেখল, সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর বসে আছে। সমস্ত প্রশ্নের সমাধান। সমস্ত তর্কের নিষ্পত্তি। সমস্ত জটিলতার মীমাংসা। সমস্ত যাত্রার উত্তরণ। নরপূজার বিরুদ্ধে এক দিন প্রতিবাদ করেছিল বিজয়। কিন্তু, এখন এ সব কী হচ্ছে? নর কোথায়? এ যে নরাকারে নিরাকার! পরমেশ্বর ইচ্ছাবশে মায়াময় রূপ ধরে অবতীর্ণ হয়েছেন সংসারে। অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সম্রাট হয়েও আছেন হৃদয়েশ্বর হয়ে। খেলার সাথী হয়ে, বিশ্রম্ভের সখা হয়ে। স্নেহে মাতা পালনে পিতা হয়ে। দশদিগন্তব্যাপী প্রেমের মহাসমুদ্র হয়ে।

বিজয়ের কণ্ঠে শুধু সেই শ্রবণলোভন আকূতি, 'হে শ্রীহরি—'

শুধু বিজয়কে নয়, আরো অনেককেই কেশব ডেকে নিয়ে গেল একে-একে।

কেশব শুধু নিমিত্ত। যিনি অন্তরে বসে ডাক দেবার তিনিই ডাক দিলেন।

এগারো নম্বর মধু রায় লেনে থাকে রামচন্দ্র দত্ত—সে গেল সকলের আগে। ক্যাম্বেল মেডিকেল ইস্কুল থেকে ডাক্তারি পাশ করে বেরিয়েছে—ঘোরতর নাস্তিক। নাস্তিক হলেও রামকৃষ্ণের প্রতি অশ্রদ্ধাবান নয়। যখন কেশব বললে, যীশুখৃস্টের মত রামকৃষ্ণেরও 'ট্রান্স' হয়, তখন রাম দত্ত ভাবল, মিরগি রোগ নিশ্চয়ই।

'না হে, হাত-পা খেঁচাখেঁচি করে না। ধীর-স্থির শান্ত হয়ে থাকে। আপনা-আপনি ভালো হয়। ডাক্তার লাগে না কখনো।'

কি জানি বা! এমনতরো কই পড়িনি বইয়ে।

প্রগতিবাদী ছেলে-ছোকরারা ব্যঙ্গ করে পরমহংসকে। বলে, গ্রেট গুস।

পানিহাটিতে বৈষ্ণবদের উৎসব হচ্ছে। যাকে বলে হরিনামের হাটবাজার। ভক্তদের নিয়ে ঠাকুর যাচ্ছেন সে উৎসবে। ভক্তদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ দুইই আছে। চার-চারটে পানসি ভাড়া করা হয়েছে।

শ্রীমা যাবেন কি না—একজন স্ত্রী-ভক্ত এসে জিগগেস করলে ঠাকুরকে।

'তোমরা তো সবাই যাচ্ছ—' বললেন ঠাকুর, 'ওর যদি ইচ্ছা হয় তো চলুক—' ইচ্ছা হয় তো চলুক—নিশ্চয়ই মন খুলে মত দিচ্ছেন না। প্রচ্ছন্ন সুরটি ঠিক ধরতে পেরেছেন শ্রীমা। যদি মন খুলে সম্মতি দিতেন, তা হলে প্রফুল্ল স্বরে বলে উঠতেন, হ্যাঁ, যাবে বৈ কি। তার বদলে, ইচ্ছা হয় তো চলুক। একটু যেন কুণ্ঠার কুয়াশা আছে কোথাও।

শ্রীমা গেলেন না। বললেন, 'অত ভিড়ে আমি যাব না। তোমরা যাও।'

উৎসবশেষে ঠাকুর ফিরেছেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর বলছেন, 'সাধে কি আর ও যায়নি? ও মহাবুদ্ধিমতী। ওর নাম সারদা।'

স্ত্রী-ভক্তরা ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে রইল উৎসুক হয়ে।

'ওখানে আমার ভাবসমাধি হচ্ছিল, তাই দেখে কেউ-কেউ রঙ্গ করছিল আমাকে নিয়ে।' ঠাকুর বললেন ক্ষমাময় স্নিগ্ধ হাস্যে: 'ওকে সঙ্গে দেখলে নিশ্চয়ই বলত ঠাট্টা করে—হংস-হংসী এসেছে!'

তুমি যদি মানসসরোবর, আমরা মানসযাত্রী হংস। আমাদের সমস্ত প্রাণ তোমার দিকে উড়ে চলুক পাখা মেলে। দৈনিক জীবনযাত্রার মধ্যে আমাদের সমাপ্তি নেই, আমরা তাই যাত্রা করেছি তোমার দিকে। পরিপূর্ণের দিকে। অপর্যাপ্তের দিকে।

কলকাতা মেডিকেল কলেজের সহকারী রসায়ন-পরীক্ষক হয়েছে রাম দত্ত। কুরচি গাছের ছাল থেকে রক্তামাশয়ের ওষুধ বের করেছে। বিজ্ঞানের আওতায় এসে নাস্তিকতার নেশায় পেয়েছে। ঈশ্বর আছেন তার প্রমাণ কি? তাঁকে কি দেখা যায়? ব্রাহ্মসমাজে ঘোরে রাম দত্ত। তারা তো ঈশ্বরকে নিরাকার বলেই কাজ সেরেছে। দেখবার আর দায় রাখেনি।

পর-পর এক মেয়ে আর দুই ভাগ্নী মারা গেল কলেরায়। বিজ্ঞানে কুলোল না। ডাক্তারি ডাক্তারকে উপহাস করলে। অস্থির হয়ে পড়ল রাম দত্ত। দগ্ধ মনে শান্তির ওষুধ দেবে এখন কোন ডাক্তার?

হঠাৎ এক দিন দক্ষিণেশ্বরের দিকে রওনা হল। সঙ্গে দুই মিত্তির—মনোমোহন আর গোপালচন্দ্র। দেখি রামকৃষ্ণ কি বলে!

গিয়ে দেখে, দরজা বন্ধ। ভিতরে নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু কি বলে তাকে ডাকে। দ্বিধা করতে লাগল রাম দত্ত। রামকৃষ্ণ মনের কথা টের পেয়েছে। অমনি খুলে দিল দরজা। 'নারায়ণ' বলে নমস্কার করলে।

আমাদের মনের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে নারায়ণ। জেনে-শুনেও খুলি না দরজা। অর্গল এঁটে মনের অন্ধকারে বসে কাঁদি।

'বোসো।'

বসল তিন জন। রাম দত্তের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল রামকৃষ্ণ। বললে, 'হ্যাঁ গা, তুমি না কি ডাক্তার। আমার হাতটা একবার দেখ না।'

রাম দত্ত তো অবাক। কি করে জানলে?

এক মুহূর্তে ফুটে উঠল অন্তরঙ্গতার আবহাওয়া। একে যেন সব কিছু বলা যায়, এ একেবারে ঘরের মানুষ। জিগ্‌গেস করল রামচন্দ্র: 'ঈশ্বর কি আছেন?'

'দিনের বেলায় তো একটি তারাও দেখা যায় না। তাই বলে কি বলবে তারা নেই?' বললে রামকৃষ্ণ। 'দুধে মাখন আছে কিন্তু দুধ দেখলে কি তা ঠাহর হয়? যদি মাখন দেখতে চাও, দুধকে আগে দধি করো। তার পর সূর্যোদয়ের আগে মন্থন করো সে দধিকে। তখন দেখতে পাবে মাখন।'

'কিন্তু কি করে তাঁকে দেখা যায়?'

'বড় পুষ্করিণীতে মাছ ধরতে চাইলে কি করো? আগে খোঁজ নাও। যারা সে পুকুরে মাছ ধরেছে তাদের থেকে খোঁজ নাও। কি মাছ আছে, কি টোপ খায়, কি চার লাগে। শেষে সেই পরামর্শানুসারে কাজ করো। ধরো সেই মনোনীত মাছ।' একটু থামল রামকৃষ্ণ। বললে, 'কিন্তু ছিপ ফেলামাত্রই কি মাছ ধরা পড়ে? স্থির হয়ে অপেক্ষা করতে হয়। তবেই আস্তে আস্তে "ঘাই" আর "ফুট" দেখা যায়। তখন বিশ্বাস হয়, পুকুরে মাছ আছে—আর বসে থাকতে-থাকতে আমিও এক দিন ধরে ফেলব।'

ঈশ্বর সম্বন্ধেও তাই। গুরুর কাছে তত্ত্ব করো। ভক্তি-চার ফেল। মনকে ছিপ করো। প্রাণকে কাঁটা। নামকে টোপ। তার পরে টোপ ফেল সরোবরে। ঈশ্বরের ভাব-রূপ 'ফুট' আর 'ঘাই' জানান দেবে। বসে থাকো তন্নিষ্ঠ হয়ে। টোপ গিলবে মাছ। খেলিয়ে খেলিয়ে ডাঙায়, মানে সংসারে তুলে নিয়ে আসবে। সাক্ষাৎকার হবে।

তার পর?

তার পর আর কি। সেই মাছ তখন ঝালে খাও ঝোলে খাও ভাজায় খাও অম্বলে খাও।

শান্তি পেল রাম দত্ত। শোকে অস্থির হয়ে কাজকর্ম ছেড়ে দিয়েছিল, আবার

ধীর-স্থির হয়ে কাজ করতে লাগল। ঈশ্বর যদি আছেন তবে সুরাহা এক দিন একটা হবেই। সমস্ত কাটাকুটি ও যোগ-বিয়োগের পর হিসেব এক দিন মিলবেই। মন খাঁটি করে রইল।

কুলগুরুর কাছে দীক্ষা না নিয়ে রামকৃষ্ণের থেকে দীক্ষা নিল রাম দত্ত। রাম দত্ত বৈষ্ণব, দীক্ষাদাতা শাক্ত। পাড়ায় ঢি-ঢি পড়ে গেল। 'রাম ডাক্তারের গুরু জুটেছে হে। ঐ যে দক্ষিণেশ্বরে থাকে—কৈবর্তদের পূজুরী। কেলেঙ্কারী করলে মাইরি—'

সবাই চটল। চটল কিন্তু পিছিয়ে গেল। পিছন থেকে টিপটেন কাটতে লাগল। এগিয়ে এল পাড়ার সুরেশ মিত্তির, আসল নাম সুরেন মিত্তির। দুর্ধর্ষ শাক্ত। কেশব সেন যখন বিডন স্কোয়ারে ব্রাহ্মধর্মের বক্তৃতা দেয়, তখন তার খোলের চামড়া কেটে দিয়েছিল ছুরি দিয়ে।

'ওহে রাম, তোমার গুরুর কাছে একবার নিয়ে চল।' বললে সুরেশ। 'কেমন হংস একবার দেখে আসি।'

রাম দত্ত হাসল। বললে, 'চল।'

'কিন্তু এক কথা। তোমার হংস যদি মনে শান্তি দিতে না পারে তবে তার কান মলে দিয়ে আসব।'

সে যুগে 'কান মলে দেব' কথাটার বড় বেশি চল। অন্যের কানটা যেন হাতের কাছেই আছে এমনি একটি আত্মদৃপ্ত উদ্ধত ভাব সকলের। সিমলে স্ট্রীটে থাকে। সদাগরি অফিসের মুৎসুদ্দি। বুদ্ধিতে পাটোয়ার। আর মদে টুপভুজঙ্গ। গেল রাম দত্তের সঙ্গে। দেখল ভক্ত-পরিবৃত হয়ে ভাবে বিভোর হয়ে বসে আছে রামকৃষ্ণ। রাম দত্ত প্রণাম করল। এক পাশে সুরেশ বসল নির্লিপ্ত হয়ে। ভাবখানা এই, কান মলে যে দিইনি এই যথেষ্ট।

বাঁদরের বাচ্চা না বেড়ালের বাচ্চা—এই গল্পটাই তখন বলছিল রামকৃষ্ণ।

'বাঁদরের বাচ্চা জোর করে মা'র কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মা ব্যাজার হয়ে ফেলে দেয়, পড়ে গিয়ে কিচমিচ করে। কিন্তু মা-অন্ত প্রাণ বেড়ালছানা মা-ও মা-ও, কি না মা-মা বলে ডাকে। মা যেখানে রাখে সেখানেই সুখে থাকে। ছাইয়ের গাদায়ই হোক বা গদিবিছানায়ই হোক। একেই বলে নির্ভরের ভাব—'

অমৃতময় কথা। সুরেশের সমস্ত জিজ্ঞাসার নিরসন হয়ে গেল। ভক্তিভরে প্রণাম করল রামকৃষ্ণকে।

রামকৃষ্ণ বললে, 'কালী ভজনা কর যখন, মা'র উপর নির্ভর রাখ ষোলো আনা। তবে মাঝে-মাঝে এসো এখানকে, ভগবৎ-ভাবের উদ্দীপনা হবে!'

'ভাই, কান মলতে গিয়েছিলাম, কান মলা খেয়ে এলাম।' রাম দত্তের কানে-কানে বললে সুরেশ।

নরেন্দ্রনাথেরও সেই কথা।

নরেন্দ্রনাথ আরো দুর্ধর্ষ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে উপাসনায় ধ্রুপদ গায়। হার্বার্ট স্পেনসার, স্টুয়ার্ট মিল পড়ে। গলার জোরে গায়ের জোরে তর্ক করে। পাদরিদেরও ছাড়ে না। তেড়েফুঁড়ে কথা কয়। কথার দাপটে ভূত ভাগায়।

তাকে এক দিন ধরলে রাম দত্ত। 'বিলে, শোন্‌—'

নরেন দাঁড়াল।

'দক্ষিণেশ্বরে এক পরমহংস আছেন দেখতে যাবি ?'

'সেটা তো মুখখু—' এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিল নরেন। বললে, 'কী তার আছে যে শুনতে যাব ? মিল স্পেনসার লকি-হ্যামিলটন এত পড়লুম, কোনো কিনারা হল না। ঐ একটা কৈবর্তের বামুন, কালীর পুজুরী—ও কি জানে ?'

'একবার গিয়ে কথা বলেই দেখ না—'

কি ভাবল নরেন। বললে, 'বেশ, যদি রসগোল্লা খাওয়াতে পারে তো ভালো, নইলে কান মলে দেব বলছি।'

স্যার কৈলাস বসুও চেয়েছিলেন ঠাকুরের কান মলতে।

রাম দত্তকে বললেন, 'তুমি বলছ, তাই যাচ্ছি একবার তোমার পরমহংসকে দেখতে। যদি ভালো লোক হয় তো ভালো, নইলে তার কান মলে দেব বলে রাখছি।'

ঠাকুর তখন কাশীপুরের বাগানে, অসুস্থ। উপরে আছেন। নিচে বসে অপেক্ষা করছে কৈলাস। নিচের ঘরের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছে এই ভাবে : 'আরে, গিয়ে দেখলুম নরেনটা বি-এ পাশ করে একেবারে বকে গেছে। নিচেকার হল-ঘরের কতগুলো ছোঁড়া নিয়ে এলোমেলো ভাবে বসে আছে আর রামের বাড়ির সেই চাকর-ছোঁড়া লাটু—সেটাও বসে আছে ওদের সঙ্গে। আরে ছ্যা !'

উপর থেকে কে এক জন চলে এল নিচে। বললে, 'ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, যে বাবুটি আমার কান মলে দেবেন বলেছেন তাঁকে ওপরে নিয়ে এস। তাই নিতে এসেছি। তিনি কে, কোনটি ?'

কৈলাস তো স্তম্ভিত ! সিমলেতে ঘরের মধ্যে বসে রামের সঙ্গে কি কথা কয়েছি কাশীপুরের বাগানে সে-কথা এল কি করে এখুনি ? স্খলিত পায়ে উঠে গেল কৈলাস। অচ্যুত-পায়ে প্রণাম করলে। মানলে গুরু বলে, দিগদর্শক বলে।

কিন্তু গিরীশ ঘোষ আরেক কাঠি সরেস। তার থিয়েটারে গিয়েছেন ঠাকুর, মাতাল হয়ে তাঁকে বাপান্ত গালাগাল করলে গিরীশ। নেপথ্যে নয়, মুখের উপর। দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসে তাই বলছেন ঠাকুর : 'শুনেছ গা ! গিরীশ ঘোষ দেড়খানা লুচি খাইয়ে আমায় যা না তাই বলে গালাগাল দিয়েছে।'

'ওটা পাষণ্ড। ওর কাছে আপনি যান কেন ?'

যাই কেন ! যাই বলে এই ব্যবহার ! রাম দত্তের কাছে নালিশ করলেন ঠাকুর।

কেন, বেশ তো করেছে। ঠিকই করেছে। গিরীশকে সমর্থন করল রাম দত্ত।

'শোন, শোন, রাম কি বলে শোন। সে আমার মাতৃপিতৃ উচ্চারণ করল, আর রাম বলে কি না—'

'ঠিকই বলি। কালীয়কে শ্রীকৃষ্ণ তাড়া করলেন, কি জন্যে তুমি বিষ উদ্‌গীরণ কর ? কালীয় কী বললে ? বললে, ঠাকুর, তুমি আমাকে বিষ দিয়েছ, সুধা উদ্‌গীরণ করব কি করে ? গিরীশ ঘোষকে আপনি যা দিয়েছেন তাই দিয়ে সে আপনার পুজো করছে।'

হাসলেন ঠাকুর। বললেন, 'যাই হোক, আর কি তার বাড়িতে যাওয়া ভালো হবে?'

'কখনোই না।' অনেকে বলে উঠল একসঙ্গে।

'রাম, গাড়ি আনতে বলো।' উঠে পড়লেন ঠাকুর। 'চলো তার বাড়ি যাই।' সকলে তো লুপ্তবাক।

তুমিও চলো, রাম। তুইও চল, নরেন। পতিতপাবন চললেন জীবোদ্ধারে।

+ ৬২ +

হে ঈশ্বর, তুমি তো জানো আমরা কত দুর্বল, কত অক্ষম, কত ক্ষণভঙ্গুর। মুখোমুখি তোমার সামনে গিয়ে যে দাঁড়াতে পারি এমন আমাদের সাধ্য নেই। কি করে সইব তোমার সেই আলো, কি করে বইব তোমার সেই ভালোবাসা! আমরা ক্ষুদ্র, আমরা ক্ষীণ, আমরা অল্পপ্রাণ। তা জানো বলেই তো আমাদের জন্যে তোমার এত কৃপা, এত অনুকম্পা। তাই তো তোমার ও আমাদের মাঝখানে তুমি অন্তরাল রচনা করেছ। তোমার চিরন্তন উপস্থিতির উলঙ্গ উজ্জ্বলতা সইতে পারব না বলেই এই অন্তরাল। এই অন্তরালটিই তোমার মায়া। এই অন্তরালের নামই সংসার। ছোট-ছোট বেড়া তুলে দিয়েছ আমাদের চার পাশে। ধনের বেড়া মানের বেড়া অহঙ্কারের বেড়া। তুচ্ছ আশা-আকাঙ্ক্ষার শুকনো খড়কুটো দিয়ে চাল ছেয়ে দিয়েছ মাথার উপরে। আশে-পাশে ছোট-ছোট সুখ-দুঃখের ঘুলঘুলি বসিয়েছ। মৃত্তিকার মেঝেটি শীতল করে লেপে দিয়েছ স্নেহ-প্রেমের সিঞ্চনে। এমনি করে অপরিসর ঘরের মধ্যে আমাদের ঢুকিয়ে দিয়ে তুমি দূরে সরে দাঁড়িয়েছ। সরে না দাঁড়িয়েই বা করবে কি। তোমার কি দোষ! আমরাই যে অশক্ত, অসমর্থ। তোমার আলোর ছটায় আমাদের দু চোখ যে ধাঁধিয়ে যাবে, তোমার ভালোবাসার ভারে ভেঙে পড়বে যে আমাদের বুক। তাই তুমি কৃপা করে তোমার ও আমাদের মাঝখানে মায়ার যবনিকা ফেলে রেখেছ। রেখেছ এই রমণীয় ব্যবধান। এই মনোহর দূরত্ব।

সংকীর্ণ পর্বতপথরেখা ধরে চলেছে রামসীতা, অনুগামী লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে। সর্বাগ্রে রাম, রামের পিছনে সীতা, সীতার পিছনে লক্ষ্মণ। এই তাদের বনাভিযানের চিরন্তন চিত্র। রাম আর লক্ষ্মণের মাঝখানে অপরিহরণীয়া সীতা। লক্ষ্মণ ভাবছে, এত দিন চলেছি একসঙ্গে, রামকে দাদা ছাড়া আর কিছু বলে দেখতে পেলাম না কোনো দিন। হনুমান তাঁকে নারায়ণ বলে সেবা করছে, বিভীষণও পুজা করছে বিষ্ণুজ্ঞানে, কিন্তু আমার কাছে তিনি শুধু আমার সেই সাদাসিদে দাদা, দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আমি তো কই তাকে কেষ্টবিষ্টু বলে দেখতে পাচ্ছি না। কি করে পারবে? কি করে রামকে দেখবে তাঁর স্বভাব-মূর্তিতে? লক্ষ্মণ আর রামের মধ্যখানে যে মায়ারূপিণী সীতা দাঁড়িয়ে। মায়াই যে দেখতে

দিচ্ছে না মায়াধীশকে। সীতা যতক্ষণ না সরে দাঁড়াচ্ছেন ততক্ষণ শ্রীরামদর্শন হচ্ছে না লক্ষ্মণের। ততক্ষণ রাম শুধু দশরথের ছেলে, শুদ্ধ-ব্রহ্ম-পরাৎপর রাম নয়।

তেমনি, ঈশ্বর, এই মায়াময় সংসার সৃষ্টি করে তুমি আমাদের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করেছ। তোমাকে ভুলে-থাকবার খেলায় অষ্টপ্রহর মেতে আছি আমরা। কিন্তু তুমি তোমার নিজের খেলায় মেতে থেকেও আমাদের ভোলনি। যবনিকা সরিয়ে মাঝে-মাঝে উঁকিঝুঁকি মারছ। আভাসে তোমার গায়ের বাতাস আমাদের গায়ে লাগছে। আমরা চমকে-চমকে উঠছি, বুঝতে পারছি না, ধরতে পারছি না। এমন একেকটা আনন্দ দিয়েছ, তোমাকে দেখবার জন্য ব্যগ্র হয়ে বাইরে ছুটে এসেছি। এমন একেকটা দুঃখ দিয়েছ, ঘরের নিঃসংগ অন্ধকারে কেঁদেছি তোমাকে বুকে নিয়ে। তবু, কই, তোমাকে দেখতে পাচ্ছি কই! রুদ্ধদৃষ্টি বধির যবনিকা দুর্ভেদ্য বাধা মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে চোখের সামনে।

এই যবনিকা উত্তোলন করো। উন্মোচিত করো এই নিষ্ঠুর অবগুণ্ঠন। তোমাকে দেখতে দাও। দেখতে দাও তোমার সম্পূর্ণ মুখচ্ছবি। তোমার নীরবতার মুখ, গভীরতার মুখ, অতলতার মুখ। পদ্ম যেমন সূর্যকে দেখে, তেমনি করে দেখতে দাও তোমাকে। তুমি অপাবৃত হও, উন্মাটিত হও, দূর করে দাও এই আচ্ছাদনের কুহেলি।

সারদা হঠাৎ মুখের ঘোমটা খুলে দাঁড়াল রামকৃষ্ণের সামনে। আর রামকৃষ্ণ করজোড়ে স্তব করতে লাগল।

মুখের ঘোমটা ঠিক সারদা নিজে সরায়নি, সরিয়েছে আরেক জন। সেই কথাটাই বলি। এমনিতে সব সময়ে মুখের উপর ঘোমটা টানা সারদার। যখন রামকৃষ্ণের কাছে এসে দাঁড়ায়, তখন জড়পুত্তলী ছাড়া তাকে আর কি বলবে! যা-ও দু-একটা কথা কয়, তা-ও ঘোমটার ভিতর দিয়ে। কথার সংগে-সংগে মুখের ভাবটি কেমন হয় তা কে জানে!

রামকৃষ্ণের তখন খুব অসুখ, সারদা থাকে দূরে, শম্ভুবাবুর সেই চালাঘরে। রামকৃষ্ণের সেবার তাই অসুবিধে হচ্ছে। কাশী থেকে কে একজন মেয়ে এসেছে, সেই সেবা করছে রামকৃষ্ণের। সেই মেয়ের কি নাম, কোথায় বাড়ি, কবে এল কবে যাবে কেউ কিছু খবর রাখে না। এক দিন রাত্রে সেই কাশীর মেয়ে চালাঘর থেকে সারদাকে ধরে নিয়ে এল। ধরে নিয়ে এল সটান রামকৃষ্ণের ঘরের মধ্যে। রামকৃষ্ণ যেখানে বসে ছিল সেইখানে তার চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সারদা। মুখে তার সেই দীর্ঘ ও দুর্ভেদ্য ঘোমটা। কাশীর মেয়ে সহসা সবল হাতে সারদার সেই মুখের ঘোমটা খুলে ফেলল এক টানে। রামকৃষ্ণকে দেখাল সেই মুখ।

রামকৃষ্ণ কী দেখল রামকৃষ্ণই জানে।

করজোড়ে তৎক্ষণাৎ স্তব শুরু করল। কোথায় অসুখ, কোথায় সেবা, সমস্ত রাত ভগবৎ-কথা ছাড়া আর কথা নেই। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সারদা। পটার্পিতের মত। কখন যে রাত পুইয়ে ভোর হয়ে গেল ধীরে-ধীরে, কেউ টের পেল না।

এবারে কলকাতায় এসে সোজাসুজি দক্ষিণেশ্বরে উঠল না সারদা। সংগে

প্রসন্নময়ী ছিল, উঠল প্রথমে তার বাসায়। পরদিন সকালে দক্ষিণেশ্বরে হাজির। সারদার মা শ্যামাসুন্দরী সেবার সংগে এসেছে, সারদা তাই একটু তটস্থ। মনে আশা, মাকে কেউ একটু সমাদর করুক। মিষ্টি করে কথা বলুক দুটো।

বরং ঠিক তার উলটোটা ঘটল। হৃদয় এল তেরিয়া হয়ে। শ্যামাসুন্দরীকে লক্ষ্য করে বললে, 'এখানে কি! এখানে তোমরা কি করতে এসেছ?'

শ্যামাসুন্দরী তো হতবাক। সারদা অপ্রস্তুত। এমন কাণ্ড কে কবে দেখেছে! দরজায় পা দিতে-না-দিতেই গলাধাক্কা!

আর কাউকে কথা বলতে দিল না। নিজেই গজরাতে লাগল হৃদয়: 'তোমাদের এখানে আসবার কি দরকার! বলা নেই কওয়া নেই সটান এখানে এসে হাজির! এখানে মজাটা কিসের জানতে পাই?'

শ্যামাসুন্দরী শিওড়ের মেয়ে, হৃদয় তাই তাকে গ্রাহ্যই করলে না। উলটে অপমান করলে। সবাই ভাবল রামকৃষ্ণ এর একটা প্রতিকার করবে। কিন্তু হাঁ-না কিছুই বললে না রামকৃষ্ণ। বলতে গেলে গালমন্দ করে হৃদয় তাকে নাস্তানাবুদ করবে। হৃদয়ের মুখ তো নয় যেন বিষের হাঁড়ি। হৃদয়কে রামকৃষ্ণের বড় ভয়।

শেষকালে শ্যামাসুন্দরী বললে, 'চল দেশে ফিরে যাই। এখানে কার কাছে মেয়ে রেখে যাব?'

অন্তরে মরে গেল সারদা। মা'র মনের ব্যথাটি গুমরাতে লাগল মনের মধ্যে।

'তাই যাও মেয়ে নিয়ে। ওরে রামলাল, পারের নৌকো এনে দে।'

রামলাল নৌকো নিয়ে এল। সেই দিনই মাকে নিয়ে ফিরে গেল সারদা। আর কোনো দিন আসব না এমন কোনো প্রতিজ্ঞা করল না রাগ করে। বরং মা-কালীকে উদ্দেশ করে মনে-মনে বললে, 'মা, আবার যদি কোনো দিন আনাও তো আসব।'

হৃদয়কে নিয়ে রামকৃষ্ণের বড় যন্ত্রণা। বড় হাঁকডাক করে, কথায়-কথায় হৈ-হুজ্জত। এত শাসন-জুলুম ভালো লাগে না রামকৃষ্ণের। অথচ উচ্চ-বাচ্য করার যো নেই। কিছু বলতে গেলেই আবার তেড়ে আসবে। দাঁতে খড়কে দিয়ে বসে থাকে রামকৃষ্ণ। শুধু কি তাড়না? ফোড়ন দিতেও ষোলো আনা ওস্তাদ।

কাউকে হয়তো উপদেশ দিচ্ছে রামকৃষ্ণ, অমনি হৃদয় চিপটেন ঝাড়ল: 'তোমার বুলিগুলি সব এক সময়ে বলে ফেল না! ফি বার একই বুলি বলার মানে কি?'

সর্বাংগ জ্বলে গেল রামকৃষ্ণের। ঝাঁজিয়ে উঠল তক্ষুনি: 'তা তোর কি রে শালা? আমার বুলি, আমি লক্ষ বার ঐ এক কথা বলব—তাতে তোর কি?'

গালাগাল তো দেয়ই, আবার থেকে-থেকে টাকা-টাকা করে। জমি-জায়গার ফিকির খোঁজে। হাটে যায় গরু কিনতে। এক দিন রামকৃষ্ণকে এসে বললে, একখানি শাল কিনে দাও দেখি।

রামকৃষ্ণ তো অবাক। আমি কোথা শাল পাব?

'না দেবে তো নালিশ করব বলে রাখছি।' হৃদয় চোখ রাঙালো।

কর্ না। শেষকালে শালের বদলে শূল এসে না জোটে।

শুধু চাওয়া আর চাওয়া! শুধু হৈচৈ। আশুতোষের ঘরে কেউ নয়, সবাই

অসন্তোষের ঘরে। বাজ পড়লে ঘরের মোটা জিনিস তত নড়ে না, শার্সিই খটখট করে। রামকৃষ্ণ ঠিক করল কাশীবাসী হব। আর সহ্য হয় না জ্বালাতন।

কিন্তু কাশী যে যাবে, কাপড় না-হয় নেবে, কোনো রকমে রাখবে না-হয় পরনে, কিন্তু টাকা নেবে কেমন করে? হাতে মাটি দেবার জন্যে মাটি নিতে পারে না রামকৃষ্ণ। বটুয়া করে পান আনবার যো নেই। কাশী যাবার টিকিট রাখবে কিসের মধ্যে? আর কাশী যাওয়া হল না।

কিন্তু একটা ব্যবস্থা তো দরকার। ব্যবস্থা আবার কি! হৃদয় না হলে দেখবে-শুনবে কে, সেবা করবে কে? বর্ষার দিনে পেট-খারাপের সময় মাছের ঝোল আর শুক্তোর যোগাড় দেখবে কে?

তুমি তোমার কাজ করো না। হৃদয়কে থাকতে দাও না তার মোড়লির মণ্ডলে।

তুমি এত বড় জগৎ-সংসারের মোড়লি করছ, হৃদয়ের এই সেবার প্রভুত্বে কেন বাদ সাধছ? হৃদয় আর কাউকে তোমার পা ছুঁতে দেয় না, শুধু ঐ পা দুখানি নিজের নিভৃত বুকে ধরে রেখেছে বলে।

তবু জীব-নিয়তির বন্ধন তার গলায়। সে টাকা চায়, জমি চায়, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার চায়। তোমার ও তার মাঝখানে চায় সে একটি সহন-শোভন যবনিকা। জীবননাটকের বিচিত্রিত পটপৃষ্ঠা। তুমি যদি না তোলো, কার সাধ্য তা সরায়! তুমি যদি না খোলো, কার সাধ্য নড়ায়!

৬৩

অর্ধেক রাতে উঠে রামকৃষ্ণ কুটনো কুটতে লেগেছে। তা-ও দিগম্বর হয়ে। এমন কথা শুনেছে কেউ? হৃদয় খেপবে না তো কি! শুধু তাই নয়, কাল সকালের চাল-ডাল মশলা সব যোগাড় করে রাখছে রামকৃষ্ণ।

'তুমি তো বেশ লোক।' খুট-খুট শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গিয়েছে হৃদয়ের। 'চোখে ঘুম নেই বুঝি? মাঝ রাতে উঠে এই কাণ্ড?'

হৃদয়ের কথা রামকৃষ্ণ তো ভারি গ্রাহ্য করে! নিজের মনে কাজ করে চলেছে।

'কেন? ও সব কি সকালে হয় না?'

'তুই তার কি বুঝবি? ঘুম ভেঙে গেল, ভাবলুম বসে-বসে কি আর করি, কালকের রান্নার যোগাড় দেখি গে যাই।' সরল সহাস মুখে বললে রামকৃষ্ণ।

'কিন্তু ও তোমার কি কাজের ছিরি! ঠিক একটা লোকের মত অল্প-সল্প করে যোগাড় করছ। ঐটুকু তরকারিতে তোমার পেট ভরবে?' হৃদয় ঝামটা মেরে উঠল: 'আচ্ছা কিপ্পন যা হোক।'

'তা তো বলবিই। তোদের কি! খুব খানিকটা বেশি-বেশি করে অপচয় করতে পারলেই হল! আমার পেটের আটকোল যখন জানিস না তখন চুপ করে থাক—'

'রাখো। তোমার মত গুনে-গুনে একশোটা ভাতের দানা রাখতে পারব না পাতে।'

'শোন্, এই ভাতের জন্যই কুলীন বামুনের ছেলে হয়ে এখানে চাকরি করতে এসেছিস। নইলে কোথায় শিওড় আর কোথা দক্ষিণেশ্বর ! যদি দেশে তোর ধানের জমি বা টাকা-পয়সা সচ্ছল থাকতো তা হলে কি আসতিস এখানে ? শোন্, লক্ষ্মীছাড়া হতে নেই, মিতব্যয়ী হবি।'

একজনকে একটা দাঁতন-কাঠি আনতে বলল রামকৃষ্ণ। সোজা দু-তিনটে ডাল ভেঙে আনলে সে।

'শালা, তোকে একটা আনতে বললুম, তুই এতগুলি আনলি কেন ?'

লোকটা ভেবেছিল রামকৃষ্ণ বুঝি খুশি হবে অনেকগুলি দাঁতন পেয়ে। উলটে ধমক খাবে ভাবতে পারেনি।

দু দিন পরে আবার সেই লোককেই বললে রামকৃষ্ণ : 'ওরে একটা দাঁতন দে না—' সে আবার ছুট দিল বাগানের দিকে।

'আজ্ঞে গাছ থেকে ভেঙে আনতে যাচ্ছি।'

'কেন, সেদিন যে অতগুলি আনলি—নেই ?'

'আছে।'

'তবে আবার ডাল ভাঙতে ছুটছিস যে ?' রামকৃষ্ণ শাসনের সুরে বললে, 'ও গাছ কি তুই সৃজন করেছিস যে মনে করলেই টপ করে কিছু ডাল ভেঙে আনবি ! যার সৃজন সেই জানে। বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে, বুঝে-সুজে কাজ কর্। জিনিসের অপচয় করবি কেন ?'

ঠিক-ঠিক উপদেশ মত চলতে চেষ্টা করে রামলাল। রাত্রে যত বার বিড়ি খায়, পোড়া দেশালাইয়ের কাঠি দিয়ে ধরিয়ে নেয় লণ্ঠন থেকে। ফালতু একটিও বাক্সের কাঠি খরচ করে না।

'যত সব হাড়-কিপ্পন—' হৃদয়কে বাগানো যায় না কিছুতেই।

খিটিমিটি বেধেই আছে রামকৃষ্ণের সংগে। সামান্য বচসা নয় দস্তুরমতো লম্বাই-চওড়াই ঝগড়া। রামলাল বলে, সে সব ঝগড়া দেখবার মত।

একেক সময় ভীষণ রেগে যায় রামকৃষ্ণ। হৃদয়কে যা-তা গালাগাল দিয়ে বসে। এমন সব কথা বলে যা মুখে আনা যায় না।

হৃদয় তখন চুপ করে থাকে। যখন অসহ্য হয়, বলে, 'আঃ, কি কর মামা। ও সব কথা কি বলতে আছে ? আমি যে তোমার ভাগনা।'

আমার গালাগাল দেওয়া নিয়ে কথা। কথার অর্থ দিয়ে আমার কি হবে ?

আমার পূজা করা নিয়ে কথা। আমার স্তোত্রমন্ত্র দিয়ে কি হবে ?

আমার ভালোবাসা দেওয়া নিয়ে কথা। আমি রূপ-গুণ রত্ন-বস্ত্র দিয়ে কী করব ?

একেক সময় গালাগালেও মেটে না। হাতের সামনে যা পায়, ঝাঁটা-জুতো, সপাসপ লাগিয়ে দেয় হৃদয়ের পিঠে। হৃদয় নীরবে সহ্য করে।

মনে হয় এই বুঝি দুজনে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার দুজনে ভালোবাসা, আবার ঠাট্টা-ইয়ার্কি। আবার হৃদয়ের প্রাণ-ঢালা সেবা। পর্যন্তহীন পরিচর্যা। তখন আবার হৃদয় হুকুম করছে রামকৃষ্ণকে। আর রামকৃষ্ণ তাই শুনছে চুপ করে। হৃদয়ের যখন প্রভুত্বের পালা তখন আবার সেই মাত্রাজ্ঞানহীন

কোলাহল। রামকৃষ্ণের যন্ত্রণার একশেষ। রামকৃষ্ণ ভাবল এ দেহ আর রাখব না। গঙ্গায় ঝাঁপ দেবার জন্যে পোস্তার উপর গিয়ে দাঁড়াল।

দেহত্যাগ করতে হবে না রামকৃষ্ণকে। মা অন্য রকম ব্যবস্থা করে দিলেন।

হৃদয়ের কি খেয়াল হল, কুমারী-পুজো করবে। কিন্তু কুমারী কোথায় ? মথুরবাবুর নাতনী—ত্রৈলোক্য বিশ্বাসের মেয়েকে পাকড়াও করলে হৃদয়। পায়ে ফুলচন্দন দিয়ে পুজো করলে। খবর শুনে নিদারুণ চটে গেল ত্রৈলোক্য। কে জানে কি অকল্যাণ হবে না-জানি মেয়ের। যত সব মূর্খ অঘটন।

মন্দিরের কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলে হৃদয়কে। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে চলে যাও মন্দির ছেড়ে। আর কোনো দিন ঢুকতে পাবে না এর ত্রিসীমায়।

দারোয়ান এসে বললে, 'আপনাকে এখান থেকে যেতে হবে।'

'আমাকে ?' রামকৃষ্ণ চমকে উঠল : 'সে কি রে ? আমাকে নয়, হৃদুকে।'

'না, বাবুর হুকুম,' দারোয়ান বললে শাসনভঙ্গীর কণ্ঠে : 'তাকে আর আপনাকে দুজনকেই যেতে হবে।'

ব্যস, আর বিন্দুমাত্র বাক্যব্যয় নেই, ক্ষণমাত্র দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই, রামকৃষ্ণ চটি পরে বেরিয়ে গেল।

হাঁ-হাঁ করতে-করতে ছুটে এল ত্রৈলোক্য। ছুটে এসে হাতে-পায়ে ধরল রামকৃষ্ণের। 'ও কি ? আপনি যাচ্ছেন কেন ? আপনাকে তো আমি যেতে বলিনি।'

'তাই নাকি ?' কিছু আর না বলে ফিরে এল রামকৃষ্ণ।

ত্যাগেও ঝাঁজ নেই রামকৃষ্ণের। নির্লিপ্ত, নিরভিমান। যেতে বলো চলে যাচ্ছি। থাকতে বলো থাকছি এককোণে। আমার কোনো ইতরবিশেষ নেই। আমার যেতেও যেমন আসতেও তেমন।

'ওরে হৃদু, তোকে একাই চলে যেতে বলেছে।'

হৃদয় চলে গেল হেঁট মুখে। রামকৃষ্ণ দেখল, মা-ই তাকে সরিয়ে দিলেন।

এবার আবার হাজরাকে নিয়ে মুশকিল হয়েছে। ব্রহ্ম আর শক্তি যে অভেদ এ সে কিছুতেই মানতে চায় না।

তখন রামকৃষ্ণ মাকে ডাকতে বসল। বললে, 'মা, হাজরা এখানকার মত উলটে দেবার চেষ্টা করছে। হয় ওকে বুঝিয়ে দে, নয় ওকে সরিয়ে দে এখান থেকে।'

'হাজরার কথায় আপনার এত লাগল ?' জিগগেস করল ভবনাথ।

'এখন আর লোকের সঙ্গে হাঁক-ডাক করতে পারি না। হাজরার সঙ্গে যে ঝগড়া করব এ রকম অবস্থা আর আমার নয়—'

মা প্রার্থনা শুনলেন।

পর দিন হাজরা এসে বললে, 'হ্যাঁ, মানি। বিভু সকল জায়গায় বর্তমান।'

জীবের স্বভাবই সংশয়। হ্যাঁ বললেও, ঢোক গিলে বলে, কিন্তু। বিশ্বাস হতে হবে প্রহ্লাদের মত। স্বতঃসিদ্ধ। স্বতঃস্ফূর্ত। 'ক' দেখেই প্রহ্লাদের কান্না। 'ক' দেখেই দেখেছে কৃষ্ণকে। বালকের বিশ্বাস চাই।

এক দিন ঘাসবনে কি কামড়েছে ঠাকুরকে। ভয় হল, যদি সাপ হয়। তবে কি করা ! ঠাকুর শুনেছিলেন, আবার যদি সাপ কামড়ায়, তা হলে বিষ ঠিক তুলে নেয়।

তখন সাপের গর্ত খুঁজতে লাগলেন ঠাকুর, যাতে আবার কামড়ায় দয়া করে। কিন্তু গর্ত ঠিক ঠাহর হচ্ছে না। একজন জিগ্‌গেস করলে, কি করছেন? সব বললেন তাকে ঠাকুর। লোকটি বললে, যেখানটায় আগে কামড়েছে ঠিক সেই জায়গায় কামড়ানো চাই। তখন উঠে পড়লেন ঠাকুর।

আরেক দিন রামলালের কাছে শুনেছিলেন, শরতের হিম ভালো। নজির হিসেবে কি একটা শ্লোকও আওড়েছিল রামলাল। কলকাতা থেকে গাড়ি করে ফিরছেন ঠাকুর, গলা বাড়িয়ে রইলেন বাইরে, যাতে সব হিমটুকু লাগে। তাই লাগল। তার পর অসুখ।

'গংগাপ্রসাদ আমাকে বললে আপনি রাত্রে জল খাবেন না। আমি ঐ কথা বেদবাক্য বলে ধরে রেখেছি। আমি জানি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।'

বিশ্বাসের কত জোর! সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ যে রাম তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু লাগল। কিন্তু শুধু রাম নামে বিশ্বাস করে লাফ দিয়ে সমুদ্র ডিঙোল হনুমান। তার সেতু লাগল না। তোমার-আমার বিরহের অন্তরালে আর কত সেতু বাঁধব? যে সমুদ্রে আমি সে সমুদ্রে তুমিও। আমি যাচ্ছি ও-পার, তুমি আসছ এ-পার। মাঝসমুদ্রে দেখা হয়ে যাবে দুজনের। আমাদের হাতেহাতে সেতুবন্ধ।

কিন্তু হৃদয় কি সত্যিই চলে গেল? রামকৃষ্ণের সংগছাড়া হল?

শ্রীমা বললেন, 'তা ভালো কি চিরদিন কেউ ভোগ করতে পায়?'

'কিন্তু ঠাকুরকে অনেক কষ্টও দিত। গাল-মন্দ করত।'

'যে অত সেবা-পালন করেছে সে একটু মন্দ বলবে না? যে যত্ন করে সে অমন বলে থাকে।' শ্রীমা'র কণ্ঠস্বরে মমতার ফল্গু।

রামকৃষ্ণেরও সেই অন্তঃশীলা করুণা। বললে, 'অমন সেবা বাপ-মাও করতে পারে না।'

কিন্তু এখন তোমাকে কে দেবে সেবা-স্নেহ?

'দেবার সেই ঈশ্বর।' বললে রামকৃষ্ণ: 'শাশুড়ি বললে, আহা, বৌমা, সকলেরই সেবা করবার লোক আছে, তোমার কেউ পা টিপে দিত বেশ হত। বউ বললে, ওগো, আমার পা হরি টিপবেন। আমার কারুকে দরকার নেই। সে ভক্তিভাবেই ঐ কথা বললে—'

তার মানে, আমি যখন ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে আছি তিনিই সব ভারবহনের ব্যবস্থা করবেন। এ চাই, ও চাই, বলে তো বহু বাহানা করি, কিন্তু কী বা কতটুকু আমার সত্যিকার চাইবার মত, তা কি আমি জানি? মা জানেন, মা-ই ঠিক করে দেবেন। হয়তো শয্যা পেলাম, নিদ্রা পেলাম না; বিষয় পেলাম, মামলা বাধল; প্রেয়সী পেলাম কিন্তু প্রেম হল অস্তমিত। কী পেলে আমার চলে, কিসে বা কতটুকুতে আমার শান্তি ও সমতা, তা বুঝি আমার সাধ্য কি? আমি লোভান্ধ, অল্পদৃষ্টি, স্বার্থপর। তাই তিনি বঞ্চনা দিয়ে বাঁচান, আঘাত দিয়ে চেনান, বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নিয়ে আসেন নতুন পরিচ্ছেদে। রাজার বেটা যদি ঠিক মাসোয়ারা পায়, হরির বেটা ঠিক হরিসেবা পাবে।

যিনি ক্লেশ হরণ করেন পাপ হরণ করেন মনোহরণ করেন তিনিই হরি।

ত্রৈলোক্য নতুন এক হিন্দুস্থানী চাকর রেখে দিল। হৃদয়ের বদলে সে-ই সেবা করবে রামকৃষ্ণের। কিন্তু শুদ্ধ সাত্ত্বিক লোক ছাড়া আর কারু ছোঁয়া সহ্য করতে পারে না রামকৃষ্ণ। তাই কি করে চলে ও-সব হেটো চাকরে?

দু দিন পরে রাম দত্ত এসেছে দক্ষিণেশ্বরে।

'তোমার সঙ্গে এই ছেলেটি কে হে?' উৎসুক হয়ে জিগ্গেস করল রামকৃষ্ণ।

'লালটু। আমার বাড়ির চাকর।'

'ওকে এখানে আমার কাছে রেখে দাও। ও বড় শুদ্ধসত্ত্ব ছেলে।'

এই লাটু মহারাজ। এই স্বামী অদ্ভুতানন্দ। ঠাকুরের সন্ন্যাসী-শিষ্যদের মধ্যে প্রথমাগত। প্রথম-পরশ-ধন্য।

* ৬৪ *

আদি নাম রাখতুরাম। ছাপরা জেলার কোন এক গণ্ডগ্রামে জন্ম। খুব ছেলেবেলাতেই বাপ-মা মরে গিয়েছে। আছে খুড়োর সংসারে। খুড়োর ছেলেপিলে নেই। রাখতুরামকে সহজেই সে টেনে নিল বুকের কাছে।

কিন্তু রাখতুরামের জন্যে নিভৃত পক্ষীনীড় নয়। ঝড়ের আকাশে তার নিমন্ত্রণ। কোন এক সমুদ্রগামী জাহাজের মাস্তুলে এসে সে বসবে। রাখতুরাম রাখালি করে। গোঠে-মাঠে ঘুরে বেড়ায়। প্রকৃতির পাঠশালায় পড়ে। খোলা মাঠ তার বই, আকাশ আর মেঘ তার স্লেট-পেন্সিল, বৃষ্টি তার ধারাপাত। ঘরের পশু আর বনের পাখি তার সহপাঠী। আর গুরু? কে জানে! থেকে-থেকে গান করে রাখতুরাম: 'মনুয়া রে, সীতারাম ভজন কর লিজিয়ে।'

মহাজনের খপ্পরে পড়েছে চাচাজী। ঋণের দায়ে নিলেম হয়ে গেল জমি-জমা। রাখতুরামকে নিয়ে চাচাজী পথে বসল। ভাগ্যের সন্ধানে কলকাতায় এল দুজনে। কিন্তু ইটের পর ইট, ওখানে শুধু মানুষ-কীটের বাসা। কোথাও স্নেহ নেই, কোমলতা নেই। অতিথিকে ওখানে ভিক্ষুক মনে করে, ভিক্ষুককে মনে করে চোর। দেশের লোক কাউকে পাওয়া যায় কিনা, এখানে-ওখানে খুঁজতে লাগল চাচাজী। পাওয়া গেল ফুলচাঁদকে। ফুলচাঁদ মেডিকেল কলেজে রাম দত্তের আরদালি।

'আমার কাছে রেখে যা। দেখি বাবুকে বলে কয়ে রাজী করাতে পারি কিনা।'

'সব কাজ করবে। খুব বাধ্য ছেলে রাখতুরাম।' খুড়ো মিনতি করল।

দেখেই কেমন পছন্দ হয়ে গেল রাম দত্তের। বেশ উজ্জ্বল চোখ দুটো ছেলেটার। মুখে একটা অকাপট্যের ভাব। শরীরে কাঠিন্যের লাবণ্য। কাজ আর কি। বাজার করা, মেয়েদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, মায়েদের ফরমাস খাটা আর অফিসে রাম দত্তের টিফিন দিয়ে আসা। কি, পারবি তো?

'কিন্তু এক কথা। তোর অত বড় নাম আমি বলতে পারব না। ছোট্ট করে বলব, লালটু। কি, রাজী।'

লালটু থেকে লাটু। ঠাকুর ডাকেন লেটো বলে।

কুস্তি করে লাটু। আশ্চর্য, তাতে পাড়ার গৃহস্থদের আপত্তি। চাকর আবার কুস্তি করে কি! কুস্তিগীর চাকর হলে তো সর্বনাশ।

রাম দত্তের কাছে নালিশ করে কেউ-কেউ। এতে নালিশ করবার কী আছে। শেষ কালে বললে রাম দত্ত: 'কুস্তি করা তো ভালো। কুস্তি করলে কাম কমে যায়, আপনা-আপনি বীর্য রক্ষা হয়। নিজেরা যেমন দুর্বল, চাকরও তেমনি দুর্বল খোঁজো।'

কিন্তু তবু নিবৃত্ত হয় না পড়শীরা। একজন এসে বললে, বাজারের পয়সা চুরি করে লাটু।

'হ্যাঁ রে ছোঁড়া,' হাঁক দিল রাম দত্ত: 'ক পয়সা আজ চুরি করেছিস বাজার থেকে?'

রুখে দাঁড়াল লাটু। প্রতিবাদের ভঙ্গিতে ফুটে উঠল পালোয়ানের ভাব। জ্বলে উঠল প্রস্ফুট দুই চোখ। আধা হিন্দির তোতলামি মিশিয়ে বললে, 'জানবেন বাবু! হামি নোকর আছে, চোর না আছে!'

এই তো কথার মত কথা! জীবলোকে যত দীপ্তি আছে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে সত্যদীপ্তি।

রামকৃষ্ণের থেকে দীক্ষা নিয়ে রাম দত্ত তখন ঈশ্বরমদে মাতোয়ারা। সে মদের ছিটে-ফোঁটা পড়ছে এসে সংসারে। যিনি সর্বমন্ত্রপ্রণেতা তাঁরই বাণীবিন্দুর বর্ষণ। রামের উদ্দীপনায় বাড়ির সবাই কমবেশি উৎসাহিত হচ্ছে, কিন্তু একেকটা কথা লাটুর মনে নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে। কথার মানে সে ভালো বোঝে না কিন্তু একটি ইশারা মনের মধ্যে কেবল কেঁদে-কেঁদে বেড়ায়। একটা ভ্রমর যেন গুনগুনিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। তার মনের মধ্যে যে ফুলটি ফুটিফুটি করছে তার মধু খেতে।

'ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না।' কথাটা বাজল একটা আশ্বাসের মত। পথহারা প্রান্তরে আলো-জ্বালা আশ্রয়ের মত।

'নির্জনে বসে কাঁদতে হয় তাঁর জন্যে। তবে তো তাঁর দয়া হবে।'

দুপুর বেলায় গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে আছে লাটু। মাঝে-মাঝে বাঁ হাত দিয়ে চোখ মুছছে। পাশ ফিরছে খানিক বাদে। আবার চোখ মুছছে ডান হাত দিয়ে। 'কাকার জন্যে মন কেমন করছে রে লাটু?' রামবাবুর স্ত্রী জিগ্গেস করলেন কাছে এসে।

তাঁর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল লাটু। কার জন্যে কাঁদছি তা কি আমি জানি? কেউ কি তা জানে?

এক রোববার রাম দত্ত চলেছে দক্ষিণেশ্বরে, লাটু এসে তার সঙ্গ নিল। বললে, 'হামাকে নিয়ে চলুন।'

'সে কি, তুই কোথা যাবি?'

'যার কথা আপুনি বলেন, সেই পরমহংসকে হামি দেখবে।'

কেমন মায়া হল রাম দত্তের। সঙ্গে করে নিয়ে গেল লাটুকে।

গোলগাল বেঁটেখেটে জোয়ান চেহারার চাকর। চাকর বলে ঘরে ঢুকতে সাহস নেই। রামকৃষ্ণের ঘরের সামনে পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু হাত-জোড়।

রাম দত্ত ঘরে ঢুকে রামকৃষ্ণকে দেখতে পেল না। বাইরে থেকে রামকৃষ্ণ তখন আসছে নিজের ঘরের দিকে। রাধিকার কীর্তন গাইতে-গাইতে। 'তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে—'। নিজের মনে আখর দিচ্ছে রামকৃষ্ণ। 'কথা কইতে পেলুম না। আমার বঁধুর সনে কথা হল না। দাদা বলাই ছিল সাথে তাই কথা হল না।' বারান্দায় লাটুর সঙ্গে দেখা। তুই কে রে? তুই কোত্থেকে এলি? তোকে এখানে কে আনল?

রামকৃষ্ণকে দেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে রাম দত্ত।

'এ ছেলেটাকে বুঝি তুমি সঙ্গে করে এনেছ? একে কোথা পেলে? এর যে সাধুর লক্ষণ।'

রাম দত্তের দেখাদেখি লাটুও প্রণাম করলে রামকৃষ্ণকে। বুঝলে চোখের সামনে এই সেই নয়নাতীত। কিন্তু ঘরে ঢুকেও বসছে না সবাইর মত। হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে ঈষন্নত হয়ে। যেন রামের কাছে হনুমান।

'বোস না রে বোস।' হুকুম করল রামকৃষ্ণ। তখন লাটু এক পাশে বসল জড়সড় হয়ে।

'যারা নিত্যসিদ্ধ তারা যেন পাথর-চাপা ফোয়ারা। জন্মে-জন্মে তাদের জ্ঞান-চৈতন্য হয়েই আছে। এখানে-সেখানে ওসকাতে-ওসকাতে যেই চাপটা সরিয়ে দিল মিস্ত্রি, অমনি ফোয়ারার মুখ থেকে ফরফর করে জল বেরুতে লাগল—' বলেই রামকৃষ্ণ হঠাৎ ছুঁয়ে দিল লাটুকে।

লাটুর গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল, ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল ঘন-ঘন, আর দেখতে-দেখতে দু চোখ ফেটে উথলে উঠল কান্না। সকলে অবাক। এক ঘণ্টার বেশি হয়ে গেল, তবু কান্না থামে না লাটুর।

'ছেলেটা কি এমনি সারাক্ষণই কাঁদবে না কি?' ব্যস্ত হল রাম দত্ত।

রামকৃষ্ণ আবার স্পর্শ করল লাটুকে। কান্না থেমে গেল তৎক্ষণাৎ।

যে হাতে কাঁদাও সেই হাতেই আবার মুছে দাও কান্না। খেলার আরম্ভে যেমনি তুমি, খেলার ভাঙার বেলায়ও তুমি।

বাড়ি ফিরে এসে কেমন আনমনা হয়ে রইল লাটু। কাজে-কর্মে উৎসাহ নেই, মন যেন দেশান্তরী হয়েছে। দেহযন্ত্রটা ঠিক-ঠিক চলছে বটে, কিন্তু যন্ত্রের মধ্যে থেকেও যে যন্ত্র নয়, সেই মনটিরই এখন যন্ত্রণা।

পরের রবিবার দক্ষিণেশ্বরে কিছু ফল-মিষ্টি পাঠাবার কথা উঠল। কিন্তু কে নিয়ে যায় বয়ে। রাম দত্তের কোথায় কি কাজ পড়েছে, সে যেতে পারবে না।

মনমরা হয়ে বসে ছিল লাটু। ঝটকা মেরে লাফিয়ে উঠল। জোয়ার-আসা গাঙের মত খুশির ঢেউয়ে উলসে উঠল সর্বাঙ্গ। বললে, 'হামি যাবে। হামাকে দিন, হামি সব উখানকে লিয়ে যাবে। ঠিক পছন লিবে আমাকে।'

তাই গেল লাটু। দীর্ঘ পথ একটা বাঁশির সুরের মত বাজতে লাগল। এত দিন গোষ্ঠে ফিরেছে লাটু, আজ চলল গোকুলে।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছে রামকৃষ্ণকে। বাগানে দাঁড়িয়ে আছে। বেলা প্রায় এগারোটা। দেখেই দৌড় মারল লাটু। এক ছুটে হাজির হল পায়ের কাছে। লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলে। 'কি রে, এসেছিস ? আজ এখানে থাক।'

'শুধু আজ নয়, বরাবরই ইখানকে থাকবে। হামি আর নোকরি করবে না। আপনার কাজ করবে।'

রামকৃষ্ণ হাসল। বললে, 'তুই এখানে থাকবি আর আমার রামের সংসার দেখবে কে ? রামের সংসার যে আমারই সংসার।'

এই বলে রামকৃষ্ণ তাকে বুঝিয়ে দিল কি করে চাকরি করতে হয় মনিবের বাড়িতে। কি করে কর্ম করতে হয় সংসারে। মনিবের বাড়িতে থাকবি আর মন পড়ে থাকবে দেশের বাড়িতে। মনিবের ছেলেদের 'আমার রাম' 'আমার হরি' বলবি, কিন্তু মনে-মনে ঠিক জানবি ওরা তোর কেউ নয়।

কিন্তু এখন কোন ধরনের প্রসাদ নিবি তুই ?

কালীবাড়ির আমিষ প্রসাদ নিতে কুণ্ঠা ছিল লাটুর। রামকৃষ্ণ তা বুঝতে পেরেছে। বললে, 'ওরে, মা-কালীর আমিষ ভোগ হয় আর বিষ্ণু মন্দিরে হয় নিরামিষ। সব গঙ্গাজলে রান্না। প্রসাদে কোনো দোষ নেই।'

'আমি অত-শত কি জানি!' লাটু শুধু জানে কোথায় তার আসল প্রসাদ। 'আপনি যা পাবেন হামনে তাই খাওয়া করবে। হামি তো আপনার প্রসাদ পাবে —বাকি আর কুছু পাবে না।'

রামলালের দিকে তাকিয়ে বললে রামকৃষ্ণ, 'শালা কেমন চালাক দেখেছিস। আমি যা পাব শালা তাতেই ভাগ বসাতে চায়।'

'বাচ্চা সাচ্চা হ্যায়।'

সারা বেলা কাটিয়ে দিল লাটু। বুঝিয়ে-সুজিয়ে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল রামকৃষ্ণ। যাবার সময় বলে দিল, 'দেখিস বাপু, এখানে আসবার জন্যে যেন মনিবের কাজে ফাঁকি দিসনি। রাম তোর আশ্রয়দাতা, তার যদি কাজ না করবি তা হলে নেমকহারামি হবে। খবরদার, নেমকহারাম হবি না। যখন সময় হবে তখন আমিই তোকে এখানে ডেকে নেব।'

* ৬৫ *

রামকৃষ্ণকে এখন একবার দেশে যেতে হয়। এই প্রথম তার হৃদয়-ছাড়া দেশে যাওয়া। মাকে বলে হৃদয়কে নিজেই সরিয়ে দিয়েছে রামকৃষ্ণ। কায়মনে এত সেবা করে অথচ টাকার মায়া কাটাতে পারে না, থেকে-থেকে কোত্থেকে সব বড়লোক এনে হাজির করে। বলে, এটা চাও, ওটা নাও, এদিক-ওদিক সুবিধে দেখ। লছমীনারায়ণ মাড়োয়ারীকে ওই ধরে এনেছিল কিনা ঠিক কি। যখন বললে, টাকাটা হৃদয়বাবুর কাছে রেখে যাই, হৃদয়বাবুর স্ফূর্তি তখন দেখে কে।

এক কথায় নিরস্ত করে দিল রামকৃষ্ণ। টাকা কাছে রাখাই মানে অহঙ্কারকে জীইয়ে রাখা।

মাড়োয়ারী তখন আরেক কৌশল করলে। বললে, 'তোমার স্ত্রীর নামে লিখে দি।'

হৃদয় বললে, 'সেই ভালো।'

রামকৃষ্ণ ভাবল, মন্দ কি, জিগ্‌গেস করা যাক সারদাকে।

নিভৃতে ডাকিয়ে আনল। বললে, 'দশ-দশ হাজার টাকা! তোমাকে দিতে চাচ্ছে লছমীনারায়ণ। নাও না? নেবে?'

সার কথা বুঝতে পেরেছে সারদা। বললে, 'তা কেমন করে নিই? আমি নিলে যে তোমার নেওয়াই হয়ে গেল। আমি আর তুমি কি আলাদা? তুমি যা নিতে পারো না তা আমিও নিতে পারি না।' চলে গেল সারদা।

হৃদয়ের মুখ ম্লান হল বটে কিন্তু হাঁপ ছাড়ল রামকৃষ্ণ।

টাকার যে এত অহঙ্কার কর, তোমার ক' হাঁড়ি আছে জিগ্‌গেস করি? তোমার যদি আছে হাঁড়ি, ওর আছে জালা। তোমার যদি আছে জালা, ওর আছে মটকি। আধিক্যেরও আতিশয্য আছে। সন্ধের পর যখন জোনাকি ওঠে তখন সে ভাবে জগৎকে খুব আলো দিচ্ছি। কিন্তু যেই আকাশে তারা উঠল, তার অভিমান চলে গেল। তারারা ভাবতে-লাগল, আমরাই আলো দিচ্ছি জগৎকে। কিছু পরে যেই চাঁদ উঠল, লজ্জায় মলিন হয়ে গেল তারারা। চাঁদ ভাবল জগৎ আমার আলোতেই হাসছে। দেখতে-দেখতে অরুণোদয় হল, সূর্য উঠলেন। তখন কোথায় বা চাঁদ, কোথায় বা কি।

গোড়ায়-গোড়ায় রামলালও এক-আধটু হাত বাড়াত। ঠাকুরের অসুখের সময় মহেন্দ্র কবরেজ দেখতে এসেছে সেবার। যাবার সময় পাঁচটি টাকা দিয়ে গেল রামলালের হাতে। ডাক্তার কই ভিজিট নেবে, সে-ই কিনা উলটে টাকা দেয় রুগীকে।

বিছানায় ছটফট করলেন ঠাকুর। সারাক্ষণ কত হাওয়া করল লাটু, তবু কমছে না যন্ত্রণা। বুকের মধ্যে যেন বিল্লি আঁচড়াচ্ছে। শেষে বললেন, 'যা তো, রামনেলোকে ডেকে নিয়ে আয় তো, সে শালা নিশ্চয় কিছু করেছে, নইলে চোখ বুজছে না কেন?'

রামলাল কাছে আসতেই ঠাকুর চেঁচিয়ে উঠলেন: 'যা শালা যা, এখানকার জন্যে যার ঠেঙে টাকা নিয়েছিস তাকে শিগগির ফিরিয়ে দিয়ে আয়।'

রাত তখন প্রায় দুটো। লাটুকে সঙ্গে নিয়ে রামলাল গেল সেই কবরেজের বাড়ি। কবরেজকে ঘুম থেকে তুলে তার টাকা তাকে ফেরত দিলে।

ঠাকুর ঠাণ্ডা হয়ে দুচোখ একত্র করলেন।

'ওরে রামলাল', ঠাকুর বলেছিলেন একদিন স্নেহস্বরে: 'যদি জানতুম জগৎটা সত্যি, তবে তোদের কামারপুকুরটাই সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়ে যেতুম। জানি যে, ও সব কিছু নয়, একমাত্র ভগবানই সত্যি।' ওরে, সে যে আনন্দং নন্দনাতীতং। প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োনাস্মাৎ সর্বস্মাৎ। তার মত ভালোবাসার জিনিস আর কিছু নেই।

শ্রীমতী বললে, 'সখি, চতুর্দিক কৃষ্ণময় দেখছি।'

তা তো দেখবেই। তুমি যে অনুরাগ-অঞ্জন চোখে দিয়েছ।

সখীরা বললে, 'রাধে, ঐ দেখ কৃষ্ণ এসেছে। তোমার সর্বস্ব ধন হ'রে নিতে এসেছে—'

ওরে, নিক হরণ করে। ওই তো আমার সর্বস্ব।

কেশব সেন যখন আসে দক্ষিণেশ্বরে, হাতে করে কিছু নিয়ে আসে। হয় ফল নয় মিষ্টি। রামকৃষ্ণের পায়ের কাছে বসে কথা কয়। একেক দিন বা বক্তৃতা দেয়। সেদিন বড় ঘাটে গঙ্গার দিকে মুখ করে বক্তৃতা দিলে কেশব।

হৃদয়ের যেমন মুরুব্বিয়ানা করা অভ্যেস, গম্ভীর মুখে বললে, 'আহা, কী বক্তৃতা! মুখ দিয়ে যেন মল্লিকে ফুল বেরুচ্ছে!'

কিন্তু বক্তৃতার মধ্যেই উঠে গেল রামকৃষ্ণ। যারা জমায়েত হয়েছিল বলাবলি করতে লাগল, লোকটা মুখখু কিনা, মাথায় কিছু ঢোকে না, তাই কেটে পড়ল।

কিন্তু কেশবের মনে ডাক দিল, কোনো ত্রুটি হয়েছে নিশ্চয়ই। তাড়াতাড়ি কাছে এসে জিগ্‌গেস করলে রামকৃষ্ণকে, 'কিছু কি অন্যায় করে ফেলেছি?'

'নিশ্চয়ই। তুমি বললে, ভগবান, তুমি আকাশ দিয়েছ বাতাস দিয়েছ—কত-কি দিয়েছ। তারি জন্যে যেন তোমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। ও সব তো ভগবানের বিভূতি। বিভূতি নিয়ে কথা কইবার দরকার কি? এ কি তুমি বলে শেষ করতে পারবে? তা ছাড়া, এ সব বিভূতি যদি তিনি নাই দিতেন, তা হলেও কি তিনি ভগবান হতেন না?' একটু থামল রামকৃষ্ণ। বললে, 'বড়লোক হলেই কি তাঁকে বাপ বলবে? যদি তিনি গরীব হতেন, নিঃস্ব ও নির্ধন হতেন, তা হলে কি তাঁকে বাপ বলবে না?'

কেশব চুপ করে রইল।

হৃদয়কে জিগ্‌গেস করি, এখন এ কোন ফুল বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে?

সকলে বলাবলি করতে লাগল, 'সত্যি বড়লোক হলেই কি বাপ হবে? গরীব হলে সে আর বাপ নয়?'

এরই নাম ভালোবাসা। ভগবান আমাকে কিছু দিন বা না-দিন, আমার দিকে তাকান বা না-তাকান, তবু আমি তাঁকে ভালোবাসি। আমি তাকিয়ে আছি তাঁর দিকে। দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুন কেশব সেনের মাথা ভেঙে দিয়েছে। এই নিয়ে শুরু হল হৈ-চৈ। বলে কিনা, বড়লোক না হলে বাপ কি আর বাপ হবে না? সন্তান কি গরীব বাপকে ডাকবে না বাবা বলে?

তার পরে যখনই কেশবকে বক্তৃতা দেবার জন্যে অনুরোধ করেছে রামকৃষ্ণ, কেশব সলজ্জ হাস্যে বলেছে, 'কামারের দোকানে আমি আর ছুঁচ বেচতে আসব না। আপনি বলুন, আমরা শুনি।'

হৃদয়ের মাতব্বরী করার দিন ফুরিয়ে গেল। দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে যাবার সময়ও নরম হল না। বললে, 'মামা, তুমি এদের ছাড়ো। দু-চারটে বড়মানুষ ধরো, দেখবে কত বাগানবাড়ি তোমার হবে।'

ত্রৈলোক্য তাড়া দিচ্ছে বেরিয়ে যাবার জন্যে।

'তুমিও আমার সঙ্গে চলো, মামা।' হৃদয় এক মুহূর্ত তাকাল পিছন ফিরে। বললে, 'তোমায় যদি পেতুম দেখতে কত বড় কালীবাড়ি জাঁকিয়ে তুলতুম! ইট চুন সুরকির মন্দির নয়, একেবারে সোনার মন্দির।'

চলে গেল হৃদয়। রামকৃষ্ণ নিঃসঙ্গ। একা-একা গেল কামারপুকুর।

বালক লাটু একা-একা চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। কিন্তু এসে দেখছে, সমস্ত ফাঁকা, রামকৃষ্ণ নেই, তার ঘর বন্ধ। তখন কি করে লাটু, গঙ্গার ঘাটে বসে অঝোরে কাঁদতে বসল। ডাকতে লাগল আকুল হয়ে, তুমি কোথায়? একবার দাঁড়াও আমার চোখের সামনে।

আর কত কাঁদবি? এবার বাড়ি যা। আজই তাঁর ফেরবার দিন নয়।

ফেরবার দিন নয় মানে? তিনি কি কুথা গেছেন নাকি? তিনি ইখানকেই আছেন।

এখানেই আছেন কি রে? তিনি দেশে গেছেন।

আপুনি জানেন না। ইখানকেই আছেন। হামি তার সাথে দেখা না কোরে যাবে না।

তবে থাক বসে। কতক্ষণে দেখা পাস দ্যাখ।

মন্দিরে সন্ধ্যারতি হচ্ছে। ওদিকে লক্ষ্য নেই লাটুর। গঙ্গার পরপারে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে।

কে একজন বুঝি তাকে প্রসাদ দিতে এল। এসে দেখল লাটু যেন প্রাণ ঢেলে কাকে প্রণাম করছে। সামনে লোকজন কেউ নেই, তবু প্রাণ-ঢালা প্রণাম।

অনেকক্ষণ পর মাথা তুলল লাটু! অপরিচিত লোক সামনে দেখে থ হয়ে গেল। বলল, 'সে কি! পরমহংসমশায় কুথায় গেলেন! এই যে ছিলেন এতক্ষণ ইখানকে।'

রাম দত্তকে জিগ্গেস করলে রামকৃষ্ণ: 'কি মধু পেয়ে ছোঁড়াটা এখানে পড়ে থাকতে চায় বলো তো! আমি তো কিছু বুঝি না।'

রাম দত্তও বোঝে না। তার স্ত্রীও বোঝে না।

রাম দত্তের স্ত্রী বলে, 'ওখানে তোকে খাওয়াবে কে? কাপড়চোপড় দেবে কে?'

কি রকম অবুঝের মতন তাকায় লাটু। খাওয়া? কাপড়চোপড়? দক্ষিণেশ্বরের সংসারে এও আবার একটা জিজ্ঞাসা নাকি? জোটে জুটবে না জোটে না জুটবে। সে যে দক্ষিণ-ঈশ্বর।

তবু বিনা মাইনেয় নোকরি করতে হবে কষ্ট সয়ে! এরই বা অর্থ কি?

কালবোশেখীর দুর্যোগ, তবু নরেন চলেছে দক্ষিণেশ্বর। বাবা বললেন, যদি একান্তই যাবি, ঘোড়ার গাড়িতে যা। কেন মিছিমিছি পয়সা নষ্ট! শেয়ারের নৌকোতেই চলে যাবে দক্ষিণেশ্বর। নৌকো যদি ডোবে তো ডুববে!

একেই বলে ডানপিটের মরণ গাছের আগায়। কোনো সুবুদ্ধির সে ধার ধারে না। 'এসেছিস?' ডাক দিয়ে উঠল রামকৃষ্ণ।

পর মুহূর্তেই গম্ভীর হবার ভান করে বললে, 'কেন আসিস বল তো? আমার কথা যখন শুনিস না তখন আসিস কি করতে?'

'তুমি আবার শোনাবে কি! তুমি কি কিছু জানো? নিজে কি কিছু পেয়েছ যে তাই পরকে দেবে?' নরেনের কণ্ঠে স্পষ্ট অস্বীকার। রূঢ় প্রত্যাখ্যান।

'বেশ তো, জানি না কিছু, পাইনি কানাকড়ি।' রামকৃষ্ণ স্নেহকরুণ চোখে তাকাল নরেনের দিকে: 'তবু, যার থেকে কিছুই শেখবার নেই, যাকে তুই নিস না, মানিস না, তার কাছে এই ঝড়দাপটে তুই আসিস কেন?'

'আসি কেন?' হাসল নরেন: 'তোমাকে ভালোবাসি বলে দেখতে আসি।'

রামকৃষ্ণ জড়িয়ে ধরল নরেনকে। বললে, 'সকলেই স্বার্থের জন্যে আসে। নরেন আসে'আমাকে শুধু ভালোবাসে বলে।'

একেই বলে ভালোবাসা!

* ৬৬ *

স্বরবর্ণ হয়ে গিয়েছে। এখন লাটুকে ব্যঞ্জনবর্ণ শেখাচ্ছে রামকৃষ্ণ।

সামনেই বর্ণপরিচয় খোলা।

রামকৃষ্ণ বললে, 'বল্, "ক"—'

লাটু উচ্চারণ করলে, '"কা"—'

'ওরে "কা" নয়, "ক"। বল্ "ক"—'

আবার লাটু বললে, '"কা"—'

কিছুতেই পশ্চিমী জিভ সজুত করতে পারছে না। রামকৃষ্ণ যত বলছে "ক", লাটু তত বলছে "কা"।

ঝলসে উঠল রামকৃষ্ণ: 'শালা, "ক"কেই যদি "কা" বলবি তবে "ক"-এ আকারকে কি বলবি? যা শালা, তোর আর পড়ে কাজ নেই।'

ছুটি মিলে গেল লাটুর। তাকে আর পাশের পড়া পড়তে হল না।

ঠাকুর বলেন, 'পাশ করা, না, পাশ পরা!'

লেখা-পড়া না শিখিস, নেশা-করাটা শিখে নে।

কিসের নেশা?

মদ-ভাঙের নেশা নয়। এ একেবারে রাজা নেশা। ব্রহ্ম-নেশা।

বই পড়ে কি জানবি? যতক্ষণ না হাটে পৌঁছুনো যায়, দূর হতে শুধু হো-হো শব্দ। হাটে পৌঁছুলে আরেক রকম। তখন দেখতে পাবি, শুনতে পাবি স্পষ্ট। দেখতে পাবি দোকানিকে। শুনতে পাবি, আলু নাও, পয়সা দাও।

বড়বাবুর সঙ্গেই আলাপের দরকার। তাঁর কখানা বাড়ি, কটা বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, এ আগে থেকে জানতে এত ব্যস্ত কেন? কেন এ-দোর ও-দোর ঘোরাঘুরি করা? চাকরদের কাছে গেলে দাঁড়াতেই দেয় না, তারা বলবে কোম্পানির কাগজের খবর! কিন্তু যো-সো করে বড়বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ করু, তা ধাক্কা খেয়েই হোক বা বেড়া ডিঙিয়েই হোক—তখন একে-একে সব জানতে পাবি।

কত বাড়ি কত বাগান কত কোম্পানির কাগজ তিনিই সব বলে দেবেন। বাবুর সংগে আলাপ হলে চাকর-দারোয়ানরা সব সেলাম করবে।

'এখন বড়বাবুর সংগে আলাপ হয় কিসে ?' একজন কে জিগ্‌গেস করলে।

'তাই তো বলি, কর্ম চাই।' বললে রামকৃষ্ণ: 'ঈশ্বর আছেন বলে বসে থাকলে চলবে ? যো-সো করে তাঁর কাছে গিয়ে পেঁছুতে হবে।'

'কি করে পেঁছুই ?'

'নির্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা করো। দেখা দাও বলে কাঁদো ব্যাকুল হয়ে। কামিনীকাঞ্চনের জন্যে তো পাগল হয়ে বেড়াতে পারো, একবার তাঁর জন্যে একটু পাগল হও দেখি। লোকে বলুক, অমুকে ঈশ্বরের জন্যে পাগল হয়েছে।'

একটু নির্জনে যা। নির্জন না হলে মন স্থির হবে না। নির্জনে বসে একটু ধ্যান কর। বাড়ির থেকে আধ পো অন্তরে ধ্যানের জায়গা কর। নির্জনে গোপনে তাঁর নাম করতে-করতে তাঁর কৃপা হয়। তার পরেই দর্শন।

'দর্শন ?' চমকে উঠল কেউ-কেউ।

'হ্যাঁ, দর্শন। যেমন ধরো জলের ভিতর ডোবানো বাহাদুরী কাঠ আছে—তীরে শিকল দিয়ে বাঁধা। সেই শিকলের এক-এক পাপ্ ধরে-ধরে গেলে, শেষে বাহাদুরী কাঠকে স্পর্শ করা যায়।'

কেন সংসার কি দোষ করল ? আমরা জনক রাজার মত নির্লিপ্ত ভাবে সংসার করব।

'মুখে বললেই জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা হেঁটমুণ্ড হয়ে ঊর্ধ্বপদ করে কত তপস্যা করেছিলেন। তোমাদের হেঁটমুণ্ড বা ঊর্ধ্বপদ হতে হবে না, কিন্তু সাধন চাই। নির্জনে বাস চাই। দই নির্জনে পাততে হয়। ঠেলাঠেলি নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না।'

সবাইর মুখভাব একটু কঠিন হয়ে উঠল। কোমলকে পাবার জন্যে সাধনা চাই কঠিন। বন্ধুর পথটি বন্ধুর হয়ে রয়েছে !

'এ তো ভালো বালাই হল।' রামকৃষ্ণ কথায় একটু বিদ্রূপের টান দিল: 'ঈশ্বরকে তুমি দেখিয়ে দাও আর উনি চুপ করে বসে থাকবেন। দুধকে দই পেতে মন্থন করলে তো মাখন হবে! তুমি মাখন তৈরি করে ওঁর মুখের কাছে তুলে ধরো! ভালো বালাই—তুমিই মাছ ধরে হাতে দাও।'

ওরে, রাজাকে দেখতে চাস ? রাজা আছেন সাত দেউড়ির পারে। প্রথম দেউড়ি পার না হতে-হতেই বলে, রাজা কই ? যেমন আছে, এক-একটা দেউড়ি তো পার হতে হবে। যেতে হবে তো এগিয়ে।

রাম দত্তকে বলে লাটুকে রেখে দিয়েছে রামকৃষ্ণ। এমন শুদ্ধসত্ত্ব ছেলে আর দুটি হতে নেই।

গাড়ু ছুঁতে পারে না রামকৃষ্ণ। শৌচে যখন যায় গাড়ু নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে লাটু। জপে বসেছে লাটু, হঠাৎ জপ ছুটে গেল। কে যেন ছুটিয়ে দিলে।

'ওরে, তুই যার ধ্যান করছিস, সে এক গাড়ু জলও পায় না।' সামনে দাঁড়িয়ে রামকৃষ্ণ। বলছে, 'এ রকম ধ্যানে কী ফল হবে রে ?'

গাড়ু হাতে সঙ্গে-সঙ্গে চলল লাটু।

'যার সেবা করবি তার কখন কি দরকার হুঁশ রাখবি। তবে তো সেবার ফল পাবি।' শোন, কাজের মাঝেই তাকে ধরবি। কিন্তু সব সময়ে জানবি তুই যন্ত্র তিনি যন্ত্রী। তুই চক্র, তিনি চক্রী। তুই গাড়ি তিনি ইঞ্জিনিয়র। পাতাটি নড়ছে সেও জানবি ঈশ্বরের ইচ্ছে। সেই তাঁতি কি বলেছিল জানিস না? তাঁতি বললে, রামের ইচ্ছেতেই কাপড়ের দাম এক টাকা ছ আনা, রামের ইচ্ছেতেই ডাকাতি। রামের ইচ্ছেতেই ধরা পড়ল ডাকাত, রামের ইচ্ছেতেই আমাকে ধরে নিয়ে গেল, আবার রামের ইচ্ছেতেই ছেড়ে দিলে। ওরে ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। খোলেরই মাঝ, মাঝেরই খোল।

এক দিন লাটুকে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ: 'ওরে লেটো, বলতে পারিস ভগবান ঘুমোয় কি না?' প্রশ্ন শুনে লাটুর তো চক্ষুস্থির! বললে, 'হামনে জানে না।'

'ওরে, জীবজগতে সকলেই ঘুমের অধীন, কিন্তু ভগবানের ঘুমোবার যো নেই। তিনি ঘুমুলে সব অন্ধকার! সারা রাত সারা দিন জেগে তিনি জীব-জন্তুর সেবা করছেন। তিনি জেগে আছেন বলেই জীবজন্তু নির্ভয়ে ঘুমুতে পারছে।'

শুধু কি তাই? ঘুমে বা জাগরণে কে কখন কেঁদে ওঠে, তিনি না জেগে থাকলে তা শুনবে কে? আমরা অন্ধকারে ঘুমুই, আর তিনি সারা রাত আলো জ্বালিয়ে বসে থাকেন শিয়রে।

অধর সেন দক্ষিণেশ্বরে এসে প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়ে।

একদিন ঠাকুরকে এসে শুধোলেন, 'তোমার কি-কি সিদ্ধাই হয়েছে বলো তো?'

'যারা ডিপটি হয়ে সবাইকে ভয় দেখিয়ে থাকে', ঠাকুর বললেন হাসতে-হাসতে, 'মায়ের ইচ্ছেয় সে সব ডিপটিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখি।'

তারই জন্যে কি অধর দক্ষিণেশ্বরে এসে ঘুমোয়?

এ কেমন হীনবুদ্ধি! ভাগ্যবলে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিস, 'বিলডিং' না দেখে বরং গঙ্গা দ্যাখ, মাকে দ্যাখ, ঠাকুরকে দ্যাখ—তা নয় গা ঢেলে লম্বা ঘুম! সবাই নিন্দে করতে লাগল অধরের। নিতান্তই পাশবদ্ধ জীব, ত্রিনাথের এলাকায় এসেও ত্রাণ নেই। কিন্তু ক্লান্তিহরণের কণ্ঠে অপূর্ব করুণা। স্নেহশান্ত স্বরে বললেন ঠাকুর, 'তোরা কি বুঝবি রে? এ মায়ের ক্ষেত্র, শান্তি-ক্ষেত্র। ওরা এখানে এসে বিষয়-কথা না বলে ঘুমুচ্ছে, সে অনেক ভালো। তবু একটু শান্তি পাচ্ছে!'

কৃষ্ণধন নামে এক রসিক ব্রাহ্মণ আসে দক্ষিণেশ্বরে। সারাক্ষণ কেবল ফষ্টি-নষ্টি করে।

'কি সামান্য ঐহিক বিষয় নিয়ে তুমি রাত-দিন ফষ্টি-নষ্টি করে সময় কাটাচ্ছ? ঐটি ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও। শোনো, যে নুনের হিসেব করতে পারে, সে মিছরিরও হিসেব করতে পারে।'

কৃষ্ণধন সহাস্যে বললে, 'আপনি টেনে নিন।'

'আমি কি করব! তোমার চেষ্টার উপর নির্ভর করছে। এ মন্ত্র নয়, এ মন তোর!

'কি করতে হবে বলুন—'

'সামান্য রসিকতা ছেড়ে ঈশ্বরের পথে এগিয়ে পড়ো। ঈশ্বরই সব চেয়ে বড় রসিক, তাঁর তত্ত্বটিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় রসিকতা। সেই রসিকতার সন্ধান করো। শুধু এগিয়ে পড়ো—'

'এ পথের আর শেষ নেই—'

'কিন্তু চলতে-চলতে যেখানেই শান্তি, সেখানে "তিষ্ঠ"। সেখানে বিশ্রাম করে নাও।'

আহা, অধর সেন এখানে এসে শান্তিতে একটু বিশ্রাম করছে! ওকে জাগাস নে। ওকে ঘুমুতে দে একটু ঠাণ্ডা হয়ে!

কিন্তু যে সেবা করতে এসেছে তারই সেবায় লাগল নাকি রামকৃষ্ণ?

লাটুকে শিবমন্দিরে ধ্যান করতে পাঠিয়েছে রামকৃষ্ণ। ঢুকেছে সেই দুপুর বেলা, বিকেল হয়ে এল, লাটুর এখনো বেরুবার নাম নেই। কি করছে দেখে আয় তো রে। রামলালকে খোঁজ নিতে পাঠাল। রামলাল এসে বলল, এক গা ঘেমে আছে। নিথর পাথর! একখানা পাখা নিয়ে আয়। পাখা নিয়ে চলল রামকৃষ্ণ। আর, শোন্, এক গ্লাস জল চাই ঠাণ্ডা। জল নিয়ে গিয়ে রামলাল দেখে, রামকৃষ্ণ লাটুকে হাওয়া করছে। আর পাখার হাওয়ায় লাটুর শরীর কাঁপছে তুলো যেমন কাঁপে তেমনি।

'ওরে বেলা যে আর নেই। সন্ধে-টন্ধে কখন সাজাবি?' রামকৃষ্ণের আওয়াজে লাটুর ধ্যান ভাঙল। চোখ চেয়ে দেখল যাকে ধরবার জন্যে মহাশূন্যে পাখা মেলেছিল তিনিই পাখা হাতে করে পাশটিতে বসে আছেন। সস্নেহে বাতাস করছেন মা'র মত। ব্যস্ত হয়ে উঠতে চাইল আসন ছেড়ে। রামকৃষ্ণ বললে, 'আগে একটু সুস্থ হ, তার পরে উঠিস। দেখছিস না, গরমে কেমন ঘেমে গেছিস।'

'আপনি এ কী করছেন! এতে আমার অকল্যাণ হবে।'

হাসল রামকৃষ্ণ। বললে, 'তোর কে সেবা করছে? তোর মধ্যে যে শিব এসেছিলেন তাঁর সেবা করছিলুম। গরমে যে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। নে, এখন এই এক গেলাশ জল খা দিকিনি—'

জড়ভরত রাজার পালকি বইছে। রাজা পালকি হতে নেমে এসে বললে, 'তুমি কে গো?'

জড়ভরত বললে, 'আমি নেতি।'

'সে আবার কি?'

'আমি শুদ্ধ আত্মা।'

যেমন বাতাস। ভালো-মন্দ সব গন্ধই বাতাস নিয়ে আসে কিন্তু বাতাস নির্লিপ্ত। যেমন প্রদীপ। প্রদীপের সামনে বসে কেউ ভাগবত পড়ে, কেউ বা দলিল জাল করে। প্রদীপ নির্লিপ্ত। যেমন সূর্য। শিষ্টকেও আলো দিচ্ছে ধৃষ্টকেও আলো দিচ্ছে। ধোঁয়া যতই কালো হোক দেয়ালকে ময়লা করতে পারে, আকাশকে নয়। চামড়া-ঢাকা অখণ্ড খোলের মধ্যে খোঁজো সেই প্রাণস্বরূপে। হাড়মাসের খাঁচার মধ্যে ধরো সেই পলাতক পাখি!

* ৬৭ *

রাম দত্তের বাড়ি, মধু রায়ের গলিতে, রামকৃষ্ণ এসেছে।

কলকাতাকে বড় ভয়, বড় সম্ভ্রম রামকৃষ্ণের। সব জ্ঞানী-গুণীর বাসা এখানে। রাজা-রাজড়া সুখী-ভোগীদের আস্তানা। পাড়াগাঁয়ের আলাভোলা ছেলে আমি, এখানে কি কলকে পাব? আমাদের কি কেউ খাতির-যত্ন করবে?

ঠাকুরের তখন হাত ভেঙেছে, দেবেন্দ্র মজুমদার দেখতে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে।

পরনে লাল-পাড় কাপড়, ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাত গলার সংগে ঝোলানো, ঠাকুর বসে আছেন তক্তপোশে। দেবেন্দ্রকে জিগ্গেস করলেন, 'কোত্থেকে আসা হচ্ছে?'

'কলকাতা থেকে।'

কলকাতার নাম শুনে যেন শিউরে উঠলেন ঠাকুর। নিশ্চয়ই তবে একজন গনিমান্যি লোক।

'কী দেখতে এসেছ? এমনি?' বলে ঠাকুর হাতের পর হাত রেখে ত্রিভংগবঙ্কিম কৃষ্ণের ভংগি করলেন।

'না, শুধু আপনাকে দেখতে এসেছি।' কণ্ঠস্বরে যেন ভক্তির সুরটি পাওয়া গেল। ঠাকুরের গলায় কান্না ফুটে উঠল: 'আর আমায় কী দেখবে বলো! পড়ে গিয়ে আমার হাত ভেঙে গিয়েছে! দেখ দেখি সত্যি ভেঙেছে কিনা! বড় যন্ত্রণা। কি করি?'

হাতখানি বাড়িয়ে দেবার ইংগিত করলেন। দেবেন্দ্র স্পর্শ করল সেই হাত। একটু বা টিপে-টিপে দেখল। জিগ্গেস করল, 'কি করে ভাঙল?'

কাঁদ-কাঁদ মুখে ঠাকুর বললেন, 'কি একটা অবস্থা হয়, তাইতে পড়ে গিয়ে ভেঙে গিয়েছে। ওষুধ দিলে আবার বাড়ে। অধর সেন ওষুধ দিয়েছিল, বেশি করে ফুলে উঠল। তাই আর কিছু দিইনি। হাঁ গা, সারবে তো?'

যিনি সকলের ব্যথা সারান তাঁরই কণ্ঠে ব্যথার জিজ্ঞাসা।

'আজ্ঞে সেরে যাবে বৈ কি। নিশ্চয় সারবে।' দেবেন্দ্র জোরের সংগে বললে।

আহ্লাদে শিশুর মতন হয়ে গেলেন ঠাকুর। আর সকলকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন: 'ওগো, ইনি বলছেন আমার হাত সেরে যাবে। আর ভয় নেই। ইনি যেমন-তেমন লোক নন। ইনি কলকাতা থেকে এসেছেন!'

কলকাতা সম্বন্ধে এত তাঁর ভয়-ভক্তি। সেই কলকাতায় তিনি এসেছেন বিদ্বৎ সমাজে! বসেছেন তাদের বৈঠকখানায়। শেষে চাতরে না হাঁড়ি ভাঙে! মা গো, পাশে এসে বোস্। রাশ ঠেলে দে। রামকৃষ্ণের চোখের দিকে চেয়ে মা হাসেন মিটি-মিটি।

রাম দত্তের হাঁপানি, তাই নিয়ে সে ছুটোছুটি করছে। এসেছে সুরেশ মিত্তির, ভাবে বিভোর হয়ে টলছে মাতালের মত। গায়ে জামা নেই, নেই গলায় পৈতে, এক পাশে এসে বসেছে দেবেন মজুমদার। গ্যাস জ্বলছে ঘরে। তাতে আর কতটুকু আলো হবে! রামকৃষ্ণের গায়ের আলোয় মধু রায়ের গলি ভেসে যাচ্ছে। আকাশের সুধাকর এসেছেন নগরের ধূলির নিকেতনে।

ওরে, রাম দত্তের বাড়িতে দক্ষিণেশ্বরের সেই সাধু এসেছে। চল দেখবি চল। রাস্তায় কর্পোরেশনের বাতি নেই, সাধুই নাকি সব অলি-গলি আলো করে বসেছে। একটি সহজসুন্দর মানুষ। ঘরছাড়া হয়েও যেন ঘরের লোক। গালে একটু-একটু কপচানো দাড়ি, চোখের পাতা অনবরত মিটমিট করছে—

ওরে, ভালো করে চেয়ে দ্যাখ, কমলবিশদনেত্র ক্লেশনাশন কেশব বসে আছেন। সর্ববান্ধবস্বরূপ দীনবন্ধু।

কলকাতায় এসেছে, তাই গায়ে জামা পরে এসেছে। জামার আস্তিন কনুই আর কব্জির মাঝখানে রঙিন। একটি বটুয়া সামনে। তারই থেকে একটু মশলা নিয়ে মুখে দিচ্ছে মাঝে-মাঝে। কতক্ষণ আর থাকা যায় কাঠের ভদ্রলোক সেজে? গায়ের জামা খুলে ফেলল রামকৃষ্ণ। এমনি যে আভা ছিল তার শতগুণ বিভা বেরুচ্ছে গা থেকে। সুধাকরের বদলে নেমে এসেছে প্রভাতের দিবাকর। নখজ্যোতিতেই যেন শরদিন্দুর দীপ্তি গায়ের আলো বহুদূর ছড়িয়ে পড়েছে। একটি স্থিরস্ফুট বিদ্যুৎ যেন চিরজীবী হয়ে আছে আকাশে। বহু লোক এসে জমায়েত হয়েছে। ঘর ছাপিয়ে ভিড় করেছে রোয়াকে, রোয়াক ছেড়ে রাস্তায়। অথচ সবাই স্তব্ধ, অভিভূত। বিস্ময়বিভোর। এ কে বল দেখি? দরিদ্রের মধ্যে রাজরাজেশ্বর! মর্তধামে ত্রিলোকপালক! যিনি শ্মশানে ভূতনাথ তিনিই আবার গৃহে জগদ্‌গুরু।

কথা ক' না! প্রশ্ন কর্। যায় যা জিগ্‌গেস করবার আছে জেনে নে।

কেউই প্রশ্ন করে না। প্রশ্ন করবার কথা মনেও হয় না কারুর। শুধু এই মনে হয়, অশেষ প্রশ্নের শেষে উত্তরটি যেন জীবন্ত হয়ে জ্বলন্ত হয়ে বসে আছে। গভীর উপলব্ধির সহজ একটি উচ্চারণ। বসে আছে বাকপতি, বিবুধেশ্বর। বাক্য দিয়ে শুধু হরিনামের মালা গাঁথা। তাই যা বাক্য তাই কাব্য।

নিজের মনেই বলে যাচ্ছে রামকৃষ্ণ। বলছে ঈশ্বরপ্রসংগ। সতৃষ্ণকর্ণে তাই শুনছে সকলে। কোনো তর্ক-বিচার করছে না। যা বলছে তাই যেন চরাচরের চরম কথা। এর পরে আর বিষয় নেই, বর্ণনা নেই। পারাপার নেই। যা শুনছে তাই নিঃসন্দেহে মানছে সকলে। কি যে শুনছে মনে ধরে রাখতে পারছে না, তবু মন বলছে এ অত্যন্ত খাঁটি কথা, এ কথার আর ওর নেই।

কথা বলতে-বলতে মাঝে-মাঝে থামছে রামকৃষ্ণ। তখনই সবাই শ্রবণতৃষ্ণায় অস্থির হয়ে উঠছে। রামকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকছে নিষ্প্রাণের মত। কথা কও, তুমি সর্বমন্ত্রপ্রণেতা, তোমার কথায় নিশ্চল নিস্তব্ধতায় প্রাণসঞ্চার করো।

অথচ কী সরল কথা! পণ্ডিতগিরি ফলানো নেই এতটুকু। এতটুকু বক্তৃতা মারা নেই। লঘুতা-প্রগল্‌ভতা নেই। সহজের সংবাদটি সহজ করে পরিবেশন করছেন। 'আগে সাদাসিদে জ্বর হত, সামান্য পাচনেই সেরে যেত। এখন যেমন ম্যালেরিয়া জ্বর, তেমনি ওষুধ ডি-গুপ্ত! আগে লোকে যোগ-যাগ তপস্যা করত, এখন কলির জীব, দুর্বল, অন্নগত প্রাণ—এক হরিনামই তার সম্বল। হরিনামেই

সে পেরিয়ে যাবে ভবনদী। নামও করো, সঙ্গে-সঙ্গে প্রার্থনা করো, দুদিনের জিনিসের উপর থেকে ভালোবাসা যেন কমে যায়। দুদিনের জিনিস মানে টাকা, মান, যশ, দেহসুখ। টাকার জন্যে যেমন ঘাম বার করো, হরিনাম করে নেচে গেয়ে ঘাম বার করতে পারো তো বুঝি।'

তার পর গান ধরে রামকৃষ্ণ।

'নামেরই ভরসা কেবল শ্যামা গো তোমার।
কাজ কি আমার কোশাকুশি দেঁতোর হাসি লোকাচার!
নামেতে কালপাশ কাটে, জটে তা দিয়েছে রটে;
আমি তো সেই জটের মুটে, হয়েছি আর হব কার॥'

এ তো গান নয়, শিবের জটা ছেড়ে গঙ্গার মর্তাবতরণ।

'জানতে, অজানতে বা ভ্রান্তে যে কোনো ভাবেই হোক না কেন, তাঁর নাম করলেই ফল হবে।' আবার কথা শুরু করলে রামকৃষ্ণ: 'কেউ তেল মেখে নাইতে যায়, তারও যেমন স্নান হয়, যদি কাউকে জলে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয় তারও তেমনি স্নান হয়। আর কেউ ঘরে শুয়ে আছে, তার গায়ে জল ঢেলে দিলে তারও স্নানের কাজ হয়ে যায়। নিতাই তাই কোনো রকমে হরিনাম করিয়ে নিতেন। চৈতন্যদেব বলেছিলেন, ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাত্ম্য। তক্ষুনি-তক্ষুনি ফল না পেলেও এক সময়ে না এক সময়ে পাবেই। বাড়ির কার্নিশে যদি বীজ পড়ে অনেক দিন পরে বাড়ি পড়ে গেলেও সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হয়ে তার ফল হবে।'

রাত হয়ে গেল কিন্তু বাড়ি ফেরবার কারু নাম নেই। খিদে পেয়েছে তেষ্টা পেয়েছে এ অত্যন্ত তুচ্ছ চিন্তা। এখন শুধু নয়নের তৃষ্ণা। জীবনের রাত অনেক হয়ে গেল বটে কিন্তু গৃহ বলতে এঁরই পদাশ্রয়। রামকৃষ্ণকে ছেড়ে কোথায় আবার আমাদের ঘর-বাড়ি?

হঠাৎ রামকৃষ্ণের সমাধি উপস্থিত হল।

পাড়া-বেপাড়ার ভিড়-করা শহুরে লোকেরা দেখুক তা চর্মচক্ষে।

রামকৃষ্ণের ডান হাতের মাঝের তিনটি আঙুল বেঁকে গেল, শক্ত ও সিধে হয়ে গেল হাত দুখানি। মোটেই দেহবিকারের লক্ষণ নয়, বিদেহবিহারের লক্ষণ। রামকৃষ্ণ এখন দিব্য ভাবের দীপ্র মূর্তি। তার সঙ্গে ভাবনবনীর অমিয় লাবণ্য। এ কি কর্পূরকুন্দেন্দুধবল শিব না রাজীবলোচন দূর্বাদলশ্যাম রাম!

দেবেন্দ্র মজুমদারের মনের মধ্যে গুরুস্তোত্রের শ্লোক গুঞ্জন করে ফিরতে লাগল:

'মন-বারণ-শাসন-অঙ্কুশ হে,
নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে।
গুণগানপরায়ণ দেবগণে,
গুরুদেব দয়া করো দীন জনে॥'

রামকৃষ্ণের ভাবের হাওয়া লেগে সবাইর মন মাটি ছেড়ে উড়তে লাগল আকাশে। ঘোর-ঘোর নেশা আর কাটতে চায় না। মন যেন আর থা পায় না মাটিতে। ভাবের

বাতাসেই কেবল উড়তে চায়। উড়তে-উড়তেই যেন ধরতে পারবে কাউকে। সেই চিরকালের অধরাকে। দেবেন্দ্র তখন পেঁীছে গেছে শেষ শ্লোকে :

'জয় সদ্‌গুরু ঈশ্বরপ্রাপক হে,
ভবরোগবিকারবিনাশক হে।
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে,
গুরুদেব দয়া করো দীন জনে ॥'

* ৬৮ *

দক্ষিণেশ্বরে যিনি আছেন তাঁর আরেক নাম দক্ষিণ-ঈশ্বর।

রুদ্র, যত্তে দক্ষিণমুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

উত্তরে-দক্ষিণে পূবে-পশ্চিমে ডাক পাঠাচ্ছে রামকৃষ্ণ। কখনো নহবতখানা থেকে, কখনো বা কুঠির ছাদের উপর উঠে। আরতির সময় ঘড়ি-ঘণ্টা বাজছে আর ডাকছে রামকৃষ্ণ : ওরে তোরা কে কোথা আছিস চলে আয়। তোদের ছাড়া দিন আর কাটে না রে—

প্রথমে এল লাটু। দ্বিতীয় এল রাখাল।

রামকৃষ্ণ দেখল গোপাল এসেছে। পায়ে নূপুর বাজছে ঝুম-ঝুম। 'আয়, আয়—' হাত বাড়িয়ে দিল রামকৃষ্ণ। আর রাখাল দেখল স্নেহ-শান্তির সুধাসত্র বিছিয়ে মা বসে আছেন। ঝাঁপিয়ে পড়ল কোলের মধ্যে।

কখনো তার গায়ে হাত বুলোয় রামকৃষ্ণ, কখনো বা স্তন্য পান করায়। গদগদভাষে কখনো বা ডাকে, গোপাল, গোপাল ; কখনো বা যদি দেখতে না পায়, গলা ছেড়ে কান্না ধরে, আমার ব্রজের রাখাল কোথায় গেলি ? যখন আসে ক্ষীর-ননী খাওয়ায়, কত খেলা দেয়, কখনো বা কাঁধে করে নাচে। আঠারো বছরের জোয়ান মরদ, বিয়ে করেছে, মনে হয় যেন অবোলা শিশু। পড়াশোনায় মন নেই, মানে না গুরুজনদের। সব চেয়ে আশ্চর্য, নতুন বিয়ে করেছে, অথচ শ্বশুরবাড়ি যায় না। কান্তিমতী কিশোরী স্ত্রী, এতটুকু টান নেই। 'কোথায় যাস তুই রোজ-রোজ ?' বাপ হুঙ্কার করে উঠল।

ব্রাহ্মসমাজে যেত খুব আগে-আগে। সেখানকার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে এসেছে নিরাকার ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছাড়া আর কারু ভজনা করব না। এ সবে তত আপত্তি ছিল না আনন্দমোহনের। কিন্তু তিনি তো জানেন কোথায় আজকাল ছেলের গতিবিধি। ব্রাহ্মসমাজে মিশে কেউ তো আর বিবাগী হয় না, কিন্তু যেখানে এখন সে যাওয়া-আসা শুরু করেছে সেখানে যে এক বিশ্বভোলা বাউণ্ডুলের বাসা। আজব কারখানা। ওখানে গেলে আর মানুষ হতে হবে না, রাখালিই করতে হবে সারা জীবন।

'খবরদার, আর যেতে পারবি না ওখানে !' ছেলেকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করল

আনন্দমোহন। বসিরহাটের শিকরা গাঁয়ের বলদৃপ্ত জমিদার, অগাধ পয়সার মালিক, তার ছেলে কিনা পথে-পথে ভেসে বেড়াবে! কখনোই না। থাক ঐ ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে। এদিকে বৎসহারা গাভীর মত কাঁদছে রামকৃষ্ণ। ওরে রাখাল, কোথায় গেলি? তোকে না দেখে যে থাকতে পারছি না। মা'র মন্দিরে গিয়ে কাকুতি-মিনতি করছে: মা, আমার রাখালকে এনে দাও। রাখালকে না দেখে বুক ফেটে যাচ্ছে—খাঁচায় পোরা বনের পাখির মত পাখা ঝাপটাচ্ছে রাখাল। বন্ধ ঘরে ছটফট করছে। সেদিন কি দয়া হয়েছে, আনন্দমোহন ছেলেকে বন্ধ ঘরে না রেখে নিজের চোখের সামনে বসিয়ে রেখেছে। নজরবন্দী করে রেখেছে। নিজে নিবিষ্ট মনে দেখছে কি সব নথি-পত্র। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে জটিল মামলা, কাগজ-পত্রও পর্বতপ্রমাণ। তেরছা চোখে বাপকে একবার দেখল রাখাল। দেখল, কাগজের মধ্যে ডুবে আছেন, কাগজ ছাড়া আর কিছুতে লক্ষ্য নেই। টুপ করে সরে পড়ল আলগোছে। নিজের দেহের ছায়াটিকে পর্যন্ত জানতে না দিয়ে। পড়ে নেমেই দে-ছুট। একেবারে দক্ষিণেশ্বর।

'রাখাল, রাখাল—' কান্নার স্বর দূর থেকে রাখাল শুনতে পাচ্ছে।

'আমি এসেছি। আমি এসেছি। এই যে আমি।' রামকৃষ্ণের প্রসারিত বাহুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাখাল।

এই মোকদ্দমায় আর জেতবার কোনো আশা নেই। নথির থেকে মুখ তুলল আনন্দমোহন। এ কি! রাখাল কোথায়? রাখাল কোথায় গেল?

আর কোথায় গেল! ছাঁদন-দড়ি খুলে দেবার পর বাছুর আবার যায় কোথায়! এখন কোর্টের বেলা হয়ে গেছে, এখন আর ছেলের পিছু ছোটা যায় না দক্ষিণেশ্বর। সন্ধের পর ব্যবস্থা করতে হবে। এবার ফিরিয়ে এনে সত্যি-সত্যি লোহার বেড়ি পরিয়ে দেব। যৌবনের সোনার শৃংখলে সে বশ মানেনি। কিন্তু মামলায় হঠাৎ উল্টো রকম ফল হয়ে গেল। ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি, মামলায় ডিক্রি পেল আনন্দমোহন। ছেলের সাধুসংগের জোরেই ঘটেনি তো এই ফললাভ? কে জানে! ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে দক্ষিণেশ্বরের দিকে যাচ্ছে বটে আনন্দমোহন, কিন্তু মনের মধ্যে আর তাড়ন-পীড়নের তাপ নেই। তার প্রথম পক্ষের সন্তান রাখাল। কত ভোগবিলাসে মানুষ। তার কিনা সইবে ও-সব অনাসৃষ্টি? ভুলিয়ে-ভালিয়ে যেমন করে হোক মনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে ঐ বিপথগামীকে।

'ওরে রাখাল, ঐ তোর বাপ আসছে বুঝি।' রামকৃষ্ণ যেন ভয় পাবার মত করে বললে। 'দ্যাখ দেখি তাকিয়ে—'

তা ছাড়া আবার কে! ঐ তো আনন্দমোহন। দূর থেকে ঠিক চিনেছে রামকৃষ্ণ।

বাপের আভাস পেয়ে রাখালের মুখ এতটুকু হয়ে গেল। বললে, আমি কোথাও গিয়ে লুকোই। নইলে বাবা আমাকে ঠিক ধরে নিয়ে যাবে। আর আসতে দেবে না।

'ভয় কি আসুক না!' রামকৃষ্ণ অভয় দিলে। 'বাপ তো সাক্ষাৎ দেবতা। তাকে

আবার ভয় কিসের ! সামনে এলে বেশ ভক্তিভরে প্রণাম করবি। মা'র ইচ্ছে হলে কী না হতে পারে—'

আনন্দমোহনকে খুব সমাদর করে বসাল রামকৃষ্ণ। রাখালও দেহ-মন ঢেলে বাবাকে প্রণাম করলে।

কত গুণ আমার রাখালের ! কেমন দিব্যগন্ধময় তার সত্তা। সর্ব তীর্থে তার স্নান, সর্ব যজ্ঞে তার দীক্ষা। ও হচ্ছে ব্রহ্মশ্রোতা, ব্রহ্মমন্তা ছেলে। রাখালের প্রশংসা করতে লাগল রামকৃষ্ণ ! শুধু কি প্রশংসা ? প্রতিটি কথার অন্তরালে সীমাহীন স্নেহ। কূলহীন ভালোবাসা।

ছেলের মুখের দিকে তাকাল আনন্দমোহন। আনন্দে জ্বলছে রাখালের চোখ দুটি। হয়তো ভালো করে খায়নি, কে জানে সারা দিন উপোস করেই আছে কিনা —তবু যেন আনন্দের প্রতিমূর্তি।

'বাবা, ক্যা ভোজন হুয়া ?' এক সাধুকে জিগগেস করলে একজন।

'আজ মালিক নেহি মিলায়ে।' বললে সেই সাধু 'আজ রামজীকি ইচ্ছাই হ্যায় ভোজন মিলনে নেহি হ্যায়। আজ আনন্দই হ্যায়—'

সর্বাবস্থায় সদানন্দ। এই আনন্দের হাট থেকে আমার তোলা বন্ধ করে দিও না। কেমন যেন হয়ে গেল আনন্দমোহন। ছেলেকে পারল না ফিরিয়ে নিতে। শুধু রামকৃষ্ণকে বললে, 'মাঝে-মাঝে এক আধবার পাঠিয়ে দেবেন দয়া করে।'

তাই সেই অনুরোধই এখন করছে রামকৃষ্ণ। ওরে, অনেক দিন হয়ে গেল, এখন একবার বাড়ি গিয়ে বাপকে দেখা দিয়ে আয়। যদি একেবারে না যাস, কেলেঙ্কারি হবে, তোকে চিরদিনের মত আটকে রাখবে, আর তোকে আসতে দেবে না। তুইয়ে-তাইয়ে পাঠিয়ে দেয় বাড়িতে।

দুদিন যেতে না যেতেই ফের ফিরে আসে। বাপের চোখের উপর দিয়েই ফিরে আসে। আনন্দমোহনের কেমন ধারণা হয়েছে এ সাধুকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। এর আস্তানায় অনেক গণ্যমান্য লোক যাতায়াত করছে। ওর এখন বিস্তর নাম-ডাক ! এর কৃপাতেই মামলাতে সুফল হয়েছিল। বলা যায় না, লেগে থাকলে কোন না আবার সুবিধে হবে ! রাখালের খোঁজে নিজেও দু-এক দিন চলে আসে আনন্দমোহন। রামকৃষ্ণ খুব খাতির-যত্ন করে। আগে-আগে শুধু ছেলের প্রশংসা করত এখন বাপেরও প্রশংসা করে। বলে, 'যেমন ওল তেমনি মুখীটি তো হবে। গাছটি রসালো বলেই তো ফলটি মিঠে।'

'এমনি করেই রাখালের বাবার মন খুশি রাখতেন।' বললেন একদিন শ্রীমা : 'রাখালের বাবা এলেই যত্ন করে এটি-ওটি দেখাতেন, খাওয়াতেন, কত কথা যে বলতেন তার শেষ নেই। মনে ভয়, পাছে রাখালটিকে ওখানে না রাখে, নিয়ে যায়। রাখালের সৎ-মা ছিল। সে যখন দক্ষিণেশ্বরে আসত, ঠাকুর রাখালকে বলতেন, "ওরে ওঁকে ভালো করে সব দ্যাখা, শোনা, যত্ন কর্—তবেই তো জানবে ছেলে আমাকে ভালোবাসে।'

একবার রামলালকে ধরেছিল, এখন ধরল বালগোপালকে। আগে ছিল অষ্ট-ধাতুর বিগ্রহ এখন সপ্তধাতুর মানুষ। আগে ছিল মনোমূর্তি, এখন মানস-পুত্র।

'ভারি খিদে পেয়েছে।' রাখাল বললে এসে রামকৃষ্ণকে। যেমন আবদারে ছেলে মাকে এসে বলে। খিদে পেয়েছে! কি সর্বনাশ, এখন তোকে খেতে দিই কি! ঘরে খাবার নেই, দোকানও বা কই এখানে কাছে-ভিতে! এখন করি কি, যাই কোথায়! আমার রাখালের যে খিদে পেয়েছে! উতলা হয়ে গঙ্গার ধারে চলে এল রামকৃষ্ণ। গলা ছেড়ে কান্নার সুরে ডাকতে লাগল: 'ও গৌরদাসী, এস আমার রাখালের খিদে পেয়েছে।'

বৃন্দাবনের সন্ন্যাসিনী এই গৌরদাসী। বলরাম বসুর কাছে শুনেছে রামকৃষ্ণের কথা। সটান চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বর। এসে দেখল রামকৃষ্ণ কোথায়, এ যে সেই গৌরহরি। সেই থেকে আছে তার পদচ্ছায়ে।

আচ্ছা, গৌরদাসী কি মেয়ে? রামকৃষ্ণ বলে, মেয়ে যদি সন্ন্যাসী হয় সে কখনো মেয়ে নয়, সে পুরুষ। গৌরদাসীও তাই পুরুষ। অদম্য কর্মশক্তি। অভঙ্গ ব্রতে অসাধ্যসাধিকা।

রামকৃষ্ণ বলে, 'আমি জল ঢালছি, তুই কাদা মাখ।'

আমি ভাব দি, তুই তাকে আকার দে। আমার রূপকে তুই রীতিতে নিয়ে যা। আমার বস্তুকে নিয়ে যা আস্বাদে।

শ্রীমা যেবার রামেশ্বর থেকে ফিরলেন, তাঁকে জিগ্‌গেস করলে মেয়েরা, 'কি দেখে এলেন বলুন—'

'আমাকে তারা লেকচার দিতে বললে।' শ্রীমা একটু হাসলেন। 'বললাম আমি লেকচার দিতে জানি না। যদি গৌরদাসী আসত তবে দিত।' একটু থেমে আবার বললেন, 'যে-বড় হয় সে একটিই হয়। তার সঙ্গে অন্যের তুলনা হয় না। সে আমাদের গৌরদাসী।'

সেই গৌরদাসীকে লক্ষ্য করে কাঁদছে রামকৃষ্ণ। ওরে আয়, অসাধ্যসাধন করে দিয়ে যা। ঘরে এক দানা খাবার নেই। আমার রাখালের কিছু খাবার দিয়ে যা শিগগির। তুই না হলে এ অসম্ভব কে সম্ভব করবে?

চাঁদনি ঘাটে নৌকা লাগল। কে তোরা, কোত্থেকে আসছিস? পথে আমার গৌরদাসীকে দেখেছিস কেউ? নৌকোর মধ্যেই তো গৌরদাসী। সঙ্গে বলরাম বোস। আরো কয়েকজন ভক্ত! সবাই এসে পড়েছে এক ডাকে। একে-একে নামতে লাগল। গৌরদাসীও নামল। গৌরদাসীর হাতে খাবারের পুঁটলি।

'ওরে রাখাল, আয়, ছুটে আয়, খাবার খাবি আয়। তোর জন্যে খাবার নিয়ে এসেছে গৌরদাসী।' ব্যাকুল হয়ে ডাকতে লাগল রামকৃষ্ণ।

রাখাল কাছে এসে মুখ ভার করে রইল। বললে, 'খাব না।'

'সে কি রে? এই-না বলছিলি খিদে পেয়েছে!'

'বলেছিলাম তো বলেছিলাম! তাই বলে চার দিকে ঢাক পেটাতে হবে নাকি?'

'আহাহা, তাতে কি হয়েছে।' রাখালের পিঠে হাত বুলুতে লাগল রামকৃষ্ণ: 'তোর খিদে পেয়েছে, তোর খাবার চাই, এ কথা বললে দোষ কি! খিদে পাবার মধ্যে লজ্জা কিসের! আর, খিদে যখন পেয়েছে, তখন খেতে তো হবেই। এতে আবার রাগের কথা কি! নে, এখন খা।' রাখালকে খাইয়ে দিতে লাগল রামকৃষ্ণ।

বড় করে হাঁ কর্। ভালো করে খা।

'কি অবস্থাই গেছে। মুখ করতুম আকাশ-পাতাল জোড়া আর মা বলতুম। যেন মাকে পাকড়ে আনছি। যেন জাল ফেলে মাছ হড়-হড় করে টেনে আনা।'

সেই গানে আছে না—

'খাব খাব বলি মা গো, উদরস্থ না করিব,
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পুজিব।
যদি বল কালী খেলে কালের হাতে ঠেকা যাব,
আমার ভয় কি তাতে, কালী বলে কালেরে কলা দেখাব॥'

* ৬৯ *

কামারপুকুরের লক্ষ্মণ পানকে দিয়ে রামকৃষ্ণ খবর পাঠাল সারদাকে।

'এখানে আমার কষ্ট হচ্ছে। রামলাল মা-কালীর পুজারী হয়ে বামুনের দলে মিশেছে, এখন আমাকে আর তত খোঁজ করে না। তুমি অবশ্য আসবে। ডুলি করে হোক, পালকি করে হোক, দশ টাকা লাগুক, বিশ টাকা লাগুক, আমি দেব।'

সারদার মন কেঁদে উঠল। ভাবল যদি পারি তো পাখি হয়ে উড়ে যাই।

লক্ষ্মণ পান আরো বললে। বললে, ঠাকুর ভাব-টাব হয়ে পড়ে থাকেন, সেদিকে রামলালের খোঁজ নেই। তার মনের ভাবখানা হচ্ছে, কালীঘরের থাকিয়ে পুজারী হয়েছি, আর আমাকে পায় কে। এদিকে মা-কালীর প্রসাদ শুকনো হয়ে রয়েছে, দেখেও দেখছে না।

যেমন চালাও তেমনি চলি। যদি দূরে রাখো, দূরে থাকি ; যদি কাছে ডাকো, ডাক শোনবার জন্যে কান খাড়া করে থাকি তোমার কাছে-কাছে।

ছোট তক্তপোশে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছেন ঠাকুর। মেঝেতে ভক্তদল। হেসে-হেসে ঠাকুর বলছেন ভক্তদের, 'হাজার বিচার করো, আর যাই কেননা বলো, তবু তাঁর অন্ডারে আমরা আছি।'

মাস্টার মশাই বলেন, 'সেই দিন থেকে অন্ডার কথাটি শিখলাম—'

'তিনি তো আর আমাদের হাতে পড়েননি, আমরাই তাঁর হাতে পড়েছি।' বললেন ঠাকুর।

তেমনি আমি পড়েছি তোমার হাতে। আমি আমার বাঁশি শূন্য করে রেখেছি, তুমি যেমন বাজাও তেমনি বাজব। সারদা চলে এল দক্ষিণেশ্বর। ঢুকল নহবতে। ছোট্ট একটুখানি ঘর। ঢোকবার দরজাটিও ছোট। ঢুকতে প্রায়ই মাথা ঠুকে যায় সারদার। এক দিন তো কেটেই গেল রীতিমত। ক্রমশ অভ্যেস হয়ে এল। দরজার সামনে আপনা হতেই নুয়ে পড়ে মাথা। হে প্রবেশপথের দারুদেবতা, ভক্তিমতীর প্রণাম নাও। সামনে একটু বারান্দা, দরমার বেড়া দেওয়া। ঐ তো ঘর, তার মধ্যেই সমস্ত সংসার। রাজ্যের জিনিসপত্র। রাঁধবার সাজ-সরঞ্জাম, হাঁড়ি-কুড়ি, বাসন-কোশন।

জলের জালা, রামকৃষ্ণের জন্যে হাঁড়িতে মাছ জিয়ানো। শিকেতে ভক্তদের জন্যে খাবার-দাবার। আবার লক্ষ্মী এসেছে সংগে। সেও থাকে এই নহবতের ঘরে। রাত্রে মাথার উপর মাছের হাঁড়ি কলকল করে, লক্ষ্মীর ঘুম আসে না।

শুধুই কি লক্ষ্মী? কলকাতা থেকে স্ত্রী-ভক্ত যদি কেউ আসে সেই ঘরেই রাত কাটিয়ে যায়। গৌরদাসীর তো কথাই নেই। তার আবার সেই ঘরেই ভাব হয়। থেকে-থেকে 'নিত্য কোথা' 'নিত্যগোপাল কোথায়' বলে নৃত্য করতে থাকে।

'কে জানে তোমার নিত্য কোথায়?' সারদার কণ্ঠস্বরে হয়তো ঈষৎ ঝাঁজ ফোটে: 'দেখ গে, গংগার ধারে-টারে ভাব হয়ে রয়েছে হয়তো।'

কলকাতা থেকে স্ত্রী-ভক্তরা যারা দেখতে আসে, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলে, 'আহা, কি ঘরেই আমাদের সীতা লক্ষ্মী আছেন গো! যেন বনবাস গো!'

সত্যিই সীতা-লক্ষ্মী। পরনে কস্তা পেড়ে শাড়ি; সিঁথে-ভরা সিঁদুর। কালো ভরাট মাথার চুল প্রায় পা পর্যন্ত পড়েছে। গলায় সোনার কণ্ঠীহার। কানে মাকড়ি। হাতে চুড়ি, যে চুড়ি রামকৃষ্ণের মধুর ভাবের সময় গড়িয়ে দিয়েছিলেন মথুরবাবু। তার উপরে আবার নাকে নথ। নিজের নাকের কাছে আঙুল ঘুরিয়ে গোল চিহ্ন দেখিয়ে সারদাকে রামকৃষ্ণ বোঝায় ইশারায়।

নহবতকে বলে খাঁচা। লক্ষ্মী আর সারদাকে শুকসারী। কালীঘরের প্রসাদ এলে রামলালকে বলে, 'ওরে খাঁচায় শুকসারী আছে, ফল-মূল ছোলা-টোলা কিছু দিয়ে আয়।'

বাইরের লোক যারা শোনে, ভাবে, খাঁচায় বুঝি সত্যি-সত্যি পাখি আছে রামকৃষ্ণের। রাত্রে তো বেশি ঘুম নেই, অন্ধকার থাকতে-থাকতেই উঠে পড়ে রামকৃষ্ণ। বেড়াতে-বেড়াতে নহবতের দিকে চলে আসে। হাঁক পাড়ে: 'ও লক্ষ্মী, ওঠরে ওঠ। তোর খুড়িকে তোল রে। আর কত ঘুমুবি? রাত পোহাতে চলল। মা'র নাম কর।'

শীতের রাত। এক-এক দিন বিছানা ছাড়তে মন ওঠে না। লেপের ভিতরে কুঁকড়ি-সুকড়ি হয়ে সারদা আস্তে-আস্তে লক্ষ্মীকে বলে, 'চুপ কর, সাড়া দিসনি। নিজের চোখে তো ঘুম নেই! এখনো সময় হয়নি ওঠবার। কাক-কোকিল ডাকেনি এখনো—'

সাড়া না পেয়ে সরে যাবার লোক নয় রামকৃষ্ণ। দরজার ফাঁক দিয়ে জল ছিটোয় বিছানায়। নইলে এমনিতে রাত চারটের সময় উঠে সারদা স্নান করে নেয় গংগায়। বিকেলে নহবতের সিঁড়িতে যেটুকু রোদ পড়ে তাইতে চুল শুকোয়। যোগেনের চুল-বাঁধাটি ভারি পছন্দ। যোগেন এলেই বলে বেঁধে দিতে। যোগেনকে বলতে হয় না। সে নিজের থেকে বসে সেই চুলের কাঁড়ি নিয়ে। পাঁচ আঙুল চুলের গোছা সামলাতে পারে না। মা যে আমার আলুলায়িতকুন্তলা। থাকেন ক্ষুদ্র নহবতে, কিন্তু আসলে ভুবনেশ্বরী। সর্বানন্দকরী, প্রসন্নাস্যা। ক্ষিতীশ-মুকুটলক্ষ্মী।

'কার ধ্যান করছিস রে লেটো?'

যার ধ্যান করছে সে তো চোখের সামনে। লাটু আসন ছেড়ে পড়ল।

'শোন, ঐ নবত-ঘরে সাক্ষাৎ ভগবতী আছে, তাঁর রুটি বেলে দে গে।'

বিবেকানন্দের ভাষায়, জ্যান্ত দুর্গা। আমেরিকা থেকে শিবানন্দকে চিঠি লিখছেন স্বামীজী: 'দাদা, বিশ্বাস বড় ধন। দাদা, জ্যান্ত দুর্গা পুজো দেখাব, তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনে জ্যান্ত দুর্গামাকে যেদিন বসিয়ে দেবে সেই দিন আমি একবার হাঁপ ছাড়ব। তার আগে আর আমি দেশে ফিরছি না।'

ফল-মিষ্টি দেদার বিলোচ্ছে সারদা। লোকদের বিলিয়ে দিতে পারলে আর তার কথা নেই। তার এই সদাব্রত দেখে রামকৃষ্ণ ঈষৎ বিরক্ত হল বোধ হয়। বললে, 'অত খরচ করলে কি চলবে?'

একটু বুঝি অভিমান হল সারদার। তার সমুখ থেকে চলে যাবার ভঙ্গিটিতে বুঝি সেই ভাবই ফুটে উঠেছে। ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠল রামকৃষ্ণ। রামলালকে ডেকে পাঠাল।

'ওরে তোর খুড়িকে গিয়ে শান্ত কর।'

'কি হয়েছে?'

'বোধ হয় রেগে গেছে।' একটু থামল রামকৃষ্ণ। বললে. 'ও রাগলে আমার সব নষ্ট হয়ে যাবে।'

রামকৃষ্ণ অগ্নি, সারদা দাহিকা। রামকৃষ্ণ জল, সারদা শীতলতা। রামকৃষ্ণ ব্রহ্ম, সারদা কালী।

রাখালের বালিকা-বউকে নিয়ে এসেছে মনোমোহনের মা। মনোমোহনের মা মানে রাখালের শাশুড়ি। রাখালের শ্বশুরবাড়ি রামকৃষ্ণের ভক্ত-পরিবার। কিন্তু তাই বলে রাখালের বউকে নিয়ে আসার মানে কি? রামকৃষ্ণের বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। রাখালকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার অভিসন্ধি নয় তো? না, ব্যস্ত কি, রাখালই ফিরে-ফিরে যাবে সংসারে। তার ভোগের এখনো একটু বাকি আছে। কিন্তু স্ত্রীর সংস্পর্শে রাখালের ঈশ্বরভক্তির হানি হবে না তো?

আয় তো মা, আয় তো এদিকে, তোকে একবারটি দেখি।

বিশ্বেশ্বরী এগিয়ে এল রামকৃষ্ণের কাছে। রামকৃষ্ণ তাকে দেখতে লাগল খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। সুলক্ষণা, সুভূষণা মেয়ে। সর্বঅঙ্গে দেবীশক্তি। ভয় নেই এতটুকু, স্বামীর ইষ্টপথে বিঘ্ন হবে না।

বললে, 'নবতে যাও, তোমার শাশুড়িকে প্রণাম করে এস।'

সারদাকে নহবতে বলে পাঠাল রামকৃষ্ণ: 'টাকা দিয়ে যেন পুত্রবধূর মুখ দেখো।' সিঁথিতে বেণী পালের বাগানে রাখালকে সঙ্গে করে বেড়াতে গিয়েছে রামকৃষ্ণ। কথা আছে, রাতটা থাকবে সেখানে। সন্ধের পর বাগানে একা-একা বেড়াচ্ছে রামকৃষ্ণ। সেখানে কতগুলো ভূতের সঙ্গে দেখা।

'তুমি এখানে এসেছ কেন?' ভূতগুলো কাতরাতে লাগল: 'তোমার হাওয়া আমাদের সহ্য হচ্ছে না। আমরা জ্বলে গেলুম, জ্বলে গেলুম। তুমি চলে যাও এখান থেকে।'

খাওয়া-দাওয়ার পরেই গাড়ি আনতে বললে রামকৃষ্ণ। সে কি কথা, আপনি না রাত্রে এখানে থাকবেন বলেছিলেন? তা থাকা হল না। শুধু জীবিতের নয়, মৃতেরও আর্তি আছে।

'কিন্তু এত রাতে গাড়ি পাব কোথায় ?'

'তা পাবে, দেখ গে।'

গাড়ি পাওয়া গেল সহজেই। সেই রাতেই ফিরে এল দক্ষিণেশ্বর। জাগ-প্রদীপটির মতই জেগে আছে সারদা। গাড়ির শব্দ পেয়ে চমকে উঠল। কান পেতে শুনল রাখালের সংগে কি কথা বলছে রামকৃষ্ণ। ওমা, কি হবে, যদি না খেয়ে এসে থাকেন, কি খেতে দেব এত রাতে ? অন্য দিন কিছু না কিছু ঘরে থাকে, অন্তত একটু সুজি। কখন কি খেয়ালে খেতে চেয়ে বসেন ঠিক কি। কিন্তু আজ কী হবে ? যদি বলেন, খিদে পেয়েছে ? রাত একটা, মন্দিরের ফটক বন্ধ হয়ে গেছে কখন। কি করে কে জানে ফটক খুলিয়ে নিল রামকৃষ্ণ। হাততালি দিয়ে ঠাকুর-দেবতার নাম করতে-করতে এগুতে লাগল। সংগে-সংগে তালি দিয়ে-দিয়ে রাখালও নাম করছে।

ঝি যদুর মাকে তোলাল সারদা। ও যদুর মা, কি হবে, উনি যে ফিরে এলেন ! যদি বলেন, খাইনি কিছু, খেতে দাও ?

মনের আকুলতাটি বুঝতে পেরেছে মনোহারী। নিজের ঘর থেকেই ডেকে বললে, 'তোমরা ভেবো না গো, আমরা খেয়ে এসেছি।'

পরদিন সকালে রাখালকে বললে সেই ভূতের গল্প।

'ও বাবা, ভাগিস তখন বলোনি সেই রাত্তির বেলা, তাহলে আমার দাঁত-কপাটি লেগে যেত। শুনে এখুনি বুক কাঁপছে—'

স্ত্রী-ভক্তদের কাছে সেই গল্পটাই সেদিন বলছেন শ্রীমা, আর রাখালের ভয়ের কথা ভেবে হাসছেন মৃদু-মৃদু। 'ভূতগুলো তো বড় বোকা।' বললে একজন স্ত্রী-ভক্ত। 'ঠাকুরের কাছে কোথায় মুক্তি চাইবে, তা নয়, চলে যেতে বললে।'

'ঠাকুরের যখন একবার দর্শন পেলে তখন মুক্তির আর বাকি রইল কি মা !' শ্রীমা'র চোখ দুটি প্রসন্নতায় ভরে উঠল : 'জানো না বুঝি আমার নরেনের কাণ্ড ? সেবার মাদ্রাজে গিয়ে ভূতের পিণ্ড দিলে। পিণ্ড দিয়ে মুক্ত করে দিলে প্রেতাত্মাদের।'

কলকাতার রাস্তায় লাটুর সংগে নরেনের দেখা।

'তোদের ওখানকার খবর কি ?' জিগ্গেস করলে নরেন।

'কাল উখানে কত উৎসব হল, আপুনি যান নাই কেন ? হামার সংগে আজ উখানে চলুন—'

'আমার বয়ে গেছে ! সামনে একজামিন। এখন এক পাগলা বামুনের সংগে বসে আড্ডা দেবার আমার সময় নেই।'

'পাগলা বামুন !' হতবুদ্ধির মত তাকিয়ে রইল লাটু। 'পাগলা বামুন আপুনি কাকে বলছেন ?'

'আর কাকে ! কোমরে কাপড় থাকে না, হাত-পা তেউরে যায়, নাম শুনলেই ধেই-ধেই করে নাচে, মান ইজ্জত নেই, যেখানে-সেখানে খালি গায়ে যাওয়া-আসা করে ! তারপর আবার ভেলকি দেখানো আছে—'

'ভেলকি !'

তা ছাড়া আর কি ! সেই গান আছে না ? নিতাই কি ভেলকি জানে, নিতাই কি যাদু জানে, শুকনো কাঠে ফল ধরালো, ফুল ফোটালো পাষাণে !

'হ্যাঁ রে, রাখাল ওখানে যায় ?'

'যায় বই কি। শুধু যায় না, কখনো দু-তিন রাত্তির থেকেও যায়। ঠাকুর তাকে ছেলে বলেন। মাকে বললেন, এই নাও গো তোমার ছেলে এসেছে।'

'রাখালকে তাঁর ছেলে বললেন ?'

'সাচ বলছি, তাই শুনেছি।'

রাখাল যদি ঠাকুরের ছেলে, নরেন শ্রীমা'র।

'মা, এই একশো আট বিল্বপত্র ঠাকুরকে আহুতি দিয়ে এলুম, যাতে মঠের জমি হয়। তা কর্ম কখনো বিফলে যাবে না। ও হবেই একদিন।' নরেনের কণ্ঠে বজ্রের ঘোষণা।

তারপর মঠের জমি কেনা হলে চতুঃসীমা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখাল শ্রীমাকে। বললে, 'মা, তুমি তোমার আপন জায়গায় আপন মনে হাঁপ ছেড়ে বেড়াও।'

একদিন খুব ব্যস্ত-ত্রস্ত হয়ে এসেছে নরেন। বললে, 'মা, আমার আজকাল সব উড়ে যাচ্ছে। সবই দেখছি উড়ে যায়।'

শ্রীমা হাসলেন। বললেন, 'দেখো, আমাকে কিন্তু উড়িয়ে দিও না।'

নরেন বললে, 'মা, তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায় ? যে জ্ঞানে গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দেয় সে তো অজ্ঞান। গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়ায় কোথায় ?'

কৃষ্ণ নাম, বিষ্ণু নাম দু-অক্ষর হলেও কঠিন। বানানেও কঠিন, উচ্চারণেও কঠিন। শিব বলতে তিনটে 'স'-এর মধ্যে একটাকে বাছতে হয়। তার চেয়ে হরি আর রাম সোজা। বর্ণপরিচয়ের সময় যখন জল-খল অজ-আম শিখেছিলি সে সময়েই শেখা যেত হরি নাম। তেমনি সরল, শিশুবোধ্য। কিন্তু তা-ও দু-অক্ষর। তোকে একাক্ষর মন্ত্র দিচ্ছি। সব চেয়ে কম, সব চেয়ে ছোট, সব চেয়ে সোজা— সেই একাক্ষর। ওঁ নয়, হ্রীং-ক্লীং নয়। একেবারে জলের মত তরল, শিশিরের মত ঠাণ্ডা। সেই শব্দটি শিখেছিস সকলের আগে, ভুঁয়ে পড়ে মাটি পাবার সঙ্গে-সঙ্গে। কান্নার স্বর, আনন্দের স্বর, আর্তির স্বর, আকুলতার স্বর। সেই একাক্ষর মন্ত্রটির নাম হচ্ছে মা।

মা আমার জগৎ জুড়ে। আর আমিও তো জগৎ ছাড়া নই। তাহলেই তো মা আমাকে ধরে আছেন, ঘিরে আছেন। তাহলে আর আমার ভয় কি !

মা-ই আমার অভয় মন্ত্র।

সুরেশ মিত্তির 'কারণ' করে জপ করে। তার পর ছাদের পাঁচিলের পাশে বসে নিচু গলায় শ্যামার গান গায়। আস্তে-আস্তে গলা চড়তে থাকে। ক্রমে-ক্রমে সে-গলা কান্নায় গলে পড়ে। আর সে কী কান্না! আর্তনাদের মত কানে লাগে। আশে-পাশের বাড়িগুলি সচকিত হয়ে ওঠে।

'সুরেশ মিত্তির মদ খায়।' এক দিন রাম দত্ত এসে নালিশ করল রামকৃষ্ণের কাছে। 'ওকে বারণ করুন।'

'তাতে তোর কি?' রামকৃষ্ণ ঝলসে উঠল: 'ওর ধাত আলাদা, ও নিজের পথে যাবে। তাতে তোর কী মাথাব্যথা?'

'কারণ' করে কোনো দিন যদি আনন্দে পায় সুরেশকে, তখন আর কথা নেই, সর্বক্ষণ তার মুখে শুধু রামকৃষ্ণের কথা।

'তুই কত্তামো করিস নে।' রাম দত্তকে বললে এক দিন সুরেশ। 'চল্ প্রভুর কাছে যাই। তিনি যেমন আদেশ করেন তেমনি করব।'

নহবতখানার পাশে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে আছে রামকৃষ্ণ। প্রণাম করে দাঁড়াল দুজনে। মনোবাসী টের পেয়েছে মনের কথা। বললে, 'ও সুরেন্দর, মদ খাবি তো খা না। কিন্তু দেখিস পা যেন না টলে, মা'র পাদপদ্ম হতে মন যেন না টলে।'

এখানেও আশ্বাস, এখানেও প্রশ্রয়! মন যদি মুক্ত থাকে, পায়ের বন্ধনে কি এসে যাবে!

জানিস না সেই দুই বন্ধুর গল্প? দুই বন্ধু—এক জন গেল বেশ্যালয়ে, আরেক জন গেল ভাগবত শুনতে। প্রথম জন ভাবছে, ধিক আমাকে! বন্ধু হরিকথা শুনছে, আর আমি এ কোথায় পড়ে আছি! দ্বিতীয় জন ভাবছে, ধিক আমাকে! বন্ধু কেমন ফুর্তি করছে, আর আমি শালা কী বেকুব! দুজনেই মলো। প্রথম জনকে বিষ্ণুদূতে নিয়ে গেল—বৈকুণ্ঠে। দ্বিতীয় জনকে নিয়ে গেল যমদূতে—নরকে। শুধু মন নিয়ে কথা। মনেতেই বন্ধ মনেতেই মুক্ত। মনেতেই শুদ্ধ মনেতেই অশুদ্ধ। মন ধোপাঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, গেরুয়ায় ছোপাও গেরুয়া। যে রঙে ছোপাও সেই রঙে ছুপবে।

'ওরে মদে বিষও আছে মধুও আছে।' সুরেশ মিত্তিরকে বললে রামকৃষ্ণ। 'মদ খাস কেন? ঐ মধুর জন্যেই তো? কিন্তু ঐ বিষ তুই ধারণ করতে পারবি? না, তুই চাস তাই ধারণ করতে?'

সুরেশ মিত্তির চুপ।

'শোন, মদ খাবার আগে ঐ বিষটুকু তুই মাকে নিবেদন করে দে। বল, মা তুমি এর বিষটুকু খাও আর সুধাটুকু আমাকে দাও।'

তাই ভালো। ঝামেলা গেল! মা-ই বিষ খাক। আমার সুধাপানের কথা, সুধাই খাব পুরোপুরি। খাবার আগে মদের গ্লাস মাকে নিবেদন করে দেয় সুরেশ। বলে, বিষটুকু টেনে নে মা, সুধাটুকু আমার জন্যে রেখে যা। বলে গান ধরে মুক্তকণ্ঠে:

জয় কালী জয় কালী বলো,
লোকে বলে বলবে পাগল হলো :
ভালো মন্দ দুটা কথা
ভালোটা না করাই ভালো।

কিন্তু সন্তান হয়ে মাকে কত দিন সে বিষ দিতে পারবে হাতে ধরে ? সুরেশের মনে খটকা লাগল। ঠাকুর তাকে ধোঁকায় ফেলেছেন। নিজে মধুটুকু খেয়ে মাকে কি ছেলে বিষ দিতে পারে ? কতটুকু পারে ? কত দিন পারে ? মদের গ্লাস নামিয়ে রাখলে সুরেশ।

অচলানন্দ এসে রামকৃষ্ণকে বলে, একটু কারণ খাও।

সে সব কী দিনই গেছে ! যে দলের সাধকই হও না কেন আমাকে দেখাও তোমার ঈশ্বরসাধন। তোমার রীতি-নীতি। তোমার আকার-প্রকার, আমি শুধু দেখব আর আনন্দ করব। কত রকম ভোগ্য, কত রকম ভজনা !

মথুরবাবুকে বললে, 'সব সাজপাট যোগাড় করে দাও।'

ভাণ্ডারী মথুর কাণ্ডারী হল। বললে, 'সব যোগাড় করে দিচ্ছি। কার কি লাগবে বলো। তোমার যাকে যা খুশি তাই দিয়ে দাও স্বচ্ছন্দে।'

সাধুদের জন্যে শুধু চাল ডাল ঘি আটা নয়—যোগাড় হল কম্বল-আসন-লোটা-কমণ্ডলু—যার যা নেশার সরঞ্জাম। সিদ্ধি গাঁজা কারণ চরস। আদা পেঁয়াজ মুড়ি কড়াই-ভাজা।

তান্ত্রিক অচলানন্দের দারুণ জেদ। বলে, 'কারণ খেতেই হবে তোমাকে।' রামকৃষ্ণকে চক্রে নিয়ে বসে। কখনো বা চক্রেশ্বর সাজায়। বলে, 'খাও না একটু কারণ।'

রামকৃষ্ণ বলে, 'ওগো, আমার নাম করলেই নেশা হয়ে যায়।'

আমার নেশা জিভে মেশা। বাইরের কোনো পৃথক বস্তুর দরকার হয় না। যেমনি একটু নাম করব অমনি সমস্ত সত্তা পীযুষে স্নান করে উঠবে। আমার হচ্ছে নাম-সাধুর নেশা।

অচলানন্দ ছেড়ে দিল। শেষকালে শুধু বললে, 'চক্রে বসলে কারণ গ্রহণ করতে হয়—নইলে সাধনার অংগহানি ঘটে।'

রামকৃষ্ণ তখন কারণ নিয়ে কপালে ফোঁটা কাটে বা ঘ্রাণ নেয়। বড় জোর আঙুলে করে ছিটে দেয় মুখের উপর। পাত্রে-পাত্রে ঢেলে সবাইকে পরিবেশন করে।

একেক দিন ভীষণ তর্জন করে অচলানন্দ। বলে, 'স্ত্রীলোক নিয়ে বীরভাবে সাধন তুমি কেন মানবে না ? শিবের কলম মানবে না ? তন্ত্র লিখে গেছেন শিব, তাতে সব ভাবের সাধন আছে। বীরভাবের সাধনও বাদ পড়েনি—'

'কে জানে বাপু,' রামকৃষ্ণের মুখে সরল সমর্থন : 'আমার শুধু সন্তানভাব।'

মধু রায়ের গলিতে গাড়ি ঢোকে না, দাঁড়ায় পুবের বা পশ্চিমের বড় রাস্তায়। সভা-শেষে হেঁটে চলেছে রামকৃষ্ণ—গলিটুকু পেরিয়েই গাড়িতে গিয়ে উঠবে। কিন্তু ঈশ্বরানন্দে এমনি মাতোয়ারা হয়ে আছে, মেপেমেপে পা ফেলতে পারছে না। টলমল

করছে, এখানকার পা ওখানে গিয়ে পড়ছে—রাখাল বুঝি এখন সঙ্গে নেই। তার কাজই হচ্ছে ঈশ্বরবিভোর রামকৃষ্ণকে ধরে-ধরে ঠিকমতো পথ দেখানো। এইখানে সিঁড়ি, এইখানে উঁচু, এইখানে গর্ত, এমনি বলে-বলে নিজের জায়গায় টেনে নিয়ে যাওয়া। যখন রাখাল না থাকে তখন বাবুরাম আছে।

ভক্তরা দু দিক থেকে ধরে রামকৃষ্ণকে নিয়ে যাচ্ছে গাড়ির দিকে। আস্তে-আস্তে নিয়ে যাচ্ছে। রামকৃষ্ণ টলছে, হেলছে-দুলছে, পা রাখতে পারছে না স্থির হয়ে। গলির মোড়ে দাঁড়িয়েছিল কারা। বলে উঠল, 'কী দারুণ টেনেছে হে!'

'বাবাঃ একেই বলে পাঁড় মাতাল! একেবারে বেহুঁশ।'

লোকে তাই দেখে চর্মচক্ষে। একেই বলে দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রমাণ! দড়িকে সাপ দেখে, ছায়াকে ভূত! আবার তেমনি ঈশ্বর রসময়কে বলে কি না সুরাপানে জ্ঞানশূন্য! ওরে সুরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে। আমার মন-মাতালে মাতাল করে মদ-মাতালে মাতাল বলে।

আহাহা, চেয়ে দ্যাখ ঈশ্বর যেন ঊর্ণনাভ। মাকড়সা কি করে? নিজের শরীর থেকেই লূতাতন্তু সৃষ্টি করে নিজের আনন্দে জাল বোনে। আবার সেই জালের আশ্রয়েই নিজের আনন্দে বাস করে। তেমনি আমাদের ঈশ্বর। সমস্ত জগতের উপাদান তিনি, তিনিই আবার সমস্ত জগতের উপলক্ষ। আবার এই জগতের মধ্যেই তাঁর বাসা। এই জগৎই আবার তাঁর লীলাগৃহ।

রামকৃষ্ণ গেছে কালীঘরে ভবতারিণীকে দর্শন করতে। সারদা তার ঘরখানি ঝাঁটপাট দিয়ে রাখছে। পেতে রাখছে বিছানা। তার পর পান সাজতে বসেছে এক কোণে। ঘরের কাজ চটপট সেরে চুপিচুপি বেরিয়ে যাবে সারদা, দরজার মুখে রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা। কিন্তু এ তাঁর কী চেহারা! যেন পুরোদস্তুর মাতাল! চোখ দুটো লাল, এখানকার পা ওখানে পড়ছে, কথা এড়িয়ে গেছে, কী সব যেন বলছেন জড়িয়ে-জড়িয়ে!

ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে কিনা এক মুহূর্ত ভাবল সারদা। এক মুহূর্ত!

মাতালের মত সারদার গা ঠেলে দিল রামকৃষ্ণ। বললে, 'ওগো, আমি কি মদ খেয়েছি?'

সারদা আনন্দে লহর দিয়ে উঠল। বললে, 'না, না, মদ খাবে কেন?'

'তবে কেন এমনি টলছি? তবে কেন কথা কইতে পাচ্ছি না? আমি কি মাতাল?'

সারদা একবার দেখল বুঝি পরিপূর্ণ চোখে। বললে, 'না, না, তুমি মদ কেন খাবে? তুমি মা-কালীর ভাবামৃত খেয়েছ।'

'তোদের বংশের কেউ সন্নেসী হয়েছে ?' নতুন কোনো ছাত্র ইস্কুলে ভর্তি হতে এলেই নরেনের এই প্রথম জিজ্ঞাসা : 'ধন-মান স্ত্রী-পুত্র ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে বিবাগী হয়ে ?'

মেট্রোপলিটন ইস্কুলের সবচেয়ে নিচু ক্লাসের ছাত্র। মাত্র সাত বছর বয়েস। নতুন ছাত্র অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। রাজারাজড়ার খবর নয়, কে কবে কোথায় ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে পথে বেরিয়েছে, এ নিয়ে এত জাঁক। সন্নেসী হওয়া মানে যেন কত বড় এক দিকপাল হওয়া। জান্তা ছেলেরা কেউ-কেউ টিপ্পনি কাটে। তোর বাবা তো মস্ত এটর্নি, আছিস সবাই রাজার হালে, সুখের পায়রা সেজে। তোদের বংশে আবার সন্নেসী !

'ছাই জানিস।' গর্জে ওঠে নরেন : 'আমার ঠাকুরদা দুর্গাচরণ দত্ত সন্নেসী হয়েছিলেন—'

মাত্র পঁচিশ বছর বয়েস, স্ত্রী ও তিন বছরের শিশুপুত্র বিশ্বনাথকে ত্যাগ করে দুর্গাচরণ চলে গেলেন প্রব্রজ্যা নিয়ে। বিশ্বনাথ তখন আট বছরের, তাকে নিয়ে তার মা কাশী চললেন। উদ্দেশ্য বিশ্বনাথ-দর্শন। নৌকোয় যেতে দেড় মাস লাগল। যিনি স্বামী হয়ে ত্যাগ করেছেন ও পুত্র হয়ে পূর্ণ করেছেন তাঁকে একবার দেখে আসবেন স্বচক্ষে।

বৃষ্টি হয়ে বিশ্বনাথের মন্দিরের সমুখটা পিছল হয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পড়ে গেলেন। 'মায়ি গির-গিয়া—' বলে এক সাধু ছুটে এসে তাঁকে তুলে ধরল। কে এ সন্নেসী ? সিঁড়িতে সযত্নে শুইয়ে দিতে যাবে চোখে-চোখে চকিত সংস্পর্শ হয়ে গেল ! এ যে দুর্গাচরণ !

'মায়া হ্যায়, এ মায়া হ্যায়—' বলে উঠল সন্নেসী। দ্রুত পায়ে অন্তর্ধান করলে। সেই সন্নেসীরই নাতি নরেন্দ্রনাথ।

বলে, 'এই, দেখি, তোর হাত দেখি।'

যেন কতই পণ্ডিত, এমনি ভাবে সহপাঠীদের হাত দেখে। বলে, 'ছাই, কিচ্ছু নেই। তোর কিচ্ছু হবে না—সন্নেসী হওয়া নেই তোর অদৃষ্টে।'

সন্ন্যাসী হওয়া মানে নরপতি হওয়া। আর, নরপতির আরেক নামই নরেন্দ্র।

'এই দ্যাখ, আমার হাতে কত বড় চিহ্ন। আমি নির্ঘাত সন্নেসী হব।'

এ যেন প্রায় বিলেত যাওয়ার মত। আর সব ছেলেরা আবিষ্টের মতন চেয়ে থাকে। সন্নেসী হবার কী মজা, তাই তখন সবাইকে গল্প করে। তোরা কিচ্ছু জানিস নে, বড়-বড় সাধুরা সব হিমালয়ে থাকে, গভীর জঙ্গলের মধ্যে। কৈলাস পাহাড়ের উপর রোজ মহাদেবের সঙ্গে তাদের দেখা হয়। যদি সন্নেসী হতে চাস, তবে প্রথম যেতে হবে সেই জঙ্গলে, সাধুদের পায়ে মাথা খুঁড়তে হবে। যদি তাঁদের দয়া হয়, যদি তাঁদের পরীক্ষায় পাস করতে পারিস, তবেই চেলা বনতে পারবি, পরতে পাবি গেরুয়া। কিসের পরীক্ষা ? কেমনতরো পরীক্ষা ? পরীক্ষা

খুব কঠিন। প্রত্যেককে একখানা করে বাঁশ দেবে। আর, সেই একখানা বাঁশের উপর শুয়ে ঘুমুতে হবে সারা রাত। পড়ে গেলেই ফেল। যদি না পড়ে রাত কাটাতে পারিস তবেই সন্নেসী। তারপরেই একদিন কৈলাসে শিবদর্শন।

মা ভুবনেশ্বরী প্রত্যহ শিবপুজো করেন। চারচারটি মেয়ে, দুটি আবার গত হয়েছে, একটিও ছেলে নেই। বীরেশ্বর শিব কি তাঁর মনের ইচ্ছাটি পূর্ণ করবেন না? ইচ্ছা হয়ে যিনি মনের মধ্যে ছিলেন, তিনিই আবির্ভূত হলেন। অপূর্ব স্বপ্ন দেখলেন ভুবনেশ্বরী। যেন যোগীশ্বর শিব যোগনিদ্রা ছেড়ে পুত্ররূপে তাঁর দুয়ারে দাঁড়িয়ে।

বারো শো উনসত্তর সালের পৌষসংক্রান্তির দিন বিশ্বনাথের ছেলে হল। মা নাম রাখলে বীরেশ্বর। সেই থেকে দাঁড়াল 'বিলে'। এ তো হল ডাক-নাম। ভালো নামের তলব পড়ল অন্নপ্রাশনের সময়। নাম দাও নরেন্দ্র। নরের মধ্যে যে ইন্দ্র, তার নাম আবার কী হবে? এ হচ্ছে নরেশ্বর, নরোত্তম। এ হচ্ছে নরসিংহ। দুর্দান্ত ছেলে। অষ্টপ্রহর তার সংগে-সংগে ঘোরবার জন্যে দু-দুটো ঝি রেখে দিয়েছে বিশ্বনাথ। যদি একবার রাগ হয় জিনিসপত্র সব ভেঙে-চুরে ছারখার করে দেবে। তাকে শান্ত করা তখন এক বিষম সমস্যা। কিন্তু অভিনব এক উপায় বের করেছেন ভুবনেশ্বরী! 'শিব' বলে মাথায় একটু জল ছিটিয়ে দিলেই নিশ্চিন্ত। ফুসমন্তরে ঠাণ্ডা।

এক টুকরো গেরুয়া কাপড় কৌপীনের মত করে পরেছে নরেন।

'এ কি?' চমকে উঠলেন ভুবনেশ্বরী।

'আমি শিব হয়েছি।'

চোখ বুজে ধ্যান করলেই মাথায় জটা গজায়, আর সেই জটা বটের শেকড়ের মত মাটির ভেতরে গিয়ে সেঁধোয়। এমনি চমৎকার একটা কাহিনী কে বলেছে নরেনকে। তাই সে শিরদাঁড়া টান করে চোখ বুজে খানিকক্ষণ আর থেকে-থেকে চোখ মেলে দেখে, জটা কত দূরে নামল পিঠ বেয়ে।

'মা, এত ধ্যান করছি, জটা হচ্ছে কই?'

মা বলেন, 'জটা হয়ে কাজ নেই।'

বাবা জিগ্গেস করেন, 'বড় হয়ে কি হবি রে বিলে?'

নির্বিতর্ক উত্তর নরেনের : 'কোচোয়ান হব।'

চাবুক মেরে ঘোড়া ছুটিয়ে গাড়ি চালাব।। চেতনার চাবুক। কর্ম আর ধর্ম দুই ঘোড়া। আর, জাড্য আর তামসিকতার গাড়ি।

'ত্যাগী না হলে তেজ হবে না।' ব্রহ্মানন্দকে লিখছে বিবেকানন্দ : 'আমরা অনন্তবলশালী আত্মা—দেখ দিকি কি বল বেরোয়। কিসের দীনা-হীনা? আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা। কিসের রোগ, কিসের ভয়, কিসের অভাব? দীনা-হীনা ভাবকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করো দিকি।...বীর্যমসি বীর্যং, বলমসি বলম্, ওজোঽসি ওজঃ, সহোঽসি সহো, ময়ি ধেহি। তুমি বীর্যস্বরূপ, আমাকে বীর্যবান করো। তুমি বলস্বরূপ, আমাকে বলবান করো। তুমি ওজঃস্বরূপ, আমাকে ওজস্বী করো। তুমি সহ্যশক্তি, আমাকে সহনশীল করো। রোজ ঠাকুর পুজোর সময় যে

আসন প্রতিষ্ঠা—আত্মানং অচ্ছিদ্রং ভাবয়েৎ—আত্মাকে অচ্ছিদ্র ভাবনা করবে—ওর মানে কি ? ওর মানে, আমার ভেতরই সব আছে—আমার ইচ্ছা হলেই সমস্ত প্রকাশিত হবে।'

ইচ্ছাটিকে চাবুক করে মারো তোমার গতিহীন জড়ত্বের স্থূল পিণ্ডে। বেগবান ঘোড়া ছুটিয়ে দাও ! রজোগুণের ঘোড়া। আস্তাবলের সহিসের সঙ্গে ভাব করল নরেন। কিন্তু বিয়ে করে সহিসের বড় কষ্ট। বিয়ের মত ঝকমারি আর কিছু নেই। সারা জীবন সে ঝকমারির মাশুল যোগাতেই প্রাণান্ত। বালক নরেনের কানে মন্ত্র দিলে সহিস। আর, নরেনের কাছে সহিসই সর্বজ্ঞ।

মনের মধ্যে ধাক্কা খেল আচমকা। এ বলে কী ! যে রামসীতাকে নরেন এত ভক্তি করে তারা যে বিয়ে করেছে ! রামসীতার ভালোবাসার কত গল্প শুনেছে সে মা'র কাছে ! তবে সহিস যখন বলছে, বিয়ে খারাপ, তখন রামসীতাকে কি করে আর ভক্তি করা যায় ? রামসীতার দুঃখে কাঁদতে লাগল নরেন। মা কাছে আসতে তাঁর বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে আরো ফুঁপিয়ে উঠল। মা বললেন, 'তাতে কি ! তুই শিবপুজো কর।'

বুকটা হালকা হয়ে গেল। ছাদের ঘরে উঠে রামসীতার মূর্তি সে তুলে নিয়ে এল। ছুঁড়ে ফেলে দিল রাস্তায়। রামসীতার আসনে বসাল শিবমূর্তি।

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ চন্দ্রশেখর। আদিমধ্যান্তশূন্য শ্বেতশিখা।

নরেন নিজে কী !

'ও হচ্ছে পাতালফোঁড়া শিব। ও বসানো শিব নয়।' বললেন ঠাকুর : 'কারু পদ্ম দশদল, কারু ষোড়শদল, কারু বা শতদল। কিন্তু পদ্ম মধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল।'

আর নরেন্দ্র কী বলছে ?

'দাদা, না হয় রামকৃষ্ণ পরমহংস একটা মিছে বস্তুই ছিল, না হয় তাঁর আশ্রিত হওয়া একটা বড় ভুল কর্মই হয়েছে, কিন্তু এখন উপায় কি ? একটা জন্ম নয় বাজেই গেল, মরদের বাত কি ফেরে ? দশ স্বামী কি হয় ? তোমরা যে যার দলে যাও, আমার কোনো আপত্তি নেই, কিছুমাত্রও নেই, তবে এ দুনিয়া ঘুরে দেখছি, যে, তাঁর ঘর ছাড়া আর সকল ঘরেই "ভাবের ঘরে চুরি।" তাঁর জনের উপর আমার একান্ত ভালোবাসা, একান্ত বিশ্বাস। কি করব ? একঘেয়ে বলো বলবে, কিন্তু ঐটি আমার আসল কথা। যে তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছে, তার পায়ে কাঁটা বিঁধলে আমার হাড়ে লাগে।...তাঁর দোহাই ছাড়া আর কার দোহাই দেব ? আসছে জন্মে না হয় বড় গুরু দেখা যাবে, এ জন্ম এ শরীর সেই মূর্খ বামুন কিনে নিয়েছে।'

জাত কাকে বলে—বালক নরেন বড় ফাঁপরে পড়েছে। জাত না মানলে কী হয় ? ছাদ-দেয়াল কি ভেঙে পড়ে ? জাত যে যায়, কি করে যায়, কোন পথে ? ও কি টাকা-কড়ি যে চুরি যায় ? না, জামা-কাপড় ছিঁড়ে যায় ? একবার দেখলে হয় পরীক্ষা করে।

নানারকম মক্কেল আসে বিশ্বনাথের বৈঠকখানায়। জাত মেনে আলাদা-আলাদা হুঁকো। বৈঠকের উপর সার-সার বসানো। এটা শুদ্দুর এটা বামুন এটা মুসলমান। মুসলমানের হুঁকোতেই আগে টান দিল নরেন।

'ও কি হচ্ছে রে ?' বাবা কখন হঠাৎ এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে।

'দেখছি কোনখান দিয়ে জাত যায় ? যাকে ছোট করে রেখেছি তাকে ছুঁলে কী হয় ?'

কী হয় ? সে হাতে হাত দিয়ে পাশে এসে দাঁড়ায়। জাতটা নিমেষে বড় হয়ে ওঠে। দেশ দুশো কদম এগিয়ে যায়।

'বলি, শশীবাবুকে মালাবারে যেতে বোলো।' রাখালকে চিঠি লিখছে নরেন : 'সেখানকার রাজা সমস্ত প্রজার জমি ছিনিয়ে নিয়ে ব্রাহ্মণগণের চরণার্পণ করেছেন, গ্রামে-গ্রামে বড়-বড় মঠ, চর্বচোষ্য খানা, আবার নগদ।···ভোগের সময় ব্রাহ্মণেতর জাতের স্পর্শে দোষ নেই—ভোগ সাঙ্গ হলেই স্নান।...পয়সা নেবে, সর্বনাশ করবে, আবার বলে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না। আর কাজ তো ভারি—আলুতে-বেগুনে যদি ঠোকাঠুকি হয়, তা হলে কতক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে !...মহা দঙ্ক সামনে—সাবধান, ঐ দঙ্কে সকলে পড়ে মারা যাবে—ঐ দঙ্ক হচ্ছে যে হিঁদুর ধর্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই—ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। হিঁদুর ধর্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গে নয়, ছুঁৎমার্গে। আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না। এই ঘোর বামাচার ছুঁৎমার্গে পড়ে প্রাণ খুইও না। "আত্মবৎ সর্বভূতেষু" কি পুঁথিতে থাকবে নাকি ? যারা এক টুকরো রুটি গরীবের মুখে দিতে পারে না তারা আবার মুক্তি কি দিবে !'

'নরেন্দ্র সভায় থাকলে আমার বল।' বললেন তাই ঠাকুর : 'ও বড় ফুটোওলা বাঁশ। খুব আধার—অনেক জিনিস ধরে।'

তৃণগুল্মের দেশে মাঝে-মাঝে বিস্ময়কর বনস্পতির দেখা মেলে। নরেন্দ্রনাথ বনস্পতির দেশে দেবতাত্মা নগাধিরাজ। আর সেই যে হিমালয় তার ঊর্ধ্বে বিরাজিত যে মানস-সরোবর—নিবাত-নিষ্কম্প নীলকান্ত প্রশান্ত অমৃত-হ্রদ, তিনিই রামকৃষ্ণ।

* ৭২ *

ছ'টি সৈন্য সঙ্গে নিয়ে পথ চলে নরেন। তারা হচ্ছে—কি আর কে, কবে আর কোথায়, কেন আর কেমন করে ? সব সঙিন-ওঁচানো সান্ত্রী। কেউ একটা কিছু বলবে আর তখুনি ঘাড় কাত করে মেনে নেবে এমনটি কখনো হবার নয়। যদি থাকে তো দেখাও। বেশ তো, কোথায় ? চলো আমার সঙ্গে। কেন ঈশ্বরকে ডাকবো ? কেন মানবো তোমাকে ? তুমি কে ? ঈশ্বরই বা কি ? যদি উঠবোই উপরে, কেমন করে উঠবো ?

শিব চাঁপাফুল ভালোবাসে। তাই নরেনও ভালোবাসে চাঁপাফুল। পাড়ার কোন এক ছেলের বাড়িতে চাঁপা গাছ আছে, যখন-তখন তার ডালে বসে দোল খায় নরেন। গাছ তো ভাঙবেই, ডানপিটে ছেলেটাও জখম হবে।

'ও গাছটায় উঠো না।' বাড়ির বুড়ো মালিক ভারিক্কি গলায় বারণ করলে।

'কি হয় উঠলে ?'

প্রশ্ন শুনে মালিক চমকে উঠল। ভাবলে শান্ত কথায় হবে না, ভয় দেখাতে হবে। বললে, 'ও গাছে ব্রহ্মদৈত্য থাকে।'

'কি রকম দেখতে ব্রহ্মদৈত্য ?'

'ওরে বাবাঃ, ভয়ঙ্কর দেখতে। নিশুতি রাতে সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

'ঘুরে বেড়াক না।' নরেনের মুখে নিটোল নির্লিপ্তি : 'তাতে আমার কি !'

'তোমার কি মানে ? যারা ঐ গাছে চড়ে তাদের ঘাড় মটকে দেয়।'

রাত করে চুপি চুপি চলে এসেছে নরেন। বড় ইচ্ছে সাদা চাদর-পরা ব্রহ্মদৈত্যর সঙ্গে দেখা হয়। সহপাঠী ছেলে বাধা দিতে এল নরেনকে। বললে, 'না ভাই অমন কাজ করিস নে। নির্ঘাত তবে তোর ঘাড় মটকাবে।'

নরেন হেসে উঠল উচ্চরোলে। 'লোকে একটা কিছু বললেই বিশ্বাস করতে হবে ? পরীক্ষা করে দেখব না নিজে ?' বলেই সে গাছের ডালে চড়ে বসল।

নিজে যাচাই করে দেখব। যাচাই করে দেখব বুদ্ধির কষ্টিপাথরের যুক্তির সোনা ঘষে-ঘষে। বইয়ে লেখা আছে বলেই সত্য, ভালোমানুষের মত তা মানতে পারব না। নিজে পরীক্ষা করব। সত্য কি এতই সোজা ? বিলেত আছে, এ বললেই হবে ? যেতে হবে বিলেতে। পরের মুখে ঝাল খেতে পারব না। ঝালের প্রমাণ চাই।

'ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসেন এ বললেই হবে ?' নরেন্দ্র গর্জে উঠল : 'প্রমাণ চাই।'

গিরীশ ঘোষ বললে, 'বিশ্বাসই প্রমাণ। এই জিনিসটা যে এখানে আছে তার প্রমাণ কি ? বিশ্বাসই প্রমাণ।'

'আমি ট্রুথ চাই—প্রুফ চাই।' নরেন্দ্র আবার হুঙ্কার ছাড়ল। 'শাস্ত্রই বা বিশ্বাস করি কেমন করে ? এককে জন এককে বলছে। যার যা মনে আসছে তাই—'

ঠাকুর বললেন, 'গীতা সব শাস্ত্রের সার। সন্ন্যাসীর কাছে আর কিছু থাক-না-থাক, ছোট একখানি গীতা অন্তত থাকবে।'

একজন ভক্ত গদ্‌গদ হয়ে উঠল : 'আহা, গীতা—শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'

'শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, না ইয়ে বলেছেন—' ঝাঁজিয়ে উঠল নরেন।

'হাতি যখন দেখিনি, তখন সে ছুঁচের ভেতর দিয়ে যেতে পারে কিনা কেমন করে জানব ?' বললে ভবনাথ। 'ঈশ্বরকে যখন জানি না তখন তিনি মানুষ হয়ে অবতার হতে পারেন কিনা কেমন করে বুঝব বিচার করে ?'

নরেন বললে, 'আমি বিচার চাই। ঈশ্বর আছেন, বেশ ; কিন্তু তিনি কোথাও ঝুলছেন এ আমি মানতে পারব না।'

'সবই সম্ভব।' বিস্ময়-সুস্মিত মুখে বললেন ঠাকুর, 'তিনি ভেলকি লাগিয়ে দেন। বাজিকর গলার ভেতর ছুরি চালায়, আবার বার করে। ইট-পাটকেল খেয়ে ফেলে।'

তবে বাজিকরই সত্য। আর সব ভেলকি। বাজিকর আর তার বাজি। ভগবান আর তাঁর ঐশ্বর্য। বাবু আর তার বাগান। বাজি দেখে লোক অবাক, কিন্তু বাজি ক্ষণিকের, এই আছে এই নেই—বাজিকরই সত্য। ঐশ্বর্য দুদিনের, ভগবানই সত্য। বাগান দেখেই ফিরে যেও না, বাগানের মালিক-বাবুর সন্ধান করো।

নরেনের বয়েস তখন এগারো, গঙ্গার ঘাটে ইংরেজের মনোয়ারী জাহাজ এসেছে। চল্, দেখে আসি। কিন্তু ঘাটের বড় সাহেবের দস্তখতী ছাড় চাই। ওরে বাবা, গিয়ে কাজ নেই। কে দাঁড়াবে ওই লালমুখো জাঁদরেলের কাছে? কথা কইবে কে? ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চল্। সামনের সিঁড়িতে প্রত্যক্ষ বাধা। পিছনের দিকে লোহার আরেকটা সরু সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়েই সটান উপরে উঠে গেল নরেন। পর্দা-ফেলা ঘরে সাহেব বসে আছে। পর্দা সরিয়ে সটান ঢুকলো নরেন। সাহেব তো অবাক। অবাক যখন হয়েছ তখন অবাক থেকেই আলগোছে সই করে দাও একটা।

পাস নিয়ে সামনের সিঁড়ি দিয়েই বুক ফুলিয়ে নেমে এল নরেন। প্রহরী তো অবাক। জিগ্‌গেস করলে, 'তুম ক্যায়সে উপরমে গিয়া?'

নরেন শুধু বললে, 'হাম জাদু জানতা।'

বাবার সঙ্গে রায়পুর যাচ্ছে নরেন—নাগপুর পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে, সেখান থেকে গরুর গাড়ি। গরুর গাড়ির রাস্তা প্রায় পনেরো দিন। তাই চলেছে নরেন। চলেছে বিন্ধ্যাচলের গা ঘেঁষে। ঘন অরণ্যের পথ বেয়ে। একখানা গরুর গাড়িতে নরেন একা। অন্য গাড়িতে তার মা আর ছোট ভাইয়েরা।

চার দিকে বিরাটের রূপ। যে দিকে তাকাও সেই দিকেই বিরাট আসন পেতে বসেছেন। বসেছেন পর্বতশৃঙ্গে, বসেছেন গহন অরণ্যানীতে। তা ছাড়া সেই মহা-শিল্পীর সূক্ষ্ম কারুকাজও ছড়িয়ে রয়েছে এখানে-সেখানে। পত্রে-পুষ্পে, কঠিনের গায়ে কোমলের আলিম্পনে। হঠাৎ একটা মৌচাক নরেনের চোখে পড়ল। পাহাড়ের চূড়া থেকে শুরু করে প্রায় মাটি পর্যন্ত দীর্ঘ এক ফাটল জুড়ে বিরাট মৌচাক। কত তিল-তিল পরিশ্রম, কত বিন্দু-বিন্দু মধু—আদি-অন্তের ইয়ত্তা করা যায় না। অনন্তের ভাবে তলিয়ে গেল নরেন।

তাকাও তেমনি একবার ঐ অন্তরীক্ষে। রাত্রির তারকাময় আকাশে। সমুদ্র-তটের বালুকাকণার মত জ্যোতির কণিকা। একেকটা কণিকা দেদীপ্যমান সূর্যের চেয়ে বড়! এমনি কত যে স্ফুলিঙ্গ, বিজ্ঞানের কোনো ল্যাবরেটারিতেই গণনা করা যায় নি। তার মধ্যে এক কণা ধূলির মত এই পৃথিবী। এ সবের মানে কি! তাও কি সবাই স্থির হয়ে আছে? ছুটেছে দুর্দান্ত বেগে। সে যে কত বড় মহাশূন্য কে তার সীমাসীমান্ত খুঁজে পায়! কেন এই জ্যোতিরিঙ্গন? কেন এই সর্বতশ্চক্ষু আকাশ? রাত্রির পৃষ্ঠায় কিসের ইঙ্গিতটি সে লিখে রেখেছে স্পষ্টাক্ষরে? কেন? কার জন্যে?

সেই মৌচাক দেখে প্রথম ধ্যানাবিষ্ট হল নরেন।

এণ্ট্রান্স পাস করে ঢুকল এসে কলেজে। নড়ে-ভোলা ছেলে নয়, দুঃসাহসী, জাহাবাজ ছেলে। এদিকে আবার স্ফূর্তিবাজ, রঙ্গপ্রিয়। অপরিমিত জীবনের

উজ্জ্বল উচ্ছ্বাস। সব মিলে আবার নির্মলতা আর পবিত্রতার দীপ্ত বিগ্রহ। শুধু তাই ? গান গায় নরেন। মৃদঙ্গ বাজায়। নৃত্য হচ্ছে বীরোচিত কলা। নাচে তাই স্বচ্ছন্দে। স্বভাবসৌন্দর্যে। তাণ্ডবপ্রিয় শিব যেন মেতেছেন উদ্ধত নৃত্যে।

ফার্স্ট আর্টস পাস করে বি-এ পড়তে গেল নরেন। কিন্তু পড়ার উদ্দেশ্য কি ? শুধু পরীক্ষা পাস করা ? না জ্ঞানার্জন ? কিন্তু জ্ঞানই বা বলে কাকে ?

'আহাম্মক, তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পাইচারি করছ। ইউরোপীয় মস্তিষ্ক-প্রসূত কোনো তত্ত্বের এক কণামাত্র—তাও খাঁটি জিনিস নয়—সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্ছ, আর তোমাদের প্রাণমন সেই তিরিশ টাকার কেরানীগিরির দিকে পড়ে রয়েছে। না হয় খুব জোর একটা দুষ্ট উকিল হবার মতলব করছ। এই ভারতীয়গণের সর্বোচ্চ দুরাকাঙ্ক্ষা। আবার প্রত্যেক ছাত্রের আশে-পাশে একপাল ছেলে—তাঁর বংশধরগণ—বাবা খাবার দাও, খাবার দাও করে উচ্চ চিৎকার তুলেছে। বলি, সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে যে তোমাদের বই গাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সমেত তোমাদের ডুবিয়ে ফেলতে পারে না ?'

বি-এ-তে দর্শন ছিল নরেনের। এক দিকে হার্বার্ট স্পেনসার, কাণ্ট আর মিল, অন্য দিকে ভারতবর্ষ—হিন্দুদর্শন। তত্ত্ব আর তর্ক, যুক্তি আর কল্পনা। কি হবে দর্শনে ? দর্শন পড়ে কী দর্শন করব ? সত্য-দর্শন চাই। সত্যমেব জয়তে নানৃতং, সত্যেনৈব পন্থা বিততো দেবযানঃ।

'যৌবন ও সৌন্দর্য নশ্বর, জীবন ও ধনসম্পত্তি নশ্বর, নাম-যশ নশ্বর, এমন ক পর্বতও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধূলিকণায় পরিণত হয়, বন্ধুত্ব ও প্রেমও অচিরস্থায়ী, একমাত্র সত্যই চিরস্থায়ী। হে সত্যরূপী ঈশ্বর, তুমিই আমার একমাত্র নিয়ন্তা হও।...এই মুহূর্ত হইতে আমি ইহামুত্রফলভোগবিবাগী হইলাম—ইহলোক এবং পরলোকের যাবতীয় অসার ভোগনিচয়কে পরিত্যাগ করিলাম। হে সত্য, একমাত্র তুমিই আমার পথপ্রদর্শক হও। আমার ধনের কামনা নাই, নাম-যশের কামনা নাই, ভোগের কামনা নাই। ভগিনি, এ সকল আমার নিকট খড়-কুটা—'

শুধু গুণবিচার করে চলেছি। শুধু বর্ণনা আর অনুমান। শুধু কীর্তন আর কল্পনা। আগে দেখি, পরে গুণ-বিচার করব। আগে দর্শনধারী পিছে গুণ-বিচারি।

দেবেন ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হল নরেন। বললে, 'আপনি ঈশ্বর দেখেছেন ?' চোখ বুজে ধ্যান করছিলেন মহর্ষি। এক উত্তেজিত উন্মাদ কণ্ঠে তাঁর ধ্যান ভাঙল। চেয়ে দেখলেন, নরেন। যে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করছে, নাম লিখিয়েছে খাতায়, যোগ-ধ্যানের ক্লাসে ভর্তি হয়েছে ক'দিন।

'দেখেছেন আপনি ঈশ্বর ?'

তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলেন মহর্ষি। নরেনের স্থিরনিবদ্ধ বিস্ফারিত দুই চক্ষু যেন ভাগবতী দীপ্তিতে জ্বলছে। হাঁ-না উত্তর দিতে পারলেন না মহর্ষি। শুধু বললেন, 'তোমার চোখ দুটি কী উজ্জ্বল! যেন যোগীচক্ষু।'

তা দিয়ে আমার কী হবে! যে অন্ধকারে আমি তাঁকে খুঁজছি সেখানে কী করবে চর্মচক্ষু ? আলোয় আলোকময় করে কি তিনি দেখা দেবেন যে চোখ মেলেই তাঁকে

দেখব ? দেখব তাঁকে পাতায়-ফুলে ঘাসে-শিশিরে আকাশে-তারায়, প্রতিটি মানুষের মুখে !

কেশব সেনকে প্রকাশিত করেছেন মহর্ষি, উদ্ভাসিত করেছেন। যে ছিল মৃৎ-প্রদীপ তাকে করেছেন ভাস্বতী শিখা। মহাকবি প্রকৃতিকে মানবায়িত করে, মহর্ষি মানুষকে ঈশ্বরায়িত করেছেন। কেশব যাঁর কীর্তি, তিনিও দেখেননি ঈশ্বরকে ? বড় হতাশ হল নরেন। মনের আকাশে যে ঝড় উঠেছে তাতে মুছে যাচ্ছে আকাশের শাশ্বতী স্থিতি। তবে কি তিনি নেই ? তবে কি তিনি দর্শনের অগোচর ?

কেন এসেছিল সে দর্শনের সংস্পর্শে ? ধর্মের অনুসন্ধানে ? সে কি এই মেঘ জালের মধ্য থেকে পথ পাবে না ? সে কি জ্যোতির তনয় নয় ?

'বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি—অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি।' পাবে না কি সে সেই তপ্ত তাড়িত স্পর্শ ? এমন কি কেউ নেই যিনি তাকে বলবেন সরল সত্যের সহজ স্ফূর্তিতে : 'তাঁকে দেখেছি বই কি। তোকে যেমন দেখছি চোখের উপর, তেমনি। স্পষ্ট, স্থূল, সাবয়ব।'

'দেখেছ ?' চমকে উঠবে নরেন, কিন্তু এমন প্রাণময় সারল্যের সংগে তিনি বলবেন যে নরেন তাঁকে বিশ্বাস করবে। সে অগ্নিময় আন্তরিকতার কাছে তার সংশয়ের ফণা সে নত করবে।

'শুধু দেখেছি ? তাঁর সংগে খেয়েছি, কথা কয়েছি, শুয়েছি একসংগে।'

'বলো কি, দেখাতে পারো আমাকে ?' লাফিয়ে উঠবে নরেন।

'আমাকে দেখাতে হবে না। তুই নিজেই দেখতে পারবি।' বলবেন সেই সর্বানুভূ। 'তোর এমন চক্ষু তুই দেখবি নে ?'

কোথায়, কোথায় তিনি ?

। ৭৩ ।

ওরে অন্তরে আয়, ঘুচে যাবে সব অন্তরায়।

রাম দত্তের বাড়িতে রামকৃষ্ণের বসবার জন্যে একখানা বিলিতি গালচে হয়েছে। হয়েছে তাকিয়া। ডান হাতের কাছে কাঁচের গেলাসে জল। এড়ানী পাখা দিয়ে বাতাস করছে কেউ। কোঁচার কাপড় ফেটি করে কোমরে বাঁধা। জামাটি কখনো গায়ে আছে, কখনো বা কতক্ষণ পরেই খুলে ফেলছে। কখনো বা কোঁচাটি খুলে লম্বা চাদরের মত করে কাঁধের উপর ফেলা।

রাম দত্ত আর মনোমোহন প্রথম আরম্ভ করল কীর্তন। খোল-করতাল নেই। মাঝে-মাঝে শুধু রামকৃষ্ণ হাততালি দেয়। সেই হাততালিই যেন সূর্য-চন্দ্রের করতাল।

'মন একবার হরি বল হরি বল,
জলে হরি থলে হরি, অনলে-অনিলে হরি—'

ভাবাবেশে কখনো দাঁড়িয়ে পড়ে রামকৃষ্ণ। নৃত্য করে। সে নরনৃত্য নয়, অমর-নৃত্য। স্পন্দনের সংগে স্থৈর্য। যাকে বলে 'সাম্যস্পন্দন।' কতক্ষণ পরে একেবারে সমাধি। শরীর থেকে শক্তি বেরুচ্ছে, সূর্যের যেমন বিভা। সমস্ত ঘর-দালান ভেসে যাচ্ছে। জানলা দিয়ে বেরিয়ে ঢেউ খেলছে গলিতে।

একবার বিজয় গোস্বামীকে বলেছিল নাগ-মশাই: 'এখানে এসে চোখ বুজে বসেছ কেন? দেখতে এসেছ, চোখ খুলে দেখ প্রাণ ভরে। এখানে জপধ্যানও বন্ধন। শুধু উন্মীলনই মুক্তি।'

'ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে. তাঁকে দর্শন করতে হলে, শুধু ভক্তি হলেই হয়?' জিগ্গেস করল বিজয়।

'হ্যাঁ, পাকা-ভক্তি, প্রেমা-ভক্তি, রাগ-ভক্তি।' বললেন ঠাকুর, 'সোজা কথা, ভালোবাসা। যেমন ছেলের মা'র উপর ভালোবাসা। যতক্ষণ না এই ভালোবাসা জন্মায় ততক্ষণ ফটোগ্রাফের কাঁচে কালি মাখানো হয় না। ফটোগ্রাফের কাঁচে কালি মাখানো থাকলেই যা ছবি পড়ে তা রয়ে যায়। কিন্তু শুধু-কাঁচেব উপর হাজার ছবি পড়ুক, একটাও থাকে না—একটু সরে গেলেই যেমন কাঁচ তেমনি কাঁচ।'

'ভালোবাসা এলে কী হয়?'

'ভালোবাসা এলে স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজনের উপর যে মায়ার টান থাকে না, দয়া থাকে। সংসারকে বিদেশ বোধ হয়, শুধু একটা কর্মভূমি, রংগভূমি ছাড়া কিছু নয়। দেশলায়ের কাঠি যদি ভিজে থাকে, হাজার ঘষো, কোনো রকমেই জ্বলবে না—কেবল একরাশ কাঠিই লোকসান হবে। বিষয়াসক্ত মনই ভিজে দেশলাই—'

তাই শ্রীমতী যখন বললেন, জগৎ-সংসার আমি কৃষ্ণময় দেখছি, তখন সখীরা বললে, তুমি এ কী প্রলাপ বকছ! কই আমরা তো তাকে দেখতে পাচ্ছি না। শ্রীমতী বললেন, সখি, নয়নে অনুরাগ-অঞ্জন মাখো, তাকে দেখতে পাবে। অনুরাগের ঐশ্বর্য কি কি? অনুরাগের ঐশ্বর্য বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধু সেবা, সাধু সংগ, ঈশ্বরের নাম-গুণকীর্তন, সত্য কথা—এই সব।

'এই সব লক্ষণ দেখলে ঠিক বলতে পারা যায়, ঈশ্বরদর্শনের আর দেরি নেই। বাবু কোনো খানসামার বাড়ি যাবেন এরূপ যদি ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে সেই খানসামার বাড়ির অবস্থা দেখেই ঠিক-ঠিক বুঝতে পারা যায়। প্রথমে বন-জংগল কাটা হয়, ঝুলঝাড়া হয়. ঝাঁটপাট দেওয়া হয়। বাবু নিজেই সতরঞ্চি গুড়গুড়ি এই সব পাঁচ রকম জিনিস পাঠিয়ে দেন। এই সব আসতে দেখলেই লোকের বুঝতে বাকি থাকে না, বাবু এই এসে পড়লেন বলে।' কিন্তু হাজার চেষ্টা করো, তাঁর কৃপা না হলে কিছু হবার নয়। তিনি কৃপা না করলে তাঁকে দেখা তোমার সাধ্য কি। সার্জন সাহেব রাত্রে আবার লণ্ঠন হাতে করে বেড়ায়—তার মুখ কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুখ দেখে, আর-সকলেও পরস্পরের মুখ দেখে। যদি কেউ সার্জনকে দেখতে চায়, তাহলে তাকে প্রার্থনা করতে হয়। বলতে হয়, সাহেব, কৃপা করে একবার আলোটি নিজের মুখের উপর ফেরাও, তোমাকে একবার দেখি।'

একটা মাতাল এসেছে রাম দত্তের বাড়িতে। নাম বিহারী ঘোষ।

'রাম-দাদা, বলতে কি, চাটের পয়সা জোটে না, শুধু মদ খেয়ে বেড়াই—'

'আজ সন্ধের সময় আসিস। তোকে লুচি আলুরদমের চাট খাওয়াবো।'

সেই সন্ধের সময় এসেছে বিহারী। দেখলে বৈঠকখানায় ভিড়, কাকে ঘিরে উত্তেজিত স্তব্ধতা। ও সব বুঝি না। আমাকে আমার লুচি আলুরদমের চাট কখন দেবে? বকতে লাগল বিহারী।

কে একজন বললে, 'যা পরমহংসদেবকে প্রণাম কর্ গিয়ে—'

মাতালের কি খেয়াল হল ঘরে ঢুকে প্রণাম করলে। সেই হল তার চরম চাট খাওয়া। এখন শুধু অঝোরে কাঁদে আর বলে, 'ভাই, শুধু তাঁর কথা বলো। আর কিছু ভালো লাগে না। মাতাল ছিলুম, লুচি আলুরদমের চাট খেতে চেয়েছিলুম, কিন্তু তিনি কী করে দিলেন? তাঁকে ছাড়া আর কিছু মনে আসে না। হায়, এমন অমূল্য রতন হাতে পেয়ে তখন কিছু বুঝিনি—লুচি আলুরদমের চাটকেই জীবনের সার ভেবেছিলুম—'

সে সব দিনের নিমন্ত্রণে তরকারিতে নুন দেওয়া হত না। আলুনি তরকারির পাশে আলাদা করে নুন থাকত পাতে। রামকৃষ্ণকে নিয়ে সকলে যখন পঙ্ক্তি ভোজনে বসছে, তখন চলবে নুন-দেওয়া তরকারি। রাম দত্তর বাড়িতেই প্রথম নিয়মভঙ্গ হল। একসঙ্গেই আহার চলল সকল শ্রেণীর। রামকৃষ্ণ এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিলেন জাতাজাতি। বললেন, 'ভক্তির মধ্যে আবার জাত কি? সব একাকার।'

বন্যার জল যখন এসে পড়েছে তখন কে আর আল-পথ খুঁজে বেড়ায়?

মেয়েরাও আসছে দলে-দলে। এ এক অভিনব ব্যাপার। মুক্ত অঙ্গনে জ্যোতির্ময়কে দেখবার পিপাসায় বেরিয়ে আসছে পর্দার ঘেরাটোপ থেকে। আরো আশ্চর্য, কেবা-পুরুষ কেবা স্ত্রী—কারুরই কোনো দেহজ্ঞান নেই। সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকছে মুখের দিকে। রামকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে আর সবাইও যেন বিদেহ হয়ে গিয়েছে। হাঁটু দুটি উঁচু করে আসনখানির উপর বসে আহার করে রামকৃষ্ণ। স্ত্রী-পুরুষ কাতার হয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখে।

'আগে কাপড় ঠিক থাকত না, বেভুল বে-এক্তিয়ার হয়ে থাকতাম। এখন সে ভাবটা প্রায় গেছে—' বলতে-বলতেই কখন দিগ্‌বসন হয়ে গেল রামকৃষ্ণ। বিরক্ত হয়ে বললে, 'আরে ছ্যাঃ, আমার ওটা আর গেল না—'

কিন্তু যারা দাঁড়িয়ে আছে সামনে, সবাইর অতীন্দ্রিয় ভাব। মেয়েরা পর্যন্ত নিঃসঙ্কোচ। একটি ছোট শিশু যদি উলঙ্গ হয়ে যায় তবে মা কি কুণ্ঠিত হন? 'আমি মাঝে-মাঝে কাপড় ফেলে আনন্দময় হয়ে বেড়াতাম।' বললেন ঠাকুর।

শম্ভু এক দিন বলছে, 'ওহে তুমি তাই ন্যাংটো হয়ে বেড়াও—বেশ আরাম! আমি একদিন দেখলাম।'

কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল সুরেশ মিত্তির। বললে, 'অফিস থেকে এসে জামা চাপকান খোলবার সময় বলি—মা, তুমি কত বাঁধাই বেঁধেছ।'

'অষ্ট পাশ আর তিন গুণ দিয়ে বেঁধেছ।'

রামকৃষ্ণ শিশু।

'মাইরি, কোন শালা ভাঁড়ায়—' বালকের মতই শপথ করে মাঝে-মাঝে।

'বিষয়ী লোকদের সঙ্গে কথা বলতে কষ্ট বোধ হত বলে হৃদয়কে দিয়ে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেদের ধরে আনতুম। খাবার খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে খেলা করতুম তাদের সঙ্গে। বেশ খেলছে, যেই একবার বললে, মা যাব, শালার ছেলেকে আর কে ধরে রাখে! তখন আবার হৃদেকে দিয়ে তার মা'র কাছে পাঠিয়ে দিই। মানুষের যদি এমনি টান হয় ভগবানের উপর, তাহলে কেউ আর তাকে রুখতে পারে না।' কটির বসনখানি কখন বগলের নিচে চলে এসেছে। যুবক ভক্তদের লক্ষ্য করে বলছেন ঠাকুর, 'তোরা সব ইয়ং বেঙ্গল আসা অবধি আমি এত সভ্য হয়েছি যে সব সময়ই কাপড় পরে থাকি।'

'এই আপনার কাপড় পরা ?'

'মাইরি আমি সভ্য হয়েছি—'

তখন তাঁর গা ছুঁয়ে দেখানো হল তিনি সত্যিই দিগ্‌বসন।

করুণ স্বরে বললেন ঠাকুর, 'মনে তো করি সভ্য হব। কিন্তু মহামায়া যে অঙ্গে বসন রাখতে দেন না। সে কি আমার অপরাধ ?'

প্রলয়পয়োধিতে বটপত্রের উপর শিশু নারায়ণ শুয়েছেন। তেমনি শুয়েছে রামকৃষ্ণ। দু পায়ের দু বড়ো আঙুল মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে শিশুর মত আনন্দ করছে। বালক-ভাবের চরম।

আবার কখনো শ্রীমতীর ভাব ধরে। অল্প পথ হেঁটেই ক্লান্তিতে ঢলে পড়ে। রাখালের কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে-আস্তে যেতে যেতে গান ধরে রামকৃষ্ণ। 'আর চলিতে নারি, চরণ বেদন যে হল সখি! সে মথুরা কত দূর।'

সে মথুরা কত দূর! কোথায় সে প্রেমের অমরাবতী!

সুবল একটা বাছুর বুকে নিয়ে জটিলার কাছে উপস্থিত। বললে, 'মা একটু জল খাব।' গোষ্ঠ-মিলন গান হচ্ছে। গাইছে নরোত্তম কীর্তনে। জটিলা বললে—গানের সুরে—'সুবল রে, তোর সবই গুণ।'

অমনি রামকৃষ্ণ আখর দিল: 'তবে কালার সঙ্গে বেড়াস, ওই যা দোষ—'

'পাকশালায় যাও, বধূর কাছে জল পান করবে।' বললে জটিলা।

'সুবল তাই তো চায়—' আখর দিল রামকৃষ্ণ।

রান্নাঘরে সুবল গিয়ে দেখে উনুনের ধোঁয়ার ছলে শ্রীমতী কৃষ্ণ-বিরহে কাঁদছে। সুবলকে দেখে চকিতে ব্যাপারটা বুঝতে পারল শ্রীমতী। সমরূপী সুবলের সঙ্গে তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্তন করল। বললে, গানের সুরে—'সুবল, সবই হলো, আমি যে নারী কিরূপে বক্ষ ঢাকি বলো।'

রামকৃষ্ণ আখর দিচ্ছে, 'চিন্তা নাই, উপায় করে এসেছি—বাছুয়াকে বুকে এনেছি—ঐ দেখ দ্বারে বেঁধে রেখেছি—এরে বুকে করে তুমি চলে যাও—'

ওরে, তোরা আর কিছু না নিস, কৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর এই টানটুকু নে—

সুরেশ মিত্তির এসে বললে, 'এক দিন আমার ওখানে চলুন।'

'তোর ওখানে যে যাব, গাইবার লোক আছে ?' জিগ্‌গেস করলে রামকৃষ্ণ।

'কত! গাইয়ের আবার ভাবনা!' কথাটা উড়িয়ে দিল সুরেশ।

এ কে ? পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, নাগ-যজ্ঞ-উপবীতী। সর্বাঙ্গে বিভূতি, নাগালঙ্কার। ধূম্র, পীত, শ্বেত, রক্ত আর অরুণ—পঞ্চ বর্ণের পঞ্চ মুখ। ত্রিনয়ন, জটাজুটধারী। শিরে গঙ্গা, ললাটে চন্দ্রকলা। বামকরে কপাল, পাবক, পাশ, পিনাক আর পরশু। দক্ষিণ করে শূল, বজ্র, অঙ্কুশ, শর আর বরমুদ্রা। লোচন আনন্দসন্দোহে উল্লসিত। কান্তি হিমকুন্দেন্দুসদৃশ। কোটিচন্দ্রসমপ্রভ। বৃষাসনে বিরাজিত। এ কে ? এ তো সেই শিব-শান্ত উমাকান্তকে দেখছি।

সিমলে স্ট্রীটে সুরেশ মিত্তিরের বাড়িতে এসেছে রামকৃষ্ণ।

বেলফুলের গোড়ে মালা এনেছে সুরেশ। নিচের দিকে তোড়ার মত করা ফুলের থোপনা, মাঝে মাঝে রাঙন ফুল আর জরির তবক। রামকৃষ্ণের গলায় মালাটি পরিয়ে দিয়ে পায়ের কাছে প্রণাম করল সুরেশ। কিন্তু সহসা রামকৃষ্ণের এ কী হল ? মালা গলা থেকে খুলে দূরে ফেলে দিল রামকৃষ্ণ।

নিমেষে ম্লান হয়ে গেল সুরেশ। কী না-জানি যে সেবাপরাধ করে বসেছে। কিন্তু জলের গ্লাসে শশীর যখন পা ঠেকে গিয়েছিল তখন তো এত বিমুখ হয়নি রামকৃষ্ণ। সে-জল খেয়েছিল শান্ত মুখে।

সমাধি ভাঙবার পর এক ঢোঁক জল খায় রামকৃষ্ণ। যন্ত্রচালিতের মত হাত বাড়িয়ে দেয়, আর তক্ষুনি জল-ভরা গ্লাসটি এগিয়ে দেয় শশী। শশী মানে শশিভূষণ ভটচাজ, উত্তরকালের রামকৃষ্ণানন্দ। সে দিন রাম দত্তের বাড়িতে কি হল, তাড়াতাড়িতে জলের গ্লাসে পা ঠেকে গেল শশীর। জল বদলাবার আর সময় নেই, রামকৃষ্ণ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

সেই জলের গ্লাসই এগিয়ে ধরল শশী। রামকৃষ্ণ তাই খেল নিশ্চিন্ত হয়ে।

শশীর অপরাধ তো জানিত অপরাধ। সুরেশ তো বুঝতেই পাচ্ছে না কোনখানে তার বিচ্যুতি হয়েছে। শশীর যদি ক্ষমা হয়, তবে তার কেন হবে না ?

এই জলের গ্লাসে পা ঠেকে যাওয়া নিয়ে চিরকাল আক্ষেপ করেছে শশী। কিন্তু ঠাকুর তো জানতেন তার অন্তরের স্বচ্ছতা। তাই তো তাকে ক্ষমা করলেন অনায়াসে। সুরেশের মন কি তেমনি পরিষ্কার নয় ?

জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর কাট-ফাটা রোদ্দুরে শশী এসে হাজির। মুখ-চোখ লাল, এক হাঁটু ধুলো। ঘাম ঝরছে গা বেয়ে। 'এ কি করেছিস তুই ?' ঠাকুর ক্ষিপ্র হাতে তাকে পাখা করতে লাগলেন। 'এই রোদ্দুরে কেউ আসে ?' শশী নিবৃত্ত করতে চায় ঠাকুরকে, ঠাকুর কোনো-কিছুতেই শুনতে রাজী নন। বোস একটু চুপ করে, আগে খানিক ঠাণ্ডা হ। গায়ের ঘাম মরেছে এতক্ষণে। বল এইবার কি বলবি।

বলবার কিছু নেই। এই দেখুন বরানগরের বাজার থেকে আপনার জন্যে কিছু বরফ কিনে এনেছি। চাদরের খুঁট খুলে এক টুকরো বরফ বের করল শশী।

ঠাকুরের আনন্দ তখন দেখে কে। বললেন, 'দেখ, দেখ। এই গরমে মানুষ

গলে যায়, কিন্তু শশীর বরফ গলেনি। কি করে গলবে? শশীর ভক্তিহিমে বরফ জমাট হয়ে রয়েছে।'

ভক্তি-হিমে জল জমে যখন বরফ হয় তখনই ঈশ্বর সাকার। যখন জ্ঞান-সূর্যে গলে যায় বরফ, তখন আবার যে-জল সে-ই জল, তখন আবার তিনি নিরাকার। ভক্তের জন্যে তাঁর রূপ, জ্ঞানীর জন্যে অরূপ। কিন্তু দুয়ের জন্যেই সমান অপরূপ।

তবে কি সুরেশের ভক্তি নেই?

ভক্তমাল থেকে একটি গল্প বলল রামকৃষ্ণ। যে ভক্ত সে কী মনোভাব নিয়ে দান করবে। তার মধ্যে অভিমানের এতটুকু আঁশ থাকবে না। অহংকার ত্যাগ করলেই তবে ঈশ্বর ভার নেন। মালা যে দিলি মালার মধ্যে যে তোর একটু অহংকারের জ্বালা আছে। মালার মধ্যে যে অনেক চেকনাই। অনেক কেরামতি। তারই জন্যে তোর মনের মধ্যে একটু অহংকারের জ্বর। অহংকার হচ্ছে উঁচু ঢিপি। সেখানে কি জল জমে! জল জমে নিচু জমিতে, খাল জমিতে। সেই ঢিপিকে খাল করে দাও। তবেই জমবে ভক্তির জল।

সুরেশ কাঁদতে লাগল।

লাটু ছিল উপস্থিত। সে তাজ্জব বনে গেল। ঠাকুরের রসদদারদের মধ্যে একজন এই সুরেশ মিত্তির, তবু তার দান তিনি গ্রহণ করলেন না! আর, চেয়ে দেখ, তারই জন্যে কাঁদছে সুরেশ মিত্তির। না কাঁদলে হবে কেন? কান্না দিয়ে পথের ধুলো ধুয়ে দিলেই তো তিনি আসবেন। ভক্তি-প্রদীপের তেলটিই তো অশ্রুজল। এই যে বিশ্ব এ হচ্ছে বিস্তীর্ণ ব্যথার পত্রপট। ভক্তকে পাচ্ছেন না বলে ভগবানের কান্না। তাঁর অসীম শক্তির শুকনো রঙগুলি তিনি প্রেমের অশ্রুতে গুলে-গুলে এই বিচিত্র বর্ণবেদনার ছবি এঁকেছেন। মনের মধ্যে যদি সেই কান্না না থাকে তবে এ চিঠির মর্মোদ্ধার করব কি করে? এই চিঠির মধ্যেই তো আনন্দের সংবাদ।

কীর্তনে নিয়ে এসেছে সুরেশ। নিজে গান গেয়ে রামকৃষ্ণ তাকে উচ্চভাবে উদ্দীপ্ত করে তুলল। অর্ধবাহ্যদশায় এসে হঠাৎ সেই ত্যক্ত মালা গলায় পরে উঠে দাঁড়াল। গান ধরল গলা ছেড়ে:

'আর কী সাজাবি আমায়—
জগৎ-চন্দ্র-হার আমি পরেছি গলায়—'

ফের আখর দিতে লাগল: 'আমি জগৎ-চন্দ্র-হার পরেছি। অশ্রুজলে সিক্ত-করা জগৎ-চন্দ্র-হার পরেছি। প্রেমরসের ভাবন দেওয়া জগৎ-চন্দ্র-হার পরেছি—'

চোখের কান্না মুছে ফেলে চেয়ে দ্যাখ আমাকে। আমি দূরে আছি যে বলে, সেই নিজে দূরে রয়েছে। আমাকে দেখতে আবার নতুন কী আয়োজন হবে! দেখব বলে তাকালেই দেখতে পাবি চোখের উপর। 'ত্বমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং।' ইট কাঠ মাটি পাথর সব আমি। আকাশ বাতাস আগুন জল পাখি পতঙ্গ। একটা গাছ দেখছিস সামনে? ঐ বৃক্ষরূপে তো আমি দাঁড়িয়ে। সমস্ত কান্নার পারে আমিই তো আনন্দ-তীর।

কিন্তু সেদিন সুরেশের বাড়িতে গাইয়ের যোগাড় নেই।

রামকৃষ্ণ শুধালো : 'ভজন গাইতে পারে এমন কেউ নেই তোমাদের পাড়ায় ?'

আছে বৈ কি। সুরেশ ব্যস্ত হয়ে খুঁজতে বেরুল। গৌর মুখুজ্জে স্ট্রীটের বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন। নরেন তখন গানের স্রোতে ভাসছে। ভগবান আছে কি নেই জানি না, কিন্তু দেহ-ভরা প্রাণ আছে, কণ্ঠ-ভরা গান আছে। আর, এই প্রাণ আর গান এ যেন আর কার দানোচ্ছ্বাস। তাই নরেন গায়, 'অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি।' কখনো বা :

'মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ,
তোমারি রচিত ছন্দ মহান বিশ্বের গীত।
মর্তের মৃত্তিকা হয়ে ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে
আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত ॥'

'ওরে বিলে, বাড়ি আছিস ?' দরজায় সুরেশ মিত্তির দাঁড়িয়ে। ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে কাছে এল নরেন। 'চল আমার বাড়ি চল। গান গাইবি।'

একবার গানের নাম শুনলেই হল, নরেন উচ্ছ্বলিত। ক'দিন বাদে একজামিন, দুপুর বেলা হয়তো পড়ছে নরেন, বন্ধু এসে বললে, রাত্তিরে পড়িস, এখন দুটো গান গা। তবে বাঁয়াটা নে—বলেই বই-টই ঠেলে ফেলে নরেন তানপুরা নিয়ে বসল। ইস্কুল-কলেজে টেবিল চাপড়ে বাজিয়েছে বলেই কি আর এখন বাঁয়া বাজাতে পারবে—গান শুনতে চেয়ে বন্ধু পড়ল মুশকিলে। মোটেই শক্ত নয়, এমনি করে শুধু ঠেকা দিয়ে যা—বাজনার বোল বলে দিল নরেন। ঠেকার অভাবে ঠেকবে না, নরেন তানে-লয়ে তন্ময় হয়ে গান ধরল উদার গলায়। কখন দুপুর গড়িয়ে গেল আস্তে আস্তে, কিছু খেয়াল নেই—একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছে অনবরত। সন্ধ্যায় আলো দিয়ে গেল চাকর, তবু আসর ভাঙছে না। রাত দশটায় এল খাবার তাড়া, তখনই বুঝি প্রথম হুঁশ হল। দিব্যভূমি থেকে নেমে এল স্থলভূমিতে। গানই হচ্ছে একমাত্র জ্ঞান যে জ্ঞানের ওপারে একজন আছেন। জ্ঞানের ওপারে যিনি আছেন তাঁকে একমাত্র গান দিয়েই স্পর্শ করা। অন্তরের কান্নাটিও একটি গান। আকুলতাটিও একটি সুর।

গানের নাম শুনেই কোমর বাঁধল নরেন। চলল সুরেশ মিত্তিরের বাড়িতে।

রামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রের প্রথম দর্শন হল—সূর্যের সঙ্গে সমুদ্রের।

এ কে ! চমকে উঠল রামকৃষ্ণ। এ যে তার সেই স্বপ্নে-দেখা সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঋষি !

সে এক অপূর্ব দর্শন হয়েছিল রামকৃষ্ণের।

সমাধি অবস্থায় জ্যোতির্ময় পথ ধরে ঊর্ধ্বে নভোমণ্ডলে উঠে যাচ্ছে রামকৃষ্ণ। পার হল পৃথিবী, পার হল জ্যোতিষ্কলোক। ক্রমে-ক্রমে চলে এল সূক্ষ্মতর ভাবলোকে। যতই উপরে উঠছে, পথের দুপাশে দেখতে লাগল দেব-দেবীরা বসে আছেন। সেখানেও ঊর্ধ্বগতি ক্ষান্ত হল না। উঠে এল ভাবরাজ্যের চরম চূড়ায়। সেখানে দেখল একটি জ্যোতির রেখা দিয়ে দুটি বিশাল রাজ্যকে আলাদা করা হয়েছে। খণ্ড আর অখণ্ডের রাজ্য, দ্বৈত আর অদ্বৈতের দেশ। রামকৃষ্ণ অখণ্ডের রাজ্যে এসে ঢুকল। সেখানে আর দেব-দেবী নেই—দিব্য দেহের অধিকারী হয়েও

এখানে আসবার অধিকার নেই তাদের। অনেক নিচে ভাবলোকে তাদের বাসা। সেই অখণ্ডলোকে সাতটি ঋষি বসে আছে ধ্যানলীন হয়ে। প্রাজ্ঞ, প্রবীণ ঋষি। আশ্চর্য হল রামকৃষ্ণ। যেখানে দেব-দেবী আসতে পারে না সেখানে এই ঋষিরা এল কি করে? বুঝল জ্ঞানে প্রেমে পুণ্যে পবিত্রতায় এরা দেবদেবীকেও হার মানিয়েছে। এদের মহত্ত্বচিন্তায় অভিভূত হল রামকৃষ্ণ। সহসা দেখতে পেল সেই অখণ্ডলোকের পরিব্যাপ্ত জ্যোতিপুঞ্জের কিয়দংশ ঘনীভূত হয়ে একটি দেব-শিশুর আকার নিলে। একটি অমলকান্তি দেবশিশু। দেবশিশুটি তার মৃদুল-কোমল বাহু দুটি দিয়ে একজন ঋষির গলা জড়িয়ে ধরল, তার ধ্যান ভাঙাবার জন্যে ডাকতে লাগল কলভাষে। ধ্যান ভাঙল ঋষির, আনন্দময় অনিমেষ চোখে দেখতে লাগল শিশুকে। এ যেন তার কত কালের প্রিয়ধন, তার হৃদয়রতন। কি যেন বলবে বলে এসেছে! প্রসন্ন-প্রভাত চোখ দুটি তুলে শিশু বললে ঋষিকে, 'আমি চললুম তুমি এস।' কোথায় চললে? পৃথিবীতে। তুমিও এস আমার পিছু-পিছু। স্নেহস্নাত চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে ঋষি আবার ধ্যানস্থ হল। রামকৃষ্ণ দেখল, ঋষির সেই দেহ থেকে একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে জ্যোতির্বর্তিকারূপে নেমে গেল পৃথিবীতে।

নরেন্দ্রকে দেখেই চমকে উঠল রামকৃষ্ণ। এ যে সেই ঋষি!

তবে ঐ শিশুটি কে? শিশুটি স্বয়ং রামকৃষ্ণ।

বিবেকানন্দ ঋষি, রামকৃষ্ণ শিশু। তার মানে কি? বিবেকানন্দ পরিপূর্ণ জ্ঞান, রামকৃষ্ণ পরিপূর্ণ প্রেম। বিবেকানন্দ সংহত তেজ রামকৃষ্ণ বিগলিত সারল্য।

বিবেকানন্দ তাই হিমালয়, রামকৃষ্ণ মানস-সরোবর।

* ৭৫ *

একটি ভজন গাইল নরেন। উন্মনা হয়ে গেল রামকৃষ্ণ। কাদের বাড়ির ছেলে? কোথায় থাকে? কোথা থেকে এসেছে? কি করে পথ চিনল এ গলির?

আরো একখানা গান হল।

এগিয়ে এল রামকৃষ্ণ। কাছে এসে নরেনের অঙ্গলক্ষণ দেখতে লাগল। বলল, কথার সুরে মিনতি মাখিয়ে বলল, 'একবারটি দক্ষিণেশ্বরে এসো আমার কাছে। কেমন, আসবে?'

উন্মনা হয়েই ফিরল দক্ষিণেশ্বরে। তার নিঃসংগতার অন্ধকারে। কে যেন নেই। কে যেন আসবে বলে আসেনি। দেখা দিয়েই চক্ষের পলকে পালিয়ে গেছে। প্রতিক্ষণ উচাটন। প্রতিক্ষণ তার পায়ের শব্দ শুনছে উৎকর্ণ হয়ে। সে যে আসে আসে আসে। পৃথিবীর সমস্ত সুরে-ছন্দে তার আগমনী বাজছে। কিন্তু সে আসছে কই? দেখা দিচ্ছে কই চোখের সামনে! কোথায় সেই চারু-হারী-রুচীর-মনোহর? রুচ্য রম্য কান্ত কাম্য? তাকে না দেখে কেমন করে থাকব? অন্ধকারে তার গন্ধ টের

পাচ্ছি, কিন্তু সে কি অন্ধকারে আমার কান্না শুনতে পাচ্ছে না ? বিশ্ববীণায় সে এত সুর বুনছে, সেখানে কি বাজছে না এই গীতহারা নীরবতা ?

'ওরে, তুই কে জানি না। কী হবে জেনে ? তবু তুই একবার আয়। তোকে না দেখে যে থাকতে পারছি না। তোকে ছাড়া সব অন্ধকার। একেবারে একা।'

নির্জনে গিয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদে রামকৃষ্ণ। যেমন ভিজে গামছা নিংড়োয় তেমনি করে বুকের ভিতরটা কে জোর করে নিষ্পীড়ন করছে। চোখে ঘুম নেই, মুখে রুচি নেই, সব সময়ে কেবল ইতি-উতি তাকায়, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে, কিন্তু সে আসে না।

সে শুধু আসে আসে আসে।

শেষকালে মা'র কাছে কেঁদে পড়ে রামকৃষ্ণ। মা, একবারটি তাকে এনে দে। ওকে না পেলে কেমন করে থাকব ! কার সংগে কইব আমার প্রাণের কথা ? আমি রাজ্য চাই না, স্বর্গ চাই না, মোক্ষ চাই না, তুই শুধু ওকে এখানে নিয়ে আয়। আমি ওর কনককাঞ্চনছবি আর একবার দেখি।

রাত্রে শুয়ে আছে রামকৃষ্ণ, কে যেন তাকে তার গা ঠেলে তুলে দিল। বললে, 'আমি এসেছি।' রামকৃষ্ণ চেয়ে দেখল, নরেন।

ধড়মড় করে উঠে বসল। এসেছিস ? এত রাত্রে, মধ্যরাত্রে ? তাতে কি ? তাই তো আমি আসি, যখন চরাচর সান্দ্র-স্তব্ধ, সুষুপ্তিগত। কিন্তু কই, কই তুই ?

কেউ নেই। এই তুই সাকার, আবার তুই নিরাকার। এই তুই সমুপস্থিত গান, আবার তুই পলায়মান সুর ! আর কত তোর পথ চেয়ে বসে থাকব ? আমার ঘর নেই আমি পথই সার করেছি। তুই এসে আমাকে পথের খবর দিয়ে যা। কোন পথে মিলবে সেই পথপতিকে ?

বয়ে গেছে নরেনের আসতে ! তার এফ-এ পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, বাবা তার জন্যে এখন পাত্রী খুঁজছেন। তার খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, সে চলেছে দক্ষিণেশ্বর ! ধাপ-ধাড়া গোবিন্দপুর এর চেয়ে অনেক ভালো জায়গা। কিন্তু বাবা শুধু পাত্রীই দেখছেন না, দেখছেন তার টাকার ওজনটা। মেয়েটি শামলা, তাই তার দশ হাজার টাকা জরিমানা। তা ছাড়া ছেলে দেখুন। ছেলে আমার সোনা-বাঁধানো হাতির দাঁত। কিন্তু নরেন ঘাড়ে এক ঝাঁকরানি দিয়ে সব নস্যাৎ করে দিলে। মেয়ে কালো বলে নয়, নয় বা বাবা পণ নিচ্ছেন বলে। সে বিয়ে করবে না কেননা সে ঈশ্বরসন্ধানে হবে দুর্গমের যাত্রী, দুরারোহ ও দুরবগাহের। সে-পথ ক্ষুরধারের মত নিশিত-দুস্তর।

বিশ্বনাথের সংসারেই প্রতিপালিত রাম দত্ত, তাকে তাই ধরলেন বিশ্বনাথ। বললেন, 'বিলের ঘাড়ে একটু ঘি ডলো, কি এক গোঁ ধরেছে, বলছে বিয়ে করবে না—'

রাম দত্ত লাগল ঘটকালিতে। কিন্তু নরেন তো ঘট নয় যে কালি মাখাবে, নরেন আকাশ, তাতে লাগে না কিছু কামনার কালিমা।

'যদি সত্যি ধর্ম লাভ করতেই চাও তবে মিছে ব্রাহ্মসমাজে না ঘুরে দক্ষিণেশ্বরে যাও। মূর্তিমান ধর্মকে দেখে এসো।'

যেতে হয় তো যাব, তুমি বলবার কে! এমনিই ভাব নরেনের। তুমি বলবে বললেই যাব? তুমি কি আমার অভিভাবক? তুমি কি আমার বিবেক? আমার খুশি আমি যাব না।

নতুন গাড়ি হয়েছে সুরেশের। দুশো টাকা মাইনে হয়েছে রাম দত্তের। হাসি পায়, সব নাকি ঠাকুরের কৃপায়। এতই যখন কৃপা, নরেন ভাবল মনে মনে, জগৎ-সংসারের সমস্ত দুঃখ-দারিদ্র্য এক দিনে দূর করে দিক না। তবে বুঝি কেমন ঠাকুর!

নতুন গাড়ি কিনে রামকৃষ্ণকে একদিন চড়াল সুরেশ। সুরেশের বাড়ি এলে রামকৃষ্ণকে ঘিরে আজকাল ছেলে-ছোকরারা ভিড় করে। 'ছোট ছেলেগুলোকে আপনি বকাচ্ছেন—' সুরেশেরই বাড়িতে থাকে এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সে একদিন হঠাৎ রামকৃষ্ণকে আক্রমণ করলে।

'তুমি কী করো?' শান্ত বয়ানে প্রশ্ন করল রামকৃষ্ণ।

'আমি আপনার মতো ছেলে বকাই না, আমি জগতের হিত করি।'

'যিনি এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন পালন করেছেন তিনি কিছু বোঝেন না আর তুমি সামান্য মানুষ, তুমি জগতের হিত করছ? ঈশ্বরের চেয়ে তুমি বেশি বুদ্ধিমান?' চুপ করে গেল সরকারী চাকুরে।

সেই সরকারী চাকুরের পিছনে লেগে গেল পাড়ার ছেলেরা। কি হে, জগতের হিত করছ নাকি? কতটা হিত আজ করলে জগতের?

কৃষ্ণদাস পালকে জিগ্গেস করলে রামকৃষ্ণ, 'মানুষের কি কর্তব্য?'

কৃষ্ণদাস বললে, 'জগতের উপকার করব।'

'হ্যাঁ গা, তুমি কে?' বললে রামকৃষ্ণ, 'আর, কী উপকার করবে? আর, জগৎ কতটুকু গা, যে তুমি উপকার করবে?'

ঈশ্বরকে ভালোবাসাই জীবনের উদ্দেশ্য। ঈশ্বরে ভাব-ভক্তি মানেই ঈশ্বরে ভালোবাসা। নিষ্কাম কর্ম করতে করতেই ঈশ্বরে ভক্তি-ভালোবাসা আসে। আর এই ভক্তি-ভালোবাসা থেকেই ঈশ্বরলাভ। এই ঈশ্বরলাভই মানুষের কর্তব্য। জগতের উপকার মানুষে করে না, তিনিই করছেন। যিনি চন্দ্র-সূর্য করেছেন, যিনি মা-বাপের বুকে স্নেহ দিয়েছেন, মহতের চিত্তে দয়া দিয়েছেন, ভক্তের প্রাণে ভক্তি দিয়েছেন—তিনিই। বাপ-মা'র মধ্যে যে স্নেহ দেখ সে তাঁরই স্নেহ। দয়ালুর মধ্যে যে দয়া দেখ সে তাঁরই দয়া। তুমি কাজ করো আর না করো, তিনি কোনো না কোনো সূত্রে তাঁর কাজ করবেনই করবেন। তাঁর কাজ আটকে থাকবে না।

জগতের দুঃখ দূর করবে তোমার স্পর্ধা কি? জগৎ কি এতটুকু? বর্ষাকালে গঙ্গায় কাঁকড়া হয় দেখেছ? তেমনি অসংখ্য জগৎ আছে—অফুরন্ত। যিনি জগতের পতি তিনিই সকলের খবর নিচ্ছেন। তোমার মিথ্যে মাথা ঘামাতে হবে না। তোমার কাজ হচ্ছে তাঁকে আগে জানা। তাঁর জন্যে ব্যাকুল হওয়া। শরণাগত হওয়া। ঈশ্বরদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য!

এমন নরদেহ ধারণ করেছ একবার ঈশ্বরদর্শন করবে না? এত কিছু দেখলে, এত কিছু ধরলে, দেখবে-না ধরবে-না শুধু ঈশ্বরকে? জীবনে এত রোমাঞ্চ খুঁজছ, নেবে না একবার ঈশ্বর-শিহরণ?

গঙ্গার দিকে পশ্চিমের দরজায় কার ছায়া পড়ল। কে? চঞ্চল হয়ে উঠল রামকৃষ্ণ। এ কার ছায়া? কার আভাতি? আর কার! চোখের সামনে নরেন। সপ্ত ঋষির একজন।

সুরেশ মিত্তিরের গাড়িতে করে এসেছে। সঙ্গে সুরেশ, আরো ক'জন সমবয়সী ছোকরা। কিন্তু সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র এই নরেন্দ্রনাথ। সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন-বিমুক্ত। শরীরের দিকে লক্ষ্য নেই, বেশবাসে উদাসীন, গায়ে ময়লা একখানা চাদর, বাইরের কোনো কিছুতে কৌতূহল নেই, সমস্ত কিছুর সঙ্গে অবন্ধন, সমস্ত কিছুই যেন তার শিথিল। শুধু ধ্যানের আবেশে চোখের তারা উপর দিকে উঠে আছে। ঘুমুলেও হয়তো সম্পূর্ণ বোজে না তার চোখ। চোখ সুমুখ ঠেলা। দেখলেই মনে হয় ভিতরে কিছু আছে।

বিষয়ীর আবাস কলকাতায় এত বড় সত্ত্বগুণী আধার হল কোত্থেকে? সত্ত্ব-গুণই তো সিঁড়ির শেষ ধাপ। তার পরেই ছাদ।

এসেছিস? আয়—

মনের ব্যাকুলতা চেপে রাখল রামকৃষ্ণ। মেঝেতে মাদুর পাতা, বসতে বলল নরেনকে। যেখানে জলের জালা, তার কাছেই বসল নরেন। তার সহচর বন্ধুরাও বসল আশে-পাশে। কিন্তু তারা সব ডোবা-পুষ্করিণী। ডোবা-পুষ্করিণীর মধ্যে নরেন বড় দীঘি—যেন ঠিক হালদার পুকুর!

চুম্বকের টানে লোহা আসে, না লোহার টানে চুম্বক ছোটে—কে করবে এ রহস্যের সমাধান? প্রিয়তন্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রামকৃষ্ণ। বলে, 'একটা গান ধর।'

গান তো নয়, মানস-যাত্রী হংস। নরেনের সমস্ত শরীর যেন সুরে-বাঁধা। সমস্ত প্রাণ-মন ঢেলে ধ্যানারূঢ় হয়ে সে গান ধরলে :

> 'মন চল নিজ নিকেতনে।
> সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
> ভ্রম কেন অকারণে ॥'

'আহা, কি গান' ভাবে উঠে গিয়েছিল রামকৃষ্ণ, নেমে এসে বললে, 'আরেকখানা গা।' 'যাবে কি হে দিন বিফলে চলিয়ে'—সুধা-ঢালা কণ্ঠে গান ধরল নরেন : 'আছি নাথ, দিবানিশি আশা পথ নিরখিয়ে ॥'

পাখির ওড়াই যেমন বিশ্রাম, নরেনের গানই যেন ধ্যান। ও স্বতঃসিদ্ধ। নিত্যসিদ্ধ। নিত্যসিদ্ধ হচ্ছে মৌমাছি। শুধু ফুলের উপর বসে মধু পান করে। তার মানে হরিরস পান করে, বিষয়-রসের দিকে যায় না। মা, তোর কী কৃপা! তুই এত দিন পরে নিয়ে এসেছিস আমার মন-ঠাণ্ডা-করা আপন জন।

কালীঘরের খাজাঞ্চি ভোলানাথ মুখুজ্জেকে জিগগেস করেছিল রামকৃষ্ণ : 'নরেন্দ্র বলে একটি কায়েতের ছেলে, তার জন্যে আমার মন এমন হচ্ছে কেন? সে আমার কে!'

ভোলানাথ বললে, 'এর মানে ভারতে আছে। সমাধিস্থ লোকের মন যখন নিচে আসে, তখন সত্ত্বগুণী লোকের সঙ্গে বিলাস করে। সত্ত্বগুণী লোক দেখলে তবে তার মন ঠাণ্ডা হয়।'

আমি বিলাস করব। আমি শুঁটকে সাধু হব না।

গান শেষ হওয়া মাত্র নরেনের হাত ধরল রামকৃষ্ণ। হাত ধরে টেনে আনল উত্তরের বারান্দায়। বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলে ঘরের দরজা। শীতকাল। উত্তুরে হাওয়া আটকাবার জন্যে থামের ফাঁকগুলো ঝাঁপ দিয়ে ঘেরা। নিশ্চিন্ত, নিরিবিলি জায়গা। ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবার পর কারু সাধ্য নেই এখানে উঁকি মারে।

নিরিবিলিতে কিছু উপদেশ দেবে বোধ হয় রামকৃষ্ণ, নরেন তাই কৌতূহলী হয়ে রইল। কিন্তু এ কী, রামকৃষ্ণের মুখে কোনো কথা নেই। রামকৃষ্ণ কাঁদছে। আকুল হয়ে কাঁদছে। যেন কত দিনের গভীর পরিচয়, বলছে তেমনি স্নেহস্বরে, 'এত দিন কোথায় ছিলি ?'

নিঃশব্দ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল নরেন।

'তোর কি মায়া-দয়া নেই ? এত দিন পরে আসতে হয়! কত ক্ষণ থেকে দিন, দিন থেকে মাস, মাস থেকে বছর আমি তোর জন্যে বসে আছি—তোর তা খেয়াল নেই। তোর মনে পড়ল না আমাকে ?' নরেনের হাত ধরে বিলাপের মত করে বলছে, কিন্তু আসলে এ আনন্দ-প্রলাপ। এ দুঃখ প্রীতিকণ্টকিত দুঃখ। এ অশ্রু স্নেহার্দ্রগাঢ় সুধাধারা।

এ বাণী নবনীসমানা অমিয় বাণী।

'বিষয়ী লোকের কথা শুনে শুনে আমার কান পুড়ে গেল। প্রাণের কথা আর কাউকে বলা হল না। বলতে না পেয়ে এই দ্যাখ আমার পেট ফুলে রয়েছে। এইবার তুই এসেছিস, এবার বাহির দুয়ারে কপাট লেগে ভিতর দুয়ার খুলে যাবে। হরিকথারীতিতে কেটে যাবে দিন-রাত। তুই এসেছিস, তার মানে ভক্তের হৃদয়ে ভগবান বিশ্রাম করতে এসেছে। ভক্তের হৃদয়েই তো ভগবানের বিশ্রাম।'

নরেন চিত্রলিখিতের মত দাঁড়িয়ে রইল। নিস্পন্দ, নিঃসাড়।

'মাকে সে দিন অনেক করে বললাম। কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী শুদ্ধ ভক্ত না পেলে কেমন করে থাকব পৃথিবীতে ? কার সঙ্গে কথা কইব ? কাঁদতে-কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর কী হল জানিস না বুঝি ?'

নরেন তাকিয়ে রইল উৎসুক হয়ে।

'মাঝ রাতে তুই এলি আমার ঘরে। আমায় তুললি গা ঠেলে। বললি, আমি এসেছি।'

'কই আমি তো কিছু জানি না।' নরেনের মুখে হাসির একটি রেখা ফুটল। বললে, 'আমি তো আমার কলকাতার বাড়িতে তখন তোফা ঘুম মারছি।'

'তুমি জানো না বৈ কি। তুমি যদি না জানো, তবে আর কে জানে!' রামকৃষ্ণ সহসা হাত জোড় করল। দেববন্দনার ভঙ্গিতে বলতে লাগল, 'কিন্তু আমি জানি প্রভু, তুমি সেই পুরাণ পুরুষ, তুমি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, তুমি নররূপী নারায়ণ। তুমি আমার জন্য রূপধারণ করে এসেছ। শুধু আমার জন্য নয়, সমস্ত জীবের জন্য

এসেছ। এসেছ সমস্ত ভুবনের দৈন্যদুঃখদূরিত দূর করতে—প্রণতজনের ক্লেশহরণ করতে—'

কে এ উন্মাদ! নইলে আমি সামান্য বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে, আমাকে এ সব কথা বলছে! কে এ বচনরচনপটু! এ সব কি আমি প্রহেলিকা শুনছি? আমি আছি তো আমার মধ্যে? নরেন স্থান-কাল একবার যাচাই করে নিল। সব ঠিক আছে। শুধু পাত্রই অপ্রকৃতিস্থ। লোকে যে বলে দক্ষিণেশ্বরে এক পাগলা বামুন আছে, ঠিকই বলে।

পাগল নয় তো কি! পাগল না হলে কি মানুষের মধ্যে ঈশ্বর দেখে! যাকে দেখা যায় না শোনা যায় না তার জন্যে অশ্রুবর্ষণ করে কেউ? এমন কাণ্ডজ্ঞান-শূন্যের মত কথা বলে?

কিন্তু পাগল বলে এক কথায় উড়িয়ে দেবার মত সায় পায় না মনের মধ্যে। পাগল কি এমন হিরণ্ময় হয়? হয় কি এমন পুলকোদ্ভিন্নসর্বাঙ্গ? বচনে কি এত মধু থাকে? কথা কি হয় শ্রবণমঙ্গল? এমন লোকার্তিহর হাসি কি তার মুখে থাকে? কণ্ঠে ও চাহনিতে, স্পর্শে ও কাতরতায় থাকে কি এমন মেদুরমেঘের মমতা, অমৃতবর্ষণ স্নেহ?

কে জানে! কী হবে বিচার-বিতর্ক করে? এ যেন এক তর্কাতীত, তত্ত্বাতীত অনুভূতি। শুধু দেখা যাক। শুধু শোনা যাক। নিরুদ্ধ নিশ্বাসে থাকি শুধু নিশ্চল হয়ে।

'তুই একটু বোস। তোর জন্যে খাবার নিয়ে আসি।' দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকল রামকৃষ্ণ।

চকিতে ফিরে এল খাবারের থালা নিয়ে। প্রায় পাগলের ব্যাকুলতায়। যদি এই ফাঁকে পালিয়ে যায় ননীচোর! যদি অন্ধকারে অন্তর্ধান করে। না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে নরেন। বর্তমান-ভবিষ্যৎ কিছুই নির্ণয় করতে পারছে না। শুধু ভাবছে, আমি কি সার্ধ-ত্রিহস্ত পরিমিত মাংসপিণ্ডময় সামান্য একটা দেহ? না কি আমি বিরাট, আমি মহান, আমি অনন্তবলশালী পরমাত্মা?

থালায় কতগুলি সন্দেশ, মাখন আর মিছরি। হাতে করে নরেনের মুখের কাছে খাবার তুলে ধরলে রামকৃষ্ণ। বললে, 'খা, হাঁ কর।'

'সে কি, আমার বন্ধুরা যে রয়েছে সঙ্গে।' মুখ সরিয়ে নিতে চাইলে নরেন। 'দিন, আমার হাতে দিন, ওদের সঙ্গে ভাগ করে খাই।'

কে শোনে কার কথা।

'হবে'খন, ওরা খাবে'খন পরে—আগে তুমি খাও।' জোর করে মুখে পুরে দিতে লাগল রামকৃষ্ণ।

কৌশল্যা হয়ে রামকে খাইয়েছি, যশোদা হয়ে ননীগোপালকে। খা, এই নে আমার হৃদয়বেদ্য নৈবেদ্য। তুই জানিস না তুই কে? তুই সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণ।

জোর করে সবগুলি খাবার খাইয়ে দিলে।

'বল, আবার আসবি। দেরি করবি না একেবারে! ঠিক তো?' রামকৃষ্ণ মিনতি জানাল। বললে, স্বর নামিয়ে বললে, 'কিন্তু দেখিস, একা-একা আসবি।'

পাগল ? কিন্তু এমন দরদী-মরমী হয় কি করে ? কথা কি করে হয় এমন অমিয়জড়িত ?

'আসব।'

'আর শোন, একটু বেশি-বেশি আসবি। প্রথম আলাপের পর বরং একটু ঘন-ঘনই আসে। কেমন, আসবি তো ?'

'চেষ্টা করব।'

ঘরের মধ্যে ফের চলে এল দুজনে। একদৃষ্টে নরেন দেখতে লাগল রামকৃষ্ণকে। পাগল কি এমন সদালাপ করে, পাগলের কি ভাবসমাধি হয় ? পাগল কি ঈশ্বরের জন্যে পাগল হয় ?

'লোকে স্ত্রী-পুত্রের জন্যে ঘটি-ঘটি চোখের জল ফেলে,' বলতে লাগল রামকৃষ্ণ, 'কিন্তু ঈশ্বরের জন্যে কাঁদে কে ? কাশী যাওয়া কী দরকার যদি ব্যাকুলতা না থাকে। ব্যাকুলতা থাকলে এইখানেই কাশী। এত তীর্থ, এত জপ, হয় না কেন ? যেন আঠারো মাসে বৎসর। হয় না তার কারণ, ব্যাকুলতা নেই। যাত্রার গোড়ায় অনেক খচমচ-খচমচ করে, তখন শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায় না। তারপর নারদ ঋষি যখন ব্যাকুল হয়ে বৃন্দাবনে এসে বীণা বাজাতে-বাজাতে ডাকে আর বলে, প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন ! তখন কৃষ্ণ আর থাকতে পারেন না। রাখালদের সঙ্গে সামনে আসেন আর বলেন, ধবলী রহ ! ধবলী রও !'

'দেখা যায় ঈশ্বরকে ?' কে একজন জিগগেস করলে।

'তিনি আছেন, আর তাঁকে দেখা যাবে না ? যেকালে তিনি আছেন সেকালে দ্রষ্টব্য হয়েই আছেন।'

'আছেন ?'

'জগৎ দেখলেই বোঝা যায় তিনি আছেন। কিন্তু তাঁর বিষয়ে শোনা এক, তাঁকে দেখা আর-এক। কিন্তু দেখার উপরেও বড় কথা আছে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করা। কেউ দুধের কথা শুনেছে, কেউ দেখেছে, কেউ খেয়েছে। দেখলেই আনন্দ, খেলেই বল-পুষ্টি।'

সমস্ত যেন প্রত্যক্ষ করেছে এমনি প্রজ্বলন্ত অনুভূতি। পাগল বলতে চাও বলো কিন্তু তার ঊর্জস্বান ত্যাগ দেখ। ঈশ্বরের জন্যে সর্বস্বত্যাগ। দেখ তার আয়সী-কঠিন পবিত্রতা। তার অমল-ধবল আনন্দ। তার অতল-গভীর শান্তি। এ যদি পাগল হয় তবে পাগলের আরেক নাম সচ্চিদানন্দ। নরেনের মনে হল পরম তীর্থে বসে আছি। যার দ্বারা মানুষ দুঃখ থেকে পার হয় তার নাম তীর্থ। জল ত্রাণ করে না উলটে ডুবিয়ে মারে। নৌকোই তীর্থ, সেই উত্তীর্ণ করে দেয় নদ-নদী। রামকৃষ্ণ সেই ভবসাগরতারণি। সকল তীর্থের সার। এবার উঠতে হয় নরেনের। প্রণাম করল। প্রেমস্মিতস্নিগ্ধহাস্যে তাকিয়ে রইল রামকৃষ্ণ।

কোথায় আর যাবি, কত দূর ? তোকে এই তীর্থপ্রদ পাদসরোজপীঠে আসতেই হবে বারে-বারে। তোকে নির্বিতর্ক হতে হবে, নিঃসংশয় হতে হবে। অবগাহন করতে হবে এই করুণাঘন অগাধ সমুদ্রে। বেরুতে হবে জগজ্জয়ের মশাল নিয়ে। আজ যা।

'আর কোন মিঞার কাছে যাইব না' গাজীপুর থেকে লিখছে বিবেকানন্দ : 'এখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে ইন্টেন্স সিম্‌প্যাথি বদ্ধজীবনের জন্য—এ জগতে আর নাই...তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কখনো আমার প্রার্থনা গরমঞ্জুর করেন নাই—আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—এত ভালোবাসা আমার পিতা-মাতায় কখনো বাসে নাই। ইহা কবিত্ব নহে, অতিরঞ্জিত নহে, ইহা কঠোর সত্য এবং তাঁহার শিষ্যমাত্রেই জানে। বিপদে, প্রলোভনে, ভগবান রক্ষা করো, বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি—কেহই উত্তর দেয় নাই—কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার বা যাই হউন, নিজে অন্তর্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহৃত করিয়াছেন। যদি আত্মা অবিনাশী হয়—যদি এখনো তিনি থাকেন, আমি বারংবার প্রার্থনা করি, হে অপারদয়ানিধে, হে মমৈকশরণদাতা রামকৃষ্ণ ভগবান, কৃপা করিয়া আমার এই নরশ্রেষ্ঠ বন্ধুবরের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো। আপনার সকল মঙ্গল, এ জগতে কেবল যাঁহাকে অহেতুক দয়াসিন্ধু দেখিয়াছি, তিনিই করুন।'

আজ যা। আবার আসিস। দেখিস দেরি করিস নে যেন।

'মনের কথা কইবো কি সই কইতে মানা
দরদি নইলে প্রাণ বাঁচে না
মনের মানুষ হয় যে জনা
নয়নে তারে যায় গো চেনা
সে দু-এক জনা।
সে যে রঙ্গে ভাসে প্রেমে ডোবে
করছে রসের বেচাকেনা ॥
মনের মানুষ মিলবে কোথা
বগলে তার ছেঁড়া কাঁথা,
ও সে কয় না কথা।
মনের মানুষ উজান পথে করে আনাগোনা ॥'

কেশব সেনকে বললে রামকৃষ্ণ : 'জগদম্বা তোমাকে একটা শক্তি, মানে, বক্তৃতা-শক্তি, দিয়েছেন বলে তুমি জগৎমান্য হয়েছ, কিন্তু মা দেখাচ্ছেন নরেন্দ্রর ভিতরে আঠারোটি শক্তি আছে। নরেন্দ্র খানদানি চাষা, বারো বছর অনাবৃষ্টি হলেও চাষ ছাড়ে না।'

নরেন্দ্র খাপখোলা তরোয়াল। মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙাচক্ষু বড় রুই—আর সব পোনা, কাঠিবাটা। অন্যেরা কলসী-ঘটি, নরেন্দ্র জালা।

'ওর মদ্দের ভাব—পুরুষভাব ; আর আমার মেদি ভাব—প্রকৃতিভাব।'

ওরে, আয়, দেখা দে। সেই যে আসবি বলে গেলি, আর এলি না। আমি যে তোর জন্যে পথ চেয়ে বসে আছি। তুই এলে আমি বিহ্বল হই, বিবশ হয়ে পড়ি ; জানি, সব জানি, তবু তুই আয়।

বাড়ি ফিরে এল নরেন। ফিরে এল তার নিভৃত ঘরের অন্ধকারে।

চক্ষু মেলে কী দেখে এল সে দক্ষিণেশ্বরে! বৈরস্য ও নৈরাশ্যের মরুভূমিতে এ কোন সজলতা ও সরসতার অভিষেক! দৈন্য ও মালিন্যের মাঝে এ কে প্রসাদ-পবিত্র আনন্দ! ধূলি ও গ্লানির রাজ্যে নির্মলশ্যামল নির্মুক্তি! নিত্য অভাবের দেশে অমৃতপুঞ্জিত পরিপূর্ণতা! স্বপ্ন দেখে এল না কি নরেন? না কি রঙ্গমঞ্চের অভিনয়?

যাই বলো, পাগল ছাড়া কিছু নয়। পাগল না হলে বলে কি না ঈশ্বরকে দেখা যায় স্বচক্ষে? কি করে দেখবে? যে নির্বিকার নিরাধার গুণাতীত লোকাতীত, যে অবাঙমনসোগোচর, সে কখনো ধরা দেয় চোখের সমুখে? তুমি দাঁড়াও, আমি দেখি—বললেই সে কি আকারিত হয়? যে অকায়, তার আবার আকার কি! যে অসংগ তার আবার সীমা কোথায়! যে অরূপ সে তো দিগদেশ-কালশূন্য।

নরেন পড়েছে, যা আত্মা তাই ঈশ্বর। আত্মা অজ, তার জন্ম নেই। অমর, তার মৃত্যুও নেই। নিরবয়ব বলেই অজ। নির্বিকার বলেই অবিনাশী। এ হেন যে আত্মা সে আবার মূর্তি ধরবে কি? মূর্তি ধরলে কোন মূর্তি ধরবে? যে ব্যাপী তার পরিচ্ছেদ কোথায়, পৃথকত্ব কোথায়?

কিন্তু এমনভাবে বললেন, উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেই স্থির-স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দুই চক্ষের আলোয় কোথাও যেন এতটুকু ছায়া থাকে না সন্দেহের। দেখা যায় ঈশ্বরকে—এ যেন চোখের সামনে এই দেয়াল দেখার মত। ভোরে উঠে সূর্য দেখার মত। রাত্রে উঠে অন্ধকার দেখার মত। কথার মধ্যে এতটুকু গায়ের জোর নেই, এ যেন সরল জল-ভাত। এ যেন বিশ্বাসের পাষাণে আন্তরিকতার শিলালিপি। সত্যের কষ্টিপাথরে সারল্যের স্বর্ণাক্ষর।

কিন্তু কি হলে, কি করলে দেখা দেবেন ঈশ্বর? খুব করে বিনতি-মিনতি করব—স্তুতি-চাটুক্তি করব? তা হলেই কি ঈশ্বর কান পাতবেন? মিথ্যে কথা। আমাকে যদি কেউ খোশামোদ করে, আমি তো বেজায় চটে যাই। যা আমার কাছে বিরক্তিকর, তাই ঈশ্বরের কাছে সুখকর হবে? আর, নিজেকে যে অত্যন্ত ছোট বলে ভাবব সেটাও তো মিথ্যে ভাবা হবে। আমিই তো দীনের দীন হীনের হীন নই—আমার চেয়েও তুচ্ছ আমার চেয়েও অধম লোক আছে অনেক সংসারে। তাই মিথ্যে কথায় বাজে কথায় ঈশ্বর মুগ্ধ হবেন এ ক্ষুদ্রতা যেন আমার না হয়! তা ছাড়া আমার চেয়ে অনেক যিনি বেশি বোঝেন, তিনি আমারই আদেশ-অনুরোধের অপেক্ষা করছেন, এ বুদ্ধি স্পর্ধার নামান্তর। তিনি কি করবেন, না-করবেন তা আমার বলা-না-বলায় ঠিক হবে না। তাই যতই কেননা 'দেখা দাও' 'দেখা দাও' বলে দেয়ালে মাথা ঠুকি, মাথাই ভাঙবে, দেয়াল নড়বে না একচুল। ঈশ্বর কি একটা বস্তু? একটা দ্যুতি? একটা দ্যোতনা? তাঁকে কি করে দেখা যাবে?

তাঁকে দেখা যায় না। তিনি কি শিলা, না দারু, না ভূমি? তিনি কি কাঠ-খড়, না তাম্র-পিত্তল? আর, তাঁকে দেখেই বা আমার কী লাভ! তাঁকে দেখলেই কি আমার তাপ-ত্রয় ঘুচে যাবে? তাই যদি হত, তবে এত যাঁর করুণা আর ঐশ্বর্য, তিনি দর্শন দিয়ে সমস্ত জীব-জগৎকে একযোগে মুক্ত করে দিতেন। লোকের শোক-ক্রন্দন দৈন্য-অনুনয়ের জন্যে বসে থাকতেন না।

কে বলে তিনি প্রত্যক্ষীভূত নন? 'বল দেখি রে তরুলতা, আমার জগজ্জীবন আছেন কোথা?'—এ কান্নার প্রয়োজন কি! তিনি তো হাতের কাছেই আছেন, এই আমার চোখের কাছে। তাঁকে আবার দেখব কি, পাব কি! তাঁকে তো প্রতিক্ষণেই দেখছি, প্রতিক্ষণেই তো ডুবে রয়েছি, মিশে রয়েছি তাঁতে। যিনি সর্বত্রস্থ, তাঁর আবার দূর-নিকট কি—যিনি সর্বব্যাপী, তিনি তো অন্তরে বাহিরে সমান বর্তমান। তিনি তো আমার মধ্যেও আছেন। চমকে উঠল নরেন। মনে পড়ল দক্ষিণেশ্বরের সেই স্তববাণী: 'তুমিই সেই পুরাণ পুরুষ, তুমিই সেই নররূপী নারায়ণ—'

আমিই সেই?

'চিদানন্দরূপঃ শিরোঽহং শিবোঽহং?' আমিই কি সেই ওঙ্কারগম্য সঙ্গহীন শিব? মনোবাগতীত প্রকাশস্বরূপ? নিরাকার, অত্যুজ্জল, মৃত্যুহীন? কে বলে?

উন্মাদ! যে বলে সে উন্মাদ ছাড়া আর কিছু নয়! কিন্তু যদি সে উন্মাদ তবে সে এত ভালোবাসে কেন! চেনে-না-শোনে-না, নিজেকে লুকিয়ে-রাখে-সরিয়ে-রাখে, অথচ আলো-বাতাসের মত আপ্রাণ ভালোবাসে, সে কি উন্মাদ? দূর ছাই, ভাবব না তার কথা। কিন্তু না ভেবে থাকো তোমার সাধ্য কি। থেকে-থেকেই সে লোক কেবল উঁকিঝুঁকি মারে। বলে, যদি তুমি আছ তা হলে আমিও আছি। যদি আমি আছি তা হলে তুমিও আছ! এই 'তুমি'টির কি কোনো মানস মূর্তি নেই? নেই কোনো মানুষ মূর্তি? থেকে-থেকেই ঠাকুরের মোহন মূর্তি দেখা দেয় চোখের সামনে। দয়াঘন আনন্দকন্দ জগদ্বন্ধু।

দূর ছাই, যাই আরেকবার দক্ষিণেশ্বর। তাঁকে আরেকবার দেখে আসি। এ কি শুধু অলস কৌতূহল, না আর কোনো অনিবার্য আকর্ষণ? যদি আকর্ষণই হয় তবে এর পেছনে যুক্তি কি? চুম্বক লোহাকে টানে, সূর্যে-চন্দ্রের জোয়ার-ভাটা খেলে? এর মধ্যে সংগত ব্যাখ্যা কোথায়? আর যারই উদ্দেশ্য-উপলক্ষ থাক, ভালোবাসা অহেতুক। তিনি যে ভালোবাসেন। তাঁর ভালোবাসায় যে হিসেব নেই, জিজ্ঞাসা নেই। সূর্যের আলোতেই যেমন সূর্যকে দেখি তেমনি তাঁর করুণাতেই তাঁকে দেখব।

মাস খানেক পরে আবার এক দিন হাজির হল দক্ষিণেশ্বরে। পথ যেন আর শেষ হতে চায় না। কে জানত এত দূরের রাস্তা আর এত কষ্টকর! সেদিন সুরেশ মিত্তিরের গাড়িতে করে এসেছিল বলে বুঝতে পারেনি। যাই, ফিরে যাই। বৃথা এই সন্ধান-ক্লান্তি। পথশ্রমের হয়তো শেষ আছে কিন্তু পণ্ডশ্রমের শেষ কই। কিন্তু, যাই বলো, নেই আর ফিরে যাওয়া। চুম্বকের টানের কাছে লোহা নিরুপায়, সূর্য-চন্দ্রের কাছে নদী ইচ্ছাশূন্য। এ গতি নিরঙ্কুশ। এ গতি কৃষ্ণাকর্ষী।

দক্ষিণেশ্বর কোন দিকে যাব বলতে পারেন ? আরো উত্তরে যাবে। সেখানেই আছেন সেই লোকোত্তর। উত্তর দেবেন সুদক্ষিণ বলে।

সেদিনের মতই ছোট তক্তপোশটিতে বসে আছে রামকৃষ্ণ। যেন কার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে। ঘরে লোক-জন নেই। যেন কথা কইবার লোক নেই সংসারে। উদাস, নিরালম্বের মত চেয়ে আছে শূন্য চোখে। যেন উৎকর্ণ হয়ে শুনছে কার পদধ্বনি।

তুই এসেছিস ? নরেনকে দেখে আহ্লাদে ফেটে পড়ল রামকৃষ্ণ। আয়, আয়, বোস আমার পাশটিতে। মুখখানি শুকিয়ে গেছে দেখছি। কিছু খাবি ?

একটু দূরে কুণ্ঠিত হয়ে বসল নরেন। রামকৃষ্ণ সরে আসতে লাগল। তোর কুণ্ঠা, কিন্তু আমার অজস্রতা। তুই দূরে বসিস আর আমি সরে-সরে আসি। চুম্বকই শুধু লোহাকে টানে না, লোহাও ডাকে চুম্বককে।

পাগল না-জানি অদ্ভুত কি করে বসে তারই ভয়ে সঙ্কুচিত হল নরেন। ঠিক তাই, রামকৃষ্ণ তার ডান পা নরেনের গায়ের উপর তুলে দিলে। মুহূর্তে কী যে হয়ে গেল বোঝা গেল না। মনে হল দেয়াল-দালান সব যেন মহাবেগে উড়ে চলেছে, বিরাট আকাশের ব্যাপ্তির মধ্যে মিশে যাচ্ছে এই ক্ষুদ্র আমিত্বের অস্তিত্ব। আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়ল নরেন। আমিত্বের নাশই তো মৃত্যু। সেই মৃত্যুই বুঝি এখন উপস্থিত।

চেঁচিয়ে উঠল নরেন : 'ওগো তুমি আমার এ কী করলে ? আমার যে মা-বাপ আছেন।'

খল-খল করে হেসে উঠল রামকৃষ্ণ। তাই আছে না কি ? যখন তোর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল, জিজ্ঞাসাও করিনি, তোর বাপের নাম কি ? তোর বাপের কখানা বাড়ি ? আয়-আদায় কত ? আমার মদ খাওয়া নিয়ে কথা। যেখানে আমার এক বোতলেই কাজ হয়ে যায়, সেখানে শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে সে হিসেবে আমার দরকার কী !

নরেনের আর্তস্বর কি রকম যেন লাগল বুকের মধ্যে। তার বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল রামকৃষ্ণ। স্নেহস্নাত করুণকোমল হাত।

'তবে থাক, এখন থাক, একেবারে কাজ নেই। কাল হবে। আস্তে-আস্তে হবে।'

অমনি নিমেষে আবার সব স্বাভাবিক হয়ে গেল। সেই ঘর সেই দেয়াল—সেই সব এখানে-ওখানে। তবে এটা কী হয়ে গেল চকিতের মধ্যে ? ভোজবাজি ? এই কি মন্ত্র-তন্ত্র-ইন্দ্রজাল ? না কি এই জীবনেই জন্মান্তর ঘটে গেল নরেনের ? কিছু না, কিছু না। হিপ্‌নটিজম জানে লোকটা, তারই প্রভাবে সহসা সম্মোহিত করে ফেলেছে।

তাই বা মেনে নিতে মন সায় দিচ্ছে কই ? আমি এমন একজন দৃঢ়কায় লোক, এত আমার মনের জোর, আমিই এত সহজে অভিভূত হয়ে পড়ব ? যাকে পাগল বলে ঠাউরেছি, হব তারই হাতের পুতুল ? কে জানে কি শক্তি ধরে লোকটা, দরকার নেই তার কাছে এসে, ভেলকি লাগিয়ে কি অঘটন ঘটায় তার ঠিক কি !

অমনি পরমুহূর্তেই মন আবার রুখে দাঁড়াল। পালিয়ে যাবার কোনো মানে হয় না। লোকটা যদি পাগলই হয় তবে প্রমাণ করতে হবে সেই পাগলামি। কঠিন-কঠোর পাথরকে যে এক নিমেষে এক তাল কাদা বানাতে পারে এক কথায় তাকে পাগল বললেই তার ব্যাখ্যা হয় না। শিশুর অধিক সারল্য, মা'র অধিক ভালোবাসা আর ফুলের অধিক শুচিতা—এদের সমাহারে পাগলামির জন্ম হয় এ কখনো শুনিনি। না, বিচার-বিশ্লেষণ করে একটা শান্ত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুতেই হবে। দাঁড়াতে হবে এ প্রশ্নের মুখোমুখি, করতে হবে এ রহস্যের উন্মোচন। প্রহেলিকা বলে পালিয়ে যাব না। কুহেলিকা বলে আচ্ছন্ন হতে দেব না নিজেকে। আয়ত্তা-তীতকে আনতে হবে ইয়ত্তার মধ্যে। সংশয় থেকে আসতে হবে সংকল্পে। হয় এসপার নয় ওসপার। হয় প্রত্যাখ্যান নয় সমর্পণ।

তাই ঠাকুর যখন এক দিন বললেন, 'নরেন্দ্র, তুই কি বলিস! সংসারী লোকেরা কত কি বলে! কিন্তু দ্যাখ, হাতি যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চিৎকার করে, কিন্তু হাতি ফিরেও চায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে, তখন তুই কী মনে করবি?'

নরেন্দ্র বললে, 'আমি মনে করব কুকুর ঘেউ-ঘেউ করছে।'

না, পালিয়ে যাব না। যে যাই বলুক, একটা হয়-নয় করে যাব। এই পরম-অদ্ভুতের স্বরূপ বুঝব ঠিক-ঠিক। হটে যাব না, ছেড়ে দেব না, শানের উপর আছড়ে-আছড়ে টাকা বাজিয়ে নেব। দেখব এতে কতটা খাদ, কতটা ভেজাল, কতটা মেকি। সব আবার সহজ হয়ে গেল। দুজনে যেন সৌভাগ্যের দিনের আত্মীয়, নিঃসংগ-বাসের বন্ধু। কত অন্তরংগ কথা, কত রংগ-রস, কত হাস্য-পরিহাস। তার পর আবার কাছে বসে খাওয়ানো। গায়ে হাত বুলিয়ে দেওয়া। ছেড়ে দিতে মন-কেমন করা। আসন্ন সন্ধ্যা তো নয়, ঘনায়মান বিষণ্ণতা। ও আবার চলে যাবে। ওর আবার বাড়ি আছে, বাপ-মা আছে—

রামকৃষ্ণের চোখ ছলছল করে এল।

আর-সব কিছুরই হয়তো সমাধান মেলে, মেলে না শুধু ভালোবাসার। সূর্যের আলোর হয়তো ব্যাখ্যা হয় কিন্তু চন্দ্রের কেন এত ভুবনপ্লাবন জ্যোৎস্না?

এবার তবে উঠি?

'কিন্তু আবার শিগগির আসবি বল—যেমন নতুন পতি ঘন-ঘন আসে তেমনই আসবি বেশি বেশি। ওরে, তোকে যখন দেখি, তখন আমি সব ভুলে যাই।'

আসব।

প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিল রামকৃষ্ণ।

হাজরা বললে, 'তুমি ছোকরাদের কথা এত ভাবো কেন? যদি নরেন-রাখাল নিয়েই ব্যস্ত থাকো তবে ঈশ্বরকে ভাববে কখন?'

বলরাম বোসের বাড়ি যাচ্ছে রামকৃষ্ণ, মহা ভাবনা ধরলো। সত্যি, কথা তো ভুল বলেনি। ওর পাটোয়ারি বুদ্ধি, ওর চুল-চেরা হিসেব। সত্যিই তো, যখন থেকে রাখাল-নরেন এসেছে তখন থেকে ওদের কথাই তো বুক জুড়ে রয়েছে। মায়ের কথা ভুলে আছি।

মাকে তাই বললে রামকৃষ্ণ, মা, এ কেমনতরো হয় ? তোমাকে ছেড়ে এখন যে কেবল ছোকরাদেরই চিন্তা করছি। হাজরা মুখের উপর কথা শুনিয়ে দিলে।

মা বুঝিয়ে দিলেন। বুঝিয়ে দিলেন তিনিই মানুষ হয়েছেন। শুদ্ধ আধারে তাঁরই বিশদ বিকাশ। ঘোল ছেড়ে মাখন পেয়ে তখন বোধ হয় ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল।

সমাধি-দর্শনের পর হাজরার উপর রাগ হল। শালা আমার মন খারাপ করে দিয়েছিল। তার পর আবার ভাবলে, হাজরার দোষ কি। সে জানবে কেমন করে ? তাঁকে দেখার পর সবতাতেই তাঁকে দেখা যায়। মানুষে তাঁর বেশি প্রকাশ। তার মধ্যে যারা আবার শুদ্ধসত্ত্ব তাদের মধ্যে তিনি আরো উচ্চারিত। সমাধিস্থ ব্যক্তি যখন নেমে আসে তখন কিসে সে মন দাঁড় করাবে ? তাই তো সত্ত্বগুণী ভক্তের দরকার। ভারতের এই নজির পেয়ে তবে বাঁচল রামকৃষ্ণ।

ভাবসমুদ্র উথলালেই ডাঙায় এক বাঁশ জল। নদী দিয়ে সমুদ্রে আসতে হলে এঁকে-বেঁকে আসতে হয়। বন্যা এলে আর ঘুরে যেতে হয় না। তখন নদীতে-সমুদ্রে একাকার। তখন ডাঙার উপর দিয়েই সোজা চলে যাবে নৌকো।

ভগবানের লীলা যে আধারে বেশি প্রকাশ সেখানেই তাঁর বিশেষ শক্তি। জমিদার সব জায়গায় থাকেন, কিন্তু অমুক বৈঠকখানায়ই তাঁর বিশেষ গতিবিধি। তেমনি ভক্তই ভগবানের বৈঠকখানা। ভক্তের হৃদয়েই তাঁর বিশেষ ভক্তির উদ্ভাসন। যেখানে কার্য বেশি সেখানেই বিশেষ শক্তির রূপচ্ছটা।

'বুঝলে হে', কেশব সেনকে বলছে রামকৃষ্ণ : 'যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্ম, পুরুষ। যখন কর্মময়ী তখন শক্তি, প্রকৃতি। যিনিই পুরুষ তিনিই প্রকৃতি। আনন্দময় আর আনন্দময়ী।'

একটু থেমে আবার বললে, 'যার পুরুষ-জ্ঞান আছে তার মেয়ে-জ্ঞানও আছে। যার বাপ-জ্ঞান আছে তার মা-জ্ঞানও আছে।'

কেশব একটু হাসল।

'যার সুখ-জ্ঞান আছে তার দুঃখ-জ্ঞানও আছে। যদি রাত বুঝি তবে দিনও বুঝেছি। যদি বলি আলো তবে আবার বলব অন্ধকার। তুমি এটা বুঝেছ ?

'হ্যাঁ, বুঝেছি।'

'মা মানে কি ? মা মানে জগতের মা। যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, পালন করছেন তিনি। যিনি সর্বদা রক্ষা করছেন তাঁর ছেলেদের। আর যে যা চায়, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, সব দিচ্ছেন দু হাতে। ঠিক যে ছেলে সে মা ছাড়া থাকতে পারে না। তার মা-ই সব জানে। ছেলে খায়-দায় বেড়ায়—অত-শত জানে না। কি, বুঝেছ ?

কেশব ঘাড় নাড়ল। আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝেছি।

ব্রাহ্ম ভক্তদের সঙ্গে স্টিমারে করে বেড়াতে গিয়েছে রামকৃষ্ণ।

ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে যখন বান ডাকে তখন তার অনাশ্রয় আত্মাকে তা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সমুদ্র হচ্ছে নিরাকার ঈশ্বর আর তার লহরী হচ্ছে সাকার।

ভাবমগ্ন হয়ে বসে আছে রামকৃষ্ণ, একজন একটি দূরবীন নিয়ে তার কাছে এল। বললে, 'এর ভিতর দিয়ে একবার দেখুন।'

এর ভিতর দিয়ে তাকালে কী এমন আর দেখা যাবে, যিনি অণু হতে অণীয়ান তাঁকে বিশালতম করে দেখছি। যিনি দবিষ্ঠ তাঁকে দেখছি অন্তিকতম করে! ব্রহ্মকে দেখতে দূরবীন লাগে না। তাঁর তো দূরের বীণা নয়, তাঁর হচ্ছে অন্তরের বীণা।

সেদিন আবার এক স্টিমার এসেছে দক্ষিণেশ্বরে! স্টিমারে রেভারেণ্ড কুক আর মিস পিগট। ব্রাহ্মভক্তরা নিয়ে এসেছে তাদের। ধর্ম বিষয়ে বড় একজন বক্তা এই কুক সাহেব—রামকৃষ্ণকে দেখতে বড় সাধ। রামকৃষ্ণকে দেখতে মানে মূর্তিমান ভারতবর্ষকে দেখতে। ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মকে দেখতে।

খবর পেয়ে রামকৃষ্ণ নিজেই এল নদীর ঘাটে।

সকলের পীড়াপীড়িতে উঠে গেল স্টিমারে। উঠে গেল গভীর ভাবাবেশের মধ্যে। পশ্চিমের জ্ঞান বিমুগ্ধ হয়ে দেখল এই ভারতীয় ভক্তি। ভক্তির পায়ের কাছে জ্ঞান মাথা নোয়ালো। উপলব্ধির কাছে স্তব্ধ হল বক্তৃতা।

তোমাদের কেবল লেকচার দেওয়া আর বুঝিয়ে দেওয়া। তোমাকে কে বোঝায় তার ঠিক নেই। তুমি বোঝাবার কে হে? যাঁর জগৎ তিনি বোঝাবেন। তিনি এত উপায় করেছেন, আর এ উপায় করবেন না? বেশ করছি, আমি মাটির প্রতিমা পূজা করছি। এতে যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে, তা তিনি কি জানেন না যে তাতে তাঁকেই ডাকা হচ্ছে?

নিশ্চয়ই হচ্ছে। যে মাকে লক্ষ্য করে গান বা প্রার্থনা করছে রামকৃষ্ণ সে মা যেন চোখের সামনে জলজীয়ন্ত দাঁড়িয়ে। কথা বা গানের ভাষাও প্রাণতপ্ত। কে বলে সে শুধু মৃৎমূর্তি, কে বা বলে সে শুধু শূন্যরূপা? সে মা সর্বসাম্রাজ্যদায়িনী মহামায়া। অতিবিস্তীর্ণকান্তি কাননকুন্তলা পৃথিবী।

আপনি শুতে জায়গা পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। নিজে জানি না, পরকে বোঝাই। এ কি অঙ্ক না ইতিহাস না সাহিত্য যে পরকে বোঝাব? এ যে ঈশ্বরতত্ত্ব। নুনের পুতুল হয়ে যেই গেছে সমুদ্র মাপতে সেই গলে গেছে। যে গলে যায় সে আবার ফিরে এসে বলবে কি!

আবার জাহাজ এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। ঘরে বসে বিজয় গোস্বামী আর হরলালের সঙ্গে কথা কইছেন রামকৃষ্ণ। জাহাজে কেশব এসেছে—ব্রাহ্মভক্তরা এসে বললে। চলুন একটু বেড়িয়ে আসবেন আমাদের সঙ্গে।

এক কথায় রাজী! কেশব যখন আছে তখন আবার কথা কি! বিজয়কে নিয়ে নৌকোয় উঠল রামকৃষ্ণ। নৌকোয় উঠেই সমাধিস্থ। নৌকো থেকে জাহাজে তোলাই মুশকিল। কেশব ব্যস্তসমস্ত হয়ে সব তদারক করছে। অনেক কষ্টে বাহ্যজ্ঞান আনতে পারলেও ঠিক-ঠিক পা ফেলতে পারছে না রামকৃষ্ণ। ভক্তের গায়ের উপর ভর দিয়ে আসছে। ক্যাবিনে আনা হল। বসানো হল চেয়ারে। কেশব লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলে। সংগে-সংগে অন্যান্য ভক্তরা। যে যেখানে পেল বসে পড়ল মেঝেতে। বিস্তর ভিড় চারদিকে, যারা ঢুকতে পায় নি তারা শুধু এখানে-ওখানে উঁকিঝুঁকি মারছে। স্পর্শন না পাই শুধু একটু দর্শন হোক। যদি দর্শনও না জোটে, পাই যেন তার একটু অমৃতবর্ষণ।

ঘরের জানলাটা খুলে দিল কেশব। বিজয়কে দেখেই সে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। যে একদিন অত্যাগসহন বন্ধু ছিল সেই আজ বিরুদ্ধ-বৈরী। অথচ ছায়াসন্ধানে দুজনেই এক তরুমূলে সমাগত। একই নদীর ঘাটে এসে অঞ্জলিতে করে একই পিপাসার বারি তুলে নিয়েছে।

সমাধি ভেঙেছে রামকৃষ্ণের। তবু এখনো ঘোর রয়েছে ষোলো আনা। মাকে বলছে, 'মা, আমাকে এখানে তুই আনলি কেন? বেড়ার ভিতর থেকে কি পারব এদের রক্ষা করতে?' এদের যে সব কাম-কাঞ্চনে হাত-পা বাঁধা। বেড়ার মধ্যে সব বেড়ি পরে বসে আছে। ওদের কি পারব আমি মুক্ত করতে?

গাজীপুরের নীলমাধববাবু আছেন। গাজীপুরের সেই সাধু পওহারী বাবার কথা উঠল! পওহারী মানে পও-আহারী, অর্থাৎ কিনা বায়ুভুক সন্ন্যাসী।

মাটিতে বিরাট এক গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে ধ্যান করে পওহারী। উপরে ছোট একটি আশ্রম, সেখানে প্রেমাস্পদ-প্রভু রামচন্দ্রের পূজা আর নিজের হাতে বিরাট ভোগ রান্না করে দরিদ্রের মধ্যে পরিবেশন। এই তার সাধন-ভজন। নিজের খাবার বেলায় এক মুঠো তেতো নিম পাতা নয়তো গোটা কয় কাঁচা লঙ্কা। তার পর গর্তের মধ্যে এক-এক সময় এত দীর্ঘকাল সমাধিস্থ হয়ে থাকে, লোক ভেবে পায় না সাধু খায় কি? সাপের মত নিশ্চয়ই শুধু বাতাস খেয়ে থাকে। সেই থেকে তার নাম হয়েছে পওহারী।

এরই আশ্রমে একদিন চোর এসেছিল। পোঁটলা বেঁধে জিনিসপত্র নিয়ে গিয়েছিল চুরি করে। পওহারী বাবা দেখতে পেয়ে তার পিছু নিল। ভয় পেয়ে পোঁটলা ফেলে চম্পট দিল চোর। তবু পওহারী বাবা তার পিছু ছাড়ে না। জিনিস পেয়ে গিয়েছে তবু ছাড়ান-ছোড়ান নেই। চোর কি করে পারবে সাধুর সংগে, জোরে ছুটে চোরকে ধরে ফেললে পওহারী। কোথায় চোর কাকুতি-মিনতি করবে, পওহারী বাবাই স্তুতি-মিনতি করতে লাগল। চোরের পদপ্রান্তে পোঁটলা নামিয়ে রেখে করজোড়ে ক্ষমা চাইলে। বললে, অনেক ব্যাঘাত ঘটিয়েছি প্রভু, তাই নিশ্চিন্ত মনে পোঁটলাটি তোমার নেওয়া হল না। আমাকে ক্ষমা করো। নাও এই সামান্য উপচার। এ পোঁটলা আমার নয়, এ তোমার।

'সেই পওহারী বাবা', বললে একজন ব্রাহ্মভক্ত, 'নিজের ঘরে আপনার ছবি টাঙিয়ে রেখেছে।'

নিজের দিকে আঙুল দেখালে রামকৃষ্ণ। বললে, 'এই খোলটার!'

বালিশ আর তার খোল—তার মানে দেহী আর দেহ। বাইরেটা দেহ, অন্তরে দেহী, তার মানে অন্তর্যামী। দেহের ছবি নিয়ে কি হবে? ছাপ নাও সেই অন্তরজ্ঞের।

তিনি এক, তাঁর নাম আলাদা, রূপ আলাদা। একই ব্রাহ্মণ, যখন পূজা করে তখন তার নাম পূজারি; যখন রান্না করে তখন রাঁধুনে। একই লোক, যখন মা'র কাছে তখন ছেলে, যখন স্ত্রীর কাছে তখন স্বামী, যখন ছেলের কাছে তখন বাপ। একই জল, কেউ বলে জল, কেউ বলে পানি, কেউ বলে ওয়াটার। একই ভাব, নানান নামের টুকরোয় ফেটে পড়ে। একই শুভ্রতা, রূপ নিয়েছে সাতরঙা রামধনু।

'কালীর কথা বলুন।' জিগ্‌গেস করল কেশব। 'কালী কালো কেন?'

'দূরে আছে বলে কালো দেখায়। জানতে পারলে আর কালো নয়। তখন আলো। আকাশ দূর থেকেই নীল, যদি কাছে যাও দেখবে রঙ নেই—সাদা। সমুদ্রের জলও তাই—দূর থেকেই নীল, কাছে থেকে সাদা।'

'তিনি যদি লীলাময়ী ইচ্ছাময়ী, তবে তিনি তো ইচ্ছা করলেই আমাদের সকলকে মুক্ত করে দিতে পারেন—তাই দেন না কেন?'

'তাও তাঁরই ইচ্ছে। তাঁর ইচ্ছে তিনি এই সংসারের ছকে জীব-জন্তুর ঘুঁটি চেলে-চেলে খেলা করেন। বুড়িকে আগে থাকতেই ছুঁয়ে ফেললে ছুটোছুটি হয় না। ছুটোছুটি না হলে খেলে সুখ কই? খেলা চললেই বুড়ির আহ্লাদ।' তবে কি আমরা বুড়ির আহ্লাদের জন্যে কেবল ছুটোছুটি করব? করলেই বা। মন্দ কি। খেলা চলছে এই তো বেশ। যে ছেলে ছুটোছুটি করে খেলছে আর যে ছেলে বসে আছে মা'র কোলে চেপে, এদের মধ্যে কোন্ ছেলেকে মা'র বেশি পছন্দ?

'সব ত্যাগ না করলে কি পাওয়া যাবে না ঈশ্বরকে? জিগ্‌গেস করলে এক ব্রাহ্মভক্ত।

'তা যাবে না। কিন্তু ত্যাগ তো মনে। মন নিয়েই কথা। সংসার করছ করো কিন্তু মন রাখো ঈশ্বরের হাতের মুঠোয়।'

'সেই তো কঠিন।'

'মোটেই কঠিন নয়। এক পাশে পরিবার, এক পাশে সন্তান নিয়ে শোওনি? দুজনকে আদর করোনি দুভাবে? দুই জন দুই ভাব, কিন্তু মন এক। মন নিয়েই সব। যদি সাপে কামড়ায়, আর যদি জোর করে বলো, বিষ নেই, বিষ ছেড়ে যায়। যদি বলো আমি মান-হুঁষ মানুষ, যদি বলো আমি ঈশ্বরের সন্তান, কে তোমাকে বাঁধে, দেখবে তুমি নির্বন্ধন, তুমি নির্মুক্ত। তুমি মহাবীর।'

রামকৃষ্ণ তাকাল কেশবের দিকে। বললে, 'তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেও কেবল পাপ আর পাপী। খৃস্টানদেরও তাই। যে রাত-দিন কেবল পাপী-পাপী করে সে পাপীই হয়ে যায়। যে কেবল বলে আমি বন্ধ আর বন্ধ, সে বদ্ধই হয়ে থাকে। বলো আমি রাজরাজেশ্বরের ছেলে আকাশজোড়া আমার মুক্তি, আকাশজোড়া আমার নির্মলতা, আমাকে ছোঁয় কে, আমাকে কে আটকায়!'

ভাঁটা পড়ে এসেছে। এবার ফেরা যাক। অমৃত কথা শুনতে শুনতে কত দূর চলে এসেছে জল ঠেলে কারু খেয়াল নেই। কোঁচড়ে করে মুড়ি নারকেল খাচ্ছে সবাই। হঠাৎ বিজয়ের দিকে নজর পড়ল রামকৃষ্ণের। কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। তার পাশে আরেক চেয়ারে কেশব বসে। সেও তেমনি জড়সড়। মিটে গেছে ঝগড়া তবু যেন মিশ খাচ্ছে না।

রামকৃষ্ণ তাকাল একবার বিজয়ের দিকে, তারপর কেশবের দিকে। বললে, 'তোমাদের ঝগড়াবিবাদ যেন সেই শিব-রামের যুদ্ধ। জানো তো, রামের গুরু শিব। দুজনে যুদ্ধও হলো, আবার সন্ধিও হলো। কিন্তু শিবের চেলা ভূতপ্রেত আর রামের চেলা বানর—ওদের ঝগড়া-কিচমিচি আর মেটে না।'

সবাই হেসে উঠল।

'মায়ে-ঝিয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে, এও প্রায় তেমনি। মা'র মঙ্গল আর মেয়ের মঙ্গল এ দুটো যেন আলাদা। এর মঙ্গলেই যে ওর মঙ্গল এ খেয়াল কারুর হয় না। তোমাদের ওর একটি সমাজ আছে এখন আবার এর একটি দরকার।'

আবার হাসির রোল।

'তবে এ সব চাই। যদি বলো ভগবান নিজে লীলা করছেন, সেখানে জটিলে-কুটিলের কী দরকার। জটিলে-কুটিলে না থাকলে যে লীলা পোষ্টাই হয় না।'

বুড়ি-ছোঁয়ার খেলাটিও তাই জটিল-কুটিল। যদি গোলকধাঁধার পথ না হত তবে জমত না খেলা, রগড় হত না। বলতেই বলে, দুশো মজা, পাঁচশো রগড়।

জাহাজ এসে থামল কয়লাঘাটে। গাড়ি আনা হল। কেশবের ভাইপো নন্দলালের সঙ্গে গাড়িতে উঠল রামকৃষ্ণ।

উঠেই মুখ বাড়িয়ে ব্যাকুল স্বরে ডেকে উঠল, কই, কই তিনি কই? কাকে রামকৃষ্ণ খুঁজছে বুঝতে কারু দেরি হল না। তাঁকে ডেকে আনল। হাসি-হাসি মুখে কেশব এসে দাঁড়াল সামনে! ভূমিষ্ঠ হয়ে রামকৃষ্ণের পায়ের ধুলো নিল।

ইংরেজটোলার মধ্য দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। ঝকমক করছে রাস্তা, ঝকঝক করছে বাড়ি-ঘর। গ্যাসের আলো জ্বলছে অন্দরে বাইরে। আকাশে আবার পূর্ণিমার প্লাবন। পিয়ানো বাজিয়ে গান করছে মেমসাহেবরা। সর্বত্র যেন আনন্দভাতি। সব দেখে-শুনে রামকৃষ্ণও হাসতে হাসতে চলেছে। হঠাৎ এক সময় বলে উঠল, আমি জল খাব। তেষ্টা পেয়েছে আমার!

এখন কী হবে! রাস্তার মাঝখানে এখন কী করা যায়! নন্দলাল নামল গাড়ি থেকে। সামনেই ইণ্ডিয়া ক্লাব। সেখান থেকে কাচের গ্লাসে করে জল নিয়ে এল। সানন্দে সেই জল খেল রামকৃষ্ণ।

নবাগত শিশু যেমন কলকাতা দেখে তেমনি ভাবে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগল গাড়ি-ঘোড়া, দোকান-দানি, দেখতে লাগল শহরের ইট-পাথরের উপর জ্যোৎস্নার অকার্পণ্য।

নন্দলাল নেমে গেল কলুটোলায়। গাড়ি এসে থামল সুরেশ মিত্তিরের বাড়ির সামনে।

সুরেশ বাড়ি নেই। এখন গাড়িভাড়া কে দেবে?

'ভাড়াটা মেয়েদের কাছ থেকে চেয়ে নে না—'

দোতলার ঘরে ঠাকুরকে এনে বসাল সকলে। ফরমাস দিয়ে নতুন একখানা ছবি আঁকিয়েছে সুরেশ—ঠাকুর কেশবকে সকল ধর্ম সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয় দেখাচ্ছেন। সেই ছবি দেয়ালে টাঙানো। মেঝেতে ফরাস পাতা, তার উপর তাকিয়া। রামকৃষ্ণ বসল সেখানে, বসেই বললে, ওরে তোরা নরেনকে কেউ ডেকে আন।

চাষারা হাটে গরু কিনতে যায়। গরু বাছবার চিহ্ন কি? ল্যাজের নিচে হাত দিয়ে দেখে। ল্যাজে হাত দিলে যে-গরু শুয়ে পড়ে সে-গরু কেনে না। ল্যাজে হাত দিলে যে-গরু তিড়িং-মিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে সেই গরু পছন্দ করে। নরেন আমার সেই গরুর জাত—ভিতরে জ্বলন্ত তেজ। সে চিঁড়ের ফলার নয়, সে ভ্যাদ-ভ্যাদ করে না। আহা, এখানে এক রকম, ওখানে আরেক রকম। দুরন্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে, যেন জুজুর ভয়ে চুপ করে বসে, আবার যখন চাঁদনিতে এসে খেলে তখন তার আরেক মূর্তি। এরা নিত্যসিদ্ধের থাক, সংসারে বদ্ধ হয় না কখনো। একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। ওরে, কই, এখনো তো এল না নরেন্দর।

নরেন এসেছে, নরেন এসেছে, রব উঠল চার দিকে। রামকৃষ্ণের আনন্দের আগুন দ্বিগুণ হয়ে উঠল।

'আজ কেমন জাহাজে করে বেড়াতে গিয়েছিলাম—' বলতে লাগল নরেনকে, 'সঙ্গে বিজয় ছিল, কেশব ছিল, এরা সব ছিল। এদের জিগ্গেস কর্, কত আনন্দ হল আজ। কেমন বিজয়-কেশবকে মায়ে-ঝিয়ে মঙ্গলবার শোনালুম, বললুম সেই জটিলে-কুটিলের কথা।'

নরেন শুনতে লাগল অতৃপ্য কর্ণে।

ওরে আমার আনন্দের ভাগ তোকে কিছু না দিলে আমি যে একা-একা বইতে পারি না।

॥ ৭৯ ॥

বেড়াতে গিয়ে রাখাল একটি পয়সা কুড়িয়ে পেয়েছে। ভাবলে বাজে লোক যদি পায় নির্ঘাত মেরে দেবে। তার চেয়ে কানা-খোঁড়া ভিক্ষুককে দিয়ে দিলে সদ্ব্যয় হবে পয়সাটার।

ঠাকুরের কাছে কথাটা গোপন করলে না। শিশু যেমন তার মাকে সব কথা খুলে বলে, রামকৃষ্ণের কাছে রাখালের সেই রকম অনাবৃতি।

'একটা পয়সা কুড়িয়ে পেয়েছি। পথের ভিক্ষুক কাউকে দিয়ে দেব।'

ভেবেছিল ঠাকুর বোধ হয় খুশি হবেন, কিন্তু তিনি জ্বলে উঠলেন। তোর দানের জন্যে বিশ্ব-ভুবন বসে আছে। পয়সা তো আপনা থেকে তোর মুঠোর মধ্যে চলে আসেনি। তুই কুড়োতে গেলি কেন?

'বা, আমি যে যাচ্ছিলুম ও-পথে। পথের মধ্যে পড়ে রয়েছে।'

'যে মাছ খায় না সে মাছের বাজারেই বা যাবে কেন? তোর যখন নিজের দরকার নেই, তখন কেন তুই ও-পয়সা ছুঁতে গেলি?'

দে ফেলে দে পয়সা।

সেদিন স্নানের আগে ঠাকুরকে তেল মাখাচ্ছে রাখাল। কি খেয়াল হল রাখাল একটা প্রার্থনা করে বসল। প্রার্থনা আর কিছুই নয়, ভাবসমাধি চাই। রাখাল যত চায় রামকৃষ্ণ তত কঠিন হয়। রাখালও নাছোড়বান্দা। দিতেই হবে আমাকে সেই ঈশ্বরিক অনুভূতির উচ্চতর অবস্থা।

রামকৃষ্ণ তখন কি করে, একটা নিদারুণ কথা বলে রাখালকে আঘাত করে বসল। সেই মর্মান্তিক আঘাতের যন্ত্রণা সইতে পারল না রাখাল। তেলের বাটি হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হন-হন করে ছুটে চলল। থাকবে না আর সে দক্ষিণেশ্বরে। ফিরে যাবে কলকাতা। কত দূর আর যাবে! ফটক পার হতে না হতেই পা দুটো তার অবশ হয়ে পড়ল। সাধ্য নেই দাঁড়িয়ে থাকে। বসে পড়ল সেইখানে। একেবারে নিরুপায়! এখন কি করি কোথায় যাই, যেন জলে পড়ল রাখাল।

নিরুপায়েরই উপায় আছে। জলেরই আছে আবার তীরাশ্রয়। ফটকের কাছে রামলাল। 'ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন নিয়ে যেতে।'

ক্ষমায় একেবারে মাতা বসুন্ধরার মত। দীনপাবনী করুণার মুক্তধারা। রামলালের পিছু-পিছু রাখাল চলে এল গুটি-সুটি। অধোবদন হয়ে দাঁড়াল ঠাকুরের সামনে।

'কি রে পারলি? পারলি গণ্ডি ছাড়িয়ে যেতে?'

সন্ধেবেলায় সেই রাখাল আবার বসেছে ঠাকুরের সামনে।

'রাখাল-নরেনও আছে, আবার আছে হাজরা। হাজরা হচ্ছে শুকনো কাঠ। জপ করে, আবার ওরই ভেতর দালালির চেষ্টা করে। সবাই বলে, ও এখানে থাকে কেন? তার মানে আছে। জটিলে-কুটিলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না।'

তার পর হঠাৎ রাখালের দিকে চোখ ফেরাল রামকৃষ্ণ। বললে, 'সকালে তখন তুই রাগ করেছিলি? তাই না? তোকে রাগালুম কেন? তার মানে আছে। ওষুধ ঠিক পড়বে বলে। পিলে মুখ তুললে পরই মনসার পাতা-টাতা দিতে হয়। বুঝলি?'

তার পর আবার ঈশ্বরীয় রূপের কথা বলছেন মাস্টারের দিকে চেয়ে। বলছেন, 'ঈশ্বরীয় রূপ মানতে হয়। জগদ্ধাত্রী রূপের মানে জানো? যিনি জগৎকে ধারণ করে আছেন। তিনি না ধরলে জগৎ পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। মন-করীকে যে বশ করতে পারে তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রীর উদয়।'

রাখাল বললে, 'মন মত্ত-করী।'

'সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতিকে জব্দ করে রয়েছে।'

আবার আরেক দিন অভিমান হল রাখালের। আবার ছেড়ে গেল দক্ষিণেশ্বর। আবার ফিরে এল ঠাকুরের পদমূলে।

'তুই রাগ করে দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে গেলি, আমি মা'র কাছে গিয়ে কাঁদতে লাগলুম। মা গো, এরা তোর অবোধ সন্তান, এদের অপরাধ নিসনি। তাই আবার ফিরে এলি। না এসে আর যাবি কোথায় ?'

অধর সেনকে এক দিন বললেন ঠাকুর, 'এরা শ্রাবণ মাসের জল নয়। শ্রাবণ মাসের জল হুড়-হুড় করে আসে আবার হুড়-হুড় করে বেরিয়ে যায়। এরা থাকিয়ে জল। মাটি ফুঁড়ে এদের আবির্ভাব।'

ঠাকুরের পা টিপছে রাখাল, আর একজন ভাগবতের পণ্ডিত ভাগবতের কথা বলছে কাছে বসে। কথায় আর স্পর্শে রাখালের সেই প্রথম ভাব। থেকে-থেকে শিউরে উঠতে-উঠতে একেবারে নিশ্চল স্থির। ভাব তো নয়, ভাব-বিলাসিতা ! এই হল নরেনের ধারণা। এ সব ভাব হচ্ছে স্নায়ুদৌর্বল্যের ফল, মানসিক মৃগি রোগ।

ব্রাহ্মসমাজের খাতায় নাম লিখিয়েছে দুই জনে—নরেন আর রাখাল—ব্রাহ্মসমাজের সংকল্প নিয়েছে। অথচ—

এক দিন দক্ষিণেশ্বরে এসে নরেন দেখতে পেল ঠাকুরের পিছু-পিছু রাখালও চলেছে মন্দিরে। বিগ্রহের সামনে ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছেন, পিছু-পিছু রাখালও প্রণাম করছে। দেখে তো পায়ের রক্ত মাথায় উঠল নরেনের। রাখালের এ কী বিশ্বাসভংগ ! কথা দিয়ে এসে সেই কথার প্রত্যবায় !

ধরল রাখালকে। অন্তরালে ডেকে নিয়ে গেল। তীব্র ভর্ৎসনার সুরে বললে, 'এ তোমার কী কাণ্ড ?'

'কেন, কী হয়েছে ?'

'কী হয়েছে মানে ? এটা মিথ্যাচার নয় ?'

'কোনটা ?'

'এই যে মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীকে প্রণাম করা ?'

রাখাল চোখ নামাল। কথা কইল না।

'তুমি ব্রাহ্মসমাজের অংগীকার-পত্রে সই করে দিয়ে আসোনি ? বলে আসোনি, নিরাকার ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু ভজনা করবে না ? মানবে না দেবদেবী ?'

তবু চুপ করে রইল রাখাল। কি করে মনের কথা বোঝাবে নরেনকে ? ঠাকুরের ছোঁয়ায় সংস্কারের পুরোনো গ্রন্থি সব খুলে গিয়েছে যে। ব্রহ্মের যে ইতি নেই, তাঁর যে লেখাজোখা হয় না। তিনি যদি নিরাকার হয়ে থাকতে পারেন, সাকার হয়েই বা থাকতে পারবেন না কেন ? তিনি যদি সর্বব্যাপক সর্বাবয়ক হন তবে তিনি শিলা-মৃত্তিকাই বা আশ্রয় করতে পারবেন না কেন ? গোঁড়ামির অন্ধকূপ থেকে ঠাকুর তাকে নিয়ে এসেছেন আকাশের নিত্যনির্মল উদারতায়। কিন্তু কিছুই বলতে পারল না। এত যার তেজ ও দীপ্তি তার সংগে রাখাল পারবে না তর্ক করে। তাই বলে নরেন ছাড়বার পাত্র নয়। সে গিয়ে ধরল ঠাকুরকে।

'রাখাল এই মিথ্যাচার করবে ? গড় হয়ে প্রণাম করবে দেবদেবী ?'

'করলেই বা। ভগবান সব জায়গায় আছেন, শুধু মূর্তিতেই থাকবেন না ?'

'কিন্তু ও যে সই করে দিয়ে এসেছে।'

'তাই বলে ও মত বদলাতে পারবে না? চিন্তার জগতে থাকবে না ওর স্বাধীনতা?'

চির স্বাধীন নরেন্দ্রনাথ থমকে গেল। কথা খুঁজে পেল না।

'রাখালের এখন সাকারে বিশ্বাস হয়েছে। তা কি করবে বলো? যার যেমন ধাত। যার যেমন পেটে সয়। তোর নিরাকারের ঘর, রাখালের সাকারের। সকলেই কি আর গোড়া থেকে নিরাকারে মন দিতে পারে? সাকার-নিরাকার যে কোনো একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হলো।'

নরেন ফিরে যাচ্ছিল, ঠাকুর ডাকলেন। বললেন, 'রাখালকে আর কিছু বলিসনি। সে তোকে দেখলেই ভয়ে জড়সড় হয়।'

সেই রাখালের অসুখ করেছে। সবাইকে উদ্বেগ জানাচ্ছেন ঠাকুর। বলছেন, "এই দেখ আমার রাখালের অসুখ। সোডা খেলে কি ভালো হয় গা?'

শেষকালে যেন দৈববাণীর মতো বলে উঠলেন, 'যা, রাখাল, তুই জগন্নাথের প্রসাদ খা গে, যা।'

দেখতে পেলেন নারায়ণ বালকের রূপ ধরে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠাকুরের প্রেমানুরঞ্জিত চোখ—গোপালকে দেখে যশোমতীর যেমন স্নেহগদগদ দৃষ্টি। ধীরে-ধীরে সমাধিতে ডুবে গেলেন রামকৃষ্ণ। যে মা এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন সন্তানের জন্যে, সে মা এখন কোথায়? সাকার ছেড়ে ডুব দিয়েছেন নিরাকারের জলধিতে।

নন্দনবাগানে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে নিমন্ত্রণ হয়েছে ঠাকুরের। ভক্তদের নিয়ে এসেছেন, সংগে রাখাল। কিন্তু তাঁদের দিকে গৃহস্বামীদের লক্ষ্য নেই। উপাসনা শেষ হলে খাবার ডাক পড়ল। কিন্তু এদিক পানে কেউ তাকিয়েও দেখছে না। শুধু বড়লোক আর আত্মীয়-কুটুমদের নিয়ে শশব্যস্ত।

'কই রে কেউ ডাকে না যে রে!' ঠাকুর বললেন ভক্তদের।

ভক্তরা আর কি করবে। এদিক-ওদিক তাকায়, কারুরই চোখের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না। কে না কে এসেছে হেজিপেজি এমনি মনোভাব।

ঠাকুরের কথা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল রাখাল। বললে, 'মশায়, চলে আসুন।'

রাখালকে বড় বিঁধছে এ অপমান। অন্যায় ঔদাসীন্য অপমান ছাড়া আর কি। কিন্তু চলে আসুন বললেই তো আর চলে যাওয়া যায় না।

'আরে রোস', রাখালকে নিরস্ত করলেন ঠাকুর: 'গাড়িভাড়া তিন টাকা দু আনা কে দেবে? রোক করলেই হয় না। পয়সা নেই আবার ফাঁকা রোক। আর এত রাত্রে খাই কোথা?'

একসংগে পাতা পড়েছে সকলের। অনেক পরে যখন ডাক পড়ল এ-দলের তখন গিয়ে দেখল, জায়গা নেই, সমস্ত আসন ভরে গিয়েছে। তখন এক পাশে নোংরা-মতন একটা জায়গায় ভক্ত সমেত ঠাকুরকে বসানো হল এক ধারে। নুন-টাকনা দিয়ে দিব্যি লুচি খেলেন ঠাকুর। ভক্তরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ঠাকুরের দিকে। বিন্দুমাত্র অভিমান নেই। নেই এতটুকু দোষদর্শন। কারুণ্য আর সৌশীল্যের প্রতিমূর্তি। উদারতা আর ক্ষমার সমাহার। লোককল্যাণ কামনায় সর্বংসহ।

পরের দোষ আর দেখব না। গর্বে আর পর্বত ভাবব না নিজেকে।

এদিকে, এর আগে, বিজয়ের কি হয়েছিল একটু খোঁজ নিই।

কেশবের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে। কেশব করেছে 'নববিধান', বিজয় করেছে 'সাধারণ'। জয় হয়েও বিজয়ের শান্তি নেই। শুধু প্রচারে-বিচারে উপদেশে-উপাসনায় ঊষর মরু সজল হয় না। চাই শ্রাবণ-সিঞ্চন। তৃষ্ণা মেটে না শুধু জ্ঞানের খরতাপে। চাই ভক্তির বারিধারা। শুধু নিরাকারে শান্ত হয় না হাহাকার।

মেছুয়াবাজার স্ট্রীট ধরে এক দিন হেঁটে যাচ্ছে বিজয়কৃষ্ণ, হঠাৎ এক হিন্দুস্থানী সাধুর সঙ্গে দেখা। সাধু-সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়েও দেখেনি কোনো দিন, অথচ এর দিকে চোখ না ফেলে পারল না। যেমনি চোখ পড়ল অমনি থমকে দাঁড়াল। শুধু তাই নয়, যা ধারণার অতীত, পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে বসল সাধুকে। কি লজ্জা, কেউ দেখতে পায়নি তো!

ব্রাহ্মসমাজে বেদীতে বসে উপাসনা করছে বিজয়, চোখ চেয়ে দেখল এক কোণে সেই সাধু বসে। উপাসনার শেষে বেরিয়ে আসছে মন্দির থেকে, হঠাৎ পিছন দিক থেকে এসে বিজয়ের হাত ধরল সেই সাধু। বললে, 'চলো!'

কোথায়? কোথাও নয়। এই রাস্তায়। অচেনা ভিড়ের নিরিবিলিতে।

ফাঁকায় চলে এসে হঠাৎ জিগগেস করলে সাধু, 'তোম গুরু কিয়া?'

বিজয় দৃঢ়স্বরে বললে, 'আমি গুরুবাদ মানি না।'

শিবনাথ শাস্ত্রীও বলেছিল সেই কথা। গুরু লাগবে কিসে? আত্মবলে ঈশ্বর লাভ করব। আমি কি কিছু কম?

ঠাকুর একবার তাকালেন গঙ্গার দিকে। দেখলেন হাতের কাছেই সুস্পষ্ট উদাহরণ। চলন্ত স্টিমারের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা গাধাবোট। স্টিমারের সঙ্গে-সঙ্গে গাধাবোটও দিব্যি জল কেটে এগিয়ে আসছে পারের দিকে। ঐ দেখ ঐ গাধাবোট। ওর সাধ্য ছিল আত্মবলে এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে? হয়তো এক বেলা লেগে যেত। ভাগ্যক্রমে স্টিমারের সঙ্গে বাঁধা পড়েছিল বলেই এত বেগে বেরিয়ে আসতে পারছে। গাধাবোটের পক্ষে পার পেতে হলে শুধু আত্মবলে চলে না, গুরুবল লাগে। জীবমাত্রই গাধাবোট। শুধু লগি ঠেলে-ঠেলে কত আর তুমি এগোবে—কত দিনে? স্টিমার ধরো। ধরো গুরু। ধরো পারাপারের কর্ণধার। ঠিক তোমাকে পার করে দেবে।

'গু' মানে অন্ধকার আর 'রু' মানে আলোর দ্যোতক। অন্ধকার থেকে যিনি আলোকে নিয়ে যান তিনিই গুরু। অন্ধকারে যিনি আলোর সংবাদ দেন তিনিও।

এত বড় যে বিদ্যা-বিশারদ হয়েছ, বলি, বর্ণপরিচয় শিখতে গুরু লাগেনি?

কিন্তু মুখ গম্ভীর করে বিজয় বললে, 'মানি না আমি গুরুবাদ।'

মৃদু-মৃদু হাসল সেই সন্ন্যাসী। বললে, 'এই সি ওয়াস্তে সব বিগড় গিয়া—'

বিজয়ের বুকের মধ্যে কে ধাক্কা দিলে। মুখ ঘুরিয়ে বললে, 'তুমি শুনেছ আমার উপাসনা ? ও কিছু নয় ?'

'ও সব তো বেদকা বাণী হ্যায়। ওসি মে ক্যা হোগা ?'

যেন সহসা কে টলিয়ে দিল বিজয়কে। পথের মধ্যে বসিয়ে দিল। মনে হল গুরু নেই বলে সব পণ্ড হয়ে যাচ্ছে। পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল চেষ্টা। গুরু চাই। অগ্নিমন্থন কাঠ প্রস্তুত। শুধু একটু ঘর্ষণ দরকার।

আপনি আমার গুরু হোন। ব্যাকুলতায় সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল বিজয়ের। আমাকে দিন সেই চৈতন্যের স্ফুলিঙ্গ। যজ্ঞের কাঠ একবার জ্বলে উঠুক।

'নেহি। তোমারা গুরু দোসরা হ্যায়—'

ঠাকুর বললেন, 'তবে একবার এক বাঘিনীর গল্প শোনো—'

ছাগলের পালে এক বাঘিনী পড়েছিল। দূর থেকে তাক করে এক শিকারী তাকে মেরে ফেললে। তখন সেটার প্রসব হয়ে ছানা হয়ে গেল। ছানাটি ছাগলের সঙ্গে মানুষ হতে লাগল। ছাগলেরা ঘাস খায়, বাঘের ছানাও ঘাস খায়। ছাগলদের মত বাঘের ছানাও ভ্যা-ভ্যা করে। আবার কোনো জানোয়ার এলে ছাগলদের মতই ছুটে পালায়। এক দিন সেই ছাগলের পালে আর একটা বাঘ এসে পড়ল। ঘাসখেকো বাঘটাকে দেখে তো সে অবাক ! দৌড়ে তখন ধরল সে ঘাসখেকোকে। সেটা প্রাণপণে ভ্যা-ভ্যা করতে লাগল। সেটাকে টেনে হিঁচড়ে জলের কাছে নিয়ে এল সেই বাঘ। বললে, দ্যাখ, জলের মধ্যে তোর মুখ দ্যাখ—আমার যেমন হাঁড়ির মতন মুখ, তোরও তেমনি। আর এই নে খানিকটা মাংস, চিবিয়ে দ্যাখ। বলে তার মুখের মধ্যে খানিকটা মাংস জোর করে পুরে দিলে। আর যায় কোথায় ! প্রথমে তো মুখেই তুলবে না, শেষে রক্তের স্বাদ পেয়ে খেতে লাগল। তখন বাঘ বলল, 'এখন বুঝেছিস ? দ্যাখ চেয়ে, আমিও যা তুইও তা। এখন আয়, আমার সঙ্গে বনে চলে আয়।'

বাঘ হল সেই গুরু। চৈতন্য এনে দিলে। জলে মুখ দেখালে—তার মানে, চিনিয়ে দিলে স্বরূপ। বনে ডেকে নিয়ে গেল। নিয়ে গেল স্বধামে। ঈশ্বর-নিকেতনে।

গুরুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল বিজয়, তিনি যদি নিজের থেকে না আসেন তাঁকে খুঁজে বের করতে হবে। ভারতবর্ষের আঁতিপাঁতি চষে দেখব। মাটি খুঁড়ে হোক, পাহাড় ফেড়ে হোক, উদ্ধার করতে হবে সেই লুক্কায়িতকে। কোথায় আমার সেই জল-দর্পণ ! যার মধ্যে তাকিয়ে আমি আমার স্বরূপকে চিনব !

বিন্ধ্যাচল পাহাড়ে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে বিজয়। শুনেছিল কোথাকার কে এক সাধু আছে এই জঙ্গলে। রাত্রির অন্ধকার নেমে এল, জনপ্রাণীর দেখা নেই। শুধু লতাগুল্মের জটিলতা। খুঁজতে-খুঁজতে পেল এক ভাঙা বাড়ি—ঠিক করল এখানেই রাত কাটাবে। তাই সই, পরিত্যক্ত ভাঙা বাড়িতেই ডেরা বাঁধলে। কিসের ডেরা—মাঝ-রাতে এক দল ডাকাত এসে হাজির। এটা সাধু-সন্নেসীর ডেরা নয়, এটা ডাকাতের আস্তানা। কেটে পড়ো। সন্নেসীর পোশাক থাকলেই বা কি, বিজয়কে ওরা তাড়িয়ে দিলে। দূরে এক গাছতলায় গিয়ে বসল

বিজয়। এ দিকে ভাঙা বাড়ির মধ্যে বসে লুট-করা মালের বখরা করতে লাগল ডাকাতেরা। বখরার পর যখন ঘুমুতে যাবে তখন বিজয়ের কথা ফের মনে পড়ল তাদের। সাধুটা গেল কোথায়? ও তো নির্ঘাত পুলিশে খবর দেবে। ওকে ধরো। সাবড়ে দাও এক কোপে। ডাকাতদের যে সর্দার সে আপত্তি করলে। বললে, নিরীহ সন্নেসীমানুষ, ওর থেকে আমাদের কোনো ক্ষতি হবে এ আমার বিশ্বাস হয় না। ওকে মেরে কাজ নেই। রাখো তোমার সরফরাজি। ওকে না কেটে ফেললে পুলিশের হাতে ও সাবুদ হবে।

দুটো তরোয়াল নিয়ে দুটো ডাকাত এগিয়ে গেল সেই গাছতলার দিকে। কিন্তু এ কী সর্বনাশ! বিজয়ের সামনে অল্প কয়েক হাত দূরে প্রকাণ্ড একটা বাঘ বসে। যেন পাহারা দিচ্ছে বিজয়কে। সেই পুরুষব্যাঘ্রকে। এ দিক থেকে মারা যাবে না দেখছি। যেতে হবে পিছন দিকে। সে দিক থেকেই বসাতে হবে কোপ। সে দিকে গিয়ে দেখে, সে দিকেও আরেক বাঘ। বিশাল জিভ মেলে থাবা চাটছে বসে-বসে। কে মারে সেই ব্যাঘ্রমূর্তিকে! ডাকাত দুটো তরোয়াল নামিয়ে হেঁট মুখে সরে পড়ল।

এবার এসেছে তিব্বতে। শুনেছিল দুর্গম অরণ্যের মধ্যে কোন এক গোফার ধারে এক বাঙালী মহাপুরুষ আছেন। অহোরাত্রই নাকি সমাধিস্থ। যেই থেকে শোনা সেই থেকেই তাঁর ঠিকানা খুঁজে ফিরছে। ঠিকানা মানে বরফ আর পাথর, জল আর জঙ্গল। তবু বের করা চাই সেই মহাপুরুষকে। খাদ্য নেই, ঘুম নেই, না থাক, চাই শুধু সেই পরমান্ন, শুধু সেই অসঙ্গ-সঙ্গ। কোথায় সে! পথ চলতে-চলতে তিন দিনের দিন অজ্ঞান হয়ে পড়ল বিজয়। ঘোর অরণ্য। প্রাণস্পন্দনহীন। কে তার খবর রাখে! কিন্তু যাকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে তিনি খোঁজ রাখেন।

নগ্নদেহ কে এক সন্ন্যাসী সহসা তার সামনে এসে দাঁড়াল। স্পর্শ করতেই জেগে উঠল বিজয়। তার শিথিল হাতে কটি ছোট-ছোট বীজ গুঁজে দিলে সন্ন্যাসী। বললে, 'বাচ্চা, এহি দানা লেও, ভুখ-পিয়াস ছুট যায়েগা।'

সত্যিই তাই। দু-এক দানা মুখে দিতেই ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটে গেল বিজয়ের। মিটে গেল পথশ্রান্তি। কিন্তু শুধু দেহের ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটিয়েই নিবৃত্তি কোথায়? শুধু এ হলেই মন কেন বলে না সব পাওয়া গেল? কোথায় মানুষের সেই 'সব পেয়েছি'-র দেশ? ক্লান্তি গেলেও ক্ষান্তি আসে না কেন? আবার কেন সন্ধানের ইন্ধন জ্বলে? সেই সন্ন্যাসী কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। হল না বুঝি গুরুপ্রাপ্তি। অন্ধকার থেকে আলোতে আগমন।

ঘুরতে-ঘুরতে গয়ায় এসেছে বিজয়। এখানে এসে শুনতে পেল আকাশগঙ্গা পাহাড়ে রঘুবর দাস এক মস্ত সাধু। আর কথা নেই, অমনি ছুটল সেই আশ্রমে। বাবাজীর পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল বিজয়: 'বাবাজী, কি করে উদ্ধার হব? কে আমার হাত ধরবে?'

এমন সাধু আর দেখেনি রঘুবর। যেমন উত্তাল ভক্তি তেমনি উদ্দাম ব্যাকুলতা। আশীর্বাদের ভঙ্গিতে বললে, 'দয়াল রামজী তোমাকে আলবৎ কৃপা করেগা। দৈন্য ছোড়ো।'

যতক্ষণ তার দেখা না পাই ততক্ষণ কি করে ছাড়ি এই দীন বেশ ?

সেখান থেকে আরেক সাধুর সন্ধানে চলল ব্রহ্মযোনির পাহাড়ে। বিজয়কে দেখে সেই সাধু তো আনন্দে আত্মহারা। বাহু বাড়িয়ে আলিঙ্গন করল বুকের মধ্যে। শুধু বললে, 'আনন্দে রহো। আনন্দে রহো।'

যাই বলো, রঘুবর দাসের আশ্রমটিই বিজয়ের মনে ধরেছে। এই আশ্রমটিই যেন এক দিন সে দেখেছিল স্বপ্নে। এই পাহাড়, এই মন্দির, মন্দিরে এই মহাবীরের মূর্তি। কেন দেখেছিল কে জানে, কিন্তু জায়গাটি ভারি প্রাণজুড়ানো। সঙ্কেতে-সংগীতে ভরা।

একদিন রঘুবরের সংগে বসে গল্প করছে বিজয়, এক রাখাল ছেলে এসে খবর দিলে, পাহাড়ের উপরে কে একজন মস্ত লোক এসেছেন। স্বপ্নে মহাবীর যেন এই পর্বতশীর্ষের দিকেই ইশারা করেছিল। তাড়াতাড়ি ছুটে গেল দুজনে। দেখল এক অপূর্বকান্তি তেজস্বান মহাপুরুষ। মাথা ঘিরে জ্যোতির্গোলক। কিন্তু তাদের তিনি কাছে ঘেঁষতে দিলেন না। ইশারায় বললেন চলে যেতে।

কি আর করা! ম্লান মুখে ফিরে গেল বিজয়। কিন্তু মন রইল সেই পর্বতের নির্জনতায়।

কিছু গাঁজা কিনল বিজয়। ভাবল গাঁজা পেলে সাধু নিশ্চয় তাকে ফিরিয়ে দেবেন না। দুটো অন্তত কথা কইবেন। একা-একা চলে এল সে গুটি-গুটি। গাঁজা দিতে হল না, কথা কইলেন সাধু। জিগ্‌গেস করলেন, 'কি করো ?'

ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করি।

'ব্রাহ্মধরম ? ও হাম জানতা হ্যায়। কলকাতামে ব্রাহ্মসমাজ হ্যায়। রাজা রামমোহন একঠো বড় আদমি থা। আগাড়ি ওহি ব্রাহ্মধরম স্থাপন কিয়া। ওলোগ বেলায়েত গিয়া—'

বিজয় তো অবাক। পশ্চিমী সাধু, বাঙলা দেশের এত খবর জানে কি করে ?

'দেবেন বাবু কেশব বাবু সব কোইকো হাম পছান্তা—'

যত কথা বলেন সাধু ততই যেন বেহুঁশ হয়ে আসে বিজয়। তার আর নড়বার-চড়বার ক্ষমতা নেই। জিভও পর্যন্ত অসাড় হয়ে গেছে। জ্ঞানহারা অবস্থায় নীরবে কাঁদতে লাগল। মহামানব তাকে টেনে নিলেন কোলের মধ্যে। দেহে শক্তি সঞ্চার করলেন। শুধু তাই নয়, কানে দীক্ষামন্ত্র দিয়ে দিলেন। লাফ দিয়ে উঠে বসল বিজয়। পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করল। কৃপাসিন্ধুর এ কী কৃপাবিন্দু! একে-একে সাধন-প্রণালী শিখিয়ে দিলেন সাধু। শুধু সাধু নয়, বলো গুরুদেব। বলো আকাশগঙ্গার পরমহংস। কঠোর সাধনে লেগে গেল বিজয়। শুকনো কাঠে আগুনই শুধু জ্বলছে, কিন্তু কোথায় সে হিরণ্যগর্ভ ?

গুরুদেব হঠাৎ এক দিন আবার দেখা দিলেন। বললেন, 'কাশী যাও। হরিহরানন্দ সরস্বতীর কাছে গিয়ে সন্ন্যাস নাও।'

তক্ষুনি কাশী ছুটল। বের করল সেই সরস্বতীকে। বললে, পৈতে ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্মে ঢুকেছি। এখন প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে আমাকে সন্ন্যাস দিন।

তোমার এই উচ্চাবস্থায় প্রায়শ্চিত্তের দরকার নেই। তবে তোমাকে আবার

যথারীতি উপবীত গ্রহণ করতে হবে। তার পরে তিন দিন ধরে বিরজাহোমে শিখাসূত্রের আহূতি দিয়ে সন্ন্যাসী হবে তুমি।

তথাস্তু। আমি সন্ন্যাসী হব। সর্বপ্রকার কাম্যকর্ম ত্যাগ করে সম্যকরূপে ভগবানে যে আত্মসমর্পণ করে সেই সন্ন্যাসী। পুরো দস্তুর সন্ন্যাসী হয়েই বিজয় ফিরে এল দক্ষিণেশ্বরে। দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের কাছে। বললে, 'হে শ্রীহরি—'

যদিও এখানেই বিজয়ের সাধনার ইতি নয়—এখানে এক মহাস্বীকৃতি।

* ৮১ *

বরানগরে বেড়াতে এসেছে মহেন্দ্র গুপ্ত। আটাশ বছর বয়েস, শ্যামবাজার মেট্রোপলিটান ইস্কুলের হেডমাস্টার। বেড়াতে এসেছে বন্ধু সিদ্ধেশ্বর মজুমদারের বাড়ি। এণ্ট্রান্সে দ্বিতীয়, এফ-এ-তে পঞ্চম, বি-এ-তে তৃতীয় হয়ে বেরিয়েছে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে। আইন পড়বার শখ, সংসারের প্রয়োজনে চাকরিতে ঢুকেছে। প্রথমে কেরানিগিরি, ইদানীং মাস্টারি। গোড়ার দিকে যশোর নড়ালে, এখন কলকাতায়। সিটি স্কুল, এরিয়ান স্কুল, মডেল স্কুল শেষ করে এখন এসেছে বিদ্যাসাগরের ইস্কুলে। সে ইস্কুলের শ্যামবাজার ব্রাঞ্চে।

'গঙ্গার ধারে চমৎকার একটি বাগান আছে, যাবে বেড়াতে?' জিগগেস করলে সিদ্ধেশ্বর।

প্রসন্ন বাঁড়ুয্যের বাগান দেখে ফিরছিল দুজনে। মাস্টার বললে, 'কার বাগান?'

'রাসমণির বাগান। সেখানে একজন পরমহংস আছেন। যাবে?'

'সে তো শুনেছি উন্মাদ।'

'না হে, এখন আর তার সে অবস্থা নেই। সে এখন শান্ত সদানন্দ বালক। দেখলে চোখ জুড়োয়।'

হাঁটতে-হাঁটতে চলে এল দুজনে। একেবারে ঠাকুরের ঘরে। এই প্রথম দর্শন! এ কে! এ কি মানুষ, না, শুভ্র-স্বচ্ছ অক্ষুণ্ণানন্দ আকাশ। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার দিকে। মনে হল সমস্ত জীবনের সুখ-দুঃখ-মন্থন-ধন যেন বসে আছে সামনে। কিন্তু এ কোথায় এলাম? কাঁসর-ঘণ্টা খোলকরতাল বেজে উঠেছে একসঙ্গে। দেবালয়ে আরতি হচ্ছে বুঝি?

চলো আগে দেখে আসি মন্দির। দ্বাদশ শিবমন্দির। রাধাকান্তের মন্দির। আর এই ত্রিভুবনজননী কারুণ্যপূর্ণেক্ষণা ভবতারিণী।

মন্দির দেখে আবার ফিরল তারা ঠাকুরের ঘরে। ঘরের দরজা ভেজানো। পাশেই বৃন্দে-ঝি দাঁড়িয়ে। জল-খাবারের জন্যে লুচি বরাদ্দ থাকে—এই সেই বৃন্দে-ঝি। মাঝে-মাঝে অসময়ে কোনো ভক্ত এলে যদি তার বরাদ্দ লুচি খরচ হয়ে যায়, সে বকে অনর্থ করে। বলে, ওমা, কেমন সব ভদ্দরলোকের ছেলে গো, আমারটি সব খেয়ে বসে আছে। সামান্য মিষ্টিটাও পাই না?

পাছে এই সব কথা ছেলেদের কানে যায়, ঠাকুরের দারুণ ভয়। এক দিন তেমনি খরচ হয়ে গেছে লুচি, ঠাকুর প্রমাদ গুনছেন। নহবতে চলে এসেছেন শ্রীমা'র কাছে। বলছেন, 'ওগো, বৃন্দের খাবারটি তো খরচ হয়ে গেল। এখন চটপট রুটিলুচি যা-হয় কিছু করে রাখো, নইলে এক্ষুনি এসে বকাবকি করবে। দুর্জনকে পরিহার করে চলতে হয়—'

বৃন্দেকে দেখেই তো শ্রীমা'র মুখ চুন। বললেন, 'বোসো, তোমার খাবারটা তৈরি করে দি।'

থাক। বুঝেছি। ঢের হয়েছে। গরিবের উপর যত অত্যাচার।

'বেশিক্ষণ লাগবে না। এক্ষুনি তৈয়ের করে দিচ্ছি।'

'আর তৈয়েরে কাজ নেই বাছা—এমনি দাও।'

শ্রীমা তখন সিধে সাজিয়ে দিলেন। ঘি ময়দা আলু পটল—কত কি।

সেই বৃন্দে-ঝি দরজায়। একটু বোধ হয় ঘাবড়ে গেল মাস্টার। বললে, 'হ্যাঁ গা, সাধুটি কি ভিতরে আছেন ?'

'ভিতরে থাকবে না তো যাবে কোথায় ?'

'কতদিন আছেন বলো তো এখানে ?'

'আমি কত দিন আছি তার হিসেব কে রাখে ঠিক নেই—অন্যের হিসেব রাখতে যাব !'

মাস্টার দ্বিধা করল, তবু জিগগেস না করে পারল না। 'আচ্ছা, ইনি কি খুব বইটই পড়েন ?'

'ওসব তোমরা পড়ো।' বৃন্দে-ঝি ঝামটা মেরে উঠল : 'সব বই ওঁর মুখে-মুখে।'

বই পড়ে না সে আবার কি রকম জ্ঞানী !

গ্রন্থ নয় হে, গ্রন্থি—গাঁট। শুধু পাণ্ডিত্যে মানুষ ভোলাতে পারবে, তাঁকে পারবে না। হাজার বই পড়ো, হাজার শ্লোক আওড়াও, ব্যাকুল হয়ে তাঁতে ডুব না দিলে তাঁকে ছুঁতেও পারবে না। পণ্ডিত খুব লম্বা-লম্বা কথা বলে, কিন্তু নজর কেবল পার্থিব সুখে। যেমন শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে, কিন্তু নজর রয়েছে গো-ভাগাড়ে। শুধু-পণ্ডিতগুলো দরকোচাপড়া। না এ দিক না ও দিক।

তাই সংক্ষেপে করো। পিঁপড়ের মতো বালিটুকু ত্যাগ করে চিনিটুকু নাও। শব্দার্থ না খুঁজে মর্মার্থ খোঁজো ! সাধুমুখে গুরুমুখে জেনে নাও সেই মর্মস্থলের সংবাদ। এক জানার নাম জ্ঞান, অনেক জানার নাম অজ্ঞান।

এক দৃষ্টে শুধু পাখির চোখ দেখ। লক্ষ্যভেদের সময় অর্জুনকে দ্রোণাচার্য কী জিগগেস করলেন ? জিগগেস করলেন, 'আমাদের সবাইকে দেখতে পাচ্ছ ? এই সব রাজা-রাজড়া, গাছ, গাছের ডাল-পালা, তার উপরে পাখি—দেখতে পাচ্ছ সব ?' অর্জুন বললে, 'শুধু পাখির চোখ দেখতে পাচ্ছি।'

যে শুধু পাখির চোখ দেখে, সেই লক্ষ্যভেদ করে।

'বন্ধ ঘরে ইনি বুঝি এখন সন্ধে করছেন—' বৃন্দে-ঝিকে জিগগেস করল মাস্টার। 'তোমার বুদ্ধি কি গো ! ঘরে ধুনো দিয়েছি। যাও না, ঘরে গিয়ে বোসো না।' ঘরে ঢুকে প্রণাম করে বসল দুজনে। মামুলী দু'চারটে প্রশ্ন করলেন

ঠাকুর। কথার ফাঁকে-ফাঁকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন। সেই তন্ময়তার মধ্যে শিথিল ঔদাসীন্য নেই, বরং রয়েছে আতীব্র একাগ্রতা। একেই বুঝি ভাব বলে।

সিদ্ধেশ্বর বললে, 'সন্ধের পর এমনি ওঁর ভাবান্তর হয়।'

তবে আরেক দিন সকাল বেলা আসব। দেখব প্রভাত-আলোয়।

শীতের সকাল। নাপিত এসেছে, ঠাকুর কামাতে যাচ্ছেন। গায়ে র‍্যাপার, ধারগুলো শালু দিয়ে মোড়া, পায়ে চটিজুতো।

'তুমি এসেছ ? আচ্ছা বোসো আমার কাছে।'

দক্ষিণের বারান্দায় কামাতে বসলেন। কামাচ্ছেন আর কথা কইছেন।

হঠাৎ বলে উঠলেন কাতরভাবে। 'হ্যাঁগা, কেশব কেমন আছে বলতে পারো ? তার বড্ড অসুখ।'

'আমিও শুনেছি বটে।'

'তার অসুখ হলেই আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়। রাত্রি শেষ প্রহরে উঠে আমি কাঁদি। বলি, মা কেশবের যদি কিছু হয়, তবে কার সঙ্গে কথা কবো।'

মাস্টারের বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। বললে, 'এখন বোধ হয় ভালো আছেন।'

'কেশবের জন্যে মা'র কাছে ডাব চিনি মেনেছি। কলকাতায় গেলে দিয়ে আসব সিদ্ধেশ্বরীকে।' বলে তাকালেন মাস্টারের দিকে। শুধোলেন, 'তোমার কি বিয়ে হয়েছে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, হয়েছে।'

যন্ত্রণায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন ঠাকুর। 'ওরে রামলাল ! যাঃ, বিয়ে করে ফেলেছে।'

মাথা হেঁট করে বসে রইল মাস্টার। বিয়ে করা কি এতই দোষ ?

আবার জিগগেস করলেন ঠাকুর, 'ছেলে হয়েছে ?'

বুকের মধ্যেই ঢিপ-ঢিপ করছে মাস্টারের। ভয়ে-ভয়ে বললে, 'আজ্ঞে, হয়েছে একটি।'

'যাঃ, ছেলেও হয়ে গেছে।' আবার কাতরোক্তি করে উঠলেন। পরে বললেন স্নেহস্বরে, 'তোমার মধ্যে যে ভালো লক্ষণ ছিল। আমি কপাল চোখ এ সব দেখে বুঝতে পারি—'

জানো, মানুষের মন হচ্ছে সরষের-পুটুলি। সরষের পুঁটুলি ছড়িয়ে পড়লে কুড়ানো ভার হয়ে ওঠে। তেমনি কামিনী-কাঞ্চন মন ছড়িয়ে পড়লে ছড়ানো মন কুড়ানো দায়। অনেকের কাছে স্ত্রী একেবারে শিরোমণি। বলে, আমাকে কত ভালোবাসে, কত সেবা-যত্ন করে, তাকে ছেড়ে যাই কেমন করে ? শিষ্যকে গুরু তাই এক ফন্দি শিখিয়ে দিল। একটা ওষুধের বড়ি দিয়ে বললে, এইটে খেলেই মড়ার মত হয়ে যাবি, তোর জ্ঞান থাকবে না। কিন্তু সব বেশ পাবি দেখতে-শুনতে। তার পর আমি এলে তোর চৈতন্য হবে। যেমন কথা তেমন কাজ। শিষ্যের বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। ওগো দিদি গো আমার কি হল গো, তুমি আমাদের কী করে গেলে গো—বলে আছড়ে-আছড়ে কাঁদতে লাগল স্ত্রী। লোকজন সব জড়ো হল।

খাট এনে তাকে ঘর থেকে বার করবার যোগাড় করলে। কিন্তু বাড়ির গুণে লাশ এঁকে-বেঁকে আড়ষ্ট হয়ে যাওয়াতে দরজা দিয়ে তা বেরুচ্ছে না সিধেসিধি। তখন একজন একখানা কাটারি নিয়ে এল। দরজার চৌকাঠ কাটতে আরম্ভ করলে। দুম-দুম শব্দ শুনে স্ত্রী ছুটে এল অস্থির হয়ে। ওগো, কী হয়েছে গো! কী করছ গো! ইনি বেরুচ্ছেন না তাই দরজা কাটছি। অমন কম্ম করো না গো! স্ত্রী চেঁচাতে লাগল। আমি এখন রাঁড়-বেওয়া হলুম, আমার আর দেখবার-শোনবার কেউ নেই। কটি নাবালক ছেলেকে মানুষ করতে হবে। এ দুয়ার গেলে তো আর হবে না। ওগো, ওঁর যা হবার তা তো হয়ে গেছে, ওর হাত-পা কেটে বার করো। ততক্ষণে গুরু এসে গিয়েছে। লাফিয়ে উঠল শিষ্য। হাঁক পাড়লে, তবে রে শালী, আমার হাত-পা কাটবে? এই বলে গুরুর সংগে বেরিয়ে গেল বাড়ি ছেড়ে।

জানো না বুঝি, অনেক স্ত্রী আবার ঢঙ করে শোক করে। কাঁদতে হবে বলে গয়না নৎ খুলে বাক্সের ভেতরে রেখে আসে। তার পর আছড়ে পড়ে কাঁদে—'ওগো দিদি গো, আমার কী হল গো—'

এই স্ত্রী? এই সংসার!

'আচ্ছা তোমার পরিবার কেমন? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি?'

মাস্টার ভরসা পেয়ে বললে, 'আজ্ঞে ভালো, কিন্তু অজ্ঞান।'

যেন লেখাপড়া শিখলেই জ্ঞান!

ঠাকুর একটু বিরক্ত হলেন। বললেন, 'আর তুমি এক মস্ত জ্ঞানী!'

অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল মাস্টারের।

শোনো, বারে-বারে শোনো, এক জানার নাম জ্ঞান, অনেক জানার নাম অজ্ঞান। চৈতন্যদেব দাক্ষিণ দেশে ভ্রমণের সময় দেখলেন একজন গীতা পাঠ করছে, আর একজন একটু দূরে বসে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। চৈতন্যদেব তাকে জিগগেস করলেন, তুমি এ সব কিছু বুঝতে পারছ? সে বললে, ঠাকুর, আমি শ্লোক কিছুই বুঝতে পারছি না, আমি অর্জুনের রথ দেখতে পাচ্ছি আর তার সামনে ঠাকুর আর অর্জুন কথা কইছেন।

জানতেও বই লাগে না, চিনতেও বই লাগে না। অক্ষরজ্ঞান ছাড়াও সম্ভব সে অক্ষর-জ্ঞান।

কলকাতা যাবার পথে বিষ্ণুপুর ইস্টিশানে গাড়ির অপেক্ষা করছেন শ্রীমা। হঠাৎ এক হিন্দুস্থানী কুলি তাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এল। কাঁদতে-কাঁদতে লুটিয়ে পড়ল পায়ের কাছে। বললে, 'তু মেরী জানকী, তুঝে ম্যায় নে কিতনে দিনোঁসে খোঁজা থা। ইতনে রোজ তু কাঁহা থী?'

তুই আমার মা জানকী। তোকে কত দিন ধরে খুঁজছি। তুই এত দিন কোথায় ছিলি?

মা তাকে শান্ত করলেন। বললেন, একটি ফুল নিয়ে আয়। ফুল নিয়ে কি করতে হবে বলে দিতে হল না কুলিকে। মা'র পাদপদ্মে নিবেদন করলে। মা তাকে দিয়ে দিলেন ইষ্টমন্ত্র।

কেশবেরও বড় সাধ রামকৃষ্ণের পা দুখানি ফুল দিয়ে পুজো করে। কিন্তু পাড়ার লোক, দলের লোক কি ভাববে এই ভেবে সাহস পায় না।

সেদিন রামকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা হচ্ছিল কেশবের।

কেশব বললে, আরো বলুন।

রামকৃষ্ণ হেসে বললেন, 'আর বললে দলটল থাকবে না।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কেশব। বললে, 'তবে আর থাক মশাই।'

এই দল-দল করতেই দলা পাকিয়ে গেল। তুমি দল-দল করছ আর এদিকে তোমার দল থেকে লোক ভেঙে-ভেঙে যাচ্ছে।

'আর বলেন কেন মশাই। তিন বছর এ দলে থেকে আবার ও দলে চলে গেল। যাবার সময় আবার গালাগাল দিয়ে গেল—'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তুমি লক্ষণ দেখ না কেন? যাকে-তাকে চেলা করলে কি হয়?'

যতক্ষণ মোড়লি করছ ততক্ষণ মা আসে না। মা ভাবে ছেলে আমার মোড়ল হয়ে বেশ আছে। আছে তো থাক।

যে ভাবছে, আমি দলপতি, দল করেছি, লোকশিক্ষা দিচ্ছি, সে কাঁচা আমি। ঘি কাঁচা থাকলেই কলকলানি করে। মধু যতক্ষণ না পায় ততক্ষণই ভনভনানি করে মাছি। তুমি এখন ও সব ছাড়ো। পাকা ঘি, পাকা আমি হও। সালিশি মোড়লি তো অনেক করলে, এখন তাঁর পাদপদ্মে বেশি করে মন দাও। বলে, কার দল কে করে। দল ভাঙে তো তোমার কি। বলে, লঙ্কায় রাবণ মলো, বেহুলা কেঁদে আকুল হলো। তুমি দলে নও, তুমি শতদলে।

কিন্তু কিছুতেই পুরোপুরি হয় না কেশবের। সিদ্ধি মুখে নিয়ে শুধু কুলকুচোই করলে, পেটে ঢোকালে না। পেটে ঢোকালে কি নেশা হবে? অহেতুকী ভক্তি না হলে কি মিলবে ভগবানকে?

কেশব উপাসনা করছে। বলছে, হে ঈশ্বর, তোমার ভক্তিনদীতে যেন ডুবে যাই। রামকৃষ্ণ বললেন, 'ওগো, তুমি ভক্তিতে ডুবে যাবে কি করে? ডুবে গেলে চিকের ভেতর যারা আছে তাদের হবে কি! বেশি দূর এগোতে চেও না—বেশি এগোতে গেলে সংসার-টংসার ফক্কা হয়ে যাবে। তবে এক কর্ম করো। মাঝে মাঝে ডুব দিয়ো, আর এক-একবার আড়ায় উঠো।'

রামকৃষ্ণকে বাড়িতে নিয়ে এসেছে কেশব। অনেক ফুল নিয়ে এসেছে। অনেক ফুল দিয়ে পুজা করবে রামকৃষ্ণকে। প্রাণ ঢেলে পুজা করবে। তাই করলে কেশব। কিন্তু—কিন্তু পুজা করবার আগে ঘরের দরজা বন্ধ করলে। বন্ধ করলে, পাছে তার পাড়ার লোক, তার দলের লোক টের পায়।

মনে মনে হাসলেন রামকৃষ্ণ। বললেন, 'ও যেমন দরজা বন্ধ করে পুজা করলে, তেমনি ওর দরজাও বন্ধ থাকবে!'

কিন্তু বিজয়? মুক্ত অঙ্গনে সকলের চোখের সামনে ঠাকুরের পাদমূলে লুটিয়ে পড়ল। ঠাকুরের পা দুখানি ধরলে নিজের বুকের মধ্যে। রক্তমাখা প্রাণপুষ্প অর্ঘ্য দিলে ঠাকুরকে।

মহিমা চক্রবর্তী জিগগেস করলে, 'বহু তীর্থ করে এলেন, দেখে এলেন অনেক দেশ, এখন এখানে কী দেখলেন বলুন।'

'কি বলবো।' অশ্রুভরভর বিজয়ের কণ্ঠস্বর : 'দেখছি, যেখানে এখন বসে আছি, এখানেই সব। কেবল মিছে ঘোরা। কোনো-কোনো জায়গায় এরই এক আনা, দু আনা, বড় জোর চার আনা—এই পর্যন্ত। এখানেই পূর্ণ ষোলো আনা দেখছি।' 'দেখ বিজয়ের কি অবস্থা হয়েছে। লক্ষণ সব বদলে গেছে। যেন সব আউটে গেছে। আমি পরমহংসের ঘাড় ও কপাল দেখে চিনতে পারি। বলতে পারি পরমহংস কিনা।'

নিজের কথা শুনবে না বিজয়। পরের কথা, একের কথা, প্রত্যক্ষের কথা শুনবে। বললে, 'এখানেই ষোলো আনা।'

কেদার বললে, 'অন্য জায়গায় খেতে পাই না—এখানে এসে পেটভরা পেলুম।' মহিমা বললে, 'পেটভরা কি! উপছে পড়ছে।'

হাত জোড় করল বিজয়। বললে, 'বুঝেছি আপনি কে। আর বলতে হবে না।' ভাবারূঢ় অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'যদি তা হয়ে থাকে তো তাই।'

॥ ৮২ ॥

রংগন আর জুঁই ফুল দিয়ে মালা গেঁথেছে সারদা। সাত-নহর গোড়ে মালা। বিকেল বেলা গেঁথে পাথরের বাটিতে জল দিয়ে রাখতেই কুঁড়ি-গুলি ফুটে উঠেছে। মন্দিরে পাঠিয়ে দিল। জগদম্বার গলার গয়না খুলে রেখে পরান হল ফুলের মালা। রামকৃষ্ণ দেখতে এসেছে ভবতারিণীকে! আহা এ কি রূপ! একদিকে নিকষের মতো কালো আকাশ, তার গায়ে সূর্যোদয়ের ছিটে-লাগা সাদা সমুদ্রের ঢেউ। ভাবে একেবারে বিভোর রামকৃষ্ণ। সেই যে ছ-বছর বয়সে প্রথমে দেখেছিল সরু আল-পথ দিয়ে মাঠে যেতে-যেতে। কাজল কালো আকাশের কোলে সিতপক্ষ বকের বলাকা।

'আহা, কালো রঙে কী সুন্দরই মানিয়েছে!'

যেন জীবন-মৃত্যুর কোলাকুলি। মাঝখানে ঈশ্বরানুরাগের রক্তিমা।

'কে গেঁথেছে রে এমন মালা?' চারদিকে তাকালো রামকৃষ্ণ।

'আর কে!' পাশে ছিল বৃন্দে-ঝি, টিপ্পনি কাটল।

রামকৃষ্ণের বুঝতে আর বাকি নেই, কে! সে ছাড়া আর কার এমন শুভ্রতা, কার এমন চিকণ-গাঁথন। ভক্তির সুগন্ধে গদ গদ হয়ে আছে সারল্যের হাসিটি।

'আহা, তাকে একবার ডেকে নিয়ে এস।' স্নেহের আনন্দে উছলে উঠল রামকৃষ্ণ। 'মালা পরে মায়ের কি রূপ খুলেছে একবার দেখে যাক।'

বৃন্দে-ঝি ডাকতে গেল সারদাকে। লজ্জায় জড়িপটি খেয়ে গেল। মন্দিরে কেউ আর নেই তো এ সময়? নেই। তা ছাড়া ঠাকুর যখন ডেকেছেন—

কিন্তু মন্দিরের কাছে আসতেই দেখল সুরেশ মিত্তির, বলরাম বোস, আরো কে কে, আসছে এদিকে। হয়েছে! এখন তবে কোথায় যাই! কোথায় লুকোই। বুন্দের আঁচল টেনে ধরে তাড়াতাড়ি নিজেকে ঢাকা দিল সারদা। কোনো রকমে একটা আড়াল রচনা করে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেল। আশ্চর্য, ঠিক নজর রেখেছে রামকৃষ্ণ। বলে উঠল, 'ওগো ওদিক দিয়ে উঠো না। সেদিন এক মেছুনি উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মরেছে। সামনের দিক দিয়েই এস।'

বলরাম বাবুরা সরে দাঁড়ালো। সারদা উঠে দাঁড়ালো। ভাবে-প্রেমে গান ধরল রামকৃষ্ণ।

সেবার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে সত্যি-সত্যিই কিন্তু পড়ে গিয়েছিলেন শ্রীমা। দুধের বাটি নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন—বাটিতে আড়াই সের দুধ। ঠাকুরের তখন অসুখ, আছেন কাশীপুরের বাড়িতে। হঠাৎ কি হল, মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন শ্রীমা। দুধ তো গেলই, পায়ের গোড়ালির হাড় সরে গেল। নরেন আর বাবুরাম কাছে পিঠে কোথাও ছিল, ছুটে এসে ধরলে মাকে।

ঠাকুর তখন মণ্ড খান। সে মণ্ড তৈরি করে দেন শ্রীমা। রোজ উপরের ঘরে গিয়ে খাইয়ে আসেন ঠাকুরকে।

'এখন তবে কে আমার মন্ড রাঁধবে? কে খাইয়ে দেবে?'

শ্রীমা'র পা বিষম ফুলে উঠেছে, নিদারুণ যন্ত্রণা। ওঠা-চলা সম্ভবের বাইরে। গোলাপ-মা রেঁধে দিচ্ছে মণ্ড। নরেন খাইয়ে দিচ্ছে নিজের হাতে।

একদিন বাবুরামকে নিজের কাছটিতে ডেকে আনলেন ঠাকুর। নিজের নাকের কাছে হাত ঘুরিয়ে ঠারে-ঠোরে বললেন, 'ওকে একবারটি এখানে নিয়ে আসতে পারিস?' বাবুরাম তো অবাক। পা ফেলতে পারেন না মাটিতে, সিঁড়ি বেয়ে আসবেন কি করে উপরে?

ঠাকুর পরিহাস করে বললেন, 'একটা ঝুড়ির মধ্যে ওকে বসিয়ে দিব্যি মাথায় করে তুলে নিয়ে আসবি।'

নরেন আর বাবুরাম উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।

ব্যাথাটা একটু কম পড়তেই উঠে দাঁড়ালেন শ্রীমা। নরেন-বাবুরামকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমাকে তোমরা ধরে-ধরে নিয়ে যাও উপরে। হ্যাঁ, খুব পারব আমি। ওঁকে নিজের হাতে খাইয়ে আসি।'

বাবুরাম আর নরেন মাকে নিয়ে চলল ধরে-ধরে।

কিন্তু সেবার যখন ঠাকুরের হাত ভেঙেছিল তখন কী হয়েছিল?

জগন্নাথকে মধুর ভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়েই ঠাকুর পড়ে গেলেন। ভেঙে গেল বাঁ-হাত। এর দু-একদিন আগেই সারদামণি ফিরেছে দেশ থেকে। দক্ষিণেশ্বরে ফিরতে না ফিরতেই এই অঘটন।

'কবে রওনা হয়েছিলে?' জিগ্‌গেস করলেন ঠাকুর।

'বেস্পতিবার।'

'বেলা তখন কত?'

হিসেব করে দেখা গেল, বারবেলা।

আর কথা নেই। ঠাকুর বললেন দৃঢ়স্বরে, 'বিষ্যুৎবারের বারবেলায় রওনা হয়ে এসেছ বলেই আমার হাত ভেঙেছে। যাও, যাত্রা বদলে এস।'

আর কথাটি নেই। সারদা ফিরে চলল দেশে। যাত্রা বদলে আসতে।

তুমি যেমন বলো তেমনি চলি। তোমার যাতে আরাম তাতেই আমার আনন্দ। বৃক্ষ হয়ে যদি বসতে বলো, বসি। আকাশ হয়ে যদি বলো ওড়ো, উড়ে বেড়াই। বৃক্ষ আর আকাশ, দুইই আমার আশ্রয়।

মথুরবাবুর দেওয়া পিঁড়িতে রামকৃষ্ণ বসে আর সারদা তার গায়ে তেল মাখিয়ে দেয়। সারদা তন্ময় হয়ে দেখে, গা থেকে যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে। আর কী রঙ! যেন হরিতালের মত! বাহুতে সোনার ইষ্টকবচ, তার সঙ্গে গায়ের রঙ যেন মিশে গেছে।

ঠাকুর তখন দেহ রেখেছেন, ঠাকুরের ইষ্টকবচ তখন শ্রীমা'র হাতে। ট্রেনে বৃন্দাবন যাচ্ছেন শ্রীমা, দেখতে পেলেন জানলার বাইরে ঠাকুর দাঁড়িয়ে। শুধু দাঁড়িয়ে নয়, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছেন ভিতরে। বলছেন, 'কবচটি যে সঙ্গে-সঙ্গে রেখেছ, দেখো যেন না হারায়।'

মার যে হাতখানিতে কবচ ছিল তা বোধ হয় জানলার উপরে অনাবৃত ছিল। দেখতে পেয়ে ঠাকুর তাই সাবধান করে দিলেন।

আগে একবার সত্যিই গিয়েছিল হারিয়ে। সেই কবচ পুজো করতেন শ্রীমা। একবার ঠাকুরের এক তিথিপুজার দিন ফুল-বেলপাতার সঙ্গে তাকেও ফেলে দিয়েছিল গঙ্গায়। কারুর খেয়াল ছিল না। কিন্তু যাঁর কবচ তাঁর খেয়াল আছে। ভাঁটায় জল যখন কমে গেল, তখন গঙ্গার পারে খেলতে গেল হৃষি, বলরামের ছেলে। দিব্যি পেয়ে গেল ইষ্টকবচ।

যা হারাবার নয়, তা কে হরণ করে? নিশীথ রাত্রে নিজের হাতে যদি ঘরের আলো নিবিয়েও ফেলি, বাইরে চেয়ে দেখি ধ্রুবতারার জ্যোতিটি তুমি ঠিক জ্বেলে রেখেছ!

পরনে ছোট তেল-ধুতি, থস-থস করে গঙ্গায় নাইতে যায় রামকৃষ্ণ। কাচের উপর রোদ লেগে যেমন ঠিকরে পড়ে তেমনি তার গা থেকে একটা আভা ছিটকে পড়ছে চারদিকে। যে দেখে তারই আর পলক পড়ে না।

রামকৃষ্ণের জন্যে রাঁধে সারদা। যদিও পরিহাস করে বলে, শ্রীনাথ হাতুড়ে, তবু সারদার রান্নাটিতেই রামকৃষ্ণের অন্তরের রুচি। সজনে খাড়া বা পলতা শাক যেটি যখন রাঁধে সারদা, সেটিই একান্ত মনের মতন হয়ে ওঠে। স্বাদ আর পুষ্টির স্বাভাবিক মিতালি। রাত্রে দু-একখানি লুচি আর একটু সুজির পায়েস। কাশীপুরে তুলোর মতন নরম করে মাংসও রেঁধে দিয়েছেন শ্রীমা।

'আমি যখন ঠাকুরের জন্যে রাঁধতুম কাশীপুরে, কাঁচা জলে মাংস দিতুম। কখনো তেজপাতা আর অল্প খানিকটা মশলা। তুলোর মতন সেদ্ধ হলে নামিয়ে নিতুম।'

থালার উপর টিপে-টিপে ভাত বেড়ে দেয় সারদা। যাতে একটু কম দেখায়। বেশি ভাত দেখলে আঁতকে ওঠে রামকৃষ্ণ। তাই সরুটি করে দেয় টিপে-টিপে। দুধের বেলায়ও তাই। আধ সের করে রোজ-বাঁধা। কখনো-সখনো একটু বেশি দিয়ে

যায় গয়লা ! সেটাকে ফুটিয়ে ঘন করে রাখে। সর করে। সর ভালোবাসে রামকৃষ্ণ। এমনি করে ভুলিয়ে-ভুলিয়ে খাওয়ায় সেই সদানন্দ শিশুকে। কিন্তু কিছুতেই লোভ নেই সেই শিশুর। একদিন একটা সন্দেশ মুখে পুরে দিতে গিয়েছিল সারদা, রামকৃষ্ণ বললে, 'ওতে আর কি আছে ? সন্দেশও যা মাটিও তা।'

শুধু নারকেলের নাড়ু আর জিলিপির উপর একটু পক্ষপাত।

'ঠাকুর নারকেলের নাড়ু ভালোবাসতেন।' এক স্ত্রী-ভক্তকে বললেন একদিন শ্রীমা : 'দেশে গিয়ে তাই করে তাঁকে ভোগ দেবে।'

আর জিলিপি ?

কেশব সেনের বাড়িতে খেতে বসেছেন ঠাকুর। খাওয়া হয়ে গিয়েছে—হাত তুলে বসেছেন পাত থেকে। আর খাবেন না, শত সাধাসাধি করলেও না। এমন সময় জিলিপি এসে উপস্থিত। আর যায় কোথা ! ঠাকুর তুলে নিলেন জিলিপি।

এ হচ্ছে বড়লাটের গাড়ি। ঠাকুর প্রসন্ন চোখে হাসলেন। বড়লাটের গাড়ি দেখলে রাস্তা যেমন ফাঁকা হয়ে যায় তেমনি জিলিপি দেখে ভরা পেট হালকা হয়ে যাচ্ছে। জিলিপির সঙ্গে কার কথা ! জিলিপি হচ্ছে অমৃতের লিপি। সেই শিশু-কালের অকৃত্রিম সুস্বাদের সংবাদ। সেই কামারপুকুরের সত্য-ময়রার দোকান।

খাবার জায়গা হয়েছে রামকৃষ্ণের। নহবত থেকে থালা হাতে নিয়ে আসছে সারদা। ভক্তরা সব এখন সরে যাও। সিঁড়ি থেকে বারান্দায় পা দিয়েছে, কোত্থেকে এক মেয়ে-ভক্ত হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল। 'দাও মা আমাকে দাও।' বলে প্রায় জোর করেই সারদার হাত থেকে টেনে নিল থালা। রামকৃষ্ণের আসনের কাছে ধরে দিয়ে সরে গেল। সারদা বসল এক পাশে। রোজ এমনিই এসে বসে। রামকৃষ্ণের খাওয়া দেখে। খেয়ে যে স্বাদ রামকৃষ্ণ পায় তারও চেয়ে সারদা অধিকতর পায় না-খেয়ে।

'তুমি এ কি করলে ?' আসনে বসেই বললে রামকৃষ্ণ, 'আমার খাবার নিজে না নিয়ে ওর হাতে দিলে কেন ? তুমি কি ওকে জানো না ?'

একটা কলঙ্ক ছিল মেয়েটির। সারদা বললে, 'জানি।'

'জানো তো দিলে কেন ? এখন আমি খাই কি করে ?'

মেয়েটির হাতের সেই আকুলতাটি বুঝি মনে পড়ল সারদার। বললে, 'আজকে খাও।'

'তবে বলো, আর কোনো দিন আর কারু হাতে দেবে না আমার খাবার ?'

সারদা জোড় হাত করল। বললে, 'ওটি আমি পারব না। যে কেউ চাইলেই আমি ছেড়ে দেব ভাতের থালা।'

করুণাময়ীর এ আরেক অমৃত-পরিবেশন। আমার ভালোবাসার সঙ্গে আর যদি কেউ তার ভক্তির স্বাদটি মিশিয়ে দিতে চায় তা আমি বারণ করি কি করে ?

'তবে চেষ্টা করব খুব।' সারদা বললে গাঢ়স্বরে, 'যাতে আমিই বরাবর নিজের হাতে নিয়ে আসতে পারি।' খুশি মনে খেতে লাগল রামকৃষ্ণ।

কাশীপুরে ঠাকুরের জন্যে শামুকের ঝোল ব্যবস্থা হল। ঠাকুরের ইচ্ছে শ্রীমাই তা রান্না করুন। শ্রীমা বললেন, 'ও আমি পারব না।'

'কেন কি হল ?'

'ওগুলো জীয়ন্ত প্রাণী, চলে বেড়ায়। ওদের মাথা আমি ইট দিয়ে ছেঁচতে পারব না।'

'সে কি ? আমি খাব, আমার জন্যে করবে !'

'তখন, কি আর করা, রোক করে কয়তে লাগলেন শ্রীমা।

'মা, ঠাকুরকে অন্ন ভোগ দেব কি ?' জিগগেস করলেন এক স্ত্রী-ভক্ত।

'হ্যাঁ, দেবে বৈ কি। তিনি শুকতো খেতে ভালোবাসেন। গাঁদাল, ডুমুর, কাঁচকলা—'

'মাছ ভোগ দেব কি ?' কুণ্ঠা-ভরা জিজ্ঞাসা মেয়েটির।

'হ্যাঁ, তাও দেবে। তিনি সেদ্ধ চালের ভাত খেতেন, মাছও খেতেন। অন্তত শনি-মঙ্গলবারে মাছ ভোগ দেবে। আর যেমন করে হোক তিন তরকারি ছাড়া ভোগ দেবে না—'

তারপরে পান সাজে সারদা। রামকৃষ্ণের মশলা-এলাচ লাগে না। সাদাসিধে সাজা পানেই অন্তরঙ্গ স্বাদ। পান সাজছে নহবতে বসে। কতগুলো বেশ ভালো করে এলাচ-মশলা দিয়ে, কতগুলো শুধু শুপুরি-চুন দিয়েই। যোগেন বসে ছিল পাশে। জিগগেস করলে, 'কই এগুলোতে মশলা-এলাচ দিলে না ? ওগুলো বা কার, এগুলোই বা কার ?'

সারদা বললে, 'যেগুলো ভালো, এলাচ-দেওয়া সেগুলো ভক্তদের। ওদের আপনার করে নিতে হবে, তাই একটু আদর-যত্নের ছিটেফোঁটা ওগুলোতে। আর এলাচ-মশলা ছাড়া এগুলো—এগুলো ওঁর জন্যে। উনি তো আপনার আছেনই।'

তোমাকে ভালো ভাষায় ভোলাব না, তোমাকে ভালোবাসায় ভোলাব। তোমার জন্যে আমার কোনো সাজ-সজ্জা নেই, আমার এই সারল্যটুকুই আমার একমাত্র ভূষণ। আমার তো ঘোষণা নয়, আমার আহ্বান। অকপট না হলে তোমার কপাটপাটন হবে না যে।

আহারান্তে রামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে এসে বসে। তামাক খায়। সারদা এসে পা টেপে। শেষকালে, সারদার চলে যাবার আগে সারদাকে আবার প্রণাম করে রামকৃষ্ণ।

সন্ন্যাসী-স্বামীর একটি পরিত্যক্তা স্ত্রী এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। একটু সাজগোজ করতে চায় বলে তার উপর তার শাশুড়ির বড় কড়া শাসন। শ্রীমা তাই বলছেন দুঃখ করে : 'আহা ছেলেমানুষ বৌ, তার একটু পরতে-খেতে ইচ্ছে হয় না ? একটু আলতা পরেছে তা আর কি হয়েছে ? আহা, ওরা তো স্বামীকে চোখেই দেখতে পায় না—স্বামী সন্ন্যাস নিয়েছে। আমি তো তবু চোখে দেখেছি, সেবা-যত্ন করেছি, রেঁধে খাওয়াতে পেরেছি, যখন বলেছেন যেতে পেয়েছি কাছে, যখন বলেননি, দু'মাস পর্যন্ত নামিইনি নবত থেকে। দূর থেকে দেখে পেন্নাম করেছি—'

সাজতে সারদাও ভালোবাসে।

'কেন বাসবে না ? ওরে, ওর নাম সারদা, ও সরস্বতী। তাই তো ভালোবাসে সাজতে।' বললে রামকৃষ্ণ। নিজে টাকা-কড়ি ছুঁতে পারে না, তাই ডাকালো হৃদয়কে। 'দ্যাখ তো, তোর সিন্দুকে কত টাকা আছে। ওকে ভালো করে দু ছড়া তাবিজ গড়িয়ে দে।' সিন্দুক থেকে তিনশো টাকা বেরুলো। তাই দিয়ে তাবিজ

হল সারদার। রামকৃষ্ণের মাইনে নিয়ে হিসেবে কি গোল করেছিল খাজাঞ্চি। কম দিয়েছিল। তাই নিয়ে একদিন বললে সারদা, 'খাজাঞ্চিকে গিয়ে বলো না—'

রামকৃষ্ণ বললে, 'ছি-ছি, হিসেব করব ?'

হিসেব পচে যায়।

এদিকে সর্বস্বত্যাগী, অথচ সারদার জন্যে ভাবনা। একদিন তাকে জিগ্গেস করলে রামকৃষ্ণ, 'তোমার ক'টাকা হলে হাতখরচ চলে ?'

মুখ নামালো সারদা, বললে, 'পাঁচ-ছ টাকা হলেই চলে।'

তারপর, হঠাৎ আরেক অদ্ভুত জিজ্ঞাসা : 'বিকেলে কখানা রুটি খাও ?'

এবার লজ্জায় আর বাঁচে না সারদা। কি করে বলি ! এ কি একটা বলবার মত কথা ! কিন্তু রামকৃষ্ণ ছাড়ে না। জিগ্গেস করে বারে-বারে। মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে সারদা বললে, 'এই পাঁচ-ছখানা খাই।'

তারপর আরো একটু অন্তরঙ্গ হয় রামকৃষ্ণ। বলে, 'বুনো পাখি খাঁচায় রাতদিন থাকলে বেতে যায়। মাঝে-মাঝে পাড়ায় বেড়াতে যাবে।'

একদিন ক'টা পাট এনে দিলে সারদাকে। বললে, 'এগুলি দিয়ে আমাকে শিকে পাকিয়ে দাও। আমি সন্দেশ রাখব লুচি রাখব ছেলেদের জন্যে।'

সারদা শিকে পাকিয়ে দিল। ফেঁসোগুলো দিয়ে থান ফেলে বালিশ করলে।

কোনো জিনিস অপচয় হতে দেয় না সারদা ! যত সামান্য জিনিস হোক, যত্ন করে রেখে দেয়, কাজে লাগায়। বলে সেই অপূর্ব কথা : 'যাকে রাখো সেই রাখে।' পটপটে মাদুর পেতে ফেঁসোর বালিশে মাথা রেখে সারদা শোয়। দিব্যি ঘুম আসে। পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, সারদার জন্যে বড় ভাবনা রামকৃষ্ণের। কোথায় না জানি শৌচে যাবে, নিন্দে করবে লোকে, তখন ভারি লজ্জা পাবে বেচারী ! কিন্তু আশ্চর্য, কখন যে কি করে, কাকপক্ষীও টের পায় না।

'বাইরে যেতে আমিও কখনো দেখলুম না।' বলে ফেলল রামকৃষ্ণ।

কথাটা সারদার কানে যেতেই মুখ শুকিয়ে গেল। ওমা, এখন কী হবে ! ঠাকুর যা মনে-মনে চান তাই-ই মা ওঁকে দেখিয়ে দেন। এখন তো তবে এক দিন তাঁর চোখে ঠিক ধরা পড়ে যাব ! এখন উপায় ? আকুল হয়ে ভবতারিণীকে ডাকতে লাগল সারদা। 'হে মা, আমার লজ্জা রক্ষা করো।'

এমন মা, বিপন্না মেয়ের দায় মোচন করলে। দুই পাখা দিয়ে ঢেকে রাখল মেয়েকে। কত বছর ধরে আছে সারদা, এক দিনও কারু সামনে পড়ল না।

রাত তিনটের সময় উঠে জপে বসে। জপে বসে আর কোনো হুঁশ থাকে না। সেদিন জ্যোৎস্না রাত, নহবতে সিঁড়ির পাশে বসে জপ করছে সারদা। চারদিকে রুদ্ধশ্বাস স্তব্ধতা। ধ্যান খুব জমে গিয়েছে। ঠাকুর কখন বটতলায় গেছেন টেরও পায়নি। অন্য দিন জুতোর শব্দে টের পায়, আজ তাও নয়। লালপেড়ে শাড়ির আঁচল খসে বাতাসে উড়ে-উড়ে পড়ছে, খেয়াল নেই। তন্ময়তার প্রতিমূর্তি।

যখন ধ্যান ভাঙল তাকালো চাঁদের দিকে। হাত জোড় করলে। বললে, 'তোমার ঐ জ্যোৎস্নার মত আমার অন্তর নির্মল করে দাও।'

'আজ নরেন এখানে খাবে।' ঠাকুর বললেন এসে নহবতে। 'বেশ ভালো করে রাঁধো।' মুগের ডাল আর রুটি করল সারদা। তাই খেল নরেন এক পেট। খাবার পর ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'ওরে কেমন খেলি ?'

'বেশ খেলুম। যেন রুগীর পথ্য।'

ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। নহবতের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললেন, 'ওকে ওসব কি রেঁধে দিয়েছ ? ওর জন্যে ছোলার ডাল আর মোটা-মোটা রুটি করে দেবে।'

তাই আবার করে দিল সারদা। তাই আবার খেল নরেন।

'নরেনের হচ্ছে ব্যাটাছেলের ভাব। নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা! ও হচ্ছে পুরুষ-পায়রা। পুরুষ-পায়রার ঠোঁট ধরলে ঠোঁট টেনে ছিনিয়ে নেয়।'

কিন্তু মেয়ে-ভাব প্রকৃতি-ভাব কার ? বাবুরামের। ওর হচ্ছে প্রেমের ঘর।

কিন্তু নরেন আসে না কেন ? কেন দেখা দিয়ে আবার লুকিয়ে থাকে ?

নরেন আসেনি কিন্তু সেদিন বাবুরাম এসে উপস্থিত।

যখন পাঁচ বছর বয়েস তখন যদি কেউ বলত, 'তোর এমন বাবুর মত চেহারা, তোকে একটি টুকটুকে সুন্দরী বউ এনে দেব', অমনি কচি-কচি দুটি হাত নেড়ে অসম্মতি জানাত, 'ও কথা বোলো না—ম'য়ে যাব, ম'য়ে যাব।' সেই বাবুরাম।

বড় বোন কৃষ্ণভাবিনী। শ্যামবাজারের বলরাম বোসের স্ত্রী। ঠাকুরের রসদদার বলরাম বোস।

'যখন আসবে এখানকার জন্যে কিছু নিয়ে এস। শুধু হাতে আসতে নেই।' এ কথা এক দিন বলেছিলেন বলরামকে। আর যায় কোথা! প্রতি মাসে ডালা পাঠায় বলরাম।

কেশবও যখন আসে হাতে করে নিয়ে আসে। অন্তত একটি ফুল।

শ্যামবাজারে যদু পণ্ডিতের 'বঙ্গ বিদ্যালয়ে' ভর্তি হয়েছে বাবুরাম। থাকে খুড়োর বাড়িতে। পাঠশালায় সহপাঠী কালীপ্রসাদ। স্বামী অভেদানন্দ।

সেইখান থেকে চলে এসেছে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে। মাস্টারমশায়ের ইস্কুলে। ঠিক অঙ্কুরটি উড়ে এসে পড়েছে ঠিক মাঠটিতে।

গঙ্গাপারে সাধুসন্নেসী খুঁজে বেড়ায় বাবুরাম। কতই দেখে, কিন্তু মনের মতনটিকে দেখে না। যাকে দেখে আর জিগগেস করতে হয় না, এ কে—সেই জিজ্ঞাসাতীতকে।

ঘুণাক্ষরেও জানে না তেমন একজনকে দেখেছে তার ভগ্নিপতি। দেখেছে তার মা। এমন কি তার দাদা তুলসীরাম।

'কোথায় অমন সাধু খুঁজে বেড়াচ্ছিস ?' একদিন তাকে বললে তুলসীরাম। 'যদি সত্যিকার সাধু দেখতে চাস তবে দক্ষিণেশ্বরে যা! দেখে আয় রামকৃষ্ণদেবকে।'

রামকৃষ্ণের কথা শুনেছে বাবুরাম। পড়েছে খবরের কাগজে। জোড়াসাঁকোর এক হরিসভায় এক দিন বুঝি তাঁকে দেখেওছিল দূর থেকে। কিন্তু তাঁর কাছে যাই কেমন করে? কে নিয়ে যায়!

শুধু একবার মনে করো, যাবে, তিনিই ব্যবস্থা করে দেবেন। ছেলে যদি বাপের কাছে যেতে চায়, বাপ টাকা পাঠিয়ে দেয়, লোক পাঠিয়ে দেয়। তোমার কাছে যাব—একবার শুধু একটি খবর পাঠিয়ে দাও তাঁকে। আর দেখতে হবে না। তিনি পাঠিয়ে দেবেন যান-বাহন লোক-লস্কর টাকা পয়সা।

রাখালকে চিনত, তাকে বললে খুলে মনের কথা।

'আমি তো যাই প্রায়ই দক্ষিণেশ্বর।'

'আমাকে নিয়ে যাবে?' রাখালের হাত চেপে ধরল বাবুরাম।

কিন্তু যাবে কি করে? পায়ে হেঁটে না নৌকোয়? যাবে তো ফিরবে কি করে? যদি ফিরতে না পাও, খাবে কি? শোবে কোথায়? কোনো প্রশ্ন নিয়েই আর মাথা ঘামায় না বাবুরাম। ঠিকানা জানা হয়ে গেছে। ঠাকুর পাঠিয়ে দিয়েছেন দিশারী। শনিবার ইস্কুল ছুটি হলে দুই বন্ধু চলে এল হাটখোলার ঘাটে। রামদয়াল চক্রবর্তীও এসেছে দেখছি। হোরমিলার কোম্পানিতে চাকরি করে রামদয়াল, থাকে বলরামের বাড়িতে। সেও দক্ষিণেশ্বরের যাত্রী।

পৌঁছুতে সেই সন্ধে। ঠাকুর ঘরে নেই। রাখাল কখন চলে গেছে মন্দিরের দিকে। বাবুরামকে বসে থাকতে বলে গেছে, তাই বসে আছে বাবুরাম। বসে আছে প্রার্থনার মত। প্রসাদের জন্যে যে প্রতীক্ষা তাই প্রার্থনা। কতক্ষণ পরে রাখালের কাঁধে হাত রেখে ভাবাবিষ্ট ঠাকুর ঘরে ঢুকছেন। টলছেন মাতালের মত। হতবাকের মত তাকিয়ে রইল বাবুরাম। চোখের সামনে এ কে নয়নভুলানো!

ছোট খাটটিতে বসলেন ঠাকুর। রামদয়াল পরিচয় করিয়ে দিল।

'বলরামের আত্মীয়? তা হলে তো আমাদেরও আত্মীয়।' হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ডাকলেন বাবুরামকে। 'এসো তো, আলোয় এসো তো একটিবার, তোমার মুখখানি দেখি।'

ঘরের কোণে মিটমিটে একটি দীপ জ্বলছে। সেইখানে বাবুরামকে টেনে আনলেন ঠাকুর। বাবুরামের ভক্তিনম্র কিশোর মুখখানি দেখলেন একদৃষ্টে। বললেন, 'বাঃ, বেশ ছেলেটি তো!' পরে তার হাতখানি টেনে নিলেন তাঁর হাতের মধ্যে। ওজন নিলেন। বললেন, 'বেশ।'

বাবুরামকে দেখলাম—দেবীমূর্তি। গলার হার। সখী সঙ্গে। ওর দেহ শুদ্ধ —ওর হাত পর্যন্ত শুদ্ধ। একটা কিছু করলেই ওর হয়ে যাবে।

পরে একদিন বলেছিলেন ঠাকুর, 'দেহরক্ষার বড় অসুবিধে হচ্ছে। বাবুরাম এসে থাকলে ভালো হয়। নেটো তো চড়েই রয়েছে। ক্রমে লীন হবার যো। আর রাখাল? রাখালের এমন স্বভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে, আমাকেই তাকে জল দিতে হয়। আমার সেবা বড় সে আর করতে পারে না। তবে টানাটানি করে আসতে বলি না, বাড়িতে হাঙ্গামা হতে পারে। আমি যখন বলি চলে আয় না, তখন বেশ বলে, আপনি করে নিন না। রাখালকে দেখে কাঁদে, বলে বেশ আছে।'

তাই এক দিন যখন মাকে নিয়ে বাবুরাম গিয়েছে দক্ষিণেশ্বর, ঠাকুর বললেন মাতঙ্গিনী দেবীকে, 'তোমার এই ছেলেটি আমাকে দেবে ?'

মাতঙ্গিনী দেবী নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন। বললেন, 'এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।'

বাবুরামের দেহ-লক্ষণ পরীক্ষা করে ঠাকুর আবার বসলেন ছোট খাটে। হঠাৎ রামদয়ালকে লক্ষ্য করে বললেন স্নেহাকুল কণ্ঠে, 'ওগো নরেনের খবর জানো ? সে কেমন আছে ?'

'ভালো আছে।' বললে রামদয়াল।

'এখানে অনেক দিন আসে না। তাকে দেখতে বড় ইচ্ছে করছে। কেন আসে না—এক দিন আসতে বোলো।'

কানু ছাড়া গীত নেই, ঈশ্বর ছাড়া কথা নেই। কথায়-কথায় রাত দশটা বেজে গেল। অমৃতময়ী কথা।

নারদকে রাম বললেন, তুমি আমার কাছে কিছু বর নাও। নারদ বললেন, রাম, আমার আর কি বাকি আছে ? কি বর নেব ? তবে যদি একান্তই দেবে, এই বর দাও যেন তোমার পাদপদ্মে শ্রদ্ধাভক্তি থাকে, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। রাম বললেন, নারদ, আর কিছু বর নাও। নারদ আবার বললেন, রাম আর কিছু চাই না, যেন তোমার পাদপদ্মে শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকে এই করো।

যেখানে ভক্তি সেখানেই ভগবান।

লক্ষ্মণ রামকে জিগগেস করলেন, রাম, তুমি কত ভাবে কত রূপে থাকো, কিরূপে তোমায় চিনতে পারব ? রাম বললেন, ভাই, একটা কথা জেনে রাখো। যেখানে উর্জিতা ভক্তি, সেখানে নিশ্চয়ই আমি আছি। উর্জিতা ভক্তিতে হাসে কাঁদে নাচে গায়। যদি কারু এরূপ ভক্তি হয় নিশ্চয় জেনো সেখানে ভগবানের আবির্ভাব।

ঠাকুরের তো সেই অবস্থা। প্রেমে হাসে কাঁদে নাচে গায়। তবে কি এইখানেই ঈশ্বরসাক্ষাৎ ? বাবুরামকে ঠাকুর যখন আত্মীয় বললেন তখন তার মানে কি বাবুরাম ঠাকুরের ভক্ত ? অন্তরঙ্গদের একজন ?

রাত দশটা বেজে গেছে। ঠাকুর বললেন, এবার খেয়ে নাও সকলে।

রামদয়াল আর বাবুরাম বারান্দায় শুলো। রাখাল ঠাকুরের সঙ্গে এক ঘরে।

শয়ন যেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম এই শুধু মনে হতে লাগল বাবুরামের। যেন বা মাতৃঅঙ্কে মাথা রেখে শিশুর মতো ঘুমিয়ে আছে। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে নিগূঢ় শান্তি। যেন কোন গভীরের দেশে এসে সহজ বিশ্রাম পেয়েছে আজ।

'ওগো ঘুমুলে ?'

অতন্দ্র মধ্যরাত্রিই হঠাৎ করুণ স্বরে কেঁদে উঠল নাকি ?

বাবুরাম চোখ চাইল, দেখল ঠাকুর। বালকের মত পরনের কাপড়খানি বগলের নিচে ধরা। রামদয়ালের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে ডাকছেন।

দুজনে ঘুম ফেলে উঠে বসল। বললে, 'আজ্ঞে না, ঘুমুইনি।'

'ওগো আমার ঘুম আসছে না। নরেনের জন্যে আমার প্রাণের ভেতরটা মোচড়

দিচ্ছে। যেন জোরে কে গামছা নিংড়োচ্ছে বুকের মধ্যে। তাকে একবার নিয়ে আসতে পারো ?'

'আজ্ঞে, ভোর হোক। ভোর হলেই তাকে আমি সংবাদ দেবো।' বললে রামদয়াল।

'তাই কোরো। শুধু একবারটি একটু চোখের দেখা। তাকে মাঝে-মাঝে না দেখলে থাকতে পারি না।'

এই বুঝি ভগবানের কান্না। বাবুরাম দেখতে লাগল, শুনতে লাগল। ভক্তই শুধু ভগবানের জন্যে কাঁদে না, ভগবানও বিনিদ্র রাত্রি জেগে ভক্তের জন্যে অশ্রুবর্ষণ করে। ভক্ত না থাকলে ভগবানও অনর্থক। যিনি কবি তাঁর একটি রসিক পাঠক চাই। এই রসিকটি না থাকলে সমস্ত রসসমুদ্রই শুষ্ক। সমস্ত কবিতাই মাটি।

শুধু ভগবান নন ভক্তও কঠোর হতে জানে। আর সেই ভক্তকে দ্রবীভূত করবার জন্যে ভগবানের এই বিগলিত কান্না।

বাবুরাম ভাবতে লাগল, কী নিষ্ঠুর না-জানি এই নরেন্দ্রনাথ !

শুধু কি এক দিন না এক রাত্রি ? ভালোবাসার কি দিন-রাত্রি আছে ? কান্নার কি ক্ষান্তি আছে কোনো কালে ? এক দিন শেষে মা'র মন্দিরে গিয়ে ধন্না দিলেন। মা গো, তাকে এনে দে। তাকে না দেখে যে থাকতে পাচ্ছি না।

ঠাকুরের কান্নার রোল ঘরের মধ্যে বসে শুনতে পাচ্ছে ভক্তেরা। পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে। একটা পরের ছেলের জন্যে এমন করে কাঁদতে-পারে কেউ ? মা গো, এক কালে তোর জন্যে কেঁদেছিলাম, এখন নরেনের জন্য কাঁদছি। তুই দেখা দিলি আর নরেন দেখা দেবে না ? আমার এই কান্নার ডাকটি তার কানে পেঁছে দে মা। তুই পাষাণ হয়ে শুনতে পেলি আর ও রক্তমাংসের মানুষ হয়ে শুনতে পাবে না ?

আবার ভক্তদের মধ্যে এসে বসেন ঠাকুর। বলেন, 'এত কাঁদলাম কিন্তু নরেন্দ্র তো এলো না ! সে এত বোঝে আর আমার প্রাণের টানটাই বোঝে না !'

আবার ঘরের বাইরে গিয়ে কান পাতেন ! ঐ বুঝি শোনা যাচ্ছে তার পায়ের শব্দ। তার দরাজ গলার কলস্বর।

কোথাও কিছু নেই। তখন নিজেকেই নিজে উপহাস করেন ঠাকুর। 'বুড়ো মিনসে, পরের একটা ছেলের জন্যে এমনি কাঁদছি, লোকে দেখলে কী বলবে বলো দেখি ? তোমরা আপনার লোক, তোমাদের কাছে না-হয় লজ্জা নেই, কিন্তু অন্যে কী বলবে ? অন্যে কী বলবে ভেবেও তো সামলাতে পাচ্ছি না।'

সেবার ঠাকুরের জন্মোৎসব করছে ভক্তরা। নতুন সাজে সাজিয়েছে ঠাকুরকে। চন্দন-চর্চিত পুষ্পমাল্য দুলিয়ে দিয়েছে গলায়। আনন্দের হাটবাজার বসে গিয়েছে চারদিকে। রাম দত্ত প্রসাদ বিলোচ্ছে। গোষ্ঠমিলন গান শুরু হবে এবার।

কিন্তু ঠাকুর মাঝে-মাঝে একটা বিষণ্ণতার রেখা টানছেন। 'তাই তো, নরেন্দ্র এখনো এলো না।'

নরোত্তম কীর্তন গাইছে। যার কীর্তন তিনি মাঝে-মাঝে আখর দিচ্ছেন। মাঝে-মাঝে আবার তা কান্নার আখর। 'কই, নরেন্দ্র কই ?'

নরেন্দ্র ছাড়া সমস্ত ব্যঞ্জন আলুনি। সমস্ত ব্যঞ্জনা বিস্বাদ। উন্মনা ভাবে কখন একটু তন্ময় হয়ে ছিলেন ঠাকুর, নরেন হঠাৎ এসে তাঁকে প্রণাম করলে। ঠাকুর লাফিয়ে উঠলেন। তাঁর আনন্দ তখন আর দেখে কে! একেবারে নরেনের কাঁধে চেপে বসলেন, বসেই গভীর ভাবাবেশ। আর নরেন? প্রেমময়ের স্পর্শে বেদান্তবাদীর কাঠিন্য গলে যেতে লাগল। দুটি পরিপূর্ণ চোখ আচ্ছন্ন হয়ে এল অশ্রুতে। চারদিকে আনন্দের ঢেউ বইতে লাগল। বইতে লাগল সেবার স্রোতস্বিনী।

ঠাকুর খাচ্ছেন, প্রসাদ-লোভে ভক্তরা তাঁকে বেষ্টন করে আছে। হঠাৎ দু'চার গ্রাস খেয়েই ঠাকুর বলে উঠলেন, 'নরেনের গান শুনব। গান শুনতে-শুনতে খাব। তাঁর গুণগান শোনবার জন্যে মহামায়া নরেনকে অখণ্ডের ঘর থেকে নিয়ে এসেছেন। এর গান শুনলে আমার ভিতরে কী হয় জানিস? আমার ভিতরে যিনি, তিনি ফোঁস করে ওঠেন।'

নরেন গান ধরল:

'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী॥
অভয় চরণ তলে প্রেমের বিজলী খেলে
চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি॥'

গান শুনেই ঠাকুর সমাধিস্থ। অন্নরস ছেড়ে চলে গেছেন অন্য রসে। আনন্দ-রসে। কিন্তু ঠাকুরের পরিহাসরসও অফুরন্ত।

বেলা দুটোর সময় ভক্তরা বসেছে পঙক্তিভোজনে। চিঁড়ে, দই আর চিনি পরিবেশন হচ্ছে। 'রামের কি ছোট নজর!' বললেন ঠাকুর, 'আমার জন্মোৎসবে কিনা চিঁড়ের ব্যবস্থা করল! এই শীতের দিনে চিঁড়ে-দই! তার বদলে—' ঠাকুর গান ধরলেন: 'মোণ্ডা খাজা খুরমা গজা মোদক-বিপণি-শোভনম্।'

ভক্তবৃন্দ উল্লাসের হিল্লোল তুলল।

গান জমাবার জন্যে 'আরে-আরে' বলে ঠাকুর আখর দিচ্ছেন, এমন সময় এক ভক্ত 'হরি হরি' বলে উঠল। সব রস মাটি। ঠাকুর হেসে উঠলেন। 'শালা এমন বেরসিক, রসগোল্লা-রসগোল্লা না বলে হরি-হরি বললে।'

এমন সময় ফের দই নিয়ে এল। এই দেখে ঠাকুর হাত তুলে গাইতে লাগলেন:

'দে দই দে দই পাতে, ওরে ব্যাটা হাঁড়ি-হাতে।
ওরা কি তোর বাবা খুড়ি, ওদের পাতে হাঁড়ি-হাঁড়ি—'

একটা হুল্লোড় পড়ে গেল।

আর তারই মধ্যে সেই অরসিক ভক্ত 'রসগোল্লা' বলে 'জয়' দিলে।

যদু মল্লিকের বাগানে গিয়ে আবার কাঁদে রামকৃষ্ণ। ভোলানাথ, মোটা বামুন, হাত জোড় করে বলে, 'মশায়, ওর সামান্য পড়াশুনো, ওর জন্যে আপনি কেন এত অধীর হন ?'

সামান্য পড়াশুনো ? নরেনের জুড়ি আর একটাও ছেলে আছে ? ঝলসে ওঠে রামকৃষ্ণ। 'যেমন গাইতে-বাজাতে, তেমনি বলতে-কইতে, তেমনি আবার লেখা-পড়ায়। রাত-ভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে-করতে সকাল হয়ে যায়, হুঁশ থাকে না। সে কি যে-সে ? তার ভেতর এতটুকু মেকি নেই—বাজিয়ে দেখ গিয়ে, টং-টং করছে। আর সব ছেলেদের দেখি—দেড়টা-দুটো পাশ করেছে হয়তো, ব্যস, ঐ পর্যন্তই। চোখ-কান টিপে কোনো রকমে পাশ করতেই যেন সব শক্তি বেরিয়ে গেছে। আমার নরেনের সে রকম নয়, সে হেসে-খেলে পাশ করে যায়। ব্রাহ্মসমাজে ভজন গায় সে—আর-আরদের মতন নয়, সে সত্যিকারের ব্রহ্মজ্ঞানী। বুঝলে, ধ্যান করতে বসে জ্যোতি দেখে। সাধে কি আর নরেনকে এত ভালোবাসি ?' কিন্তু যাকে এত ভালোবাসেন সে তাঁকে মানতে রাজী নয়। সে তাঁকে কাঁদায়। একদিন সরাসরি বললে মুখের উপর, 'তুমি ঈশ্বরের রূপ-টুপ যা দেখ তা তোমার মনের ভুল।' আহতের মত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন রামকৃষ্ণ! বললেন, 'বলিস কি রে! কথা হয় যে!'

'কথা হয় না কচু!' কথাটা হেসে উড়িয়ে দিল নরেন্দ্র। 'সব আপনার মাথার খেয়াল!'

বলে কি ছোঁড়া! মাথার খেয়াল ?

'বলিস কি রে! মা স্পষ্ট চোখের সামনে দাঁড়ান, হাঁটেন-চলেন, কথা কন—'

'বাজে কথা, মাটির প্রতিমা নড়বে-চড়বে কি! কথা কইবে কি!'

'বাঃ, নিজের চোখ-কানকে অবিশ্বাস করব ?'

'মাথার গরমে ছায়া দেখেন আপনি, হয় তো বা অপচ্ছায়া!' নরেন নিষ্ঠুরের মত বললে, 'হাওয়ায় হয়তো বা কি শব্দ হয়, ভাবেন ছায়া বুঝি কথা কইছে।'

'তুই বললেই হল ?' নরেনকে উড়িয়ে দিতে চাইলেন রামকৃষ্ণ।

'আপনি বললেই বা হবে কেন ?' প্রত্যাখ্যানে দৃঢ় নরেন্দ্রনাথ: 'পশ্চিমের বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, অনেক জায়গায় চোখ-কান এমনি করে প্রতারণা করে। আপনিও যে প্রতারিত হচ্ছেন না তার প্রমাণ কি ? কে বলবে সমস্তই আপনার চোখ-কানের ভুল নয় ?'

'সমস্তই আমার চোখ-কানের ভুল ?' অসহায়ের মত তাকিয়ে রইলেন রামকৃষ্ণ।

'নিশ্চয়। নইলে যা সত্যি অদৃশ্য তাকে দেখা যাবে কি করে ? যা অচল সে কি করে নড়ে-চড়ে ?'

এর মধ্যে আবার হাজরা আছে টিপ্পনি ঝাড়তে।

বলছে, 'ঈশ্বর অনন্ত, তাঁর ঐশ্বর্য অনন্ত—সব বুঝি। তাই বলে তিনি কি আর সন্দেশ-কলা খাবেন ? না, গান শুনবেন ? ও সব ধোঁকা, ধাপ্পাবাজি।'

'তা ছাড়া আবার কি।' তার কথায় দাগা বুলালো নরেন।

বড় মন-মরা হয়ে গেলেন রামকৃষ্ণ। নরেন তো মিথ্যে বলবার ছেলে নয়! তবে এত দিন তিনি যা সব দেখে এসেছেন, বিশ্বাস করে এসেছেন, সব ভুয়ো! সব কাল্পনিক? ভবতারিণীর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লেন রামকৃষ্ণ।

'মা, এ কী হল? এ সব কি মিছে? নরেন্দ্র এমন কথা বললে! তুই শুধু পাথরের মূর্তি? তুই অচল, অনড়? তুই বোবা, বধির?'

মা কথা কয়ে উঠলেন। বললেন, 'ওর কথা শুনিস কেন? কিছু দিন পরে ও-ই নিজে দেখতে পাবে ঈশ্বরীয় রূপ, সব কথা সত্য বলে মানবে। কিছু ভাবিসনে। যদি মিথ্যে হবে, সব কথা তবে অবিকল মিলল কি করে?'

শুধু তাই নয়, দেখিয়ে দিলেন ভবতারিণী। দেখিয়ে দিলেন, সর্বত্র চৈতন্য, অখণ্ড চৈতন্য—চৈতন্যময় রূপ।

তেড়ে ছুটে গেলেন রামকৃষ্ণ। পাকড়াও করলেন নরেনকে। বললেন, 'শালা, তুই আমায় অবিশ্বাস করে দিয়েছিলি! চলে যা, তুই আর এখানে আসিস নে।'

যার জন্যে এত কান্না, তাকেই কিনা বাড়ির বার করে দেওয়া।

মুখের কথায় নরেন নড়ে না, কেননা সে জানে অন্তরের কথাটি। তাই সে আস্তে-আস্তে বারান্দায় সরে গিয়ে বসে তামাক সাজতে। নীরবে হুঁকোটা বাড়িয়ে দেয় হাজরার দিকে। হাজরাও চুপ।

সেই যে সেদিন চলে গেল নরেন, রামকৃষ্ণের ভয় হল, আর বুঝি সে আসবে না রাগ করে। কিন্তু, না, আবার এসেছে আরেক দিন। সেদিন আনন্দ কত রামকৃষ্ণের! মনে-মনে বলছেন, ও যে আমার আপনার লোক, তাই ওকে বকলেও ও আসবে। যে আপনার লোক তাকে বকলেও সে রাগে না। তাই তো ঈশ্বর মুখের কথার ধার ধারেন না। অন্তরের বচনহীন ভাষাটি শোনবার জন্যে নিরন্তর কান পেতে থাকেন।

'নরেন্দ্রের কথা আর লই না।'

সেদিন আবার আরেক তর্ক।

রামকৃষ্ণ বললেন, চাতক আকাশের জল ছাড়া আর কিছু খায় না।

নরেন তা মানতে রাজী নয়। বললে, 'বাজে কথা। এমনি জলও চাতক খায়।'

মহা ভাবনা ধরল রামকৃষ্ণের। আবার ছুটলেন ভবতারিণীর মন্দিরে। মা, এ সব কি মিথ্যে হয়ে গেল? যা এতদিন সব দেখেছি-জেনেছি সব গাঁজাখুরি?

সেদিন কি মনে করে নরেন্দ্র এসে হাজির।

ঘরের ভিতর কতগুলো কী পাখী উড়ছে ফরফর করে। নরেন্দ্র বলে উঠল 'ঐ, ঐ—'

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন রামকৃষ্ণ, 'কি?'

'ঐ চাতক! ঐ চাতক!' উল্লাস করে উঠল নরেন।

কতগুলো চামচিকে।

হেসে উঠলেন রামকৃষ্ণ। বললেন, 'সেই থেকে নরেন্দ্রের কথা আর লই না।'

কিন্তু সব সময়ে ভয়, নরেন্দ্র এই বুঝি আর কারু হয়ে গেল। আমার বুঝি হল না! তাই তার সঙ্গে কথা কইতেও ভয়, না কইতেও ভয়। স্নেহকরুণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন রামকৃষ্ণ। ভাববিহ্বল হয়ে গান ধরেন :

'কথা বলতে ডরাই না-বললেও ডরাই।
মনে সন্দ হয় পাছে তোমাধনে হারাই-হারাই ॥'

গান শুনে অশ্রু-ভরোভরো চোখে তাকিয়ে থাকে নরেন। ভাবে ভালোবাসায় পাহাড় বুঝি দ্রবময়ী নির্ঝরিণী হয়ে যাবে।

কিন্তু ঐ বুঝি আবার হারিয়ে গেল। কত দিন আবার দেখা নেই নরেনের।

কাঁহাতক আর বসে থাকবেন পথ চেয়ে! সেদিন নিজেই রওনা হলেন কলকাতার দিকে। কিন্তু, হঠাৎ খেয়াল হল, আজ তো রবিবার, যদি তার বাড়িতে গিয়ে দেখা না পাই! যদি কোথাও কারু সঙ্গে আড্ডা দিতে বেরিয়ে গিয়ে থাকে! কোথায় আর যাবে! আজ যখন রবিবার, নিশ্চয়ই ব্রাহ্মসমাজে ভজন গাইবার ডাক পড়েছে সন্ধের সময়। সেখানে গেলেই নির্ঘাত তাকে দেখতে পাব। আমার তো আর কিছুই বাসনা নেই, শুধু তাকে একটু দেখব কাছে থেকে।

যেমন ভাবনা তেমন কাজ। সরাসরি সমাজে গিয়ে উপস্থিত হলেন রামকৃষ্ণ।

মুহূর্তে একটা প্রলয়-কাণ্ড ঘটে গেল। বেদিতে বসে আচার্য ভাষণ দিচ্ছেন, জনতার সেদিকে লক্ষ্য নেই। সেই 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' সহসা যেন মূর্তি ধরে আবির্ভূত হয়েছেন সভাস্থলে, এমনি মনে হল জনতার। তাঁকে একবারটি একটু চোখের দেখা দেখবার জন্যে চারদিকে রব পড়ে গেল। শুরু হয়ে গেল বাঁধভাঙা বিশৃঙ্খলা। বেঞ্চির উপর উঠে দাঁড়াল একদল, অন্য দল ঘিরে ধরতে চাইল রামকৃষ্ণকে। স্তম্ভিতের মত বসে রইল আচার্য। মাথায় একবার এল না ঠাকুরকে যোগ্য সমাদরে সম্বর্ধনা করে নিই। বসাই এনে বেদির উপরে।

আচার্যের কথা ছেড়ে দি, সমাজের কর্তৃপক্ষের কেউই একটা সাধারণ শিষ্টাচার পর্যন্ত দেখালো না। মনে-মনে রামকৃষ্ণের উপর তারা চটা ছিল। তাদের সমাজের দু-দুটো মাথা—কেশব আর বিজয়কে রামকৃষ্ণ বশ করেছে! টেনে নিয়েছে নিজের মতে। কিন্তু তাই বলে তিনি এমনি ভাবে অপমানিত হবেন? বেদির উপর বসে ছিল নরেন্দ্রনাথ, নিচে লাফিয়ে পড়ল। এগিয়ে গেল ঠাকুরের দিকে। তাকে দেখতে পেয়ে ভাবে মাতোয়ারা হলেন রামকৃষ্ণ। তার দিকে ধাবমান হতে-না-হতেই সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

তখন আবার সমাধি-অবস্থায় রামকৃষ্ণকে দেখবার জন্যে জনতা আলোড়িত হয়ে উঠল। এমন সময় কারা ঘরের গ্যাস দিল নিবিয়ে। ঘনান্ধকারে ভরে গেল চার দিক। তুমুল গোলমাল। দিক্‌ভ্রান্ত দ্বারভ্রান্ত জনতা। এদিক-ওদিক ছুটতে লাগল বিপর্যস্তের মত। এখন রামকৃষ্ণকে কি করে রক্ষা করবে নরেন্দ্র! কি করে অন্ধকার থেকে নিয়ে আসবে বাইরে। নরেন একাই একশো। একাই আবৃত করে রাখবে। বলিষ্ঠবাহু পুত্র যেমন পিতাকে বেষ্টন করে রাখে। কারু সাধ্য নেই রামকৃষ্ণের ছায়া মাড়ায়। রামকৃষ্ণের সমাধি ভাঙল। চার পাশে তাকালেন অন্ধকারে। কই, তুই আছিস? আয়, আমাকে ধর। তোকে দেখতে চলে এসেছি কতদূর!

হাত ধরে রামকৃষ্ণকে বাইরে নিয়ে এল নরেন। পিছনের দরজা দিয়ে। অন্ধকার ঠেলে-ঠেলে। একটা গাড়ি ডাকলো। চলো দক্ষিণেশ্বরে।

পথে ঠাকুরকে বকতে লাগলো নরেন। 'কেন আপনি এসেছিলেন এখানে?'

তুই জানিস না কেন এসেছিলাম? স্থখস্মিতমুখে তাকিয়ে রইলেন ঠাকুর।

'সেজন্য এখানে আপনি আসবেন, এই ব্রাহ্মসমাজে? এখানে ওরা আপনাকে সম্মান দেখাল, না, অভ্যর্থনা করল? ঘর অন্ধকার করে পালিয়ে গেল সকলে। আমার জন্যে আপনি কেন এ অপমান নিতে এলেন? আপনার অপমানে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে—'

অপমান! ঠাকুরের মুখপদ্মের প্রসন্নাভা এতটুকু ম্লান হল না।

'অপমান ছাড়া আবার কি। ওরা আপনাকে বোঝে না, বোঝবার ওদের সাধ্যও নেই—ওদের এখানে আসবার আপনার কী দরকার! আমাকে ভালোবাসেন বলে আপনার সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান খোয়াতে হবে?'

যা খুশি তাই বল। তোর কথায় কে কান দেয়! তোর কথা আর লই না। তোর দেখা পেয়েছি, তুই আমাকে গাড়ি করে দক্ষিণেশ্বরে পেঁাছে দিতে যাচ্ছিস এই ঢের। নইলে কে কোথায় কী অনাদর বা উপেক্ষা করল তাতে আমার বয়ে গেল।

'ভালোবাসেন বাসুন, কিন্তু নিজের দিকে খেয়াল রাখেন না কেন?'

ওরে ভালোবাসায় কি নিজের দিকে খেয়াল থাকে? ভালোবাসা যে আত্মনাশী।

'কিন্তু এই ভালোবাসার পরিণতি কি? শেষে ভরত রাজার মতন আপনার না দশা হয়! ভরত রাজা হরিণ ভাবতে-ভাবতে হরিণ হয়ে জন্মেছিল, আপনারো না শেষ পর্যন্ত—'

ঠাকুরের মুখে হঠাৎ চিন্তার ঘোর লাগল। বললেন, 'তুই একেকটা এমন কথা বলিস যে বিষম ভাবনা ধরে যায়।'

'আমি ঠিকই বলি।'

'তাই তো রে, তাহলে কী হবে! আমি যে তোকে না দেখে থাকতে পারি না। আমায় তবে উপায় বলে দে।'

তবু ভালোবাসায় মাত্রা টানতে পারবেন না ঠাকুর। মন্দা পড়তে দেবেন না জোয়ারে। শেষকালে দক্ষিণেশ্বরে পেঁাছে মা'র দুয়ারে এসে হাজির হলেন। নরেনকে কেন এত ভালোবাসি? কেন ওকে দেখবার জন্যে চোখ দুটো ক্ষয় হয়ে যায়? ও আমার কে? হাসতে-হাসতে ফিরে এলেন মন্দির থেকে। বললেন, 'যা শালা, তোর কথা আর লই না। মা সব বলে দিলেন, বুঝিয়ে দিলেন—'

'কী বলে দিলেন?'

'বলে দিলেন তুই ওকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস, তাই অত ভালোবাসিস। যেদিন ওর মধ্যে নারায়ণকে দেখতে পাবিনে সেদিন ওর মুখদর্শন তোর অসহ্য হবে।' প্রসন্ন আস্য প্রেমে তরল হয়ে এল। 'আমার ভরত রাজার মত দশা হবে বলতে চাস? নারায়ণ ভেবে নারায়ণকে ভালোবেসে যে পাড়ি জমাতে পারে তার আর পারাবারের ভয় কি।' সেই ভালোবাসার কাছে নরেন দাঁড়িয়ে রইল অসহায়ের মত। আত্মবিস্মৃতের মত।

'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কিনা জানি না, বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি একঘেয়ে', শিবানন্দকে বিবেকানন্দ চিঠি লিখছেন আমেরিকা থেকে : 'রামকৃষ্ণ পরমহংস দি লেটেস্ট এ্যাণ্ড দি মোস্ট পারফেক্ট—জ্ঞান প্রেম বৈরাগ্য লোকহিতচিকীর্ষা উদারতায় জমাট—কারু সঙ্গে কি তাঁর তুলনা হয় ? তাঁকে যে বুঝতে পারে না তার জন্ম বৃথা। আমি তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের দাস, এই আমার পরম ভাগ্য, তাঁর একটা কথা বেদবেদান্ত অপেক্ষা অনেক বড়। তস্য দাস-দাস-দাসোঽহং। তবে একঘেয়ে গোঁড়ামি দ্বারা তাঁর ভাবের ব্যাঘাত হয়—এই জন্য চটি। বরং তাঁর নাম ডুবে যাক—তাঁর উপদেশ ফলবান হোক। তিনি কি নামের দাস ?...'

* ৮৫ *

জুড়িগাড়ি করে কারা আসছে দক্ষিণেশ্বরে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল রাখাল। সহজেই চিনতে পারল। কলকাতার এক নামজাদা বড়লোক।

রামকৃষ্ণেরও চোখ পড়েছে। যেমনি দেখা অমনি জড়সড় হয়ে পালিয়ে গেলেন ঘরের মধ্যে। অচেনা আগন্তুক দেখে শিশু যেমন ভয়ে পালায়।

এ কি হল ? রাখালও পিছু-পিছু ঘরে ঢুকল।

'যা, যা শিগগির যা। ওরা এখানে আসতে চাইলে বলিস এখন দেখা হবে না।'

এমনতরো তো কোনো দিন হয় না। অর্থী তো কোনো দিন ফিরে যায় না ব্যর্থ হয়ে। অবাক মানল রাখাল। বাইরে এসে জিগগেস করলে অভ্যাগতদের : 'কি চাই ?'

'এখানে একজন সাধু আছেন না ? তাঁকে চাই।'

'কি দরকার ?'

'আমার আত্মীয়ের থাক-যাক অসুখ। কিছুতেই সুরাহা হচ্ছে না। উনি দয়া করে যদি কোনো ওষুধ-টোষুধ দেন—'

এতক্ষণে বুঝল রাখাল। কিন্তু অন্তরের ভাবটি কি করে বোঝেন ঠিক অন্তর্যামী তা কে বলবে !

'উনি ওষুধ দেন না। আপনারা ভুল শুনেছেন—'

এক দিন আরেক জন বড়লোক এসেছিল। আমায় বলে, মশায়, এই মোকদ্দমাটি কিসে জিত হয় আপনার করে দিতে হবে। আপনার নাম শুনে এসেছি। আমি বললুম, বাপু, সে আমি নই—তোমার ভুল হয়েছে।

বলছেন রামকৃষ্ণ : 'যার ঠিক-ঠিক ঈশ্বরে ভক্তি হয়েছে, সে শরীর, টাকা—এ সব গ্রাহ্য করে না। সে ভাবে, দেহসুখের জন্যে কি লোকমান্যের জন্যে কি টাকার জন্যে আবার জপ-তপ কি ! জপ-তপ ঈশ্বরের জন্যে।'

বলে দুদিক রাখব ! দুআনা মদ খেলে মানুষ দু'দিক রাখতে চায়। কিন্তু খুব মদ খেলে রাখা যায় দু'দিক ?

তেমনি ঈশ্বরের আনন্দ পেলে আর কিছুই ভালো লাগে না। কামকাঞ্চনের

কথা যেন বুকে বাজে। শাল পেলে আর বনাত ভালো লাগে না। রামকৃষ্ণ কীর্তনের সুরে গান গেয়ে উঠলেন। 'আন লোকের আন কথা ভালো তো লাগে না—' তখন ঈশ্বরের জন্যই মাতোয়ারা। আর সব আলুনি, পানসে।

ত্রৈলোক্য বললে, 'সংসারে থাকতে গেলে টাকাও তো চাই, সঞ্চয়ও চাই। পাঁচটা দানধ্যান—'

'আগে টাকা সঞ্চয় করে নিয়ে তবে ঈশ্বর?' রামকৃষ্ণ ঝলসে উঠলেন: 'আর, দান-ধ্যানই বা কত! নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার-হাজার টাকা খরচ, আর পাশের বাড়িতে খেতে পাচ্ছে না। তাদের দুটি চাল দিতে কষ্ট হয়। দিতে-থুতে হিসেব কত! ও শালারা মরুক আর বাঁচুক—আমি আর আমার বাড়ির সকলে ভালো থাকলেই হল। মুখে বলে সর্বজীবে দয়া!'

জীবে দয়া! জীবে দয়া! দূর শালা! কীটানুকীট—তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? তোর স্পর্ধা কিসের? তুই কিসে এত আত্মম্ভরী?

সেদিন ঠাকুর তাই ধমকে উঠেছিলেন নরেন্দ্রকে। বল, জীবে দয়া নয়, জীবে শ্রদ্ধা, জীবে প্রেম, জীবে সেবা। শিবজ্ঞানে জীবের বন্দনা।

দয়ার মধ্যে একটু উঁচু-নিচু ভাব আছে। আমি দয়ালু, আমি উপরে দাঁড়িয়ে; তুমি দয়ার ভিখারী, তুমি নিম্নাসীন। এ অসাম্য সহ্য হল না রামকৃষ্ণের। তিনি সর্বত্র নরায়িত নারায়ণ দেখলেন। দেখলেন আশ্চর্য সৌষম্য। সব এক, সব সমান, সব বিভক্ত হয়েও অবিচ্ছিন্ন। প্রত্যেককে দাঁড় করিয়ে দিলেন একটি শ্যামল সমভূমিতে—যার পোশাকী নামটি ভূমা, আর চলতি নামটি ভালোবাসা।

এই রামকৃষ্ণের সাম্যবাদ! সকলে আমরা অমৃতস্য পুত্রাঃ, আনন্দময়ীর ছেলে, রামপ্রসাদের ভাষায়, ব্রহ্মময়ীর বেটা। এক বাপের সমাংশভাক বংশধর। অধিকারের স্তরভেদ নেই, আমাদের মধ্যে শুধু প্রেমের সমানস্রোত।

বনের বেদান্তকে ঘরে নিয়ে এলেন রামকৃষ্ণ। একেই বললেন, 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে কাজ করা।' একেই বললেন, নিরাকার থেকে আবার সাকারে চলে আসা। এবার সত্যিকারের সাকার। মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে স্বীকার করা, আবিষ্কার করা, অভ্যর্থনা করা।

নরেনের তৃতীয় নয়ন আবার উদ্দীপ্ত হল। দেখল সর্বত্র অভেদ। পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলে একই পরমপ্রকাশের খণ্ড মূর্তি। প্রত্যহের তুচ্ছতার মধ্যে সে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তাকে মুক্ত করে যুক্ত করে দিতে হবে সে সর্বভাসকের সঙ্গে। দিতে হবে তাকে তার সুমহান অধিকারের সংবাদ। তার অন্তরের নিভৃত গুহা থেকে জাগাতে হবে সে প্রসুপ্ত কেশরী। তার অনুভবের মধ্যে আনতে হবে তার অস্তিত্বের পরমার্থের আস্বাদ।

শুধু নিজে দেখলে চলবে না, দেখাতে হবে। শুধু নিজে চিনলে চলবে না, চেনাতে হবে। আমি যদি একা জেগে উঠে দেখি আর-সবাই তখনো ঘুমিয়ে রয়েছে, তখন আমার আকাশ-ভরা প্রভাত-আলোর আনন্দ কই?

ছিন্ন কথার খেই ধরল ত্রৈলোক্য। বললে, 'সংসারে তো ভালো লোকও আছে। চৈতন্যদেবের ভক্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, তিনি তো সংসারে ছিলেন—'

'তার গলা পর্যন্ত মদ খাওয়া ছিল।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'যদি আর একটু খেত, সংসার করতে পারত না।'

'তা হলে সংসারে কি ধর্ম হবে না ?'

'হবে। যদি ভগবানকে লাভ করে থাকতে পারো। তখন কলঙ্ক-সাগরে ভাসো, কলঙ্ক না লাগে গায়। তখন পাঁকাল মাছের মতো থাকো। ঈশ্বরলাভের পর যে সংসার সে বিদ্যার সংসার। তাতে কামিনীকাঞ্চন নেই, শুধু ভক্ত আর ভগবান। এই আমার দিকেই দেখ না। আমারও মাগ আছে, ঘরে-ঘরে ঘটি-বাটিও আছে—হরে প্যালাদের খাইয়েও দিই, আবার যখন হাবীর মা এরা আসে এদের জন্যেও ভাবি।'

চৈতন্যলাভের পর সংসারে গিয়ে থাকো। যদি অনেক পরিশ্রমের পর কেউ সোনা পায়, তা বাক্সের মধ্যেই রাখো বা মাটির নিচেই রাখো, সোনার কিছুই হয় না। কাঁচা মনকে সংসারে রাখতে গেলেই মন মলিন হয়ে যায়। দুধে-জলে একসঙ্গে রাখলেই যায় সব একাকার হয়ে। দুধকে মন্থন করে মাখন তুলে জলের উপর রাখলে আর গোল থাকে না, ভাসে। কাগজে তেল লাগলে তাতে আর লেখা চলে না। তবে যদি বেশ করে খড়ি দিয়ে ঘষে নিস, লেখা ফুটবে। তেমনি কামকাঞ্চনের দাগ-ধরা জীবনে সাধন করতে হলে ত্যাগের খড়ি ঘর্ষণ করো।

শশধর পণ্ডিতকে দেখতে যাবেন রামকৃষ্ণ। অত বড় পণ্ডিত, অথচ এক বিন্দু ভয় নেই কাছে ঘেঁষতে ! আমার কি ! আমার তো বাজনার বোল মুখস্থ বলা নয়, হাতে বাজানো। ওরা শুধু জল তোলপাড় করে, আর আমি অতলতলে ডুব দিই। ওরে নরেন, তুই সঙ্গে চল। মন্দ কি, পণ্ডিতদের সঙ্গে দর্শনচর্চা করে আসবি।

কিন্তু, দেখা হলে শশধর পণ্ডিত কী বললে ? বললে, 'দর্শনচর্চা করে হৃদয় শুকিয়ে গিয়েছে। দয়া করে আমায় এক বিন্দু ভক্তি দিন—'

জ্ঞানের খররৌদ্রে দগ্ধ হয়ে গেলাম, দাও এবার একটু ভক্তির বিষাদ-মেঘ, ভালোবাসার অশ্রুবিন্দু। তোমার জন্যে শুধু সেজে-গুজে সুখ নেই, তোমার জন্যে কেঁদে আনন্দ। আমি তোমার রাজরানি হতে চাই না, আমি তোমার কাঙালিনী হব। রামকৃষ্ণ শশধরের বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন। তৃষ্ণা মিটল শশধরের। দীপ্ত চোখ অশ্রুতে ছলছল করে উঠল।

রামকৃষ্ণেরও পিপাসা পেল হঠাৎ। বললেন, জল খাব।

গৃহস্থ যদি নিজের থেকে কিছু না-ও দেয়, তবু সাধু-সন্ন্যেসী চেয়ে নিয়ে কিছু খেয়ে আসবে। আর কিছু না হোক, অন্তত এক গ্লাস জল। নইলে অকল্যাণ হয় গৃহস্থের। আর সকলের হোক বা না হোক, রামকৃষ্ণের ভুল হয় না।

তিলক-কণ্ঠিধারী এক ভক্ত শুদ্ধ ভাবে জল নিয়ে এল। কিন্তু মুখের কাছে গ্লাস তুলে ধরতেই, এ কী হল হঠাৎ ? রামকৃষ্ণ গ্লাস নামিয়ে রাখলেন। তাঁর কণ্ঠনালী আড়ষ্ট, বিশুষ্ক হয়ে গিয়েছে। এক ফোঁটা জল গলবে না ভিতরে। গ্লাসের জলে কুটোকাটা পড়েছে বোধ হয়। তাই বোধ হয় আপত্তি করলেন খেতে। গ্লাসের জল ফেলে দিল নরেন। আরেক গ্লাস জল এনে দিল আরেক জন।

এবার সে জল স্বচ্ছন্দে পান করলেন রামকৃষ্ণ। সন্দেহ নেই, আগের গ্লাসে ময়লা ছিল বলেই সেটা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

কিন্তু নরেনের মন মানতে চাইল না কিছুতেই। নিশ্চয়ই গভীর আর কোনো রহস্য আছে। ঠাকুরকে একাই পাঠিয়ে দিলে গাড়িতে করে। বললে, আমার বিশেষ কাজ আছে। পরে যাব।

বিশেষ কাজ নয় তো কি! সব দিক থেকে যাচিয়ে-বাজিয়ে নিতে হবে ঠাকুরকে। সব কিছুর জানতে হবে হাট-হদ্দ। কেন উনি ভক্তের হাতের জল খেলেন না?

তিলক-কণ্ঠিধারীকে প্রশ্ন করা যায় না সরাসরি। তার ছোট ভাইকে পাকড়াও করলে। ভাগ্যক্রমে তার সঙ্গে আগে থেকে আলাপ ছিল নরেনের। জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কি হে তোমার দাদাটির? বলি, স্বভাবচরিত্র কেমন?

মাথা চুলকোলো ছোট ভাই। বললে, দাদার কথা কি করে বলি ছোট হয়ে?

নিমেষে বুঝে নিল নরেন। কিন্তু ঠাকুর বুঝলেন কি করে? তিনি কি অন্তর্যামী অন্তরজ্ঞ?

আবার গেরুয়া কেন? একটা কি পরলেই হল? রামকৃষ্ণ রসিকতা করলেন, 'একজন বলেছিল চণ্ডী ছেড়ে হলুম ঢাকী। আগে চণ্ডীর গান গাইতো, এখন ঢাক বাজায়।'

সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়া পরেছে—সে বৈরাগ্য বেশি দিন টেঁকে না। হয়তো কাজ নেই, গেরুয়া পরে কাশী চলে গেল। তিন মাস পরে ঘরে চিঠি এল, আমার একটি কাজ হয়েছে, কিছু দিন পরেই বাড়ি ফিরব, ভেবো না আমার জন্যে। আবার সব আছে, কোনো অভাব নেই, কিন্তু কিছুই ভালো লাগে না। ভগবানের জন্যে একা-একা কাঁদে। সে বৈরাগ্যই আসল বৈরাগ্য।

মন যদি ভেকের মত না হয়, ক্রমে সর্বনাশ হয়। তার চেয়ে সাদা কাপড় ভালো। মনে আসক্তি, আর বাইরে গেরুয়া! কী ভয়ঙ্কর!

ভগবতী ঝি এসে দূর থেকে প্রণাম করল ঠাকুরকে। অনেক দিনের ঝি। বাবুদের বাড়িতে কাজ করে। ঠাকুরের জানাশোনা। প্রথম বয়সে স্বভাব ভালো ছিল না। কিন্তু তাই বলে ঠাকুর তাঁর করুণার সুগন্ধ বারির ধারাটি শুকিয়ে ফেলেননি। দিচ্ছেন তাকে তাঁর অমিয় বচনের আশীর্বাদ। বললেন, 'কি রে, এখন তো ঢের বয়েস হয়েছে। টাকা যা রোজগার করলি, সাধু-বৈষ্ণবদের খাওয়াচ্ছিস তো?'

'তা আর কী করে বলব?' অল্প একটু হাসল ভগবতী।

'কাশী-বৃন্দাবন—এ সব হয়েছে?'

'তা আর কি করে বলব?' কুণ্ঠিত হবার ভান করল ভগবতী: 'একটা ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছি। তাতে পাথরে আমার নাম লেখা আছে।'

'বলিস কি রে?'

'হ্যাঁ, নাম লেখা আছে শ্রীমতী ভগবতী দাসী।'

আনন্দে হাসলেন রামকৃষ্ণ। বললেন, 'বেশ, বেশ।'

কি মনে ভাবল ভগবতী, হঠাৎ ঠাকুরের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে।

যেন একটা বিছে কামড়েছে, যন্ত্রণায় এমনি অস্থির হয়ে পড়লেন ঠাকুর। ছোট খাটটিতে বসে ছিলেন, ঝটকা মেরে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মুখে শুধু 'গোবিন্দ', 'গোবিন্দ'। কী যেন একটা অঘটন ঘটে গেল মুহূর্তে। অসহন আর্তির দৃশ্য। শিশুঅংগে কে যেন তপ্ত অংগার ছুঁড়ে মেরেছে।

ঘরের যে কোণে গংগাজলের জালা, সেদিকে হাঁপাতে-হাঁপাতে ছুটলেন ঠাকুর। পায়ের যেখানে ভগবতী ছুঁয়েছিল সেখানে ঢালতে লাগলেন গংগাজল।

জীবন্মৃতার মত বসে আছে ভগবতী। সাড় নেই স্পন্দ নেই, দহনের পর দেহের ভস্মরেখা। জীবনে অনেক সে পাপ করেছে, কিন্তু এ পাপের বোধ হয় তুলনা নেই। যত তোমার পাপ করবার ক্ষমতা, তার চেয়ে ভগবানের বেশি ক্ষমতা ক্ষমা করবার। পতিতপাবন করুণাসিন্ধু তাই আবার অমৃতবচন বিতরণ করলেন।

বললেন, 'বেশ তো, গোড়ায় দূর থেকে প্রণাম করেছিলি। কেন মিছিমিছি পা ছুঁতে যাস ? যাক গে। তাই বলে মন-খারাপ করিস নে। গা-হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে এতক্ষণে। শোন, একটু গান শোন। গান শুনলে তুইও ঠাণ্ডা হবি।'

ঠাকুর গান ধরলেন।

দুর্গাপূজার দিন মঠে বহু লোক সেবার প্রণাম করছে শ্রীমাকে। প্রণামের পর বারে-বারে গংগাজলে পা ধুচ্ছেন শ্রীমা। যোগেন-মা বললেন, 'মা, ও কি হচ্ছে ? সর্দি করে বসবে যে !'

'যোগেন, কি বলব ! এক-একজন প্রণাম করে যেন গা জুড়োয়, আবার এক-একজন প্রণাম করে যেন গায়ে আগুন ঢেলে দেয়। গংগাজলে না ধুলে বাঁচিনে।'

তোমার পা ছোঁবার সুযোগ দাওনি। তাই দূর থেকেই তোমাকে প্রণাম করছি। তাতেও যদি পাপস্পর্শের জ্বালা লাগে, গংগাজল কোথায় পাব মা, আমার অশ্রুজলে ধুয়ে নিয়ো পাদপদ্ম।

ভবতারিণীর মন্দিরে গিয়ে ভাবাবস্থায় কথা বলছেন ঠাকুর, 'করছিস কি ? এত লোকের ভিড় কি আনতে হয় ? নাইবার-খাবার সময় নেই। গলা তো ভাঙা ঢাক। এত করে বাজালে কোন দিন ফুটো হয়ে যাবে যে। তখন কী করবি ?'

তবু ভিড়ের কমতি নেই। ভক্তের দল যেমন আসছে তেমনি আসছে আবার ভণ্ডের দল।

'অমন সব আদাড়ে লোকদের এখানে আনিস কেন ?' এক দিন সরাসরি জগদম্বার সংগে ঝগড়া করছেন রামকৃষ্ণ। 'আমি অতশত পারব না। এক সের দুধে পাঁচ সের জল—জ্বাল ঠেলতে-ঠেলতে ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে গেল। তোর ইচ্ছে হয় তুই দিগে যা। আমি অত জ্বাল ঠেলতে পারব না। অমন সব লোকদের আর আনিসনি।'

সাধুর মধ্যেও ভণ্ডের ছড়াছড়ি।

'যে সাধু ওষুধ দেয়, ঝাড়ফুঁক করে, টাকা নেয়, বিভূতি-তিলকের আড়ম্বর করে, খড়ম পায়ে দিয়ে যেন সাইনবোর্ট মেরে নিজেকে জাহির করে বেড়ায়, তার থেকে কিছু নিবিনে।'

শুধু ভক্তি খুঁজে বেড়াবি। অহেতুক ভক্তি। নারদীয় ভক্তি। ভক্তির আমি-র অহঙ্কার নেই। এ আমি আমির মধ্যেই নয়। যেমন হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়। অন্য শাকে অসুখ করে, হিঞ্চে শাকে পিত্ত যায়। মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়। অন্য মিষ্টিতে অপকার, মিছরি খেলে অম্বল নাশ হয়। ভক্তি অজ্ঞান করে না, বরং ঈশ্বর লাভ করিয়ে দেয়। আমার শক্তি নেই, আসক্তিও নেই। শুধু ভক্তি নিয়ে বসে আছি এক কোণে। মধুস্নিগ্ধ পদ্ম যদি ফোটে, শুনতে পাব সে ভৃঙ্গের গুঞ্জরণ।

* ৮৬ *

আচ্ছা, রসিক মেথর কি কোনোদিন পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিল ঠাকুরকে? যদি বা করেছিল, গায়ে কি জ্বালা ধরেছিল ঠাকুরের? যেমন হয়েছিল ভগবতীর বেলায়? ময়লা পরিষ্কার করে বলে রসিকও কি ময়লা?

কে বলে! মেথররূপী নারায়ণ। ঝাড়ু অস্পৃশ্য বটে, কিন্তু ঝাড়ুদার অস্পৃশ্য নয়। পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিল কিনা জানা নেই, কিন্তু ঠাকুর একদিন সটান রসিকের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত। শরীরে না হোক, মনে-মনে।

বলছেন ঈশান মুখুজ্জেকে, 'ধ্যান করছিলাম। ধ্যান করতে-করতে মন চলে গেল রসিকের বাড়ি। রসকে ম্যাথর। মনকে বললুম, থাক শালা, ঐখানেই থাক। মা দেখিয়ে দিলেন, ওর বাড়ির লোকজন সব বেড়াচ্ছে, খোল মাত্র, ভিতরে সেই এক কুলকুণ্ডলিনী, এক ষটচক্র।'

রতির মাকে চেনো তো? লালাবাবুর রানি কাত্যায়নীর মোসাহেব, গোঁড়া বৈষ্ণবী। খুব আসা-যাওয়া করে দক্ষিণেশ্বরে। ভক্তি দেখে কে। কিন্তু যেই রামকৃষ্ণকে দেখল মা-কালীর প্রসাদ খেতে, অমনি পালালো।

কী আশ্চর্য, সেই রতির মা'র বেশেই মা'কালী দেখা দিলেন একদিন। যা শক্তি তাই বৈষ্ণবী। বললেন, তুই ভাব নিয়েই থাক।

কিন্তু আমার ভাব কি জানো? চোখ চাইলেন কি তিনি, আর নেই? আমি নিত্য-লীলা দুই-ই লই। সব মতই সেই এককে নিয়ে। একঘেয়েকে নিয়ে নয়। তাই আমি শাক্তেও আছি, বৈষ্ণবেও আছি, বেদেও আছি, বেদান্তেও আছি। রাম শিবকে পুজো করেছিলেন, শিব রামকে। কৃষ্ণ স্তব করেছিলেন কালীকে, আবার কৃষ্ণই কালীরূপ ধরেছিলেন। আমি সব ঘটে আছি, সব সংঘটে। শুধু অকপট হলেই হল। আকারে যে অনাকারেও সে। কিম্বা বলো, সাকার-নিরাকার আমার বাপ-মা। বাপ নির্গুণ মা গুণান্বিতা। কাকে নিন্দা করে কাকে বন্দনা করবে, দুই পাল্লায় সমান ভারি।

'নির্গুণ মেরা বাপ সগুণ মাহ্‌তারি,
কারে নিন্দো কারে বন্দো, দোনো পাল্লা ভারি।'

'যে সমন্বয় করেছে সেই-ই লোক।' বললেন রামকৃষ্ণ।

যত মত তত পথ। কিন্তু পথটাই পৌঁছুনো নয়। মতেই না হয় মতিভ্রম। যদি ভুল-পথেও যাও, ঘুর-পথেও যাও, অন্তরে যদি অসরল না থাকে, তবে সে-পথও একদিন সোজা-পথ হয়ে যাবে। হবে ঠিক জগন্নাথদর্শন। যাত্রার লগ্নে লক্ষ্যটি যদি ঠিক থাকে, পথ যাই হোক, একদিন ঠিক হাত ধরবেন অন্ধকারে। ক্লান্ত হলে কোলে নেবেন। তাঁর হাতে শুধু হিত, পায়ে শুধু ছায়া। ঈশ্বর ক্ষীরের পুতুল। হাত ভেঙে খেলেও মিষ্টি, পা ভেঙে খেলেও মিষ্টি। এই একমাত্র আসল, যার আসল ভেঙে খেলেও সুদ বাড়ে।

কলকাতায়, পাথুরেঘাটায় যদু মল্লিকের বাড়ি যাচ্ছেন ঠাকুর। কিন্তু গাড়ির যোগাড় হয় কোত্থেকে?

বরানগরের বেণী সা ভাড়ায় গাড়ি খাটায়। কথা আছে, ঠাকুর বলে পাঠালেই দক্ষিণেশ্বরে গাড়ি আসবে। আর, কলকাতা থেকে ফিরতে যত রাতই হোক না, গাড়োয়ান গোলমাল করতে পাবে না। যত বেশী টাইম তত বেশি ভাড়া। আগে রসদদার ছিল মথুর, পরে পেনেটির মণি সেন, শেষে শম্ভু মল্লিক, এখন সিঁদুরে-পটির জয়গোপাল। তবে যার বাড়িতে যাওয়া, সেই দিয়ে দেয় গাড়িভাড়া।

কিন্তু যদু মল্লিক যা কৃপণ। বরাদ্দ দু'টাকা চার আনার বেশি গাড়িভাড়া দেবে না। কিন্তু বেণী সা'র সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছে ফিরতে যত রাতই হোক, তিন টাকা চার আনা দিলেই গাড়োয়ান আর গোলমাল করবে না। নইলে, দেরি হতে দেখলেই গাড়োয়ান কেবল চলো, চলো, করে দিক্ করে। কিন্তু গেলেই কি তক্ষুনি-তক্ষুনি ফেরা যায়? যদুর মা এসেছে, সে কত ভালোবাসে, তার সঙ্গে দুটো কথা না কয়েই বা আসি কি করে? কিন্তু এখন বাড়তি টাকা একটা কে দেয়!

একদিন যদুকে বললেন সরাসরি: 'হ্যাঁ হে, এত টাকা করেছ, এখনো টাকার লোভ গেল না?'

'দেখ ছোট ভটচাজ,' বললে যদু মল্লিক, 'ও লোভ যাবার নয়। তুমি যেমন ভগবানের লোভ ছাড়তে পারো না, তেমনি বিষয়ী লোকও ছাড়তে পারে না টাকার লোভ। আর কেনই বা ছাড়বে? তুমি ভগবানের প্রেমের জন্যে পাগল, আমি তাঁর ঐশ্বর্যের জন্যে পাগল! আচ্ছা বলো দিকিনি টাকা কি তাঁর ঐশ্বর্য নয়?'

ঠাকুরের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, 'যদি এটা ঠিক বুঝে থাকো টাকাটা তোমার নিজের ঐশ্বর্য নয়, ভগবানের ঐশ্বর্য, তাহলে আর তোমার ভাবনা কি গো! কিন্তু এ কথা তুমি সরল ভাবে বলছ, না, চালাকি করে বলছ?'

'সে কথা তুমিই জানো। তোমার কাছ থেকে কি মনের কথা লুকানো যায়?'

কিন্তু যাই বলো ও সব মোসাহেবগুলোকে রেখেছ কেন?

'ভদ্দরলোকের ছেলে, ভিক্ষে করতে পারে না, কিছু পাবার আশায় এখানে পড়ে থাকে। ওদের বঞ্চিত করলে ওরা যায় কোথায়?'

'কিন্তু ওদের সঙ্গে মিশলে ক্ষতি হতে পারে।'

'দেখ ছোট ভটচাজ, বিষয়-আশয় রাখতে গেলে অমন লোকের দরকার আছে।'

আবার বিষয়-আশয়! চঞ্চল হয়ে উঠলেন ঠাকুর। 'সবই তো ইহকালের জন্যে সংগ্রহ করছ, ও পারের জন্যে কি যোগাড়যন্ত্র করলে?'

'ও পারের কাণ্ডারী তো তুমি। শেষের দিনে তুমি আমায় পার করবে সেই আশায়ই তো শেষ পর্যন্ত বসে থাকব। আমায় উদ্ধার না করলে তোমার পতিত-পাবন নামে কালি পড়বে।'

চলো যদু মল্লিকের বাড়ি।

তার মা ঠাকুরকে কাছে বসে খাওয়ান আর কাঁদেন। তাঁর বাৎসল্য-রস।

গাড়িতে উঠলেন ঠাকুর। সঙ্গে লাটু, হাতে ঠাকুরের বটুয়া আর গামছা। আর হয়তো অতুলকৃষ্ণ, গিরীশ ঘোষের ভাই। কৌতূহলী হয়ে এটা-ওটা দেখছেন ঠাকুর আর শিশুর মত জিগ্‌গেস করছেন লাটুকে। বরানগরের বাজার ছাড়িয়ে চলেছেন এখন মতিঝিলের পাশ দিয়ে। ডাইনে একটা মদের দোকান, ডাক্তারখানা, চালের আড়ত, ঘোড়ার আস্তাবল। তার দক্ষিণে সর্বমঙ্গলা আর চিত্তেশ্বরীর মন্দির।

মদের দোকানে মদ খাচ্ছে মাতালেরা আর খুব হল্লা করছে। কেউ-কেউ বা গান ধরেছে স্ফূর্তিতে। কেউ-কেউ বা বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে নাচছে স্খলিত পায়ে। সব চেয়ে মজার, দোকানের যে মালিক, সে নির্লিপ্ত হয়ে দুয়ার ধরে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে চেয়ে। দোকানের চাকর তদারক করছে বেচাকেনা। এ সবে মালিকের যেন আঁট নেই। কপালে মস্ত এক সিঁদুরের ফোঁটা কেটে দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। যার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে সে বুঝি ঘরের সমুখ দিয়ে চলে যায়। আনমনে চলে যাবে। হয়তো একবার ভুলেও ভ্রূক্ষেপ করবে না।

মদ-বেচা শুঁড়ি, তার আবার আবদার! কিন্তু ঠাকুর তো মদ দেখেন না, ঠাকুর মন দেখেন। জীবিকা দেখেন না, জীবন দেখেন। দোকানের মদের ভাণ্ড আমার পূর্ণ থাকতে পারে কিন্তু অন্তরে করুণার কুম্ভটি আমার শূন্য।

ঠাকুরকে দেখতে পেয়েই হাত তুলে প্রণাম করল দোকানি। ঠাকুরের চোখ পড়ল দোকানের দিকে। তরল-অনল-উচ্ছল মাতালদের দিকে। তাদের বিহ্বল মাতামাতির দিকে। এ কি! ঠাকুরও যে মুহূর্তে বিভোর হয়ে গেলেন নেশায়। তাঁর গা-হাত-পা টলতে লাগল, এড়িয়ে গেল কথা! এ কি! ঠাকুরও মদ খেয়েছেন নাকি? কখন খেলেন?

মদ দেখে কারণের কথা মনে পড়েছে ঠাকুরের—জগৎকারণের কথা। কারণানন্দ দেখে মনে পড়েছে সচ্চিদানন্দকে। ঠাকুরও মদ খেয়েছেন, কিন্তু এ মদের নাম হরিরসমদিরা। এ মদের নাম সুরা নয় সুধা। এ মদ মদের চেয়েও দুর্মদ।

শুধু তাই নয়, চলতি গাড়ির পা-দানিতে এক পা রেখে মাতালের মত নাচতে শুরু করলেন ঠাকুর। হাত নেড়ে-নেড়ে বলতে লাগলেন চেঁচিয়ে: 'বা, বেশ হচ্ছে খুব হচ্ছে, বা, বা, বা!'

এ কি, পড়ে যাবেন যে! চলতি গাড়ি থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়লে কি আর রক্ষে আছে? ত্রস্তব্যস্ত হয়ে অতুল ধরতে গেল ঠাকুরকে, হাত বাড়িয়ে টানতে গেল ভিতরে। লাটু বাধা দিয়ে বললে, 'পড়ে যাবেন না, ভয় নেই। নিজে হতেই সামলাবেন—'

আড়ষ্ট হয়ে রইল অতুল। বুক ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল। নিজে হতেই সামলাবেন! কে জানে! পড়ে গেলেই তো সর্বনাশ! আর নয়, পাগলা ঠাকুরের সঙ্গে

আর কখনো যাব না এক গাড়িতে। দিব্যি সহজ মানুষের মত কথাবার্তা বলছিলেন, হঠাৎ কোথাকার কতগুলো মাতাল দেখে মত্ত হয়ে গেলেন। এ কখনো শুনিনি।

শুনিনি তো ঠিক, কিন্তু দেখছি স্বচক্ষে। কারণীভূতকে দেখে কারণশরীরে অকারণ আনন্দ!

গাড়ি ছাড়িয়ে গেল শুঁড়িখানা। ঠাকুর স্থির হয়ে বসলেন এসে ভিতরে। স্বাভাবিক সহজ সুরে বললেন, 'ঐ সর্বমঙ্গলা। বড় জাগ্রত। প্রণাম করো।' নিজেই প্রণাম করলেন সর্বাগ্রে।

মদ খেয়ে টং হয়েছে গিরীশ। এমন মাতাল, বেশ্যাও তখন দরজা খুলে দিতে নারাজ। হঠাৎ কি হল, দক্ষিণেশ্বরের কথা মনে পড়ে গেল আচমকা। একটা ঘোড়ার গাড়ি ডাকিয়ে নিয়ে উঠে বসল। চলো দক্ষিণেশ্বরে। সেখানে এমন একজন আছেন যিনি দরজা কখনো বন্ধ করেন না। রাত নিশুতি। মন্দিরের ফটক কখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, এতক্ষণে।

তা হোক, তবু কোথাও যদি জায়গা থাকে, সে দক্ষিণেশ্বরে। কলকাতার উত্তরে, কিন্তু আসলে দক্ষিণ। যা ভেবেছিল। ফটক বন্ধ। চার পাশ অন্ধকার। নিস্পন্দ।

কিন্তু যিনি ঘুমোন না, আর্ত জনের অন্ধ জনের কান্না শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে আছেন তাঁকে ডাকতে দোষ কি!

'ঠাকুর! ঠাকুর!' চীৎকার করে ডাকতে লাগল গিরীশ।

কে, গিরীশ না? সেই নোটো নেচো গিরীশ! নির্জন নিঃসহায় অন্ধকারে আমাকে ডাকছে কাতর প্রাণে! আমি কি থাকতে পারি স্থির হয়ে?

বাইরে বেরিয়ে এলেন ঠাকুর। ফটক খোলালেন। মাতাল গিরিশের হাত ধরলেন আনন্দে। মদ খেয়েছিস তো কি, আমিও মদ খেয়েছি। সুরাপান করি না রে, সুধা খাই রে কুতূহলে। আমারে মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে। বলে গিরীশের হাত ধরে হরিনাম করতে-করতে নাচতে লাগলেন ঠাকুর।

স্বভাব আর ছাড়তে পারে না গিরীশ। সে দিন আবার মাতাল হয়ে এসেছে গাড়িতে করে। কি করেই বা ছাড়বে? গল্প করলেন ঠাকুর: 'বর্ধমানে দেখেছিলাম একটা দামড়া গাই-গরুর কাছে যাচ্ছে। জিগগেস করলুম, এ কী হল? তখন গাড়োয়ান বললে, মশায়, এ বেশি বয়সে দামড়া হয়েছিল। তাই আগেকার সংস্কার যায়নি। একটা বাটিতে যদি রশুন গোলা হয়, রশুনের গন্ধ কি যায়? বাবুই গাছে কি আম হয়?'

ঠাকুরও তেমনি তাঁর স্বভাব ছাড়তে পারেন কই? তাঁর অযাচিত করুণার স্বভাব। ওরে গিরীশ এসেছে। নিজেই এগিয়ে গিয়ে আদর করে ধরে নিয়ে এলেন। মাতাল বলে প্রত্যাখ্যান করলেন না।

লাটুকে বললেন, 'যা তো, দ্যাখ তো গাড়িতে কিছু আছে কিনা।'

লাটু গিয়ে দেখে মদের বোতল পড়ে আছে। আর গ্লাশ আছে কাঁচের। ঠাকুরের হুকুম, নিয়ে চলল গ্লাশ বোতল। ভক্তরা যারা দেখল হেসে উঠল।

ঠাকুর বললেন, 'রেখে দে তোর কাছে। এখানে খোঁয়ারি এলে তখন কোথায় পাব?'

মদের মধ্য দিয়েই ওর মুক্তি আসবে। শেষকালে আর মদ থাকবে না, থাকবে মাদকতা। ক্রোধ থাকবে না, থাকবে তেজ। কাম থাকবে না, থাকবে প্রেম। লোভ থাকবে না, থাকবে ব্যাকুলতার হাওয়া।

গিরীশের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন ঠাকুর। রাঙা চোখ শাদা করে দিলেন।

গিরীশ বললে, 'আমার আস্ত বোতলের নেশাটাই মাটি করে দিলে।'

'যদি পাপ থেকে পরিত্রাণ পাবই জানতুম', গিরীশ আপশোষ করেছিল, 'তবে আরো কিছু পাপ করে নিতুম শখ মিটিয়ে।'

সে বার লছমনঝোলায় শরৎ-মহারাজ আর হরি-মহারাজ খুব ভাঙ খেয়েছে। নেশা করে শুধু ঠাকুরের কথাই কইতে লাগল। কইতে-কইতে চোখ শাদা হয়ে গেল, নেশার লেশমাত্র রইল না।

বাকি রাতটুকু তোমার কথাই কইতে দাও। এই ব্যাধির রাত, বিকারের রাত কেটে যাক। তোমার কথায় জাগুক একবার সেই আরোগ্যের সুপ্রভাত।

* ৮৭ *

'আমাকে বিদ্যাসাগরের কাছে নিয়ে যাবে?' মাস্টারমশাইকে জিগগেস করলেন ঠাকুর। 'আমার দেখতে বড় সাধ হয়।'

বিদ্যাসাগরের ইস্কুলে মাস্টারি করেন, একদিন কথাটা পাড়লেন গিয়ে মাস্টার-মশাই। বিদ্যাসাগর জিগগেস করলেন, 'কেমনতরো পরমহংস হে? গেরুয়া কাপড় পরে থাকেন নাকি?'

'না, লালপেড়ে কাপড় পরেন। গায়ে জামা, পায়ে বার্ণিশ-করা চটিজুতো। রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন একটি ঘরে, তক্তাপোশের উপর সামান্য বিছানা, তাতেই শোন, মশারি খাটান। দেখতে অত্যন্ত শাদাসিধে, কিন্তু এমন আশ্চর্য লোক আর দেখা যায় না। ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু জানেন না সংসারে।'

বটে? খুশি হয়ে উঠলেন বিদ্যাসাগর। বললেন, 'শনিবার চারটের সময় নিয়ে এস।'

গাড়ি করে যাচ্ছেন রামকৃষ্ণ। সঙ্গে মাস্টার, ভবনাথ আর হাজরা।

আহা, ভবনাথ কেমন সরল! বিয়ে করে এসে আমায় বলছে, আমার স্ত্রীর উপর এত স্নেহ হচ্ছে কেন? তা, স্ত্রীর উপর ভালোবাসা হবে না? এটিই জগৎমাতার ভুবনমোহিনী মায়া। এই স্ত্রী নিয়ে মানুষ কী না দুঃখভোগ করছে। তবু মনে করে এমন আত্মীয় আর কেউ নেই। 'কুড়ি টাকা মাইনে—তিনটে ছেলে হয়েছে—তাদের ভালো করে খাওয়াবার শক্তি নেই, বাড়ির ছাদ দিয়ে জল পড়ছে, পয়সা নেই মেরামত করার—ছেলের নতুন বই কিনে দিতে পারে না, ছেলের পৈতে দিতে পারে না—এর কাছে আট আনা ওর কাছে চার আনা ভিক্ষে করে—

বিদ্যারূপিণী স্ত্রীই যথার্থ সহধর্মিণী। এক হাতে সংসারের কাজ করে, আরেক হাতে স্বামীর হাত ধরে নিয়ে চলে ঈশ্বরের পথে।

আর হাজরা? অনেক জপতপ করে, মন পড়ে আছে বাড়িতে, স্ত্রী-ছেলে জমি-জমার উপর। তাই ভিতরে-ভিতরে দালালিও করে। টাকাওয়ালা লোক দেখলে কাছে ডাকে, লম্বা-লম্বা কথা শোনায়, বলে, রাখাল-টাখাল যা সব দেখছ, জপতপ করতে পারে না, হো-হো করে ঘুরে বেড়ায়।

'যদি কেউ পর্বতের গুহায় বাস করে, গায়ে ছাই মাখে, উপবাস করে, নানা কঠোর সাধনা করে, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে বিষয়ে মন, কামকাঞ্চনে মন, সে লোককে বলি ধিক। আর যার কামকাঞ্চনে মন নেই, খায় দায় বেড়ায়, তাকে বলি ধন্য।'

পোল পার হয়ে শ্যামবাজার হয়ে আমহার্স্ট স্ট্রিটে পড়েছে গাড়ি। এই বাদুড়-বাগানের কাছে এসে গেলাম। মুহূর্তে ভাবাবেশ হল রামকৃষ্ণের।

এই রামমোহন রায়ের বাগান-বাড়ি।

রামকৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এখন ও সব আর ভালো লাগছে না।'

এখন শুধু বিদ্যাসাগর। বিদ্যা—যা থেকে ভক্তি, দয়া, প্রেম, জ্ঞান—যা শুধু ঈশ্বরের পথে নিয়ে যায়। সেই বিদ্যার সমুদ্র।

দোতলা, ইংরেজ-পছন্দ বাড়ি। চারদিকে দেয়াল, পশ্চিম ধারে ফটক। পাঁচিল থেকে নিচের ঘর পর্যন্ত ফুলের কেয়ারি। বিদ্যাসাগর উপরে থাকেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই উত্তরে একটি কামরা তার পূবে হল-ঘর। হল-ঘরের পূব প্রান্তে টেবিল-চেয়ার। সেইখানে পশ্চিমমুখো হয়ে বসে কাজ করেন বিদ্যাসাগর। হলঘরের দক্ষিণে বিদ্যাসাগরের লাইব্রেরি। সে আরেক বিরাট শব্দসমুদ্র। পাশেই নিরীহ শোবার-ঘর।

'মা গো, পণ্ডিতের সংগে দেখা করতে চলেছি। আমার মুখ রাখিস মা।'

গাড়ি থেকে নামলেন রামকৃষ্ণ। গায়ে একটি লংক্লথের জামা, পরনে লালপেড়ে ধুতি, আঁচলটি কাঁধের উপর ফেলা। পায়ে বার্ণিশ-করা চটি জুতো। উঠোন পেরিয়ে যেতে-যেতে জিগগেস করলেন মাস্টারকে, 'জামার বোতাম খোলা রয়েছে, এতে কিছু দোষ হবে না?'

'আপনার কিছুতে দোষ হবে না।' বললে মাস্টার। 'আপনার বোতাম দেবার দরকার নেই।'

নিশ্চিন্ত হলেন ঠাকুর। বালককে বোঝালে যেমন নিশ্চিন্ত হয়, তেমনি।

হল-ঘরে না বসে উত্তরের কামরায় বসেছেন বিদ্যাসাগর। বয়স আন্দাজ বাষট্টি। রামকৃষ্ণের থেকে ষোলো-সতেরো বছরের বড়। খর্বাকৃতি, মাথাটি প্রকাণ্ড, চার পাশ উড়িয়াদের মতো কামানো। পরনে শাদা থান কাপড়, গায়ে হাত-কাটা ফ্লানেলের জামা, গলায় পৈতে দেখা যাচ্ছে, পায়ে ঠনঠনের চটি জুতো। বাঁধানো দাঁতগুলো ঝকঝক করছে।

রামকৃষ্ণ ঘরে ঢুকতেই বিদ্যাসাগর উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন। যে টেবিল সামনে রেখে দক্ষিণাস্য হয়ে বসে ছিলেন বিদ্যাসাগর, তার পূব পাশে এসে দাঁড়ালেন রামকৃষ্ণ। বাঁ হাতখান টেবিলের উপর। যেন সংলগ্ন হয়ে আছেন বিদ্যাসাগরে।

একদৃষ্টে তাঁকে দেখছেন আর হাসছেন ভাবাবেশে। ভাবাবেশ সংবরণ করবার জন্যে মাঝে-মাঝে বলছেন, 'জল খাব।' 'জল খাব।'

দেখতে-দেখতে ভিড় হয়ে গেল ঘরের মধ্যে। পিছনে একটা পিঠ-তোলা বেঞ্চি ছিল, তাতে বসলেন রামকৃষ্ণ। সেখানে একটি ছেলে বসে। বিদ্যাসাগরের কাছে ভিক্ষে করতে এসেছে, পড়াশোনার খরচ চলে না। তার থেকে সরে বসলেন ঠাকুর। বললেন, 'মা, এ ছেলের বড় সংসারাসক্তি। তোমার অবিদ্যার সংসার। এ অবিদ্যার ছেলে।'

আর এ ছেলেটি? সামনে-বসা আরেকটি ছেলেকে নির্দেশ করলেন বিদ্যাসাগর।

'এ ছেলেটি সৎ। যেন অন্তঃসার ফল্গু নদী। উপরে বালি, কিন্তু একটু খুঁড়লেই জল দেখতে পাবে ভিতরে।'

জল এসে গেল ভিতর থেকে। বিদ্যাসাগর মাস্টারকে জিগগেস করলেন, 'কিছু খাবার দিলে ইনি খাবেন কি?'

'আজ্ঞে আনুন না!' বললে মাস্টার।

বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেলেন বাড়ির মধ্যে। একথালা মিষ্টি নিয়ে এলেন। বললেন, 'এগুলি বর্ধমান থেকে এসেছে।'

মিষ্টিমুখ করলেন রামকৃষ্ণ। ভবনাথ আর হাজরাও কিছু অংশ পেল। মাস্টারের বেলায় বিদ্যাসাগর বললেন, ও তো ঘরের ছেলে। ওর জন্যে আটকাবে না।

মিষ্টিমুখের পর বিদ্যাসাগরের দিকে চেয়ে মিষ্টি হেসে বললেন রামকৃষ্ণ, 'আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হ্রদ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখলুম!'

বিদ্যাসাগর হেসে জবাব দিলেন, 'তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।'

'না গো! নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি যে ক্ষীরসমুদ্র।'

এক ঘর লোক। কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে। কথার রসগ্রহণ করে হাসছে সবাই। কিন্তু বিদ্যাসাগর চুপ।

'তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম।' বলছেন রামকৃষ্ণ, 'সত্ত্বগুণ হয় দয়া থেকে। শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্যে দয়া রেখেছিলেন। তোমার বিদ্যাদান অন্নদান—সেও ঐ দয়া থেকে। নিষ্কাম হয়ে করতে পারলে ঐতেই ভগবান-লাভ। কেউ করে নামের জন্যে, পুণ্যের জন্যে, তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। আর তোমার হচ্ছে দয়ার থেকে, দয়ার জন্যে। তাই তুমি তো সিদ্ধ গো!'

'আমি সিদ্ধ?' চমকে উঠলেন বিদ্যাসাগর। 'আমি আবার ভগবানের জন্যে সাধন করলুম কবে?'

রামকৃষ্ণ হাসলেন। বললেন, 'আলু-পটল সিদ্ধ হলে কী হয়? নরম হয়। তুমিও তো তেমনি নরম হয়ে গেছ। পরের দুঃখে তোমার হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছে। তোমার এত দয়া, তুমি নও তো আর কে সিদ্ধ?'

শিবনাথের কোলে একটি সাত-আট বছরের মেয়ে। শিবনাথ তখন আছে বন্ধু যোগেনের সঙ্গে। যোগেন দ্বিতীয়পক্ষে একটি বিধবা মেয়েকে বিয়ে করে সমাজ-

পরিত্যক্ত হয়ে বাস করছে নিরালায়। একটা হিন্দু চাকর পর্যন্ত জোটেনি। থাকবার মধ্যে আছে সতীর্থ বন্ধু শিবনাথ আর মহাপ্রাণ অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরই পুরোত যোগাড় করে দিয়েছেন বিয়ের, নিমন্ত্রিতদের খাওয়াবার খরচ দিয়েছেন, নববধূকে দিয়েছেন মূল্যবান উপহার।

যোগেনের বাড়িতে প্রায়ই আসেন বিদ্যাসাগর। মজার-মজার গল্প বলে হাসিয়ে যান সবাইকে। বিষাদভাব লাঘব করেন। কঠোর ব্রতোদ্‌যাপনের প্রতিজ্ঞাতে ধার যোগান। সে দিন এসে দেখেন, শিবনাথের কোলে সুশ্রী একটি মেয়ে।

'কে এই মেয়ে?'

'নাপিতদের মেয়ে। আমাদের পাড়াতেই থাকে। দাদা বলে আমাকে।'

'বা, বেশ মেয়েটি তো?' একটু আদর করতে হাত বাড়ালেন বিদ্যাসাগর।

'কিন্তু জানেন কি?' কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হয়ে এল শিবনাথের: 'ও বিধবা।'

বিধবা? যেন বাজ পড়ল ঘরের মধ্যে। স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন বিদ্যাসাগর। যন্ত্রণায় মুদ্রিত করলেন দু'চোখ। শিবনাথ দেখতে পেল, বড়-বড় জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে।

হঠাৎ দু'বাহু বাড়িয়ে অবোলা শিশুটাকে টেনে নিলেন বুকের মধ্যে।

শিবনাথ বললে, ওকে ফের দিয়ে দেবার জন্যে ওর মাকে বোঝাচ্ছি ক'দিন থেকে। 'কিছু ভাবতে হবে না। ওকে আগে বেথুন ইস্কুলে ভর্তি করে দাও। খরচ-পত্র যা লাগে সব আমি দেব। তার পর একদিন পালকি ভাড়া করে ওকে আর ওর মাকে পাঠিয়ে দিও আমার বাড়িতে, আমার মা'র কাছে।'

বিদ্যাসাগর কি সিন্ধ নয়?

শিবনাথ যখন ব্রাহ্ম হয়, তখন তার বাবা কেঁদেছিলেন। বলেছিলেন বিদ্যাসাগরকে, 'মানুষ যেমন যমকে ছেলে দেয়, তেমনি আমি কেশবকে দিয়েছি।'

শুনে স্থির থাকতে পারেননি বিদ্যাসাগর। বাপের দুঃখে কেঁদেছিলেন আকুল হয়ে। শিবনাথকে বাড়ির থেকে বের করে দিয়েছে বাপ। ত্যাজ্যপুত্তুর করেছে। স্ত্রী আর ছোট্ট একটি মেয়ে নিয়ে আলাদা বাসা করে আছে কায়ক্লেশে। স্কলারশিপের টাকা ক'টিই ভরসা। পথে-ঘাটে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা হয় মাঝে-মাঝে। মুখ ফিরিয়ে নেন না বিদ্যাসাগর। বরং মুখ বাড়িয়ে গলা নামিয়ে জিগ্‌গেস করেন আলগোছে, 'হ্যাঁ রে, কেমন করে চলে?'

শুধু বাপের কষ্টেই কাঁদেন না, ছেলের কষ্টেও কাঁদেন। প্রায়ই খোঁজ নিতে আসেন। এটা-ওটা পরামর্শ দেন। শিবনাথ যদি কখনো অর্থ সাহায্য চেয়ে বসে, বোধ হয় তারই জন্যে নীরবে অপেক্ষা করেন। কত ছেলেবেলা থেকে ভালোবাসেন শিবনাথকে। যখনই তাদের বাড়ি যান, দু'আঙুলের চিমটেতে শিবনাথের ভুঁড়ির মাংস টেনে ধরেন। ওটাই তাঁর আদরের চেহারা! সে আদরের ভয়ে পালিয়ে বেড়ায় শিবনাথ। কিন্তু বিদ্যাসাগর ঠিক তাকে ধরে আনেন। তার ভুঁড়িতে চিমটি না কাটতে পেলে বিদ্যাসাগরের শান্তি নেই। তখন তো বাপ-ছেলে একসঙ্গে ছিল। এখন ছেলে একা, বাপ একা। দুয়ের দুঃখেই কাঁদেন বিদ্যাসাগর। একবার এ বাড়ি যান, আরেক বার ও বাড়ি।

কাঁদবার আগে পর্যন্তই বিচার। একবার কান্না এসে গেলে বিচার ধুয়ে যায়।

বিদ্যাসাগরের কাছে কত লোক এসে গাল পাড়ে শিবনাথকে। ব্রাহ্মসমাজে ঢুকেছে বলেই সবাইর রাগ। কিন্তু বিদ্যাসাগর বলেন, 'যাই ও করুক, ফেলতে পারব না ওকে। যাই বলো, ওকে বুকে রাখলে আমার বুক ব্যথা করে না।'

সেই শিবনাথের ঘরে আরেক জন তার বন্ধু এসেছে। বন্ধুটিও শিবনাথের মত সমাজদ্রোহী, বিধবা বিয়ে করেছে, আর শিবনাথের মতই পিতৃ-পরিত্যক্ত। খুব ধনী বাপের ছেলে, এখন একেবারে দুরবস্থার চরম। তার উপর রোগ হয়েছে মারাত্মক। বিধবা বিয়ে ঘটাতে হাত ছিল শিবনাথের, তাই এখন ত্যাগ করতে পারল না বন্ধুকে। সপুত্রকলত্র আশ্রয় দিল। ডাক্তার ডাকল। কিন্তু কিছুই সুরাহা হল না। তখন বন্ধু বললে, বাবাকে একটা খবর দাও। তিনি ক্ষমা না করলে আর সারব না আমি। তার বাবার সঙ্গে পরিচয় নেই শিবনাথের। কি করে তাঁকে ধরে! নিজে গেলে হয়তো উলটো ফল হবে। বন্ধুর অন্তিম কামনা পূর্ণ হবে না। তখন অগতির গতি, বিদ্যাসাগরকে গিয়ে ধরল শিবনাথ। বিদ্যাসাগর তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। 'জানো ও ছোকরার চরিত্র? ওর সব অতীত কীর্তি?'

সব জানে শিবনাথ। মুখ বুজে হেঁট হয়ে রইল। বুঝল, বৃথা, আশালতা দগ্ধ হয়ে গেল সূর্যতেজে।

'ওকে সাহায্য করবে না আর কিছু! উলটে ওকে চাবকে দেওয়া উচিত।'

সেই বিরাট আননের উপর ক্রোধের রুদ্ররঙ্গ দেখতে লাগল শিবনাথ। নিরুপায়ের মত প্রণাম করল বিদ্যাসাগরকে। চলে যাবার আগে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'একজন মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ ইচ্ছাটি পূর্ণ করতে পারলাম না।'

মহামানুষটি নড়ে উঠলেন। ধমক দিলেন শিবনাথকে। 'বোস্। আমি তোকে চলে যেতে বলেছি? হ্যাঁ, সেই কাল সকালের আগে তো আর কিছু হবে না? যা, কাল সকালেই নিয়ে যাব তার বাপকে। আর, শোন, দাঁড়া, এই ক'টা টাকা নিয়ে যা।' শিবনাথের হাতে ক'টা টাকা গুঁজে দিলেন বিদ্যাসাগর: 'তুই একা কদ্দিন চালাবি? এই নে। দেখিস ওর স্ত্রী আর সন্তান যেন কষ্টে না পড়ে।'

বলো, সিদ্ধ কি নয় বিদ্যাসাগর? যে মাতৃভক্ত সে কি সাধক নয়? মা বলেছেন ভাইয়ের বিয়েতে হাজির হতে, যেমন করেই হোক, দামোদর সাঁতরে চলে গেলেন। তারপর মা যখন চলে গেলেন, বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে গেলেন নির্জনে। আর কিছুর জন্যে নয়, মা'র জন্যে কাঁদতে বুক ভরে। পরের জন্যে যে কাঁদে সে তো পরমের জন্যেই কাঁদে। পরই তো পরম। পরেশও যে, পরমেশও সে-ই। ব্রহ্মই তো পরব্রহ্ম। ব্রহ্মের জন্যে যে কাঁদে সেই তো সিদ্ধ। বিদ্যাসাগর বললেন রামকৃষ্ণকে, 'কিন্তু জানেন তো, কলাইবাটা সেদ্ধ হলে শক্ত হয়ে যায়।'

'তুমি তেমনি নও গো। তুমি দরকচা-পড়া পণ্ডিত নও। শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে, কিন্তু তার নজর ভাগাড়ের দিকে। যারা শুধু পণ্ডিত, শুনতেই পণ্ডিত, এদিকে কামকাঞ্চনে আসক্তি, তারা শকুনির মতই পচা মড়া খুঁজছে। তুমি সে রকম নও। বিদ্যার ঐশ্বর্য—দয়া ভক্তি বৈরাগ্য খুঁজছ। তুমি সিদ্ধ নও তো কে সিদ্ধ?' এক জ্ঞানময় পুরুষ দেখছেন এক আনন্দময় পুরুষকে।

'ছেলেরা মেলায় যাবার বায়না ধরেছে', হেনরিয়েটা কাঁদো-কাঁদো মুখে বললে ঘরে ঢুকে, 'কিন্তু হাতে মোটে আমার তিন ফ্রাঙ্ক—'

তখনকার হিসেবে দেড় টাকার কাছাকাছি। মধুসূদন তাকাল একবার শূন্য চোখে। বললে, 'শুধু আজকের দিনটা অপেক্ষা করো।'

'কত দিন-রাতই তো গেল এমনি অপেক্ষা করে-করে। তুমি কি মনে করো তোমার দেশের লোক কেউ তোমাকে সাহায্য করবে ?'

সে আশা ছেড়েছে মধুসূদন। সাহায্য দূরের কথা, পাওনা টাকাই পাঠাচ্ছে না সরিকেরা। এদিক-সেদিক করে চার হাজার টাকা পাওনা। একটি কপর্দকেরও দেখা নেই। সরিক তো নয় কালসাপ। তাদের কথা ভাবছে না মধুসূদন। দেশে কত-কত মানী-গুণী। কত টাকার আণ্ডিল। তাদের কথাও ভাবছে না। হেন লোক নেই যার সংগে চেনাশোনা নেই মধুসূদনের। এক-এক করে মনে করতে লাগল মুখগুলো। একটা মুখও এমন নয় যে মন উন্মুখ হয়। বিত্তবান তো অনেক আছে, কিন্তু চিত্তবান কোথায় !

না, একজন বোধ হয় আছে। একজন নয়, দুজন। একজন ঈশ্বর, আরেকজন ঠিক সেই ঈশ্বরের নিচেই। তারই জন্যে অপেক্ষা করতে বলছে স্ত্রীকে। এমনিতে অস্থিরমতি মধুসূদন, মুহূর্তের বশে কাজ করতে গিয়ে অনেক ভুল সে করেছে জীবনে, অনেক নির্বুদ্ধিতা, কিন্তু এবার পরিত্রাতা খুঁজতে গিয়ে ভুল করেনি এতটুকু। এত দিনে একটি স্থিরবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। অন্তত এই একবার।

'শুধু আজকের দিনটা—'

'কি আছে আজকে ?'

'আজকে ডাক আসবার দিন। আজ ঠিক চিঠি আসবে। একটা শুভসংবাদ এসে যাবে কিছু।'

'যদি না আসে ?'

'যদি না আসে !' চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি করতে লাগল মধুসূদন : 'তাহলে আমি সটান জেলখানায়, আর তোমরা, তুমি আর ছেলেমেয়েরা, কোনো একটা অনাথ-আশ্রমে।'

জামার হাতায় চোখ মুছল হেনরিয়েটা।

'কিন্তু, কান্নাটা শেষ পর্যন্ত স্থায়ী নাও হতে পারে। কেননা টাকার জন্যে যাকে এবার লিখেছি—'

'কে সে ?'

'সমস্ত বাঙলাদেশে সে শুধু একজনই আর্য ঋষির মত জ্ঞানী, ইংরেজের মত কর্মোৎসাহী, আর বাঙালী মায়ের মত কোমলহৃদয় ! এখানেও যদি না হয় ! না, না, হতেই হবে, নিজে বিপন্ন হয়েও আসবে বিপদুদ্ধারে। আমি নদী-নালার কাছে যাইনি, গিয়েছি সমুদ্রের কাছে !'

দরজার কড়া নড়ে উঠল।

ঐ এলো বুঝি সেই সমুদ্রের মুক্ত হাওয়া! বাধাহীন স্বাধীনতার শুভ্রতা।

আদালতের বেলিফ। দরজা একটু ফাঁক করে উঁকি মেরে দেখল হেনরিয়েটা। ক্ষিপ্র হাতে ফের বন্ধ করে দিল। ক্রোক করবার মত আর নেই কোনো মালামাল। এবার হাতে-হাতে গ্রেপ্তার করতে এসেছে। আবার নড়ে উঠল কড়া।

'কে?'

'চিঠি।'

উল্লাসে লাফিয়ে উঠল মধুসূদন। 'বলিনি, চিঠি আসবে দেশ থেকে?' ত্বরিত হাতে খুলে ফেলল দরজা। 'কোথাকার চিঠি?'

তোমাকে বলিনি? সাগরের মত প্রাণ! বাঙালী মায়ের মত হৃদয়! আশ্চর্য, এমন আকাঙ্ক্ষাও ফলে মানুষের জীবনে! এই দেখ। পনেরো শো টাকার ড্রাফট পাঠিয়েছেন বিদ্যাসাগর।

শুধু কি সেই একবার? আরো বহুবার টাকা পাঠালেন। জড়িয়ে পড়লেন ঋণ-জালে। শেষ পর্যন্ত ব্যারিস্টারি পাশ করিয়ে ছাড়লেন।

সেই মাইকেল দেশে ফিরছে এত দিনে। বিদ্যাসাগর তার জন্যে পছন্দসই বাড়ি ভাড়া করে রেখেছেন। বিলেত-ফেরতের মত উপযুক্ত করে সাজিয়ে দিয়েছেন জিনিসে-আসবাবে। কিন্তু সে-বাড়িতে উঠল না মাইকেল। গেল স্পেন্স হোটেলে। অবজ্ঞা দেখে অভিমান করলেন না বিদ্যাসাগর। নিজে থেকে আনতে গেলেন ডেকে। এক কথায় ফিরিয়ে দিল মাইকেল। ঐ নেটিভ পাড়ায় ঐ নোংরা পরিবেশের মধ্যে সে থাকবে! বিলেতে থেকে ব্যারিস্টার হয়ে আসা ব্যর্থ করে দেবে এমন করে! বিষণ্ন মনে ফিরে এলেন বিদ্যাসাগর। শূন্য সাজানো বাড়ির দিকে তাকালেন শূন্য চোখে।

তবু কি সেই বাঙালী মায়ের হৃদয় শুষ্ক হয় কখনো? কত বাধা-বিপদ ফিরতে লাগল পদে-পদে—এমন কি, হাইকোর্টেই ঢুকতে পাচ্ছে না মাইকেল। চিরযোদ্ধা বিদ্যাসাগরের ডাক পড়ল। গাঁয়ের নামে যাঁর নাম—আর কে আছে অমন বীরসিংহ! হটিয়ে দিলেন সব বাধা-নিষেধ, ঢুকিয়ে দিলেন হাইকোর্টে।

কর্মে ঢুঢু, শুধু মুখেই কৃতজ্ঞতা। শুধু চলচিত্তের চলচ্চিত্র। স্থিরদ্যুতি নক্ষত্র নয়, ধাবিত স্খলিত উল্কাপিণ্ড।

টাকার কথাটা একবার মনে করিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর। টাকা? কত চাই? দুই-দশ-কুড়ি হাজার টাকা এই এসে পড়ছে হাতের মুঠোয়। মধুসূদনের জন্যে কত ধার হয়েছে বিদ্যাসাগরের?

মুখে শুধু বড়-বড় কথা। যত বহ্বাস্ফোট। হাতে টাকা এলে আর ধার শোধ নয় নির্বিরোধ স্বেচ্ছাচার। ছন্দে যেমন অবন্ধন ব্যয়ে তেমনি উড়নচণ্ডি।

শুধু বিদ্যাসাগরেরই ঋণ বাড়ে। তাঁর সংস্কৃত প্রেসের দু-তৃতীয়াংশ বিক্রি হয়ে যায়। তবু কি বাঙালী মায়ের হৃদয় নিষ্ঠুর হয়, নীরস হয়?

বলো, এ কোন্ সাধনায় সিদ্ধ বিদ্যাসাগর? রামকৃষ্ণ কি আর ভুল বলেন? এই মধুসূদনই রামকৃষ্ণের কাছে কটি কথা চেয়েছিল। শান্তির কথা, আশ্বাসের

কথা। মা-কালী রামকৃষ্ণের মুখ চেপে ধরেছিলেন, ধর্মত্যাগীর সঙ্গে বলতে দেননি কথা। কিন্তু কথার-চেয়ে গান বড়। ধর্মের চেয়ে বড় ঈশ্বরকরুণা।

সেই করুণায় বিগলিত হল রামকৃষ্ণ। করুণার ধারা নেমে এল সুরস্রোতে। কথা বলতে দিচ্ছেন না, কিন্তু গান তো কথা নয়, গান গাইতে দোষ কি। আর এ গান তো অন্যের রচনা, রামপ্রসাদের রচনা। রামকৃষ্ণ গান ধরল। আর মধুসূদন কৃতজ্ঞতা নেমে এল অশ্রুবর্ষণে।

আমি অমিত্রাক্ষর লিখি, কিন্তু হে অক্ষর, তুমি তো অমিত্র নও।

'তুমি মিথ্যেবাদী, তুমি প্রবঞ্চক।' গর্জন করে উঠলেন বিদ্যাসাগর : 'ভদ্রলোকের ছেলে বলে এসে আমার সঙ্গে এই চাতুরীটা করলে?'

সামান্য একজন পুলিশ সাব ইনস্পেকটর। ভয়ে-দুঃখে দাঁড়িয়ে আছে বিমূঢ় হয়ে। কী যে অপরাধ করেছে বুঝতে পারছে না।

অপরাধের মধ্যে টাকা ধার নিয়েছিল বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে। বিপদে না পড়ে কি আর কেউ কর্জ করে! আর, সে কী নিদারুণ বিপদ। ছ মাসের জেলের হুকুম হয়েছে, চাকরিরও দফা রফা। এখন হাইকোর্টে মোশন করতে হবে। মনোমোহন ঘোষকে ব্যারিস্টার দেবার ইচ্ছে, কিন্তু তার সাতশো টাকা ফি। বাড়িতে লেখা হয়েছে, এখনো এসে পৌঁছয়নি টাকা।

সুতরাং মুরুব্বি ধরে চলো বিদ্যাসাগর। অনুপায়ের উপায়, অশরণের আশ্রয়। 'কি করতে হবে তাই বলো না।'

মনোমোহন ঘোষকে আপনি শুধু একটা চিঠি লিখে দিন যেন বিনা ফি-তে কাজটি করে দেয়। হ্যাঁ, আজকেই দিন মামলার। হপ্তা খানেকের মধ্যেই টাকা এসে যাবে বাড়ি থেকে, তখন দিয়ে দেব ঘোষ-সাহেবকে—নির্ঘাত দিয়ে দেব।

'বাড়ি কোথায়?'

নাটোর। পুলিশে চাকরি করে, বিরুদ্ধ দল মিথ্যেমিথ্যি ফাঁসিয়ে দিয়েছে। জেলটা রদ করাতে না পারলে একটা পরিবার ছারখারে যাবে। শুধু যদি একটা সুপারিশ লিখে দেন—

চুপচাপ কতক্ষণ ভাবলেন বিদ্যাসাগর। বললেন, 'এ কর্ম আমার দ্বারা হবে না। এক পা জলে এক পা বাইরে এমন লোকের টাকা বাকি রেখে কাজ করতে বলা অবিচার করা। মামলায় যদি হার হয়? জেলের হুকুম যদি বহাল থাকে? না বাপু, অসম্ভব, এমনটি পারব না কিছুতেই।'

তবে আমি যাই কোথা? শুনেছি যার কেউ নেই তার বিদ্যেসাগর আছে। যার বিদ্যেসাগরও নেই সে যাবে কোন দুয়ারে?

কাগজ-কলম টেনে নিলেন বিদ্যাসাগর। ঘসঘস করে লিখতে লাগলেন, মাই ডিয়ার ঘোষ—

হঠাৎ থেমে পড়ে বললেন, 'অসম্ভব। এ কর্ম হবে না আমার দ্বারা। অন্যায় অনুরোধ করি কি করে?'

দারোগা কেঁদে ফেলল। বললে, 'তা হলে আমি জেলেই যাব?'

একটা তীর যেন এসে বিদ্ধ করল বিদ্যাসাগরকে। চোখের কোণ ভিজে উঠল।

জানা ছিল, তবু ব্যাঙ্কের খাতা খুলে আরেকবার দেখলেন এক পয়সাও মজুত নেই। তবু, আশ্চর্য, একটা চেক কাটলেন। সাত শো টাকার চেক। বললেন, 'এই চেক নিয়ে গিয়ে ঘোষকে দাও। আর বলো, কাল, সাড়ে এগারোটার আগে যেন ব্যাঙ্কে না পাঠায়। যে করে হোক আজকের দিনের মধ্যে সাত শো টাকা ব্যাঙ্কে জমা করে দেব।'

হাইকোর্টে খালাস পেয়েছে দারোগা। ধার শোধ করতে টাকা নিয়ে এসেছে। এক আধলা কম নয়, পুরো সাত শো টাকা। সাত দিনের মধ্যে ধার শোধ দেবার কথা ছিল, চার দিনের দিনই পৌঁছে দিয়েছে টাকা। সহাস্য মুখে প্রণাম করে উঠেছে। কিন্তু হঠাৎ এ কী বিস্ফোরণ! তুমি মিথ্যেবাদী, তুমি প্রবঞ্চক, তুমি অভদ্র—

'তা ছাড়া আবার কী।' বিদ্যাসাগর তেমনি গরজাতে লাগলেন: 'তুমি না বলেছিলে তুমি পুলিশে কাজ করো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

'মিথ্যে কথা। একশো বার মিথ্যে।'

'সে কি কথা? আপনি খোঁজ নিন, খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন। সামান্য চাকরি, মিথ্যে বলতে যাব কেন?'

'মিথ্যে ছাড়া আর কী বলব!' একটু যেন প্রশমিত হয়েছেন বিদ্যাসাগর। কণ্ঠস্বরে নির্জলা ক্রোধের পরিবর্তে এসেছে যেন একটু অভিমানের ঝাঁজ: 'এত দিনে কত লোক "দেব" বলে টাকা নিয়ে আর দিল না। অপারগের কথা ছেড়ে দিই, কত সম্পন্ন বড়লোকও টাকা ধার নিয়ে মেরে দিলে। বন্ধুবান্ধবের তো কথাই নেই। যে দেশে নিলে আর দিতে চায় না, সে দেশের লোক হয়ে, শুধু তাই নয় পুলিশের দারোগা হয়ে, পুরোপুরি ফিরিয়ে দেব, এ বিশ্বাস করি কি করে? তা ছাড়া সাত দিনের কড়ার করে চতুর্থ দিনে ফেরত দেবে এ কল্পনার অতীত। তবে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলব না তো কি! তোমার খালাস পাওয়া উচিত হয়নি। সাত দিনের কড়ারে টাকা নিয়ে চার দিনের দিন যে শোধ দেয় সে পুলিশের দারোগাগিরি করে জেলে যাবে না তো কে যাবে!'

কাউকে চিঠি লিখতে বসেই প্রথমে লেখেন: 'শ্রীহরিঃ শরণম্'। বাজে বা বেফাঁস কথা লেখবার লোক নন বিদ্যাসাগর। কিন্তু সংসারে বাস্তব চক্ষে যদি কারু শরণ নিয়ে থাকেন, তবে সে বাপ-মা। পাকপাড়া রাজবাড়ির হডসন সাহেবকে দিয়ে দুখানা ছবি করিয়ে নিয়েছেন—তাদের সামনে দিনারম্ভের প্রথম প্রণামটি না রেখে জলস্পর্শ করেন না বিদ্যাসাগর। ওই তাঁর হর-গৌরী। তাঁর রাম-সীতা। তাঁর লক্ষ্মী-নারায়ণ।

'পাকপাড়া রাজবাড়িতে ভালো এক সাহেব পোটো এসেছে, মা', ভগবতী দেবীকে বললেন বিদ্যাসাগর, 'ইচ্ছে করছে তোমার একখানা ছবি আঁকিয়ে নি।'

'দূর, আমার ছবি কী হবে! ছি-ছি!' ভগবতী দেবী মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

'ছবি তো তোমার জন্যে নয়, ছবি আমার জন্যে। যখন যেখানে থাকি, সকাল-সন্ধে থাকবে আমার চোখের সামনে। প্রাণটা যখন কেমন করে উঠবে তখন একবার দেখব চোখ ভরে।'

রামকৃষ্ণের সেই কথা। যাকে দেখতে এসেছিস, চোখ মেলে চোখ ভরে দ্যাখ মা'র মুখখানি। ঈশ্বরের মুখের আভাস যদি কোথাও থাকে তবে এই মা'র মুখে।

'না বাপু, সাহেবের সামনে বসে ছবি আঁকাতে পারবো না।' ভগবতী দেবী আবার পাশ কাটাতে চাইলেন।

'না, মা, সে খুব ভালো লোক, আমাকে খুব ভালোবাসে, তার সামনে বসতে দোষ নেই।'

একটু বোধ হয় নরম হলেন ভগবতী। বললেন, 'তা সে এখানে আসবে তো?' 'না মা, তোমাকে পাকপাড়ার রাজবাড়িতে গিয়ে বসতে হবে। সেখানে সে আড্ডা করেছে। সে আড্ডা ভেঙে এখানে আনতে গেলে ছবি হয়তো ভালো হবে না—'

পুত্রের মুখের দিকে তাকালেন ভগবতী। বললেন, 'তোর যা ইচ্ছে তাই কর। নিন্দে হলে লোকে তো আর আমাকে নিন্দে করবে না, তোরই নিন্দে করবে। বলবে, বিদ্যাসাগর মাকে পাকপাড়া ছবি তুলতে নিয়ে গেছে।'

লোকের নিন্দাকে বিদ্যাসাগর যেন কত ভয় করে! আমি মাতৃবন্দনা করব তায় লোকনিন্দা!

সেই মা'র মৃত্যুতে দশ দিক শূন্য হয়ে গেল বিদ্যাসাগরের। বালকের মত কাঁদতে লাগলেন অঝোরে। মৃত্যুর সময় কাছে থাকতে পারনি, সেবা করতে পারনি, দুটো কথা শুনতে পারনি, এ দুঃখ রাখবার জায়গা নেই। নির্জনে চলে গেলেন, ফিরতে লাগলেন দীনহীনের মত। পায়ে জুতো নেই, মাথায় ছাতা নেই, বেশে-বাসে পরিচ্ছন্নতা নেই। থাকেন একাহারে, স্বপাকে নিরামিষ খেয়ে। নিতান্ত অসুস্থ হয়ে না পড়লে সাহায্য নেন না দিনময়ীর। কঠিন মেঝের উপর শুয়ে ঘুমোন। আর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তন্গত চিত্তে মা'র গুণাবলীর ধ্যান করেন।

এমনি এক বছর। একটানা এক বছর।

কত বছর তার পর চলে গেছে। এক দিন কি কথায়-কথায় এক বন্ধু হঠাৎ তাঁর মা'র গুণের কথা উল্লেখ করলেন। যেই শোনা, কাতর কান্নায় ফেটে পড়লেন বিদ্যাসাগর।

বন্ধু তো অপ্রস্তুত। বিদ্যাসাগর অত্যন্ত পীড়িত, দেখা করতে এসেছিলেন। কথাচ্ছলে উঠে পড়েছিল ভগবতী দেবীর প্রসঙ্গ। কিন্তু ফল এমন হবে অনুমান করতে পারেন নি। এ যে একেবারে শোকসমুদ্র!

'এত কষ্ট দেব জানলে ও-কথা পাড়তুম না।'

'কষ্ট? তুমি আমাকে কষ্ট দিলে কোথায়? তুমি তো আমার বন্ধুর মত কাজ করলে। তোমার জন্যে আমার মায়ের কথা মনে পড়ল, মায়ের নামে দু ফোঁটা চোখের জল ফেললুম। এত দুর্দশা, সব সময়ে বাপ-মাকে স্মরণ করতে পারি কই?'

এই বিদ্যাসাগর। সাগরের তুলনা সাগর। 'সাগরং সাগরোপমং'।

এই মাতৃসাধক কি সিদ্ধ নয়? নয় কি তপঃপরায়ণ ঋষি?

রামকৃষ্ণ কী করতেন? যত দিন চন্দ্রমণি জীবিত ছিলেন, রোজ সকালে গিয়ে

প্রণাম করে আসতেন। বৃন্দাবনে থেকে যাবেন ভেবেছিলেন মায়ের কথা মনে পড়তেই বৃন্দাবন ভেসে গেল। তার পর মা যখন গত হলেন তখন রামকৃষ্ণের সে কী কান্না! রামকৃষ্ণের মন্ত্রই তো মা! মুখেই হোক আর মনেই হোক মাকে যে ডাকে সে তো ভগবতীকেই ডাকে। বিদ্যাসাগরের মা-ও তাই ভগবতী!

* ৮৯ *

'ব্রহ্ম যে কি মুখে বলা যায় না।' বিদ্যাসাগরকে বলছেন রামকৃষ্ণ : 'সব শাস্ত্র-দর্শন এঁটো হয়ে গেছে। তার মানে মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল এঁটো হয়নি। সে ব্রহ্ম। সে অনুচ্ছিষ্ট।'

আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন বিদ্যাসাগর। 'বা, এটি তো বেশ কথা। এ কথা তো কোথাও শুনিনি! একটি নতুন কথা শিখলাম আজ।'

ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট।

একেবারে মুখের মধ্যে এনে ছেড়ে দিয়েছেন। ঘনিষ্ঠ আস্বাদের মধ্যে। রসনার রসাশ্রয়ে। কিন্তু সাধ্য নেই দন্তস্ফুট করো। মুখ খুলেছ কি উড়ে পালিয়েছে! বাক্যের ব্যর্থ অলঙ্কারে ভাবস্বরূপের বন্দনা চললেও বর্ণনা চলে না। ভূষণ দিয়ে কি রূপের উদ্ঘাটন হয়?

'কিন্তু যারা ব্রহ্মজ্ঞানী?'

'তারা নুনের পুতুল। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়েছিল। কত গভীর জল তার খবর দেবে। খবর দেওয়া আর হল না। যেই নামা অমনি গলে যাওয়া। কে কার খবর দেবে?'

মানুষ তো খুব বাহাদুর, তাই মনে করে আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি। সেই যে পিঁপড়ের গল্প। একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিল। এক দানা খেয়ে পেট ভরে গেল। আরেক দানা মুখে করে বাসার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় ভাবছে এবার এক সময় এসে গোটা পাহাড়টা নিয়ে যাব।

ব্রহ্ম তো নির্লিপ্ত, কিন্তু ভগবানটি কে?

যিনিই ব্রহ্ম তিনিই ভগবান। একজনেরই দু রকমের পোশাক। বাড়িতে থাকার মত শাদাসিধে চেহারার একজন, আরেকজন বাইরে বেরুবার মত একটু ফিটফাট সাজগোজ। একজন গুণাতীত, আরেকজন গুণময়। একজন ষড়্‌ভাবশূন্য, আরেকজন ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ।

আপনার কাকে বেশি পছন্দ, ব্রহ্মকে না ভগবানকে?

ব্রহ্ম যেন গতসর্বস্ব দেউলে। যেন নিষ্কিঞ্চন পথের ভিখিরি। চাল নেই চুলো নেই, যেন গাছতলায় আশ্রয়। যে বাবুর ঘর নেই, দ্বার নেই, বিনি পয়সায় যে বিকিয়ে গেল, সে বাবু আর কিসের বাবু? ভগবান ষড়ৈশ্বর্যে প্রকাশমান। কত তাঁর প্রতাপ কত তাঁর প্রভুত্ব। তাঁর যদি ঐশ্বর্য না থাকত তা হলে কে মানত

তাঁকে ? আমার কিন্তু বাপু ব্রহ্মের চেয়ে ভগবানকে বেশি ভালো লাগে। ভগবান হচ্ছে রাজা, কিন্তু ব্রহ্ম হচ্ছে জমিহীন জমিদার।

'ঈশ্বর যদি সর্বভূতেই আছেন, তবে একজনকে বেশি শক্তি আরেকজনকে কম শক্তি দিয়েছেন এর মানে কি ?'

যেমন আধার তেমনি শক্তির আয়তন। শক্তি আধারের নয়, শক্তি তাঁর। তিনিই বিকশিত হয়েছেন। যেমন দীপ তেমনি আলো। যেমন মাঠ তেমনি ফসল। যেমন কলসী তেমনি সরা।

সব তিনি। তোমাকে যখন কেউ মানে তখন জানবে তাঁকেই মানে। তোমাকে যে মানে তাতে তোমার শিং বেরিয়েছে দুটো ?

শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু নেই। তাঁকে জানবার জন্যেই বই পড়া, জনে-জনে জানাবার জন্যে নয়। পাণ্ডিত্য হচ্ছে ঢাকের বাদ্যি। পাড়া-পড়শীর ঘুম না ভাঙিয়ে ক্ষান্তি নেই। সারা গায়ে গয়না পরে একা-একা নিজের ঘরের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কে কবে শান্তি পায় ! বাইরের লোককে দেখাবার জন্যে রাস্তায় ছোটে। নামের পেছনে পদবীর পুচ্ছ নাড়ে। নিজের কথাটি পরের কথার উদ্ধৃতির স্তূপে চাপা দেয়। শুধু কোটেশন আর ফুটনোট। জানতে তো জেনেছি কিছুই নয়, তবু কতটা পড়েছি তার ফর্দও নাও। আমার বাক্যের বহরে যদি একটু অবাক হও। যেমন ঐশ্বর্য দেখিয়ে সূক্ষ্মভাবে চাই তোমাকে একটু ঈর্ষালু করতে। শুধু নিজেকে দেখানো। শুধু প্রাচীরপত্রে নিজের নামজারি। যদি কাউকে জাহির করতে হয়, তাঁকে জাহির করো। যদি কাউকে সাব্যস্ত করতে হয় তাঁকে সাব্যস্ত করো।

'আমি ও আমার, এই দুটি অজ্ঞান। আমার বাড়ি, আমার টাকা, আমার বিদ্যা, আমার ঐশ্বর্য, এই যে ভাব এ হয় অজ্ঞান থেকে।' বললেন রামকৃষ্ণ : 'আর হে ঈশ্বর, তুমিই সব কর্তা, আর এ সব তোমার জিনিস—বাড়ি-ঘর, ধন-দৌলত, পুত্র-পরিবার, বন্ধু-বান্ধব—আমার বলতে কেউ কিছু নয়, সব তোমার—এইটিই জ্ঞানভাব।'

লোকে বুঝেও বোঝে না। ঘা খায়, আবার উঠে বসে অহঙ্কারের বেড়া মেরামত করে। সূর্য যে অস্তে চলেছে সেদিকে খেয়াল নেই। সারা দিন চলে শুধু এই মেরামতি টুকটাক। আত্মরতির ক্ষুদ্র-সংস্কার। দিন যায় দৈন্য আর যায় না। তার পর মৃত্যুর পর আবার খবরের কাগজে হেডলাইন দিতে ছোটে। হোমরা-চোমরা কে-কে এসেছিল শ্রাদ্ধ খেতে তার ফিরিস্তি ঝাড়ে। চাকরি থেকে পেন্সন নিয়ে বাড়ি করে দরজার উপরে ছাড়া-চাকরির নেম-প্লেট ঝোলায়। সন্ন্যাসী শুয়ে আছে লোহার কাঁটার উপর। সংসারী শুয়ে আছে অহঙ্কারের কণ্টকে।

বড় মানুষের বাগানের সরকার, বাগান যদি কেহ দেখতে আসে, খুব আড়ম্বর করে বলে, এ বাগানটি আমাদের, এ পুকুরটি আমাদের। কিন্তু কোনো দোষ দেখে বাবু যদি তাকে ছাড়িয়ে দেন, তখন তাঁর আম কাঠের সিন্দুকটাও নিয়ে যাবার তার যোগ্যতা থাকে না। বাবুর দারোয়ানকে দিয়ে সিন্দুকটা পাঠিয়ে দেয়।

হেসে উঠলেন বিদ্যাসাগর।

বদলি হবার সময় আদালতের ফার্নিচার ফেরত দাও। মায় দোয়াতদানটি পর্যন্ত। ভগবান দুই কথায় হাসেন, বললেন আবার রামকৃষ্ণ। এক হাসেন, কবরেজ যখন রুগীর মাকে বলে, মা, ভয় কি ? আমি তোমার ছেলেকে ভালো করে দেব। এই বলে হাসেন, আমি মারছি, আর এ কিনা বলে বাঁচাবে ! আর হাসেন, দু ভাই যখন দড়ি ফেলে জায়গা ভাগ করে, আর বলে, এ দিক আমার, ও দিক তোমার। এই বলে হাসেন, আমার জগৎ ব্রহ্মাণ্ড, আর ওরা বলছে, এ জায়গা আমার।

'আচ্ছা, তোমার কী ভাব ?' ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে জিগগেস করলেন বিদ্যাসাগরকে। মৃদু-মৃদু হাসছেন বিদ্যাসাগর। বললেন, 'সে একদিন আপনাকে গিয়ে বলব আমি চুপি-চুপি।'

আমার পরোপকারের ভাব। পর মানে ভগবান, উপ মানে সমীপস্থ, আর কার মানে কার্য। আমি এমন কার্য করব যাতে মুহূর্তে ভগবানের সমীপস্থ হয়ে যাব। ভগবানকে কি করে আনন্দিত করব ? এত যাঁর আছে তাঁকে আর আমি কী দিয়ে খুশি করতে পারি ? তাঁকে খুশি করতে পারি শুধু পরের অশ্রু মুছিয়ে। আপনি বলছেন ভগবান হাসছেন। আমি তো দেখি অহর্নিশ কাঁদছেন তিনি। কাঁদছেন ঘরে-ঘরে, পথে-পথে। শৃঙ্খলে নিপীড়িত হয়ে কান্নার ভাষা হারিয়ে, শাসনের কারাগারের দেয়ালে মাথা ঠুকে-ঠুকে।

তিনিই সব এ ভাবটুকু থাকলেই হল। তাঁর জন্যেই সব করছি, নিজের নাম-যশের জন্যে নয়, গীতায় একেই বলেছে নিষ্কাম কর্ম। গীতায় এমনিতেও যা, ওলটালেও তাই। এমনিতেই গীতা, ওলটালে তাগী। তাগী মানে ত্যাগী। ত্যজ ধাতুর উপর বিহিত প্রত্যয়ে তাগী-ও সিদ্ধ। মরা-মরা বলতে-বলতে যেমন রাম হয়েছিল তেমনি গীতা-গীতা বলতে-বলতে ত্যাগী হয়ে যাও। নিজের সমস্ত জ্ঞান-কর্ম বিদ্যাবুদ্ধি তাঁর হাতে, একটা বৃহত্তম সত্তার উপলব্ধিতে, উৎসর্জন করো। এর জন্যে চাই বিশ্বাস। সংশয়ের ঝড়ের রাতে প্রত্যয়ের দীপবর্তি। এর হদিস পণ্ডিতের বিচারে নেই, আছে একটি নির্মলসরল বালকের বিশ্বাসে। ষড়দর্শনেও তাঁর দর্শন হয় না, দর্শন হয় শুধু বালকের পবিত্রতায়। সেই যে কথায় বলে না, স্বয়ং রামের সাগর বাঁধতে হল আর হনুমান রামনামের বিশ্বাসের জোরে ডিঙিয়ে গেল এক লাফে।

'যদি তাঁতে বিশ্বাস থাকে', বললেন রামকৃষ্ণ, 'তা হলে পাপই করুক আর মহা-পাতকই করুক, কিছুতেই ভয় নেই।'

শক্তিতে হয় না, ভক্তিতে হয়। একের পর এক গান ধরলেন রামকৃষ্ণ। সুরে-সুরে সুধার হ্রদ নেমে এল মর্তধামে।

তত্ত্ব অতি সোজা। শুধু একটি ভালোবাসার তত্ত্ব। যাতে ঐ ভালোবাসাটি আসে তার জন্যেই তাঁকে মা বলা। মা বড় ভালোবাসার জিনিস।

বিদ্যাসাগরের চোখ ছলছল করে উঠল। এ কি আর বিদ্যাসাগরকে বোঝাতে হবে ? পুজো হোম যাগযজ্ঞ, ও-সব কিছুই নয়। আসল হচ্ছে ভালোবাসা। যদি একবার ভালোবাসা আসে তবে কী হবে ও-সব অনুষ্ঠানে ? যদি ভালোবাসা হবে কী হবে আর বেশভুষায় ? চোখে যদি জল আসে কাজলের রেখা আর থাকে না।

'তুমি যে সব কর্ম করছ এ সব সৎকর্ম।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'যদি আমি কর্তা এই অহঙ্কার ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে করতে পারো তা হলেই হল। এই নিষ্কাম কর্ম করতে-করতে ঈশ্বরে ভালোবাসা আসবে।'

একেক জনের একেক রকম পথ। কারু জ্ঞানে, কারু ভক্তিতে, কারু বা শুধু নিষ্কাম কর্মে। নিষ্কাম কর্মই নিয়ে যাবে মনস্কামের চরম তীর্থে।

'আমি বলছি, নিষ্কাম কর্মই হচ্ছে ঈশ্বরপ্রেম। আর ভালোবাসা হলেই দর্শন। আর সব দর্শনে চোখাচোখি হয় না, ভালোবাসাতেই মুখচন্দ্রিকা। হ্যাঁ গো, দেখা যায় ঈশ্বরকে। তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়। এই যেমন তোমাকে দেখছি চোখের উপর চোখ রেখে। এই যেমন কথা কচ্ছি তোমার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে।'

রাত হচ্ছে, এবার উঠবেন রামকৃষ্ণ।

'যা সব বলছি তোমাকে তুমি সব জানো।' হাসলেন রামকৃষ্ণ: 'তবে খবর নেই। বরুণের ভাণ্ডারে কত-কি রত্ন আছে, বরুণ রাজার খবর নেই।'

'তা আপনি বলতে পারেন।' হাসলেন বিদ্যাসাগর।

'অন্তরে সোনা আছে, কিন্তু একটু মাটি চাপা পড়ে আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, তখন অন্য কর্ম কমে যাবে। শুধু খনন করবে এই গহন অন্তর। ঐ দেখ না, গৃহস্থের বউর কত কর্ম, অন্তঃসত্ত্বা হলেই কর্ম কমে আসে। শেষে ছেলে হলে ছেলেটিকেই নিয়ে থাকে, ওটিকে নিয়েই নাড়াচাড়া করে। সংসারের কাজ আর শাশুড়ি করতে দেয় না।'

তাই শুধু এগোও। কর্মারণ্যে কুঠার হাতে করে কাঠ কাটতে বেরিয়েছ, কিন্তু শুধু চন্দন গাছ দেখেই থেমে যেও না। ঐ কুঠারে যে রুপোর খনি সোনার খনিও খুঁড়তে হবে। তবে থামছ কেন? এগোও, এগিয়ে যাও। মণি-মাণিক্যের ভাণ্ডার রয়েছে সামনে। অন্তরেই সেই আকর, অন্তরেই সেই রত্নাগার। থেমো না, আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পোড়ো না—

এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা! অনেক তোমার সম্ভাবনা। অনেক তোমার প্রতিশ্রুতি। তোমার মাত্রাহীন যাত্রা। তোমার সংক্রান্তিহীন দিনপঞ্জী। প্রতিদিনই তোমার জন্মদিন।

'সব জানো, তবে খবর নেই।'

'তা কখনো হয়?'

'হ্যাঁ গো, অনেক বাবু জানে না চাকর-বাকরের নাম কি।' উঠলেন রামকৃষ্ণ। 'একবার যেয়ো বাগান দেখতে। রাসমণির বাগান। ভারি চমৎকার জায়গা।'

'যাবো বৈকি। আপনি এলেন আর আমি যাবো না?'

'আরে আমার কাছে যাবে কি? ছি-ছি! বাগান দেখতে যাবে।'

'সে কি কথা!' একটু ক্ষুন্ন হলেন কি বিদ্যাসাগর? বললেন, 'ও কথা বলছেন কেন?'

'আরে, আমরা হচ্ছি জেলেডিঙি। খাল-বিলেও যেতে পারি, আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু তুমি হচ্ছ জাহাজ, কি জানি যদি যেতে গিয়ে চড়ায় হঠাৎ ঠেকে যায়—'

সকলে হেসে উঠল।

রামকৃষ্ণ টিপ্পনি কাটলেন : 'তবে এ সময়ে যেতে পারে জাহাজ।'

ইঙ্গিত বুঝে নিলেন বিদ্যাসাগর। বললেন, 'হ্যাঁ এটি বর্ষাকাল বটে।'

নবানুরাগের বর্ষা। নবানুরাগের সময় মান-অপমান থাকে না, বিদ্যা-অবিদ্যা থাকে না, শুধু জলে জলময়। তখন প্রেমের নদী, প্রেমের হাওয়া, প্রেমের ময়ূরপঙ্খী। প্রেমের অঞ্জনে তখন বিশ্বময় নিরঞ্জন।

দাঁড়িয়ে মূল মন্ত্র জপ করছেন রামকৃষ্ণ। ভাবারূঢ় হয়েছেন। হয়তো বিদ্যাসাগরের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা করছেন মা'র কাছে।

ভক্তসঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন ধীরে-ধীরে। নিজের হাতের মধ্যে একটি ভক্তের হাত ধরা। আগে-আগে বাতি-হাতে চলেছেন বিদ্যাসাগর।

শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষ। ষষ্ঠীর চাঁদ দেখা দেয়নি এখনো। বাগানে অন্ধকার তার মধ্য দিয়ে বাতির একটি ক্ষীণ রেখা চলেছে ফটকের দিকে। সেই ক্ষীণ রেখার পিছনেই জ্যোতিষ্মান দিনকর। জগৎজোড়া অন্ধকারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কি সেই আশার ক্ষীণ-দ্যুতি ? সেই আভাসের পিছনে নব ভাস্করের আবির্ভাব ?

ফটকের সামনে কে একজন গৌরবর্ণ সুপুরুষ দাঁড়িয়ে। বয়েস চল্লিশের কাছা-কাছি। মাথায় পাগড়ি, দাড়িগোঁফ একমুখ। শিখ নাকি ? অথচ পরনে ধুতি, পায়ে জুতো-মোজা। বাঙালী তো, গায়ে চাদর নেই কেন ?

রামকৃষ্ণকে দেখামাত্রই পাগড়িশুদ্ধ মাথা পায়ে লুটিয়ে দিল।

'এ কি ? তুমি ? বলরাম ? এত রাত্রে ?'

'অনেকক্ষণ এসেছি। দাঁড়িয়েছিলাম এখানে।'

'সে কি ? ভেতরে যাওনি কেন ?'

'সবাই আপনার কথা শুনছেন, এর মধ্যে আমি গিয়ে কেন তালভঙ্গ করি ?'

ঘরের মধ্যেই থাকি আর দরজার বাইরেই থাকি, আমি আছি আমার ভাবের ঘরের দরজা খুলে।

ঠাকুর গাড়িতে উঠলেন।

মাস্টারের কানে-কানে বললেন বিদ্যাসাগর, 'গাড়িভাড়া দেব ?'

'আজ্ঞে না, ও হয়ে গেছে।'

বিদ্যাসাগর প্রণাম করলেন ঠাকুরকে। প্রত্যেকে, একে-একে।

গাড়ি চলল দক্ষিণেশ্বর। কিন্তু গাড়ির মধ্যে যিনি বসে তিনি চলেছেন কোথায় ? তিনি চলেছেন জীবের ঘরে-ঘরে। কায়ে, মনে আর বাক্যে একটি শুধু বাণী নিয়ে। সে বাণী ভালোবাসার বাণী। শুধু ভালোবাসা। ঈশ্বরকে ভালোবাসা। ঈশ্বরকে ভালোবাসলেই আর সকলকে ভালোবাসবে। এ জীবন পেয়েছে শুধু সেই ভালোবাসার আলো জ্বালাতে। গাঁথতে শুধু সেই একটি ভালোবাসার বরমালা।

তুমি তোমার সিংহাসন ছেড়ে নেমে এলে। নেমে এলে আমার পর্ণকুটিরের ভগ্ন-দুয়ারে। আমার দুয়ারের চৌকাঠে ঠেকে যাবে বলে ফেলে এলে তোমার রাজমুকুট। আমি দীনদুঃখী বলে পরে এলে রিক্ততার সাজ। আমি ছোট বলে তুমিও ছোট হলে। আমি কি তোমাকে ছোট করেছি? তুমি নিজেই ছোট হয়েছ আমার জন্যে। আমি দুর্বল বলেই সুলভ হয়েছ। ভঙ্গুর বলেই হয়েছ সুকোমল। নইলে তোমাকে ধরি কি করে? রাখি কি করে বুকের নিবিড়ে? কিন্তু, ছোট হয়ে শুনতে চাও তুমি বড় কথা। আমার ছোট মুখের বড় কথা। সে-কথাটির নাম ভালোবাসি। তোমাকে ভালোবাসতে পারলেই বিশ্বসংসার ভরে উঠবে, ঘুচে যাবে সব ঘর-গড়া ব্যবধান। এইটিই বড় কথা। এইটিই শোনবার জন্যে ছোট হয়ে কাছে এসেছ। ছোট হয়েছ বড় করবার জন্যে। রিক্ত সেজেছ মুক্তির পথ দেখাতে।

তুমি ভিখারি শিব। ভস্মমাখা। হাড়ের মালা গলায় দোলানো। তুমি নিষ্কিঞ্চন বলেই তো প্রবঞ্চিতের বন্ধু। সরল বলেই তো ডাক দিয়েছ সহজ হতে।

কিন্তু এ কেমনতরো শিব? কেমনতরো সাধু? থেকে-থেকে কেবল হাত পাতে। কেবল খেতে চায়।

দু পয়সার দেদো সন্দেশ কিনে দক্ষিণেশ্বরে এসেছে অঘোরমণি। থাকে কামার-হাটিতে, দত্তদের ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণের কোঠায়। রাধাকৃষ্ণের মন্দির। নিজের হাতে ভোগ রাঁধে অঘোরমণি। কলাপাতায় করে গোপালের জন্যে ভোগ সাজায়। গঙ্গা-জলের ছোট গ্লাশ পাশে রেখে পিঁড়ি পাতে সামনে। এস, বসো, খাও—আহ্বান করে গোপালকে।

দুপয়সার দেদো সন্দেশের জন্যেই হাত বাড়ায় রামকৃষ্ণ। বলে, 'কই, কি এনেছ আমার জন্যে? দাও। ওকি, ঢাকছ কেন আঁচলে?'

ছি-ছি, অমন রোথো সন্দেশও কেউ চায় হাত বাড়িয়ে। লজ্জায় পিছিয়ে গেল অঘোরমণি। কত ভালো জিনিস এনে খাওয়াচ্ছে ভক্তেরা, কত তবক-দেওয়া, কত-বা রাংতা-জড়ানো। অঘোরমণির যেমন অদৃষ্ট, দুপয়সার দেদো সন্দেশের বেশি জোটেনি। তা, লুকিয়ে এনেছি আঁচলের তলায়, একেবারে আসামাত্রই খেতে চাওয়ার কী হয়েছে? একটু বয়ে-সয়ে ধীরে-সুস্থে চাইলেই তো হয়।

'দাও না গো! এনেছ তো লুকোচ্ছ কেন?'

কুণ্ঠিতভঙ্গিতে সন্দেশগুলো বের করে দিল অঘোরমণি। তুচ্ছ জিনিস নিয়ে এসেছি তোমার জন্যে, কিন্তু তুমি কি আমার নৈবেদ্যের দৈন্য ধরবে? দেখবে না কি আমার নিবেদনের ভাবটি? তুমি কি ভাবে নও? তুমি কি উপকরণে?

স্বচ্ছন্দে মুখে পুরল সেই দেদো সন্দেশ। সানন্দে খেতে লাগল রামকৃষ্ণ। বললে, 'তুমি গরিব মানুষ, পয়সা খরচ করে বাজার থেকে সন্দেশ আনো কেন?'

ন বছরে বিয়ে হয়েছিল, তেরো বছরে বিধবা হয়েছে। অল্প কিছু ধানজমি পেয়েছিল শ্বশুরঘর থেকে, বিক্রি করে তারই সামান্য আয়ে দিন চালায়। দিন কি

আর চলে ? দিন না চলে তো মনও চলে না। মন অচল হয়ে পড়ে থাকে বিগ্রহের পদমূলে। গোপালমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে অঘোরমণি। সমস্ত সৃষ্টির যে সম্রাট তাকে সে সন্তানরূপে কাছে টেনে এনেছে। দিন কাটাচ্ছে শুধু মন্দিরের তদারকে। ফুল তুলছে, মালা গাঁথছে, চন্দন বাটছে, বাসন মাজছে, ঝাটপাট দিচ্ছে। তারপর কোনো-রকমে নিজের স্নানাহার সেরে বাকি সময় শুধু জপযজ্ঞ। শুধু মানসনামগুঞ্জন।

এমনি এক-আধ দিন নয়, একটানা তিরিশ বছর।

'নারকোলের নাড়ু করবে নিজের হাতে, তাই আনবে দুটো-একটা।' কিন্তু এতেও বিশেষ আগ্রহ নেই রামকৃষ্ণের। বললে, 'যা নিজের জন্যে রাঁধো, তারই থেকে কিছু নিয়ে এলেই তো ভালো হয়। কী রেঁধেছিলে আজ ? লাউশাকের চচ্চাড়, না, আলু-বেগুন-বড়ি দিয়ে সজনেখাড়ার ঘ্যাট। তাই নিয়ে এসো না দু-একদিন। তোমার হাতের রান্না খেতে বড় সাধ যায়।'

কেবল খাওয়া আর খাওয়া। এ ছাড়া সাধুর কি আর কোনো কথা নেই ? দত্তগিন্নি খুব ভালো সাধুরই খোঁজ দিয়েছে যা হোক। গোপাল-গোবিন্দের কথা নেই, শুধু এ-খাই না ও-খাই। দূর ছাই, আর আসব না। আমি অনাথ-কাঙাল লোক, কোথায় পাব অত ভোজের পারিপাট্য। নিজের পেট চলে না, এখন আবার অতিথি খাওয়াই ! তাও, যে অতিথি দুয়ারে এসে দাঁড়ায় না, দূর থেকে বসে হুকুম দেয়। দরকার নেই অমন আদিখ্যেতায়। কিন্তু কি হল অঘোরমণির, কদিন যেতে না যেতেই চচ্চড়ি রেঁধে হাজির হল দক্ষিণেশ্বরে।

'দাও, দাও, কী এনেছ বাটিতে করে ? লাউশাক না সজনেখাড়া ?' হাত বাড়িয়ে বাটিটা টেনে নিল রামকৃষ্ণ। কোনোরকম ভূমিকা না করে খেতে লাগল রসিয়ে-রসিয়ে। বললে, 'আহা, কী রান্না ! সুধা ! সুধা !'

অঘোরমণির চোখে জল এল। কী এমন রেঁধেছি, সাধু একেবারে স্বাদে-গন্ধে গদগদ হয়ে উঠেছে। কী করুণা এই সাধুর ! দরিদ্র বলে উপেক্ষা করল না, সাধারণ ব্যঞ্জনে কী অসাধারণ ব্যঞ্জনা পেল না জানি। এমন একটি মশলা এসে মিশেছে যা বাজারে কেনা যায় না, সেটি হৃদয়-রসের পাঁচফোড়ন। ভক্তি-প্রীতির সম্বরা।

যতই খায় ততই শুধু খাই-খাই। এটা আনো ওটা আনো। এটা রাঁধো ওটা রাঁধো। আর কোনো প্রসঙ্গ নেই, শুধু ভোজনবিলাস ! শুধু নোলার শকশকানি। অনেক সাধু দেখেছি জীবনে কিন্তু এমন পেটুক সাধু দেখিনি ! এ তুমি আমাকে কোথায় এনে ফেললে ! গোপালের কাছে মনে-মনে কাঁদে অঘোরমণি। এমন সাধুর কাছে আনলে যার খাওয়া ছাড়া আর কথা নেই। ধর্ম-কর্মের ধার ধারে না, যেন খাওয়াই পরমার্থ। এত আমি খাওয়াই কি করে ? আমার ভাঁড়ার কি অফুরন্ত ?

রাত তিনটের সময় জপে বসেছে অঘোরমণি। জপ সেরে প্রাণায়াম শুরু করেছে, কে একজন তার পাশে এসে বসল। গা ছমছমিয়ে উঠল অন্ধকারে। কে, কে তুমি ? চমকে চোখ চেয়ে দেখল—একি, এ যে সেই দক্ষিণেশ্বরের সাধু। ডান হাত মুঠ করে ধরা, যেমনটি দেখেছে দক্ষিণেশ্বরে, আর মুখে সেই মধুর মৃদুল হাসি। এত রাতে এল কি করে এখানে ? অন্ধকারে পথ চিনে-চিনে ?

আশ্চর্য একটা সাহস হল অঘোরমণির। নিজের বাঁ হাত বাড়িয়ে ধরল রামকৃষ্ণের

বাঁ হাত। মুহূর্তে ঘটে গেল অভাবনীয়। পাশে বসে আর সেই প্রৌঢ় রামকৃষ্ণ নেই, তার বদলে একটি দশ মাসের শিশু। নধর নবনীতকোমল। স্নেহদ্রব নবজলধর। একি, এ যে সত্যিকার গোপাল! হামা দিয়ে একেবারে বুকের কাছে চলে এল দেখছি। হাত তুলে মুখের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'মা গো, ননী দে।'

একি কাণ্ড! অঘোরমণি আকুলকণ্ঠে কেঁদে উঠল: 'বাবা, আমি কাঙালিনী চিরদুখিনী। ননী কোথা পাব? আমি খুদ খাই পাতা কুড়ুই।'

সেকথা শুনে নিবৃত্ত হবার ছেলে নয় গোপাল। অঘোরমণির আঁচল টানে, হাত থেকে মালা কেড়ে নেয়। বলে, 'ও-সব আমি শুনি না। মা হয়েছিস কেন তবে? খেতে দিবি কি না বল—'

শিকে থেকে নারকেল-নাড়ু বের করে অঘোরমণি। ছোট হাতখানি ভরে নাড়ু দেয়। বলে, 'বাবা গোপাল, তোমাকে এ বাসি জিনিস দিতে বুক ফেটে যাচ্ছে—'

তার আগে যে খিদেয় আমার পেট চুপসে যাচ্ছে। বাসি নাড়ু, বাসি নাড়ুই সই। সন্তানবিরহে যে মা উপবাসী, তার সঞ্চিত স্নেহ কি কখনো বাসি হয়?

মুখ ভরে খেতে লাগল গোপাল। উপভোগের আনন্দে চোখের পাতা নাচতে লাগল। কিন্তু খেয়েই কি সে শান্ত হবে? না কি সে শান্ত হবার মত ছেলে? ঘরময় ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল। কখনো বা অঘোরমণির কোলে, কখনো বা কাঁধে চেপে বসতে লাগল। জপ-তপ ঘুচে গেল অঘোরমণির।

সকাল হলেই ছুটল দক্ষিণেশ্বরের দিকে। ছুটল প্রায় পাগলিনীর মত। অগোছাল চুল, অসামাল বেশবাস। বুকের উপর দুবাহুর মধ্যে কখন উঠে এসেছেন গোপাল। তার রাঙা পা দুখানি টুকটুক করছে বুকের উপর।

গোপাল! গোপাল! বলতে-বলতে রামকৃষ্ণের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল অঘোরমণি। কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, রামকৃষ্ণের পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল। আর, এরই জন্য যেন অপেক্ষা করছিল রামকৃষ্ণ। ভাবাবেশে অঘোরমণির কোলে চড়ে বসল।

যে দেখল সেই অবাক। বাষট্টি বছরের বুড়ির কোলে ৪৮ বছরের প্রৌঢ় সন্তান! যে ঠাকুর স্ত্রীজাতির ছোঁয়া সহ্য করতে পারেন না তাঁর এ কেমনতরো ব্যবহার! কেমনতরো তা কে বোঝে! একবার মা হয়ে কোলে নিয়েছিল ছেলেকে, রাখালকে, এবার ছেলে হয়ে কোলে বসলো মা'র!

ক্ষীর-সর খাইয়ে দিতে লাগল অঘোরমণি। খাইয়ে দিচ্ছ তো কাঁদছ কেন? অন্তরের স্নেহধারা নয়নের অশ্রুধারা হয়ে বেরুচ্ছে। আমি নন্দরানি—তুমি নন্দদুলাল। তুমি গোপাল আর আমি গোপালের মা—

ভার সংবরণ করে সরে বসল রামকৃষ্ণ। কিন্তু গোপালের মা'র আর ভাব থামে না। ছেলে সরে বসে, কিন্তু মা'র স্নেহভাবের কি ইতি আছে? সে ভালোবাসায় কি ভাঁটা পড়ে? সেখানে শুধু জোয়ারের জল। শুধু ঢেউয়ের পর ঢেউ। তাই ঘরময় নাচতে লাগল অঘোরমণি। আর গাইতে লাগল, 'ব্রহ্ম নাচে বিষ্ণু নাচে আর নাচে শিব!'

'দেখ দেখ আনন্দে ভরে গেছে। গোপাললোকে চলে গেছে গোপালের মা।' বললে রামকৃষ্ণ।

'এই যে গোপাল আমার কোলে, এই যে আবার তোমার ভেতর—' নৃত্যের আর বিরাম নেই অঘোরমণির : 'আয়রে গোপাল বেরিয়ে আয়, আয়রে আমার কঠিন কোলে—'

এবার ছেলের হাতে কিছু খাও গোপালের মা। ছেলের ভালোবাসার কিছু স্বাদ নাও। নিজের হাতে খাইয়ে দিল রামকৃষ্ণ। বুকে হাত বুলিয়ে ভাবভূমি থেকে নিয়ে এল বাস্তবভূমিতে।

'বড় দুঃখে দিন কেটেছে বাবা। কোথায় ছিলি তুই এতদিন ? টেকো ঘুরিয়ে সুতো কেটে দিন কেটেছে। আজ বুঝি তোর দুখিনী মায়ের কথা মনে পড়লো ? তাই এত আদর করছিস্ মাকে ? বল্, যখন একবার তোকে কোলে পেলাম, আর তুই যাবি না কোল ছেড়ে—'

রামকৃষ্ণ এখন নিজেই রামলালা।

অনেক বলে-কয়ে সন্ধের দিকে পাঠিয়ে দিল অঘোরমণিকে। নিজের বাড়ি কামারহাটিতে। কিন্তু যখনই পথে নেমেছে, গোপাল কখন ছুটে এসে দিব্যি কোলে চড়ে বসল। তা বসেছিস বোস, বুকে করে নিয়ে যাচ্ছি বাড়ি। কিন্তু বাড়ি এসে এ তুই কী রঙ্গ শুরু করে দিলি ? এ কি, আমাকে আজ তুই জপ করতে দিবিনে দুষ্টু ছেলে ? বেশ, তাই, করব না জপ, মালার থলে গঙ্গাজলে ফেলে দেব। কিন্তু এখন তুই কী চাস বল তো ? এই তো দেখছিস আমার বিছানার ছিরি, শুকনো তক্তপোশের উপর ছেঁড়া মাদুর পাতা। নরম বিছানা-বালিশ আমি পাব কোথায় ? শুবি তো শো এই শুকনো কাঠে। শুয়েছে বটে কিন্তু গোপালের স্বস্তি নেই। খুঁতমুত করতে লেগেছে। দুধের শিশুকে কি তার মা এমন কঠিন বিছানায় শুতে দেয় ? বালিশ নেই তোশক নেই, এ কী নিষ্ঠুরতা !

'বাবা, আজ এরকমই শোও, কাল কলকাতায় গিয়ে নরম বিছানা করিয়ে দেব।'

বাঁ বাহুর বালিশে গোপালের মাথা রেখে ঘুম পাড়াল গোপালের মা। মাতৃঅঙ্গের স্নেহস্পর্শ পেয়েছে, আর চাই কি গোপালের ! অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল।

অঘোরমণিকে দেখিয়ে রামকৃষ্ণ বললে, 'এ খোলটা কেবল হরিতে ভরা। হরিময় শরীর।' মাথা থেকে পা পর্যন্ত হাত বুলিয়ে দিলে। শিশু যেমন মাকে আদর করে তেমনি। পায়ে হাত দিয়েছে বলেও চমকাল না গোপালের মা। ছেলে যদি পায়ে হাত দেয়, মা কি চমকায়, না প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ করে ?

সেদিন বাড়ি ফেরবার সময় মাকে অনেকগুলি মিছরি দিলে রামকৃষ্ণ। ভক্তরা যত এনেছিল উপহার, সমস্ত। গোপালের মা বললে, 'এত মিছরি দিয়ে কী হবে ?'

তার চিবুক ধরে সোহাগ করে বললে রামকৃষ্ণ, 'ওগো, আগে ছিলে গুড়, পরে হলে চিনি, এখন হয়েছ মিছরি। এখন মিছরি খাও আনন্দ করো।'

সন্তান কোলে নিয়ে মেয়েরা যেমন কোমর বেঁকিয়ে হাঁটে, তেমনি করে চলে গোপালের মা। 'না বিইয়ে কানায়ের মা।' সর্বজীবে গোপাল দেখে। ক্ষুধার্ত ভগবান মাতৃ হৃদয়ের কাছে স্নেহের নবনী ভিক্ষা করে ফিরছেন।

আত্মীয়ের মধ্যে একটি শুধু বেড়াল। বেড়ালের মধ্যে ঠাকুর দেখেছেন কালী, অঘোরমণি দেখছে গোপাল। সেবার ঠাকুর তখন অপ্রকট হয়েছেন, বোসপাড়া

লেনের বাড়িতে সিস্টার নিবেদিতার ঘাড়ে বেড়ালটি ঘুমিয়ে আছে। নিবেদিতাও নির্বিকার! এ কি দুর্দৈব, কে একজন স্ত্রী-ভক্ত তাড়িয়ে দিল বেড়ালটাকে।

'আহাহা, কি করলি মা, কি করলি? গোপাল যে চলে গেল, চলে গেল—'

কিন্তু কোথায় সে যাবে? সে যে বস্ত্রাঞ্চলের নিধি। সকাল হতেই চলেছে সে বাগানে মা'র সঙ্গে কাঠ কুড়োতে। পিঠে পড়ে মা'র রান্না দেখতে। পুকুরে নেমে ঝাঁপাই ঝুড়তে।

দিন যায়। অঘোরমণি বড়ো হয়, কিন্তু গোপাল আর বড় হয় না। চিরকাল মা'র বুকের আঁচল ধরে টানে আর কাঁদে, 'মা খেতে দে, খিদে পেয়েছে—'

কোথায় তুমি খেতে দেবে, তা নয়, তুমিই খেতে চাও! ভ্রমর হয়ে ফিরছ গুঞ্জন করে, গুনগুন করে বলছ, কোথায় ফুলটি ফুটেছে, কে আমাকে একটু মধু দেবে!

পরমাপ্রকৃতি

শ্রীশ্রীসারদামণি

পরমপূজনীয়া

শ্রীযুক্তা মাতাঠাকুরাণী

শ্রীচরণকমলেষু

সেবক

অচিন্ত্য

এই রচনার উপাদান নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী থেকে সংগ্রহ করেছি

"শ্রীশ্রীমায়ের কথা" প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (উদ্বোধন)

স্বামী সারদানন্দকৃত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ"

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যকৃত "শ্রীশ্রীসারদাদেবী"

Sri Sarada Devi, the Holy Mother

(Ramkrishna Math, Madras)

শ্রীআশুতোষ মিত্রকৃত "শ্রীমা"

অক্ষয়কুমার সেনকৃত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি"

চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়কৃত "শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা"

স্বামী বিবেকানন্দের "পত্রাবলী"

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত "শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী"

লক্ষ্মীমণি দেবী ও যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাসকৃত

"শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিকথা"

স্বামী গম্ভীরানন্দকৃত "শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা"

"গৌরীমা" (শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম)

* ভূমিকা *

ভগবানের কাছে আমরা কী চাই? চাই অহেতুকী কৃপা। আর, ভগবান আমাদের কাছে কী চান? চান অমলা অনিমিত্তা ভক্তি। অকারণের ভালোবাসা। যেমন ভালোবাসা প্রহ্লাদের। ধ্রুব যে তপস্যা করেছিল, বিমাতার দুর্বাক্যে বিদ্ধ হয়ে, মনে অভিমান নিয়ে, রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষায়। কাঁচ কুড়োতে এসে মণি পেয়ে গেল। তণ্ডুল যা পেল তা সতুষ তণ্ডুল, কামনার দাগ-ধরা। কিন্তু প্রহ্লাদ যে কেন ঈশ্বরকে ভালোবাসে তা সে নিজেও জানে না। হাতির পায়ের নিচে ফেলছে তখনও হরি, পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলছে তখনও হরি। তারপর যখন হিরণ্যকশিপু নিহত হল ভগবান প্রহ্লাদকে বর দিতে চাইলেন। প্রহ্লাদ বললে, আমি কি বণিক, আমি কি ব্যবসা করতে বসেছি? আমি তোমাকে ভালোবেসেছি বিনিময়ে কিছু লাভ করবার জন্যে?

সংসারে এমনিধারা কিছু না চেয়ে অপ্রয়োজনে ভালোবাসি আমরা কাকে? একমাত্র মাকে। সন্তান যখন মাকে ভালোবাসে, জিগ্‌গেসও করে না, মা, তুমি কি রূপসী, না, বিদুষী, বা, তোমার ক্যাশবাক্সে কত টাকা আছে, বা, তোমার সোয়ামী কী চাকরি করে! তার মা আছে এই তার ঐশ্বর্য। চীরবাসা ভিখারিণী যে মা, তার কোল ছেড়ে তার শিশু যায় না কোনো হাত-বাড়ানো রাজেন্দ্রাণীর কোলে।

ভগবানকে যাতে আমরা অহেতুক ভালোবাসতে পারি তারই জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণ 'মা'-মন্ত্র রচনা করেছেন। আর, তিনি শুধু মন্ত্রই দেননি, সঙ্গে-সঙ্গে দিয়েছেন তার বিগ্রহ। 'মা'-মন্ত্রের ঘনীভূত মূর্তিই হচ্ছেন সারদামণি। শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত বাক্যের ব্যাখ্যা, সমস্ত কর্মের মূলমর্ম।

সংসারে সঙও আছে সারও আছে। মায়াও আছে বস্তুও আছে। সার যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা মাতৃত্ব ছাড়া আর কি। আর, এই সার যিনিই দেন তিনিই সারদা। শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত সাধনার সারভূতা প্রতিমা।

মা যখন সন্তানকে মারেন সন্তান তখনও মাকেই জড়িয়ে ধরে, তখনও মা-মা বলেই কাঁদে। কেননা সে জানে যে নয়ন তিনি অশ্রু দিয়ে ভরেছেন সেই নয়নই তিনি বারবার স্নেহচুম্বনে ভরে দেবেন॥

* এক *

'হ্যাঁ রে, বিয়ে করবি ?'

দুই বছরের মেয়ে, মা'র কোলে বসে গান শুনছে। শিওড়ে মা'র বাপের বাড়ি, সেই গাঁয়ে। এদিকে বসেছে মেয়েরা, ওদিকে জায়গা ছেলেদের। সব কাছাকাছি, এক ঘেরের মধ্যে।

'কি রে, বিয়ে করবি ?' মা'র সখী না আত্মীয়া, কে জিগ্‌গেস করল ঝুঁকে পড়ে। স্নেহপ্রসন্ন পরিহাসের ভঙ্গিতে।

করব। দু বছরের মেয়ে দিব্যি ঘাড় কাৎ করল। হাসল গাল ভরে।

'সে কি রে ? কাকে বিয়ে করবি ?'

আঙুল তুলে স্পষ্ট দেখিয়ে দিল। ওই যে, ওই ছেলে। ওই আমার বর। আমার পুরুষ। সবাই দেখল অবাক হয়ে। যাকে দেখাল সে কে ? চেন না বুঝি ? মেয়ের চেয়ে আঠারো বছরের বড়। নাম গদাধর। কামারপুকুরের ক্ষুদিরাম চাটুজ্জের তৃতীয় ছেলে। আর যে দেখাল ? তার নামটি সারদা। বাপের নাম রাম মুখুজ্জে। বাড়ি জয়রামবাটি।

'আমার জন্যে কোথায় মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছ ?' তিন বছর বাদে মা চন্দ্রমণিকে জিগ্‌গেস করলে গদাধর। বললে, 'আমার বিয়ের পাত্রী জয়রামবাটি রাম মুখুজ্জের বাড়িতে কুটোবাঁধা হয়ে আছে।'

চিহ্নিত হয়ে আছে। ক্ষেতে যখন শশা ফলে প্রথম ফলটিতে চাষা কুটো বেঁধে রাখে। যাতে ভুলে সেটি বিক্রি হয়ে না যায়। যাতে সেটি ঠিক দেবতার ভোগে সমর্পিত হয়। তেমনি রাম মুখুজ্জের মেয়ে আমার জন্যে নির্বাচিত। নির্ধারিত। নিবেদিত। কিন্তু যাই বলো, সারদাই আগে দেখিয়ে দিয়েছে, বেছে নিয়েছে গদাধরকে। শক্তিই আগে স্থির করেছে তার শিব।

সারদার যখন চৌদ্দ বছর বয়েস, স্বামীর সঙ্গে মিলতে প্রথম শ্বশুরবাড়ি এসেছে। সমবেত মেয়েদের নানা উপদেশ শোনাচ্ছে গদাধর। নানা নির্মল কথা। শুনতে-শুনতে সারদা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ভাবখানা বোধহয় এই, ওসব আমার জানা। নতুন করে শোনার কোনো দরকার নেই।

অন্য মেয়েরা গা ঠেলছে সারদার। বলছে, 'এমন কথাগুলো শুনলিনি, ঘুমিয়ে পড়লি ?'

'না গো, ওকে তুলোনি।' বাধা দিল গদাধর: 'ও কি সাধে ঘুমিয়েছে ? ও এসব শুনলে এখানে আর থাকবেনি, চোঁচা দৌড় মারবে।'

ভাবখানা বোধহয় এই, আচ্ছাদন করে এসেছে। লুকিয়ে রেখেছে স্বরূপটিকে। ওকে ঘাঁটিয়ো না। যদি একবার প্রকৃতিটিকে চিনতে পারে চলে যাবে সমাধিভূমিতে, আর তাকে পাব না জীবসীমায়। গুপ্তরূপে আপ্তলীলা করতে এসেছে, তাই ঘুমুতে দে।

'শুধু কি আমারই দায় ? তোমারও দায়।' শ্রীশ্রীমাকে বললেন একদিন ঠাকুর। 'আমি কী করেছি, তোমাকে এর চাইতে অনেক বেশি করতে হবে। দেখছ না লোকগুলো অন্ধকারে পোকার মতন কিলবিল করছে। তুমি ছাড়া কে দেখবে এদের ?'

একদিন বকে ফেলেছিলেন ঠাকুর। ফল-মিষ্টি অঢেল হাতে বিলিয়ে দিচ্ছেন শ্রীমা, ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'অত খরচ করলে কি করে চলবে ?' মা'র মুখখানি অভিমানে ভার হয়ে উঠল। ঠিক চোখে পড়ল ঠাকুরের। একটি কালো মেঘের আভাসে যেন প্রলয়ের সূচনা। ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে ডাকিয়ে আনলেন রামলালকে। বললেন, 'ওরে তোর খুড়িকে গিয়ে শান্ত কর। ও যদি একবার রাগে আমার সব নস্যাৎ হয়ে যাবে।'

'আমাকে বেশি জ্বালাবে না।' ঠাকুর অপ্রকট হবার পর সাংসারিক অশান্তিতে একদিন বলে ফেললেন শ্রীমা, 'আমি যদি চটে-মটে কাউকে কিছু বলে ফেলি তো কারু সাধ্যি নেই আর রক্ষে করে।'

'তুমি কি আমাকে সংসার পথে টেনে নিয়ে যেতে এসেছ ?' পাংশুল কণ্ঠে জিগ্‌গেস করল রামকৃষ্ণ।

তুমি যদি টানো, সাধ্য নেই নিজেকে বেঁধে রাখতে পারি। তোমার স্রোতে ভেসে যাবে ঐরাবত। তাই কৃপা চাই তোমার কাছে। তুমি যদি একটু সম্বৃত হও। স্তম্ভিত হও।

রামকৃষ্ণকে নিশ্চিন্ত করল সারদা। বলল, 'না, তোমাকে ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি। আমি বিদ্যুন্মালিনী বহ্নি, কিন্তু তোমার সাধনার মন্দিরে আমি স্নেহ-শান্ত দীপশিখা।

তারপর কালীর কাছে সেই প্রার্থনা রামকৃষ্ণের : 'মা ওকে ভালো রাখো, ঠাণ্ডা রাখো। ও যদি মুহূর্তের জন্যেও আত্মহারা হয় আমি তলিয়ে যাব। রুখতে পারব না নিজেকে।'

ওর সঙ্গে কি আমি পারি ? ও জগৎসংসারের কর্ত্রী—কাপড়ে হলুদের দাগ-লাগানো কর্মব্যস্ত গিন্নি আর আমি আলবোলায় তামাক-খাওয়া হুঁ-হাঁ-বলা কর্তা। ও যেমন বলবে তেমনি চলবে এই পৃথিবী, তেমনি জ্বলবে ওই সূর্য-চন্দ্র। ও কর্ত্রী কারয়িত্রী করণগুণময়ী কর্মহেতুস্বরূপা।

সাধকচক্রবর্তী রামকৃষ্ণ ষোড়শী-পূজা করল সারদাকে। পরমতম প্রণিপাতটি রাখল তার পদমূলে। আর, আশ্চর্য, প্রণামটি ফিরিয়ে দেবার কথা মনেও এল না সারদার। পূজা-অন্তে রামকৃষ্ণ যখন বললে, তুমি এবার যেতে পারো, মুক্ত হরিণীর মত পালিয়ে গেল পলকে।

সারদা অজিতা, অমিতা, আরাধিতা। গোলকে রাধা, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী। ব্রহ্মলোকে সাবিত্রী ভারতী। কৈলাসে পার্বতী। মিথিলায় সীতা। দ্বারকায় রুক্মিণী। দক্ষিণেশ্বরে সারদা। এক দিকে সর্বশত্রুবশঙ্করী কালী, অন্য দিকে সর্বাভয়দায়িনী অন্নপূর্ণা।

ঠাকুর বলেন, ছাইচাপা বেড়াল।

বিবেকানন্দ বলে, জ্যান্ত দুর্গা।

চিঠি লিখছে শিবানন্দকে : 'জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম। দাদা, মায়ের কথা মনে পড়লে সময়-সময় বলি, কো রামঃ ? রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন যা হয় বলো দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নেই, তাকে ধিক্কার দিও।'

* দুই *

রুমু ঝুমু রুমু ঝুমু—রুপোর মল বাজছে পায়ে-পায়ে।

শিওড়ে এল্লা পুকুরের পাড়ে কুমোরদের পোয়ান। অদূরে বেলগাছ। বেলতলায় ঘাটে গেছেন শ্যামাসুন্দরী, একটি ছোট্ট মেয়ে এসে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরল। কোত্থেকে এল এই মেয়ে ? কুমোরদের পোয়ানের ধার ঘেঁষে, না, বেলগাছ থেকে ?

রুমু ঝুমু রুমু ঝুমু—শ্যামাসুন্দরী অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

রাম মুখুজ্জে ঘুমুচ্ছেন দুপুরবেলা, স্বপ্ন দেখলেন কে একটি ছোট্ট মেয়ে তাঁর পিঠের উপর পড়ে গলা জড়িয়ে ধরল। কি তার রূপ, কি বা তার অলঙ্কার ! কে গো মা তুমি ? কেন এসেছ ? এই এমনি এলুম তোমার কাছে। মিলিয়ে গেল স্বপ্ন।

বারোশো ষাট সালের আটুই পৌষ জন্ম নিল সারদা।

যিনি সার দেন তিনিই সারদা। কী সার এই সংসারে ? সংসারে সার যদি কিছু থাকে, সারাৎসার যদি কিছু থাকে, তবে তা মা। জ্ঞানস্তন্যদায়িনী স্নেহময়ী মা। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই মাতৃ-অঙ্ক। মা'র কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি। নির্ভয়, নিষ্কলঙ্ক।

আমি যে ঘুমিয়ে আছি এ নিদ্রাটুকুও মা। তিনি শুধু প্রত্যয়রূপিণী নন তিনি আমার সুষুপ্তিরূপিণী। নিদ্রা হয়ে ভ্রান্তি হয়ে বিস্মৃতি হয়ে আমার সমস্ত বিক্ষেপ সমস্ত চাঞ্চল্য জুড়িয়ে দিচ্ছেন। ভুলিয়ে দিচ্ছেন সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা। রোজ যে ঘুমুই রোজই তো মাকে পাই, ডুবে যাই মাতৃস্পর্শে। রোজ যে জাগি রোজই তো মাকে দেখি, ভেসে যাই তাঁর লীলানন্দে।

'কেমন ঘরে মেয়ের বিয়ে দিলুম গা', শ্যামাসুন্দরী দুঃখ করছেন—'সংসার করতে পেল না। ছেলেপুলে হল না একটিও—'

ভাগিস হয়নি। হলে কি আর আমাদের মা হতেন ? বিমাতা হয়ে যেতেন। হতেন বা পাতানো মা। কেঁদে উঠলে তক্ষুনি-তক্ষুনি শুনতেন না, দেরি করে ফেলতেন। পক্ষপাতী হতেন। নিজের পেটের ছেলেকে শাঁস দিয়ে আমাদের দিতেন খোসাভুষি। টাটকা দুধটুকু তাকে দিয়ে আমাদের দিতেন জল-মেশানো দুধ।

'ঈশ্বর কি তোর পাতানো মা যে চাইতে কুণ্ঠিত হবি ?' বললেন ঠাকুর, 'আঁচল টেনে গায়ের জোরে আদায় করে নিবি তোর হকের পয়সা, তোর সম্পত্তির অংশ।'

পেটে যদি একটা ছেলে ধরত, ষোলো আনা হিস্সা তাকেই দিয়ে দিত। মুখ

ম্লান করে এক-পাশে দাঁড়িয়ে থাকতুম। আজ স্বভাব-সাহসে একেবারে কোলে চেপে বসেছি। বলছি তুই যখন আমারও মা, আমার ক্ষুধার অন্ন জুগিয়ে দে।

'একটি-দুটি ছেলে নিয়ে কী করবে আপনার মেয়ে?' শাশুড়িকে বলেছিল রামকৃষ্ণ: 'তার এত সন্তান হবে যে মা-ডাকের জ্বালায় তিষ্ঠোতে পারবে না।'

সারদা জীবজগতের মা। দীর্ঘ ঘোররাত্রির শিয়রে বিতন্দ্রা জননী। চিরপ্রহরের প্রহরিণী। অভয়দাত্রী অন্নপূর্ণা। যাকে পেলে সন্তানের আর কিছু পাবার ইচ্ছে থাকে না, একমাত্র যাকে পেলেই তার সকল ভোগের অবসান, সেই মা। নিত্যানন্দময়ী কল্যাণবৃষ্টি। যদি একবার ঈশ্বরকে মা বলে ভাবা যায় তা হলে আর ভাবনা থাকে না। যেহেতু কিছুই আর চাইতে হয় না তাঁর কাছে। কৃপা? মা'র কৃপা তো স্বাভাবিকী। অগ্নির কাছে কেউ কি আর দীপ্তি কামনা করে? জলের কাছে শীতলতা?

'আমি কী শুধু সতের মা?' বললেন শ্রীমা। আমি সত্যের মা। তাই, 'আমি শুধু সতের মা নই, আমি অসতেরও মা।'

যে ছেলে ধুলো-বালি মেখে আসে তাকে কি মা ধরেন না? তাকে আরো বেশি করে ধরেন। গুণরহিত পুত্রে অধিক দয়া।

শিরোমণিপুরের আমজাদ। ডাকাতি করে জেলে গিয়েছিল। জেল থেকে ফিরে এসে বড় কষ্টে পড়েছে। একে মুসলমান তায় ডাকাত, কেউ মজুরি খাটাতেও চায় না। মা-ই প্রথম কাজ দিলেন তাকে। শুধু কাজ নয় খেতে দিলেন। বারান্দায় বসেছে আমজাদ, মা'র ভাইঝি নলিনী পরিবেশন করছে। দেবার কি ছিরি, দূর থেকে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারছে। পাছে ছোঁয়া লেগে জাত যায়। গায়ের হাওয়া লেগে অশুচি হয়। মা রেগে উঠলেন।

'এ কি দেবার ছিরি! এমনি করে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দিলে কেউ তৃপ্তি করে খেতে পারে? দে আমাকে দে।'

থালা কেড়ে নিয়ে মা নিজে পরিবেশন করতে লাগলেন ঝুঁকে পড়ে। বললেন, 'পেট ভরে খেয়ো আমজাদ। লজ্জা কোরো না।'

পেট কি শুধু ব্যঞ্জনে ভরে? পেট ভরে আতিথেয়তার ব্যঞ্জনায়।

খাওয়ার পর আমজাদের এঁটো ধুলেন মা। নলিনী চেঁচিয়ে উঠল, 'ও কি, পিসি, তোমার জাত যাবে যে।'

'চুপ কর। সন্তানের এঁটো নিলে মা'র জাত যায়! খুব বুঝেছিস তুই। যেমন শরৎ আমার ছেলে তেমনি আমজাদও আমার ছেলে।'

এই মা সারদা। সর্ববান্ধবরূপিণী জগন্মাতা। শশিরুচিকোমলা, কারুণ্যপূর্ণেক্ষণা।

তুলোর চাষ করে রাম মুখুজ্জে। ক্ষেতে গিয়ে তুলো তোলে শ্যামাসুন্দরী। তুলোর ক্ষেতের মধ্যে শুইয়ে রাখে সারদাকে।

ছোট্টটি থেকেই কাজ করে সারদা। পুকুরে নেমে গলা-জলে দাঁড়িয়ে গরুর জন্যে ঘাস কাটে। চেয়ে দেখে তারই মত আরেকটি মেয়ে গলা ডুবিয়ে দাঁড়িয়েছে জলের মধ্যে। সমবয়সী, কৃষ্ণাঙ্গী। তাকে দল টেনে-টেনে দিচ্ছে। এগিয়ে দিচ্ছে হাতের

কাছে। তাকে কি চেনে সারদা? কে জানে। কোনো কথা কইছে না পরস্পরে। শুধু এ-ওর দিকে তাকিয়ে নীরবে কাজ করে যাচ্ছে।

এই কালো মেয়েটির সঙ্গে, আরো পরে আরেকবার দেখা হয়েছিল সারদার। যেবার সে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছে। পায়ে হেঁটে, তপ্ত রোদে মাঠ ভেঙে-ভেঙে।

এমন অদৃষ্ট, হু-হু করে জ্বর এসে গেল। সঙ্গে বাবা ছিলেন, মেয়ে নিয়ে উঠলেন পাশের চটিতে। এত দিনের এত আশা, সব ভেস্তে গেল বোধহয়। শুধু গা পুড়ছে না মনও পুড়ছে। কে জানে এত পথ হেঁটে এসে ফিরে যেতে না হয়! মিলনের পাত্রটি না বিচ্ছেদে ভরে ওঠে! এমন সময়, চেয়ে দেখল, কে একটি মেয়ে তার পাশে এসে বসেছে। কি আশ্চর্য, সেই কালো মেয়েটি। সারদা যেমন বড় হয়েছে সেও বড় হয়েছে। তেমনি টানা-টানা ভাসা ভাসা চোখ। দেখেই কেমন আপন বলে মনে হয়, চোখের দৃষ্টিটি এত সকরুণ। জ্বরো গায়ে হাত রেখেছে যেন মর্মমূল পর্যন্ত জুড়িয়ে যাচ্ছে।

'কে তুমি গা?' জিগগেস করল সারদা।

'তোমার বোন।' বলল সেই কালো মেয়ে।

'বোন!' তৃপ্তিতে যেন শীতল হল সারদা। বললে, 'কোত্থেকে আসছ বলো তো?'

'দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি।'

'বলো কি! আমি তো দক্ষিণেশ্বরেই যাচ্ছিলুম। কিন্তু আমার মনোবাঞ্ছা আর পূর্ণ হল না।'

'না, না, হবে বৈ কি।' কালো মেয়ে মমতায় আরো ঘন হয়ে এল। 'তারই জন্যে তো এসেছি আগ বাড়িয়ে। তোমাকে নিয়ে যেতে। তোমার জন্যে ঠাকুর পথ চেয়ে বসে আছেন।'

'আমার জন্যে?'

'তুমি ছাড়া তাঁর সাধনা যে পূর্ণ হবার নয়। তিনি অগ্নি তুমি তার দাহিকা। তিনি জল তুমি তার শীতশক্তি। তোমাকে ছাড়া তিনি অঙ্গহীন। তুমিই তাঁর পরিপূরক। তুমি ঘুমোও চুপটি করে, কাল তোমার জ্বর ছেড়ে যাবে। তোমার জন্যে পাঠিয়ে দেব পালকি।'

শুধু পুকুরের দল-ঘাস কাটা নয়, ক্ষেতে মজুরদের জন্যে খাবার নিয়ে যায় সারদা। সেবার পোকায় ধান নষ্ট করেছে, বহু ধান শিষ থেকে ঝরে পড়ে রয়েছে মাটিতে। আঙুলে করে খুঁটে-খুঁটে কুড়োচ্ছে তাই সারদা। খেলাধুলোয় মন নেই, মন শুধু গেরস্তালিতে। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে যদি কখনও খেলেও, গিন্নিবান্নির পাট নেয়। পুতুলও ঢের আছে এদিক-ওদিক, কিন্তু লক্ষ্মী আর কালীর পুতুলই তার বেশি পছন্দ। একদিন তো ফুল আর বেলপাতা নিয়ে সেই পুতুলই সে পুজো করলে।

কে একজন বললে-এ পুতুলের নাম জগদ্ধাত্রী। বা, বেশ নামটি তো! কি হল সারদার, সেই দেবীর কথা ভাবতে বসল। মনে হল ভাবতে-ভাবতে সেই যেন সে দেবী হয়ে গিয়েছে। কাছ দিয়ে যাচ্ছিল হলদিপুকুরের রামহৃদয় ঘোষাল। সারদাকে

দেখে ভয়ে সে শিউরে উঠল। আনন্দলতিকা বালিকার মাঝে এ কী ভয়ঙ্করের আবেশ !

একবার কি দুর্ভিক্ষই লাগল দেশ জুড়ে। সারদাদের আগের বছরের ধান মরাই-বাঁধা ছিল, তাই লোক আসতে লাগল দলে-দলে। ভাতের ঘ্রাণে। চালে-ডালে খিচুড়ি রান্না হতে লাগল—খিচুড়ির ঘ্রাণে। হাঁড়ি-হাঁড়ি খিচুড়ি। যে আসবে সে খাবে। বাড়ির লোকেরও এই ব্যবস্থা। 'শুধু আমার সারদার জন্যে দুটি ভালো চালের ভাত করবে।' বললেন রাম মুখুজ্জে। 'সে এসব খেতে পারবেনি।'

কন্যার জন্যে অবার্য মমতা।

তৈরি খিচুড়িতে কুলোয় না একেক দিন। এত লোক চলে আসে। তখন আবার নতুন করে হাঁড়ি চাপাও। হাঁড়ি যদি নামে, গরম খিচুড়ি জুড়োতে দেয় না। সবাই একেবারে পড়ে হুমড়ি খেয়ে। গরম গরমই সই, মুখ পোড়ে তো পুড়ুক, পোড়া পেটের মত পোড়া মুখ আর কী আছে।

কোত্থেকে একটি পাখা নিয়ে এসেছে সারদা। তাল-পাতার হাতপাখা। তার ডাঁটটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে সারদা হাওয়া করতে লাগল। হাওয়া করতে লাগল ঢালা খিচুড়ির উপর। যাতে শিগগির করে জুড়োয়, ক্ষুধার্তেরা বড়-বড় থাবা দিয়ে গিলতে পারে গোগ্রাসে।

সেবারূপিণী লক্ষ্মী। ধান্যদা ধনদায়িনী।

সেদিন একটি মেয়েলোক এসেছে, রুক্ষ চুল, পাগলের মত চেহারা। গরুর ডাবায় কুঁড়ো ভেজানো ছিল, দিশেহারার মত তাই খেতে শুরু করলে।

'আহা, একটু রোসো গো রোসো।' সারদা ব্যস্ত হয়ে উঠল : 'বাড়ির ভেতর খিচুড়ি আছে এনে দিচ্ছি—'

কে শোনে কার কথা। সব কিছু ধৈর্য মানে, ক্ষুধার ধৈর্য নেই। খিদের জ্বালা কি কম ! দেহ ধরলেই খিদে-তেষ্টা। ক্ষুধা বিশ্বগ্রাসিনী বহ্নিবন্যা।

'অসুখের সময় মাঝরাতে এমনি একদিন আমার খিদে পেল।' বলছেন শ্রীমা : 'সরলা-টরলা ঘুমিয়েছে। আহা, ওরা এই খেটে-খুটে শুয়েছে, ওদের আবার ডাকব ! নিজেই শুয়ে-শুয়ে চার দিকে হাতড়াতে লাগলুম। দেখি একটা বাটিতে চারটি খুদ-ভাজা রয়েছে। বালিশের পাশে দুখানা বিস্কুট। তখন ভারি খুশি। খিদের জ্বালায় যে খুদ-ভাজা খাচ্ছি তার খেয়াল নেই—'

যা দেবী সর্বভুতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা—

আমার তো শুধু অন্নের ক্ষুধা নয়, আমার জ্ঞানের ক্ষুধা, প্রেমের ক্ষুধা, আনন্দের ক্ষুধা। আমার পেট ভরলেই তো বুক ভরে না। ঘর ভরলেই তো ভরে না আমার অন্তর। মা তুমি আমার সেই চিরন্তনী ক্ষুধামূর্তি। আমার পঞ্চকোষের পঞ্চক্ষুধার সংহতি-মূর্তি। কিন্তু তুমি যেমন ক্ষুধা তেমনি আবার তুষ্টি। তুমি যেমন ক্ষুধার প্রকাশিকা তেমনি আবার ভবক্ষুধানিবারিণী। আমি ক্ষুধিত পুত্র আর তুমি অন্নদায়িনী বসুন্ধরা।

* তিন *

সারদার পাঁচ বছর বয়েস আর গদাধরের তেইশ—দুজনের বিয়ে হল। শক্তি মিলল শিবের সঙ্গে। তিনশো টাকা পণ পেল রাম মুখুজ্জে। কন্যা-পণ। কিন্তু বউকে গয়না দিচ্ছ কী? চন্দ্রমণি গয়না পাবে কোথায়? তাদের বড় দৈন্য। নগদ টাকা দিতেই প্রাণান্ত। গদাধরের পাগলামি সারুক, সাংসারে মন পড়ুক তারি জন্যে তার বিয়ে দেওয়া! কিন্তু গয়না কিছু না দিলে তো নয়! লোকে বলবে কি! লাহাদের বাড়ি থেকে ধার করল গয়না। বউকে সাজাবার জন্যে পাঠিয়ে দিল চন্দ্রমণি।

সুরজুর বাপের কোলে চড়ে বউ এসেছে কামারপুকুর। বৈশাখের শেষাশেষি। খেজুর পাকবার সময়। পাকা খেজুর কুড়োবার জন্যে কোল থেকে নেমে পড়ল সারদা।

ধর্মদাস লাহা জিগ্‌গেস করলে, 'এই বুঝি নতুন বউ?'

সুরজুর বাপ আবার কোলে তুলে নিল।

বউ পেয়ে চন্দ্রমণির খুশি আর ধরে না। কিন্তু যতই আনন্দ করো, গায়ের গয়না ফিরিয়ে দিতে হবে এবার। যতই সে কথা ভাবেন চোখ ছাপিয়ে জল আসে। এমন সোনার প্রতিমাকে কি করে নিরাভরণ করবে!

গদাধর বললে, ভয় নেই, আমি খুলে নেব।

সরল শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে সারদা। একটি-একটি করে গদাধর সব গয়না খুলে নিল গা থেকে। কিন্তু ঘুম থেকে উঠেই টের পেল সারদা। জিগ্‌গেস করতে লাগল জনে-জনে, কে আমার গয়না নিলে? কোথায় গেল? বা, এই যে পরে শুলুম রাত্তির বেলা—

সহ্য হল না চন্দ্রমণির। দু হাতে সারদাকে কোলের উপর চেপে ধরলেন। বললেন, 'ও গেছে গেছে। গদাই তোমাকে আরো ভালো-ভালো গয়না দেবে।'

সে সবই তো আসল অলঙ্কার। সেবা আর ব্রত, নিষ্ঠা আর সংযম, করুণা আর ভালোবাসা, নিরভিমানিতা আর সারল্য। ক্ষমা আর সহিষ্ণুতা, ত্যাগ আর তিতিক্ষা, সুখে-দুঃখে ঔদাসীন্য আর কর্মোদ্‌যাপনে অক্লান্তি।

'ওরে হৃদে, দ্যাখ তো তোর সিন্দুকে কত টাকা আছে।' হেঁকে বললেন একদিন ঠাকুর। সাত টাকা করে পান মন্দির থেকে। যদিও নিজে ছোঁন না, ছুঁতে পারেন না, জমে গিয়ে সিন্দুকে।

হৃদয় গুনে বললে, 'তিনশো।'

'ওকে ভালো করে দু ছড়া তাবিজ গড়িয়ে দে। আর ডায়মন-কাটা বালা দে একজোড়া। ওরে, ওর নাম সারদা, ও সরস্বতী। তাই সাজতে ভালোবাসে।'

তারই জন্যে তো কান্না সারদার, পাঁচ বছরের সারদার—আমার গায়ের গয়না কে খুলে নিলে। সঙ্গে, সে বাড়িতে, ছিল তার এক খুড়ো, ব্যাপার দেখে ভীষণ চটে উঠল। এ কি ছলনা! এ কি কারচুপি! সারদাকে কোলে তুলে নিয়ে ফিরে চলল। সোজা জয়রামবাটি।

চন্দ্রমণি চিন্তিত হলেন। গদাধরের চিন্তা নেই। উদাসীনের মত বললে, যাবে কোথায় ? বিয়ে হয়ে গিয়েছে না ? বাঁধন কি আর আলগা হয় ?

গা থেকে গয়না খুলে নিয়েছে, তবু গদাধরের উপর রাগ নেই সারদার। সারদা তখন সাতে পড়েছে, শ্বশুরবাড়ি এসেছে গদাধর। কেউ বলে দেয়নি, নিজের থেকে সারদা জল নিয়ে এল ঘটি করে। গদাধরের পা ধুয়ে দিলে। নুয়ে পড়ে চুল বুলিয়ে দিলে পায়। উঠে দাঁড়িয়ে পাখার হাওয়া করতে লাগল।

সবাই বলছে, পাগলা জামাই !

বলবেই বা না কেন শুনি ? বেশ আছে, হঠাৎ একসময় লাফ মেরে চেঁচিয়ে উঠল গদাধর : 'এবার আমি কাউকে ছাড়ছি না, যবন হোক, চণ্ডাল হোক, যেই হোক না কেন—' সবাই বলে উঠল : 'এই দেখ ! দেখেছ ? পাগল আর কাকে বলে !'

যে যাই বলুক, সারদার বেশ ভালো লাগে লোকটিকে। তাকিয়ে থাকতে চোখে তৃপ্তি লাগে। মনে হয় আনন্দের একটি পূর্ণঘট যেন বুকের মধ্যে বসানো !

জোড়ে ফিরল দুজনে। গদাধর বললে, 'যদি কেউ জিগ্গেস করে, কবে তোমার বিয়ে হয়েছিল, সাত বছর বয়সে বোলো না যেন, বোলো পাঁচ বছর বয়সে। ছেলেমানুষ, বছর গুলিয়ে ফেলো না যেন—'

ভাগ্নে হৃদয় কোত্থেকে কতগুলো পদ্মফুল নিয়ে এসেছে। সারদাকে পুজো করবে। সারদা তো পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু হৃদয়ের সঙ্গে পেরে ওঠা অসাধ্য।

এক ভক্ত এসে শ্রীমাকে বললে, 'মা, তোমার পুজো করব। তোমার কোন ফুল পছন্দ ?'

'না, না, আমাকে পুজো কেন ? ঠাকুরের পুজো করো। ঠাকুর শাদা ফুল ভালোবাসতেন।'

ভক্তের মুখখানি ম্লান হয়ে গেল। মমতাময়ীর চোখ এড়াল না। বললেন, 'আচ্ছা কিছু হলদে ফুলও এনো।'

ভক্ত ফুল নিয়ে এল। মা বললেন, শাদা ফুল ঠাকুরকে দাও। আর হলদে ফুল আমাকে।

বগলাপুজোয় পীতপুষ্প বিহিত। কে একজন জিগ্গেস করলে মাকে, মা আপনি কি বগলা ?

'কি যে বলো তার ঠিক নেই।' কথাটা চাপা দিলেন।

অবগুণ্ঠিতা হয়ে রইলেন। রইলেন আত্মবিলুপ্তিতে।

আমি কে তা জেনে তোমার লাভ কি। দেখ তোমার অন্তরে একটি বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল কিনা। তাতে ধরল কিনা অনুরাগের রঙ ! লাগল কিনা শরণাগতির সৌরভ। তা যদি হয়ে থাকে তবে তোমার সেই চিত্তকমলটিই পুজার পুষ্প। বীণাবাদিনীর পা রাখবার জায়গা।

বড়টি হয়ে প্রথম যখন কামারপুকুরে এল সারদা, তার বয়স তখন তেরো কি চৌদ্দ। গদাধর দক্ষিণেশ্বরে। কালীর জন্যে আকুল। সেই আকুলতাটি যেন ছুঁয়ে আছে সারদাকে। তাই দূরে থেকেও দূর মনে হয় না। অদর্শনই সুদর্শন।

হালদারপুকুরে নাইতে যাবে সারদা। একে নতুন বউ তায় ছেলেমানুষ।

লজ্জায় জড়সড়, কি করে পাঁচজনের সমুখ দিয়ে যাবে-আসবে! খিড়কির ছোট দরজাটির পাশে দাঁড়িয়ে গড়িমসি করছে। অমনি, কোথা থেকে কে জানে, আট-আটটি সমবয়সী মেয়ে এসে হাজির। কিগো, নাইতে যাবে? বেশ তো, চলো আমাদের সঙ্গে। আমরা তোমায় ঘিরে নিয়ে যাব, কেউ দেখতে পাবে না। তোমরা কে গা? জিগ্গেস করল সারদা। আমরা? আমরা এই পাড়ারই মেয়ে, তোমার বন্ধু। চারজন আগে চারজন পিছনে, এমনি করে নিয়ে চলল সারদাকে। নাওয়া হয়ে গেলে আবার ফের পেঁাছে দিয়ে গেল। এমনি রোজ। যতদিন ছিল সে কামারপুকুর।

'মাগো, ওরা কি তোমার অষ্ট সখী?' একদিন জিগ্গেস করল এক ভক্ত।

'কে জানে বাপু! তোমার খালি ঐ সব কথা।'

পঞ্চবটীতে বসে লাটু-মহারাজ ধ্যান করছে। ওদিকে যেতে-যেতে ঠাকুর দেখতে পেলেন। বললেন, 'কার ধ্যান করছিস রে লেটো?'

লাটু তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

'ওই নবত ঘরে যা। সেখানে সাক্ষাৎ ভগবতী আছেন। রুটি বেলছেন বসে-বসে। যা তাঁর রুটি বেলে দে গে যা।'

দৃকপাত না করে লাটু ছুটল নহবতে। সেবার চেয়ে আর বড় পুজো কি আছে!

'মাকে মানা কি সহজ কথা রে?' বলছেন লাটু-মহারাজ। 'ঠাকুরের পুজো গ্রহণ করেছেন—বুঝো ব্যেপার। মা-ঠাউন যে কি তা শুধু তিনি বুঝেছিলেন, আর কিঞ্চিৎ স্বামীজী বুঝেছিল। তিনি যে স্বয়ং লক্ষ্মী। তাঁর দয়া বুঝতে গেলে বহুৎ তপস্যা দরকার।'

বলরাম বোসের বাড়ি থেকে মা জয়রামবাটি ফিরে যাচ্ছেন। একে-একে সবাই মাকে প্রণাম করল, কিন্তু লাটুর দেখা নেই। ঘরে পাইচারি করছে আর বলছে, 'সন্ন্যাসীকো কো পিতা, কো মাতা, সন্ন্যাসী নির্মায়া।'

মা শুনতে পেলেন সেই কথা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'বাবা লাটু, তোমার আমাকে মেনে কাজ নেই।'

তড়াক করে লাফ মেরে মা'র পায়ে পড়ল লাটু। প্রণাম করবে না কাঁদবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ঠিক করতে পেল না।

মা'র চোখ দুটিও ভিজে উঠল। গায়ের চাদর দিয়ে মা'র চোখ মুছিয়ে দিল লাটু। বললে, 'বাপ-ঘরে যাচ্ছ মা? কাঁদতে নেই। শরোট আবার শিগগির তোমাকে নিয়ে আসবে। কেঁদো না মা, যাবার সময় ফেলতে নেই চোখের জল।'

ঠাকুরের ভাই-ঝি লক্ষ্মী। বছর সাতেকের ছোট সারদার চেয়ে। কোত্থেকে একখানা বর্ণ-পরিচয় যোগাড় করে এনেছে। দুজনে মিলে তাই পড়ছে লুকিয়ে-লুকিয়ে।

হৃদয়ের চোখ এড়ানো গেল না। হাতের থেকে বই কেড়ে নিলে জোর করে। বললে, 'মেয়েছেলের লেখাপড়া শিখতে নেই। শেষে কি নাটক-নভেল পড়বে?'

সারদা ছেড়ে দিল। কিন্তু লক্ষ্মী ঝিয়ারী-মানুষ, সে হারল না। নিজে গিয়ে পাঠশালায় পড়ে আসতে লাগল। পড়ে এসে লুকিয়ে-লুকিয়ে শেখাতে লাগল সারদাকে।

সারদা তখন দক্ষিণেশ্বরে, বাগানের পিতাম্বর ভাণ্ডারীর এগারো বছরের ছেলেকে ঠাকুর বললেন লক্ষ্মী আর তার খুড়িকে প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ পড়িয়ে দিতে।

ভালো করে শেখা হয় আরো পরে, ঠাকুর যখন অসুখ হয়ে শ্যামপুকুরে আছেন একা-একা। ভব মুখুজ্জেদের একটি মেয়ে নাইতে আসে গঙ্গায়। অনেকক্ষণ ধরে থাকে মা'র সঙ্গে-সঙ্গে। পড়িয়ে যায়, পড়া নেয় রোজ-রোজ। শাক পাতা যা জোটে মা'র, তাই দেন তাকে গুরুদক্ষিণা।

দিব্যি রপ্ত হয়ে উঠলেন কদিনে। একটানা পড়তে পারেন রামায়ণ-মহাভারত। কঠিন-কঠিন শব্দেরও মানে শিখে নিলেন আস্তে-আস্তে।

'মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং। মার্গশীর্ষ মানে কি?'

'মার্গশীর্ষ মানে অগ্রহায়ণ মাস।' দিব্যি বলে ফেললেন।

লেখাপড়া দিয়ে কী হবে? ভগবানে মতি হওয়াই আসল। সরল না হলে মতি আসবে কি করে? আর, পদবী থেকে মুক্ত হতে না পারলে আসবে কি করে সারল্য?

'ঠাকুর তো লেখাপড়া কিছুই জানতেন না।' বলছেন শ্রীমা, 'নাই জানুন, তবু এবার তিনি এসেছেন ধনী-নির্ধন পণ্ডিত-মূর্খ সবাইকে উদ্ধার করতে। মলয়ের হাওয়া খুব বইছে চারদিকে। যে একটু পাল তুলে দেবে, শরণাগত হবে, সেই ধন্য হয়ে যাবে। যার মধ্যে একটুকু সার আছে, বাঁশ আর ঘাস ছাড়া সব চন্দন হয়ে যাবে। তোমাদের ভাবনা কি, তোমরা তো আমার আপন লোক—তবে কি জানো?' থামলেন একটু শ্রীমা: 'বিদ্বান সাধু যেন হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।'

ভক্তি হাতির দাঁত, জ্ঞান হচ্ছে সোনার বন্ধনী।

এদিকে ঠাকুর বলছেন, 'নরেন আমাকে যত মুখখু বলে আমি তত মুখখু নই। আমি অক্ষর জানি।'

বর্ণলিপি জানি আর সমস্ত বর্ণে ও লিপিতে যিনি অবর্ণনীয় জানি সেই ব্রহ্মকে।

* চার *

কিন্তু পাড়া-পড়শীদের অনুকম্পা সইতে পারে না সারদা। সইতে পারে না পতিনিন্দা। 'আহা, শ্যামার মেয়ের কি-একটা পাগলের সাথে বিয়ে হল।' সইতে পারে না এ লোকগঞ্জনা। হয়েছে তো হয়েছে! তোমরা কী বুঝবে সেই পাগলের মহিমা! আমিই তো নিজের থেকে সেই পাগলকে নির্বাচন করেছি। আমিও তো উন্মাদিনী।

পার্বতীর বিয়ের দিনটি মনে করো। বাপ হিমালয় কত বড় সভা সাজিয়েছেন। হাঁসের পিঠে চড়ে প্রথমে এলেন ব্রহ্মা, কত শোভা-সম্পদের ছড়াছড়ি। গরুড়ের

পিঠে চড়ে এলেন তারপর বিষ্ণু, তারই বা কত আড়ম্বর। তারপর এল প্রজাপতিরা, দিকপালেরা—হৈ-হৈ পড়ে গেল। ঐশ্বর্যে বিলাসে ঝলসে গেল দশদিক। শেষকালে বর এল—ওমা, এই বর, এই তার চেহারা! বাঘের ছাল পরে ষাঁড়ে চড়ে এসেছে। সাপ ঝুলছে ঘাড়ে-বুকে। নেশার ঝোঁকে চোখ ঢুলু-ঢুলু করছে। তাও দুচোখ নয়, তিন চোখ! সঙ্গে আবার দুটো ভূত-প্রেত, নন্দী-ভৃঙ্গী।

বৎসে, বঞ্চিতাসি—আত্মীয়েরা আক্ষেপ করে উঠল। রাজার মেয়ে তুমি, তোমার এ কী মন্দ ভাগ্য। ব্রহ্মা-বিষ্ণু ছেড়ে দিই, আর যে-কোনো বরযাত্রী এ বরের চেয়ে বরণীয়। এ কুকথায় পঞ্চমুখ, কণ্ঠে ভরা বিষ!

কিন্তু গৌরী নির্বিচল। যাতে মন একবার স্থির করেছি তার থেকে ভ্রষ্ট হব না। নিম্নমুখী জলকে কে প্রতিরোধ করবে? যতই নিন্দা করো, ওই আমার সাধনার ধন, আমার তপস্যার নিধি।

সারদারও সেই অবস্থা। যতই নিন্দা করো আমার আনন্দের ঘটটি কানায়-কানায় পরিপূর্ণ। পাড়ায় কারু বাড়িতে যায় না বেড়াতে। মাঝে-মাঝে ভক্তিমতী ভানুপিসির কাছে আসে। তার দাওয়ায় আঁচল বিছিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকে। নিষ্কম্পশিখা সহিষ্ণুতা।

'সহ্যগুণ বড় গুণ।' বলছেন শ্রীমা, 'এর চেয়ে আর গুণ নেই।'

তপস্যা ছাড়া আর কোনো আমার অস্ত্র নেই, এই ধৈর্যই আমার আয়স-কণ্টক।

'তাঁর অনন্ত ধৈর্য।' বললেন আবার শ্রীমা: 'এই যে তাঁর মাথায় ঘটি-ঘটি জল ঢালছ দিন-রাত, তাতেই বা তাঁর কি! আর শুকনো কাপড় দিয়ে ঢেকে পুজো কর তাতেই বা তাঁর কি! তাঁর অসীম ধৈর্য।'

পেটের অসুখ করে কামারপুকুরে এসেছে গদাধর। সঙ্গে হৃদয় আর বামুন-ঠাকরুন। ভৈরবী যোগেশ্বরী। সারদা তখন বাপের বাড়ি। খবর গেল, দেখবে এস আমাদের। পাখির মত উড়ে এল সারদা।

কোথায় পাগল! এ যে রূপের ধবলগিরি! সব-ভোলানো ভোলানাথ!

রাত থাকতে উঠে সারদাকে উদ্দেশ করে হাঁক দেয়: 'ওগো এই-এই সব রান্না কোরো গো—' বলে ফিরিস্তি ঝাড়ে।

কোথাও কিছু ত্রুটি হলে চলবে না। ছেলেমানুষ বউ, সব নিখুঁত করে রাখে। একদিন হয়েছে কি, পাঁচফোড়ন নেই। বড় জা, লক্ষ্মীর মা বললে, 'তা অমনিই হোক। না থাকলে আর কি হবে!'

ঠিক কানে গিয়েছে গদাধরের। ফোড়ন দিয়ে বলছে, 'এক পয়সার আনিয়ে নাও না। যাতে যা লাগে তাতে তা বাদ দিলে চলবে কেন?'

শ্রীমা'রও সেই কথা: 'যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যখন যেমন তখন তেমন।'

এক মেমসাহেব এসেছে মা'র সঙ্গে দেখা করতে। মাকে প্রণাম করতেই মা তার হাত ধরল। অনেকটা হ্যাণ্ড-সেক করার মত। যেখানে যেমন সেখানে তেমন।

বামুন-ঠাকরুন আবার ঝাল বেশি খান। মেজাজটিও ঝুনো সরষে।

গদাধর মা বলে, তাই সারদাও তাকে শাশুড়ির মত ভয় করে।

নিজে রান্না করেন। ঝালে-পোড়া। সারদা চোখ মোছে আর খায়।

'কেমন হয়েছে?' জিগ্‌গেস করে যোগেশ্বরী।

সারদা ভয়ে ভয়ে বলে, 'বেশ হয়েছে।'

লক্ষ্মীর মা না বলে পারে না, 'ঝাল হয়েছে।'

তাই শুনে চটে যায় যোগেশ্বরী। বলে, 'তোমার বাপু কিছুতে ভালো হয় না। ছোট বৌমা তো বললে ভালো হয়েছে। যাও, তোমাকে আর দেব না বেন্নুন।'

নম্রতায় নতশাখা সারদা। লজ্জার নবমঞ্জরী।

ফুল-মালা দিয়ে ঠাকুরকে একদিন সাজালো যোগেশ্বরী। ভাবারূঢ় হলেন ঠাকুর। ঠিক যেন গৌরাঙ্গের মত। ব্রাহ্মণী সারদাকে ডেকে নিয়ে এল সামনে। জিগ্‌গেস করলে, কেমন হয়েছে?

ঘোমটার ফাঁক দিয়ে দেখল একটু সারদা। ভাবাবেশে রয়েছেন ঠাকুর, দেখে কেমন ভয় করতে লাগল। অস্ফুটস্বরে বললে, 'বেশ হয়েছে।' বলে কোনো রকমে একটা প্রণাম সেরে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল সারদা।

দেখল আনন্দের পূর্ণঘটটি টইটুম্বুর হয়ে আছে। এক কণা জলও চলকে পড়েনি।

কিন্তু ঠাকুর যখন মাকে ষোড়শী-পূজা করলেন, সমস্ত সাধনাকে একটি প্রগাঢ় প্রণামে পর্যবসিত করে নিবেদন করে দিলেন মা'র পায়ে, মা ফিরিয়ে দিলেন না সেই প্রণাম। ভুলে গেলেন, না, আর-কিছু? শ্রীরামকৃষ্ণ কি তখন স্বামী, না সাধকচক্রবর্তী? সারদা কি তখন স্ত্রী, না, ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী কালিকা?

রাত তিন প্রহর, পূজা-অন্তে ঠাকুর বললেন, এবার তুমি যেতে পারো।

খাঁচা খুলে দিলে পাখি যেমন উড়ে পালায় তেমনি বেরিয়ে গেল সারদা। বাইরে এসে মনে হল, এ কি করলাম! ঠাকুরের প্রণামটি ফিরিয়ে দিলাম না? মনে মনে প্রণাম করল সারদা। হে মনোবাসী, হে মনোনীত, আমার প্রণামটি গ্রহণ করো।

'মনই প্রথম গুরু।' বললেন শ্রীমা, 'শেষ গুরুও ওই মন।'

বারুইদের মেয়ে সুশীলা। সে-রাত্রে রাঁধুনি আসেনি। রুটি যা হোক করা গেল, এখন তরকারি কে রান্না করে? সুশীলা মাকে গিয়ে বললে, 'মা, আমি যদি রান্না করি, খাবে?'

'তোমরা আমার মেয়ে, তোমাদের রান্না খাব না তো কার রান্না খাব?' সুশীলার আনন্দ আর ধরে না।

চলে যাচ্ছে, কেদারের মা মুখিয়ে এল। ঝাঁজিয়ে উঠল মা'র উপর: 'তুমি বামুনের মেয়ে হয়ে এদের হাতের রান্না কেন খাবে? ঠাকুর না হয় সন্নেসী ছিলেন তুমি তো আর সন্নেসী হওনি।'

সুশীলাকে ফেরালেন মা। মুখখানিতে মলিন একটি ছায়া পড়েছে, হয়তো বা মমতার ছায়া। বললেন অনুতপ্ত গলায়, 'এদের জবালায় কিছু হবে না। শুনলে তো, এইরকম সব বলে। তা তুমি মনে কিছু কষ্ট কোরোনি। ঠাকুর যদি সুযোগ দেন তো হবে।'

মনে কিছুই করেনি সুশীলা। মা যে খেতে চেয়েছেন তার হাতে, এই তার অনন্ত তৃপ্তি। মনই মধু। মনই সুধা। লোকাচার মানতে হয়, কিন্তু মনের টানে ছিঁড়ে যায় বিধি-নিষেধের জঞ্জাল।

খাওয়া হয়ে গিয়েছে, শালপাতা কুড়িয়ে জায়গা নিকোবে ভক্তের দল, মা বলে উঠলেন, 'থাক, লোক আছে।'

লোক আর কে! লোক স্বয়ং মা। কত জাতের ভক্ত, কিন্তু মা'র এক ধর্ম এক জাত। নিজের হাতে সবাইর এঁটো সাফ করতে লাগলেন।

'তুমি বামুনের মেয়ে, এদের গুরু, এরা তোমার শিষ্য, তুমি এদের এঁটো নাও কেন?' নালিশ করে সহবাসিনীরা: 'এতে যে ওদের অমঙ্গল হবে।'

বলে কী অলুক্ষুনে কথা! আমি যে এদের মা গো! ছেলেরটা মা করবে না তো আর কে করবে!

ঈশ্বর দয়াময়—এ আবার কেমন বুলি! বললেন ঠাকুর। ঈশ্বর বাপ-মা। ছেলেকে বাপ-মা দেখবে না তো দেখবে কি ভিন-পাড়ার লোক? দয়া আবার কি! যোগের টান, নাড়ীর টান। না দেখে যাবে কোথায়! একশো বার দেখবে।

সেই যে কামারপুকুর থেকে চলে গেল গদাধর আর তার দেখা নেই। খবর যা আসে তা শুনতে মোটেই ভালো নয়। সত্যি-সত্যি নাকি পাগল হয়ে গিয়েছে। কেবল মা-মা করে কাঁদে, মাটিতে মুখ ঘষে। পুজোর জন্যে রয়েছে মন্দিরে, পুজোতে আর মন নেই। লাঠি কাঁধে করে মন্দিরের চার পাশে ঘুরে বেড়ায়। গায়ে জামা-কাপড় রাখে না, চুলও ঝাঁকড়-মাকড়।

মন বড় উতলা হয়, চোখের কোণে জল জমে। একবার নিজের চোখে দেখে এলে হয় না? তিনি কি সত্যি বদলে যেতে পারেন? কতদিন আগে সেই যে দেখেছিল তাঁকে, পুণ্য-পবিত্র সদানন্দ পুরুষ, সে কি পাগল হয়ে যেতে পারে? যদি কাছে গিয়ে বসে চিনবে না কি সারদাকে, নেবে না কি তার স্নিগ্ধ হাতের শুশ্রূষা? কে জানে! কে বললে, চোখ দুটো নাকি সব সময়ে লাল! দয়ায় ভরা সেই যে দুটি প্রসন্ন চোখ সে কি বিমুখ হয়ে থাকবে? কণ্ঠস্বরে সেই যে ভালোবাসা সে কি ক্ষয় হয়ে যাবার মত?

মন কিছুতেই সায় দেয় না। তিনি ডাকবেন সেই আশায় এত দিন প্রতীক্ষা করে আছি। আমি শাশ্বতী প্রতীক্ষা। শাশ্বতী সহিষ্ণুতা। কিন্তু কই, ডাকছেন কই? না, এসেছে ডাক। ফাল্গুনী পূর্ণিমা গৌরাঙ্গের জন্মতিথি। সে উপলক্ষে আত্মীয়ারা কেউ-কেউ যাচ্ছে কলকাতায়, গঙ্গাস্নান করতে। তাদের সঙ্গে গেলে হয়! গিয়ে দেখে আসতে পারি! তাঁকে দেখাই আমার গঙ্গাস্নান! তাঁকে দেখাই আমার ফাল্গুনী পূর্ণিমা। বাবাকে বলব? কি না-জানি মনে করবেন! হয়তো বুঝে নেবেন অন্তরের কথাটি। লজ্জায় মরে গেল সারদা।

স্নানার্থিনীদের কেউ কথাটা তুলল সারদার বাপের কানে। তিনি এক কথায় রাজী। শুধু রাজী নন, তিনি নিজে যাবেন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে।

পায়ে-হাঁটা পথ, ট্রেন-স্টিমারের নাম-গন্ধ নেই। এক পালকি, তায় অত খরচ করবার মত অবস্থা নয় রাম মুখুজ্জের। সুতরাং মাঠ ভেঙে-ভেঙে চলো—মাঠের

পর মাঠ, মাঠের সমুদ্র। মুক্ত হাওয়ার মতই খুশি-খুশি মন, মাটির ঢেলা মাড়িয়ে-মাড়িয়ে চলেছে সারদা। ক্ষীণাঙ্গী, শ্যামলা মেয়ে। আঠারো বছর বয়স। কোনোদিন পথে নামেনি, খোঁজেনি দিগন্তের ঠিকানা। ধু-ধু করছে মাঠ, ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ, কোথায় একটু গাছের ছায়া, কোথায় একটু পুকুরের জল! শুধু পথ আর পথ, পথচিহ্নহীন প্রান্তরের ঔদাসীন্য! এ কি দুরন্ত অভিসার! তবু ক্লান্ত দেহে পা টেনে-টেনে চলেছে সারদা। দুদিন কাটল আর বুঝি কাটে না। প্রবল জ্বর এসে গেল সারদার।

অফুরন্ত মাঠের দিকে চেয়ে রইল সে শূন্য চোখে। এত দূর টেনে এনে এইখানে শেষে ঠেলে ফেলবে! সামনের চটিতে নিয়ে গিয়ে তুললেন রাম মুখুজ্জে। উপায় কি! যত দিন জ্বর না ছাড়ে, দেহ না সুস্থ হয়, যাত্রা স্থগিত রইল। কে জানে বিধি বাম হলে ফিরে যেতে না হয় জয়রামবাটি।

সেই জ্বরের ঘোরে, চটিতে, সেই কালো মেয়েটির সঙ্গে দেখা। সেই কালাভ্র-শ্যামলাঙ্গী কল্যাণী। তার প্রেমতরল দুটি চোখ। স্নেহবারিভরিত স্পর্শ। এক পা ধুলো নিয়ে বিছানার পাশে বসে পড়ল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। জ্বরে-পোড়া গা ঠাণ্ডা হয়ে গেল মুহূর্তে।

'কেউ তোমাকে পা ধুতে জল দেয়নি?' জিগগেস করল সারদা।

'না, বোন, আমি এখুনি চলে যাব। তোমাকে দেখতে এসেছি। ভয় নেই, ভালো হয়ে যাবে।'

কোয়ালপাড়ায় মা'র জ্বর হয়েছে। জ্বরে একেবারে বেহুঁস। কোথায় পাই এমন ভক্ত যার স্পর্শে জ্বরের জ্বালা ঠাণ্ডা হবে! মোটাসোটা কাঞ্জিলাল। ডাক্তার। ভক্ত। মা'র চিকিৎসা করে। তারই ঠাণ্ডা মোটা পেটটিতে হাত দিয়ে শুয়ে থাকেন শ্রীমা।

সেই কাঞ্জিলালের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। একদিন এসে মাকে বললে প্রণাম করে, 'মা, আশীর্বাদ করুন আপনার ছেলের যেন উপায় হয়!'

মা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, 'বৌমা এমন আশীর্বাদ করব যাতে সকলের অসুখ হোক, সকলে কষ্ট পাক? এমনটি পারব না বলতে। বরং এই আমার আশীর্বাদ, সকলে ভালো থাক, সকলের মঙ্গল হোক।'

ঠাকুরের প্রবল অসুখের সময় বলছেন তিনি নাগমশাইকে: 'ওগো এগিয়ে এস, এগিয়ে এস, আমার গা ঘেঁষে বোস। তোমার ঠাণ্ডা শরীর ছুঁয়ে আমার দগ্ধ শরীর শীতল হোক।' বলে তাকে জড়িয়ে ধরলেন ঠাকুর।

দারুণ গরম পড়েছে। মা তখন কোয়ালপাড়ায়। বলছেন আকাশের দিকে চেয়ে, 'আঃ, একটু বৃষ্টি হলে ধরিত্রীটা ঠাণ্ডা হত।'

কিছুক্ষণ পরেই শুরু হল ঝড়বৃষ্টি। শিল পড়তে লাগল। আনন্দচপলা কিশোরীর মত মা শিল কুড়োতে লাগলেন। মুখে পুরতে লাগলেন তুলে-তুলে। জলে ভিজে লাভ হল এই, আবার জ্বর হল। জ্বরের সঙ্গে-সঙ্গে দুঃসহ গাত্রদাহ।

মেয়েরা মা'র বিছানার দুপাশে বসেছে ঘন হয়ে। তাদের বুকে-পিঠে হাত রাখছেন মা। বলছেন, 'আঃ, এতগুলো মেয়ে, কারু গা ঠাণ্ডা নয়।'

শরৎ মহারাজকে খ‍ুঁজছেন জ্বরের ঘোরে। খবর পেয়ে ডাক্তার কাঞ্জিলালকে নিয়ে এসেছে শরৎ। ছটফট করতে-করতে বারে-বারে হাত বাড়াচ্ছেন মা। গায়ের জামা খ‍ুলে ফেলল শরৎ। মা'র পাশে বিছানায় গিয়ে বসল তাড়াতাড়ি। মা তার পিঠে হাত রাখলেন। বললেন, 'আঃ, আমার সমস্ত দেহ ঠাণ্ডা হল। শরতের গা-টি যেন পাথর।'

পরদিন জ্বর ছেড়ে গেল। পথে বেরিয়েই পেয়ে গেল এক পালকি। বাপে-মেয়ে চলল দক্ষিণেশ্বরের দিকে। গঙ্গার উপরে নৌকোয় বারবেলা কাটিয়ে নিল। যখন দক্ষিণেশ্বরে পেঁছ‍ুল তখন রাত নটা।

* পাঁচ *

তুমিই শ্রী, তুমিই ঈশ্বরী। তুমিই ব‍ুদ্ধি, তুমিই শ‍ুদ্ধবোধস্বর‍ূপা। তুমিই হ্রী, তুমিই লজ্জা। প‍ুষ্টি-তুষ্টি, শান্তি-ক্ষান্তিও তুমিই।

কেউ সৌভাগ্যে আর‍ূঢ় হয়েছে, দেখি শ্রীর‍ূপিণী তুমি তাকে কোলে নিয়ে বসে আছ। কেউ প্রতাপে পর্বতায়মান হয়েছে, দেখি ঈশ্বরীর‍ূপিণী তুমি, তাকে কোলে নিয়ে বসে আছ। কেউ দ‍ুষ্কার্য করে নিন্দার ভয়ে আত্মগোপন করবার চেষ্টা করছে, দেখি হ্রীর‍ূপিণী তুমি তাকে বসে আছ কোলে নিয়ে। তোমার কোল ছাড়া আর স্থান নেই। যে ব‍ুদ্ধিবলে বিশ্বজগৎকে প্রতিভাত দেখি তুমি সেই ব‍ুদ্ধির‍ূপে বিদ্যমান। আবার যখন জগৎসত্তা ছেড়ে অন‍ুভব করি শ‍ুধ‍ু আত্মসত্তা তুমি তখন আবার সেই স্বচ্ছ নির্মল-বোধ। ধ্যানমন্থনে অখণ্ডানন্দ। যখন দেখি কেউ প্রকাশকুণ্ঠিত হয়ে আছে, রহস্যটি সম্প‍ূর্ণ উন্মোচিত করতে চাইছে না, মনে হয় তুমিই লজ্জার‍ূপে বিরাজ করছ। যখন দেখি কার‍ু প্রতিপত্তি, ভুলতে পারি না এ তোমারই পালন-পোষণ। যখন দেখি কারো সন্তোষে নিবাস, দেখি তোমারই সেই অম্লান রাজম‍ুকুট। যখন দেখি কেউ জগতের স‍ুখদ‍ুঃখের অতীত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আত্মজ্ঞানে তখন ব‍ুঝি তুমিই শান্তি। প্রতিকারের শক্তি থেকেও যখন দেখি কেউ অনায়াসে সহ্য করছে অপকার তখন দেখি তুমিই ক্ষমা, তুমিই সর্ববরদা মধ‍ুমধ‍ুরা কর‍ুণা।

আর সকলে গেল নহবতে, সারদা সোজা চলে এল রামকৃষ্ণের ঘরে। অর্থ যেমন এসে সমন্বিত হয় বাক্যের সঙ্গে।

'তুমি এসেছ?' রামকৃষ্ণ তৃপ্তস্বরে বললে, 'বেশ করেছ।' বলেই হাঁক দিলে: 'ওরে মাদ‍ুর পেতে দে রে—' কে একখানা মাদ‍ুর পেতে দিল। বসল তাতে সারদা।

'এখন কি আর আমার সেজবাব‍ু আছে?' দ‍ুঃখ করল রামকৃষ্ণ: 'আমার ডান হাত ভেঙে গেছে।' আবার বলছে জের টেনে: 'কয়েক মাস হল মারা গেছে। সে থাকলে তোমাকে আজ অট্টালিকায় রাখত!'

সারদা বললে, 'আমি নবতের ঘরে গিয়ে থাকি!'

'না, না, ওখানে ডাক্তার দেখাতে অসুবিধা হবে। এ ঘরেই থাকো।'

রাতের খাওয়া-দাওয়া সব হয়ে গিয়েছে, হৃদে ক'ধামা মুড়ি নিয়ে এল। তাই কটি চিবিয়ে সারদা শুয়ে পড়ল সেই মাদুরের উপর। একটি সংগী মেয়ে শুল তার পাশটিতে।

কী স্নেহশান্ত রাত্রি! চাটিতে সেই কালো মেয়েটির করপল্লবের মত সুকোমল। ক্লান্তকায়ে দক্ষিণসমীরের স্পর্শটির মতন এই ঘুম! অন্তরের আনন্দঘটটির দিকে তাকালো আবার সারদা। দেখল কানায়-কানায় ভরা।

যত সব বাজে গুজব শুনেছিল! লোকের খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, কেবল মিথ্যে রটানো। কেমন কর্পূরগৌর কান্তি, কেমন দয়াঘন আর্দ্র চোখ, কেমন দুঃখভঞ্জন কণ্ঠস্বর! কে বলে এ পাগল! এ যে পাগল-করা!

মেঝেতে শুয়ে শান্তিতে ঘুমুলো সারদা।

বলছেন শ্রীমা, 'আগে মেঝেতে শুতাম, তখনো ঘুম আসত, এখন ভক্তেরা পালঙ্কে এনে শোয়াচ্ছে, এখনো ঘুম আসে। কই আমি কিছু তফাত বুঝি না তো!'

ঘুম এসে গেলে আর বিছানা লাগে না। তেমনি ভালোবাসা এসে গেলে লাগে না আর আবরণ-আভরণ। আসল হচ্ছে ঘুম, আসল হচ্ছে ভালোবাসা।

শাশুড়ির কথাও ভাবছে সারদা। কুঠিঘরেই আগে থাকতেন চন্দ্রমণি। অক্ষয়, ঠাকুরের ভাইপো, ঐ কুঠিঘরেই মারা যায়। তার মারা যাবার পর কুঠিঘর ছেড়ে দিলেন চন্দ্রমণি, বললেন, 'আর থাকব না ওখানে। নবতের ঘরে থাকব, গংগাপানে মুখ করে রইব। দরকার নেই আমার কুঠিঘরে।'

কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ না করে ছেড়ে দেবে না রামকৃষ্ণ। ডাক্তার ডেকে আনল। ওষুধ খাওয়াতে লাগল নিজের হাতে। দাগ মেপে, ঘড়ি ধরে। কত সেবা, কত যত্ন। কত স্পর্শহীন পবিত্র স্পর্শ।

'স্বামীর সংগে গাছতলাও রাজ-অট্টালিকা।' স্বামীর প্রতি উদাসীন এক সধবা মেয়েকে বলছেন শ্রীমা। আবার স্ত্রীর প্রতি বিমুখ এক স্বামীকে বলছেন, 'স্বামী-স্ত্রী একসংগে থেকো। দুজনে যেখানেই থাকো, সেখানেই রামরাজ্য।'

রাধুর স্বামীর নাম মন্মথ। একদিন রাধু এসে শ্রীমা'র কাছে নালিশ করলে স্বামী তাকে চড় মেরেছে।

'কেন, কি করেছিলি?' জিগ্গেস করলেন শ্রীমা।

'গামছা ছুঁড়ে মেরেছিলাম।'

'একটা গামছা ছুঁড়ে মারলেই কি একটা চড় মারতে পারে?' শ্রীমা অবাক মানলেন।

একজন সধবা ভক্ত-স্ত্রীকে সালিস মানলেন। জিগ্গেস করলেন, 'হ্যাঁ বৌমা, এই রকম হয়?'

'তা রাধু যদি রাগ করে গামছা ছুঁড়ে মেরে থাকে,' বললে সেই স্ত্রী-ভক্ত, 'তা হলে তো তার স্বামী ওরকম করতেই পারে!'

'তাই কি বৌমা?' বালিকাস্বভাব শ্রীমা স্বচ্ছমুখে বললেন, 'তোমাদের ওরকম করে? ঠাকুরের সংগে আমার তো কোনোদিন ওরকম ব্যবহার হয়নি, তাই ওসব

জানি না। তা হলে রাধুরই দোষ! শোন্, ঐ যে বৌমা বলে, স্বামীকে ওরকম করতে নেই।'

রাধু কি শ্রীমাকেও কম যন্ত্রণা দিয়েছে? বায়ুরোগে পাগলের মতন হয়ে আছে তখন কোয়ালপাড়ায়। শ্রীমা খাইয়ে দিচ্ছেন। এমন গেরো, মুখে খাবার নিয়ে প্রায়ই ফেলে দিচ্ছে মা'র গায়ে। বিরক্ত হয়ে মা বলে উঠলেন, 'দেখ মা, এ শরীর দেবশরীর। এতে আর কত অত্যাচার সহ্য হবে? ঠাকুর আমাকে কখনো ফুলের ঘা-টি পর্যন্ত দেননি। কখনো তুমি ছাড়া তুই বলেননি। একবার আমাকে লক্ষ্মী মনে করে তুই বলে কী অপ্রস্তুত! তক্ষুনি জিব কামড়ে বললেন, ওমা, তুমি? কিছু মনে করোনি। আমি লক্ষ্মী মনে করে তুই বলে ফেলেছি!'

মন স্থির করে নিতে দেরি হল না সারদার। এইখানেই সে তার বাকি জীবন কাটিয়ে দেবে, এই তরুমূলে, বিস্তীর্ণ ছায়ায় সংক্ষিপ্ত আঁচল পেতে। এই তৃণাসনই তার রাজেন্দ্রাণীর সিংহাসন।

মেয়েকে তো কই গদাধর ত্যাগ করেনি, বরং সাদরে গ্রহণ করেছে, স্বহস্তে সেবা করে নীরোগ করে তুলেছে—তৃপ্ত মনে বাড়ি ফিরলেন রাম মুখুজ্জে। স্ত্রীকে গিয়ে দেবেন সেই সুখবর।

'আমি তোমাকে ত্যাগ করেছি?' নহবতখানায় বন্দিনী সারদাকে জিগগেস করে রামকৃষ্ণ।

'না, তুমি আমাকে গ্রহণ করেছ!'

সমান বৃক্ষের ডালে আমরা দুখ সখার মত দুই পাখি একেবারে পাশাপাশি বসে আছি, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। আমি আর তুমি। অগ্নি আর সোম। আদিত্য আর চন্দ্রমা। শক্তি আর শিব। প্রপঞ্চরূপিণী আর নিষ্প্রপঞ্চ।

* ছয় *

এবার অগ্নিপরীক্ষা।

তোতাপুরী স্পর্ধা করে বলেছিল রামকৃষ্ণকে, 'স্ত্রীকে দেশে রেখে খুব কামজয়ের বড়াই করছ। থাকত তোমার সঙ্গিনী হয়ে বুঝতুম কেমন বাহাদুর।'

অন্তরে একটি দীনতা ছিল রামকৃষ্ণের। তাই কোনো ঔদ্ধত্য দেখায়নি। বিনীতের মত অগ্নিপরীক্ষার পূত-দীপ্ত মুহূর্তটির জন্যে প্রতীক্ষা করেছে। সেই মুহূর্তটি সমাগত। মা, বল দে, বীর্য দে, আমার প্রাণপবনস্পন্দনকে দৃঢ়ভাবনা-ভূমিতে বিনিশ্চল কর্।

নহবত ঘরে আছে তখন সারদা, চন্দ্রমণির কাছে। রামকৃষ্ণ তাকে ডেকে পাঠাল। এখন থেকে আমার এখানে শোবে। চন্দ্রমণি ভাবলেন, সংসারে মতি হল বুঝি গদায়ের। পাশাপাশি দুটি খাট। বড় খাটটিতে রামকৃষ্ণ ব'সে। ছোটটিতে লজ্জা-বৃতা হয়ে ঘুমিয়ে আছে সারদা।

বিচার-বিতর্ক করছে রামকৃষ্ণ। মনের মুখোমুখি বসে করছে অনেক খণ্ডন-প্রতিপাদন। সংসার নারীকে ভোগবতী করেছে, তুই একে ভগবতী কর। ক্ষণিক মর্তসীমা ছেড়ে চলে আয় ভুমার নিকেতনে। তুই যদি ষোলো আনা করে যাস তবেই তো লোকে এক পয়সা অন্তত করবে। নারীর মধ্যে দেখবে সেই হরসহচরীকে। অন্তত সত্তার মধ্যে দেখবে সেই সম্ভাবনা, যেমন পুষ্পশাখে আত্ম-দিৎসু ফলের প্রতিশ্রুতি। 'যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না—যা শ্রী স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষু।' আর তুই যদি হাল ছেড়ে দিস সংসারজলধি পাবে না সেই স্বর্ণস্বর্গের ঠিকানা। এই সাধনা একমাত্র তোর। আর সবাই হয় স্ত্রীকে বর্জন করেছে, নয়তো ভয়ে-অভিভবে অর্জনই করেনি। তুই শুধু দেখাবি একবার স্ত্রীর মহিমা। কাকে বলে সহধর্মিনী। 'কথং ত্বং জননী ভূত্বা মম বধূরূপেণ সংস্থিতা?' জননী হয়ে কেমন করে আবার বধূরূপে আমার ঘরে বিরাজ করো? ঘরে তোর তিন দেবতা—পিতা, মাতা আর স্ত্রী। তোর এই শেষ দেবতাকে প্রতিষ্ঠিতা করে যা সংসারে। সেই তোর সদাকারা সদানন্দা স্বয়ংপ্রভা প্রতিমা। নিত্যা অক্ষর-সুধা। 'সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে।' নারীর উত্তুঙ্গতম গৌরবের মুকুট পরিয়ে দে তার মাথায়। ভবনেশ্বরীর মধ্যে ভুবনেশ্বরীকে দ্যাখ।

কিন্তু রামকৃষ্ণের মনেও কি ভয় নেই? আছে। ভয়, পাছে সারদা মোহিনীরূপ ধরে। তাকে তার অমৃতের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখে। তাই ভবতারিণীর কাছে এই শুধু আকুল প্রার্থনা রামকৃষ্ণের: 'মা, আমার স্ত্রীর ভিতর থেকে কামভাব দূর করে দে।'

কোনো ভয় নেই। আমি শিরাকঙ্কালগ্রন্থিশালিনী মাংসপাঞ্চালি নই। আমি ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা। আমি প্রতিনিয়তা শক্তি। আদিভূতা। চিন্ময়ী চিদবিলাসিনী। তোমার সর্বতপস্যার সিদ্ধি। তোমার মন্ত্রঘনীভূতা প্রতিমা। স্বল্পাক্ষরময়ী হয়েও সারবতী অখিলবিদ্যা।

মাকুকে তিরস্কার করছেন শ্রীমা: 'সংসারে যে কি সুখ তা তো দেখছিস! স্বামী-সুখও দেখলি! লজ্জা হয় না, আবার স্বামীর কাছে যাস? এতদিন আমার কাছে থেকে কী দেখলি? এত আকর্ষণ কেন, কেন এত পশুভাব? কী সুখ পাচ্ছিস? ফের যদি যাবি, দূর করে দেব। পবিত্র ভাবটা কি স্বপ্নেও তোদের ধারণা হয় না? এখনো কি ভাই-বোনের মত থাকতে পারিসনে?'

কে একটি স্ত্রীলোক এসেছে মা'র কাছে। কণ্ঠস্বর অনুতাপে ভরা। 'মা, আমাদের উপায় কী হবে?'

মা ঈষৎ বিরক্ত হলেন। বললেন, 'তোমাদের বছর-বছর ছেলে হবে, একটুও সংযম নেই! এখন আমার কাছে এসে, আমাদের উপায় কী, বললে কী হবে বলো?'

সেজে-গুজে একজন মহিলা এসেছে মা'র কাছে। পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করতেই মা বললেন, 'ওখানেই করো না মা, পায়ে কেন?'

মহিলাটির স্বামীর খুব অসুখ। তাকে ভালো করে দিতে হবে তার জন্যে মাকে পীড়াপীড়ি করছে। 'আপনাকে এর উপায় করতেই হবে। আপনি বলুন তিনি ভালো হবেন।'

'আমি কি জানি মা, ঠাকুরই সব। ঠাকুর যদি ভালো করেন তবেই হবে।'

'আপনি বলুন ঠাকুরের কাছে। আপনার কথা কি ঠাকুর ঠেলতে পারবেন?' কাঁদতে লাগল মহিলা।

'ঠাকুরকে ডাকো তিনি যেন তোমার হাতের নোয়া অক্ষয় রাখেন।'

মহিলা চলে গেল প্রণাম করে।

'সব লোকের জ্বালাতাপে শরীর জ্বলে গেল মা।' গায়ের কাপড় ফেলে মা শুয়ে পড়লেন। 'অমন বিপদ, ঠাকুরের কাছে এসেছে, মাথা-মুড় খুঁড়ে মানসিক করে যাবে—তা নয়, কি সব গন্ধ-টন্ধ মেখে কেমন করে এসেছে দেখ! অমন করে কি ঠাকুর-দেবতার স্থানে আসতে হয়? এখনকার সবই কেমন একরকম!'

এমনি আরো কত দিন হয়েছে।

উত্তরের বারান্দায় বসে জপ করছেন মা, পাঁচ-ছ'টি স্ত্রীলোক এসে হাজির। কি ব্যাপার? একজনের পেটে টিউমার হয়েছে, ডাক্তার বলেছে অস্ত্র করতে হবে, তাই তিনি ভয় পেয়েছেন। এখন মা'র পায়ের ধুলোয় টিউমারটি যদি আরাম হয়! কাউকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দিলেন না মা। বললেন, 'ঐ চৌকাঠ থেকে ধুলো নাও।'

'আপনি আশীর্বাদ করুন যেন ও সেরে ওঠে—'

'ঠাকুরকে ডাকো, উনিই সব।' চঞ্চল হয়ে বললেন, 'তবে তোমরা এখন এস, রাত হল।' ওরা চলে যাবার পর মা বললেন নবাসনের বউকে, 'গংগাজল ছিটিয়ে ঘর ঝাঁট দিয়ে ফেল—'

তেমনি একদিন হয়েছিল ঠাকুরের বেলায়। কামারপুকুর থেকে কে একজন দেখতে এসেছিল তাঁকে। লোকটা ভালো নয়। সে চলে যাবার পর ঠাকুর বলে উঠলেন, 'ওরে দে, দে, ওখানটায় এক ঝোড়া মাটি ফেলে দে।' কেউ ফেলতে গেল না। তাই দেখে ঠাকুর নিজেই কোদাল নিয়ে ঠনঠন করে খানিকটা মাটি ফেলে দিয়ে তবে ছাড়লেন। বললেন, 'ওরা যেখানে বসে মাটিসুদ্ধ অশুদ্ধ হয়।'

গংগাজল ছিটিয়ে ঝাঁট দিয়ে দিল বউ। নিচের বিছানায় শুয়ে গায়ের কাপড় খুলে ফেলে বলে উঠলেন মা, 'আমাকে বাতাস করো, বাতাস করো, শরীর জ্বলে গেল। গড় করি মা কলকাতাকে। কেউ বলে আমার এ দুঃখ, কেউ বলে আমার ও দুঃখ, আর সহ্য হয় না। কেউ বা কত কি করে আসছে, কারো বা পঁচিশটা ছেলে-মেয়ে—দশটা মরে গেল বলে কাঁদছে—মানুষ তো নয়, সব পশু—পশু। সংযম নেই কিছু নেই। জোরে বাতাস করো মা, লোকের দুঃখ আর দেখতে পারি না।'

মাঝে-মাঝে মাঝ-রাতে ঘুম ভেঙে যায় সারদার। ঘোমটাটি সরিয়ে পরিপূর্ণ চোখে দেখে ঠাকুরকে। এখনো বসে আছেন খাটের উপরে। ঘুম তো দূরের কথা, পাষাণের মত নিশ্চল, নিশ্বাস পড়ছে কিনা কে জানে! ভয় পেল সারদা। ঘরের বাইরে বারান্দায় শুয়েছিল কালীর-মা, তাকে জাগাল ব্যস্ত হয়ে। সে গিয়ে হৃদয়কে ডেকে আনলে। হৃদয় মন্ত্র শোনাতে লাগল ঠাকুরকে। মন্ত্র শুনতে-শুনতে সংহত তুষার বিগলিত হল, সমাধি-ভূমি থেকে নেমে এল রামকৃষ্ণ।

রামকৃষ্ণ তারপর নিজেই সারদাকে শিখিয়ে দিল যত্ন করে, কোন লক্ষণে কোন

মন্ত্র বলে ভাঙতে হবে সমাধি। সারদার আর ভয় নেই, এখন তার আনন্দ, অবিচ্ছিন্ন আনন্দ। তার এখন ঘুমিয়েও আনন্দ, জেগে উঠেও আনন্দ। রামকৃষ্ণের সাধনার সমস্ত চাবিকাঠিটি এখন তার হাতে।

তুমি সমাধি আমি মন্ত্র। তুমি অর্গল আমি কুঞ্চিকা।

তুমি কাব্য আমি ব্যাখ্যা। তুমি ভাব আমি মূর্তি।

সরলা বালিকাকে কে একজন বুঝিয়ে দিয়েছে, স্বামীর কাছ থেকে তোর পাওনা-গণ্ডা ষোলো আনা আদায় করে নিবি। সন্তান না হলে স্ত্রীলোকের সংসারই বা কি, ধর্মই বা কিসের। স্বামী অসংসারী হয়েছে বলে তুই তো আর সন্ন্যাস নিসনি! তুই তোর আদায়-উশুল ছাড়বি কেন?

শরতের শেফালিকার মতই সরল-শুভ্র সে বালিকার রূপ। মাথা নামিয়ে সলজ্জ মুখে বললে একদিন সারদা, 'তাই তো, ছেলেপুলে একটাও হবেনি, সংসারধর্ম বজায় থাকবে কিসে?'

সর্বজীবের যিনি জননী হবেন তার মধ্যে এই সন্তান-আকাঙ্ক্ষা তো স্বাভাবিক। যে মাতৃত্বের উন্মেষ হবে সারদার মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষাটি তো তারই সৌরভসংবাদ। এ আকাঙ্ক্ষা তো দেহসুখের ছলনা নয়, এ ভুবনপ্লাবিনী পরমপাবনী স্নেহগঙ্গা।

যেন খুশি হল রামকৃষ্ণ। বললে, 'একটা ছেলে খুঁজছ কি গো! তোমার এত ছেলে হবে যে তাদের মা-ডাকের চোটে টিকতে পারবে না।'

আমি জগতের মা হব না তো আর কে হবে? 'অহং রাষ্ট্রী, সংগমনী বসূনাং।' আমিই একমাত্র অধিশ্বরী, আমিই পার্থিব ও অপার্থিব ধনদাত্রী। আমিই প্রকৃতি বিকৃতিশূন্যা। আমিই সর্বাবভাসিকা বুদ্ধি। আমিই সর্বাশ্রয়দাত্রী মহামায়া।

'তাই আজ দেখছি বাবা, কত দেশদেশান্তর থেকে কত ছেলেই যে আমার আসছে।' বললেন শ্রীমা। 'নরেন, বাবুরাম, ওরা সব কত কষ্ট করে গেছে। এখন তোমাদের মহারাজ—সেই রাখালকেও কতদিন ভাতের হাণ্ডা মাজতে হয়েছে—'

'একদিন একটু মিছরির পানা খেতে দিয়েছিলাম বাবুরামকে। বাবুরামের তখন পেটের অসুখ। ঠাকুর তা দেখতে পেয়েছিলেন। আমাকে ডেকে বললেন, তুমি বাবুরামকে কী খেতে দিয়েছিলে? আমি বললুম, মিছরির পানা। ঐ কথা শুনে ঠাকুর বললেন, ওদের যে সাধু হতে হবে। ওসব কী অভ্যেস করাচ্ছ?' মিছরির পানা আর নেই, কিন্তু মায়ের প্রাণের অনন্ত কান্নাটি যেন তারও চেয়ে মিষ্টি, তারও চেয়ে স্নিগ্ধকর!

বাবুরাম মহারাজ দেহ রাখবার পর মা বলছেন স্ত্রী-ভক্তদের, 'আজ আমার বাবুরাম চলে গেল। সকাল হতে আমার চক্ষের জল পড়ছে।' বলতে-বলতেই চোখের জলের বন্যা নেমে এল। 'বাবুরাম আমার প্রাণের জিনিস ছিল। মঠের শক্তি, ভক্তি, মুক্তি, সব আমার বাবুরামরূপে গঙ্গাতীর আলো করে বেড়াত—'

নরেনের কথা বলতেও মা গদগদ: 'আহা নরেন আমাকে মঠে নিয়ে গিয়ে প্রথম দুর্গাপূজা করলে। আমার হাত দিয়ে পঁচিশ টাকা দক্ষিণা দেওয়ালে পূজারীকে। পুজোর দিন লোকে লোকারণ্য, ছেলেরা সব খাটা-খাটনি করছে, এমন সময় নরেন এসে আমায় বললে, মা, আমার জ্বর করে দাও। সে কি কথা? ওমা, বলতে-না-বলতেই

খানিকবাদে হু-হু করে জ্বর এসে গেল নরেনের। ওমা, একি হল, এখন কি হবে? নরেন বললে, কিছু ভেবো না মা। আমি সেধে জ্বর নিলুম, নইলে কখন কোন ছেলেটার কাজে কী ত্রুটি দেখে রেগে উঠে থাপ্পড় মেরে বসব ঠিক নেই। তখন ওদেরও কষ্ট আমারও কষ্ট। তাই ভাবলুম, কাজ কি, থাকি কিছুক্ষণ জ্বরে পড়ে। তারপর কাজকর্ম চুকে আসতেই বললুম, ও নরেন এখন তা হলে ওঠো। হ্যাঁ, মা, এই উঠলুম আর কি। বলে সুস্থ হয়ে যেমন তেমনি উঠে বসল।'

'মা ঠাকুরুণ যে কি বস্তু বুঝতে পারিনি, এখনো কেউই পারো না, ক্রমে পারবে।' শিবানন্দকে আমেরিকা থেকে চিঠি লিখছেন বিবেকানন্দ: 'শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন? শক্তির সেখানে অবমাননা বলে। মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জন্মাবে। দেখছ কি ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে! এইজন্য তাঁর মঠ প্রথমে চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই, মা-ঠাকুরাণী গেলে সর্বনাশ! শক্তির কৃপা না হলে ছাই হবে। আমেরিকা ইউরোপে কি দেখছি? শক্তির পুজো, শক্তির পুজো। তবু এরা অজান্তে পুজো করে, কামের দ্বারা করে। আর যারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পুজো করবে, তাদের কি কল্যাণ হবে না? আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দিন-দিন সব বুঝতে পারছি। তাই তো বলছি, আগে মায়ের জন্যে মঠ চাই।'

আর শরৎ? শরৎ তো মা'র বাসুকি।

'আমার ভার নেওয়া কি সহজ?' বলছেন শ্রীমা, 'শরৎ ছাড়া কেউ ভার নিতে পারে এমন তো দেখিনি। সে আমার বাসুকি, সহস্রফণা ধরে কত কাজ করছে, যেখানে জল পড়ছে সেখানেই ছাতা ধরছে।'

মা'র আরেক ছেলে, ডঙ্কা-মারা ছেলে, দুর্গাচরণ। ওরফে নাগ-মশাই।

'আহা, তার কি ভক্তিই ছিল! এই তো দেখ শুকনো কটকটে শালপাতা, এ কি কেউ খেতে পারে? ভক্তির আতিশয্যে, প্রসাদ ঠেকেছে বলে পাতাখানা পর্যন্ত খেয়ে ফেললে। আহা, কি প্রেমচক্ষুই ছিল তার! রক্তাভ চোখ, সর্বদাই জল পড়ছে। কঠোর তপস্যায় শরীরখানি শীর্ণ। আহা, আমার কাছে যখন আসত, ভাবের আবেগে সিঁড়ি দিয়ে আর উঠতে পারত না, এমনি—' মা নিজে উঠে দেখালেন সেই ভাব—'থর থর করে কাঁপত, এখানে পা দিতে ওখানে পড়ত। তেমন ভক্তি আর কারু দেখলুম না।'

সেই দুর্গাচরণকে মা একখানা কাপড় দিয়েছেন। পাগড়ির মত করে সে তা মাথায় জড়িয়ে রেখেছে। আর যখন-তখন উল্লাসে লাফ দিয়ে বলছে, 'বাপের চেয়ে মা দয়াল! বাপের চেয়ে মা দয়াল।'

মাকে যেদিন প্রথম দেখতে আসে সেদিন মা'র একাদশী। কোনো পুরুষ-ভক্তই মাকে তখনো সাক্ষাৎ-দর্শন করতে পায় না, সিঁড়িতে মাথা ঠুকে প্রণাম করে। ঝি শুধু হেঁকে নাম বলে দেয়, মা মনে-মনে আশীর্বাদ করেন।

সেদিন ঝি বললে, 'মাগো, নাগমশাই কে? তিনি প্রণাম করছেন তোমাকে। কিন্তু এত জোরে মাথা ঠুকছেন, রক্ত বেরুবে যে। পেছন থেকে মহারাজ কত

বলছেন থামবার জন্যে, কিন্তু কোনো বাক্যই নেই। যেন হুঁশ নেই কিছুতেই। পাগল নাকি মা ?

মা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন, 'ওগো, যোগেনদকে বলো এখানে পাঠিয়ে দিক।'

যোগেন ধরে নিয়ে এল দুর্গাচরণকে। মা দেখলেন, কপাল ফুলে গেছে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে অঝোরে। এখানে পা ফেলতে ওখানে ফেলছে, চোখের জলে দেখতে পাচ্ছে না মাকে। মুখে শুধু ঠাকুরের মন্ত্র—মা-মা ধ্বনি। পাগল অথচ শান্ত, বিহ্বল অথচ গম্ভীর। মা উঠে এলেন। ধরে বসালেন দুর্গাচরণকে। নিজের হাতে মুছে দিলেন চোখের জল। এই তো মা। সন্তান যখন ঠিক-ঠিক কাঁদে, কান্নার মধ্যে আকুলতার অগ্নিস্পর্শ লাগে, তখন এমনি করেই উঠে আসেন। ধরে বসান। চোখের জল মুছে দেন নিজের হাতে। মা'র কাছে খাবার ছিল—লুচি, মিষ্টি, ফল। নিজে কিছু খেয়ে নিয়ে খাইয়ে দিতে লাগলেন। কিন্তু কিছু কি খেতে পারে ? খাবার দিকে মন নেই, শুধু মা-মা রব ! মায়ের পায়ে হাত দিয়ে বসে আছে উন্মনার মত।

মা'র তখন খাবার সময়। মেয়েরা বলতে লাগল, 'মা, তোমার খাওয়া বুঝি হল না। মহারাজকে বলি এঁকে সরিয়ে নিতে।'

মা বাধা দিলেন। বললেন, 'না, না, থাক। একটু স্থির হয়ে নিক।'

দুর্গাচরণের গায়ে-মাথায় হাত বুলুতে লাগলেন মা। ঠাকুরের নাম করতে লাগলেন। তবে হুঁশ এল।

মা খেতে লাগলেন, সঙ্গে-সঙ্গে খাওয়াতে লাগলেন দুর্গাচরণকে।

এই না হলে মা !

খাওয়া হয়ে গেলে ধরাধরি করে দুর্গাচরণকে নিয়ে গেল নিচে। যাবার সময় বলে গেল মাকে, 'নাহং, নাহং, তুঁহু, তুঁহু !'

এই না হলে সন্তান !

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল রামকৃষ্ণ। না, কি সারদাই তাকে উত্তীর্ণ করিয়ে দিল ? পালে অনুকূল বায়ু সঞ্চার করে নিয়ে গেল সচ্চিদানন্দের অলোক-তীর্থে !

রামকৃষ্ণের পদসেবা করছে সারদা। এক সময় কি ভেবে হঠাৎ জিগ্‌গেস করে বসল, 'আমি তোমার কে ?'

'তুমি ? তুমি আমার আনন্দময়ী।' বললে রামকৃষ্ণ।

তুমি অরূপের রূপসাগর। তুমিই মধুরূপিণী মহামায়া। সর্বতোভদ্রা, অক্লিষ্টমুখী, সুপ্রসন্নাস্যা। অন্নপূর্ণা নিত্যতৃপ্তা। দুর্বৃত্তবৃত্তশমনী হয়ে আবার পরমার্তিহন্ত্রী।

'যে মা মন্দিরে সে মা-ই নবতে।' বললে আবার রামকৃষ্ণ : 'আবার সেই এখন আমার পদসেবা করছে।'

তুমি বহুরূপিণী শক্তি। সর্বেশ্বরেশ্বরী। প্রসন্না ও বরদারূপে সন্নিহিতা হয়েছ সংসারে। আর ভয় নেই। যে আনন্দের সংবাদ পেয়েছে তার আর ভয় কি।

* সাত *

সেই শক্তিস্বরূপিণীকে পূজা করল রামকৃষ্ণ। ষোড়শী পূজা। ফলাহারিণী অমাবস্যায় কালিকা-পূজা। ভালো-মন্দ কিছুই বুঝতে পারে না সারদা। রামকৃষ্ণ বলে দিলে রাত নটার সময় এস। তোমার পূজা করব। সে আবার কি! তবু যখন বলেছেন ঠিক নটার সময় হাজির হল সারদা।

লুকিয়ে পূজো হচ্ছে। সারদা ঘরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে দিল রামকৃষ্ণ। বললে, 'বোসো।'

রামকৃষ্ণের চৌকির উত্তর পাশে গঙ্গাজলের জালার দিকে মুখ করে পশ্চিমমুখো হয়ে বসল সারদা। রামকৃষ্ণ বসল পূবমুখো হয়ে। প্রথমেই সারদার পা দুখানিতে আলতা পরিয়ে দিলে, কপালে-সিঁথিতে মাখিয়ে দিলে সিঁদুর। পরিয়ে দিলে নববস্ত্র। কত আয়োজন-সম্ভার। কত মন্ত্রোচ্চারণ, কত স্তোত্রপাঠ। কিছুই বুঝতে পারছে না সারদা। তন্গতের মত বসে আছে। তার পায়ে ফুল ফেলছে রামকৃষ্ণ, স্পর্শ করছে তার পা, তবু কিছু বলতে-কইতে পারছে না। দিব্যি পূজাটি গ্রহণ করছে নীরবে।

এই রামকৃষ্ণের শেষ পূজা, শ্রেষ্ঠ পূজা। এতদিন দীর্ঘ সাধনায় যত-কিছু বস্তুভার জমেছিল তার, যত-কিছু আসন-বসন, মালা-কবচ, সব সারদার পায়ে বিসর্জন দিলে। শুধু তাই নয়, সমস্ত সাধনার সার একটি প্রণিপাতে ঘনীভূত করে উৎসর্গ করলে। আর তা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করলে সারদা। সারদার হুঁশ নেই, রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ। রাত যখন প্রায় তিন প্রহর, সমাধি ভাঙল। সারদাকে বললে, এখন যাও ফিরে নবতে।

বাইরে বেরিয়ে এসে মনে হল সারদার, কি আশ্চর্য, প্রণাম তো ফিরিয়ে দিলাম না! হে অন্তর্যামী, নাও আমার আত্মনিবেদন। মনে-মনে প্রণাম করল সারদা।

সেই শক্তিস্বরূপিনী, যাকে ঠাকুর পূজো করেছিলেন, তিনি আছেন কোথায়? যিনি পূজিতা, বন্দিতা, আরাধিতা, কোথায় তাঁর অধিষ্ঠান?

'বাবা, জানো তো, জগতের প্রত্যেকের উপর ঠাকুরের মাতৃভাব।' একজন ভক্তকে বললেন শ্রীমা: 'সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্যে আমাকে এবার রেখে গেছেন।'

সেই জগতের যিনি মা, কোথায় তাঁর ঘর-দোর? এই একমুঠো ঘর, ছোট্ট একটুখানি দরজা। ঢুকতে গেলে মাথা ঠুকে যায়। ঘরের চারপাশে একফালি বারান্দা, তাও দরমার বেড়া দিয়ে ঘেরা। তারই নাম নহবত—দক্ষিণেশ্বরের নহবত! ওই একটুখানি ঘরে কত কাণ্ড। প্রকাণ্ড এক সংসারের আয়োজন। যত রাজ্যের জিনিস-পত্তর, হাঁড়িকুঁড়ি বাসন-কোসন। ভাঁড়ারের সাজ-সরঞ্জাম, তেল-নুন থেকে ফোড়ন-তেজপাতা। শুধু তাই নয়, খাবার-জলের জালা। শিকেতে ঠাকুরের যত পথ্যের যোগাড়। হাঁড়িতে মাছ জিয়ানো। সারা রাত কলকল করে সে-মাছ।

কলকাতা থেকে দেখতে আসে মেয়েরা। বলে, 'আহা, কি ঘরেই আমাদের সীতা লক্ষ্মী আছেন গো! যেন বনবাস গো।'

কলিযুগের সীতা। নির্বাসিতা। নির্বাসনায় অধিষ্ঠিতা।

'কী চাইবি ভগবানের কাছে ?' বললেন শ্রীমা।

'কেন পিসিমা,' নলিনী বললে, 'জ্ঞান ভক্তি সুখ-সম্পদ—যাতে মানুষ সংসারে শান্তিতে থাকে—এই সব !'

'না, চাইবার যদি কিছু থাকে, তবে তা নির্বাসনা।'

সারদার নির্বাসনটিই নির্বাসনা।

কিন্তু ঠাকুর রসিকতা করে বলেন, খাঁচা। লক্ষ্মী এসে থাকে সারদার সঙ্গে, তাই বলেন, খাঁচায় শুক-সারী থাকে। সারদা নথ পরে বলে নাকের কাছে আঙুল ঘুরিয়ে ইশারায় বোঝান রামলালকে। 'ওরে খাঁচায় শুক-সারীকে ফলমূল ছোলাটোলা কিছু দিয়ে আয়।'

লোকে ভাবে, সত্যি-সত্যি বুঝি পাখি আছে খাঁচায়। রামলাল বোঝে তার খুড়ি আব বোনের কথা বলছেন।

ষোড়শীপুজোয় যেসব শাঁখা-শাড়ি পেয়েছে তা নিয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না সারদা। তার তো গুরু-মা নেই যে তাকে দিয়ে দেবে ! তাই রামকৃষ্ণকে গিয়ে জিগ্গেস করল।

'তা তোমার গর্ভধারিণী মাকে দিতে পারো। কিন্তু দেখো,' গম্ভীর হল রামকৃষ্ণ, 'তাঁকে যেন মানুষ জ্ঞান করে দিও না। দিও সাক্ষাৎ জগদম্বা ভেবে।'

কথা শুনে তৃপ্তিতে ভরে গেল সারদা। যা দিয়ে সে পুজো পেয়েছে তাই দিয়ে সে আবার পুজো করবে।

নানান জায়গা থেকে মেয়েরা আসে সারদাকে দেখতে। ঠাকুর বলেন, রূপ ঢেকে এসেছে কিন্তু সে রূপেরও যেন অবধি নেই। পরনে চওড়া লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি। সি থেয় সিঁদুর। কালো ভরাট মাথার চুল পা পর্যন্ত ঠেকেছে। গলায় সোনার কণ্ঠহার। নাকে নথ, কানে মাকড়ি। মধুরভাব সাধনের সময় মথুরবাবু যে চুড়ি দিয়েছিলেন ঠাকুরকে সেই চুড়ি দুহাতে।

মেয়েরা দেখে আর আপসোস করে, এমন মেয়ের সংসার হল না গো !

ঠাকুর সব বুঝতে পারেন। বলেন এসে মাকে, 'ওরা সব হাঁসপুকুরের চারধারে ঘুরে বেড়ায়, কি সব নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করে। আমি সব শুনতে পাই। তুমি ওদের পরামর্শ শুনোনি বাপু। ওরা সব বলবে, আমার মন ফেরাতে ওষুধ-পালা করো। দেখো বাপু, ওদের কথায় আমায় যেন ওষুধ-পালা কোরোনি ! আমার সব আছে। তবে ভগবানের জন্যে সব শক্তি তাঁকে দিয়ে রেখেছি—'

'না, না, সে কি কথা !' সারদা বললে দৃঢ়স্বরে।

ঐটুকু ঘরের মধ্যে সারদা কি চুপচাপ বসে থাকে ? দিবারাত্র কাজ করে। গৃহস্থালীর ছোট-বড় সকল কাজ রামকৃষ্ণ তাকে শিখিয়ে দিয়েছে নিজের হাতে। সলতে পাকিয়ে কি করে রাখতে হয় প্রদীপে, তা পর্যন্ত। বসে থাকতে দেয়নি। 'কর্ম করতে হয়, মেয়েলোকের বসে থাকতে নেই, বসে থাকলেই যত বাজে চিন্তা—' সারদাকে উপদেশ দিয়েছে। একদিন তো কতগুলো পাট এনে রাখল সারদার কাছে, বললে, এইগুলি দিয়ে আমাকে শিকে পাকিয়ে দাও। ছেলেদের জন্যে আমি সন্দেশ

রাখব, লুচি রাখব। তথাস্তু। শিকে পাকিয়ে দিল। আরো কিছুদূর গেল সারদা। ফেঁসোগুলো দিয়ে বালিশ বানালো। পটপটে মাদুরের উপর ফেঁসোর বালিশে মাথা রেখে ঘুমুলো পরম শান্তিতে। ক্লান্তিই টেনে আনলো নিদ্রার করুণা।

একজন সধবা বৃদ্ধা এসে মা'র কাছে নালিশ করলেন, 'সংসার-সংসার করেই মরছি, এ কাজ হল না সে কাজ হল না—এই কেবল করছি দিবানিশি—'

'কাজ করা চাই বই কি।' তাপমোচন হাসি হেসে বললেন শ্রীমা, 'কর্ম করতে করতেই কর্মের বন্ধন কেটে যায়, নিষ্কাম ভাবের উদয় হয়। এক দণ্ডও কাজ ছাড়া থাকবে না।'

কাজই তো পূজা। আমরা কি আর কোনো আরাধনা-উপাসনা জানি? আমরা জানি যেখানে আমাদের শ্রম সেখানেই আমাদের আশ্রম। সংসার আমাদের মহান প্রতিষ্ঠান আর তার মহান অনুষ্ঠানটিই কর্ম। কম করতে করতে ক্লান্ত হব। ক্লান্তিটিই হচ্ছে নৈবেদ্য। ক্লান্ত হলেই মলয় সমীরের স্পর্শটি উপভোগ্য হবে। তেমনি ক্লান্ত হলেই আস্বাদ্য হবে কৃপার শীতলতা।

'কর্মই হচ্ছে লক্ষ্মী।' বলছেন শ্রীমা: 'আমার মা বলতেন যে খুব ভালো করে রেঁধে-বেড়ে লোকজনকে খাওয়ায় তার ঘরে মা অন্নপূর্ণার নিত্য বসতি।'

ঠাকুরও বলেন সেই কথা। 'মেয়েছেলে কী নিয়ে থাকবে? রান্নাবাড়া নিয়ে থাকবে। সীতা রাঁধতেন। পার্বতী রাঁধতেন। দ্রৌপদী রাঁধতেন। স্বয়ং লক্ষ্মী রেঁধে খাওয়াতেন সবাইকে।'

সারদাও রাঁধে ঠাকুরের জন্যে। সমস্ত মশলার উপর আরেকটি অতিরিক্ত মশলা মেশায়। সে মশলা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। সেটি তার অন্তরের সুধা, হৃদয়ের ভক্তি।

তবু ঠাকুর তাকে পরিহাস করে বলেন, 'ছিনাথ হাতুড়ে।'

কামারপুকুরে একদিন খেতে বসেছেন হৃদয়ের সঙ্গে। সারদার সঙ্গে-সঙ্গে তার বড় জা, লক্ষ্মীর মা-ও রেঁধেছে সেদিন। খেতে-খেতে ঠাকুর বলছেন, 'ও হৃদু, এটা যে রেঁধেছে সে রামদাস বদ্যি। আর এটা যে রেঁধেছে সে ছিনাথ হাতুড়ে।' লক্ষ্মীর মা'র রান্নায় তার বেশি তাই সে রামদাস। আর সারদার রান্নায় তার কম, সে ছিনাথ।

'তা বটে।' হৃদয় গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়লে। বললে, 'কিন্তু তোমার ছিনাথ হাতুড়েকে তুমি সব সময়ে পাবে—গা টিপতে, পা টিপতে—ডাকলেই হল। একেবারে হাতের মুঠোয়। আর রামদাস বদ্যি, তার ষোলো টাকা ভিজিট, তাকে পাবে না সব সময়। তা ছাড়া লোকে আগে হাতুড়েকে ডাকে। সে তোমার সব সময়ের বান্ধব।'

'তা বটে, তা বটে।' সানন্দে সায় দিলেন ঠাকুর। 'এ আমার সব সময়ে আছে।'

তাই, ঠাকুর জানেন, সারদার রান্নায় তার না থাক, সার আছে।

'আচ্ছা, আবার বিয়ে কেন হল বল দেখি?' খেতে বসেছেন ঠাকুর, খেতে-খেতে বলছেন বলরামকে, 'স্ত্রী আবার কেন হল? পরনের কাপড়ের ঠিক নেই, তার আবার স্ত্রী কেন?'

ঠাকুরই উত্তর দিলেন।

পরিহাসপ্রসন্ন স্বরে বললেন, 'ও, বুঝেছি। এই, এর জন্যে হয়েছে।' বলে থালা থেকে তরকারি তুলে দেখালেন বলরামকে, 'নইলে কে আর এমন করে রেঁধে দিত বলো? হ্যাঁ গো, তাই, নইলে কে আর এমন করে দেখত খাওয়াটা। সব রকম খাওয়া তো আর পেটে সয় না আর সব সময় খাওয়ার হুঁশও থাকে না।' সারদার প্রতি ইঙ্গিত করলেন: 'ও বোঝে কি রকম খাওয়া সয়! এটা-ওটা করে দেয়, তাই ও যদি চলে যায় মনে হয় কে করে দেবে!'

একটি অন্তরঙ্গ আলেখ্য। মাধুর্যরসের রঙ দিয়ে আঁকা। কিন্তু ঐ কি সারদার তাৎপর্য? তাকিয়ে দেখ একবার মন্দিরের দিকে। তারপর এই নহবতের দিকে। মন্দিরে পাষাণময়ী ভবতারিণী, নহবতে প্রাণময়ী সারদা। ঠাকুরের একাক্ষর মন্ত্র যে 'মা', তারই ঘনীভূত বিগ্রহ। ঠাকুর শুধু মন্ত্রই উচ্চারণ করেননি, বিগ্রহও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। সমস্ত জীবের যিনি ক্ষুধাহরণ করবেন তারই রেখে গেছেন উদাহরণ।

এমন পরিপূর্ণ সাধনা আর কে করেছে এই পৃথিবীতে? বুদ্ধদেব স্ত্রী ত্যাগ করেছেন। স্ত্রী ত্যাগ করেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ। আর অন্যান্যরা স্ত্রী গ্রহণই করেননি, যেমন শঙ্করাচার্য। স্ত্রীকে নিয়ে এমন দিব্য সাধনা আর কার? সমস্ত সাধনাকে কে স্ত্রীতে সারভূতা করেছে? মন্ত্রকে কে দিয়েছে মূর্তি? প্রার্থনাকে নিয়ে এসেছে শরীরীপ্রতিমায়?

উত্তর, শ্রীরামকৃষ্ণ। এই সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ একক। অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

এককথায়, রামকৃষ্ণ 'গীতা'। সারদা 'চণ্ডী'।

সেই রাজ্যেশ্বরা সাধ করে কাঙালিনী সেজেছেন। কাঙালিনী সেজে ঘর নিকোচ্ছেন, বাসন মাজছেন, চাল ঝাড়ছেন, রাঁধছেন-বাড়ছেন, এমনকি ভক্ত ছেলেদের এঁটো পরিষ্কার করছেন! কাঙালিনী না সাজলে কাঙালেরও মা হবেন কি করে?

জয়রামবাটিতে আছেন তখন মা। তেল মেখে পুকুরে স্নান করতে যাবেন। কিন্তু পুকুরে না গিয়ে কোন দিকে যে গেলেন কেউ দেখেনি। খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল, মা গোয়ালের পিছনে বসে গোবর চটকে ঘুঁটে দিচ্ছেন। যিনি ঘুঁটে-কুড়ুনি তিনিই সর্বসাম্রাজ্যদায়িনী ভুবনেশ্বরী। সর্বাণী সিংহসংবাহা।

আরো নানা বিষয়ে সারদাকে উপদেশ দেন ঠাকুর। কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে, কি ভাবে দেবতা-গুরু-অতিথির সেবা, কি ভাবে বা টাকার সদ্ব্যয়! তারপর সেবার যখন রামলালের বিয়েতে দেশে যাচ্ছেন মা, ঠাকুরকে প্রণাম করতে এলেন উত্তরের বারান্দায়। প্রণাম সারা হবার পর ঠাকুর বলছেন গাঢ়স্বরে, 'সাবধানে যাবে। নৌকোয়-রেলে কিছু ফেলে-টেলে যেও না—'

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঠাকুর দেখলেন তাঁর যাওয়া। ভাবলেন মনে-মনে, ও কে না কে গেল যেন। পরে ফের ভাবনা ধরল, ও না হলে কে রান্না করে দেবে! তবেই বোঝো, যিনি গেলেন তিনি অন্নপানদায়িনী জীবধাত্রী। মায়ায় বাঁধা পড়ে আছেন এই সংসারে।

'তোমাকে এই যে দেখছি সাধারণ স্ত্রীলোকের মত বসে-বসে রুটি বেলছ,' একদিন এক ভক্ত জিগ্গেস করল মাকে, 'এর মানে কি? মায়া?'

মা হাসলেন মৃদু-মৃদু। বললেন, 'মায়া বই কি। মায়া না হলে আমার এ দশা কেন? আমি বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পাশে লক্ষ্মী হয়ে থাকতুম।'

অম্বিকা বাগদি জয়রামবাটির চৌকিদার। মা তাকে অম্বিকে-দাদা বলে ডাকেন। একদিন চুপি-চুপি এসে সে মাকে বললে, 'লোকে আপনাকে দেবী, ভগবতী, কত কি বলে, কই, আমি তো কিছু বুঝতে পারি না।'

মা হাসলেন কথা শুনে। বললেন, 'তোমার বুঝে দরকার নেই। তুমি আমার অম্বিকে-দাদা, আমি তোমার সারদা-বোন।'

এই প্রশ্ন নিয়ে চন্দ্র দত্তও এসেছিল মা'র কাছে। চন্দ্র দত্ত উদ্বোধন-আপিসের কর্মচারী। দেশ-দেশান্তর থেকে এত লোক আসছে-যাচ্ছে, দেবীজ্ঞানে এত সাধন-আরাধনা, কিন্তু মা'র ঐ তো শাদামাঠা চেহারা। দশ হাতও নেই, সিংহও নেই, নেই বা রক্তচর্চিত খড়্গ। একদিন তাই সে বললে চুপি-চুপি, 'মা, কত দূর দেশ থেকে কত লোক দর্শন করতে আসে আপনাকে। আপনি তো ঘরের ঠাকুমার মত পান সাজেন শুপুরি কাটেন, ঘর ঝাঁট দেন। আপনাকে দেখে, কই, আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না।'

স্মিতহাস্যে মা বললেন, 'চন্দ্র, তুমি বেশ আছ। আমাকে তোমার বুঝে কাজ নেই।'

'আপনি যে ভগবতী তা আমরা বুঝতে পারি না কেন?' এক স্ত্রী-ভক্ত সরাসরি জিগগেস করল মাকে।

মা বোধহয় এবার একটু গম্ভীর হলেন। বললেন, 'সকলেই কি আর ঠিকঠিক চিনতে পারে মা? ঘাটে একখানা হীরে পড়ে ছিল। সব্বাই পাথর মনে করে তাতে পা ঘষে স্নান করে উঠে যেত। একদিন এক জহুরী সেই ঘাটে এসে দেখে চিনলে যে সেখানা এক প্রকাণ্ড হীরে। মহামূল্য।'

রঙিন চুষিকাঠি ফেলে আমরা যখন ট্যাঁ-ট্যাঁ করে চেঁচাব, আর তুমি ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে রেখে দুদ্দাড় শব্দে ছুটে আসবে, ছুটে এসে আমাদের কোলে টেনে নেবে, তখন আমরাও বুঝব তুমি আমাদের মা। সকলের মা হয়ে আমার একলার মা!

* আট *

ষোড়শী পূজার পর সারদা দেশে ফিরল। দেশে ফিরেই দুর্ঘটনা। বাবা মারা গেলেন। বুকে বড় বাজল। কিন্তু কি করা! ভগবান যত দুঃখ-কষ্ট দিচ্ছেন তা তো বুক পেতে নিতে হবে। তিনি যা করবেন তাই তো হবে সংসারে।

দক্ষিণেশ্বরে আবার ফিরে এল। যদি দক্ষিণ-ঈশ্বরের সান্নিধ্যে শোকের জ্বালা স্নিগ্ধ হয়। আছেন সেই নহবতে। সরলা বালিকার মূর্তিতে। চন্দ্রমণির পক্ষচ্ছায়ে।

প্রথম যেবার কলকাতায় এল, কল-ঘরে গিয়েছে, দেখে, কলের মধ্যে সোঁ-সোঁ করে গজরাচ্ছে সাপের মত। দেখেই তো ভয় পেয়ে দে-ছুট। মেয়েদের কাছে গিয়ে

বলছে ত্রস্ত হয়ে, 'ওগো, কলের মধ্যে একটা সাপ ঢুকেছে দেখবে এস। সোঁ-সোঁ করছে।' শুনে মেয়েরা তো হেসে কুটপাট। 'ওগো, ও সাপ নয়, ভয় পেও না। জল আসবার আগে অমনি শব্দ হয় কলের মধ্যে।' তখন সারদাও হেসে আটখানা।

এই কাহিনীটিই পরে বলছেন স্ত্রী-ভক্তদের। বলছেন আর হাসছেন। সে সরল হাসির নির্মলতা দেখে কে !

নহবত তো নয়, দরমা-ঢাকা অন্ধকূপ। তার মধ্যে আছে বন্দিনী হয়ে। বন্দিনী তবুও আনন্দিনী।

মন্দিরেব খাজাঞ্চী বলে, 'তিনি আছেন শুনেছি কিন্তু কখনো দেখতে পাইনি।'

কি করে দেখবে ! শুধু আছেন এই জানলে কি দেখা হয় ?

যদি দেখতে চাও, কাঁদো। মা বলে আর্তনাদ করো। 'মা'-নামের যে আ-কার, তা আর্তির আকার, আকুলতার আকার, আন্তরিকতার আকার। সেই আ-কার দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত করে দাও।

বরিশালে একটি ভক্ত-ছেলের অসুখ করেছে। মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। মরবার আগে মাকে একবার দেখতে বড় সাধ। কিন্তু নিজের তো যাবার সাধ্য নেই। মা যদি আসেন ! মা'র আবার অসাধ্য কি !

একখানা চিঠি লিখল মাকে। মা, আমার নিদারুণ অসুখ, বাঁচবার বিন্দুমাত্র আশা নেই। সাধ, মরবার আগে তোমাকে একবার দেখি। আমি এখন নিঃস্ব, রুগ্ন, অসমর্থ—তোমার কাছে যাই এমন ক্ষমতা নেই। কিন্তু তুমি ইচ্ছে করলে, বরিশালে এসে আমাকে দেখে যেতে পারো। দয়া করে একবার আমাকে দেখে যাও।

মা তাঁর একখানি ফটো পাঠিয়ে দিলেন। লিখলেন, 'বাবাজীবন, ভয় নেই, তোমার অসুখ সেরে যাবে। আমার যে ফটোটি পাঠালাম, তাই দেখো—'

ছায়া-কায়া ঘট-পট সমান। মাকেই দেখল সেই ছবিতে। দেখল মা'র সেই রোগহরণ ক্ষমামধুর চক্ষু দুটি। অসুখ মুছে গেল দেহ থেকে।

ব্রজেশ্বরীর হিস্টিরিয়া। হাতে একগাছি রূপোর তাগা। রোগের প্রতিকারের আশায় কে পরিয়ে দিয়েছে। প্রতিকার দূরস্থান, কেউ বরং তাগা দেখে আধি-ব্যাধির কথা জিগ্‌গেস করে বসে। আর জিগ্‌গেস করে বসলেই রোগের কথা মনে পড়ে যায় ব্রজেশ্বরীর। আর যেই মনে পড়া অমনি মূর্চ্ছা।

সেদিন ঠিক তাই হল ! মা'র ভাজ, সুরবালা, জিগ্‌গেস করল ব্রজেশ্বরীকে, 'ও তাগা কেন পরেছ ?' মা'র কানে গেল সেই প্রশ্ন। ফলাফল বুঝতে পেরেছিলেন, তাই বিরক্তির সুরে শাসন করলেন ভাজকে, 'কেন সব কথা জিগ্‌গেস করবার কী দরকার ?' বলেই তাকালেন ব্রজেশ্বরীর দিকে। বললেন অমিয়ভাষে, 'কোনো ভয় নেই মা, তাগা তুমি খুলে ফেল হাত থেকে। তোমার ও-রোগ অমনিতেই সেরে যাবে।'

নিশ্চিন্ত হয়ে তাগা খুলে ফেলল ব্রজেশ্বরী। সেরে গেল হিস্টিরিয়া।

চাষারা এসে কেঁদে পড়েছে মা'র কাছে। মাগো, দেবতা মুখ তুলে চাইল না, আকাশ খাঁ-খাঁ করছে, এক ফোঁটা মেঘের দেখা নেই। ছেলেপুলে নিয়ে মরতে হবে না খেয়ে।

মা একবার তাকালেন আকাশের দিকে। তারপরে ক্ষেতের দিকে। যেন সর্বশূন্য শ্মশানের চেহারা। চোখের জল উথলে উঠল। বললেন, 'ঠাকুর, এ কি করলে? শেষটায় এরা না খেয়ে মরবে?'

মা'র সেই কান্না বর্ষার জল হয়ে নেমে এল সেই রাত্রে। আকাশ-ভাঙা বর্ষা। চাষাদের ঘরে-ঘরে আনন্দের কোলাহল পড়ে গেল। শুকনো মাঠ ভরে গেল সোনার ধানে।

রাত্রে ঘুম নেই ঠাকুরের। অন্ধকার থাকতে-থাকতেই বেরিয়ে পড়েন ঘর ছেড়ে। এক-একদিন নহবতের কাছে এসে লক্ষ্মীকে ডাকেন: 'ও লক্ষ্মী, ওঠ রে ওঠ। তোর খুড়ীকে তুলে দে। আর কত ঘুমুবি? রাত পোয়াতে চলল। মা'র নাম কর।'

হয়তো শীতের রাত, ঘুম পাতলা হয়ে এলেও লেপ ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে হয় না। লেপের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে সারদা আস্তে আস্তে বলে লক্ষ্মীকে, 'তুই চুপ কর্। ওঁর কি! ওঁর চোখে ঘুম নেই। এখনো ওঠবার সময় হয়নি। কাক-কোকিল রা কাড়েনি। সাড়া দিসনি।'

সাড়া না পেয়ে ঠাকুর ঠাণ্ডা জল নিয়ে আসেন। দরজার গোড়া দিয়ে বিছানা-লেপের উপর জল ছিটিয়ে দেন। তখন না উঠে উপায় কি।

এমনিতে চারটের সময় নাইতে যায় সারদা। নেয়ে এসে জপে বসে। বিকেলের দিকে একটু রোদ আসে, পড়ন্ত বেলার নিভন্ত রোদ, তাইতে চুল শুকোবার চেষ্টা করে। ওই টুকুন রোদে চুল কি শুকোয়? এক কাঁড়ি চুল। যোগেন-মা সন্ধের দিকে যখন আসে চুল বাঁধতে, তখন দেখে চুল ভিজে। প্রায়ই চুল বাঁধা হয় না। কেনই বা বাঁধবে? মা যে আলুলায়িতকুন্তলা।

'ওরে হৃদু,' হৃদয়কে ডাক দিয়ে বলেন ঠাকুর, 'আমার বড় ভাবনা ছিল, পাড়াগেঁয়ে মেয়ে—কে জানে এখানে কোথায় শৌচে যাবে। হয়ত লোকে নিন্দে করবে, আর তখন লজ্জা পাবে। তা, ও কিন্তু এমন, কখন যে কি করে কেউ টেরও পায় না। আমিও দেখলুম না কখনো বাইরে যেতে।'

কথা কটা কানে ঢুকল সারদার। ভয় ঢুকল মনের মধ্যে। ঠাকুর যখন যা চান তখন তাই তাঁকে দেখিয়ে দেন ভবতারিণী। এইবার বাইরে গেলে নির্ঘাত তাঁর চোখে পড়তে হবে! এখন উপায়! ব্যাকুল হয়ে জগদম্বাকে ডাকতে লাগল সারদা। আমাকে বাঁচাও, আমার লজ্জা রক্ষা করো।

তথাস্তু। জিতে গেল সারদা। জগজ্জননী দুই পাখা মেলে সারদাকে ঢেকে রাখলেন। তেরো বছর ছিল নহবতখানায়, কারুর চোখেই পড়ল না কোনোদিন।

'বুনো পাখি, খাঁচায় রাতদিন থাকলে বেতে যায়।' সারদাকে বলেন এসে ঠাকুর: 'মাঝে-মাঝে পাড়ায় বেড়াতে যাবে।'

মাঝে-মাঝে দুপুরবেলা যায় একটু এদিক-ওদিক। ঠাকুরই তাকে দাঁড়িয়ে দেন পথের উপর। বলেন, এখন এদিকে কেউ নেই গো, বেরোও টুক করে। খিড়কির দোর দিয়ে বেরিয়ে পড়ে সারদা। পাড়ার মধ্যে এ-বাড়ি ও-বাড়ি একটু ঘুরে এসে আবার সন্ধের আগেই খাঁচায় ঢোকে।

মন্দিরের কাছে জমি নিইয়ে দিলেন শম্ভু মল্লিক। কাপ্তেন শালকাঠ পাঠিয়ে দিল।

তাই দিয়ে তৈরি হল চালাঘর। নহবতে জায়গার সঙ্কুলান হয় না বলে চালাঘরে উঠে এল সারদা। একটি ঝি রইল তার তত্ত্ব করতে।

সেই ঘরেই ঠাকুরের জন্যে রান্না করে সারদা। বড় থালায় বড়-বড় বাটি সাজিয়ে খাবার নিয়ে যায় ঠাকুরের ঘরে। যাই খান না খান, সজনে খাড়া বা পলতার শাক, বাটির ঐশ্বর্য আছে ঠাকুরের। ছোট বাটি দিলে বলেন, আমি কি পাখি যে ঠুকরে-ঠুকরে খাব? অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে অনটন নেই কিছুর। পাত্র যদি রিক্তও হয় ভরা থাকবে তা অন্তরের অমৃতে।

দূর থেকেই ঠাকুর সব দেখা-শোনা করেন। নিঃসঙ্গে রেখেও পাঠান একটি অন্তরঙ্গতার সুর। একদিন বিকেলবেলা হঠাৎ হাজির হলেন সেই চালাঘরে। আর তখুনি এমন বৃষ্টি নামল যে ধরল না সারারাত।

'তবে এইখানেই চাট্টি রেঁধে খাওয়াও।'

অন্নপূর্ণার মন্দিরে এসে কে কবে অভুক্ত থাকে। সারদা রাঁধল ঝোল-ভাত। কাছে বসে খাওয়াল ঠাকুরকে।

বৃষ্টির আর বিরাম নেই। তবে, উপায় নেই, এ ঘরেই আজ রাত্রিবাস।

কি রকম একটা ঘনিষ্ঠতার আবেশ আনলেন ঠাকুর। বললেন, 'সেই যে কালী-ঘরের বামুনরা রাত্রে বাড়ি যায় এ যেন তেমনি হল। তাই না?'

তার চেয়ে বেশি। ওরা যেখানে যায় সেটা শুধু-ঘর, আর যেখানে সারদা থাকে, যেখানে ঠাকুর আসেন, সেটা কালী-ঘর।

উনিশ শো আঠারো সালের দুর্গাপূজার সময় মাস্টারমশাই বললেন এক ভক্তকে, 'মাকে দর্শন করেছ? মহামায়া দেহ ধারণ করে কত ভক্তকে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করেছেন। যাও, কাল মহাষ্টমী, কালই কিছু পদ্মফুল নিয়ে তাঁর পাদপদ্ম পূজো করে এস।'

পদ্মফুল নিয়ে ভক্ত গেল মা'র মন্দিরে, বাগবাজার-মঠে। যেতে-যেতে দুপুর হয়ে গেল। গিয়ে শুনল সেদিনের মত পুরুষ-ভক্তদের দর্শন হয়ে গিয়েছে। মায়ের পা জ্বলছে, বরফ দেওয়া হচ্ছে। বিকেল থেকে স্ত্রীভক্তদের দর্শন চলবে শুধু। হতাশায় বসে পড়ল ভক্ত। হাতে-ধরা পদ্মগুলি শুকিয়ে আসতে লাগল। তবু ওঠে না, জায়গা ছাড়ে না। অন্তরের পদ্মদল তো ম্লান হবার নয়।

এমন সময় শোনা গেল দুটি স্ত্রী-ভক্ত পথ হারিয়েছে। ঠিক পথ হারায়নি, ঠিকানা ভুলে গিয়েছে। মেডিকেল কলেজের পিছনের গলিতে বাড়ি কিন্তু নম্বর মনে নেই। এখন কে তাদের পৌঁছে দেয়? এমন কি কেউ আছেন এখানে যিনি ও-পথ দিয়ে ফিরবেন?

পদ্মহাতে সেই ভক্তটি উঠে দাঁড়াল। মা'র দর্শন যখন পাব না, তখন যাঁরা মা'র দর্শন পেয়ে কৃতার্থ হয়েছেন তাঁদের কাউকে যদি একটু সেবা-সাহায্য করতে পাই তবে তাই আমার দর্শন। কলেজ স্ট্রিট হয়ে শেয়ালদা স্টেশনে যাব আমি, আমিই পারব পৌঁছে দিতে।

উপর থেকে খবর এল মা ডেকেছেন। সিঁড়ি বেয়ে টলতে-টলতে উঠতে লাগল ভক্ত। মা এসে দাঁড়ালেন তার তৃষ্ণার্ত চোখের সমুখে, তাকালেন তার মুখের দিকে।

কিন্তু এমন অভিভূত হয়ে গিয়েছে ভক্ত, মা'র মুখের দিকে না তাকিয়ে পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। পদ্মফুল রাখল তাঁর পায়ে। শিশির আর তখন কোথায়, বিকচ হয়ে উঠেছে নয়নের শিশিরে।

'হ্যাঁ, এর দ্বারাই হবে।' মা মনোনীত করলেন। বললেন, 'একে প্রসাদ দাও।' নেবে না কিছুতে ভক্ত, তবু মা তাকে একখানি কাপড় ও একটি টাকা দিলেন। পথহারা স্ত্রী-ভক্ত দুটিকে দিলেন তার হেপাজতে।

অন্ধকারে অনেক ঘোরাঘুরি করে স্ত্রী-ভক্ত দুটিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ভক্ত চলে এল মাস্টারমশায়ের কাছে। সব বললে আগাগোড়া। কিন্তু সর্বশেষে দুঃখের নিশ্বাস ফেললে। বললে, 'কিন্তু মা'র সংগে তো কোনো কথা হল না।'

'কথা হয়নি কি বলছ! মা লক্ষ্মী মুখ তুলে চেয়েছেন, আর তোমার কি চাই!' বলে নতুন কাপড়খানি পাগড়ির মত করে ভক্তের মাথায় জড়িয়ে দিলেন মাস্টারমশাই। 'সাক্ষাৎ জগজ্জননীকে দর্শন করেছ সশরীরে, তোমার মানবজন্ম সফল হল!'

মা'র মুখখানি দেখিনি, তাঁর পা দুখানি দেখেছি। মা'র মুখে যা অভয় তাই তাঁর চরণে আশ্রয়। মুখে আশ্বাস, চরণেই শাশ্বতী স্থিতি।

সারদার মুখখানি ঘোমটা দিয়ে ঢাকা। চিররহস্যের অবগুণ্ঠন দিয়ে। ঠাকুরের সামনে বসে যখন খাওয়ায় তখনও ঘোমটাটি ছোট হয় না।

কে সইবে সেই অনাবৃত মুখের রূপচ্ছটা! তাই মহামায়া এই যবনিকাটি রচনা করেছেন। শুধু বিস্তৃত করেছেন একটি আভাসের আকাশ। আভাসের অন্তরালে রয়েছেন বিভাত হয়ে।

ঠাকুরের তখন কঠিন আমাশা, সারদা আছে চালাঘরে। ডাক পড়েনি তাই সারদা যাচ্ছে না ঠাকুরের সেবায়। শুধু প্রতীক্ষা করছে। কখন ডাকটি আসে! শুধু ডাকই প্রার্থনা নয়, প্রতীক্ষাও প্রার্থনা। এমন সময় কাশী থেকে কে একটি মেয়ে এসে হাজির। কেউ জানে না তার নাম-ঠিকানা, লেগে গেল ঠাকুরের শুশ্রূষায়। বোধহয় ঠাকুরের কাজেই এসেছে, চলে যাবে কাজ ফুরুলে। কোন দিকে যাবে কেউ টের পাবে না ঘুণাক্ষরে।

কাশীর মেয়ে এসে অবাক মানল। স্বামীর অসুখ, অথচ স্ত্রী রয়েছে দূরে সরে। ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে। একদিন সন্ধেবেলা কাশীর মেয়ে সারদাকে টেনে আনল হিড়হিড় করে। টেনে আনল ঠাকুরের ঘরে। এনেই একটানে খুলে ফেলল মুখের ঘোমটা।

অঘটন ঘটে গেল। ঠাকুর উঠে বসে স্তব করতে শুরু করলেন।

তুমিই চিতিশক্তিরূপিণী। তুমি পরমা আদ্যা প্রকৃতি। বিশুদ্ধা বোধস্বরূপা। যাকে সাংখ্য বলে পুরুষ, বেদান্ত বলে ব্রহ্ম, উপনিষদ বলে আত্মা, তুমি তাই। তুমি অঘটনঘটনপটীয়সী মহাশক্তি।

* নয় *

চালাঘরে থেকে সারদার অসুখ করে গেল। শম্ভু মল্লিক ডাক্তার-বদ্যির ব্যবস্থা করলেন বটে কিন্তু পুরোপুরি সারল না। ঠাকুর বললেন, বাপের বাড়ি ঘুরে এস। যদি স্থানপরিবর্তনে সুফল হয়।

জয়রামবাটিতে এসে বেড়ে গেল অসুখ। সেখানে আর ডাক্তার-বদ্যি কোথায়, কে বা ব্যবস্থা করে! কলুপুকুরের ধারে শৌচে যায়, বারে-বারে হেঁটে যেতে কষ্ট, পুকুর-পাড়েই শুয়ে পড়ে থাকে। একদিন পুকুর-জলে ছায়া দেখে বিতৃষ্ণা এল সারদার—এ হাড়সার দেহ রেখে লাভ কি! এইখানেই দেহটি থাক, এইখানেই দেহ ছাড়ি। তক্ষুনি কে একটি মেয়ে, গাঁয়ের মেয়েই হবে হয়তো, এদিকপানে চলে এসেছে। দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল। ওমা, তুমি এখানে পড়ে কেন? চলো, চলো, ঘরে চলো। বলে তুলে টেনে নিয়ে গেল ঘরে।

তখন আর কি করা, শেষ উপায়, সারদা সিংহবাহিনীর মণ্ডপে গিয়ে হত্যে দিলে। গ্রাম্য দেবী এই সিংহবাহিনী। কোনো নাম-ডাক নেই, কেউ মাড়ায় না তার এলাকা। তারই শরণাপন্ন হল সারদা। হয় দেহ নাও নয় আরোগ্য দাও।

'তুমি কেন পড়ে আছ গো?' সিংহবাহিনী নিজে এসে তুলে দিলেন মাকে। ওলতলার মাটি দিলেন খেতে। অসুখ সেরে গেল।

সারদার অসুখ সারিয়ে দিয়ে নিজেরও অখ্যাতি সারিয়ে নিলেন। দিকে-দিকে রব উঠে গেল, গ্রাম্য দেবী সিংহবাহিনীকে জাগিয়ে দিয়েছে সারদা।

'বড় জাগ্রত দেবতা, সেখানকার মাটি কৌটোয় করে রেখেছি।' বললেন শ্রীমা: 'নিজে খাই, রাধুকেও রোজ খেতে দিই একটু-একটু করে।'

'বোস মা বোস।' একজন স্ত্রী-ভক্তকে বললেন সেদিন শ্রীমা: 'এটি আমার ভাইঝি। নাম রাধারানী। ওর মা পাগল হতে আমিই ওকে মানুষ করি।'

কিশোরী একটি মেয়ে। মায়ের হাত থেকে পালাবার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। কত রকম বুঝিয়ে তার চুল বেঁধে দিলেন, কাপড় পরিয়ে দিলেন, খাইয়ে দিলেন নিজের হাতে। মহামায়ার এ আবার কোন মায়া!

'এই যে রাধি-রাধি করি, এ তো একটা মোহ নিয়ে আছি!'

দুই পাঁজরার নিচে খুব ব্যথা হয়েছে রাধুর। কাছে বসে মা সেঁক দিচ্ছেন। একটি স্ত্রী-ভক্ত মাকে প্রণাম করে বসল পাশটিতে।

'রাধুর কি হয়েছে মা?'

'রাধুর সেই ব্যথা ধরেছে। দেখ না ছেলে আমার সারা হয়ে গেল।' মায়া ফেটে পড়ল মা'র কণ্ঠস্বরে: 'পোড়া ব্যথা কোথা থেকে এল বলো দেখি। এত দেখানো হচ্ছে, কত ঠাকুরের মানসিক করেছি, কেউ শোনে না গো?'

ঠাকুরের অসুখে হত্যে দিয়েছিলেন তারকেশ্বরে। একদিন যায় দুদিন যায় পড়েই আছেন। রাতে হঠাৎ একটা শব্দ পেয়ে চমকে উঠলেন। যেন অনেকগুলো সাজানো হাঁড়ির মধ্যে একটা হাঁড়ি কেউ ঘা মেরে ভেঙে দিলে। আশ্চর্য, সেই শব্দে

সব মায়া কাটিয়ে অদ্ভুত একটা বৈরাগ্য এল মনের মধ্যে। ভাবলেন এ সংসারে কে কার? কে কার স্বামী এ সংসারে? কার জন্যে আমি এখানে প্রাণ বলি দিতে বসেছি? উঠে পড়লেন চট করে। কে যেন তুলে দিলে! অন্ধকারে হাতড়াতে-হাতড়াতে চলে এলেন মন্দিরের পিছনে। কুণ্ড থেকে স্নানজল নিয়ে দিলেন চোখে-মুখে। পিপাসায় গলা কাঠ হয়ে গিয়েছে, খেলেন খানিকটা। তবে একটু সুস্থ হলেন। পরদিনই ফিরে এলেন কাশীপুর।

'কি গো, কিছু হল?' জিগ্গেস করলেন ঠাকুর, 'কিছু না তো? আমি জানি কিছু হবার নয়। আমিও স্বপ্ন দেখলুম। হাতি ওষুধ আনতে গেছে! মাটি খুঁড়ছে ওষুধের জন্যে। এমন সময় গোপাল এসে স্বপ্ন ভেঙে দিলে।'

কাল পূর্ণ হয়েছে। খেলা শেষ করেছি। বাকি খেলা এবার তুমি খেলবে।

তারপরে মা গেলেন ভবতারিণীর মন্দিরে। দেখলেন মা-কালী ঘাড় কাৎ করে রয়েছেন। 'মা, তুমি এমন করে কেন আছ?'

কালী বললেন, 'ওর ঐ ঘায়ের জন্যে। আমারও গলায় ঘা হয়েছে।'

এক অসুখ ছাড়ে তো আরেক অসুখ ধরে। এবার ধরল ম্যালেরিয়া। সবাই বলে, পিলের দাগ নাও। পিলের দাগ ছাড়া সারবে না এই কম্পজ্বর।

সে এক অমানুষিক ব্যাপার। রুগীকে স্নান করিয়ে শুইয়ে দেওয়া হয় মাটিতে। তিন-চারজন লোক তার হাত-পা চেপে ধরে জোর করে, যাতে সে যন্ত্রণায় না পালায়। তারপর হাতুড়ে জ্বলন্ত কুলকাঠ দিয়ে পেটের খানিকটা জায়গায় ঘষতে থাকে। পোড়ার যন্ত্রণায় রুগী তীব্রস্বরে আর্তনাদ করে। যত চেঁচায় তত তাকে চেপে রাখে প্রাণপণে।

সারদা স্নান করে এল। তার মা বললেন হাতুড়েকে, 'বাবা, বেলা হয়েছে। নতুন আগুন করে আমার মেয়েটির পিলে দেগে দাও।'

তিন-চারজন দুর্ধর্ষ লোক তাকে ধরতে এল। সারদা বললে, 'না, কাউকে ধরতে হবে না। আমি নিজেই পারব চুপ করে শুয়ে থাকতে।'

কুলকাঠের আগুন দিয়ে পিলে দেগে দিল সারদার। অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করল স্থির থেকে। অস্ফুট একটি কাতরোক্তিও বেরুল না মুখ দিয়ে।

স্থির থাকো। যন্ত্রণায় স্থির থাকো, স্থির থেকো সমর্পণে, শরণাগতিতে। যেখানে আছ সেখানেই তোমার স্থির।

মাকু আক্ষেপ করছে: 'কি, এক জায়গায় থির হয়ে বসতে পারলুম না!'

'থির কি গো?' মা বললেন, 'যেখানে থাকবি সেখানেই থির! স্বামীর কাছে গিয়ে থির হবি ভাবছিস? সে কি করে হবে? তার অল্প মাইনে, চলবে কি করে? তুই তো বাপের বাড়িতেই রয়েছিস। বাপের বাড়ি লোকে থাকে না?'

যেখানেই শান্তি সেখানেই তিষ্ঠ। মনে নেই ঠাকুরের কথা?

'মা, তীর্থে-তীর্থে ভ্রমণ করা কি ভালো?'

মা বললেন, 'মন যদি একস্থানে শান্তিতে থাকে তবে তীর্থ-ভ্রমণের কি দরকার?'

আসল তীর্থ হচ্ছে চিত্ত। চিত্তে যদি তীর্থ না থাকে তবে কোথায় তোমার তৃপ্তি?

ম্যালেরিয়ার জন্যে ঠাকুরও পিলে দাগিয়েছিলেন। তাই তো বললেন, 'যা ভোগ আমার উপর দিয়েই হয়ে গেল। তোমাদের আর কারুকে কষ্ট ভোগ করতে হবে না। জগতের সকলের জন্যে আমি ভোগ করে গেলুম।'

গ্রামের কালীপুজোর কর্তারা আড়াআড়ি করে শ্যামাসুন্দরীর চাল নিলে না। তাই দেখে শ্যামাসুন্দরী কাঁদছেন। কালীর জন্যে চাল করলুম, এ চাল আমার কে খাবে?

রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন কে এক লালমুখী দেবী দোরগোড়ায় পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আছেন। কতক্ষণ পরে গা চাপড়ে ওঠালেন শ্যামাসুন্দরীকে। বললেন, 'কাঁদিসনে, কালীর চাল আমি খাব।'

ঘুম থেকে উঠে শ্যামাসুন্দরী সারদাকে জিগগেস করলেন, 'লাল রঙ, পায়ের উপর পা দিয়ে বসা—এ কোন ঠাকুর রে সারদা?'

সারদা বললে, 'জগদ্ধাত্রী।'

'আমি জগদ্ধাত্রীর পুজো করব।'

কিন্তু এমন বৃষ্টি, ধান আর শুকোনো যাচ্ছে না! শ্যামাসুন্দরী আবার কাঁদতে বসলেন, 'যদি ধানই না শুকুতে পারি, কি করে তোমার পুজো হবে?'

শেষকালে, ছোট্ট একটুখানি রোদ উঠল। সে আবার কি কথা? হ্যাঁ, তাই—এক চ্যাটাই রোদ। চারদিকে বৃষ্টি হচ্ছে অঝোরে, শুধু যে চ্যাটাইয়ে ধান শুকুতে দিয়েছে সেই পরিমাণ রোদ!

হয়ে গেল পুজো। প্রতিমা বিসর্জনের সময় কানের একটি গয়না খুলে রাখলেন শ্যামাসুন্দরী। তারপর কানে-কানে বলে দিলেন, 'মা জগাই, আবার আর-বছর এসো।'

পর বছরে পুজোর সময় সারদার কাছে কিছু চাঁদা চাইলেন শ্যামাসুন্দরী। যেন খুব উপযুক্ত রোজগেরে জামাইয়ের হাতে মেয়ে দিয়েছেন, সাহায্য করবার ক্ষমতা রয়েছে যথেষ্ট। সারদা বললে, 'একবার হল, হল, আবার ল্যাঠা কেন? ও আমি পারবনি।'

রাত্রে স্বপ্নে তিনজন এসে হাজির। একা জগদ্ধাত্রী নয়, সঙ্গে জয়া-বিজয়া। সারদাকে বললে সরাসরি, 'আমরা তবে যাই।'

'না, না, তোমরা কোথায় যাবে?' সারদা ধড়মড় করে উঠল। 'তোমরা থাকো। তোমাদের যেতে বলিনি।'

কী চাঁদা দিতে পারে সারদা? শরীরের শ্রম দিতে পারে। বাসন মাজতে পারে। সেই থেকে জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় সে গ্রামে আসে আর বাসন মাজে।

মায়ের আরেক ছেলে যোগীন। ঠাকুর বলেন অর্জুন। তার ধ্যানারক্ত চোখ দুটিকে বলেন অর্জুনচক্ষু।

যখন যে দু-এক আনা পয়সা পায় মা'র নামে তুলে রাখে। তিল-তিল করে ছশো টাকা সঞ্চয় করেছে। তাই থেকে সে কাঠের বাসন কিনে দিলে, বারকোষ, লটকেন আর সিংহাসন। জয়রামবাটির জগদ্ধাত্রী পুজোর বাসন। মাকে বললে, 'মা, তোমাকে আর বাসন মাজতে যেতে হবে না।'

তা ছাড়া—মাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত করা দরকার—তিনশো টাকা দিয়ে তিন বিঘে জমি কিনে দিল। সেই আয়ে পুজো হবে বছর-বছর।

যোগীন একখানা লেপ করিয়ে দিয়েছিল মাকে। সেটা বড় পুরোনো হয়ে

গিয়েছে, আর ব্যবহারের যোগ্য নয়। ওটার তুলো পিঁজে নতুন খোলে চড়ালে দিব্যি নতুন লেপ হয়ে যাবে। কিন্তু মা কিছুতেই রাজী হন না। বলেন, 'না, ওটাকে বদলে দিয়ে কাজ নেই। এই লেপ যোগীন দিয়েছিল, দেখলেই যোগীনকে মনে পড়ে।'

বিয়ে করেছিল যোগীন। তার অন্তিম সময়ে তার স্ত্রীকে মা নিয়ে এলেন তার পাশটিতে। যোগীন কিছুতে নেবে না তার সেবা, মা তা হতে দিলেন না। মায়ের আদেশে স্ত্রীর সেবা নিতে হল যোগীনকে। মা বললেন, 'যোগীন, একে দু-একটি কথা বলো। একটু উপদেশ দাও।'

'আমি ওসব পারবো না, সে সব আপনি বুঝুন।' যোগীন মুখ ফিরিয়ে নিল।

যোগীন দেহত্যাগ করল, তখন নরেন্দ্রনাথ বললে, 'কড়ি খসল। এবারে ধীরে-ধীরে বর্গাও সব খসে পড়বে।' আর মা বললেন, 'বাড়ির একখানা ইট খসল, এবারে সব যাবে।'

* দশ *

'কে যায় ?' আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে জনহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হুমকে উঠল বাগদি-ডাকাত।

'তোমার মেয়ে গো—' উচ্চারিত হল বাণী নির্মলমুক্তি। বন্ধনমোচনী বিঘোষণা। যা মেয়ে তাই মা। যা মা তাই মেয়ে। মা পার্বতী, মেয়ে গৌরী। ঠাকুরের সেই যে মাতৃমন্ত্র তারই উজ্জ্বলন্ত বিগ্রহ এই সারদা। মন্ত্রের জীবন্ত রূপান্তর।

আমার মেয়ে ? থমকে গেল বাগদি-ডাকাত। এই নিশ্বাসরেখাহীন পরিত্যক্ত মাঠে পথহারা আমার জননী ? সাপের মাথায় ধুলো পড়ল। বন্ধ্যা মাটিতে জেগে উঠল মমতার শ্যামলতা। এক পা এক পা করে এগুতে লাগল ডাকাত। সত্যিই তো, চেনা-চেনা লাগছে। ওই কোমলকুমার মুখখানি, ক্লান্তকায়ের কৃশিমা। কোন জন্মের মেয়ে কে জানে, ইহ জন্মের মা।

কত বার এর মধ্যে যাওয়া-আসা করেছে সারদা। একবার তো শ্যামাসুন্দরীকে নিয়ে গিয়েছিল। হৃদয় যা ব্যবহার করলে অভাবনীয়। নিজের বাড়ি শিওড়, তাই শিওড়ের মেয়ে শ্যামাসুন্দরীকে মোটে আমোলই দিলে না। বললে, 'এখানে কি ? এখানে কি করতে এসেছ ? এখানে কিছু হবে না।' বলে প্রায় তাড়িয়ে দিল। শ্যামাসুন্দরী বললেন, 'চল দেশে ফিরে যাই। এখানে কার কাছে মেয়ে রেখে যাব ?' যার কাছে রাখবার কথা তিনি হৃদয়ের ভয়ে হাঁ-না কিছুই বললেন না। রামলাল পারের নৌকো এনে দিলে। মাকে নিয়ে সারদা ফিরে এল।

উপেক্ষিত, প্রায় অপমানিত হয়ে ফিরে এল। হৃদয় যেন ভেবেছিল তার কালীবাড়ির বরাদ্দে এরা ভাগ বসাতে এসেছে ! কি লজ্জা ! অন্য কোনো মেয়ে

হলে, এই অবস্থায় এ-ই হয়তো সংকল্প করত, আর কোনো দিন যাব না দক্ষিণেশ্বর। ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হলে, অন্য কোনো মেয়ের বেলায়, লাগত অনেক সাধ্যসাধনা। ওগো, চলো, পায়ে পড়ি, ঘাট হয়েছে, আর কোনোদিন হবে না এমন অনাদর—লাগত অনেক স্তবস্তুতি। কিন্তু সারদা অনন্যা। সে মূর্তিমতী প্রস্তুতি, মূর্তিমতী শরণাগতি। ভবতারিণীর দিকে মুখ করে সে শুধু বললে, 'মা গো, এবার স্থান দিলে না। কিন্তু আর যদি কোনোদিন আনাও তো আসব।'

আসব না নয়, যদি আনাও তো আসব। এই তো নিজেকে ঢেলে দেওয়া। এই তো ডাক শোনবার জন্যে উৎকর্ণ থাকা। এই তো যোগতাৎপর্য।

তারপর এল সেই করুণ চিঠি। ঠিক চিঠি নয়, কামারপুকুরের লক্ষ্মণ পানকে দিয়ে খবর পাঠালেন ঠাকুর। হৃদয় তখন চলেগেছে দক্ষিণেশ্বর থেকে, আর নতুন পূজারী হয়ে রামলাল নিজেকে নিয়েই মাতোয়ারা। তখন বলে পাঠালেন লক্ষ্মণকে দিয়ে : 'এখানে আমার কষ্ট হচ্ছে। রামলাল মা-কালীর পূজুরী হয়ে বামুনের দলে মিশেছে। এখন আর আমাকে তত খোঁজখবর করে না। তুমি অবিশ্যি আসবে। ডুলি করে হোক, পালকি করে হোক, দশ টাকা লাগুক, বিশ টাকা লাগুক, আমি দেব।'

একমুহূর্তও দেরি করল না সারদা। পালকি-ডুলিও দ্রুত নয়, যদি পারত পাখি হয়ে উড়ে যেত।

এত যাকে প্রয়োজন তাকে আবার সেবার ফিরিয়ে দিলেন নির্বিচারে। সেবার রেললাইনের উপর পড়ে গিয়ে হাত ভেঙেছে ঠাকুরের, সারদা এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। হিসেব করে দেখলেন সারদার রওনা হবার অল্প পরেই এই দুর্ঘটনা। আরো হিসেব করে দেখলেন, যে সময়ে সারদা যাত্রা করেছিল সেটা বিষ্যুৎবারের বারবেলা। তখন বললেন অনুযোগ করে, 'তুমি বিষ্যুৎবারের বারবেলায় রওনা হয়ে এসেছ বলেই আমার হাত ভেঙেছে। যাও, যাত্রা বদলে এস।'

সারদা তখুনি চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত। ঠাকুরের বোধহয় মায়া হল একটু। বললেন, 'আচ্ছা আজ থাকো, কাল যেও।'

পরদিনই সারদা ফিরে চলল। এক রাত্রি থাকবার পর ফিরে চলল যাত্রা বদলে আসতে। কিন্তু সেবারের যাত্রা দুঃসাহসিক। সেটা বোধহয় তৃতীয়বারের যাত্রা। ভূষণ মণ্ডলের মা গংগাস্নানে যাচ্ছে। সংগে আরো কজন সহযাত্রী। তা ছাড়া লক্ষ্মী আর শিবরাম। সারদা বললে, আমিও যাব। যাওয়া পায়ে হেঁটে। ট্রেন-স্টিমারের বাষ্প নেই কোথাও। পদব্রজেই ব্রজধাম। ভ্রমণ মানে মন্দির-প্রদক্ষিণ। গমন মানে তীর্থগমন।

কামারপুকুর থেকে আরামবাগ আট মাইল। তারপরেই তেলোভেলোর মাঠ। সেই মাঠ পেরিয়ে তারকেশ্বর। সেই মাঠ এক নিশ্বাসের পথ নয়, প্রায় দশ মাইল। আগে ঐ মাঠ তো পেরোও তবে তারকেশ্বরের নাম কোরো।

কেন, সেই মাঠে কী? সেই মাঠে ঠ্যাঙাড়ে-ডাকাতের বাসা। ঘাপটি মেরে বসে আছে অন্ধকারে। দরাজ হাতে লুট-তরাজ করতে। হেসে-হেসে মাথা কাটতে। কখনো আগে হত্যা, পরে লুট।

আরো আছে। মাইল দুয়েক মাঠ ভেঙেই ডাকাতেকালীর থান। চণ্ডমুণ্ড-বিখণ্ডিনী বৈরিমর্দিণী রণরামা। বলতেই বলে, তেলোভেলোর ডাকাতেকালী। দেখতে ঘোরদর্শনা, ভয়ালকরালা। দেখতে কি, শুনতেই বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

যাত্রীদের সবায়ের চেষ্টা সন্ধ্যা লাগবার আগেই যাতে পেরোতে পারে তেলো-ভেলো। সেই উদ্দেশে পা চালাচ্ছে প্রাণপণে। কিন্তু ওদের সঙ্গে পা মিলিয়ে সমান তালে চলতে পারছে না সারদা। পিছিয়ে পড়ছে। বারে-বারেই পিছিয়ে পড়ছে। ক্লান্তিতে পা আর চলতে চাইছে না।

পুরোবর্তীরা অভিযোগ করছে : তাড়াতাড়ি পা চালাও। এখনো অনেকখানি পথ। আঁধার নামবার আগেই বেরিয়ে যেতে হবে মাঠ ছেড়ে।

থামছে সারদার জন্যে। সারদা এসে সঙ্গ ধরছে। আবার কখন পিছিয়ে পড়ছে ক্লান্তিতে। 'তোমার একার জন্যে সকলে আমরা মারা পড়ব ডাকাতের হাতে?' ধমকে উঠল অগ্রগামীর দল।

তা কি করব, শরীরে দিচ্ছে না, পারছি না হাঁটতে, এমন কথা বলল না সারদা। কিংবা, যে করেই হোক, কোলে করে হোক কাঁধে করে হোক আমাকে নিয়ে চলো তোমাদের সঙ্গে—এমন কথাও না। ওাক, আমাকে একা ডাকাতের মুখে ফেলে তোমরা কোথায় পালাচ্ছ, এমন কথা বলেও ডুকরে কেঁদে উঠল না। সারদা বিবেচনা করে দেখল, সত্যিই তো, তার জন্যে কেন আর সকলে বিপন্ন হবে, বিড়ম্বিত হবে। তার নিজের ক্লান্তি কেন অন্যের কণ্টক হবে, তার নিজের অক্ষমতা কেন হবে অন্যের প্রতিবন্ধক! সে নিজে হাঁটতে পারছে না তার ফলাফল সে নিজে বহন করবে, কেন সে বেড়ী হয়ে থাকবে পরের পা জড়িয়ে? তাই সে বললে, স্পষ্ট স্বচ্ছকণ্ঠে : 'তোমরা যাও। পারি তো আমি যাচ্ছি তোমাদের পিছনে। যদি পারো, তারকেশ্বরের চটিতে আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো।'

আশ্চর্য, সঙ্গীরা সারদাকে ত্যাগ করে চলে গেল স্বচ্ছন্দে। যেতে পারল? জনপরিশূন্য মাঠ, আতঙ্কভরা নিস্তব্ধতা, করালী সন্ধ্যা আসছে ঘনতর হয়ে, একটি একাকিনী তরুণীকে ফেলে চলে যেতে পারল? সারদাও কাঁদল না, কাটল না, নিজের সমস্ত ভার নিজেই তুলে নিল দুহাতে। কিসের তার দুঃসাহস? অনুক্ত প্রশ্নটি এইখানে, কিসের তার দুঃসাহস? কেন সে ভেঙে পড়ল না? কেন সে সঙ্গীদের হাত টেনে ধরে আটক করল না? কিসের ভরসায় সে তারকেশ্বরের চটির কথা শোনাল?

সারদা জানে, কী মন্ত্র সে ধরে, কী অমোঘ মন্ত্র। এই মন্ত্রে পাথর ফেটে দুধ বেরোয়, বন্ধ্যা মৃত্তিকায় ফুল ফোটে। এই মন্ত্র মাতৃমন্ত্র। এই মন্ত্র—আমি তোমার মেয়ে, আমি তোমার মা।

ঠিক মত উচ্চারণ করা চাই। মেশানো চাই ঠিক মত আন্তরিকতার সুর, সরলতার টান। উদ্যত সাপ ফণা নোয়াবে। উদ্ধত ডাকাত মাথা নোয়াবে।

'কে যায়?' হুমকে উঠল বাগদি-ডাকাত।

'তোমার মেয়ে গো—' কোমলকরুণ স্বরে উত্তর দিল সারদা।

আমার মেয়ে ! সমস্ত মাঠ ও আকাশের শূন্যতা একটি অপরূপ কান্নায় ভরে গেল। আমি তোমার মেয়ে, আমি তোমার মা—এই প্রথম কান্না, পরম কান্না !

'ঢুলি ভাই, বাজনা থামাও, আমি একটু মায়ের কাঁদন শুনি— ।' বিয়ের পর কন্যা চলেছে পতিবাসে। বাজনা বাজছে। কিন্তু সমস্ত বাজনার অন্তরালে বাজছে তার মায়ের কান্না। তাই কন্যা বলছে ঢুলিকে, 'ঢুলি ভাই, বাজনা থামাও, আমাকে আমার মায়ের কান্নাটি শুনতে দাও।'

তেমনি সংসার বাজিয়ে চলেছে তার নানাযন্ত্রের বাদ্যধ্বনি। বলছি, সংসার তোমার বাজনাটা একটু থামাও। বিশ্বজননীর কান্নাটি একটু শুনি কান পেতে। স্তব্ধ মাঠে বাগদি-ডাকাত শুনল বুঝি সেই জননীর কান্না।

লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল। করাল-ভয়াল দুর্দান্ত চেহারা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, হাতে লম্বা লাঠি। কণ্ঠে সিংহনাদ।

একটুও ভয় পেল না সারদা। বললে, 'যাচ্ছিলুম দক্ষিণেশ্বর তোমার জামাইয়ের কাছে। আমার সংগীরা আমায় ফেলে চলে গিয়েছে আগে-আগে। তুমি যদি এখন আমাকে পৌঁছে দিয়ে এস—'

'কোথায় জামাই ? কি করে ?'

'দক্ষিণেশ্বরে রানি রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন—'

পতিগৃহযাত্রিনী মেয়ের গলা আরো একজন শুনতে পেল। সে বাগদি-ডাকাতের বউ। সেও এল এগিয়ে। পথহারা মেয়েকে পাখা দিয়ে ঢেকে রাখতে।

'আমি তোমার মেয়ে গো—সারদা।' ডাকাত-বউয়ের হাত দুটো চেপে ধরল। বললে, 'আর আমার ভয় কি। আমার বাবা-মাকে পেয়েছি, বিপদ-আপদ কেটে গিয়েছে—'

যে রক্ষক সে ভক্ষক হয় এ হামেশাই শোনা যায়। কিন্তু যে ভক্ষক সে রক্ষক হয় এই প্রথম দেখা গেল !

গাঁয়ের এক ছোট্ট দোকানে নিয়ে গেল সারদাকে। মুড়িমুড়কি কিনে আনল, তাই খাওয়াল রাতের মত। বাগদি-বউ নিজের হাতে পেতে দিল বিছানা। ছোট মেয়েকে যেমন ঘুম পাড়ায় তেমনি ঘুম পাড়াল সস্নেহে। লাঠি হাতে দুয়ারে জেগে বাগদি-ডাকাত। যে লুণ্ঠন করবে সেই দাঁড়াল প্রহরী হয়ে। একটি মাত্র মন্ত্রে এই অসাধ্যসাধন। আরোগ্যসাধন।

সকালবেলা উঠে সারদাকে নিয়ে চলল তারকেশ্বর। পথে কড়াইশুঁটির খেত। কড়াইশুঁটি ছিঁড়ে-ছিঁড়ে বালিকার মত খেতে লাগল সারদা।

তারকেশ্বরে পৌঁছে ডাকাত-বউ বায়না ধরল, 'কাল সারা রাত কিছু খায়নি আমার মেয়ে। যাও, বাবার পুজো দিয়ে চট করে বাজার করে এস। মাকে একটু খাওয়াই ভালো করে।'

পুজো হল, বাজার হল, মায়ের জন্য রাঁধতে বসল বাগদি-বউ। মেয়ের টানে সেও এই দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছে। নিজের হাতে রেঁধে দিচ্ছে স্নেহ-ব্যঞ্জন। মেয়ের টানে না মন্ত্রের টানে !

সংগীদের সঙ্গে মিলিয়ে দিল সারদাকে। তারা বোধহয় ভাবতেও পারেনি,

এমন সুস্থ-তৃপ্ত অবস্থায় তাকে দেখতে পাবে। বলিস কি, বেঁচে আছিস? কে এরা?

'মা-বাবা। মাঠের অন্ধকারে এঁরা যদি কাল না এসে পড়তেন কি যে হত ভাবতেও পারি না।'

বদ্যিবাটির দিকে চলল এবার যাত্রীদল। বাগদি-ডাকাত আর তার বউ কাঁদতে লাগল আকুল হয়ে। সারদাও ভেঙে পড়ল কান্নায়। তরুলতাও কাঁদতে লাগল নিঃশব্দে। বিদায়ের আকাশ তাকিয়ে রইল অশ্রুমুখ হয়ে।

'যদি পায়ের বোঝা স্ত্রী সঙ্গে না থাকত তোমাকে বাবার কাছে পেঁছে দিয়ে আসতুম।' বললে বাগদি-ডাকাত।

আর বাগদি-মা ক্ষেত থেকে কড়াইশুঁটি ছিঁড়তে লাগল। ছিঁড়ে বেঁধে দিলে সারদার আঁচলে। বললে, 'মা সারু, রাত্রে যখন মুড়ি খাবি তখন খাস এই কড়াইশুঁটি।'

সারদারা বাঁয়ের রাস্তা দিয়ে চলে গেল। বাগদি আর বাগদিনী তাকিয়ে রইল তার যাওয়ার দিকে। তার অপস্রিয়মান অঞ্চলের শেষ প্রান্তটির দিকে। বাগদিরা গেল ডাইনের রাস্তা দিয়ে। যায়-যায় আর ফিরে-ফিরে তাকায়। তাকায় আর কাঁদে।

ঠাকুর বলেন, 'ডাকাতরূপী নারায়ণ।'

তার ডাকাতি দেখ, দেখবে না তার পিতৃত্ব? তার নিষ্ঠুরতা দেখ, দেখবে না তার মাতৃভক্তি? পথ চিনে-চিনে একদিন তারা এল দক্ষিণেশ্বরে। সঙ্গে মোয়া আর নাড়ু। এনেছে মেয়ে-জামায়ের জন্যে।

'আমাকে তোমরা এত স্নেহ করো কেন গা?' জিগ্গেস করলে সারদা।

'তুমি তো সাধারণ মেয়ে নও। তোমাকে যে আমরা কালীরূপে দেখলুম!'

'সে কি গো?' হাসল সারদা।

'না মা, আমরা সত্যিই দেখলুম। আমরা পাপী বলে তুমি রূপ গোপন করছ!'

'কি জানি বাপু, আমি তো কিছু জানিনি।'

যে দেখবার সে দেখে। যে শোনবার সে শোনে।

আমি যে ডাকাতেরও মা।

একটি পতিতা এসেছে মা'র কাছে। মা তাকে টেনে আনলেন কাছে, মার্জনা-মধুর সান্ত্বনা দিলেন। এই নিয়ে কথা উঠল—ওরা কেন এখানে আসে? মা বললেন, 'ওরা আমার কাছে না আসবে তো কার কাছে আসবে? আমি কাউকে বাদ দিতে পারব না। ঠাকুর বলেছেন, এবার আমি কাউকে ছাড়ছি না। ঠাকুর কি কেবল রসগোল্লা খেতে এসেছেন?'

একটি কুলবধূ বিপথে পা দিয়েছে। হৃতসর্বস্ব হয়ে এসেছে মা'র কাছে। অনুতাপের দাহ উঠেছে বুকের মধ্যে। চোখে জল অবিশ্যি অবিরল কিন্তু সে-দাহের নির্বাণ হচ্ছে না। ঠাকুরঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। মা'র সামনে গিয়ে দাঁড়ায় এটুকুও মনে হয় স্পর্ধার মত।

কিন্তু মা যে পরমপাবনী ক্ষমামূর্তি। সমস্ত ক্লেশ-ক্লেদ মুছে দেবেন বলেই তো তাঁর বসনাঞ্চল। তিনি ডাকলেন: 'এসো মা, ঘরে এসো। পাপ যখন বুঝতে

পেরেছ তখন আর পাপ নেই। এসো, তোমাকে মন্ত্র দেব। ঠাকুরের পায়ে সব অর্পণ করে দাও, ভয় কি।'

করুণাদ্রবা জাহ্নবীর স্পর্শে শুচি হল মৃত্তিকা।

থিয়েটারের অভিনেত্রীরা এসেছে। মা সবাইকে আদর করে প্রসাদ খাওয়াচ্ছেন। বিল্বমঙ্গলের পাগলীর গান ধরেছে তিনকড়ি। গান শুনে মা সমাধিস্থা।

বাগবাজারের পদ্মবিনোদ পাঁড় মাতাল। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকে মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়ার পার্ট করে। মাঝে-মাঝে আসে বলরাম-মন্দিরে, ঠাকুরের 'কলকাতার কেল্লায়'। শরৎ-মহারাজকে দোস্ত ডাকে।

দোতলায় মা শুয়েছেন, নিচে শরৎ-মহারাজ, আশুতোষ মিত্র, আরো কেউ-কেউ।

'দোস্ত, দোস্ত!' দুপুর রাতে ডাকাডাকি শুরু হল।

শরৎ-মহারাজ চুপি-চুপি সকলকে বলে দিলেন, পদ্মবিনোদ এসেছে। খবরদার, কেউ দরজা খুলে দিসনি। মাতাল হয়ে এসেছে, এমন চেঁচামেচি শুরু করবে মা-ঠাকুরুন জেগে উঠবেন। সবাই চুপ করে রইল। বন্ধ দরজায় টোকা মারল বাইরে থেকে, কিন্তু কেউ সাড়া দিল না।

'আমি ব্যাটা এত রাত্তিরে এলাম, আর দোস্ত, তুমি একবারটিও উঠলে না, জানলার পাখি তুলে দেখলেও না একটিবার।' বলে চলে গেল পদ্মবিনোদ।

পরের রাত্রে আবার এসেছে। সেই মত্ত-মুক্ত অবস্থা। এবার আর দোস্ত নয়। সোজা মাতৃসম্ভাষণ। 'মা, ছেলে এয়েছে তোমার, ওঠো মা।' বলেই সুকণ্ঠে গান ধরল :

> 'ওঠ গো করুণাময়ী, খোল গো কুটির-দ্বার,
> আঁধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাঁপে অনিবার।
> সন্তানে রাখি বাহিরে, আছ সুখে অন্তঃপুরে,
> আমি ডাকিতেছি মা-মা বলে, নিদ্রা কি ভাঙে না তোমার?'

উপরের ঘরের জানলার একটা পাটি খুলে গেল।

'এই রে, মাকে তুলেছে।' নিচে শরৎ-মহারাজ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

শুধু একটি খড়খড়ি নয় খুলে গিয়েছে সম্পূর্ণ জানলা।

'উঠেছ মা?' রাস্তা থেকে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে বলে উঠল পদ্মবিনোদ : 'সন্তানের ডাক কানে গেছে? উঠেছ তো পেন্নাম নাও।' বলে বলা-কওয়া নেই রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে লাগল। উঠে আবার চলল আপন মনে। গান ধরল :

> 'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে,
> মন, তুমি দেখ আর আমি দেখি,
> আর যেন কেউ নাহি দেখে।
> দোস্ত যেন নাহি দেখে॥'

'ছেলেটিকে?' পর দিন উঠে জিগগেস করলেন মা।

সব বৃত্তান্ত শুনলেন একে একে। বললেন, 'দেখেছ, জ্ঞানটুকু টনটনে।'

'ছাই টনটনে!' বলে উঠল ভক্তের দল : 'আপনার ঘুমের যে ব্যাঘাত করে।'

'তা করুক। ওর ডাকে যে থাকতে পারি না। দেখা দিই।'

একটি ভক্ত-মেয়ে মাকে স্বপ্ন দেখেছে। যেন তাঁকে চণ্ডীজ্ঞানে পুজো করছে ও পুজো অন্তে লালপেড়ে শাড়ি দিচ্ছে। পর দিন একখানা লালপেড়ে শাড়ি নিয়ে এসেছে সে মা'র কাছে। কিন্তু লজ্জায় কিছু বলতে পারছে না। দিদি, তুমি বলো। আরেকজন ভক্ত-মেয়েকে দিয়ে বলাল অনেক করে। মা বললেন, 'জগদম্বাই স্বপ্ন দিয়েছেন, কি বলো মা ? তা উঠি, দাও শাড়িখানা—পরতে তো হবে !'

চওড়া লালপেড়ে শাড়িখানি পরলেন। দুর্গাপ্রতিমা যেন ঝলমল করে উঠল। ভক্ত-মেয়েদের চোখে জল এল। স্বপ্ন-দেখা মেয়েটি বললে, 'একটু সিঁদুর দিলে বেশ হত।'

তাতে মায়ের আপত্তি নেই। বরং বললেন সহাস্যে, 'তা দেয় তো সিঁদুর !'

সিঁদুর আনা হয়নি। তাতে কি, মা তাঁর চুলের পিছনে রাখেন একটু সিঁদুরের চিহ্ন। মা চিরসীমন্তিনী। শিবসীমন্তিনী।

মঠে দুর্গাপুজা হচ্ছে। দেবীর বোধন। সন্ধেবেলা মা আসবেন। বাবুরাম ছুটোছুটি করছে, বলছে, কি করে মা আসবেন ? এখনো কলাগাছ আর মঙ্গলঘট বসানো হয়নি। বোধন সাঙ্গ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই মা এসে হাজির। চারদিক দেখে-শুনে মা বলছেন হেসে-হেসে, 'সব ফিটফাট, আমরা যেন সেজেগুজে মা-দুর্গা-ঠাকরুন এলুম।'

* এগারো *

সেই দুর্গাপ্রতিমা, সেই জীব-জগতের মা, রয়েছেন বন্দীশালায়। সঙ্কীর্ণ নহবতের ঘরে। দরমা দিয়ে ঘেরা দুর্ভেদ্য দুর্গে। যিনি জগতের বন্দিতা তিনিই কারাগারে বন্দিনী। তিনি জানেন তিনি কে। তবু নিয়েছেন এই সাধনব্রত। সন্তোষের সাধন। তিতিক্ষার তপস্যা। আর যিনি পাঠিয়েছেন এই বনবাসে তাঁর প্রতিই সুগভীর ভালোবাসা। যাঁকে বলা যেতে পারত নির্মম, তাঁকেই কিনা দয়াময় ও প্রেমময় বলে মনে-মনে মাল্যদান !

হৃদয় রঙ্গ করে বলে, 'তুমি মামাকে বাবা বলে ডাকো না !'

এতটুকু আড়ষ্ট হল না সারদা। প্রাণভরা আবেগ নিয়ে বললে, 'তিনি বাবা কি বলছ, তিনি পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন—সব তিনি।'

সারদার জিহ্বায় একটি মন্ত্র লিখে দিয়েছেন ঠাকুর। কুলকুণ্ডলিনী ষটচক্র এঁকে দিয়েছেন। নহবতের পশ্চিম বারান্দায় বসে দক্ষিণ দিকে মুখ করে, ঠাকুরের দিকে মুখ করে জপ করে সারদা। আর চাঁদের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করে, তোমার জ্যোৎস্নার মত আমার অন্তর নির্মল করে দাও।

আরো একটু বেশি বলে। বলে, 'তোমাতেও কলঙ্ক আছে, কিন্তু আমি যেন নিদাগ থাকি।'

ঠাকুর বলে দিয়েছেন, চাঁদা মামা সকলের মামা, ঈশ্বর সকলের ঈশ্বর, সকলের আপনার। দূরেই থাকুন দূরেই রাখুন ঠাকুরও আমার আপনার।

সাহেব-বাড়ি থেকে মা'র ফোটো তৈরি হয়ে এসেছে। কেমন হয়েছে দেখুন তো ? মা'র হাতে দেওয়া হল দেখতে। প্রথমেই মা মাথায় ঠেকালেন। ছবিখানি কার মা ? কেন—আমার ! সবাই হেসে উঠল। হাসছ কেন ? মা তাকালেন অবাক হয়ে। নিজের ছবি নিজেই প্রণাম করলেন ? হাসতে-হাসতে মা বললেন, কেন এর মধ্যে তো ঠাকুর আছেন।

তাই সেদিন বললেন ব্রহ্মবাদিনীর ভাষায়, 'আমার মাঝেও যিনি, তোমার মাঝেও তিনি। দুলে বাগদি ডোমের মাঝেও তিনি।'

বিশ্বহিতধ্যানে মগ্ন মাতৃমূর্তিকে একবার দেখ ! হাওয়ায় আঁচল চুল উড়ে যাচ্ছে তবু লজ্জারূপিণীর দেহবুদ্ধির লেশ নেই। সে মহিমময়ী মূর্তি একদিন দেখতে পেল যোগীন। ঠাকুরের খোঁজে যাচ্ছে পঞ্চবটীর দিকে, দেখল সমাধিস্থা হয়ে বসে আছেন মা, তন্ময়তাব কবিতা। সর্বভূত-মহেশ্বরী মহতী বিশ্বকান্তি।

যোগেন-মাকে বললে একদিন সারদা, 'ওঁকে একটু বলতে পারো ?'

'কি ?'

'যাতে আমার একটু ভাব-টাব হয় ! লোকজনের জন্যে যেতে পারি না ওঁর কাছে। তুমি তো যাও, বলবে ?'

এ আর বেশি কথা কি। সকালবেলা, ঠাকুর একা বসে আছেন তক্তপোশে, যোগীন্দ্রমোহিনী প্রণাম করে কাছে এসে দাঁড়ালো।

কি খবর, স্মিতমুখে জিগ্গেস করলেন ঠাকুর।

সাহস পেয়ে বললে এবার সারদার কথা। সে ভাব চায়।

ঠাকুর গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাঁর প্রসাদস্নিগ্ধ মুখে ফুটে উঠল কঠিন ঔদাসীন্য। আর কথা বলবার সাহস পেল না যোগেন-মা। তাড়াতাড়ি আরেকটা প্রণাম কোনোমতে সেরে নিয়ে পালিয়ে গেল নিঃশব্দে।

নহবতে এসে দেখে—দরজা বন্ধ। সারদা পূজায় বসেছে। দরজা একটু ফাঁক করল যোগেন-মা। এ কি কাণ্ড ! সারদা হাসছে আপন মনে। পরমুহূর্তেই কাঁদছে অঝোরে। অবিচ্ছিন্ন ধারা নেমেছে চোখ বেয়ে ! শেষে আর হাসি-কান্না নেই—গাঢ় ভাব-সমাধি। দরজা আস্তে বন্ধ করে দিল যোগেন-মা। বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল।

পূজা শেষ হতেই যোগেন-মা ঘরে ঢুকল। বললে, 'তবে মা তোমার নাকি ভাব হয় না ?'

সারদা লজ্জা পেল। হেসে ঢাকতে চাইল সে লজ্জা। সে ধরা-পড়ার লাবণ্য।

রাত্রে মাঝে-মাঝে সারদার কাছে শোয় যোগেন-মা। একদিন শোনে কে বাঁশি বাজাচ্ছে। সারদা উঠে বসেছে বিছানায়। বাঁশির স্বরে তন্ময় হয়ে গিয়েছে। যেন এ রাজ্যে নেই, চলে গিয়েছে দেশান্তরে। সেখানে কি দৃশ্য দেখছে কে জানে, থেকে থেকে হেসে উঠছে। সসঙ্কোচে সরে বসল যোগেন-মা। ভাবল, সংসারী মানুষ, এ সময় ছোঁব না মাকে।

বলরাম বোসের বাড়ির ছাদে ধ্যান করতে বসে মা সমাধিস্থ হলেন। দেহভূমিতে নেমে এসে বলছেন সরলা বালিকার মত : 'দেখলুম কোথায় যেন চলে

গেছি। সেখানে আমার যেন সুন্দর রূপ হয়েছে। ঠাকুর রয়েছেন। কারা যেন আমায় আদর-যত্ন করে ডেকে নিলে, বসালে ঠাকুরের পাশে। সে যে কী আনন্দ বলতে পারিনে। একটু হুঁশ হতে দেখি, শরীরটা পড়ে রয়েছে। তখন ভাবছি ওই বিশ্রী শরীরটার মধ্যে কি করে ঢুকবো—'

'ও যোগেন, আমার হাত কই, পা কই ?' কাতর স্বরে বলতে লাগলেন মা। বেলুড়ে, নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে। গোলাপ-মা যোগেন-মাকে নিয়ে ধ্যানে বসেছেন সেদিন, কিন্তু ওদের দুজনের ধ্যান কখন ভেঙে গেল, অথচ মা সমাধিস্থ। যখন ধ্যান ভাঙল তখন ওই অসহায় আক্ষেপ—হাত পা খুঁজে পাচ্ছেন না মাটিতে। খোলটা না পেলে চেতনাটা রাখেন কোথায় ? এই যে পা, এই যে হাত—হাত-পা টিপে-টিপে দেখাতে লাগল দুজনে। তখন আস্তে-আস্তে জাগল দেহবুদ্ধি। ফেললেন মর্ত-নিশ্বাস।

একেই বোধহয় 'নির্বিকল্প' বলে। কিন্তু কী তপস্যার বলে মা পেলেন এই উচ্চতম উপলব্ধির আস্বাদ ? তিনি কি ঠাকুরের মত তন্ত্র করেছেন, না কি যোগ প্রাণায়াম করেছেন, না কি পঞ্চভাবের বৈষ্ণব সেজেছেন ? কোনো হৈ-চৈ করেননি, খড়্গ পেড়ে চাননি গলা কাটতে—নির্বাক প্রতিমার মত চির-নেপথ্যে বাস করেছেন, একটি মহান আত্মবিলুপ্তির মধ্যে। এই আত্মবিলুপ্তিই তাঁর তপস্যা। বিরাজ করেছেন একটি অম্লান সন্তোষে। এই সন্তোষই তাঁর যোগ। উৎসুক হয়ে রয়েছেন একটি সুতীক্ষ্ন প্রতীক্ষায়। এই প্রতীক্ষাই তাঁর একান্তভক্তি।

মা স্বতঃসিদ্ধা। তাঁর জীবনে যে-দিন-রাত্রি, সে শরণাগতির দিন আর অভিমুখিতার রাত্রি।

করবার মধ্যে করেন শুধু জপ আর ধ্যান। জপ করবার জন্যে দুটি মালা, একটি তুলসীর আরেকটি রুদ্রাক্ষের। তাও অষ্টপ্রহর এই মালা নিয়ে বসে থাকেন না। চারবার মোটে জপ করেন, ব্রাহ্মমুহূর্তে, পুজোর সময়, বিকেলে আর সন্ধেয়। বাকি সময় সংসারের খেজমত। গৃহস্থালীর টুকিটাকি। সেবা-চর্চা। ত্রিশূলধারিণী ভেরবী সাজেনি সারদা, সে সংসারের একটি সলজ্জা বধূ। গোপনবাসিনী সরলতা। শীতলবাহিনী শান্তি।

'নিজের-নিজের কাজকর্মে খাটো-পেটো, তা হলেই সব হবে। তা কি সত্যি ?' একটি মেয়ে জিগ্গেস করল মাকে।

'বা, কাজকর্ম করবে বৈ কি, কাজে মন ভালো থাকে। তবে জপধ্যান প্রার্থনাও বিশেষ দরকার। অন্তত সকাল-সন্ধে একবার বসতেই হয়। ওটি হল যেন নৌকোর হাল।' সুন্দর একটি উপমার সাহায্যে বক্তব্যটি প্রাঞ্জল করলেন মা : 'সন্ধেবেলা একটু বসলে সমস্ত দিন ভালো মন্দ কি করলাম না করলাম তার বিচার আসে। গত দিনের মনের অবস্থার সংগে আজকের দিনের মনের অবস্থার একটা তুলনা করা যায়।'

'আর ধ্যান ?'

'জপ করতে-করতে ইষ্ট-মূর্তির ধ্যান করবে। শুধু মুখটি নয়, পা থেকে সমস্ত অঙ্গ। কিন্তু,' মা এবার অন্তরঙ্গ হলেন : 'কিন্তু জপধ্যান করলেই কি

সব হয়ে গেল ? মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কিছুই হবার নয়। শুধু পথ ছেড়ে দেবার জন্যেই প্রার্থনা, পথ ছেড়ে দেবার জন্যেই স্মরণ-মনন।'

'আর নিষ্কাম কর্ম ?'

'ধ্যানের চেয়েও বড় সাধন। তাই তো নরেন আমার নিষ্কাম কর্মের পত্তন করলে।'

মা'র যখন ধ্যান ভাঙে, বলে ওঠেন, খাব। যে কাছে থাকে কিছু খাবার আর জল এগিয়ে দেয়। ঠাকুর যেমন খেয়েছেন ভাবাবেশে মাও তেমনি ভাবে খান। পান দিলে তার সরু দিকটা খুঁটে ফেলে দিয়ে ঠাকুর মুখে পুরতেন। মা'রও সেই ধরন। ভাবভঙ্গি সব অবিকল একরকম। সমাধি-অবস্থায় গলার স্বরেও অদ্ভুত মিল।

'আমরা কি আলাদা ?' হঠাৎ বলে ফেললেন মা। বলেই জিভ কাটলেন। বললেন অগোচরে, 'কি বলে ফেললুম !'

আমরা তা জানি। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। কৃষ্ণ আর রাধা, শিব আর কালী, রাম আর সীতা, রামকৃষ্ণ আর সারদা।

রোগা শরীরে জপ করতে বসেছেন। এক ভক্ত প্রতিবাদ করে উঠল : 'তোমার তো সব হয়েই গেছে। তবে মিছিমিছি কেন শরীরকে কষ্ট দিচ্ছ ?'

মা বললেন, 'বাবা, আমার ছেলেরা কে কোথায় কি করছে না করছে তাদের জন্যে দুটো করে রাখছি।'

সন্তান ভুলেছে, মা ভোলেনি।

রাতে কেউ উঠলেই মা সাড়া দেন : 'কে গো ?' যত রাতেই উঠুক, মা জেগে ওঠেন। একজন অনুযোগ করল : 'রাতে আপনি ঘুমোন না কেন ?'

'কি করে ঘুমোব বাবা। ছেলেগুলো সব এসে পড়েছে, নিজেরা কিছুই করতে পারে না, তাই তাদের কাজেই রাত যায়।'

ছেলেদের হয়ে সারা রাত জপ করেন মা। ছেলেদের পাপের ভার হালকা করে রাখেন।

এক ছেলে অভিযোগ করে পাঠিয়েছে, মন স্থির হয় না। শুনে মা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, বললেন, 'রোজ পনেরো-বিশ হাজার করে জপ করতে পারে, তা হলে হয়। আমি দেখেছি, নিশ্চয়ই হয়। আগে করুক, না হয়, তখন বলবে। তবে একটু মন দিয়ে করতে হয়। তা তো নয়, কেউ করবে না, কেবল বলবে, কেন হয় না ?'

আরেক ছেলে এসে বসল মা'র কাছে। বললে, 'আর জপ-টপ করে কি হবে ?'

'কেন ?' মা মুখ তুললেন।

'অনেক করলুম, কিছু হল না। কাম-ক্রোধ আগেও যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে। মনের ময়লা একটুও কাটেনি।'

শান্তবচনে মা প্রবোধ দিলেন। 'বাবা, জপ করতে-করতে কাটবে। না করলে চলবে কেন ? পাগলামি কোরো না। যখনি সময় পাবে তখনি জপ করবে।'

'আমার দ্বারা আর হবে না। হয় আমার মন তন্ময় করে দিন, যেন একটুও কুচিন্তা না আসে, নয় আপনার মন্ত্র আপনি ফিরিয়ে নিন। বৃথা আপনাকে আর কষ্ট দিতে ইচ্ছে নেই—'

'সে কি কথা ?'

'শুনেছি শিষ্য মন্ত্র জপ না করলে গুরুকেই ভুগতে হয়।'

মা কিছুক্ষণ ভাবলেন চুপ করে। পরে বললেন, 'আচ্ছা তোমাকে আর জপ করতে হবে না।'

মর্ম ঠিক বুঝতে পারল না ভক্ত। ভাবল মা বুঝি সমস্ত সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেললেন নিজের হাতে। কেঁদে উঠল, 'আমার সব কেড়ে নিলেন মা ? তবে আমি কি এবার রসাতলে গেলুম ?'

মা অভয় হাসি হাসলেন। বললেন, 'বিধির সাধ্য নেই আমার ছেলেকে রসাতলে ফেলে।'

'তবে আমি এখন কি করব ?'

'আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকো।'

মা বকলমা নিলেন।

এক স্বামীকে দীক্ষা দিলেন মা। দীক্ষান্তে বললেন নিচে নেমে যেতে। নিচে তার স্ত্রী বসে। সে বললে, সে কি ! আমার দীক্ষা হবে না ?

মা'র কাছে গিয়ে আবেদন জানাল। মা বললেন, 'বেলুড় মঠে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আছে তাদের কাছে মন্ত্র নাও গে।'

মহিলাটি শুনবে না সে-কথা। 'তোমার শ্রীচরণে আশ্রয় পাব এই ভেবে বেরিয়েছি বাড়ি থেকে। কোনোদিকে তাকাইনি, ধারকর্জ করে এসেছি। এখন তুমি যদি "না" বলো তবে কোন্ মুখে কোন প্রাণে আমি বাড়ি ফিরব ?'

'আমি পারবোনি বাপু।' মা দৃঢ় হলেন। বসলেন গিয়ে পুজার আসনে।

মহিলাটি মাটিতে পড়ে গেল। গান জানত, গান ধরল প্রাণের আবেগে। পাষাণ-গলানো গান। 'যে হয় পাষাণের মেয়ে তার হৃদে কি দয়া থাকে ? দয়াহীনা না হলে কি লাথি মারে নাথের বুকে ?'

মা'র আসন টলল। বিভোর হয়ে গান শুনতে লাগলেন। বললেন, 'আহা, আরেকটি গান গা মা, আরেকটি গান গা। তুই আমার পাগলী মেয়ে। তোর গান বড় মিষ্টি।'

মহিলাটি আবার গান ধরল।

'উঠে বোস মা। তোর গানে যে আমি পুজো ভুলে গেছি। এবার আদেশ কর্ মা, আমি বসি পুজো করতে। এই নে, প্রসাদী পান খা, তোর মুখখানি শুকিয়ে গেছে।' পান দিলেন মা। দীক্ষার দিন ঠিক করে দিলেন।

* বারো *

একজন সন্ন্যাসীর স্ত্রী, আছেন বৈভবহীনার বেশে, ভালোমানুষটির মত মুখ বুজে, অশ্রুকণ্ঠী হয়ে—এই কি আমাদের মা ? একটি পুণ্যশীলা দানশীলা দয়াময়ী নারী—ইষ্টে আবিষ্টতা—শুধু এইটুকু ? কত পূত-কীর্তি মহাত্মার কত পুণ্যব্রতা

সহধর্মিণী আছেন, জপ-ধ্যান করছেন, তীর্থ করছেন, সংসারের পাঁচজনের সেবা করছেন, তরকারি কুটছেন, রান্না করছেন, ঘর নিকোচ্ছেন, বাসন মাজছেন, কাপড় কাচছেন, পান সাজছেন—মা কি শুধু তাদেরই একজন ? শুধু একটি গৃহবন্দিনী পুরাঙ্গনা ?

মা তার চেয়ে একটু বেশি। মা আঠারো আনা। ষোলো আনার উপরে আরো দু আনা। 'কত রঙ্গ জানিস তুই, ষোলোর উপর আরো দুই।'

মা'র মাহাত্ম্য কোথায় ? মা'র মাহাত্ম্য আত্মগোপনে, অহংনাশে। যে অবগুণ্ঠনটি মুখের উপর টেনে রেখেছেন সেই অবগুণ্ঠনে। তিনি জানেন তিনি কে, কিন্তু আছেন ভিখারিনীর বেশে। সর্বৈশ্বর্যময়ী হয়ে সর্ববঞ্চিতা সেজেছেন। তিনি জানেন তিনি কার পূজা পেয়েছেন, কিন্তু একা-একা পূজার ভাণ্ডটি নিয়ে তিনি করবেন কি, সেই ভাণ্ড থেকে জনে-জনে বিতরণ করছেন ভালোবাসার শান্তি-জল !

ঐশ্বর্যের কি যন্ত্রণা ! না দেখাতে পারলে আরো যন্ত্রণা। যে আঙুলে আঙটি আছে সে আঙুলই আস্ফালন করে। দাঁতে সোনা বাঁধানো থাকলে বারে-বারে হাসতে হয় দাঁত দেখিয়ে। আর যার কিনা রাজ্যজোড়া সম্পদ, তিনি আছেন বনবাসে। ক্ষিতীশমুকুটলক্ষ্মী হয়ে মুকুট বিসর্জন দিয়েছেন। তার জন্যে লোভ নেই ক্ষোভ নেই। কৃষ্ণপ্রীতি মানেই তো তৃষ্ণাত্যাগ। আছেন তাই মূর্তিমতী তুষ্টি হয়ে তৃপ্তি হয়ে, সর্বশ্রীরূপধারিণী হয়ে।

এমন কি যে ভাবসমাধি হয় তাও জানতে দেন না।

'শক্তিরূপিণী কিনা, তাঁর চাপবার ক্ষমতা কত !' বললেন প্রেমানন্দ : 'ঠাকুর চেষ্টা করেও পারতেন না, বাইরে বেরিয়ে পড়ত। মা-ঠাকুরুনের ভাবসমাধি হচ্ছে, কিন্তু কাউকে জানতে দেন !'

কখনো কি জাঁক করে বলেন, আমি হেন, আমি তেন ! কিম্বা আমি কত বড়লোকের স্ত্রী ! মুখের উপর ঘোমটাটি টেনে রাখেন। যেমন মহামায়া টেনে রেখেছেন অন্তরাল। ত্রিজগতে অন্ন দিয়ে বেড়াচ্ছেন কিন্তু শিবের জন্যে রান্না করছেন গাঁদালের ঝোল, তাতে ডুমুর আর কাঁচকলা।

কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন এসে ঠাকুরের জল খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। জল না বন্ধ হলে সারবে না অসুখ।

মহা ভাবনা ধরল ঠাকুরের। সবাইকে ডেকে এনে জিগ্গেস করতে লাগলেন, 'হ্যাঁ গা, জল না খেয়ে কি পারব ? হ্যাঁ গা, জল না খেয়ে কি থাকা যায় ?' সবাই আশ্বাস দিচ্ছে তবু ঠাকুরের শান্তি নেই। ডাকো সারদাকে। 'হ্যাঁ গা, পারব জল না খেয়ে ?'

'পারবে বৈ কি।' অভয় দিল সারদা।

'বেদানা পর্যন্ত জল পুঁছে দিতে হবে। দেখ যদি পারো—'

'তা মা কালী যেমন করবেন, যথাসাধ্য তাঁর ইচ্ছায় হবে।' নিজে করব না বলে কালীর হাতে ছেড়ে দিল সারদা।

মন স্থির করে ওষুধ খেলেন শেষ পর্যন্ত। জল বন্ধ হল।

এখন ভরসা শুধু দুধ। আধসেরটাক বরাদ্দ, কিন্তু এত অল্প হলে চলবে কেন? গয়লা সেধে বেশি করে দুধ দিয়ে যায়। রোজ তিন চার সের, শেষে পাঁচ-ছ সের। বলে, 'মন্দিরে দিলে কালীর ভোগ বলে ব্যাটারা বাড়ি নিয়ে খাবে। পাঁচ ভুতে লুটে-পুটে খাবে। এখানে দিলে উনি খাবেন।'

জ্বাল দিয়ে-দিয়ে কমিয়ে দেড় সের এক সের করে দেয় সারদা।

ঠাকুর বললেন, 'কত দুধ?'

'কত আর! এক সের পাঁচ-পো হবে।' সারদা নির্লিপ্ত মুখে বললে।

'উঁহুঁ। এ অনেক বেশি, এই যে পুরু সর দেখা যাচ্ছে।'

সেদিন যাহোক পার পেয়ে গেল সারদা। পাঁচ-ছ সের দুধ দিব্যি খেয়ে ফেললেন ঠাকুর।

আরেকদিন, সেদিন গোলাপ-মা কাছে বসে, জিগ্‌গেস করলেন গোলাপ-মাকে, 'হ্যাঁ গা, কত দুধ হবে বলো তো?'

গোলাপ-মা বলে দিল ঠিক-ঠিক।

'এ্যাঁ, এত দুধ।' চঞ্চল হয়ে উঠলেন ঠাকুর: 'তাই তো আমার পেটের অসুখ হয়। ডাকো, ডাকো—'

সারদা কাছে এল।

'কত দুধ?' প্রশ্ন করলেন ঠাকুর।

'কত আর! সামান্য—'

'তবে যে গোলাপ বলে, এত!'

'গোলাপ জানে না।' সারদা দৃঢ়স্বরে বললে, 'এখানকার মাপ গোলাপ জানবে কি! এখানকার ঘটিতে কত দুধ ধরে সে জানবে কি করে?' শান্ত করলে ঠাকুরকে।

তবু গোলাপ-মা টিপ্পনী কাটতে ছাড়ে না। সেদিন বলে দিলে, দু বাটি দুধ একত্র করা হয়েছে। এখানের এক বাটি, কালীঘরের এক বাটি।

এত? কী সর্বনাশ! ডাকো-ডাকো, জিগ্‌গেস করো।

সারদা কাছে আসতেই জিগ্‌গেস করলেন ঠাকুর, 'বাটিতে কত ধরে? ক-ছটাক ক-পো?'

সারদা উদাসীনের মত বললে, 'ক-ছটাক ক-পো অত জানিনে। দুধ খাবে, তা ক-ছটাকের ঘটি ক-পো, অত কেন? অত হিসেবে দরকার কি!'

সেদিন কেমন মনে হল ঠাকুরের এত দুধ হজম করতে পারবেন না। যেমনি ভাবলেন অমনি অসুখ হয়ে গেল। তখন গোলাপ-মার অনুতাপ। বললে, 'তা আমায় বলে দিতে হয়। আমি কি অত জানি? আমি ভাবলুম সত্যি কথা বলাই হয়তো ঠিক হবে।'

'খাওয়ার জন্যে মিথ্যে বললে দোষ নেই।' বললে সারদা। 'তাই দেখ না আমি ভুলিয়ে-টুলিয়ে খাওয়াই—'

'তা হলে দেখছি, মনেই সব।'

'নিশ্চয়। না বললে এমনি বেশ খেতেন, হজম করে ফেলতেন।'

খাইয়ে-টাইয়ে বেশ চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছে। মোটা হয়েছেন ঠাকুর। অসুখ সেরে

গিয়েছে। ভাত বেশি দেখলেই আঁৎকে ওঠেন। তাই টিপে-টিপে সরু করে দেয় সারদা। দু গ্রাস বেশি খান ঠাকুর এটুকুই তার অন্তরের ক্ষুধা। তিনি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন রোগজ্বালা না হয় এর বেশি আর তার কিছু চাইবার নেই।

তার 'সমর্থা রতি'। সে কৃষ্ণময়ী, কৃষ্ণগতজীবনা। কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী। এক-এক সময় তার সামনে এসে বলেন ঠাকুর, 'দেখ, তোমার হাতের রান্না খেয়ে কেমন আমার চেহারা ফিরেছে!'

সারদার চোখে তৃপ্তির অঞ্জন লাগে।

জয়রামবাটিতে বাঁড়ুজ্জেদের ভিটের সামনে ডোবায় কুচকুচে কালো কচু শাক হয়েছে। এক ভক্ত ছেলে তাই দেখে মনে-মনে ভাবলে কি বোকা এখানকার লোক-গুলো, এমন কচু শাক, খেতে জানে না। দুহাতে টেনে-টেনে অনেক সে শাক তুলল, এক বোঝা! পিঠে করে বয়ে নিয়ে গেল সে মা'র কাছে।

'কোথা পেলে?' জিগ্‌গেস করলেন মা।

'বাঁড়ুজ্জেদের ডোবায়।'

'জলের শাগ? ও তো খুব কুটকুটে। বোকা ছেলে। জোলো শাগ যে কুটকুটে হয় জানোনি? এদেশের লোক কচু শাগ খেতে জানে না—তাই না?'

লজ্জায় মাথা হেঁট করল ছেলে। মাথা হেঁট করলে কি হবে, ছেলের পিঠ ফুলে ঢাক হয়েছে, দুহাতেরও সেই দশা। তখন মা তেল নিয়ে এসে মালিশ করতে বসলেন। 'ফোলা কুটকুটুনিকে ভয় করিনে মা,' বললে ছেলে, 'কিন্তু আপনাকে যে বিব্রত হতে হয়েছে এ দুঃখ আমার যাবে না।'

মালিশ শেষ করে মা বললেন, 'তেলটা আগে শুকুগ। এখুনি যেন নাইতে যেও না। জল লাগলে আবার কুটকুট করবে।'

নিজের দুহাতে তেল মেখে মা বঁটি পেতে শাক কুটতে বসলেন। ওমা, রান্না হবে নাকি এ শাক? তোমার এত সাধ হয়েছে খেতে, দেখ না খেয়ে। খাবার সময় অনেকটা শাক দিলেন ছেলেকে। অতি চমৎকার স্বাদ। একটুও কুটকুট করছে না। মা বললেন, 'তিনবার তেঁতুল দিয়ে সেদ্ধ করে জল ফেলে নিংড়েছি, চার বারের বার রেঁধেছি।'

যতদিন চন্দ্রমণি জীবিত ছিলেন ঠাকুর নহবতে এসে খেয়েছেন। চন্দ্রমণি গত হলে ঠাকুর বললেন, আমি আমার ঘরে বসে খাব। তাই সই। সারদা থালা-বাটিতে খাবার সাজিয়ে নিয়ে যায় ঠাকুরের ঘরে। সারা দিনমানে এই তার ঠাকুরকে একটু দেখা। ঘোমটা টেনে কাছে এসে বসে। সারা দিনমানে এই তার ঠাকুরের পাশে একটু বসা। এটা-ওটা ঘরোয়া কথা কয়, ঠাকুরের মনকে হালকা কথায় ভুলিয়ে রাখে যাতে না ভাবের আবেশে সমাধি-ভূমিতে উঠে যান হঠাৎ। সারা দিনমানে এই তার ঠাকুরের সঙ্গে একটু কথা বলা।

ঠাকুরকে খাইয়ে নহবতখানায় ফিরে এসে পান সাজে সারদা। পান সাজবার সময় গান গায় গুনগুনিয়ে। নীলকণ্ঠের সেই গানটি তার বড় প্রিয়। 'ও প্রেম রত্নধন রাখতে হয় অতি যতনে।'

'আহা নীলকণ্ঠের গান কি চমৎকার।' বললেন মা অতীতের কথা বলতে গিয়ে:

'ঠাকুর বড় ভালোবাসতেন। ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন মাঝে-মাঝে তাঁর কাছে আসত নীলকণ্ঠ। গান গেয়ে শোনাত। কি-আনন্দেই তখন ছিলাম! দক্ষিণেশ্বরে যেন আনন্দের হাটবাজার বসে যেত।

একদিন লক্ষ্মীর সঙ্গে গান গাইছে সারদা। মৃদু কণ্ঠের আরম্ভ, কিন্তু ক্রমে জমে গিয়ে স্বর গাঢ় হয়ে উঠেছে। ঠাকুর শুনতে পেয়েছেন। পর দিন সকালে এসে বলছেন, 'কাল যে তোমাদের খুব গান হচ্ছিল। তা বেশ, বেশ, ভালো।'

কী লজ্জা, ঠাকুর শুনতে পেয়েছেন নাকি? যে আনন্দগানটি মনের মধ্যে অব্যক্ত হয়ে আছে তা-ও শুনতে পান নিশ্চয়ই।

দু রকম করে পান সাজে সারদা। কতগুলো এলাচ-মশলা দিয়ে কতগুলো বা খালি চুন-শুপুরি দিয়ে। যোগেন-মা জিগ্গেস করলে, তার মানে?

'যোগেন, ভালোগুলো ভক্তদের—ওদের আমাকে আদর-যত্ন করে আপনার করে নিতে হবে কিনা, তাই। আর এগুলো, মন্দগুলো, ওঁর জন্যে। উনি তো আপনার জন আছেনই।'

যে আপনার জন সে এমনিতেই সুস্বাদু।

ছেলেরা কেউ না থাকলে স্নানের সময় সারদা তেল মাখিয়ে দেয় ঠাকুরকে। কাঁচের উপর রোদ পড়লে যেমন ঝিলিক দেয় তেমনি জ্যোতি বেরোয় ঠাকুরের গা থেকে। হরতেলের মত রঙ, সোনার ইষ্টকবচের সঙ্গে গায়ের রঙ মিশে যাচ্ছে। গোড়ায়-গোড়ায় সাত-তাওয়ার আগুন জ্বলেছে গায়ে। সে আগুনের তাত সারদাই শুধু সইতে পেরেছে।

'শেষে সে রঙ আর ছিল না, সে শরীরও ছিল না।' বলছেন ভক্ত-মেয়েদের, 'এই আমাকেই দেখ না! এখন কেমন রঙ হয়েছে, কেমন শরীর হয়েছে। আগে আমার কি এই রকম রঙ ছিল? আগে খুব সুন্দর ছিলুম। এতটা মোটা ছিলুম না—'

কোত্থেকে সেদিন গোলাপ-মা এসে সারদার হাত থেকে ভাতের থালা কেড়ে নিলে। কেড়ে নিয়ে ধরে দিয়ে এল ঠাকুরের কাছে। হাঁ-না কিছু বলতে পারল না সারদা। ভাতের থালা ছেড়ে দিল।

বড় শোকা-তাপা মানুষ এই গোলাপ-মা। চণ্ডী বলে একটি মেয়ে, পাথুরে-ঘাটায় ঠাকুরবাড়িতে বিয়ে দিয়েছিল। অকালে মরে গেল সেই মেয়ে, পাগলের মত হয়ে গেল গোলাপ-মা। পড়ল এসে ঠাকুরের পায়ে। সেই থেকে ঠাকুরের আশ্রিত। 'তুমি ওকে খুব পেট ভরে খেতে দেবে।' সারদাকে উপদেশ দিয়েছেন ঠাকুর: 'পেটে অন্ন পড়লে শোক কমে।'

হাতের লক্ষ্য হয়ে রয়েছে সারদার পাশে-পাশে। সে যদি হাতের থেকে থালা তুলে নেয়, কি করতে পারে সারদা? কিন্তু এমন হবে কে জানত! সেই থেকে গোলাপ-মাই ভাতের থালা নিয়ে যাচ্ছে ঠাকুরের কাছে। দুবেলা খাওয়াচ্ছে পাশে বসে। সারা দিনে ঐ একটু ঠাকুরকে দেখবার সুযোগ ছিল। ঐ একটু পাশে বসবার, ঘরোয়া দুটি কথা কইবার। সে অধিকারটুকু থেকেও সে বঞ্চিত হল।

আরো একদিন অমনি অতর্কিতে তার হাতের থেকে থালা টেনে নিয়ে গিয়েছিল আরেকজন। আরেক মেয়ে। ঠাকুরের ঘরে থালা-হাতে ঢুকতে যাচ্ছে সারদা, কোত্থেকে

সে মেয়ে এসে বললে, আমায় দাও না মা, আমি নিয়ে যাচ্ছি। তার প্রসারিত হাতে অমনি ছেড়ে দিল ভাতের থালা। ঠাকুরের সামনে ধরে দিয়ে পালিয়ে গেল মেয়ে।

সারদা কাছে বসল। মৃদু-মৃদু হাওয়া করতে লাগল।

ঠাকুর বললেন, 'আমি খেতে পাচ্ছি না। জানো না ও কে?'

সারদা জানে, মেয়েটা ভালো নয়। বললে, 'জানি।'

'তবে আমার খাবার নিজে না এনে ওর হাতে দিলে কেন? ওর ছোঁয়া আমি খাই কি করে?'

'আজকে খাও।' সারদা মিনতি করতে লাগল।

'তবে বলো, আমার খাবার আর কোনো দিন আর কারু হাতে দেবে না।' ঠাকুর তর্জন করলেন।

হাতের পাখাটি রেখে দিল এক পাশে। হাত জোড় করল সারদা। বললে, 'সেটি আমি পারবোনি। কেউ আমার কাছে মা বলে চাইবে আর আমি তা দেব না এমনটি হবেনি কখনো। তুমি তো খালি আমার একলার ঠাকুর নও, তুমি সকলের। তবে, তুমি যখন বলছ, তোমার খাবার আমিই নিজে আনবার চেষ্টা করব।'

ঠাকুর তখন খুশি হয়ে খেতে লাগলেন।

কই সারদাকে তো আর ডাকছেন না ভাত আনতে। কি সহজেই এই সর্বশেষ অধিকারটুকুও হারিয়ে বসল সারদা।

তবু অভিযোগ নেই, কাতরতা নেই। বরং ভাবে, ঠাকুর কি আমার একলার? ঠাকুর সকলের।

একবেলা নয়, দুবেলাই ভাত নিয়ে যায় গোলাপ-মা। নিচ্ছে তো নিক কিন্তু এমন জগৎজোড়া গল্প জুড়ে দিয়েছে, নহবতে ফেরবার আর নাম নেই। সন্ধ্যায় গিয়ে ফিরতে-ফিরতে সেই দশটা। গোলাপ-মা ফিরে এলে পরে খাবে সারদা। তার খাবার আগলে নহবতের বারান্দায় বসে থাকতে হয়। একদিন, শুধু একদিন নালিশ করে ফেললে: 'খাবার বিড়াল-কুকুরে খায় খাক, আমি আর আগলাতে পারবোনি।'

গোলাপ-মা শুনতে পায়নি, কিন্তু ঠাকুর শুনেছেন। বললেন, 'এতক্ষণ থেকো না। ওর কষ্ট হয়।'

গোলাপ-মা নিজের আনন্দে ডগমগ, পরের কষ্ট বোঝবার তার সময় নেই। সে উলটে বললে, 'না, মা আমাকে খুব ভালোবাসে। মেয়ের মত ডাকে আমার নাম ধরে।'

রান্নাটি ভালো হয়েছে এ কথাটুকুও আর শুনি না। সূক্ষ্মতম আস্বাদের যে একটি সেতু ছিল তাও অপসৃত হল। এবার পূর্ণতম বিচ্ছেদ, পূর্ণতম পরিপ্রাপ্তি।

দরমার বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে সারদা। কোথায় ছোট একটি গর্ত হয়েছে তার উপর চোখ রেখে। তৃষিত চাতকের চোখ। আর মনকে সান্ত্বনা দেয়, মন, তুই কি এত ভাগ্য করেছিস যে রোজ তাঁর দেখা পাবি?

জ্বালা নয়, নিন্দা নয়, বিদ্রোহ নয়। শুধু চেয়ে থাকা। শুধু প্রতীক্ষা, শুধু সমর্পণ।

বেড়ার গর্ত কখন একটু বড় হয়েছে বুঝি!

তাই দেখে ঠাকুর পরিহাস করেন। রামলালকে ডেকে বলেন, 'ওরে রামলাল, তোর খুড়ির পর্দা যে ফাঁক হয়ে গেল।'

* তেরো *

দুপুর আর কাটে না সারদার। সারা সকালের রান্না-বাড়া কেমন একটা ছন্দপতনে এসে শেষ হয়। যার জন্যে রান্না তাকে কাছে বসিয়ে খাওয়ানো যায় না। এ যেন ফুলটি ঠিক তুললুম অথচ দিতে পারলুম না অঞ্জলি। যার জন্যে সাজলুম-গুজলুম সেই দেখল না!

একটা-দুটো নাগাদ চারটি মুখে তোলে। তারপর একটু গড়িয়ে নেয়। তিনটে বাজলে একটু রোদের জন্যে তাকায় ইতি-উতি। কোনোদিন মেলে, কোনোদিন মেলে না। মিললে শুকিয়ে নেয় কেশভার। যত কেশ তত রোদ নেই। বিকেলে যোগেন-মা আসে চুল বাঁধতে। আকাশের রোদ বাঁধতে পারি কিন্তু এ কেশদাম বাঁধব কি দিয়ে? তারপর ঝাঁট দেয়, লণ্ঠন সাফ করে, ঠিক করে রাতের রান্না। সন্ধে দেয়, ধ্যানে বসে। তারপরে আবার রান্না, আবার সেই নিজেকে নেপথ্যে রেখে থালা পাঠিয়ে দেওয়া। তারপর কখন দুটি মুখে গোঁজা, আঁচল বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়া।

এতেও কি শান্তি আছে? কলকাতা থেকে স্ত্রী-ভক্তরা আসে ভিড় করে। কেউ-কেউ বা বায়না ধরে রাতখানা এখানেই কাটিয়ে যাবে। তখন সারদার নহবত ছাড়া আর কোথায় তাদের আশ্রয়? তবে ভাব থাকলে তেঁতুলপাতায় শোয়া যায়। সবাইকে তাই নিজের স্নেহবেষ্টনীতে টেনে নেয় সারদা। দুশ্চরচারিণী হয়েও অভিলষিত-দায়িনী জগন্মাতা। সর্বকামদুঘা পৃথিবী। এবার একটি স্থায়ী বাসিন্দে নিয়ে এলেন ঠাকুর। নহবতের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ডাকলেন সারদাকে। কিন্তু কী আশ্চর্য সম্বোধন!

'ব্রহ্মময়ি, ওগো ব্রহ্মময়ি—' ডাকলেন ঠাকুর। বললেন, 'একজন সঙ্গিনী চেয়েছিলে, এই নাও, একজন সঙ্গিনী এল।'

এই সেই গৌরদাসী! 'যে বড় হয় সে একটিই হয়, তার সঙ্গে অন্যের তুলনা হয় না।' যাকে লক্ষ্য করে পরে বলেছেন শ্রীমা।

রামেশ্বর থেকে ফেরবার সময় মাকে জিগগেস করল মেয়েরা। 'কি রকম সেখানে দেখে এলেন বলুন।'

'আমাকে তারা লেকচার দিতে বললে। আমি বললুম, আমি লেকচার দিতে জানি না। যদি গৌরদাসী আসত সে দিত।'

'মেয়ে যদি সন্ন্যাসী হয়,' বললেন ঠাকুর, 'সে কখনো মেয়ে নয়। সে পুরুষ। যেমন আমাদের গৌরদাসী।'

খাঁটি কথা। সায় দেন শ্রীমা। ওর মত কটা পুরুষ ভূভারতে? ত্যাগে আর তেজে জ্যোতিরাত্মা। নহবতের ঝাঁপড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে সেদিন একটি অপূর্ব সংলাপ শুনল সারদা।

'দ্যাখ গৌরি,' ঠাকুর বলছেন গৌরদাসীকে, 'আমি জল ঢালছি, তুই কাদা চটকা।'

বকুলতলায় ফুল কুড়োচ্ছিল গৌরদাসী। চোখ তুলে বললে, 'এখানে কাদা কোথায় যে চটকাবো? সবই যে কাঁকর।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'আমি কি বললুম, আর তুই কি বুঝলি!' দেখতে-দেখতে গলার স্বর ভার হয়ে এল। 'এদেশের মায়েদের বড় দুঃখু, তুই তাদের মধ্যে কাজ কর।'

মাথা ঝাঁকালো গৌরদাসী। বললে, 'রক্ষে করো, সংসারী লোকের সঙ্গে আমার পোষাবে না। বরং আমাকে কতগুলো মেয়ে দাও, তাদের হিমালয়ে নিয়ে গিয়ে মানুষ গড়ে দিচ্ছি।'

ঠাকুর গম্ভীর হলেন। বললেন, 'না গো না, এই টাউনে বসে কাজ করতে হবে। সাধনভজন ঢের করেছিস এবার এই তপস্যা-পোরা জীবনটা মায়েদের সেবায় লাগা। ওদের বড় কষ্ট।'

মাঝে-মাঝে ব্রহ্মময়ীর কষ্টের খোঁজ নেন ঠাকুর। কিন্তু সারদা তো কষ্টধারিণী নয় সে কষ্টহারিণী।

একদিন গৌরদাসী এসে খবর দিলে, মা'র মাথা ধরেছে। শুনে অবধি ছটফট করতে লাগলেন ঠাকুর। রামলালকে ডেকে-ডেকে বলতে লাগলেন বারে-বারে, 'ও রামনেলো, তোর খুড়ির আবার মাথা ধরল কেন?'

মাসে কটি টাকা হাত-খরচ লাগতে পারে সারদার তার হিসেব করতে আসেন।

'ক টাকা হলে মাস-মাস চলে তোমার হাতখরচ?' জিগ্গেস করলেন ঠাকুর।

ওমা, এ কি কথা! লজ্জায় মুখ নামালো সারদা। কিন্তু ঠাকুর ছাড়বার পাত্র নন। প্রশ্ন যখন করা হয়েছে উত্তরটি চাই ঠিক-ঠিক।

'কত আবার!' পষ্টাপষ্টি বললে সারদা। 'এই পাঁচ-ছয় টাকা হলেই চলে যায়।'

স্বামীর তো মোটে সাতটি টাকা রোজগার। তাও ছুঁতে পারেন না। পুজো করা ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে টাকা গিয়ে জমছে সিন্দুকে। হৃদয়ের হেপাজতে। সে টাকা জমিয়েই তো তিনশো। সেই তিনশো থেকেই মা'র অলঙ্কার! যাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছেন তাকে আবার আভরণে উদ্ভাসিত করছেন। যাকে বিত্তবঞ্চিত করেছেন তারই হাতে গুঁজে দিচ্ছেন মাসোয়ারা। এ কি বনবাসে রাখা না কি মনোবাসে রাখা?

ঠাকুর যতদিন বেঁচে ছিলেন ঐ সাতটা টাকা মাকে দিতেন ত্রৈলোক্য। মথুরের ছেলে ত্রৈলোক্য। কিন্তু ঠাকুরের দেহ যাবার পর ঐ টাকাটা দীনু খাজাঞ্চি বন্ধ করে দিলে। ত্রৈলোক্যের আত্মীয়েরা সমর্থন করলে দীনুকে। মা তখন বৃন্দাবনে। চিঠি গেল। তিনি লিখলেন, 'বন্ধ করেছে তো করুক, এমন ঠাকুরই চলে গেছেন, টাকা নিয়ে আমি আর কি করবো!'

নরেন কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। ঐ সাত টাকার জন্যে অনেক সে দরবার করলে, অনেক হুলুস্থুল। 'মায়ের ও টাকাটা বন্ধ কোরো না।' তুললে সিংহনাদ। কিন্তু ওরা কান পাতল না কিছুতেই। বন্ধ করল তো করলই। মাকে ঐটুকু থেকে বঞ্চনা করতে পারলেই যেন ভাণ্ডার সঞ্চীয়মান হয়ে উঠবে।

'তা দেখ, ঠাকুরের ইচ্ছায় অমন কত সাত গণ্ডা এল-গেল !' বলছেন শ্রীমা। 'দীনু, ফীনু সব কে কোথায় চলে গেছে ! আমার তো এ পর্যন্ত কোনো কষ্টই হয়নি। কেনই বা হবে ! ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, আমার চিন্তা যে করে সে কখনো খাওয়ার কষ্ট পায় না।'

যেন ঐ একমাত্র কষ্ট ! যখন দু বেলা দু মুঠো শুধু অন্ন জুটছে, আর তবে কষ্ট কি সংসারে ! অপ্রকট হবার আগে ঠাকুর বললেন, তুমি কামারপুকুরে যাবে আর শাক-ভাত খাবে।

সত্যি-সত্যি শাক-ভাত খেতেন মা। নুন জোটেনি এক কণা। তাইতেই অপরিসীম তৃপ্তি। স্বাদলাবণ্যময় সমস্ত অন্নব্যঞ্জন।

কোনোরকমে শরীরধারণ করা নিয়ে কথা। শরীরধারণ হরির-কারণ। শরীর রাখা মানে হরিনাম করবার সুযোগ পাওয়া। ঈশ্বরের ঐকতান-বাদনসভায় একটি সহযোগী যন্ত্র হওয়া।

গৌরদাসীর মা'র নাম গিরিবালা। ঠাকুরের দিকেই তার টান বেশি, মা'র দিকে লক্ষ্য নেই। মেয়ে পীড়াপীড়ি করে : 'নবতখানায় আমার মাকে একবার দেখে আসবে চলো।'

গিরিবালা বিরক্ত হন। বলেন, 'তোদের ভেতর এখনো অনেক অভাব আছে। তাই এদিক-ওদিক তাকাতে হয়। আমার হৃদয়ে স্বয়ং ত্রিপুরেশ্বরী বিরাজ করছেন, আমার আর কারু প্রয়োজন নেই।'

'ভাগ্য নেই, তাই বলো।' টিপ্পনি কাটে গৌরদাসী।

একদিন কিন্তু জোর করেই গিরিবালাকে টেনে নিয়ে গেল নহবতখানায়। 'দেখ-দেখ মা আমার গৃহকর্ম করছেন—' গৌরদাসী বললে উচ্ছল হয়ে।

হাসিমুখে কাছে এসে দাঁড়াল সারদা।

'এ্যাঁ, মা, তুমি ? তুমি ! এ যে আমার সেই।' পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল গিরিবালা। ধুলো নিয়ে মাখতে লাগল বুকে-কপালে।

'কি হয়েছে গো, অমন কচ্ছ কেন ?' সরলা বালিকার মত তরল চোখে তাকিয়ে রইল সারদা।

'হবে আবার কি ! যা হবার তাই হয়েছে !' রোক করে বললে গৌরদাসী।

ব্রহ্মময়ী রাতে কখানা রুটি খান তারও খোঁজ নিতে আসেন ঠাকুর।

'হ্যাঁ গা, রাতে কখানা রুটি খাও ?'

লজ্জায় মুছে যেতে চাইল সারদা। ওমা, এ কী প্রশ্ন ! কিন্তু উত্তর না দিয়ে সে পার পাবে না। তাই বললে মুখ নামিয়ে, পাঁচ-ছখানা।

আর কি চাই ! থাকো এবার গিয়ে খাঁচার মধ্যে। পাঁচ-ছখানা করে রুটি, পাঁচ-ছটাকা করে হাত-খরচ আর হাতে-গায়ে কিছু গয়না। যথেষ্ট হয়েছে। তৃপ্তির আকাশে ওড়ো এবার অসীমের নীল পাখি।

তাও গয়না কখানা পরবার কি জো আছে ! লোকের চোখ টাটায় !

গোলাপ-মা এসে বললে, 'মনোমোহনের মা সেদিন কি বলছিল জানো ?'

সারদা তাকাল কৌতূহলী হয়ে।

'বলছিল, ঠাকুর অত বড় ত্যাগী, আর মা এই মাকড়ি-টাকড়ি এত গয়না পরেন, এ কি ভালো দেখায় ?'

পরদিন সকালে যোগেন-মা এসে দেখে, হাতে দুগাছি বালা ছাড়া আর কোনো গয়না নেই মা'র গায়ে। মা, একি ? এ কি করেছ ?

'বা, গোলাপ যে বললে—'

'বলুক গে। অন্তত মাকড়ি আর এ সামান্য কটা গয়না তোমার গায়ে রাখো।'

শুনল আবার যোগেন-মা'র অনুরোধ ! কি হবে আমার গয়না দিয়ে ! চিত্ত কি বিত্তে তর্পণীয় ? আমার এ অলঙ্কার তো অহঙ্কারের বিজ্ঞাপন নয়, আমার চিরসাধব্যের ঘোষণা। আমার আয়তির দীপবর্তি।

স্বামী-স্ত্রী দুজন এসেছে মা'র কাছে। স্ত্রীটির কপালে সিঁদুর নেই। মেয়ে-ভক্তেরা চঞ্চল হয়ে উঠল। একজন বললেন, 'হ্যাঁ গা, তোমার কপালে সিঁদুর নেই কেন ?'

মহিলাটি অপ্রস্তুত হবে তাই তাকে বাঁচিয়ে দিলেন শ্রীমা। বললেন, 'তা আর কি হয়েছে ! ওর এমন স্বামী সঙ্গে, নাই বা পরেছে সিঁদুর।' বলে নিজে কৌটো খুলে সিঁদুর পরিয়ে দিলেন মেয়েটিকে। যে ঐশ্বর্য-চেতনাটি প্রচ্ছন্ন ছিল তা উল্লিখিত করে দিলেন।

দুটি পুরুষ-ভক্ত এসেছে মা'র কাছে। দুখানি কাপড় নিয়ে এসেছে। মা এসে দাঁড়াতেই কাপড় দুখানি তাঁর পায়ের কাছে রেখে তারা প্রণাম করলে।

আশীর্বাদ করলেন মা। বললেন, 'বাবা, তোমাদের অবস্থা খারাপ তোমাদের আবার কাপড় দেওয়া কেন ?'

একটু ক্ষুণ্ণ হল বুঝি ছেলে দুটি। বললে, 'মা, তোমার বড়লোক ছেলেরা তোমাকে দামী কাপড় দেয়। তোমার গরিব ছেলেরা এই মোটা কাপড়ের বেশি আর কি পাবে ! তুমি যদি তাই দয়া করে তুলে নাও তবেই আমরা কৃতার্থ।'

তক্ষুনি মা কাপড় দুখানি তুলে নিলেন হাতে করে। বললেন, 'বাবা, এই আমার গরদ ক্ষীরোদ নীরদ—'

সেই ব্রহ্মময়ীকে ঠাকুর কেন নির্বাসিতা করেছেন ? রাম যে সীতাকে বনবাসে পাঠিয়েছিল তার অন্তত একটা রাজনৈতিক যুক্তি ছিল। রাম নিজে জানত সীতা অপাপা, নিষ্কলঙ্কা, তবে যেহেতু প্রজারা বলাবলি করছে সেই হেতু তাকে রাজধানী থেকে দূরে রাখা দরকার। কিন্তু সারদার সম্বন্ধে তো কোনো ফিসফাস নেই, নেই কোনো কানাঘুষা। ও তো জ্যোৎস্নার চেয়ে নির্মল, গঙ্গাজলের চেয়ে পবিত্র। তবে ? ও কেন সামনে বেরুতে পারবে না, বসতে পারবে না কাছে এসে ? রাঁধতে পারবে অথচ পরিবেশন করতে পারবে না কেন ? ও কী করেছে ? কোন দোষে ও দোষী জিগগেস করি ?

ঠাকুরের দর্শনে কত মেয়ে-পুরুষ আসছে তখন দক্ষিণেশ্বরে। পুরুষেরা বসেছে মুক্ত আঙিনায়, মেয়েরা চিকের আড়ালে। ঠাকুরের তখন কত আশ্চর্য ভাবসমাধি, কত নাম-গান, কত হরি-সঙ্কীর্তন ! সহধর্মিণী বলে আলাদা কোনো খাতির-সুবিধা চাইনে, কিন্তু যেখানে পর্দা ফেলে পুরস্ত্রীরা বসেছে তাদের মাঝখানে বসবারও কি সারদার অধিকার ছিল না ? অসামান্যের আসন না পাক,

মাত্র সামান্যের অধিকার পাবে না ? স্ত্রী হয়েছে বলে কি সে এত অপাঙক্তেয় ? এত অকিঞ্চিৎকর ? যার রাজেন্দ্রাণী হয়ে সভা উজ্জ্বল করে বসবার কথা, সে থাকবে নহবতখানার অন্ধকারে, কাঙালিনীর মূর্তিতে ? কেন ?

আমরা যে মা'র কাঙাল সন্তান। ঐশ্বর্য-আরূঢ় দেখলে পাছে আমরা এগুতে না সাহস পাই তারই জন্যে ম্লান বেশ ধরেছেন। চোখে মেখেছেন মমতার মেদুরতা। পাছে আমাদের চিনতে না ভুল হয়। পাছে ঠিক চলে আসতে না পারি তাঁর কোলের কাছটিতে।

বিভূতি নিজের বাড়িতে তত পেট পুরে খায় না, যত মা'র কাছে বসে খায়। তাই দেখে তার গর্ভধারিণী মা অনুযোগ করছে : 'বিভূতি এখানে তো বেশ খায়, আমার ওখানে মাত্র এত কটি খায়।' মা অমনি ফোঁস করে উঠলেন : 'আমার ছেলেকে তুমি খুঁড়ো না। আমি ভিখারীর রমণী, আমার ছেলেদিকে আমি যা খেতে দিই, ছেলেরা আমার তাই আদর করে খায়।'

কতগুলি জবা ও গোলাপ ফুলের কুঁড়ি ভেজা নেকড়ায় বেঁধে নিয়ে এসেছে এক ভক্ত।

মা কাছে ডাকিয়ে নিলেন। বনদুর্গার মন্দিরে একবার এক সন্ন্যাসিনীকে দেখেছিল, মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল এ যেন সেই সন্ন্যাসিনী। চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল ও অশ্রুভরা চোখে দেখতে লাগল মাকে।

মা বললেন, 'বাবা, আমি তো যাকে-তাকে মন্ত্র দিই না।'

ভক্তের বুকে যেন তপ্ত লোহার স্পর্শ লাগল। মনে-মনে বললে, তুমি অনাথের নাথ তাতে দোষ নেই, আমার পদবীতে কৌলীন্য নেই বলে আমার যত দোষ।

'তোমাদের তো কুলগুরু আছে, তার কাছ থেকে দীক্ষা নাও গে যাও।'

নিরালম্ব দুর্বলের মত ভক্তটি চলে যাচ্ছে নিচে। যেতে কি পারে ! চোখের জলে সিঁড়িগুলি ঝাপসা হয়ে গেছে। কে ডাকল ভক্তকে। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, এক ব্রহ্মচারী। আপনাকে মা ডাকছেন।

আমরাই শুধু মাকে ডাকি না। মাও আমাদের ডাকেন।

নম্রমুখে জোড়হাতে মা'র দরবারে দাঁড়ল এসে ভক্ত। মা বলে উঠলেন, 'এস বাবা এস, বোসো এই আসনে। তোমরা কৃষ্ণমন্ত্রী, তাই না ? এস দীক্ষাটা দিয়ে দি—'

ঠাকুরের চেয়ে মাকে বেশি ভালোবাসে গৌরদাসী। এটি যেন ঠিক বুঝতে পান ঠাকুর। তাই একদিন জিগ্গেস করলেন, 'হ্যাঁ রে, সত্যি বলবি ? তুই কাকে বেশি ভালোবাসিস ?'

গৌরদাসী গান গেয়ে জবাব দিলে :

'রাই হতে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী,
লোকের বিপদ হলে
ডাকে মধুসূদন বলে
তোমার বিপদ হলে পরে বাঁশিতে বলো রাইকিশোরী ॥'

সেই কৃষ্ণময়জীবিতা রাধিকা বন্দিনী আছেন নহবতে। তন্মনা হয়ে। অর্পিতচিত্তা হয়ে। তৃপ্তিময়ীর তিতিক্ষায়।

রামের তবু তো একটা কাণ্ডজ্ঞান ছিল। সীতার জন্যে বেছেছিল একটি মনোরম তপোবন। আর এ কী হতচ্ছাড়া জেলখানা। কুঠুরী না কোটর, গুহা না গর্ত! তারই বেড়ার ছিদ্রে চোখ রেখে দাঁড়ায় সেই কারাবাসিনী। সেই নীলকান্ত আকাশের দ্যুতিটি ধরতে চায়। আর মনকে প্রবোধ দেয়, মন, তুই কি এত ভাগ্য করেছিস যে রোজ তাঁর দেখা পাবি?

এ প্রবোধটি কার? যে সর্বাগ্রগণ্যা সহধর্মিণী, তার। এ সন্তোষটি কার? যে সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সমস্ত অলঙ্কার থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তার।

এ সান্ত্বনা, এ প্রার্থনা দেখেছি আর কোনো কাব্যে ধর্মে বা ইতিহাসে?

ব্যবধান যত দূর, বিরহ তত সহনীয়। কোথায় অযোধ্যা, কোথায় বাল্মীকির তপোবন! আর ঠাকুরের ঘর আর নহবতখানা মোটে পঞ্চাশ গজ তফাত। ঝাঁপড়ি সরিয়ে একটু—শুধু দুপা—বেরিয়ে পড়লেই দেখা যায় সেই পরমরমণীয়কে। সেই পরমধন পরশমণিকে। নবনীরদশ্যামগোপাল কৃষ্ণকে। সেই সাহ্লাদসতৃষ্ণনয়ন সচ্চিদানন্দবিগ্রহকে।

কিন্তু ডাক নেই। আমন্ত্রণ নেই। সারদা স্পর্শাসহা লজ্জাবতী লতা। আছে সঙ্কোচে সুষমা হয়ে। উদ্যোগ নেই শুধু প্রস্তুতি। আরম্ভ নেই শুধু প্রতীক্ষা। তার ধ্রুবা স্মৃতি। স্থির স্থিতি। স্থিত প্রজ্ঞা।

'আমি তো তবু চোখে দেখেছি। ছুঁয়েছি। সেবাযত্ন করেছি, রেঁধে খাওয়াতে পেরেছি, যখন বলেছেন যেতে পেরেছি কাছে, যখন বলেননি নামিইনি নবত থেকে। দূর থেকে যদি দৈবাৎ কখনো দেখতে পেয়েছি, পেন্নাম করেছি—' আনন্দে উদ্বেল হয়ে বলছেন শ্রীমা।

বিরহ তো নয় আনন্দের অম্বুনিধি, অদর্শন তো নয় অংগবিহীন আলিংগন।

* চৌদ্দ *

পানিহাটিতে উৎসব হচ্ছে। সবাই যাচ্ছে স্ত্রী-পুরুষ।

একজন স্ত্রী-ভক্ত জিগগেস করলে ঠাকুরকে: 'মা যাবেন আমাদের সংগে?' ঠাকুর উদাসীনের মত বললেন, 'ওর ইচ্ছা হয় তো চলুক।'

ইচ্ছা হয় তো চলুক। এ তো মন খুলে অনুমতি দেওয়া নয়। এ তো নয় আনন্দে আহ্বান করা। আমার যাওয়াটি যদি তাঁর কাম্য হত তবে সোল্লাসে বলে উঠতেন: 'বা, যাবে না? যাবে বৈকি।'

তেমন যখন ডাক নেই, দরকার নেই গিয়ে। স্ত্রী-ভক্তদের বললে সারদা, 'অনেক ভিড় হবে। অত ভিড়ে আমার দেখা হবে না কিছু। আমি যাব না।'

মুহূর্তে ইচ্ছাটুকু ত্যাগ করল সারদা। অভিমানের কুয়াশাটুকুও রইল না। স্বচ্ছ আকাশ প্রসন্ন রোদে ঝলমল করছে। আকাশ তো নয় মন। রোদ তো নয় নির্বাসনা।

ঠাকুর যখন ফিরছেন, বললেন, 'ও না গিয়ে ঠিকই করেছে। ও অশেষ বুদ্ধিমতী। ও বুঝেসুঝেই যায়নি, চায়নি যেতে।'

সবাই তাকালো মুখের দিকে।

'এমনিতে ভক্তের দল যখন সঙ্গে যায় তখন লোকেরা বলে. পরমহংসের ফৌজ চলেছে। এখন ও যদি সঙ্গে থাকত, বলত, ঐ দেখ হংস হংসী।'

কাকে না বিদ্রূপ করেছে ওরা ? কাকে না নিন্দে করেছে ? নিন্দা করতে দিয়ে ওদের আনন্দিত করছি। লোক না পোক !

কিন্তু হৃদয়কে একদিন শাসিয়েছিলেন ঠাকুর : 'তুই আমাকে হেনস্তা করছিস কর। কিন্তু ওকে, তোর মামীকে যেন করিসনে। আমার মধ্যে যে আছে সে যদি ফণা তোলে হয়তো বেঁচে-যেতে পারিস। কিন্তু ওর মধ্যে যে আছে সে যদি একবার মাথা তোলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও সাধ্য নেই তোকে বাঁচায়।'

একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আসে সারদার কাছে, নহবতের নিভৃতিতে। অনেকক্ষণ গল্প করে কাটিয়ে যায়। সেই কখন আসে ফিরে যেতে-যেতে বিকেল।

কি এত কথা ওর সঙ্গে ! বৃদ্ধাকে ঠাকুরের একদম পছন্দ নয়। এককালে জীবনের কাহিনী ওর মলিন ছিল, তারই জন্যে এই বিরাগ। একদিন সরাসরি ঠাকুর বললেন সারদাকে, 'আমার ইচ্ছে নয় ও আসে।'

এইখানেই যা একটু সংঘাত। কলঙ্কের সঙ্গে মাতৃস্নেহের। তুমি পিতা, কলঙ্কিনী কন্যাকে ত্যাগ করতে পারো, কিন্তু আমি মা আমি পারব না ত্যাগ করতে।

ও মা, যোগেন-মা'র তো চক্ষুস্থির, ঠাকুরের না করে দেবার পরও সেই বৃদ্ধা আসছে সারদার কাছে। শুধু তাই নয়। সারদাকে মা বলে ডাকছে। আর সারদা তাকে খেতে দিচ্ছে, আদর করে কথা কইছে। জীবনমরুর শেষ সীমানায় এসে ও কোথায় পাবে আর তৃষ্ণার পানীয় ? কোথায় আর শীতল তরুছায়া ? কে দেবে দুটি অমিয়মাখা আশ্বাসবাণী ?

ঠাকুর সব দেখলেন, টুঁ শব্দটি আর করলেন না। মা'র কাছে হার মানলেন। সেই হারেই মেনে নিলেন মা'র মাতৃত্বের গভীরতা।

তিনকড়ি আর তারাসুন্দরী মাঝে-মাঝে আসে মা'র কাছে। নাম-করা অভিনেত্রী। আসে মাকে প্রণাম করতে। মা অভয় দেন কিন্তু ওদেরই সঙ্কোচ। কিছুতেই পা স্পর্শ করবে না মা'র। ঠাকুরঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করবে। প্রণামের পর প্রসাদ দেন মা। কলাপাতা বা শালপাতায় করে বাইরে বসে প্রসাদ নেয়। নিজেরাই পাতা ফেলে দিয়ে আসে রাস্তায়, নিজেরাই গোবর দিয়ে এঁটো স্থান পরিষ্কার করে। মা পান নিয়ে আসেন। এমন আলগোছে পান নেয় যেন মা'র আঙুল না ছুঁয়ে ফেলে।

নিজেকে এমনি ভাবে দীনতায় নিয়ে আসা এ ভক্তি ছাড়া আর কি।

'এদেরই ঠিক-ঠিক ভক্তি।' বললেন একদিন শ্রীমা : 'যেটুকু ভগবানকে ডাকে সেটুকু একমনে ডাকে।'

সেদিন একা এসেছে তিনকড়ি। দোতলায় মা'র কাছে। বসেছে ঠাকুর-ঘরের বাইরে।

লক্ষ্মী বললে, 'একটা গান গাও।'

'আপনাদের কাছে আমি কি গাইতে পারি ?' তিনকড়ি মুখ নামাল।

'তাতে কি, গাও না—' স্বয়ং মা এবার অনুরোধ করলেন : 'সেই পাগলীর গানটা গাও না—'

তিনকড়ি ছায়ানটে গান ধরল।

'আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে
যেখানে যাই সে যায় পাছে, বলতে হয় না জোর করে ॥'

বেলা সাড়ে-নটা। যোগেন-মা কুটনো কুটছে। শরৎ মহারাজ কি লিখছেন বসে-বসে। অন্যান্য ভক্ত-কর্মীরা যে যার কাজে মশগুল। এমন সময় ভক্তি-রসের বান ডেকে এল। যেন সুরলোক থেকে নেমে এল সুরধুনী।

'আমি জানতে এলাম তাই
কে বলে রে আপনরতন নাই ?
সত্যি-মিথ্যে দেখ্‌না এসে, কচ্ছে কথা সোহাগ ভরে ॥'

শরৎ মহারাজের হাতের লেখনী স্তব্ধ হয়ে রইল। যে যেখানে ছিল ছুটে এল দোতলায়। যোগেন-মা কুটনো ফেলে উঠে এল, রাঁধুনে-বামুন রান্না ফেলে আর চাকর তার বাটনা ফেলে। ঠাকুরঘরে পা ছড়িয়ে বসে মা গান শুনছেন। সমস্ত বাড়িতে যেন আর হাঁটা-চলা নেই, সাড়া-শব্দ নেই। সমস্ত যেন নিঃশূন্য হয়ে গেছে —এমন সে স্তব্ধতা। আর সে স্তব্ধতার গুহামুখ থেকে বেরুচ্ছে স্বরস্রোত।

মা সমাসীন হয়েছেন সমাধিতে। বাহ্যজ্ঞান ফিরে পাবার পর আঁচলে চোখ মুছলেন। বললেন, 'আজ কি গানই শোনালি মা !'

তোর কণ্ঠে গান, চক্ষে অশ্রু, হৃদয়ে ভক্তি, তোকে আর পায় কে ! তোর কণ্ঠে সরস্বতীর করুণা, চক্ষে রাধিকার অশ্রু, হৃদয়ে দ্রৌপদীর ভক্তি—তোকে অবিদ্যা কে বলে !

সেদিন সত্যি-সত্যি এক পাগলী এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। প্রায়ই আসে। আসে ঠাকুরের সন্ধানে। বলে, আমি তোমার মধুরভাবের সাধনসঙ্গিনী। শুনে ঠাকুর বিরক্ত হন। সেদিন তো চটে-মটে তিরস্কার শুরু করে দিলেন। চাইলেন বার করে দিতে। নহবতখানার বন্দীশালা থেকে সব দেখল সারদা। সব শুনল। মনে হল পেটের মেয়েকে যেন তার মা'র সমুখে কে অপমান করলে।

'গোলাপ', গোলাপ-মাকে ডাকল সারদা : 'যাও তো, ওকে এখানে নিয়ে এস।' পরে বললে নিজে-নিজে : 'ও যদি কিছু অন্যায়ও বলে থাকে, আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেই তো হত। অমন ভাবে গালাগাল দেবার কী হয়েছিল !'

গোলাপ-মা নিয়ে এল পাগলীকে। সস্নেহে তাকে কাছে টেনে আনল সারদা। বললে, 'উনি যখন তোমাকে দেখতে পারেন না, তখন তুমি ওঁর কাছে যাও কেন ? তুমি আমার মেয়ে, তুমি আমার কাছে আসবে, কেমন ?'

ভক্তদের পাগলী-মামী, রাধুর-মা, সুরবালা সারাক্ষণই সেদিন গালাগাল দিচ্ছে শ্রীমাকে। সেসব কটূক্তি মা কানেও তুলছেন না। এককান দিয়ে ঢুকছে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ পাগলী বলে উঠল : 'সর্বনাশী।'

মা তখন রুখে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আমাকে আর যা বলো, সর্বনাশী বোলোনি। আমার জগৎ জুড়ে ছেলেরা রয়েছে, তাদের অকল্যাণ হবে।'

রাত্রে বাবুরামের চারখানা রুটি খাবার কথা। ঠাকুরের আদেশ। যার যেরকম ধাত তাকে সেই পরিমাণ রুটি খাবার সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন ঠাকুর। বাবুরামের বরাদ্দ চারখানা। লঘুবাশী হতে পারলেই রাত্রির ধ্যান ভালো জমবে।

'কখানা করে রুটি খাচ্ছিস রে বাবুরাম?' একদিন ঠাকুর জিগ্গেস করলেন হাঁক দিয়ে।

বাবুরাম মুখ লুকোল। বললে, 'পাঁচ-ছখানা।'

'কেন, বেশি হচ্ছে কেন?' ঠাকুরের কণ্ঠে শাসনের তর্জন।

'তার আমি কি জানি! মা দেন তাই খাই।'

মা দেন! জবাবদিহি নিতে তক্ষুনি এসে হাজির হলেন নহবতে। বললেন, 'তুমি কি বেশি-বেশি খাইয়ে ছেলেগুলোর আখের মাটি করবে?'

সারদা হাসল মুগ্ধা জননীর মত। তার নেত্রামৃতচ্ছটায় সমস্ত দিকদেশ প্রসন্ন হয়ে উঠল। সে বললে, 'সামান্য দুখানা রুটি বেশি খেয়েছে বলে তোমার ভাবনা! তোমার ভাবতে হবে না। ছেলেদের ভাবনা আমি ভাবব, আমাকে ভাবতে দাও। দুখানা রুটি বেশি খেয়েছে বলে আমার ছেলেকে তুমি বোকো না।'

বরাভয়করার কাছে যেন আশ্বাস পেলেন ঠাকুর। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা প্রহসন এমনি একটা ভাব করে উচ্চরোলে হেসে উঠলেন।

মা আবার টেক্কা দিলেন ঠাকুরকে।

লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী এসে দেখলে ঠাকুরের বিছানা ময়লা। বললে, 'আমি দশ হাজার টাকা লিখে দেব, তার সুদে তোমার সেবা চলবে।'

যেন মাথায় কে লাঠির বাড়ি মারল, ঠাকুর অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে বললেন মাড়োয়ারীকে, 'অমন কথা মুখে বোলো না। যদি বলো তা হলে আর এস না এখানে।'

মাড়োয়ারী তাকিয়ে রইল হাঁ করে। অকারণে দশ হাজার টাকা কেউ ফিরিয়ে দিতে পারে এ তার ধারণার বাইরে।

'আমার টাকা ছোঁবার জো নেই, কাছেও রাখবার জো নেই। ও তুমি ফিরিয়ে নাও।'

মাড়োয়ারীর বড় সূক্ষ্ম বুদ্ধি। বললে, 'তা হলে এখনো আপনার ত্যাজ্য-গ্রাহ্য আছে? তবে এখনো আপনার জ্ঞান হয়নি?'

ঠাকুর দীনভাবে হেসে বললেন, 'তা বাপু এত দূর হয়নি—'

তখন মাড়োয়ারী ঠিক করলে, হৃদয়ের কাছে দিয়ে যাই।

'খবরদার!' শাসিয়ে উঠলেন ঠাকুর: 'ওকে দিলে আমাকেই টাকার তদারক করতে হবে। একে দে ওকে দে; একে দিলি কেন ওকে দিলি কেন ও সব নানা হ্যাংগামা পোয়াতে হবে একটানা। কথা না শুনলে রাগ হবে। রাগের থেকেই বুদ্ধিভ্রংশ। ও দরকার নেই বাপু, ও তুমি ফিরিয়ে নাও। টাকা কাছে থাকলেই খারাপ। আরশির কাছে যদি জিনিসের বাধা থাকে তা হলে পড়ে না প্রতিবিম্ব।'

মাড়োয়ারী তখনও দোনামনা করছে। তখন ঠাকুর ভাবলেন একটা পরীক্ষা করা যাক। নহবতখানায় পাঠানো যাক সারদার কাছে! তার যদি দরকার হয় সে নিক, সে রাখুক।

বললেন মাড়োয়ারীকে, 'যদি নেয় তো নবতখানায় দিয়ে এস।'

কার পরীক্ষা নিচ্ছেন ঠাকুর? ঠাকুর জানেন না নহবতখানায় কে বসে? নির্লেপময়ী নিত্যানন্দা বৈরাগিনী! সর্বাতীতা সদানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিণী!

খবর পৌঁছল সারদার কাছে, মাড়োয়ারী তার জন্যে দশ হাজার টাকার পুঁটলি বেঁধে এনেছে। গভীর নম্রতার সঙ্গে বললে সারদা, 'যা তিনি নিতে পারেননি তা আমি নিই কিসে? আমার নেওয়া যে তাঁরই নেওয়া হবে। ঐ টাকা যখন তাঁর সেবায় লাগাব তখন তো তাঁরই নেওয়া হল।'

খবর পৌঁছল ঠাকুরের কাছে। প্রত্যাখ্যান করেছে সারদা।

বড় খুশি হলেন ঠাকুর। ও আমি জানতুম। ও কি যে-সে? ও মহাবুদ্ধিমতী। ও আমার শক্তি। ও আমার অন্তর্যামিনী ইচ্ছা।

তবু পয়সা-কড়ি সারদাই এক-আধটু নাড়াচাড়া করে। ঠাকুরের চারটি পয়সা দরকার হলে আগ বাড়িয়ে রেখে দেয় চৌকাঠের ওধারে। ঠাকুর টাকা পয়সা ছুঁতে পারেন না, যেন হঠাৎ শিং মাছের কাঁটা ফুটেছে এমনি ব্যথায় টনটন করে হাত, বেঁকে যায়, কিন্তু সারদার ওসব কিছুই হয় না। টাকা-পয়সা হাতে পড়ামাত্র সে নিজের মাথায় এনে ঠেকায়। লোককে দেবার সময়ও তাই। আগে নমস্কারটি সেরে পরে উৎসর্গ করে।

তোমাদের মধ্যে কেন এই তারতম্য?

মা সলজ্জ হাসি হেসে বললেন, 'ঠাকুর আর আমি! আমি যে তাঁর ঘরণী— আমায় যে তিনি সোনার গয়নাও পরিয়েছেন।'

আমার সব সয়, আমি যে সর্বংসহা বসুন্ধরা। মহাপ্রাণরূপিণী মহতী স্থিতিশক্তি।

ঠাকুর তখন অপ্রকট হয়েছেন, রাধিরা সব ঘাড়ে পড়েছে, মা'র তখন টাকা-পয়সার দরকার। কিন্তু হাত একেবারে শূন্য। কলকাতা থেকে শরৎ মহারাজ লিখেছেন, যোগাড়যন্ত্র করে টাকা পাঠাতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। 'তা হলে আমার শরতের হাতেও টাকা নেই, নইলে সে অমন কথা লিখবে কেন?' মা কাতরনয়নে তাকালেন ঠাকুরের দিকে। 'ঠাকুর, তোমার শেষ আদেশটি কি রাখতে পারব না? রাধি, তোর জন্যে আমি সব খোয়াতে বসেছি। ঠাকুর বলেছিলেন, কারু কাছে একটি পয়সার জন্যেও চিৎ-হাত কোরো না, তোমার মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না। একটি পয়সার জন্যে যদি কারু কাছে হাত পাতো, তবে তার কাছে মাথাটি কেনা হয়ে থাকবে। বরং পরভাতা ভালো পরঘোরো ভালো নয়। তোমাকে ভক্তেরা যে যেখানেই নিজেদের বাড়িতে আদর করে রাখুক না কেন, কামারপুকুরের নিজের ঘরখানি কখনো নষ্ট কোরো না।'

মা গো, তুমি বড় না ঠাকুর বড়?

মা'র হাতে এক ভক্ত-স্ত্রী কতগুলো ফুল এনে দিল। তা দেখে মা'র মহা

আনন্দ ! অমনি সাজাতে বসলেন ঠাকুরকে। ঠাকুরকে মানে ঠাকুরের ছবিকে। ঘট-পট ছায়া-কায়া সব সমান।

'ফুল না হলে কি ঠাকুর মানায় !' মা বলছেন গদগদ হয়ে।

কতগুলি আবার নীল রঙের ফুল ! আহা, কি সুন্দর ! দেখছ কি রঙ ! আশ্চর্য !

পুরোনো কথায় চলে গেলেন মা, বললেন, 'আশা বলে একটি মেয়ে আসত দক্ষিণেশ্বরে। কালো-কালো পাতা একটি গাছ থেকে সুন্দর একটি লাল ফুল তুলে এনেছে সেদিন। বলছে, এ্যাঁ, এমন লাল ফুল তার এমন কালো পাতা ! ঠাকুর, তোমার এ কি সৃষ্টি ! বলছে আর হাউ-হাউ করে কাঁদছে। সবাই তো অবাক। ঠাকুর বলছেন, তোর হল কি গো, কাঁদছিস কেন ? তা কেন কাঁদছে কি বলবে। অনেক কথা বলে বুঝিয়ে ঠাকুর তখন তাকে ঠাণ্ডা করলেন। বলো দেখি, ছিস্টি-ছাড়া ফুলের জন্যে ছিস্টিছাড়া কান্না !'

অঞ্জলি-অঞ্জলি নীল ফুল ঠাকুরকে দিতে লাগলেন মা, কিন্তু প্রথমবারেই কয়েকটি ফুল অতর্কিতে নিজের পায়ে পড়ে গেল !

'ওমা, আগেই আমার পায়ে পড়ে গেল !' মা যেন একটু অপ্রতিভ হলেন।

স্ত্রী-ভক্তটি বললেন, 'তা বেশ হয়েছে। তোমার কাছে ঠাকুর বড় হলেও আমাদের কাছে তোমরা দুই-ই এক।'

মাগো, ঠাকুর বড় না তুমি বড় ?

'ছি, অমন কথা বলতে হয় ?' মা কথাটা চাপা দিলেন। পরে রঙ্গ করবার জন্যে শুধোলেন, 'তোমার কি মনে হয় ?'

ভক্ত বললে, 'তুমি বড়। মহাদেব তো শুয়ে আর কালী মহাদেবের উপর দাঁড়িয়ে। কালী বড়।'

মা মৃদু হাসলেন। বললেন, 'তুমি ঐ নিয়ে থাকো ! বোকা ছেলে ! আমি যে তাঁর দাসী।'

* পনেরো *

'দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস।'

'হ্যাঁ, তাই দিলুম।'

ওমা, তুমি লক্ষ্মী নয় ? দরজার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসেছিলেন ঠাকুর, কিংবা হয়তো উন্মনা ছিলেন, ঠিক-ঠিক লক্ষ্য করেননি কে ঘরে ঢুকল ! এমন সময় খাবার নিয়ে আসবার কথা, ভেবেছিলেন লক্ষ্মীই বুঝি এসেছে। 'কিছু মনে কোরো না।' অনুতাপে কুণ্ঠিত হলেন ঠাকুর : 'লক্ষ্মী ভেবে তুই বলে ফেলেছি।'

'তাতে কি হয়েছে !' বললে সারদা, 'ওতে মনে করবার কিছু নেই।'

সারারাত ঘুম হল না ঠাকুরের। পরদিন সকালে নহবতখানার দরজায় গিয়ে হাজির। বললেন, 'দেখ গো, সারা রাত আমার ঘুম হয়নি ভেবে-ভেবে—কেন এমন রূঢ়বাক্য বলে ফেললুম !'

সেই দিন আর নেই। ভুল করেও খাবারের থালা ঠাকুরের ঘরে নিয়ে যাবার আর অধিকার নেই সারদার। তুই বলতে যার বুকে বাজত তিনি আজ তাকে দূরে-দূরে রেখেছেন। রেখেছেন দরমার খাঁচার মধ্যে।

অথচ কি দোষ করেছি এ প্রশ্নটিও মনের কোণে উঁকি দেয় না। দোষ দেখবার আগেই চিত্ত সন্তোষে ভরে ওঠে। অভিযোগ করবার আগেই এসে যায় অভিবাদন।

বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে বলছেন শ্রীমা: 'আমি রাধারমণের কাছে প্রার্থনা করেছিলুম, ঠাকুর আমার দোষদৃষ্টি ঘুচিয়ে দাও। আমি যেন কখনো কারু দোষ না দেখি।'

যোগেন-মা মাঝে-মাঝে দোয দেখতে চায়। তাকে বলছেন, 'যোগেন, দোষ কারু দেখো না। শেষে দূষিত-চোখ হয়ে যাবে। দোষ তো মানুষ করবেই। ও দেখবে কেন? ওতে নিজেরই ক্ষতি। দোষ দেখতে-দেখতে শেষে শুধু দোষই দেখে।'

নহবতখানায় বসে-বসে শুধু রান্না করো। রান্না আর রান্না। কত রকমের হুকুম। কালীর ভোগ সহ্য হয় না, তাই ঠাকুরের জন্যে আঝালি। রাম দত্ত গাড়ি থেকে নেমেই বললে, আজ ছোলার ডাল আর রুটি খাব। তিন-চার সের ময়দার রুটি। লাটু ঠেসে দেয় ময়দা, এই যা সুরাহা। রাখাল থাকলে হুকুম হয় খিচুড়ি। নরেনের জন্যে মুগের ডাল আর রুটি হল সেদিন। নরেন দিব্যি বললে, রুগীর পথ্য খেলুম। হুকুম হল, ও কি জোলো খাবার, মোটা-মোটা রুটি আর ছোলার ডাল করো। তাই সই। একবার খেয়ে উঠে আরেকবার খেল নরেন। তবে তার পেট ভরল।

সুরেন মিত্তির মাসে-মাসে দশটি করে টাকা দেয় ভক্ত-সেবায়। বুড়ো গোপাল বাজার করে। সারা দিন ধরে কত নৃত্য, কত কীর্তন, কত ভাব-সমাধি। শুধু দিনটুকু? চলে কখনো রাতভোর।

কিন্তু ডাক নেই সারদার।

স্মৃতিময়ী বলছেন করুণকণ্ঠে: 'সামনে বাঁশের চেটাইয়ের বেড়া দেওয়া। তাই ফুটোটুটো করে দাঁড়িয়ে দেখতুম। তাই তো অমনি দাঁড়িয়ে থেকে-থেকে বাত ধরে গেল।'

তবু কি নির্জনে একটি দীর্ঘশ্বাস আছে? আছে কি বিন্দুমাত্র দোষারোপ? না। শুধু একটি অমৃত-উচ্ছল পূর্ণঘটের শান্তি। একটি মঙ্গলরূপিণী শ্রদ্ধা। মাধুর্যরূপিণী তৃপ্তি।

'কি মানুষই এসেছিলেন!' মা বলছেন বিহ্বল হয়ে: 'কত লোক জ্ঞান পেয়ে গেল! কি সদানন্দ পুরুষই ছিলেন! হাসি কথা গান কীর্তন চব্বিশ ঘণ্টা লেগেই থাকত। আমার জ্ঞানে তো আমি কখনো তাঁর অশান্তি দেখিনি।'

কিন্তু বন্ধ খাঁচায় যে পাখি রুদ্ধ ক্ষোভে পাখা ঝাপটাতে পারত, আশ্চর্য, তারও মুখে হরিকথাকূজন। লোহার খাঁচার মধ্যে একটি টিয়ে পাখি। মা তাকে গঙ্গারাম বলে ডাকেন। বলেন, 'নাম করো তো গঙ্গারাম।'

গঙ্গারাম 'মা' 'মা' করে। ঠাকুরের শেখানো মন্ত্রটিই জপ করে মিষ্টি করে।

অন্য নাম কিছু বলাতে চাও বিকট আওয়াজ করে উঠবে। প্রতিবাদের আওয়াজ। মা নামের কাছে হরি-নাম কি! মা'র বাইরে আর দেবতা কোথায়!

খাঁচার ফাঁকের মধ্য দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দেন মা। প্রসাদী নৈবেদ্য খাওয়ান গঙ্গারামকে। খাওয়া-দাওয়ার পর পান খাচ্ছেন মা, গঙ্গারাম ঠিক নজর রাখছে। পান খাওয়া জিভটি মা খাঁচার ফাঁক দিয়ে বাড়িয়ে দিচ্ছেন গঙ্গারামের দিকে, ঠোঁট বাড়িয়ে সে পানটুকু জিভের থেকে তুলে নিচ্ছে গঙ্গারাম।

পুজো তখনো হয়নি নৈবেদ্য থেকে মোহনভোগ তুলে নিলেন মা। তুলে নিয়ে গঙ্গারামের দিকে হাত বাড়ালেন। বললেন, 'গঙ্গারাম, খাও বাবা।' গঙ্গারাম এমন ভক্ত, ঠোঁট বাড়িয়ে খেল সেই মোহনভোগ।

সবাই আপত্তি করলে, 'পুজো হয়নি, আগেই গঙ্গারামকে হালুয়া দিলেন।'

স্নিগ্ধ হেসে মা বললেন, 'বাবা, ওর ভেতরেই ঠাকুর রয়েছেন।'

একটা পাখি পর্যন্ত ঈশ্বরমন্ত্র পড়ছে, অথচ রাধি আর তার পাগলী-মা'র মুখে গালাগাল ছাড়া আর কিছু নেই।

'কি পাপে যে আমার এমন হচ্ছে কে জানে।' মা বলছেন তপ্ত হয়ে : 'হয়তো শিবের মাথায় কাঁটাশুদ্ধ বেলপাতা দিয়েছি। সেই কণ্টকে আমার এই কণ্টক।'

রাধুর ছেলে হয়েছে কিন্তু দুর্বলতা যায়নি। দাঁড়াতে পারে না, বসে বসে চলাফেরা করে। তারপর আবার আফিং ধরেছে। মাত্রাটা একটু কমাবার চেষ্টা করেন মা কিন্তু রাধুর ভীষণ গোঁ।

মা তরকারি কুটছেন, আফিঙের জন্যে রাধু এসে বসেছে চুপি-চুপি। এসেছে তেমনি ঘষটে-ঘষটে।

'রাধি, আর কেন, উঠে দাঁড়া।' মা ধমক দিয়ে উঠলেন : 'তোকে নিয়ে আব পারিনে। তোকে নিয়ে আমার ধর্মকর্ম সব গেল। এত খরচপত্র কোথা থেকে যোগাই বল দেখি?'

রাধু রেগে উঠল। তরকারির ঝুড়ি থেকে একটা বড় বেগুন তুলে নিয়ে মা'র পিঠে মারল দুম করে। পিঠ বাঁকিয়ে মা আর্তনাদ করে উঠলেন। দেখতে-দেখতে মারের জায়গাটা ফুলে উঠল।

তবু কি রাধুর উপর রাগ আছে মা'র? ঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে জোড়-হাতে বলছেন, 'ঠাকুর ওর অপরাধ নিও না, ও অবোধ।' নিজের পায়ের ধুলো নিয়ে মাখিয়ে দিলেন রাধুর মাথায়-কপালে। বললেন, 'রাধি এই শরীরকে ঠাকুর কোনোদিন একটিও শাসনবাক্য বলেননি, আর তুই এত কষ্ট দিচ্ছিস? তুই কি বুঝবি আমি কে, আমার স্থান কোথায়?'

নির্মাণমোহা ক্ষমা। করুণাদ্রবা নির্ঝরধারা। স্বতঃশুদ্ধা সহ্যশক্তি।

রাধি ঝামটা দিয়ে উঠল : 'তুই স্বামীর কি জানিস? স্বামীর মর্ম বুঝেছিস তুই কোনোদিন?'

যিনি প্রলয়ঙ্করী চণ্ডমুণ্ডবিখণ্ডিনী তিনিই আবার করুণাপাঙ্গা, হসম্মুখী। বললেন হাসিমুখে, 'তাই তো রে—ঠিক বলেছিস। আমার স্বামী তো ছিলেন ন্যাংটা সন্ন্যাসী।'

আমি তাঁরই মনোজবা। সেই জবাটি নিত্য সন্তোষে আরক্তিম।

এই রাধুর জন্যে আবার মায়া কত!

অসুখ করেছে রাধুর। চিন্তার মেঘে মুখখানি মলিন হয়েছে মা'র। বলছেন, 'আমি থাকতেই ওর ভালো হল না, তা এর পর কে আর ওকে দেখবে? তা হলে ও আর বাঁচবে কি?'

মা'র এত মায়া!·যোগেন-মা'র কেমন-য়েন সন্দেহ হল। ঠাকুর অমন ত্যাগী ছিলেন আর মাকে দেখছি ঘোর সংসারী। ভাই ভাই-পো ভাই-ঝি নিয়েই ব্যস্ত।

গঙ্গার ঘাটে ধ্যান করতে বসেছে, মনে হল ঠাকুর যেন বলছেন কাছে দাঁড়িয়ে, গঙ্গায় কি ভাসছে দেখ দিকি।

যোগেন-মা চোখ চেয়ে দেখে একটা মৃত শিশু যাচ্ছে ভেসে। নাড়ি-ভুঁড়ি বেরিয়ে রয়েছে ছেলেটার। ঠাকুর বললেন, 'গঙ্গা কখনো অপবিত্র হয়? না তাকে কিছু স্পর্শ করে? ওকেও তেমনি জানবে। মায়ায় জড়াবে কিন্তু কোনোদিন ম্লান হবে না।' নিজের দিকে ইশারা করলেন: 'একে আর ওকে অভেদ জানবে, বিন্দুমাত্র সন্দেহ রাখবে না।'

যোগেন-মা ছুটে এসে মা'র পায়ে পড়ল। কাকুতি করে বললে, 'আমায় ক্ষমা করো মা।'

'কেন, কি হল?'

'তোমাকে সন্দেহ করেছিলুম। তোমার উপর অবিশ্বাস এসেছিল—'

'তাই নাকি?' নির্মল রৌদ্রে নীল আকাশের মত প্রসন্নোজ্জ্বল চোখে মা তাকিয়ে রইলেন।

'কিন্তু ঠাকুর দেখিয়ে দিলেন, বুঝিয়ে দিলেন—'

'তার আর কি হয়েছে? অবিশ্বাস তো আসবেই। সেই তো কষ্টিপাথর। একবার সংশয়, আরেকবার বিশ্বাস, এই না হলে বিশ্বাস পাকা হবে কেন? এ না হলে আর বিশ্বাসের দাম কি।'

হরির মা বলে একটি প্রৌঢ়া বিধবা আসে রোজ মা'র কাছে। যত রাজ্যের সংসারের ঝগড়া-ঝাঁটির গল্প করে। যত সব নীচতা আর ক্ষুদ্রতার কাহিনী। পরে বললে, 'কি করবো মা। এ তো আর ছাড়া যায় না। আপনিই বা কই রাধুকে ছাড়তে পারলেন বলুন—'

'আমার কথা ছেড়ে দাও, হরির মা—' অদ্ভুত করে হাসলেন মা। সেই হাসিতে সব কথা স্তব্ধ হয়ে গেল।

রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে পা মুছে বিছানায় বসে বললেন, 'ওরা কি বুঝবে! আমায় বলে রাধির উপর টান! যাদের ঘরে জন্ম নিয়েছি তাদের দেখতে হয়। ঋণ তো কারুর রাখতে নেই। তা না হলে রাধি-টাধি আমার কে! ঠাকুর যে তাঁর মা'র সেবা কত করেছেন, রামলালকে ঢুকিয়েছেন কালীঘরে—এ সবের মানে কি?'

এ সবের মানে, নির্লিপ্ত হওয়া নয়, সংসারের রূপে-রসে লালিত হওয়া। রসে-বশে মানুষ হওয়া। সংসার ছেড়ে বাহ্যসন্ন্যাসে স্বর্গসন্ধান করা নয়। বাহ্যসন্ন্যাস ছেড়ে সংসারকে স্বর্গে রূপান্তরিত করা। সংসারের ছোট-বড় কাজে ঈশ্বরের সেবাচর্যা করা। পরমতম আনন্দের আস্বাদ করা। ঠাকুরেরও হৃদে-প্যালা, হাবির মা ছিল, মা'রও তেমনি রাধু-মাকু। এই সংসারই সাধনার নব পীঠস্থান। এই

জন্যেই তো শ্মশানবাসিনী হয়েও সংসার করছেন মহামায়া। সমস্ত তীর্থজলে ঘটটি পূর্ণ করে স্থাপন করেছেন সংসারের মণ্ডমূলে।

মন্ত্রটি মা, মূর্তিটি সারদা, আর পীঠস্থানটি সংসার।

আবার এই সংসারে, দক্ষিণেশ্বরের সংসারে বৃন্দে-ঝিও আছে। নহবতে বসে ধ্যান করছে সারদা, একেবারে তার সামনে বৃন্দে-ঝি একটা কাঁসি ছুঁড়ে ফেলল সেদিন। ইচ্ছে করে ঠেলা মেরেই ফেলল হয়তো। ভাবখানা হয়তো এই, ভাবের নিকেশ করে দি।

শব্দটা বজ্রের মত লাগল সারদার বুকে। সারদা কেঁদে ফেললে।

গোনাগুনতি লুচি চাই, বৃন্দে-ঝির। তার বরাদ্দের লুচি যদি কোনোদিন খরচ হয়ে যায়, তবে সে অনর্থ বাধায়। তার জিভ সকসক তো করেই লকলকও করে।

হয়তো ছেলেরা এসে পড়েছে, বৃন্দে-ঝির বরাদ্দ লুচিতে টান পড়েছে। আর যায় কোথা! অমনি শুরু হল বকুনি: 'ওমা কেমন সব ভদ্দরলোকের ছেলে গো—'

পাছে ছেলেরা শোনে তাতে আবার ঠাকুরের ভয়। অপরাধীর মত নহবতে এসে দাঁড়িয়েছেন ভোরবেলা। বলছেন, 'ওগো বৃন্দের খাবারটি তো খরচ হয়ে গেছে!'

সর্বনাশ!

'তা তুমি তাকে নতুন করে রুটি-লুচি যা হয় করে দিও। নইলে এখুনি এসে বকাবকি শুরু করবে। দুর্জনকে পরিহার করাই উচিত।'

বৃন্দে কি শোনে!

তখন সারদা তাকে নানাভাবে বোঝাতে শুরু করে। তৈরি খাবার যখন নেবেনি তখন সিধে সাজিয়ে দি। তবে বৃন্দে নিবৃত্তি মানে।

ঠাকুরের সংসার। তাঁর সংসারের কাজ করা মানেই তাঁকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাওয়া, তাঁর পুজো করা। তিনি অরণ্যেও আছেন সংসারেও আছেন। কিন্তু সংসার ছেড়ে অরণ্যে গেলেন না আর পাঁচজনের মত। তিনি অরণ্য ছেড়ে সংসারে এলেন।

রামকৃষ্ণ সর্বাভিনব। সর্বাধুনিক। তাঁর এই বিপ্লবের জোর কোথায়? তাঁর এই সাধনার ভিত্তি কি? উত্তর, সারদা। সংসার-সারদাত্রী মাতৃমূর্তি। যদি সারদা না থাকত, রামকৃষ্ণ আর-পাঁচজনের মতই আংশিক হয়ে থাকতেন। সারদাকে নিয়েই তিনি সম্পূর্ণ। সারদাকে নিয়েই তিনি সমস্তসুন্দর।

* ষোলো *

বৃন্দে-ঝি এসে খবর দিলে, ঠাকুর ডাকছেন।

আমাকে? এ কখনো হতে পারে?

হ্যাঁ, কি মালা দিয়েছ কালীর গলায়, তাই দেখে ঠাকুর মহাখুশি। বলছেন, ও এসে একবার দেখে যাক।

রঙ্গন আর জুঁই দিয়ে সাত-লহর গড়ে মালা গেঁথেছিল আজ সারদা। মাকে পরাতে পাঠিয়ে দিয়েছিল মন্দিরে। কি খেয়াল হল সাজকারের, গায়ের গয়না সব

খুলে ফেলে মাকে শুধু ফুলের মালা দিয়ে সাজালো। ঠাকুর দেখতে এসে একেবারে ভাবে বিভোর। 'আহা, কালো রঙে কী সুন্দরই যে মানিয়েছে! এমন মালা কে গেঁথেছে রে?'

আর কে! যাঁর মালা তিনিই গেঁথেছেন।

'আহা, তাকে একবার ডেকে নিয়ে এস গো!' ঠাকুর বললেন আকুল স্বরে, 'মালা পরে মায়ের কী রূপ খুলেছে একবার দেখে যাক।'

যাই এই ফাঁকে ঠাকুরকে একটু দেখে আসি। নয়নচকোর দিয়ে গগনের সেই সুধাকরকে। নিজেকে আরো ঢেকে নিল সারদা। বৃন্দে-ঝির আড়ালে-আড়ালে এগুতে লাগল মন্দিরের দিকে।

ওমা, এদিকে যে আসছেন আর কারা। বলরাম আর সুরেন। এখন আমি কোথায় লুকুই! কোথায় নিজেকে মুছে ফেলি! ত্রস্ত হাতে বৃন্দে-ঝির আঁচল টেনে নিল সারদা। তাতে আরেক প্রস্ত ঢাকা দিলে নিজেকে। সামনের দিক ছেড়ে দিয়ে উঠতে গেল পিছনের সিঁড়ি দিয়ে।

সেখানে আবার বাধা। ঠাকুর ঠিক চোখটি রেখেছেন। বলে উঠলেন, 'ওগো ওদিক দিয়ে উঠো না। সেদিন এক মেছুনি উঠতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল পা পিছলে। কি হয়েছে, সামনের দিক দিয়েই এসো না—'

বলরামরা সরে দাঁড়াল। সারদা তখন এল সমুখ দিয়ে। তাকালো কালীর দিকে। ঠাকুর তখন ভাবে-প্রেমে গান ধরে দিয়েছেন। সারদা দেখল কালীর মুখেই ঠাকুরের মুখ আঁকা। আহা, সেই গান! যেন সুধারস্রোত বয়ে চলেছে। তার উপরে ভাসছেন ঠাকুর। সে গানে কান ভরে আছে সারদার। কানের ভিতর দিয়ে এসে মরমে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

'এখন যে গান শুনি সে শুনতে হয় তাই শুনি।' বলছেন শ্রীমা। 'আর নরেনের সে কী পঞ্চমেই সুর ছিল। আমেরিকা যাবার আগে আমাকে গান শুনিয়ে গেল ঘুসুড়ির বাড়িতে। বলেছিল, মা, যদি মানুষ হয়ে ফিরতে পারি, তবেই আবার আসব, নতুবা এই-ই। আমি বললুম, সে কি? তখন তাড়াতাড়ি বললে, না না, আপনার আশীর্বাদে শিগগিরই আসব। আর গিরিশবাবু?—আহা, এই সেদিনও গান শুনিয়ে গেলেন। কী সুন্দর গান—'

বলরাম বোসের বাড়িতে তখন আছেন, একদিন ছাদে উঠেছেন বেড়াতে। বিকেলবেলা। গিরিশ ও তার স্ত্রীও সে সময় ছাদে উঠেছে। এক ছাদ থেকে দেখা যায় আরেক ছাদ। গিরিশের স্ত্রী বললে, গিরিশকে, 'ঐ দেখ ও বাড়ির ছাদে মা বেড়াচ্ছেন।'

গিরিশ তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে দাঁড়াল। চোখ বুজল। বললে, 'না, না, আমার পাপনেত্র, এমন করে মাকে দেখব না লুকিয়ে।' বলতে-বলতে দ্রুত পায়ে নেমে গেল নিচে।

এই গিরিশই একদিন ঠাকুরকে বললে, তুমি পুত্র হয়ে জন্মাবে আমার ঘরে।

ঠাকুর উড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, বয়ে গেছে আমার তোর ছেলে হয়ে জন্মাতে।'

কে জানে, ঠাকুরের দেহ যাবার পর গিরিশের ছেলে হল একটি। চার বছর বয়েস হল অথচ কথা হয় না। হাব ভাবে সব প্রকাশ করে। গিরিশ তো তাকে পেয়েই কৃতার্থ, বলে এই আমার ঠাকুর রামকৃষ্ণ। ঠাকুরের মত সেবা করে তাকে। তার জন্যে আলাদা কাপড়-জামা আলাদা রেকাব-বাটি। সাধ্য নেই কেউ তা দু-আঙুলে স্পর্শ করে।

একদিন সেই ছেলে মাকে দেখবার জন্যে ভীষণ অস্থির হল। সকলকে টানছে আর উ-উ করে দেখিয়ে দিচ্ছে উপরের দিকে। কেউ তত খেয়াল করেনি। শেষে একজন বুঝিয়ে দিলে, মাকে বোধহয় দেখতে চায়। কোলে করে নিয়ে এল সেই ছেলেকে, উপরে, যেখানে মা বসে আছেন। কোলে থাকবে না, নেমে পড়ল জোর করে। নেমে পড়েই সেই ছেলে মা'র পায়ের তলায় পড়ে প্রণাম করলে। শুধু তাই নয়, আবার নিচে নেমে গিরিশের হাত ধরে টানাটানি করতে শুরু করল। ভাবখানা এই, দেখবে চলো, উপরে কে বসে আছে।

তার কাতরতা দেখে গিরিশের সে কি হাউ-মাউ কান্না! 'ওরে আমি মাকে দেখতে যাব কি! আমি যে মহাপাপী।'

মা'র কাছে আবার সন্তানের পাপ কি! ছেলে তাই ছাড়ে না বাপকে। তখন বাধ্য হয়ে গিরিশ ছেলে কোলে নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে উপরে উঠে এল। দু-চোখে জল গড়াচ্ছে অবিরল, ছেলে আর বাপ—দুজনেই ঠিক চার বছরের শিশু।

এসেই মা'র পায়ের নিচে সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়ল। ছেলেকে দেখিয়ে বললে, 'মা, এ হতেই শ্রীচরণ দর্শন হল আমার।'

এই গিরিশের প্রথম দর্শন। প্রথম সম্ভাষণ।

আর, নরেন, নরেন আমার খাপ-খোলা তলোয়ার।

মঠে প্রথম দুর্গাপুজার সময় তার গর্ভধারিণী মাকেও এনেছিল সঙ্গে করে। সে চারদিক ঘুরে বেড়ায় এ-বাগান ও-বাগান দেখে, আর লঙ্কা তোলে বেগুন তোলে। ভাবে এসব আমার নরুর করা। নরেন বললে, 'তুমি এ সব করছ কি? মায়ের কাছে গিয়ে চুপটি করে বোসো না। লঙ্কা ছিঁড়ে বেগুন ছিঁড়ে কি হবে? তুমি বুঝি ভাবছ এ সব তোমার নরু করেছে। মোটেই নয় যিনি করবার তিনি করছেন।'

'মাতাঠাকুরাণীর যে প্রকার ইচ্ছা হইবে, সেই প্রকারই করিবেন।' গাজীপুর থেকে নরেন চিঠি লিখছে বলরাম বোসকে: 'আমি কোন নরাধম তাঁহার সম্বন্ধে কোনও বিষয়ে কথা কহি!...মাতাঠাকুরাণী যদি আসিয়া থাকেন, আমার কোটি-কোটি প্রণাম দিবেন ও আশীর্বাদ করিতে বলিবেন, যেন আমার অটল অধ্যবসায় হয়, কিংবা এ শরীরে যদি তাহা অসম্ভব, যেন শীঘ্রই ইহার পতন হয়।'

'যারা আমার অন্তরঙ্গ তারাই আমার ব্যথার ব্যথী।' বলেন ঠাকুর ছেলেদের দেখিয়ে, 'এরা আমার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী। এমন কি শম্ভু, বলরাম, সুরেন—'

ঠাকুরের সব রসদদার। দক্ষিণেশ্বরে, কালীঘরে ধ্যান করবার সময় কালীর পিছনে দেখলেন শম্ভুকে। বলরামকেও দেখলেন ধ্যানে, মাথায় পাগড়ি, গৌরবর্ণ। সেই বলরামের স্ত্রীর অসুখ করেছে।

ঠাকুর তলব দিলেন সারদাকে। বললেন, 'যাও দেখে এসো গে—'

সারদা শুধু বললে নম্রভাবে, 'যাব কিসে?'

একটু কি কুণ্ঠা, অনিচ্ছা ছিল কথাটিতে? ঠাকুর প্রায় তর্জন করে উঠলেন, 'আমার বলরামের সংসার ভেসে যাচ্ছে, আর তুমি যাবে না? হেঁটে যাবে। যাও, হেঁটে যাও।'

তাই যাব। যেমন বলবে তেমনি যাব। খুব পারি হাঁটতে। কত হেঁটেছি।

কিন্তু কোথা থেকে কে জানে এক পালকি এসে হাজির। যিনি পেঁছনো তিনিই আবার পথ।

বারান্দায় বসে আছেন মা, একটি ভিখিরি মেয়ে এসে প্রণাম করলে। হাতে একটি পেয়ারা। বললে, 'মা, এটি আজ ভিক্ষায় পেয়েছি। তাই এনেছি আপনার জন্যে। দিতে সাহস হচ্ছে না, মা। দেব?'

'আহাহা, দাও।' হাত বাড়িয়ে পেয়ারাটি তুলে নিলেন মা। বললেন, 'ভিক্ষার জিনিস খুব পবিত্র। ঠাকুর খুব ভালোবাসতেন। বেশ পেয়ারাটি, আমি খাব'খন।'

ভিখারী মেয়ের আর কি চাই! তার চোখ ছলছল করে উঠল। বললে, 'আমি আপনার ভিখারিণী মেয়ে, আমার উপর এত দয়া!'

ভিক্ষায় যে ফলটি পেয়েছে তাই মাকে দিয়ে গেল খুশি হয়ে। একেই বলে ফলত্যাগ।

ডাব চিনি আর দক্ষিণার পয়সা দিয়ে দিলেন ভক্তের হাতে। বললেন, 'যাও মন্দিরের মাকে গিয়ে দিয়ে এস। মনে-মনে বোলো, মা, ফলটি নাও আর ফলের যে ফল সেটিও নাও।'

এমন ভাবে দাও যেন দানের আকাঙ্ক্ষার ছায়াটুকুও না মনের গায়ে লেগে থাকে!

শিরোমণিপুর থেকে একটি স্ত্রীলোক এসেছে মা'র কাছে, জয়রামবাটিতে। ছেলের এখন-তখন অসুখ, মা'র পাদোদক খেলে ভালো হবেএই বিশ্বাস। ভাঁড়ে করে জল নিয়ে এসেছে, আর বলামাত্র মা তাতে তাঁর পায়ের বুড়ো আঙুল ডোবাবার উপক্রম করেছেন। এমন সময় এক ভক্ত এসে মা'র পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সে দেবে না আঙুল ডোবাতে। স্ত্রীলোকটিকে বললে, 'তুমি বাছা তোমার ছেলের চিকিৎসা করাও গে, কিংবা আর যার থেকে হোক নাও গে পাদোদক। মা'রটি পাবে না।'

স্ত্রীলোকটি তাকিয়ে রইল হতাশের মত। মা দিতে চান অথচ ভক্তেরা নারাজ।

'না, মা, দিও না বলছি।' আরেক ভক্ত এসে জোর দিল। 'একে বাতে ভুগছ, তায় আবার কি অসুখ করে বসে ঠিক নেই। কর্তাভজারা ঐ রকম পায়ের বুড়ো আঙুল চোষে শুনেছি। এ আরেক নতুন জ্বালা।'

মুখখানি ম্লান করে স্ত্রীলোকটি সরে দাঁড়াল এক পাশে। মা তাকে কাছে ডেকে এনে বললেন, 'তুই মা চুপিচুপি কেন এলিনি? তাহলে তো পেতিস। এখন ছেলেরা জানতে পেরেছে, আর কি হয়? ওদের অমতে কি কিছু করতে পারি? গাঁয়ে তো অনেক বামুন আছে, তাদের কারু থেকে চেয়ে নে গে যা! আমি বলছি, তোর ভয় নেই, তোর ছেলে ভালো হয়ে যাবে।'

আর কি চাই ! জল নিতে এসেছিল, জয় নিয়ে চলে গেল !

করুণা কি শুধু মানুষের জন্যে ?

পাগলী-মামী তার এক আত্মীয়কে খাওয়াচ্ছে। বারান্দায় জায়গা করেছে, রেখেছে জলের গ্লাশ। অমনি এক বেড়াল এসে সে জলে মুখ দিলে। আবার নতুন করে জল দিলে পাগলী-মামী। ওমা, সে জলেও মুখ দিলে বেড়াল। সে জলও ফেলা গেল। তৃতীয়বার জল এল গ্লাশ-ভরা। কি সর্বনাশ, এবারও কোন সুযোগে পাশে থেকে এসে মুখে ঠেকাল। আর যায় কোথা !

পাগলী-মামী তেড়ে এল। 'পোড়ারমুখো বেড়াল, তোকে আজ মেরে ফেলব তবে অন্য কথা।'

মা বাধা দিলেন ! বললেন, 'চৈত্র মাস, বাধা দিও না পিপাসার সময়।'

'তোমাকে আর বেড়ালকে এত দয়া দেখাতে হবে না।' পাগলী-মামী মুখভঙ্গি করলে : 'মানুষকেই কত দয়া করেছেন !'

মা'র মুখখানি গম্ভীর হয়ে উঠল। বললেন, 'যার উপর আমার দয়া নেই, সে নেহাত হতভাগ্য। কিন্তু কার উপর যে নেই তাও তো খুঁজে পাই না—'

সর্বপরিব্যাপিনী মা। পৃথিবরূপিণী মা। স্নেহকরুণাভারনম্রা স্মেরাননা মা। শরাদিন্দুকরাকারা।

শ্রাবণ মাস, বৃষ্টিতে পথ-ঘাট পিছল হয়ে গিয়েছে। জয়রামবাটিতে মা'র কাছে এসেছে একজন সন্ন্যাসী-ছেলে। মা খুশি হয়ে উঠলেন। 'এসেছ ? এমুখো হয়নি কেউ অনেক দিন। বাজার-টাজার হয়নি। আজ কিছু বাজার করে দিয়ে যাও।'

সন্ন্যাসী-ছেলে দেখলে, মহা ভাগ্য। হৃষ্ট মনে বাজারে গেল আর এক ধামা সওদা করলে। প্রায় একমণের মত। দোকানদার বললে, একটা মুটে ডেকে দি। মা বাজার করে আনতে বলেছেন, মুটের মাথায় করে আনতে হবে বলে দেননি এমন কথা। তাই সন্ন্যাসী বললে, না, মুটের দরকার হবে না, আমিই পারব। ঝুড়িটা আপনি দয়া করে আমার মাথার উপর তুলে দিন।

ঝুড়ি মাথায় নিয়ে দেখল পর্বতের মতন ভারি। উপায় নেই, মা'র আদেশ, যেতে হবে বোঝা নিয়ে। সহসা বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এক হাতে আবার ছাতা ধরো ঝুড়ির উপর। নইলে আটা-ময়দার লেশ থাকবে না। ছাতা ধরলে কি হবে, পায়ের নিচে পথও সরে-সরে যাচ্ছে। কিন্তু পা পিছলালে চলবে না, চলবে না ঘাড় বেঁকালে। মা গো, শক্তি দাও, তোমার বোঝা যেন নিয়ে যেতে পারি তোমার পায়ে।

মুহূর্তে বোঝা হালকা হয়ে গেল। সন্ন্যাসী-ছেলে অনুভব করল, পর্বত যেন তুলো হয়ে গিয়েছে।

বোঝা-মাথায় প্রায় ছুটতে-ছুটতে চলে এল মা'র দুয়ারে। এসে দেখে মা দ্রুত পায়ে ঘরের বারান্দায় ছুটোছুটি করছেন, একবার পূব থেকে পশ্চিমে আবার পশ্চিম থেকে পূবে। হাঁপিয়ে পড়েছেন ক্লান্তিতে, সমস্ত মুখ লাল, দু চোখ যেন ঠেলে উঠেছে কপালে। ছুটোছুটি করছেন, আর বলছেন আপন মনে, কেন একটা মুটে নিতে বললুম না—কেন একটা—

ছেলের সমস্ত ক্লেশ নিজের মধ্যে টেনে নিয়েছেন। সমস্ত ভার নিজে টেনে নিয়ে হালকা করে দিয়েছেন ছেলেকে।

মা'র পায়ের কাছে বোঝা নামিয়ে দিল ছেলে। মা হাঁপ ছাড়লেন। তিরস্কার করে উঠলেন, 'কি তোমার বুদ্ধি! এত বড় বোঝা, একটা মুটে নিলে না? এ আমাকে বলে দিতে হবে? আমি বলিনি, তাতে কি হল? তোমার বুদ্ধি হল না? দেখ দেখি আমার কেমন ক্লান্ত হতে হয়েছে!'

* সতেরো *

'মন তুই কি এত ভাগ্য করেছিস যে রোজ তাঁর দেখা পাবি?' পায়ে বাত ধরে গেছে, খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটে, তবু সারদা দরমার বেড়ার সেই ছিদ্র থেকে চোখটি সরিয়ে নেয় না। বড়-বড় থামের আড়াল পড়ে যায়, দেখা যায় না সেই নয়নমনোহরকে, তবু এই নিয়ত আকুতি, মন, তুই কি এত ভাগ্য করেছিস—? যেন কত অযোগ্য, কত অভাজন, কত দীনহীন—এমনি এক আত্যন্তীন কাতরতা। এ কি তাই? যে অশেষ ঐশ্বর্যে সমারূঢ়া, জগদব্যাপিকা আনন্দরূপা, বিশ্বেশসিংহাসনা—এ তার দুঃখনিবেদন? যেন কত নির্যাতিত, উপেক্ষিত, অনাদৃত—তাই কি শোনাচ্ছে? তবে যিনি উপেক্ষা করছেন তাঁরই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা কেন? এ কখনো শুনেছে কেউ? যে অন্যায়াচারী সেই আকর্ষণ করবে, আকাঙ্ক্ষনীয় হয়ে থাকবে? তারই জন্যে নয়নে ভরে থাকবে দর্শনের পিপাসা? যে বনবাসে রেখেছে তারই জন্যে অনুরাগ?

আসলে, এ কি কান্না? এ কি নালিশ? যে মেরুকিরীটভরা সমুদ্রকাঞ্চী পৃথিবী, তার আবার খেদ কিসের? সে তো মূর্তিমতী মৌন।

আসলে, এ একটি যজ্ঞের মন্ত্রোচ্চারণ। তপস্যার হোমশিখা।

পার্বতী যখন মহাদেবের ধ্যান ভাঙতে চাইলেন, পঞ্চশরের শরণাপন্ন হলেন। পঞ্চশর ভস্ম হয়ে গেল। পার্বতী তখন অপর্ণা সাজলেন। প্রাপ্তির মধ্যে বৃহত্ত্ব আনতে হলে পদ্ধতির মধ্যেও মহত্ত্ব আনতে হবে। দুঃসাধ্য মূল্য দিয়ে তাকে পেতে হবে বলেই তো সে দুর্লভ। যদি অল্পমূল্যে পাওয়া যায় সে অল্পজীবী হয়ে থাকে। যে আমার না-পাওয়ার ধন তাকে চিরন্তন চাওয়ার মধ্যেই যে আমার পরম পাওয়া সেটিই অনির্বাণ দীপশিখা করে রাখলুম জ্বালিয়ে। এইটিই আমার যোগসাধনা।

সারদা অপর্ণা সাজল। জ্বালিয়ে রাখল একটি প্রেমের দীপভাণ্ড। শিখাটি প্রতীক্ষার। নিষ্কম্প, নির্ধূম। যে জ্যোতিটি বিকিরিত হচ্ছে সেটি পরমানন্দের আভাতি। তাই কান্না নয়, বিলাপ নয়, নবযুগের বেদসূক্ত।

'হ্যাঁ গা, আমি কি তোমাকে ত্যাগ করেছি?' মাঝে-মাঝে এসে জিগগেস করেন ঠাকুর।

যেন একটি গভীর পরিপূর্ণতা কথা কইছে, তেমনি স্বরে সারদা বলে, 'না, তুমি আমাকে গ্রহণ করেছ।'

কি খেয়াল হল, খাওয়া-দাওয়ার পর ঠাকুর সেদিন নহবতে এসে হাজির। ব্যাপার কি? বটুয়ায় মশলা নেই। সারদার আনন্দ তখন দেখে কে, প্রত্যক্ষ সেবার বুঝি একটু সুযোগ পেল। দুটি যোয়ান-মৌরি খেতে দিল ঠাকুরকে। এ খাওয়া তো এক্ষুনি ফুরিয়ে যাবে—লোভ হল, রাত্রেও যেন দুটি খান, খাবার সময় সারদার কথা যেন একটু মনে করেন। কাগজে মুড়ে আরো দুটি মশলা ঠাকুরের হাতে দিল সারদা। বললে, নিয়ে যাও। পরে খেও।

বৃষ্টি ফুরিয়ে গেছে, তবু গাছের পাতার কাঁপনে ফোঁটা-ফোঁটা কতগুলো জল প'ড়ে বৃষ্টিকে আবার একটু মনে করিয়ে দেওয়া।

মশলার পুঁটলি নিয়ে ঠাকুর চললেন তাঁর নিজের ঘরে। কিন্তু হঠাৎ তাঁর রাস্তা ভুল হয়ে গেল। ঘরে না গিয়ে সোজা গঙ্গার ধারের পোস্তার দিকে চলে গেলেন। যেন বেহুঁশ, ঠাহর হচ্ছে না দিশপাশ। 'মা ডুবি' 'মা ডুবি' বলতে-বলতে প্রায় গঙ্গায় নেমে পড়েন আর কি। বন্দিনী সারদা ছটফট করতে লাগল, কাকে ডাকি, কাকে দেখাই! কি ভাগ্যি, মা-কালীর একটি বামুন যাচ্ছে এদিক দিয়ে, তাকে সারদা বললে ব্যস্ত হয়ে, 'শিগগির হৃদয়কে ডাকো।'

হৃদয় খাচ্ছিল, এঁটো হাতেই ছুটে এল খাওয়া ফেলে। সবলে ধরে ঠাকুরকে তুলে নিয়ে এল জল থেকে। পাড়ে এসে ঠাকুর ভাবলেন, এমনটি হল কেন? কেন পথ ভুললুম? মুহূর্তে উত্তর প্রতিভাত হল। ও, সঞ্চয় করেছি যে। পরের বেলার কথা ভেবে মশলা নিয়েছি পুঁটলি বেঁধে। আর দ্বিধা করলেন না। মশলার পুঁটলি ফেলে দিলেন ছুঁড়ে। সারদার চোখের সামনে পড়ে রইল মাটিতে।

তবু মনের মধ্যে অহরহ সেই সন্তোষবাণী: 'মন তুই কি এত ভাগ্য করেছিস যে রোজ তাঁর দেখা পাবি?'

এই যে বসে আছি, আমি কি পথ হারিয়েছি?

একটি মেয়ে মাকে একবার লিখলে, মা আমি কি পথ হারিয়েছি? উত্তরে মা লিখলেন, পথ কি কেউ হারায়? পথ পাবার জন্যেই তো পথ।

এক ভক্ত ঝুড়িতে করে কতগুলো পদ্মফুল নিয়ে আসছে। দূর হতে পরিচিত একজনকে দেখে ফুলসুদ্ধ হাত তুলে নমস্কার করলে। মা দেখতে পেয়েছেন। বললেন, 'ও ফুল দিয়ে আর ঠাকুরের পুজো হবে না। ওগুলো ফেলে দাও।'

একটি তেরো-চৌদ্দ বছরের ছেলে লোভালু চোখে নৈবেদ্যের দিকে তাকিয়ে আছে। তখনো ঠাকুরকে নিবেদন করা হয়নি, শুধু থালা সাজানো হচ্ছে, এখুনি লোভদৃষ্টি। মা সে নৈবেদ্য দিলেন না পুজোয়। কিন্তু এ ভাবটি রইল না বেশি দিন। পরে আবার যখন নৈবেদ্যের থালায় অমনি লুব্ধ চোখের ছায়া ফেলেছে ঐ ছেলে মা সানন্দে তার থেকে খাবার তুলে তাকে খেতে দিচ্ছেন। ওকি, এখনো যে নিবেদন করা হয়নি ঠাকুরকে। তা হোক। মা বললেন, 'ওর মধ্যেই ঠাকুর আছেন।' বলে সেই নৈবেদ্যের থালাই ধরে দিলেন পুজোয়।

একটি মেয়ে এসেছে কিন্তু তার শোবার বালিশ নেই। মা তাঁর মাথার বালিশটা স্বচ্ছন্দে তার ঘাড়ের নিচে গুঁজে দিলেন। না মা, বালিশ লাগবে না।

'লাগবে, শান্তিতে ঘুমোও', মা বললেন, 'তোমার মধ্যেই ঠাকুর আছেন।'

'ও মা নন্দরাণী, অন্ধজনে দয়া করো মা—' দুয়ারে এক ভিখিরি এসে দাঁড়িয়েছে।

গোলাপ-মা বললে, 'ওর সংগে-সংগে একবার রাধাকৃষ্ণের নামটিও কর। গৃহস্থেরও কানে যাক, তোরও নাম করা হোক। তা নয়, অন্ধ-অন্ধ করেই গেলি—'

পরদিন আবার এসেছে ভিখিরি। বলছে, 'রাধাগোবিন্দ, ও মা নন্দরাণী, অন্ধজনে দয়া করো মা—'

সংগে-সংগে কাপড় আর পয়সা।

সেদিন এক ভিখিরি এসে ভিক্ষে চাইতেই নিচের ভক্তরা তাড়া দিয়ে উঠল: 'যা, এখন দিক করিস নে।'

মা'র কানে গেছে। বলছেন, 'দেখেছ? দিলে ভিখিরিকে তাড়িয়ে। ঐ যে একটু উঠে এসে ভিক্ষে দিতে হবে এটুকু আর পারলে না। এক মুঠো তো ভিক্ষে, ওর প্রাপ্য, তা ওকে দিলে না। যার যা প্রাপ্য তার থেকে তাকে কি বঞ্চিত করা উচিত? এই যে তরকারির খোসা, এ গরুর প্রাপ্য। ওটিও গরুর মুখের কাছে ধরতে হয়।'

'কারু কাছে কিছু চেয়ো না।' মেয়ে-ভক্তদের বলছেন মা, 'বাপের কাছে তো নয়ই, স্বামীর কাছেও নয়। যে চায় সে পায় না। যে চায় না সে পায়।'

কোনোদিন চাননি কিছু মা। তাই সব তাঁর অঢেল। সব তাঁর ভরা ভাণ্ডার।

দুঃস্থদের জন্যে সেবাশ্রম হয়েছে, কিন্তু, আশ্চর্য, তাতে বড়লোকের ভিড়। বিনাব্যয়ে ওষুধ নেবার কারসাজি। দেখেশুনে রাখাল খুব বিরক্ত হয়ে উঠেছে। এসেছে মা'র কাছে। বলছে, 'যারা অনায়াসে নিজের খরচে চিকিৎসা করাতে পারে তারা এখানে আসবে কেন? এ তো শুধু গরিবদের জন্যে। মা, আপনি বলুন, বড়লোকদের কি ওষুধ দেব, করব চিকিৎসা?'

মা বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, সব করবে। আমাদের সব সমান, গরিবই বা কি বড়লোকই বা কি। তা ছাড়া যে চায় সেই তো গরিব।'

একটি লোক এসেছে মশুরকলাই বিক্রি করতে। 'মা, আমি আট আনার নেব।' একটি ভক্ত মেয়ে এসেছিল মা'র কাছে সে বললে।

'বেশ তো আমি বলে দিচ্ছি।' বললেন মা।

ভক্ত-মেয়েটির স্বামী সংগে ছিল। সে টিটকিরি দিয়ে উঠল: 'মা'র কাছে কি চাইতে এসে কি চাইছে! মশুরকলাই চাইছে।'

মা বলে উঠলেন, 'বাবা, মেয়েমানুষ ওরা, ওদের সংসার করতে হবে। সব রকম ওদের চাই। নীলবড়ি থেকে শশাবিচি—মায় সমুদ্রের ফেনা। সব যোগাড় করে রাখতে হবে আগে থেকে। ওদের সংসার করতে হবে।'

এই সংসারটি কি করে পরিপাটিরূপে করা যায় সেটুকু দেখাবার জন্যেই তো মা সংসারী হয়েছেন। জগন্মাতা সারদা হয়েছেন। সন্ন্যাস তো আর কিছুই নয়, ভগবানে সম্যকরূপে ন্যাস করা, মানে, অর্পণ করা, নিক্ষেপ করা। সংসারের সমস্ত কাজ নিখুঁত ভাবে করো কিন্তু মনটি ভগবানে দিয়ে রাখো, লাগিয়ে রাখো,—একেই বলে সংসারে সন্ন্যাসীর মতো থাকা। ঠাকুরের ভাষায় নর্তকীর মতো থাকা। মাথায়

ঘড়া নিয়ে নেচে যাচ্ছে নর্তকী, ঘাঘরা ঘুরিয়ে, কিন্তু মাথার ঘড়া স্খলিত হচ্ছে না। তেমনি সংসারের যাবতীয় কর্তব্য হাসিমুখে সম্পন্ন করো, কিন্তু খবরদার, যিনি শিরোধার্য, সেই পূর্ণঘট যেন নির্বিচল থাকে। নৃত্যের আনন্দে যেন সেই ঘটকে না মাটিতে ফেল। ঘটই যদি পড়ে যায় তা হলে আর নৃত্য কি।

এই নিস্পৃহ অথচ নির্দ্বন্দ্ব নৃত্যটি দেখাবার জন্যেই সারদা। জগজ্জননী মহামায়া হয়ে সংসারে আবার শুধু মায়া!

রাধুকে নিয়ে মা মহাব্যস্ত। আবার পরনের কাপড়খানি কোথায় একটু ছিঁড়ে গিয়েছে বলে গোলাপ-মাকে বলছেন সেলাই করে দিতে।

কাশী থেকে কজন স্ত্রীলোক এসেছে দেখা করতে। একজন একটু বিরক্ত হয়ে বললে, 'মা, আপনি দেখছি মায়ায় ঘোর বন্ধ।'

অস্ফুটরেখায় মা হাসলেন। বললেন, 'কি করব মা, আমি যে নিজেই মায়া।'

* আঠারো *

ঠাকুর অসুখে পড়লেন। গলায় ঘা, তবু ক্রমাগত পিপাসু ভক্তদের সংগে হরিকথার বিরাম নেই, অতি পরিশ্রমে ঘা থেকে রক্ত বেরুতে লাগল।

সবাই চোখে অন্ধকার দেখল। ঠিক করল কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। যিনি ব্যাধি তিনিই চিকিৎসা। ঠাকুর রাজী হলেন।

উঠলেন গিয়ে শ্যামপুকুর স্ট্রিটের এক ভাড়া-বাড়িতে। সারদা পড়ে রইল দক্ষিণেশ্বরে। দুঃসহতর নিঃসংগতায়।

রাতে বকুলতলার ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়েছে গংগায়, অন্ধকারে এক কুমীরের গায়ে পা রেখেছে। কি সর্বনাশ! কুমীরটা জল ছেড়ে সিঁড়ির উপর এসে শুয়েছে। সারদার হাতে আলো নেই, ঘোর অন্ধকার, দেখতে পায়নি। দিব্যি পা রেখে দাঁড়িয়েছে তার উপর। ভাগ্যিস সাড়া পেয়ে কুমীর লাফিয়ে পড়ল জলের মধ্যে, নইলে কি হত কে জানে।

বৃন্দাবনে মা এসেছেন তীর্থ করতে। শুনেছেন এখানে কোন নির্জনে গৌরী-মা আছে নিরুদ্দেশ হয়ে। খুঁজতে-খুঁজতে পাওয়া গেল তাকে এক গুম্ফার মধ্যে। রাতে ধুনি জ্বালালো গৌরী। ধুনি জেবলে কথা কইছে মায়ে-ঝিয়ে এমন সময় বিশাল দুটো সাপ এসে ঢুকল।

'ও গৌরদাসী, কি হবে গো, দুটো সাপ যে।' ভয়ে মা কুঁকড়ে গেলেন।

গৌরী-মা বললে, 'ব্রহ্মময়ীকে দর্শন করতে এসেছে। কিছু ভয় নেই পেসাদ পেয়ে এখুনি চলে যাবে।' দামোদরের প্রসাদ ঢাকা ছিল, তাই কিছু মাটিতে ঢেলে দিল গৌরী-মা। দিব্যি তা শেষ করে চলে গেল সাপ দুটো।

গোলাপ মা কথায়-কথায় বললে একদিন যোগেন-মাকে, 'দেখ যোগেন, ঠাকুর বোধহয় মা'র উপর রাগ করে কলকাতা চলে গেলেন।'

'সে কি কথা ? অসুখের জন্যে গেলেন যে ? ভালো-ভালো ডাক্তার-বদ্যি দেখিয়ে চিকিৎসা করাবেন !' যোগেন-মা প্রতিবাদ করল।

'বাইরে থেকে দেখতে তাই বটে,' গোলাপ-মা কণ্ঠস্বর একটু আচ্ছন্ন করলে, 'কিন্তু আমার মনে হয় আসল কারণ অন্য রকম। ঠাকুর চটেছেন মা'র উপর।'

যোগেন-মা সোজা বললে এসে মাকে। তাই ? সত্যি ?

মা তো কেঁদে আকুল। কলকাতায় গিয়ে উঠলেন ঠাকুরের পার্শ্বটিতে। ছলছল চোখে জিগগেস করলেন, 'তুমি নাকি আমার উপর রাগ করে চলে এসেছ ?'

'সে কি কথা ? এ-কথা তোমাকে কে বললে ?'

'গোলাপ বলেছে।'

'গোলাপ বলেছে ? কি আশ্চর্য ! এই কথা বলে কাঁদিয়েছে তোমাকে ?' ঠাকুর চটে উঠলেন : 'কোথায় সে ? ডাকো তাকে।'

মা তখন শান্ত হলেন। শান্ত হয়ে ফিরে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। তাঁর বন্দী-ঘরে। ভব মুখুজ্জের মেয়েকে ডেকে শিখতে লাগলেন প্রথম-পাঠ।

গোলাপ-মাকে বকে দিলেন ঠাকুর। বললেন, 'তুমি কি বলে ওকে কাঁদিয়েছ শুনি ? তুমি জানো না ও কে ? যাও এখুনি গিয়ে ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে এস।'

বিমনার মত গোলাপ-মা পায়ে হেঁটে চলে গেল দক্ষিণেশ্বর। কেঁদে পড়ল মা'র কাছে। বললে, 'আমি না বুঝে ও কথা বলেছিলাম ! তুমি যদি এখন—'

মা কথা কইলেন না। শুধু একটু হাসলেন। 'ও গোলাপ,' 'ও গোলাপ,' 'ও গোলাপ' বলে তিনটি চাপড় মারলেন তার পিঠে। সব কষ্টভার নিমেষে নেমে গেল। সব মনস্তাপ যেন উড়ে গেল হাওয়ায়।

কবরেজরা এসে জবাব দিলে। শাস্ত্রে চিকিৎসার বিধান থাকলেও এ রোগের সুরাহা নেই। অগত্যা ডাক্তারি। এলোপ্যাথির কড়া ওষুধ সইবে না ঠাকুরের ধাতে। সুতরাং মহেন্দ্র সরকারকে ডাকো। হোমিওপ্যাথিতে তার বিরাট নাম-ডাক। হয়তো এক ফোঁটায় করে ফেলবে অসাধ্যসাধন।

কিন্তু শুধু ওষুধটি হলেই তো চলবে না, সেবা চাই। ভক্তেরা প্রাণ দিতে পারে ঠাকুরের জন্যে কিন্তু যে কোমলতা যে চারুতাটুকু মিশলে সেবাটুকু সুস্বাদু হয় তা তারা পাবে কোথায় ? তা ছাড়া পথ্য রাঁধবে কে ? ঠিক-ঠিক পরিমাণে বস্তু আর মশলা মিশিয়ে রান্না করলেই তো পথ্য হয় না, তার মধ্যে হৃদয়ের স্নেহসারটুকু মেশাবে কে ?

ভক্তেরা ঠিক করলে, মাকে নিয়ে আসি। ঠাকুরের কাছে তুললে সে প্রস্তাব। মন তো চায় ষোলো আনা কিন্তু এখানে সে থাকবে কি করে ? তেমন ব্যবস্থা কই ? তার অবগুণ্ঠনটি কুণ্ঠিত হবে না তো ?

'এখানে এসে থাকতে পারবে ?' চিন্তান্বিত দেখাল ঠাকুরকে : 'থাকবার তেমন ঘর-দোর কই ? যাই হোক সব কথা খুলে-মেলে বলো গে তাকে, আসতে হলে আসুক।'

চলে তো চলুক—এ পানিহাটির উৎসবে যাওয়া নয়। খবর পেয়ে মা হাওয়ার সঙ্গে ছুটে এলেন। ঘর-দোরের ভালো ব্যবস্থা নেই, কি এসে যায় ! যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন—ঠাকুরের এই মন্ত্র সার করে ঠিক মানিয়ে থাকতে পারবে। যারা মা নিয়ে থাকবে তাদের সঙ্গে মানিয়ে থাকার হ্যাঙ্গাম কি।

দোতলায় ঠাকুরের ঘর, পশ্চিমে কোণের দিকে মা'র। কিন্তু সমস্ত দিন কাটান তিনি তেতলায় ছাদের দরজার পাশে ছোট একটু ঘেরা চাতালে। লম্বায়-চওড়ায় হাত চারেকের বেশি নয়। সমস্ত দিন কাটান মানে রাত তিনটেয় উঠে আসেন আর রাত এগারোটায় শুতে যান। রাত এগারোটায়, যেহেতু তখন সমস্ত বাড়ি ঘুমে নিঝুম হয়ে গিয়েছে। তিনটের সময় ওঠেন, এই প্রায় চিরকালের অভ্যেস। তা ছাড়া এ বাড়িতে একটি মাত্র কলচৌবাচ্চা, তাই রাত থাকতে উঠে স্নানাদি সেরে না নিলে অনুপায়। এক মহল বাড়ি, বাড়িতে অগুনতি পুরুষ, অনেকেই অচেনা। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সকলের চোখের আড়ালে স্নান-টান সেরে উঠে এস চাতালে। সেখানে বসে সারা দিনমান যখন যেটুকু দরকার ঠাকুরের পথ্য রাঁধো। বুড়ো-গোপাল আর লাটু—এদের সঙ্গেই মা যা কথা কন। এরাও টের পায় না কখন মা চাতালে ঢোকেন আর কখনই বা রাত করে নেমে যান তাঁর দোতলার ঘরটিতে।

তেতলার উপরে ঐ ছোট্ট চাতালটিই মা'র নিশ্চিন্ত নিভৃতি, কিন্তু সর্বক্ষণ মনটি পড়ে আছে ঠাকুরের পাশটিতে। নিজের হাতে পথ্যটি শুধু রাঁধলেই তৃপ্তি নেই, নিজের হাতে খাওয়াতে বড় সাধ। এক-একদিন রুপার হাওয়াটি ঠিক আসে, সুযোগ পেয়ে যান। বুড়ো-গোপাল আর লাটু ঘর থেকে লোক সরিয়ে দেয়, ঠাকুরের কাছটিতে বসে খাইয়ে দেন যত্ন করে। কোনো-কোনো দিন বিধি বাম হন, এত ভিড় থাকে যে সরানো যায় না। তখন ভক্তরাই কেউ পথ্য-জল নিয়ে আসে উপর থেকে। হায়, আজ তোমাকে খাওয়াতে পারলুম না কাছে বসে। কিন্তু কি করবো, তুমি তো আমার একলার নও, তুমি সকলের।

দিনের পর দিন সর্বংসহা অশেষ ক্লেশ সইছেন। শারীরিক ক্লেশ। তবু হাল ছাড়ছেন না, ভেঙে পড়ছেন না। রোগরাত্রির পরে আরোগ্যের সুপ্রভাতটির জন্যে প্রতীক্ষা করছেন এক মনে। কিন্তু কই, অসুখ সারছে কই? রোগ ক্রমশই বৃদ্ধির মুখে। ঠাকুরকে কলকাতার বাইরে একটু কোথাও ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গেলে বোধ-হয় ভালো হয়। তাই ভেবে কাশীপুরের গোপাল ঘোষের বাগানবাড়ি ভাড়া নেওয়া হল। আশি টাকা ভাড়া। কে দেবে এত টাকা? সুরেন মিত্তির বললে, আমি দেব।

অঘ্রান মাসের শেষাশেষি শ্যামপুকুর ছেড়ে চলে এলেন কাশীপুরে।

বেশ বাগানওয়ালা বাড়ি, চারদিকের সবুজের গায়ে নানা রঙের বুনন, নানা ফুলের কারুকাজ। দোতলা বাড়ি, উপরের হলঘরে ঠাকুরের জায়গা। দক্ষিণে ছোট একটি ঘেরা ছাদ, সকাল-বিকেল সেখানে একটু হাঁটেন, কখনো বা বসেন একটু নিরালায়। মা'র ঘর নিচে, পুবের দিকে। সঙ্গ দেবার জন্যে এবার লক্ষ্মী এসেছে, ডেরা নিয়েছে মা'র ঘরে। মা'র কাজ ডাক্তারের ব্যবস্থামত পথ্য রাঁধা আর দুবেলা খাইয়ে আসা নিজের হাতে। শুধু এইটুকু? আর ঊর্ধ্বমুখ শিখার মত অহরহ একটি অনির্বাণ প্রার্থনা: ঠাকুরকে ভালো করো। ঠাকুরকে বাঁচিয়ে রাখো।

একদিন ঠাকুর বললেন মাকে, 'যারা লাভের আশায় এসেছিল তারা সব চলে যাচ্ছে। বলছে, উনি অবতার ওঁর আবার ব্যারাম কি। ও সব মায়া! কিন্তু যারা আমার আপনার জন, তাদের আমার এ কষ্ট দেখে বুক ফেটে যাচ্ছে—'

নরেন রাখাল নিরঞ্জন লাটু যারা ঠাকুরের সেবা করছে অহোরাত্র তারা একদিন

ঠিক করলে বাগানের ও-পাশে যে একটা খেজুরগাছ আছে সন্ধের সময় তার জিরেনের রস চুরি করে খাবে। ঠাকুর তখন বিছানায় শুয়ে, এত দুর্বল হাঁটতে-উঠতে পারেন না। এ অবস্থায় এ কথা ঠাকুরকে জানানোর কোনো মানে হয় না। সন্ধে হতে না হতেই চলল সবাই গাছের দিকে। দল বেঁধে। এমন সময় মা সহসা দেখতে পেলেন তাঁর ঘর থেকে, ঠাকুর তীরবেগে নিচে নেমে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। এ কি অঘটন! বিছানায় যাকে পাশফিরিয়ে দিতে হয় সেএমনি ছুটে বেরিয়ে যেতে পারে! নিশ্চয়ই ভুল দেখেছি চোখে। ত্বরিত পায়ে মা উঠে এলেন উপরে, ঠাকুরের ঘরে। ওমা, কি সর্বনাশ, ঠাকুর তাঁর বিছানায় নেই, ঘর ফাঁকা। এদিক-ওদিক খোঁজা-খুঁজি করলেন, অনর্থক নিচেই নেমে গিয়েছেন নির্ঘাত। ভয়ে-ভয়ে মা তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, ঢুকেই আবার দেখতে পেলেন যেমন বেগে গিয়েছিলেন তেমনি বেগে ঠাকুর আবার উঠে যাচ্ছেন উপরে, সিঁড়ি বেয়ে। উপরে উঠে, দেখতে পেলেন, দিব্যি ভালোমানুষটির মত শুয়েছেন তাঁর রোগশয্যায়।

পর দিন পথ্য খাওয়াবার সময় মা পাড়লেন কথাটা। ঠাকুর প্রথমে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। বললেন, 'ও রেঁধে তোমার মাথা গরম।'

কিন্তু সহজে ছাড়বেন না এবার মা। তিনি দেখেছেন স্বচক্ষে।

'তুমি দেখেছ নাকি?' ঠাকুর বললেন ঘনিষ্ঠ সুরে, 'ছেলেরা সব এখানে এসেছে, সবাই ছেলেমানুষ। তারা আনন্দ করে রস খেতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি দেখলুম ঐ খেজুর গাছতলায় একটা কালসাপ রয়েছে। ভীষণ রাগী সেই সাপ, ছেলেদের পেলেই কামড়ে দিত। তাই অন্যপথ দিয়ে তাড়াতাড়ি সেই গাছতলায় চলে গেলাম, ছেলেদের পৌঁছুবার আগেই। গিয়ে বাগান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে এলাম সাপটাকে। বলে এলাম, আর কখনো ঢুকিসনে। শোনো, তুমি যেন একথা এখন বোলো না কাউকে।'

খাওয়ার মধ্যে একটু সুজি, তাও ছেঁকে দিতে হয়। নয়তো একটু মাংসের জুস। ছিবড়ে খেয়ে-খেয়ে দুটো মরা কুকুর মোটা হয়ে গেল। মাংস রাঁধবার কায়দা আছে। কাঁচা জলে মাংস দিয়ে তেজপাতা আর অল্প খানিকটা মশলা দিয়ে তুলোর মতন সেদ্ধ করে নামিয়ে নেওয়া। সেবার ব্যবস্থা হল শামুকের ঝোল। এবার মা প্রতিবাদ করলেন। বললেন, 'এগুলো জীয়ন্ত প্রাণী, ঘাটে দেখি চলে বেড়ায়! এদের মাথা আমি ইট দিয়ে ছেঁচতে পারব না।'

'সে কি?' ঠাকুর বললেন, 'আমি খাব। আমার জন্যে করবে!'

আর কথা নেই। রোখ করে করতে লাগলেন।

অকালে আমলকী খেতে চাইলেন ঠাকুর। দুর্গাচরণ বেরিয়ে গেল। তিন দিন আর তার দেখা নেই। তিন দিন পর গোটা দুই তিন আমলকী নিয়ে হাজির। বেশ বড় আমলকী। ঠাকুরের আমলকী হাতে করে সে কি কান্না! বললেন, 'আমি ভেবেছিলুম ঢাকা-টাকা চলে গেল বুঝি। ওগো,' মা'র উদ্দেশে হাঁক দিলেন, 'বেশ ঝাল দিয়ে একটা চচ্চড়ি রেঁধে দাও। ওরা পূর্ববঙ্গের লোক, ঝাল বেশি খায়।'

রোজ তিন-রকম রান্না করেন মা। ঠাকুরের এক রকম, নরেনদের আরেক রকম। তৃতীয় রকম আর সবাইয়ের। এবার দুর্গাচরণের জন্যে নতুন রকম। তাই সই। যে সন্তানের যেমন রোচে তেমনিই রেঁধে দেন মা। ছেলের স্বাদেই মা'র আস্বাদন।

বাটিতে আড়াই-সের দুধ নিয়ে উপরে উঠছেন মা, মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন হঠাৎ। বাটি ছিটকে পড়ল মেঝের উপর, শুধু তাই নয়, মা'র পায়ের গোড়ালির হাড় গেল সরে। কাছাকাছি কোথায় ছিল নরেন আর বাবুরাম, মাকে এসে ধরে ফেললে।

কানে গেল ঠাকুরের। বাবুরামকে ডাকিয়ে আনলেন। বললেন, 'হ্যাঁ রে বাবুরাম, আমার এখন খাওয়ার কি উপায় হবে?'

ঠাকুর মণ্ড খান। সে মণ্ড মা তৈরি করেন। মা খাইয়ে দিয়ে আসেন।

'এখন আমার মণ্ড তবে কে রাঁধবে? কে খাইয়ে দেবে?'

পা ভীষণ ফুলে উঠেছে মা'র, ভীষণতরো যন্ত্রণা। অসম্ভব নড়া-চড়া, ওঠা-চলা তো দুরুস্থান। গোলাপ-মা রেঁধে দিচ্ছে মণ্ড। নরেন খাইয়ে দিচ্ছে নিজের হাতে। গোলাপ-মা যেন মা'র ছায়া।

রাঁচি থেকে এক ভক্ত এসেছে, সংগে অনেক ফুল-ফল, কাপড়, আবার একছড়া কাপড়ের গোলাপের মালা। কাপড়ের বটে কিন্তু মনে হয় সদ্য-সদ্য যেন ফুটে রয়েছে ফুলগুলো। ভক্তটির ইচ্ছে মা গলায় পরেন একবার মালাটি।

ভক্তের মনের কামনা পূর্ণ করলেন মা। পরলেন। মালায় লোহার তার দিয়ে বাঁধা। তাই দেখে রুখে এলো গোলাপ-মা। বললে, 'কেমনতরো ভক্ত গা তুমি? লোহার কাঁটা-ওয়ালা মালা এনেছ? এই মালা পরলে গলায় লাগবে না মা'র?' ভক্তটিকে অপ্রতিভ হতে দেখে মাও অপ্রস্তুত হলেন। বললেন, 'না না, লাগছে না, কাপড়ের উপর দিয়ে পরেছি।'

এই না হলে করুণাময়ী!

নরেন বললে, 'মা, আমার আজকাল সব উড়ে যাচ্ছে। সবই দেখছি উড়ে যায়।'

কুণ্ঠিত মুখে হাসি এঁকে মা বললেন, 'দেখো আমাকে যেন উড়িয়ে দিও না।'

'তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায়? যে জ্ঞানে গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দেয় সে তো অজ্ঞান। গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়ায় কোথায়?'

বোধগয়ার মঠে এসেছেন শ্রীমা, কত তাদের ঐশ্বর্য-প্রাচুর্য, দেখে-দেখে মা কাঁদেন। আর ঠাকুরকে বলেন, 'ঠাকুর, আমার ছেলেরা থাকতে পায় না, খেতে পায় না, দোরে-দোরে ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়। তাদের যদি অমন একটি থাকবার জায়গা হত!'

তা ঠাকুরের ইচ্ছায় মঠটি হল। ক্রমে-ক্রমে ঐশ্বর্য-প্রাচুর্যও হল মন্দ নয়। মঠের নতুন জমি কেনবার পর নরেন মাকে নিয়ে এল দেখাতে। জমির চার-সীমা দেখালে ঘুরে-ঘুরে। বললে, 'মা, এ তোমার নিজের জায়গা। তুমি আপন জায়গায় আপন মনে হাঁপ ছেড়ে ঘুরে বেড়াও।'

বাবুরামকে নিজের কাছটিতে ডেকে আনলেন ঠাকুর। নিজের নাকের কাছে হাত ঘুরিয়ে ঠারে-ঠোরে বললেন, 'একবারটি ওকে এখানে নিয়ে আসতে পারিস?'

বাবুরাম নির্বাক। যে লোক মাটিতে পা ফেলতে পারে না সে সিঁড়ি ভেঙে আসবে কি করে উপরে? এ কেমনতরো রসিকতা!

রসিকতা নয়, স্নেহ! অন্তরমাধুরী।

বেশ তো, রসিকতাই করলেন ঠাকুর। বললেন, 'একটা ঝুড়ির মধ্যে বসিয়ে দিব্যি মাথায় করে তুলে নিয়ে আসবি। কি রে, পারবি নে?'

* উনিশ *

দিন ঘনিয়ে আসছে। রোগে ভুগে-ভুগে কী চেহারা হয়ে গিয়েছে ঠাকুরের!

নিজের দিকে সংকেত করে বলছেন ঠাকুর: 'এর ভিতর মা স্বয়ং ভক্ত হয়ে লীলা করছেন। যখন প্রথম ঐ অবস্থা হল তখন জ্যোতিতে দেহ জ্বল-জ্বল করত। বুক লাল হয়ে যেত। তখন বললুম, মা, বাইরে প্রকাশ হয়ো না, ঢুকে যাও। তাই এখন এই হীন দেহ।'

পলতে দিয়ে গলার ঘা পরিষ্কার করছেন শ্রীমা। 'উঁহু, কি করছ? পলতে দিচ্ছ? আচ্ছা দাও।' সেবাটি নিচ্ছেন সহিষ্ণুর মত।

আবার বলছেন আগের কথার জের টেনে: 'সে রকম জ্যোতির্ময় দেহ থাকলে লোকে জ্বালাতন করত। ভিড় আর কমত না। এখন বাইরে কোনো প্রকাশ নেই। এতে আগাছা পালায়, যারা শুদ্ধ ভক্ত তারাই কেবল থাকবে। এই ব্যারাম হয়েছে কেন? এর মানে ঐ। যাদের সকাম ভক্তি, তারা ব্যারাম অবস্থা দেখলে চলে যাবে।'

পাপ গ্রহণ করে ঠাকুরের ব্যাধি। বললেন শ্রীমা, 'গিরিশের পাপ। ঠাকুরের ইচ্ছা-মৃত্যু ছিল। সমাধিতে দেহ ছাড়তে পারতেন অনায়াসে। বলতেন, আহা ছেলেদের একটা ঐক্য করে বেঁধে দিতে পারতুম। তাই অত কষ্টেও দেহ ছাড়েননি।'

'গিরিশবাবু নাকি মঠে অনেক টাকা দিয়েছেন?' কে একজন জিগ্গেস করল শ্রীমাকে।

'সে আর কি দিয়েছে!' বললেন শ্রীমা, 'বরাবর দিয়েছিল বটে সুরেশ মিত্তির।' হঠাৎ কেমন আর্দ্র হলেন গিরিশের জন্যে। বললেন, 'তবে হ্যাঁ, কতক-কতক দিয়েছে বই কি। সে তেমন হাজার-দু-হাজার নয়। দেবেই বা কোত্থেকে? তেমন টাকাই বা কোথায়? আগে তো পাষণ্ড ছিল, অসৎ সংগে মিশে থিয়েটার করে বেড়াত। বড় বিশ্বাসী ছিল তাই তো কৃপা পেয়েছিল ঠাকুরের। এক-এক অবতারে এক-এক পাষণ্ড উদ্ধার করেছেন। যেমন গৌর অবতারে জগাই-মাধাই, রামকৃষ্ণ অবতারে গিরিশ ঘোষ।'

একটি মেয়ে এসেছে মা'র কাছে, মনে অনেক দুঃখ নিয়ে। আশা, মা বুঝবেন এই অকথিত ব্যথা, বুলিয়ে দেবেন তাঁর মমতার হাত।

ঠিক তাই। 'দেখ মা, সকলেই বলে এ দুঃখ, ও দুঃখ, ভগবানকে এত ডাকলুম তবু দুঃখ গেল না। নাই বা গেল! দুঃখই তো ভগবানের দয়া।'

কিছুক্ষণ থেমে বললেন আবার মা, 'সংসারে দুঃখ কে না পেয়েছে বলো? বৃন্দে বলেছিল, কৃষ্ণকে, কে তোমাকে দয়াময় বলে? যে কেবল কাঁদায় তার আবার দয়া! রাম অবতারে সীতাকে কাঁদিয়েছ, কৃষ্ণ অবতারে রাধাকে! আর কংস-কারাগারে দিন-রাত দুঃখে-কষ্টে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ করেছে তোমার বাপ-মা। তবু তোমাকে ডাকি কেন? তোমার নামে যম-ভয় থাকে না।'

ঠাকুরও কি কাঁদাচ্ছেন শ্রীমাকে?

হত্যে দিলেন কিছু হল না, ভবতারিণীর দুয়ারে গেলেন, দেখলেন তাঁর নিজের গলাতেই ঘা। দিন কি তবে সত্যিই এল ঘনিয়ে?

পয়লা ভাদ্র সোমবার, বারো শো তিরানব্বুই সাল, ঠাকুর দেহ রাখলেন। সেদিন কি হল, খিচুড়ি রাঁধছিলেন মা, খিচুড়ি ধরে গেল, পুড়ে গেল নিচের দিকটা। উপর-উপর সেই খিচুড়িই খেল ছেলের দল। শুধু তাই নয় ছাতে মা'র একখানা কুঞ্জদার শাড়ি শুকোচ্ছিল তাই চুরি হয়ে গেল !

মা মাতৃহারা শিশুর মত কেঁদে উঠলেন : 'আমার কালী-মা কোথায় গেলে গো—'

কালী-মাই তো। রাখাল যখন এল দক্ষিণেশ্বরে, কোথায় ঠাকুর, এ যে কেশ এলিয়ে কালী-মা বসে আছেন। রাখাল তাঁর কোলে গিয়ে বসল। তারক যখন এল দক্ষিণেশ্বরে, সেও তাই দেখলে, ঠাকুর নয়, মা বসে। তাঁর কোলে মাথা রেখে সে প্রণাম করল। ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের মত শুয়ে আছেন, কিন্তু মা দেখছেন বরাভয়-ময়ী প্রচণ্ডিকা।

কামারপুকুরে আছেন তখন মা, একদিন ঠাকুর এসে দেখা দিলেন। বললেন, 'খিচুড়ি খাওয়াও।'

সেদিন, সেই শেষ দিনের খিচুড়ির কথা কি জানতে পেরেছিলেন ?

খিচুড়ি রেঁধে রঘুবীরকে ভোগ দিলেন শ্রীমা। হিন্দুস্থানী ঠাকুর কিনা তাই খিচুড়ি।

এইবার বুঝি বিহিত পোশাক পরতে হয় মাকে। রক্তিম থেকে যেতে হয় শুভ্রতায়। হাতের বালা খুলতে যাচ্ছেন, কোত্থেকে ঠাকুর এসে খপ করে তাঁর হাত চেপে ধরলেন। বললেন, 'ও কি করছ ? আমি কি কোথাও গেছি ? এ-ঘর থেকে ও-ঘর।'

এ-ঘর থেকে ও-ঘর। ছোট্ট কটি কথায় ঠাকুর বুঝিয়ে দিলেন জীবন-মৃত্যু, ইহকাল-পরকাল ! মাঝখানে শুধু একটি চৌকাঠের ব্যবধান। পাশের ঘরে লোক আছে, দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তার অস্তিত্বের আভাসে সমস্ত অনুভব ভরে আছে—তেমনিই তো পরকালের প্রতি ইহকালের সংবর্ধনা। এবাড়ি-ওবাড়ি নয় যে অন্তত একটা রাস্তা বা একটুখানি জমির অবকাশ থাকবে—একেবারে এ-ঘর ও-ঘর। অত্যন্ত কাছাকাছি, নিবিড়তম প্রতিবেশী। মাঝখানে শুধু একটি দুয়ার। নিরর্গল। কান পাতলেই শোনা যায় কথাবার্তা, চলা-ফেরা—শুধু চোখেই বুঝি দেখা যায় না ! কে বলে, তেমন-তেমন লোক হলে তাও দেখে।

বৃন্দাবনে তীর্থ করতে এসে হাতের বালা আবার খুলতে গেলেন শ্রীমা। ঠাকুর দেখা দিলেন। বললেন, 'তুমি হাতের বালা ফেলো না। আজ বিকেলে গৌরমণি আসবে, তার কাছ থেকে জেনে নেবে বৈষ্ণবতত্ত্ব।'

কোথায় গৌরদাসী ! বৃন্দাবনে কোথায় তপস্যায় বসেছে তা কে জানে ! ঠাকুর তাকে দেখা দিয়ে বললেন, 'যাও তোমার মা'র কাছে, তাঁকে বৈষ্ণবতত্ত্ব শিখিয়ে এস।'

বিকেলে ঠিক গৌরী-মা এসে হাজির। সে বুঝিয়ে দিল সহজ করে। কৃষ্ণ পতি যার, সে চিরসধবা। তার চিন্ময় স্বামী। বিশ্বময় প্রাণদ্যুতি।

বৃন্দাবন থেকে যখন ফিরে এলেন কামারপুকুরে তখন আবার লোকের ভয়ে খুলে ফেললেন হাতের বালা। এ ও বলছে, ও তা বলছে। কান পাতা দায়।

গভীরের কথা কে বোঝে, চোখে দেখেই লোকের ঝাঁজ। তা ছাড়া, গঙ্গা নেই কি করে থাকবে এখানে ? ঠাকুর আবার দেখা দিলেন। শ্রীমা দেখলেন ঠাকুরের পা থেকেই জলের ফোয়ারা ছুটেছে, ঢেউ খেলে যাচ্ছে মাঠ ছাপিয়ে। তবে আর ভয় কি। তাঁর পাদপদ্ম থেকে গঙ্গা, তিনিই তো আছেন সামনে। জবাফুল ছিঁড়ে-ছিঁড়ে মুঠো-মুঠো ফেলতে লাগলেন শ্রীমা।

কে আর ভয় করে লোকনিন্দা। চিত্তানন্দ যেখানে নিত্যানন্দ হয়ে আছেন লোক-নিন্দা তার কি করবে ? এ সব তো পরের কথা। কিন্তু সদ্য-সদ্য বিচ্ছেদের দুঃখে মা যখন ছিন্নভিন্ন, তখন বলরাম বোস একখানা থান ধুতি কিনে এনেছে। গোলাপ-মাকে ডেকে এনেছে মাকে দেবার জন্যে। গোলাপ-মা তো স্তম্ভিত ! কোন প্রাণে এ থান তাঁর হাতে দেব ? সেই আনন্দের রক্তিমাকে কি করে বিষাদের তুষারে শুভ্র করে দেব ?

গোলাপ-মা দেখল, মা নিজ হাতেই তাঁর শাড়ির লাল পাড় ছিঁড়ে ফেলছেন ! সম্পূর্ণ নয়, অধিকাংশ। রক্তিমার সেই ক্ষীণ প্রতীকটি বরাবর বজায় রেখেছেন মা। মাথার পিছনের দিকে ঘাড়ের কিছু উপরে একটি সিন্দুরকণাও লালন করেছেন। তিনি যে প্রসন্নোজ্জ্বলা শ্রীমতী। আর ঠাকুর সর্বরসকদম্বমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ।

'ওগো তোমরা কিছু ভেবো না।' বললেন ঠাকুর, 'এর পর ঘরে-ঘরে আমার পুজো হবে। মাইরি বলছি—বাপান্ত দিব্যি। আমার যে কত লোক তার কুল-কিনারা নেই।'

নিবেদিতা বললেন, 'মা, আমরাও বাঙালি। কর্মবিপাকে জন্মেছি ওদেশে। তা দেখবে আমরাও ঠিক-ঠিক বাঙালি হয়ে যাব।'

'মা, ধ্যান-ট্যান তো কিছুই হয় না।' সরল মনে মা'র কাছে কেঁদে পড়ল ভক্ত।

'নাই বা হল।' সরলা মা দুঃখভার উড়িয়ে দিলেন এক ফুঁয়ে : 'শুধু ঠাকুরের ছবি দেখলেই হবে।'

'যথানিয়মে তিন বেলা জপ করাও হয়ে ওঠে না।'

'নাই বা হল। স্মরণমনন থাকলেই যথেষ্ট। যখন পারবে তখনই জপ করবে। অন্তত প্রণাম তো আছে।'

ঠাকুর কি বাঁধা-ধরার মধ্যে ? নিয়মকানুনের বেড়া দিয়ে ঘেরা ? তিনি মুক্ত-মাঠের খোলা হাওয়া। তিনি ঘুমের মধ্যেও কাজ করেন নিশ্বাসের মত। কাজের মধ্যে যখন তাঁকে ভুলে থাকি তিনি সেই বিস্মৃতিটি হয়েই জেগে থাকেন কাজের মধ্যে। এক মুহূর্তের জন্যেও ছেড়ে যান না, ফেলে যান না। নিজেকে ভালো করে নামিয়ে নিয়ে আসার নামই তো প্রণাম। নামিয়ে আনার সঙ্গে-সঙ্গেই দেখি তিনিও নেমে এসেছেন। তখন প্রেমে তরল-সমতল। ঠাকুরের এই যে ভাবের সরলতা সেইটিই তো সারদামণি।

গৃহীভক্তরা বললে, আর কি, ঠাকুর নেই, এবার ভেঙে দাও কাশীপুরের সংসার। তা হলে মা কোথায় যাবেন ? নরেন আর তার সাঙ্গোপাঙ্গেরা বাধা দিল। কোন প্রাণে মাকে নিরাশ্রয় করব ? ঠাকুরের শেষ কটি দিন যেখানে কেটেছে, কটা দিন সেখানে তিনি কাটিয়ে যান। খাওয়াবে কি ? ভয় নেই, দরকার হয় তো ভিক্ষে করে খাওয়াব।

'নরেন আমার খাপখোলা তরোয়াল।'

বরানগর মঠে যখন ওরা ছিল, আহা, কতদিন আধপেটা খেয়ে কাটিয়েছে ধ্যান-জপে। একদিন সকলে ঠিক করলে দোর ধরে পড়ে থাকবে, ভিক্ষে করতেও বেরুবে না রাস্তায়। যাঁর নামে সব ছেড়েছুড়ে এলুম, দেখি তাঁর নাম নিয়ে পড়ে থাকলে তিনি খেতে দেন কিনা। চাদর মুড়ি দিয়ে সবাই লম্বা ধ্যান লাগিয়ে দিলে। আমাদের টান, তাঁর দান, দেখি আমাদের টানে তিনি দান করেন কিনা। আমাদের নাম, তাঁর দাম, দেখি তাঁর নামের কোনো দাম আছে কিনা। দুপুর গেল, সন্ধ্যা গেল, রাতও এল এখন নিবিড় হয়ে। কোথাও কিছুর দেখা নেই। না থাক, রাত পুইয়ে দেব। দেহ দড়ি পাকিয়ে শুকিয়ে মরবে। যদি খাদ্য না জোটান তবে এ দেহ রেখে লাভ কি!

দরজায় কে ঘা মারল।

নরেন উঠল লাফিয়ে। বললে, 'দ্যাখ তো দরজা খুলে, কে এল?'

গঙ্গার ধারের শ্রীশ্রীগোপালের বাড়ি, লালাবাবুর মন্দির থেকে খাবার এসেছে ভুরি-ভুরি। কে পাঠালো রে এ খাবার?

আর কে! যাঁর দয়া তাঁরই দয়া। ডাকাবেন অথচ খাওয়াবেন না? সব জায়গা কেড়ে নেবেন, শেষে বঞ্চিত করবেন কোল থেকে?

ওরে, আগে ঠাকুরের ভোগরাগ দে। তবে প্রসাদ।

দিন পাঁচেক পরে লক্ষ্মীকে নিয়ে মা চলে এলেন বলরামের বাড়ি।

এদিকে ঠাকুরের চিতাভস্ম নিয়ে ঝগড়া বেধেছে দুই দলে। এক দিকে রাম দত্ত আর অন্যান্য গৃহীভক্ত, অন্য দিকে নবীন সন্ন্যাসীরা। রাম দত্তের ইচ্ছে ভস্ম রাখা হোক তার বাগানে, কোনো মন্দির বা সৌধের আশ্রয়ে। তা কেন, সন্ন্যাসীরা বললে, এ ভস্মে আমাদের উত্তরাধিকার। বাইরে থেকে দেখতে গেলে, রাম দত্তই জিতল সেই যুদ্ধে, ভস্মের কলসী সেই হাত করলে। কিন্তু তার আগেই অধিকাংশ ভস্ম সরিয়েছে সন্ন্যাসীরা। কলসী হালকা করে দিয়েছে।

এই নিয়ে মা দুঃখ করছেন। বলছেন গোলাপ-মাকে, 'এমন সোনার মানুষ চলে গেল, অথচ দেখ তাঁর ভস্ম নিয়ে কেমন ঝগড়া করছে এরা।'

* কুড়ি *

দিন দশেক পরে মা বেরিয়ে পড়লেন তীর্থে। সঙ্গে যোগেন, কালী, লাটু, লক্ষ্মী, গোলাপ-মা, মাস্টার-মশাই আর তাঁর স্ত্রী নিকুঞ্জ দেবী।

'আমি যে-যে তীর্থে যাইনি, তুমি সব দেখে এসো, ঘুরে এসো।' মাকে বলেছিলেন ঠাকুর।

বৃন্দাবনের পথে প্রথমে দেওঘর, পরে কাশী, শেষ দিকে অযোধ্যা। কাশীতে বিশ্বনাথের আরতি দেখে মা'র ভাব হল। পায়ে-পায়ে দুম-দুম শব্দ করতে-করতে রাস্তা কাঁপিয়ে ফিরে এলেন বাড়ি। বললেন, ঠাকুরই টেনে নিয়ে এলেন হাত ধরতে।

স্বামী ভাস্করানন্দের সঙ্গে দেখা হল কাশীতে। আহা, কি নির্বিকার মহা-পুরুষ ! শীতে-গ্রীষ্মে সমান দিগম্বর হয়ে বসে আছেন।

শঙ্কা মৎ কর মায়ী, তোমরা সব জগদম্বা, সরম কেয়া ?

ভোলানাথের মত বসে আছেন আত্মভোলা হয়ে। মুক্তসমস্তসঙ্গ হয়ে। দেহ-বুদ্ধির লেশ রাখছেন না কোথাও। নিজেও শিশু আর সকলের চোখেও অদেহ-দর্শিতা।

ঠাকুরের সোনার ইষ্টকবচ দিয়ে দিয়েছেন মাকে। দিয়েছেন অসুখের সময়। দক্ষিণ বাহুমূলে তাই পরে রেখেছেন মা। শুধু তাই নয়, পরা নয়, রোজ পুজো করেন সেই কবচ। ট্রেনে শুয়েছেন কিন্তু তন্দ্রার ঘোরে হাত উঠে এসেছে খোলা জানলার উপর। হঠাৎ ঠাকুর মুখ বাড়িয়ে দিলেন জানলার মধ্য দিয়ে। বললেন, 'ওগো শুনছ ? হাতের ইষ্টকবচ এমন করে রেখেছ কেন অসাবধান হয়ে ? ও যে চোর খুলে নিতে পারে অনায়াসে।'

হাত তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিলেন মা। কবচ খুলে ফেললেন। একটি টিনের বাক্সে রেখে দিলেন তুলে। এই টিনের বাক্সেই তাঁর নিত্যপুজোর ঠাকুরের ছবিখানি। মনের নিভৃত মঞ্জুষায় সেই একটি অদ্বিতীয় স্মৃতি।

বৃন্দাবনে এসে মা বড় কাঁদেন। লুকিয়ে-লুকিয়ে কাঁদেন একা একা। যোগেন-মা কাছে এসে বসলে দুজনে কাঁদেন।

যোগেন-মাকে একদিন দেখা দিলেন ঠাকুর। বললেন, 'হ্যাঁ গা, এত কাঁদছ কেন তোমরা ? আমি কি কোথাও গেছি ? এই তো রয়েছি তোমাদের সামনে। এই যেমন এ-ঘর আর ও-ঘর।'

যোগেন-মাও ঠিক-ঠিক সে কথা বলল বলে মা বড় আশ্বাস পেলেন। যিনি নিশ্বাসের নিশ্বাস তিনি কি যেতে পারেন আমাকে ছেড়ে ? কোথায় যাবেন ? যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ তিনিও আছেন।

কীর্তন করতে-করতে একটা মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছে শ্মশানে। যুক্তকরে মা প্রণাম করলেন। বললেন, 'দেখ-দেখ কেমন ভাগ্যবান ! বৃন্দাবনপ্রাপ্ত হয়েছেন। আমরা এখানে মরতে এলুম, তা একদিন একটু জ্বরও হল না ! কত বয়স হয়ে গেল বলো দেখি—'

মা নাকি বুড়ো হয়েছেন ! মা নাকি কখনো বুড়ো হয় ! তা ছাড়া মা'র বয়স তো এখন মোটে তেত্রিশ।

ভণ্ড ভেকধারীর মুখে ভগবান নামও পচে যায়, কিন্তু কারু মুখেই মা নাম পচে না। ভগবান দুর্লভ কে বলে ? যখনই মা বলে উঠব তখনই তিনি অনায়াসের ধন হয়ে ওঠেন। বৃষ্টির সঙ্গে বাতাসের মিলন তবু খানিক কষ্টকর। কিন্তু জলের সঙ্গে জলের মিলন জলের মতই সহজ। মা সন্তানের জন্যে কাঁদেন, সন্তান মা'র জন্যে। তাই এ মিলন, নয়নজলের সঙ্গে নয়নজলের, কোথাও এতটুকু অবশিষ্ট নেই।

ছোট্ট একটি বালিকার মতন হয়ে গিয়েছেন মা। মন্দিরে-মন্দিরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর রাধারমণের মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছেন, প্রভু, কারুর দোষ যেন

না দেখি। যখনই দোষ দেখব তখনই তোমাকে আর দেখা হবে না। যদি তোমাকে দেখতে চাই যেন সকলের ভালো দেখি। সকলের ভালোতেই তুমি আলো-করা।

পায়ে বাতের ব্যথা, একটু হয়তো বা খুঁড়িয়ে চলেন, তবু সমস্ত বৃন্দাবন পরিক্রমণ করলেন। পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা। পথের পাশে যা কিছু দেখবার দেখছেন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। দেখছেন-দেখছেন, হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ছেন তন্ময় হয়ে। যেন কবেকার কোন চেনা-চেনা জায়গা! কবে যেন এখানে খেলা-ধুলো করে গেছি! তাই তো, এই তো সে-সব পথ-ঘাট, লতা-বিটপী। যোগেন-মা'রাও থমকে দাঁড়াচ্ছে। কি হল মা, কি দেখছ—মা বললেন, ও কিছু নয়।

কালা-বাবুর বাড়িতে সমাধি হল মা'র। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, সমাধি আর ভাঙে না। যোগেন-মা কত নাম উচ্চারণ করল কানে-কানে, কিছু হল না। ডাক পড়ল যোগীনের, তার ধ্বনিতে কাজ হল। অর্ধবাহ্যদশায় নেমে এসে মা বলে উঠলেন, যেমন ঠাকুর বলতেন, 'খাবো।' কিছু মিষ্টি, জল আর পান রাখল সামনে রেকাবিতে। ঠাকুরের মত একটু-একটু খুঁটে-খুঁটে নিলেন সব। পানের ডগাটুকু পর্যন্ত ছিড়লেন নখ দিয়ে। প্রশ্ন করল যোগীন। মা উত্তর দিলেন, ঠিক যেন ঠাকুরের গলা, ঠাকুরের ভঙ্গি।

'হ্যাঁ, কি বলছিলুম?' মা বলছেন একবার আত্মময়ের মত: 'ও, হ্যাঁ, ঠাকুরের কথা। একবার দেখি কী, জানো? দেখি, ঠাকুর সব হয়ে রয়েছেন। যে দিকে তাকাই সেই দিকে ঠাকুর। কানাও ঠাকুর, খোঁড়াও ঠাকুর, চাষাও ঠাকুর, মুটেও ঠাকুর—ঠাকুর ছাড়া আর কেউ নেই। বুঝলুম, তাঁরই ছিষ্টি, তিনিই সব হয়ে আছেন। জীব কষ্ট পাচ্ছে না, তিনি কষ্ট পাচ্ছেন। তাই তো যদি কেউ এসে কেঁদে পড়ে, মনে হয় তাঁরই কান্না। তাই তো উদ্ধার করতে হয়। আমার কি! আমিও তিনি। তাঁর জিনিসে তাঁকেই তুষি।'

বৃন্দাবনে আবার দেখা দিলেন ঠাকুর। বললেন, 'যোগেনকে মন্ত্র দাও।'

মা ভাবলেন মাথার গোলমালে ভুল দেখছি হয়তো। পরের দিনও দেখলেন আগের মতো। এড়িয়ে গেলেন। তৃতীয় দিন দেখলেন আরো স্পষ্ট আরো ঘনিষ্ঠ। মা বললেন, 'আমি যে তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত কই না।'

তাতে কি? মেয়ে-যোগেনকে বোলো, সে থাকবে। যোগীনকে যে আমি মন্ত্র দিতে পারিনি। আমার বাকি কাজ তো তোমাকে করতে হবে। সেই টিনের বাক্সটি সামনে রেখে মা পুজো করছেন। বেদী নয় সিংহাসন নয় টিনের বাক্সে ঠাকুরের একখানি ছবি আর কিছু দেহাবশেষ। এই মা'র ভুবনব্যাপী জগদীশ্বর। যোগেনকে ডেকে পাঠালেন। নীরবে পুজো করতে-করতে হঠাৎ মন্ত্র বলে ফেললেন। সেইটিই যোগেনের মন্ত্র। ভাবাবেশে এত জোরে বলে ফেলেছেন পাশের ঘর থেকে শুনতে পেল যোগেন-মা।

'এরা সব আমাকে ঘুমুতে বলে!' সন্তানের কল্যাণে নিদ্রাহীন মা বলছেন কাতর হয়ে: 'ঘুম কি আর আছে, না, ঘুম কি আর আসে! মনে হয় যতক্ষণ ঘুমুব ততক্ষণ জপ করলে ছেলেদের কল্যাণ হবে। এক-এক-বার মনে হয় এই শরীরটুকু না হয়ে যদি মস্ত শরীর হত তা হলে কত জীবেরই না কল্যাণ হত!'

বছরটাক ছিলেন বৃন্দাবনে। তারপরে হরিদ্বার। ব্রহ্মকুণ্ডের জলে ঠাকুরের নখ আর কেশ নিক্ষেপ করলেন। তারপরে জয়পুর, জয়পুর হয়ে পুষ্কর। ফিরতি-পথে প্রয়াগ। গংগাযমুনাসংগমে ফেললেন ঠাকুরের বাকি কেশ। ফেলবার আগেই ঢেউ এসে মা'র হাত থেকে কেড়ে নিল। যেন মা'র ব্যাকুলতা নয়, ঢেউয়ের ব্যাকুলতা।

'এ কি, এ কী করেছিস তুই ?' লক্ষ্মীকে দেখে চমকে উঠলেন মা।

'মাথা মুড়েছি।' লক্ষ্মী বললে গম্ভীর হয়ে। 'প্রয়াগে এলে মাথা মুড়তে হয়। তুমিও এবার মুণ্ডন করো।'

'ও বাবা, ও আমি পারব না।'

যদু মল্লিকের মেয়ে নন্দিনী একবার গেরুয়া পরে এসেছিল দক্ষিণেশ্বরের বাগানে। তাকে দেখে ঠাকুর বলেছিলেন, 'ছিল বেতের ধামা, ঠাকুরদের লুচি-সন্দেশ বেশ রাখা চলত। এখন চাম' দিয়ে বাঁধানো হল। আর ঠাকুরদের লুচি-সন্দেশ এতে আনা চলবে না।'

তার মানে, ভক্তিমতী মেয়ে ছিল, দেবসেবা করতে পারত। এখন জ্ঞানীর বেশ ধরেছে, ভাব-ভক্তি থেকে কাটা পড়ল।

একখানা চওড়া লাল-পাড়ের কাপড় গেরুয়ায় ছুপিয়ে মাকে দিয়েছিলেন একজন। একজন আর কে, যদু মল্লিকের স্ত্রী। সে কাপড় পরে ঠাকুরকে প্রণাম করতে এলেন মা।

ঠাকুর লক্ষ্মীকে জিগগেস করলেন, 'লক্ষ্মী এ কাপড় কে দিলে ? এটি নহবতে গিয়ে ছেড়ে রাখতে বল। বাগানে কোনো ভৈরবী এলে দিয়ে দিতে বলবি। গেরুয়ার জল পায়ে পড়তে নেই।'

তা ছাড়া, বড় অভিমান আসে সন্ন্যাসে।

'বড় অভিমান—' বলছেন শ্রীমা : 'আমায় প্রণাম করলে না, মান্য করলে না, হেন করলে না ! তার চেয়ে বরং', নিজের শাদা কাপড়টি লক্ষ্য করলেন, 'এই আছি বেশ। ত্যাগ বাইরে দেখিয়ে কি হবে, ত্যাগ অন্তরে। বৃন্দাবনে গৌর শিরোমণি কালাবাবুর কুঞ্জে দেখা করতে এসেছিলেন আমার সংগে। শুনলুম বুড়ো বয়সে সন্ন্যাস নিয়েছেন, যখন ইন্দ্রিয়ের প্রভাব কমে গিয়েছে। রূপের অভিমান, গুণের অভিমান, বিদ্যার অভিমান, সাধুর অভিমান কি যায় বাছা !'

মুক্তির চেয়েও ভক্তি বড়। ভক্তি সব কিছুর চেয়ে বড়।

'চৈতন্যলীলা' অভিনয় দেখছেন মা। রয়েল বক্সে জায়গা করে দিয়েছে গিরিশ। মা দেখবেন বলে বহুদিন পরে বিশেষ রজনীর আয়োজন হয়েছে। জগাই অর্ধেন্দু-শেখর, আর মাধাই সেজেছে গিরিশ নিজে। ভুষণ আর থিয়েটারে নেই, অবসর নিয়েছে, তবু মা দেখবেন বলে একরাতের জন্যে নিমাই সেজেছে। এক পয়সা মজুরি নেবে না। নিতাইয়ের পার্টে সুশীলা। ষোলোকলা ভরপুর।

ভুষণকে দেখিয়ে মা বলছেন, 'মেয়েটিকে দেখলুম ভক্তিমতী। ভক্তি না থাকলে কি হয় গা ? নিমাই—ঠিক নিমাই, কে বলবে মেয়েমানুষ ?'

আবার দেখছেন জগাই-মাধাইকে। বলছেন, 'ওদের মত ভক্ত কে ? রাবণের মত ভক্ত কে ? হিরণ্যকশিপুর মত ভক্ত কে ? এই দেখ না, গিরিশবাবু ঠাকুরকে কত

গাল দিতেন—তা, ওঁর মত ভক্ত কে ? এঁরা সব ঐ ভাবে এসেছেন। ভক্ত হওয়া কি কম কথা ? ভক্তি কি অমনিই হয় ?'

লক্ষ্মী সংগে ছিল, লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে বলছেন, 'হ্যাঁ রে লক্ষ্মী, সেটা কি ? মুক্তি দিতে কাতর নই—'

লক্ষ্মী সুর করে গাইলে, 'মুক্তি দিতে কাতর নই গো, ভক্তি দিতে কাতর হই—'

* একুশ *

বৃন্দাবনেই শুনতে পেলেন ত্রৈলোক্য বিশ্বাস যে টাকা সাতটি দিত, দীনু খাজাঞ্চি তা বন্ধ করে দিয়েছে। 'বন্ধ করেছে করুক।' মা বললেন উদাসীনের মত . 'এমন ঠাকুরই চলে গেছেন, টাকা নিয়ে আমি কি করব !'

কলকাতায় ফিরে বলরামের বাড়িতে থাকলেন কয়েকদিন। এবার ঘরে চলো। চলো সেই মাটির স্বর্গধামে। কামারপুকুরে। সংগে গোলাপ-মা আর যোগেন। বর্ধমান পর্যন্ত ট্রেন ভাড়া জুটেছে তারপরে আর পয়সা নেই। উচালন সেখান থেকে পাক্কা ষোলো মাইল। হাঁটা ছাড়া আর গতি নেই। ট্রেন ভাড়ার অভাবে সেই ষোলো মাইল রাস্তাই হাঁটলেন মা। রাজরানী হয়ে চলেছেন অনাথিনীর মত। পা দুটো আর টানতে পারছেন না কিছুতেই। খিদের কষ্টে বসে পড়েছেন পথের পাশে। সাবর্ণ চৌধুরীদের ছেলে সন্ন্যাসী যোগানন্দ তাই দেখছে অসহায়ের মত। রিক্তহস্ত সর্বত্যাগী সন্তান দেখছে মা'র এই কায়ক্লেশ।

বসে-বসে গোলাপ-মা খিচুড়ি রাঁধল। খেতে-খেতে ছোট মেয়েটির মত মা আনন্দে উছলে উঠলেন, 'গোলাপ, এ একেবারে অমৃতের মতন লাগছে।'

তিন দিন পরে চলে গেল যোগেন।

সারা গাঁয়ে ঢি-ঢি পড়ে গেল। বিধবার পরনে কিনা পাড়ওলা শাড়ি, হাতে বালা ! এ কি কেলেঙ্কারী ! গোলাপ-মা যতদিন ছিল সেই লোকনিন্দার আঁচ লাগতে দেয়নি মা'র গায়ে। সমস্ত আঘাত ঠেকিয়ে এসেছে একা-একা। কিন্তু যেই মাস-খানেক পর চলে গেল নিন্দুকের দল আবার বিষমুখ হয়ে উঠল। তখন এগিয়ে এল প্রসন্নময়ী—লাহাদের বোন, ঠাকুরের বাল্যকালের সখী।

'জানো এ কে ?' গর্জে উঠল প্রসন্ন। 'এ গদাইয়ের বউ।'

কে না জানে ! গদাইয়ের বউ বলেই তো বলছি এত কথা।

'এ কী তোমাদের মত সাধারণ ? এ দেবী, ঈশ্বরী।'

তখনকার মত চুপ করে গেল সকলে।

তবু মা খুলতে গিয়েছিলেন হাতের বালা। ঠাকুর বাধা দিলেন। গৌরদাসী এসে বুঝিয়ে দিল শ্রীমতী শাশ্বতকালেই শ্রীমতী।

লোকনিন্দার চেয়েও দুঃখদাতা দারিদ্র্য। ঠাকুর বলেছিলেন শেষ দিকে, 'আমি চলে যাবার পর তুমি কামারপুকুরে গিয়ে থাকবে। শাক-ভাত যা জোটে তাইতে পেট চালাবে আর দিন-রাত হরিনাম করবে।'

সে-কথাই কিনা অক্ষরে-অক্ষরে ফলল ! শুধু শাক-ভাত ! হায়, নুন কেনবার পয়সা নেই একটাও।

দরিদ্রতমের চেয়েও দরিদ্র। তেল-মশলা দূরস্থান, এক কণা নুন জোটে না জগজ্জননীর। বাড়ির সামনের মাটিটুকু নিজহাতে কোপান কোদাল দিয়ে। শাক ফলান। নিজেই কটি ধান কুটে চাল করেন। ভাত রেঁধে ঠাকুরকে আগে নিবেদন করেন। শ্মশানের ভূতনাথ তাই গ্রহণ করেন প্রসন্নমনে। সেই প্রসন্নতাই সমস্ত ব্যঞ্জনের নুন।

তবু এই ঘোরতম দারিদ্র্যের কথা কাউকে জানতে দিচ্ছেন না ঘুণাক্ষরে। কত-দূরেই বা জয়রামবাটি, তাঁর মাকে পর্যন্ত না।

শ্যামাসুন্দরী খবর পাঠালেন, একবার আমাকে দেখবি আয়।

কে কাকে দেখে। মেয়েকে দেখে শ্যামাসুন্দরী আঁতকে উঠলেন। এ যে একেবারে ভিখারিনীর মূর্তি। পরনে ছেঁড়া ময়লা শাড়ি, মাথায় রুক্ষ জট-পাকানো চুল, রোগা মলিন চেহারা। ছুটে গিয়ে মেয়ের হাত ধরলেন। বললেন, 'এ কী হয়েছিস তুই।'

সারদামণি হাসলেন। দারিদ্র্যতা দেখছ বটে, সে সঙ্গে প্রসন্নতাও দেখ। আর্তনাদ শুনে কি করবে, শোনো এই স্তব্ধতার গীতিকা।

অনেক পীড়াপীড়ি করলেন, এখানে আমার কাছটিতে থাক। তোর চুলে তেল মেখে দি, চেহারায় ফিরিয়ে আনি স্নিগ্ধতা। সারদামণি রাজী হলেন না কিছুতেই। শাকান্নে যে নুন জুটছে না, তবুও। মা'র কাছ থেকে চাইলেন না একটু নুন-তেল, কটা বা খুচরো পয়সা। ঠাকুর যে অভাবে রেখেছেন এই আমার প্রাচুর্য-প্রতুল।

'কী করবি তবে তুই ?'

'কামারপুকুরে ফিরে যাব। ঠাকুরের যা ইচ্ছে তাই হবে।'

ঠাকুর বলতেন, আমাকে যে স্মরণ করে তার কখনো খাওয়ার কষ্ট থাকে না।

তিনি নিজে বলেছেন ?

'হ্যাঁ, তাঁর নিজের মুখের কথা।' বললেন মা, 'তাঁকে স্মরণ করলে কোনো দুঃখ থাকে না। দেখছ না, তাঁর ভক্তেরা সবাই ভালো আছে। এই তো কাশী-বৃন্দাবনে দেখেছি, অনেক সাধু ভিক্ষে করে খায়, আর গাছতলায় ঘুরে বেড়ায়। তাঁর ভক্তের মত এমনটি কোথাও দেখা যায় না।'

কিন্তু তুমি ? তুমি যে কষ্ট পাচ্ছ ?

মা হাসলেন। যে মুহূর্তে একে কষ্ট ভাবব সেই মুহূর্তে ঠাকুর তার ব্যবস্থা করবেন।

সেই স্তব্ধতার দেয়ালে ছিদ্র হল। ছিদ্র হল সেই আত্মবিলুপ্তির অন্ধকারে। একা-একা আছেন, প্রসন্নময়ী একটি ঝি পাঠিয়ে দিল মা'র কাছে। তাঁকে দেখতে-শুনতে, রাতে পাহারা দিতে। সেই প্রথম বাইরে খবর নিয়ে গেল। মা'র ভাই প্রসন্নকুমার কলকাতায় পুরোতগিরি করে, তার কানে উঠল। সে খবর দিলে রামলালকে। রামলাল খেপে উঠল, তোমরা ভাই হয়ে বোনের দুর্দশার লাঘব করছ না ? এত কাছাকাছি তোমাদের বাড়ি, উদ্যোগী হয়ে ব্যবস্থা করতে পার না এতটুকু ?

ক্রমে খবর পৌঁছুল গোলাপ-মাকে। ভাত খেতে মা'র নুন নেই। অস্থির

হয়ে উঠল গোলাপ-মা। কী করতে আছ সব ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ, গৃহী আর সন্ন্যাসী? তোমাদের মা রয়েছেন অর্ধাশনে। যিনি সর্বসাম্রাজ্যদায়িনী তিনি রয়েছেন দীন-দুঃখিনীর মত।

চাঁদা উঠতে লাগল। চিঠি গেল মার কাছে, সনির্বন্ধ চিঠি, ভক্তদের নাম করে, তুমি চলে এস কলকাতায়। আমাদের মা হয়ে কেন তুমি দূরে থাকবে?

আধা-বয়সী বিধবা, মোটে চৌত্রিশ বছর বয়স, কি করে থাকবে সব অনাত্মীয় ভক্তদের সংশ্রবে? গাঁয়ের সমাজ আবার আলোড়িত হয়ে উঠল।

'ওমা, সেই সব অল্পবয়সের ছেলে, তাদের মধ্যে কি করে থাকবে!' বলাবলি করতে লাগল সকলে।

মা-ই নিজে ঢিল ছুঁড়েছেন মৌচাকে। তার মানে আছে। সমাজ কি বলে একবার শুনতে হয়। বুঝতে হয় হাওয়া-বওয়ার দিক কি।

কেউ-কেউ আবার কটাক্ষটি লুকিয়ে রেখে সরল চোখে তাকিয়ে থেকে বলেন, 'তা যাবে বৈকি। তারা হল সব শিষ্য!'

মা কেবল শোনেন। কথা কন না।

এমন সময়, এবারো, প্রসন্নময়ী এল উদ্ধার করতে। স্বরে আন্তরিকতার সমস্ত সুধা ঢেলে দিয়ে বললে, 'তারা হচ্ছে তোমার ছেলে। যাবে বৈ কি, নিশ্চয় যাবে।' আনাচে-কানাচে আড়ি পেতে দাঁড়ানো সমাজের লোকদের লক্ষ্য করে বললে, 'এরা এখনো গদাইয়ের মর্মই বোঝেনি। গদাইয়ের স্ত্রীর মর্ম তো আরো কঠিন।'

প্রসন্নময়ীর মুখের উপর কেউ কিছু বলতে পারল না। মা জোর পেলেন। শ্যামাসুন্দরীও দ্বিধা করেছিলেন গোড়ার দিকে, সে দ্বিধা কেটে গেল। মত দিলেন মুক্ত মনে।

সারদামণি চলে এলেন কলকাতা।

গঙ্গাতীরে নয় বেলুড়ে নয় বাগবাজারে ভাড়াটে বাড়িতে থাকতে লাগলেন। কখনো বা বলরাম বোসের বাড়িতে, কখনো বা মাস্টার মশাইয়ের। যদ্দিন পর্যন্ত না উদ্বোধন-অফিস তৈরি হল।

ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দেখেছি, শুনেছি তাঁর কথা, তিনি না হয় মহাপুরুষ, কিন্তু তাই বলে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বাড়াবাড়ি কেন? এমন কথাও বলতে লাগল কেউ-কেউ। মহাপুরুষের স্ত্রী হলে বুঝি তিনিও একজন লক্ষ্মী-সরস্বতী হয়ে গেলেন!

না, না, আমি কে, আমি কি, আমি কেউ নই কিছু নই। মা আত্মলুপ্তির ঘোমটা টানলেন আরো ঘন করে। নিজেকে ঠাকুর বলতেন রেণুর রেণু। আমি অণুর অণু। যদি ঠাকুরকে দেখ, ঠাকুরকে মানো, তা হলেই হল। ঠাকুর যেটুকু ভার দিয়েছেন আমার উপর, সেটুকু করতে পারলেই আমার হয়ে গেল। সে যে অনন্ত কাজ!

'দেখলুম একটা ডেঁয়ো পিঁপড়ে যাচ্ছে—রাধি তাকে মারবে।' বলছেন মা: "কিন্তু দেখলুম কি তা জানো? দেখলুম সেটা পিঁপড়ে নয়, ঠাকুর। ঠাকুরের সেই হাত-পা মুখ-চোখ সব সেই! রাধিকে আটকালুম, খবরদার মারতে পারবিনে। ভাবলুম, সব জীব যে ঠাকুরের, সব জীবই ঠাকুর। আমি আর কী করতে পাচ্ছি,

কজনকে দেখতে পাচ্ছি ? তিনি যে সকলের ভার আমার উপর দিয়েছেন। সকলকে দেখতে পারতুম তবে তো হত !'

বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুজ্জের বাড়িতে আছেন তখন মা, পঞ্চতপার আয়োজন হয়। পঞ্চতপা কি ? তা কি মা-ই জানেন !

কামারপুকুরে থাকতে মা প্রায়ই একটি মেয়েকে দেখতেন, এগারো-বারো বছর বয়স, মা'র সঙ্গে-সঙ্গে হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছে। কাজ-কর্ম করে দিচ্ছে, এটা-ওটা এগিয়ে দিচ্ছে কাজের জিনিস। কখনো-কখনো বা আমোদ-আহ্লাদ করছে। এখন ঠাকুর গত হবার পর দেখা দিচ্ছে এক দাড়িওলা সন্ন্যাসী। বলছে, পঞ্চতপা করো। সে আবার কি কথা ! প্রথম-প্রথম খেয়াল করেননি মা। কিন্তু কানের কাছে মুখ এনে বারে-বারে বলছে সন্ন্যাসী, পঞ্চতপা, পঞ্চতপা !

পঞ্চতপা কাকে বলে ? জিগ্‌গেস করলেন যোগেন-মাকে।

যোগেন-মা খবর নিয়ে এলেন। পঞ্চ বহ্নির তপস্যা। চার দিকে চার অগ্নিকুণ্ড জেবলে বসতে হবে। আর মাথার উপর জ্বলন্ত সূর্য, পঞ্চম হুতাশন। এমনি ভাবে আগুনের মধ্যে বসে ধ্যান আর প্রার্থনা। তার নাম পঞ্চতপা। যোগেন-মা বললেন, 'আমিও করব।'

পঞ্চতপার যোগাড় হল। চার দিকে ঘুঁটের আগুন, মাথার উপরে খাড়া রোদ। ভোরবেলা স্নান করে ঢুকতে হবে সেই আগুনের মধ্যে, বেরুতে হবে সূর্য অস্ত গেলে। স্নান সেরে এসে মা দেখলেন আগুন গনগন করে জ্বলছে। বড় ভয় হল, কি করে ঢুকবেন ওর মধ্যে, আর বেরুতে সেই তো সন্ধে। পারব ? পারব স্থির থাকতে ? জয় ঠাকুরের জয়। ঠাকুরের নাম করে ঢুকব, ভয় কি। পুড়তে হলে পুড়ব মরতে হলে মরব, থাকব স্থির হয়ে। অগ্নিতে ঠাকুরের কেমন স্পর্শ, তাই বুঝব এবার সর্বাঙ্গে। ঠাকুরের নাম করে ঢুকে পড়লেন অগ্নিব্যূহে। ঢুকে দেখলেন আগুনে তেজ নেই। সূর্যও স্নেহস্তিমিত ! সাত-সাত দিন করলেন এমনি পঞ্চতপা। গায়ের বর্ণ কালো ছাই হয়ে গেল। সেই সন্নেসীও বিদায় নিলে।

পঞ্চতপা করে কি হয় ? কে জানে কি হয় ! পার্বতীও করেছিলেন শিবের জন্যে। রাবণবধের পর রাম বিভীষণকে বলেছিলেন লঙ্কায় রাজা হয়ে বসতে। তা শুধু লোকশিক্ষার জন্যে। বিভীষণ যে এত রামভক্তি দেখাল তার ফল কী হল ? লঙ্কার সিংহাসন পেলে। 'তেমনি এসব করা লোকের জন্যে।' বললেন মা হেসে-হেসে, 'নইলে লোকে বলবে, কই সাধারণের মত খায়-দায় আছে। একটা ব্রত-নিয়মও করে না !'

আবার গোপন করলেন নিজেকে।

* বাইশ *

আর যাই করো, কামারপুকুরের বাড়িটি যেন খাড়া রেখো। বলেছিলেন ঠাকুর। ভক্তরা তোমাকে যতই অট্টালিকা দিন, কামারপুকুরের কুঁড়েঘরটিকে যেন ভুলো না।

যখন যেটুকু দরকার ঠিকমত মেরামত করাচ্ছেন ঘর-দুয়ার। সব সময়ে এঁকে রেখেছেন চোখের উপর। অটুট করে, নিখুঁত করে।

কিন্তু এমন বিধান, যেতে পাচ্ছেন না কামারপুকুর। কলকাতা থেকে যখনই ছাড়া পাচ্ছেন আসছেন বাপের বাড়ি, জয়রামবাটি।

এক ভক্ত একবার জিগ্গেস করেছিলেন মাকে, 'যখন আসেন একবারও ঠাকুরের বাড়ি নয়, কেবল বাপের বাড়ি। এ কি আপনার চিরকালের ধারা ?'

'তা নয় বাবা, ঠাকুরের বাড়ি আমার ঠাকুর-বাড়ি। তা কি পারি কখনো ভুলতে ? তা ছাড়া শিবু আমার ভিক্ষে-পুত্র।' বললেন মা গাঢ় স্বরে, 'তবে বাবা, গেলে বড় কষ্ট হয়। সব দেখব, ঠাকুরকেই শুধু দেখতে পাব না।'

একবার শিবু কি কাণ্ড করল দেখ না! এই সেদিন কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটি আসছি। সঙ্গে শিবু, হাতে পুঁটলি। জয়রামবাটির প্রায় কাছাকাছি এসেছি, মাঠের মধ্যে শিবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ পিছনে কারু পায়ের শব্দ না পেয়ে মা তাকিয়ে দেখলেন, শিবু দাঁড়িয়ে আছে। ও কি রে, দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? এগিয়ে আয়। শিবু বললে, একটা কথা যদি বলো তাহলে আসতে পারি। সে কি রে, কী কথা ? শিবু জিগ্গেস করলে, 'তুমি কে বলতে পারো ?'

'আমি আবার কে ! আমি তোর খুড়ি।'

'তবে যাও, এই তো বাড়ির কাছে এসেছ। আমি আর যাব না।' শিবু কাঠ হয়ে রইল।

'দেখ দেখি, আমি আবার কে !' মা বড় ফাঁপরে পড়লেন। 'আমি মানুষ তোর খুড়ি।'

'বেশ তো, তুমি যাও না !' উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত এক পাও নড়বে না শিবু।

'লোকে বলে কালী।'

'কালী তো ? ঠিক ?' শিবু নড়ে-চড়ে উঠল।

তাকে প্রবোধ দেবার জন্যেই হয়তো কে জানে মা বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, তাই।'

'তবে চলো।' বাকি মাঠটুকু শিবু পার করিয়ে নিয়ে এল খুড়িকে।

তা ছাড়া, বাপের বাড়িতে না গিয়ে উপায় নেই। মা'র ভায়েদের মধ্যে ঝগড়া বেধেছে। চার ভাই, প্রসন্নকুমার, বরদাপ্রসাদ, কালীকুমার আর অভয়চরণ। কারুর তেমন কোনো অবস্থা নেই, শুধু পৈত্রিক সম্পত্তিটুকু আঁকড়ে আছে। কাজে-কাজেই তাই নিয়ে চার ভাইয়ে ঝগড়া-মারামারি। এখন দিদি এসে যদি একটা মিট-মাট করিয়ে দিতে পারেন !

দিদি এসে ঠাঁই নিলেন ওদের সংসারে। যদি ওদের সংসারে একটু শান্তি-শ্রী আসে। শ্যামাসুন্দরী বুড়ো হয়েছেন, ভায়ের বউয়েরা ছোট-ছোট, তাদের কাউকে কাজ করতে হয় না, সব একা সারদামণি করেন। ধান সেদ্ধ করেন, রাঁধেন, ভায়েদের ছেলেমেয়ের পরিচর্যা করেন পর্যন্ত। গিরিশ ঘোষ বলে, ভায়েরা বিগত-জন্মে অনেক পুণ্য করেছিল নইলে কি এত সেবা এত স্নেহের অধিকারী হয় !

ভায়েদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ। তারই জন্যে অনেক ঝক্কি পোয়াতে হয় অকারণে, এক পক্ষে হেললে আরেক পক্ষ গাল পাড়ে। নীরবে সব সহ্য করেন

সারদামণি। তাঁর সেবাস্পর্শে যদি তাদের শুভ হয় কোনোদিন অপেক্ষা করেন তার জন্যে। শ্যামাসুন্দরী মারা গেলেন। সংসারে এবার বড় করে চিড় ধরল। ভায়েদের মধ্যে বেড়ে গেল মনান্তর, ভায়ের বউদের মধ্যে বেড়ে গেল গালি-গালাজ। শরৎ মহারাজকে ডাকিয়ে আনলেন কলকাতা থেকে। বললেন, এদের মধ্যে একটা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দাও।

আপোষে বিভাগ-বণ্টন করে দিলেন সারদানন্দ। মাকে জিগগেস করলেন, আপনি কোথায় থাকবেন?

মা বললেন, 'কখনো এ ঘর কখনো ও ঘর। কখনো প্রসন্ন কখনো কালী।'

কিন্তু মা'র বেশির ভাগ মন প্রসন্নর দিকে। তার কারণ প্রসন্নর প্রথম পক্ষের দুটি ছোট-ছোট মেয়ে, নলিনী আর মাকু। প্রসন্নর দ্বিতীয় পক্ষের বউয়ের অল্প বয়স, কি করে সব তদারক করে! তাই মা'র মন তাদের উপর গিয়ে পড়েছে।

ভাগ-বাঁটোয়ারার পরেও ঝগড়া শেষ হল না ভায়েদের। এখন দিদিকে নিয়ে টানাটানি। দিদির এখন অনেক পসার, তাঁর খরচের জন্যে ভক্তেরা আজকাল পাঠাচ্ছে টাকা-পয়সা, তাই এখন তার উপর লোভ। ভায়েদের এলাকার বাইরে নিজের জন্যে এক খোড়ো চালের মাটির ঘর তৈরি করে নিয়েছেন, তারই চারধারে কেবল ঘুরঘুর করে মরছে, যদি টাকাটা সিকেটা ছুঁড়ে দেন কখনো। দয়া করে না হোক, অন্তত বিরক্ত হয়ে।

অথচ দিদির সুখ-সুবিধের দিকে নজর নেই এতটুকু। সেবার কয়েকজন ভক্ত নিয়ে আসছেন জয়রামবাটি, আগে খবর দেওয়া হয়েছে, তা সত্ত্বেও ভায়েরা কোনো লোক পাঠায়নি নদীর ঘাটে। একটাও লোক পাঠাতে পারলে না? লোক না পাও, নিজেরা যেতে পারলে না কেউ? আমার ছেলেরা নতুন আসছে, একটা লোকের অভাবে কত অসুবিধে বলো দেখি? কে কার কথা শোনে! এ বলে আমি যাইনি, পাছে অন্য ভাই মনে করে আমি তোমাকে হাত করবার চেষ্টা করছি। ও-ও বলে সেই কথা। সব ভায়েরই এক রা। কিন্তু চাটুক্তিতে সবাই সমান পটু। বলছে সমস্বরে, 'জানি না তুমি কী অমূল্য রত্ন? তোমাকে ভগ্নীরূপে পেয়েছি এ আমাদের জন্মান্তরের সৌভাগ্য। যেন পরজন্মেও তুমি বোন হয়ে আস আমাদের সংসারে।'

মা ঝামটা দিয়ে উঠলেন: 'আবার তোমাদের সংসারে আসব? রক্ষে করো। ঢের হয়েছে। যেন পথ ভুলেও না আসি। বাবা ছিলেন রামভক্ত আর মা ছিলেন মূর্তিমতী করুণা, তাই জন্মেছিলাম তোমাদের সংসারে। আর নয়—আর নয়।'

কেবল টাকা চায়। আলু-মুলো চায়। ভুল করেও একবার জ্ঞান-ভক্তি চাইল? বিবেক-বৈরাগ্য চাইল? ঈশ্বরের আশীর্বাদ চাইল?

একদিন তো কালীতে বরদাতে হাতাহাতির উপক্রম। গালাগালিতে ক্ষান্ত হবার নয়, এবার মারামারি। নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে স্তব্ধ হয়ে কতক্ষণ দেখবেন এই হুলস্থুল? ঝাঁপিয়ে পড়লেন দু ভায়ের মধ্যে, একবার একে বকেন আরেকবার ওকে বকেন, শেষকালে দুজনকে ঠেলে দিলেন দু দিকে। একে অন্যের মুণ্ডুপাত করতে-করতে যে যার ঘরে গিয়ে ঢুকল। মা আবার তাঁর দাওয়াতে গিয়ে বসলেন।

কেন কে জানে হেসে উঠলেন উচ্চরোলে। বলে উঠলেন আপন মনে : 'কী খেলাই খেলছেন মহামায়া! মৃত্যুতে সব পড়ে থাকবে, তবু তা জেনেও মানুষ পুঁটলি বাঁধছে। অনন্ত বিশ্ব জেগে আছে চোখের সামনে, তাকিয়েও দেখছে না।' বলার পর আবার হাসি। হাসির পর হাসি।

বাইরে শান্ত মূর্তি, কিন্তু ভিতরে সংহার বেশ।

শিবরাম বাড়ি নেই, রামলালের অমত, শিবরামের বউ মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছে। ঠিক করেছে নিচু ঘরে। লাহাবাবুদের নাকি সায় আছে এ ব্যাপারে। মায়ের ভক্তেরা কেউ-কেউ জানতে পেরেছে ষড়যন্ত্র। ভাবছে কি করে উদ্ধার করা যায় মেয়েটাকে। কোথায় মেয়ে, লুকিয়ে রেখেছে শিবরামের বউ। কিন্তু রামলাল-দাদার বিপদ, যে করে হোক মান বাঁচানো চাই। কায়দা করে ঘরের তালা খুলে ফেলল ভক্তেরা, মেয়েটাকে উদ্ধার করে একেবারে জয়রামবাটির দিকে পাড়ি দিল। একেবারে মা'র দরবারে গিয়ে পেশ করলে।

বাষ্প পর্যন্ত জানেন না মা, কি ভাবে নেবেন ব্যাপারটা, ভয় ছিল ভক্তদের। জিগগেস করলেন, 'রামলাল জানে ?'

তাঁরই অমতে বিয়ে হচ্ছিল। তাঁরই কথায় উদ্ধার করেছি পাঁচিকে।

তা হলে ভাবনা কি। ঠিক করেছ। মা আশ্বাস দিলেন।

'কিন্তু লাহাবাবুরা বোধহয় অসন্তুষ্ট হবেন।' বললে একজন ভক্ত। 'জমি কিনে ঠাকুরের মঠ-মন্দির করতে হবে, হয়তো তাতে বাধা দেবেন।'

আরেকজন বললেন, 'দিন বাধা! ওখানে নাই বা হল! কত জায়গায় কত মঠ-মন্দির হবে!'

'সে কি কথা গো ?' মা রুক্ষ হয়ে উঠলেন : 'কামারপুকুর মহাতীর্থ। ঠাকুরের জন্মস্থান, পুণ্যস্থান, মহাপীঠস্থান—সেইখানেইতো আসল মন্দির। যাত্রাসিদ্ধির মন্দির।'

মা যখন বলেছেন তখন মন্দিরের আর ভাবনা নেই। কিন্তু শিবরামের বউ এখন কি করবে কে জানে।

'ছোট বউ খেপে গিয়ে ঘরে না এখন আগুন ধরিয়ে দেয়!'

'তা হলে বেশ হবে। বেশ হবে।' অদ্ভুত একটি ভাব ধরলেন মা। কথার স্তরে-স্তরে রুদ্র রূপের তীব্রতা স্পষ্টতর হতে লাগল : 'ঠাকুর যেমনটি ভালোবাসেন তেমনটি হবে। ঠাকুর শ্মশান ভালো বাসেন, সব শ্মশান হয়ে যাবে।' বলেই হাসতে শুরু করলেন—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

একটু যেন বেশিক্ষণ হাসলেন। চারদিক ত্রাস-স্তব্ধ হয়ে রইল। যে যেখানে ছিল হাসি শুনে নিশ্বাস বন্ধ করলে।

সহসা থেমে পড়লেন। চাপা দিলেন, ঢাকা দিলেন। পাড়লেন অন্য কথা, ধরলেন স্নেহময়ী মৃন্ময়ী রূপ।

বরদার স্ত্রীকে বলছেন, 'তোরা একটা-একটা ছেলে নিয়ে ন্যাতাজোবড়া হয়ে থাকিস, মানুষ করতে পারিসনে। আর আমি না বিইয়ে কানাইয়ের মা। হাজার-হাজার ছেলেমেয়েকে মানুষ করে দিতে হচ্ছে। কেউ সাধু কেউ অসাধু—হয়তো

মাথা খারাপ করে বলছে, মা, আমার কিনারা কর। এ সব তোরা বুঝবি কি? তোরা জানিস শুধু টাকা-পয়সা, ধান-মরাই, বাড়ি-ঘর। তোরা যেমনটি আছিস তেমনটিই যাবি। ভাগ্যে মনুষ্যজন্ম হয়। সেই মনুষ্যজন্ম তোরাও পেয়েছিলি, কিন্তু করলি কি?'

আরো একবার হেসে উঠেছিলেন মা।

প্রথম মহাযুদ্ধের খবর শুনছেন। শুনতে পেলেন বহু লোকক্ষয় হয়ে গিয়েছে। অমনি, কেন কে বলবে, হাসতে শুরু করলেন। প্রথমে মৃদু, পরে ভয়ংকর। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—সেই প্রলয়প্রবল অট্টহাস। ঘর-দোর কাঁপতে লাগল সেই হাসির শব্দে। মেয়েরা যারা উপস্থিত ছিল, গোলাপ-মা আর কারা-কারা গলবস্ত্র হয়ে জোড় হাতে কাতর প্রার্থনা করতে লাগল: 'সম্বর, সম্বর!'

মা আবার স্বাভাবিক পরিমিতিতে নেমে এলেন। আবার সেই মাতৃমূর্তি।

তেঁতুলতলায় খাটের উপর বসে আছেন, একটা ডোমের মেয়ে কেঁদে পড়ল মায়ের কাছে। যার জন্যে ছেড়েছুড়ে চলে এসেছিলাম ঘর-দোর, সেই এখন আমাকে ফেলে যাচ্ছে পথের ধুলায়। এর কি, মা, বিচার নেই?

সেই লোকটিকে ডেকে পাঠালেন মা। সস্নেহে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'ও তোমার জন্যে যথাসর্বস্ব ফেলে এসেছে আর তুমিই কিনা আজ ওকে ত্যাগ করে যাচ্ছ? এতকাল সেবা নিয়েছ ওর, আজ আর ওর দাম নেই এক কড়া? ওকে যদি এখন ত্যাগ করো, তোমার মহা অধর্ম হবে, নরকেও স্থান হবে না।'

ডোমের মেয়ের হাত ধরল তার ঘরের লোক। ঘরে ফিরে গেল দুটিতে।

* তেইশ *

ভাইয়েদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট অভয়। এই যা লেখাপড়া শিখেছিল, মানুষ হয়েছিল। পাশ করেছিল ডাক্তারি। কিন্তু এমন ভাগ্যের ফের, কলেরা হয়ে মারা গেল। স্ত্রী সুরবালা, পেটে তার তখন সন্তান। মরবার সময় মাকে বলে গেল অভয়, ওদের তুমি দেখো দিদি। ওদের আর কেউ নেই।

মা মুষড়ে গেলেন। কিন্তু শোকের চেয়েও ঘোরতর যে শঙ্কা, তাই আচ্ছন্ন করল মাকে। সুরবালা পাগল হয়ে গিয়েছে। পাগল অবস্থায় একটি মেয়ে প্রসব করলে। এই মেয়েই রাধারাণী বা রাধু।

ঠাকুরের দেহ যাবার পর মন তখন হু-হু করছে, হঠাৎ দেখতে পেলেন লাল কাপড় পরা একটি দশ-বারো বছরের মেয়ে সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠাকুর তাকে দেখিয়ে বললেন, একে আশ্রয় করে থাকো। আর দেখা গেল না মেয়েটিকে। তারপর আবার একদিন বসে আছেন, দেখতে পেলেন, রাধুর মা, পাগলী সুরবালা কতগুলো কাঁথা বগলে করে টানতে-টানতে যাচ্ছে, আর হামা দিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে তার পিছনে যাচ্ছে রাধু। মা'র বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। ছুটে গিয়ে রাধুকে তুলে নিলেন। মনে হল, একে আমি না দেখলে আর কে দেখবে? বাপ

নেই, মা পাগল। এই মনে করে যেই ওকে তুলে নিয়েছেন কোলে, ঠাকুর দেখা দিলেন চোখের সামনে। বললেন, 'এই সেই মেয়ে। একে আশ্রয় করে থাকো। এই যোগমায়া।'

আপসোস করে বলছেন মা, 'কি জানি বাবা, আগে-আগে ও বেশ ছিল। আজকাল নানা রোগ, বিয়েও হল। এখন ভয় হয় পাগলের মেয়ে না পাগল হয় শেষকালে। শেষটায় কি একটা পাগলকে মানুষ করলাম?'

গৌরী-মা দুর্গা বলে মেয়েটিকে নিয়ে এসেছে মা'র কাছে। মেয়েটি যেন অনাঘ্রাত ফুল। তাকে দেখে মা'র আনন্দ আর ধরে না। বললেন, 'দেখ মা, চড় খেয়ে রাম নাম অনেকেই বলে কিন্তু শৈশব হতে ফুলের মত মনটি যে ঠাকুরের পায়ে দিতে পারে, সেই ধন্য। গৌরদাসী কেমন তৈরি করেছে মেয়েটিকে। ভায়েরা বিয়ে দেবার বহু চেষ্টা করেছিল। গৌরদাসী ওকে লুকিয়ে নিয়ে হেথা-সেথা পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াত। শেষে পুরী নিয়ে গিয়ে জগন্নাথের সংগে মালা বদল করে সন্ন্যাসিনী করে দিলে। সতী লক্ষ্মী মেয়ে, কেমন লেখাপড়াও শিখেছে দেখ না! কি একটা সংস্কৃত পরীক্ষাও দেবে শুনেছি।'

পরে তাকালেন রাধুর দিকে। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেলেন হয়তো। বললেন, 'এই রাধুকে নিয়েই আমার কত মায়া দেখ না। গৌরদাসী কেমন তার মেয়েকে তৈরি করেছে, আর আমি একটা বাঁদরী তৈরি করেছি।'

তখন কে জানত বাঁদরী হবে না দুর্গা হবে! ছুটে জয়রামবাটিতে গিয়ে দু বাহুর মধ্যে আঁকড়ে ধরলেন। রাধুকে পাশে না বসিয়ে খাওয়া নেই, পাশে না শুইয়ে শোয়া নেই। চক্ষের পলকে রাধু, বুকের প্রতি নিশ্বাসে রাধু। পিসিকেই রাধু মা ডাকে, আর সুরবালাকে নেড়ী-মা।

মহামায়া কি ভাবে বাঁধা পড়লেন নিজের ফাঁদে। যার তিন কুলে কেউ নেই তাকে দিয়েও বেড়াল পুষিয়ে সংসার করান।

সংসার কি বস্তু, বুঝুন এবার হাতে-কলমে। বুঝবেন বলেই তো সংসারীর প্রতি এত ক্ষমা, এত দয়া, এত বাৎসল্য। যদি সন্ন্যাসিনী হয়ে বাইরে চলে যেতেন, মা হতেন কি করে? মা হয়ে যদি সংসারের কষ্ট নিজে না বোঝেন কি করে বুঝবেন তবে সন্তানের যন্ত্রণা? তাই তো ভুগলেন দারিদ্র্যে, পেলেন শোকদহন, সইলেন রোগজ্বালা। নিজেকে জড়ালেন মায়াজালে। রাধু মাকু আর নলিনী। সমস্ত রকমে বুঝলেন সংসারের বিসম্বাদ। বুঝলেন বলেই তো সবাইকে টেনে নিলেন কোলের মধ্যে। সবাইকে রক্ষা করলেন।

আমবাতের যন্ত্রণায় অস্থির হয়েছেন। বলছেন, 'আমবাতের জ্বালায় গেলুম মা, মুখেও আবার বেরিয়েছে। এই দেখ মুখে হাত বুলিয়ে। এ কি যাবে না? এই দেখ পিঠেও উঠেছে, দাও তো ঐ তেলটি দিয়ে। ঐটি আমার প্রাণ গো, দিলেই একটু কমে।'

তার পরে বাত—তার পরে জ্বর।

'কিন্তু রোগ তো রোগ নয়,' বলছেন মা, 'রোগ হচ্ছে যোগ।'

রোগ হওয়া মানেই তো আরোগ্যের কামনা। সেই আরোগ্যকামনাই তো

ঈশ্বরমনন। আরোগ্য কেমন আস্বাদ্য সেটুকু বোঝাবার জন্যেই তো রোগ। প্রভাতে জেগে ওঠাটি কী আনন্দময় সেটি বোঝবার জন্যেই তো রাত্রির ঘুম-মরণ।

জয়রামবাটিতে মাকুর ছেলের খুব অসুখ, ডিপথিরিয়া হয়েছে।

সত্ত্বগুণের ছেলে। মাকু বলেছিল, ছেলে ঘুমোয় না, বলে কোল থেকে নামিয়ে দিয়েছিল মুখের উপর। মা বলেছিলেন, কি করে ঘুমুবে! ও যে সত্ত্বগুণের ছেলে।

যখন মাকুর সঙ্গে জয়রামবাটি যায়, কোত্থেকে কতগুলো গুলঞ্চ ফুল কুড়িয়ে এনে মা'র পায়ে ঢেলে দিলে। বললে, 'দেখ পিসিমা, কেমন হয়েছে।'

তার পরে, আশ্চর্য, শুধু মা'র পায়ের ধুলোই নিল না, ফুলগুলি জামার পকেটে পুরলে।

শরৎ মহারাজকে 'লাল মামা' ডাকে। তার কোলের উপর চড়ে বসে। বলে, 'তোমার মা কোথায়?'

শরৎ মহারাজ মাকুকে ইঙ্গিত করে। বলে, 'এই যে আমার মা।'

'উহুঁ।' ছেলে ঘাড় নাড়ে বিজ্ঞের মত। বলে, 'তোমার মা স্কুল-বাড়িতে গেছে।'

মাকে জিগ্গেস করে, 'ফুল লাল করেছে কে?'

'ঠাকুর করেছেন।'

'কেন?'

'তিনি পরবেন বলে।'

ছেলে গম্ভীর হয়ে যায়। তিনিই যদি পরবেন তবে যে গাছে ফুল ফুটেছে সেই গাছই কি ঠাকুর?

নারায়ণ আয়াঙ্গার খুব করছেন। কলকাতায় লোক পাঠিয়েছেন ইনজেকশান আনবার জন্যে। বৈকুণ্ঠ মহারাজ দেখছে ছেলেকে।

মা কোয়ালপাড়ায়, জগদম্বা-আশ্রমে। মন বড় ব্যস্ত, ছেলের যেন ভালো হবার খবর আসে! সন্ধ্যা হয়-হয়, খবর এল অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়। 'পালকি ঠিক করে রাখো।' মা বললেন ভক্তদের, 'কাল সকালেই আমি যাব যদি ছেলে ততক্ষণ বেঁচে থাকে।'

সকালেই ফিরল বৈকুণ্ঠ।

'তবে কি ছেলে নেই?' মা আর্তনাদ করে উঠলেন।

সবাই নির্বাক। মা একমুহূর্তে দৃঢ় করলেন নিজেকে। বললেন, 'কতক্ষণ মারা গেল?'

'সকাল সাড়ে পাঁচটা।'

'এখন গেলে দেখতে পাব?'

'না মা, নিয়ে গেছে।'

নিয়ে গেছে! এবার মা ভেঙে পড়লেন। লুটিয়ে পড়লেন কান্নায়। একটু থামছেন তো আবার উথলে উঠছেন। সান্ত্বনার ভাষা জানা নেই মানুষের, তবু কেদার মহারাজ বলতে গেল মামুলি কথা। এক কথায় মা হটিয়ে দিলেন। 'কেদার গো, আমি ভুলতে পারছি না।'

অসুখের ঘোর অবস্থায় 'লাল মামাকে' নাকি খুঁজেছিল, ডেকেছিল 'লাল মামা'

বলে। 'হয়তো কোনো ভক্ত এসে জন্মেছিল।' মা চোখ মুছলেন : 'হয়তো বা শেষ জন্ম। নইলে তিন বছরের ছেলের অত বুদ্ধি! অমন করে পুজো করে গা? লালন পালন করে আমার কষ্ট।'

এমনি মায়ার বন্ধন এই সংসার। বন্ধনে রেখেছেন ক্রন্দন শুনবেন বলে। নিজে ছিলেন অমন বন্ধনে তাই তো ঠিক-ঠিক বুঝেছেন আমাদের কান্না।

'আহা, যাকে পাশ ফিরে শুইয়ে মনে প্রত্যয় হয় না, এমন ছেলে মাকুর, আজ কোল খালি করে চলে গেল! দেখ না কী যন্ত্রণায় ছটফট করছি।'

পালার বড় জ্বালা। রাধুকে লালন-পালন করেই এত কষ্ট। অভয় বলে গেল, দিদি, সব রইল দেখো। দেখতে গিয়েই মায়ায় ধরল। আর মায়ায় যদি একবার ধরে, চোখের জলের পুকুরে চুবিয়ে ধরে মারে।

সেবার কোয়ালপাড়ায় মা'র অসুখ, রাধু শ্বশুরবাড়ি যাবে বলে গাওনা ধরেছে। মা'র ইচ্ছে নেই যে যায়। তখন রাধু মুখ ঘুরিয়ে বললে, 'তোমাকে দেখবার জন্যে অনেক না হয় ভক্ত আছে, আমাকে দেখতে আমার সেই এক স্বামী ছাড়া কেউ নেই।' বলে দিব্যি পালকিতে গিয়ে উঠল।

মা'র ভয় হল। রাধু যে অমন করে মায়া কাটিয়ে চলে গেল তবে ঠাকুর কি মাকে আর রাখবেন না? এই যে রাধি-রাধি করি, এ শুধু একটা মায়া নিয়ে আছি। দেহটাকে রাখবার জন্যে কোনো রকমে একটা শিকড় আঁকড়ে পড়ে থাকা। মায়া যদি চলে যায় মহামায়াও চলে যাবেন।

রাধুর মা, পাগলী সুরবালা দেখতে পারে না মাকে। বিশেষ করে কেন তিনি রাধুর সংগে লেগে থাকেন। বলে, 'তোমার তো আরো অনেক ভাজ আছে, তাদের ছেলে একটি লাও গে যাও। তুমি কি আমার ছেলেকেই লিবে বলে জন্মেছিলে?' বলেই বাপান্ত মা-অন্ত গালাগাল।

নীরবে সহ্য করছেন মা। শেষে বলছেন শান্তস্বরে : 'তুই আমাকে সামান্য লোক মনে করিসনি। তুই যে আমাকে এত বাপ-অন্ত মা-অন্ত গাল দিচ্ছিস আমি তোর অপরাধ নিই না—ভাবি দুটো শব্দ বই তো নয়—'

'ওমা, কখন আবার আমি বাপান্ত গালাগালি দিলাম!' পাগল হলে কি হয়, দুষ্ট বুদ্ধি ষোলো আনা।

'আমি যদি তোর অপরাধ নিই, তা হলে কি তোর রক্ষে আছে? আমি যে কদিন বেঁচে আছি তোরই ভালো। তোর মেয়ে তোরই থাকবে। যে কদিন না মানুষ হয় সে কদিনই আমি। নইলে আমার কি মায়া? এখুনি কেটে দিতে পারি। কর্পূরের মত কবে একদিন উড়ে যাব, টেরও পাবিনি।'

পাগলীকে একখানি গরদের কাপড় দিলেন মা। পাগল মানুষ, সাজ-পোষাকে একটু চোখ দিক। কি নিয়ে কথা উঠল, চলে এল রাধির প্রসংগ, আর সেই নিয়ে কথা-কাটাকাটি। গরদের কাপড় মা'র গায়ে ছুঁড়ে মারল পাগলী। বললে, 'এই লাও তোমার কাপড়, তোমার ভালো ভাজদের দাও গে—'

'তোর চেয়ে আমার আর কে ভালো ভাজ আছে?' মা বললেন স্থির থেকে, 'আমি তোর কে যে আমার উপর এত উপদ্রব করছিস? যাকে মন চায় তাকে দেব।'

মাজ্‌টে গ্রামে পাগলীর বাপের বাড়ি। সেখানে সে গেছে। সঙ্গে নিজের গয়না, রাধুর গয়না। চোরে-ডাকাতে নয়, ইঁদুরে-উকুনে নয়, সে গয়না তার বাপ আত্মসাৎ করলে। মা'র কাছে খবর পাঠাল পাগলী। কি ঝঞ্ঝাট দেখ তো—কার না কার বিষয়, তার মধ্যে জড়িয়ে পড়লুম। কিন্তু বাপ হয়ে নিজের মেয়ের, অক্ষম অনাথ মেয়ের গয়না গাপ করবে এও বা কি করে সহ্য করা যায়? পাগলীর বাপকে জয়রামবাটিতে ডাকিয়ে আনলেন। কত সাধ্যসাধনা কত কাকুতিমিনতি, কিছুতেই বামুন টলল না। শেষাশেষি তার পায়ে পর্যন্ত হাত রাখলেন, করুণ স্বরে বললেন, 'আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন দয়া করে।' বামুন বললে, আমি তার কি জানি!

এদিকে পাগলী আবার মাকেই শাসাতে লাগল: 'তুমিই কারসাজি করে আমার গয়না আটক করে রেখেছ। তুমিই দিচ্ছ না।'

'আমি?' ঝলসে উঠলেন মা। 'আমি হলে কাকবিষ্ঠাবৎ এই দণ্ডে ফেলে দিতুম।'

মা গয়না দাও, মা গয়না দাও—সিংহবাহিনীর মন্দিরে গিয়ে কাঁদছে পাগলী। শুনতে পেলেন মা। কত দূরে সেই মন্দির, তবু শুনতে পেলেন। গেলেন নিজে মন্দিরে, ক্ষেপীকে তুলে নিয়ে এলেন।

চিঠি দিলেন কলকাতায়। মাস্টারমশাই চলে এলেন, সঙ্গে ললিত চাটুজ্জে। ললিত অদ্ভুত পোশাক পরে এসেছে, পেণ্টালুন আর চাপকান, মাথায় শামলা আঁটা। পুলিশের উপরওয়ালার কাছ থেকে চিঠি এনেছে যাতে সহজেই একটা কিনারা হয়। গাঁয়ের দুজন চৌকিদার ডাকিয়ে নিল। মাঠের রাস্তা চিনে নিয়ে পথ দেখাতে হবে। রাত হয়ে গেছে, চৌকিদার সঙ্গে নিয়েও সুরাহা নেই, পথ ভুল হয়ে গেল। তখন সকলে 'অম্বিকে' বলে একসঙ্গে হাঁক পাড়লে। অম্বিকে জয়রামবাটির চৌকিদার। জয়রামবাটির লোকেরা ভাবলে মাঠে কারু উপর বুঝি ডাকাত পড়েছে। লাঠি-ঠ্যাঙা লোকজন নিয়ে এসে পড়ল অম্বিকে। ও, ডাকাত নয়, —পোশাক দেখে অম্বিকা সসম্ভ্রমে গড় করল।

পর দিন দুপুরে পালকি চড়ে ললিত রওনা হল মাজ্‌টে গাঁয়ের দিকে। সেই সাজ-পোশাক, সঙ্গে সেই উপরওয়ালার চিঠি। মা কেমন ত্রস্ত হয়ে উঠলেন, মাস্টার-মশাইকে ডেকে বললেন, তুমিও সঙ্গে যাও।

এক মুহূর্ত বুঝি দ্বিধা করছিলেন মাস্টারমশাই, মা বলে উঠলেন কাতরস্বরে, 'ললিতের ছোকরা বয়স, মেজাজ গরম, ব্রাহ্মণকে যদি অপমান করে বসে!' একটা চোরের জন্যে মায়া।

'গয়না যদি ভালোয়-ভালোয় দেয় তো ভালো। না দেয় তো', মা যেন শিউরে উঠলেন, 'ললিত নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণকে অপমান করে বসবে। তুমি যাও, আর যাই হোক, ব্রাহ্মণকে যেন কোনো অপমান না করে। যেন হাতকড়া না পরায়!' মাস্টার-মশাই সঙ্গে গেলেন।

প্রথমেই জাহানাবাদ-এর থানায় গিয়ে উপরওয়ালার চিঠি দেখাল ললিত। জমাদার থেকে বড়বাবু পর্যন্ত ভড়কে গেল। দলের সঙ্গে গেল বড়বাবু। ব্রাহ্মণকে একটু ধমকে দিতেই গয়না বার করে দিল।

সমস্ত রাত মা'র ঘুম নেই। বায়ু প্রবল হয়ে মাথা ঘুরছে। রাত দুটোর সময়

হাঁকডাক। সবাই ওষুধ খুঁজতে ব্যস্ত। কোথায় ওষুধ, কি ওষুধ, কি হলে মা শান্ত হন।

'মা, এমন কেন হল ?' একজন জিগগেস করলে মাকে।

'ওরা চলে গেল গয়না আনতে, আর আমি সারা দিন ভেবে-ভেবে অস্থির, ব্রাহ্মণের কোনো অপমান না হয়। সেই ভাবনায় বায়ু প্রবল হয়ে এমন হয়েছে।'

যে বামুনের জন্য এত হয়রানি, তার জন্যে আবার ভাবনা !

চাকর চুরি করেছে বলে নরেন তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। চাকর এসে কেঁদে পড়ল মা'র কাছে। বললে, 'মা, যা মাইনে পাই তা দিয়ে সংসার কুলোয় না—'

বাবুরামকে ডাকলেন মা। বললেন, 'লোকটি বড় গরিব, অভাবের জ্বালায় ওরকম করেছে। তাই বলে কি গালমন্দ দিয়ে তাড়িয়ে দেবে ?'

বাবুরাম স্তব্ধ হয়ে রইল। এও আবার হয় নাকি ?

'তোমাদের কি। তোমরা সন্ন্যাসী, সংসারের জ্বালা তোমরা কি বুঝবে। লোকটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কাজে বাহাল করো।'

আবার দ্বিধা করল বাবুরাম। বললে, 'ওকে আবার রাখলে স্বামীজী বিরক্ত হবেন।'

'আমি বলছি নিয়ে যাও।'

চাকরকে নিয়ে ঢুকছে দেখে স্বামীজী জ্বলে উঠলেন : 'এ কি কাণ্ড ! ওটাকে আবার নিয়ে এসেছ ?'

বাবুরাম বললে, 'মা'র আদেশ।'

মা'র আদেশ ! স্বামীজী মাথা নোয়ালেন।

* চব্বিশ *

যার পাপ নিয়ে ঠাকুরের ব্যাধি সেই গিরিশ ঘোষ এসেছে জয়রামবাটিতে।

অনেকদিন আগে গিরিশের কলেরা হয়েছিল, বাঁচবার আশা ছিল না। শেষ নিশ্বাসটুকু নিয়ে ধুঁকছে, দেখলো মাতৃবেশে স্নেহময়ী একটি নারী এসে দাঁড়িয়েছে শিয়রে। কোন ছেলেবেলায় মা মারা গেছে, মনে করতে পারছে না, ভাবলে এই বুঝি সেই মা। ছেলেকে কোলে করে নিয়ে যেতে এসেছেন। কিন্তু ও কি, কী যেন খেতে দিচ্ছেন মা, মুখে পুরে দিচ্ছেন। বলছেন, 'এ মহাপ্রসাদ। খাও। এ খেলে তুমি ভালো হয়ে যাবে।'

ভালো হয়ে যাবো ! সত্যিই, ভালো হয়ে উঠল। কিন্তু মা কোথায় ?

সবাই বলে কালীঘাঠ মহাপীঠস্থান, সেখানে মা আছে। শনি-মঙ্গলবার গভীর রাত্রে সেখানে যায় গিরিশ। যেখানে বলিদান হয় সেই হাড়-কাঠের পাশে বসে মা-মা বলে ডাকে, কাঁদে আর্তস্বরে। এত জায়গা থাকতে হাড়-কাঠের কাছে কেন ? শত-শত ছাগ বলি হচ্ছে সেখানে। মৃত্যুকালে তাদের সেই করুণ আর্তনাদ শুনে বেটি নিশ্চয়ই একবার এদিকে তাকায়। যদি আমার আর্তনাদে ভুল করে

একবার তাকায় আমার দিকে। যদি আমার চোখের উপর ঠিকরে পড়ে তার চোখের আলো।

গিরিশের সেই চার বছরের ছেলে যখন গিরিশকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল শ্রীমা'র কাছে, তখন গিরিশ দেখেছিল মা'র পা দুখানি। তারপর সেই ছাদে উঠে মাকে দেখবার সুযোগ হয়েছিল ফিরিয়ে নিয়েছিল পাপনেত্র। ঠাকুর নেই, সমস্ত জীবন যেন বীতস্বাদ হয়ে গিয়েছে। জীবনকে ঘিরেছে যেন দুর্দিনের ধূমজাল। কোথায় ঠাকুর! কোথায় সেই একশরণ করুণানিলয়!

স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে ধরল একদিন। বললে আকুলকণ্ঠে, 'ঠাকুরের কাছে যদি যেতে পারতাম তবেই বোধ হয় শান্তি হত।'

'কেন, মা'র কাছে যাও না?'

'মা'র কাছে?'

পরমব্রহ্মমহিষী বলে তখনো যেন বুঝতে পারেনি গিরিশ। সাধারণ আর সকলে যেমন ভাবত গুরুপত্নী, বোধহয় তেমনি ভাবের ভক্তিতেই অধিষ্ঠিত রেখেছিল। নিরঞ্জনের কথায় চমকে উঠল।

'তা ছাড়া আবার কি? মা আর ঠাকুর কি আলাদা? হর-গৌরী রাম-সীতা রাধা-কৃষ্ণ কি খণ্ড-খণ্ড?'

ঠিকই তো। গিরিশ তো নিজেই লিখেছে বিল্বমংগলে—এক সাজে পুরুষ-প্রকৃতি। সত্যিই তো, ভগবান অবতীর্ণ হয়ে কি সাধারণ নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছেন? ঠাকুরেরই তো কথা, অর্ধেক কাজ আমি করে গেলাম আর বাকি অর্ধেক তুমি করবে।

নিরঞ্জন বললে, 'তোমার ভয় কি। তোমাকে তো ঠাকুর গেরুয়া দিয়ে গেছেন। তুমি তো সন্ন্যাসী। ঠাকুর নিজেই ভেঙে দিয়েছেন তোমার সংসার। এখন চলো সংসার ছেড়ে।'

'না তো! ঠাকুর তো আমাকে সন্ন্যাসী হতে বলেননি।' গিরিশ বললে জোরের সঙ্গে।

'কিন্তু গেরুয়া তো দিয়েছেন। তুমি দিয়েছ বকলমা তিনি দিয়েছেন গেরুয়া। তুমি শরণাগতি তিনি বৈরাগ্য। তুমি সন্ন্যাসী না তো কে সন্ন্যাসী। চলো একবার মা'র কাছে—তিনি যা বলবেন তাই হবে।'

পুণ্যধাম জয়রামবাটিতে এই প্রথম গেল গিরিশ। এই প্রথম মা'র মুখ দেখলে। এই প্রথম মা'র নেত্রামৃতচ্ছটা পড়ল গিরিশের পুণ্যনেত্রে।

কিন্তু এ কি! এ যে সেই বহুদিন আগেকার মৃত্যুশয্যার পাশে প্রসাদদায়িনী মাতৃমূর্তি।

মাগো, তুমিই কি সেই? সর্বক্লান্তিহরা হাসি হাসলেন মা।

'বলো মা, তুমি কেমনতরো মা? তুমি কি পাতানো মা?' গিরিশ পড়ল মা'র পায়ের কাছে।

'আমি সত্যিকারের মা।' মা বললেন গভীরস্নিগ্ধ সহজ সুরে, 'পাতানো মা নয়, গুরুস্ত্রীরূপে মা নয়। আমি আসল মা।'

মা যদি নিজে না চিনিয়ে দেয় কে চিনবে তাকে ? বিছানার চাদর বালিশের ওয়াড় কাচতে যাচ্ছে পুকুরঘাটে, তোমাকে কে বুঝবে জগন্মাতা ? জগন্মাতা কি হেঁসেলে হাঁড়ি ঠেলে, তরকারি কোটে, ঘর ঝাঁট দেয়, পরের ছেলে টানে ?

গিরিশ শুতে এসে দেখে, তার বিছানা-বালিশ শাদা ধবধব করছে। বুঝল এ মা'র কাজ। সোডা-সাবান দিয়ে কেচেছেন নিজের হাতে। গিরীশ ভেবে পেল না কাঁদবে না আনন্দ করবে ! অধম সন্তানের জন্যে শারীরিক কষ্ট করেছেন তার জন্যে কান্না—আবার কৃপা করেছেন স্নেহ করছেন তার জন্যে আনন্দ। অশ্রু ঝরতে লাগল চোখ বেয়ে। এ অশ্রুর আস্বাদ কি দুঃখ না সুখ তা কে বলবে !

মা'র কাছে বসে এক ভিখিরি গান গাইছে বেহালা বাজিয়ে :

'মা, উমে, বড় আনন্দের কথা শুনে এলাম। তুই বল এ কি সত্যি ? শুনে এলাম কাশীধামে তোর নাম নাকি অন্নপূর্ণা ! অপর্ণে, যখন তোকে অর্পণ করি, ভোলানাথ তখন মুষ্টির ভিখারি ছিল। নেশা-ভাঙ করে বেড়াত, নাচত ভুত-প্রেত নিয়ে। এখন শুনি সে নাকি বিশ্বেশ্বর, আর তুই নাকি তার বামে বিশ্বেশ্বরী ? বল, কি করে বিশ্বাস করি এ কথা ? দিগম্বর বলে সবাই খ্যাপা-খ্যাপা বলত, কার হাতে মেয়ে দিলাম কত গঞ্জনা সয়েছি ঘরে-পরে ! এখন শুনি দিগম্বরের ঘরে নাকি দ্বারী আছে। ইন্দ্র চন্দ্র যমও নাকি তার দর্শন পায় না। বল গৌরী, তোর এই গৌরবের কথা কি সত্যি ?'

এ যেন মেনকার কথা নয়, শ্যামাসুন্দরীর কথা। মা'র যেন বাল্যলীলা মনে পড়ে গেল, চোখের জলে ভেসে যেতে লাগলেন।

ঠাকুরের উপর বিবেকানন্দের অভিমান হয়েছে। মাকে এসে বলছেন, 'মা, এই তো ঠাকুর ! কাশ্মীরে এক ফকিরের চেলা আমার কাছে আসত বলে ফকির আমায় শাপ দিলে। বললে, 'অসুখ হয়ে তিন দিনের মধ্যে এই জায়গা ছেড়ে পালাতে হবে। আর তাই কিনা হল ! সামান্য একটা ফকিরের শক্তিকে ঠেকাতে পারলেন না ঠাকুর !'

মা বললেন, 'বাবা, শুনতে পাই শঙ্করাচার্যও নাকি এমনি করে নিজের শরীরে রোগ আসতে দিয়েছিলেন। রোগ তোমার শরীরে আসতে দেওয়া বা তাঁর শরীরে আসতে দেওয়া একই কথা। তিনি তো ভাঙতে আসেননি, গড়তে এসেছিলেন। তাই সব কিছু মেনে গিয়েছেন।'

'আমি মানি না।' বললেন বিবেকানন্দ।

'না মেনে কি উপায় আছে ?' মা বোধহয় হাসলেন একটু মনে-মনে : 'তোমার টিকি যে বাঁধা।'

ইচ্ছে হয় সব ছেড়ে দি। লেখা-পড়া থিয়েটার-অভিনয়। ঠাকুরকে একদিন বলেছিল গিরিশ ঘোষ। ঠাকুর বলেছিলেন, 'না-না ছেড়ো না, ওতে লোকের উপকার হচ্ছে—'

আশ্চর্য, মাও সেই এক কথাই বললেন। সন্ন্যাস নেবার বাসনা নিয়ে এসেছিল পাদপদ্মে। মা বললেন, 'যা করছ তাই করো। যেমন বই লিখছ তেমনি লেখ—এও তো তাঁরই কাজ। ঠাকুর তো তোমাকে বলেননি সংসার ছাড়তে।' তাই সই। সংসারেই থাকব মা'র ছেলে হয়ে। মা'র কাছেই তো ছেলে নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ।

মা বলেই তো ছেলের বিছানা পরিষ্কার করে দিলেন, পাষণ্ডের বিছানা বলে ছুঁড়ে ফেললেন না। এ তো শুধু আলোকরা ভালো ছেলের মা নয়, এ কালো ছেলেরও মা। পাতানো মা নয়, সৎ-মা নয়, সত্যিকারের মা।

মা'র জয় দে সকলে। আর ভয় নেই। আনন্দময়ী ভুবনেশ্বরী সম্পদ্‌রমা শ্রী হয়ে বিরাজ করছেন সংসারে। কে আছিস দৈন্যার্তিভীত, ভবতাপপীড়িত, শান্ত হবি আয়, তৃপ্ত হবি আয়, অমল হবি আয় আরোগ্যস্নানে। ক্ষীরোদসাগরের লক্ষ্মী উঠেছে সংসারসাগরের মন্থনে। দুর্গদুর্গতিহরা বিমুক্তিফলদায়িনী। শুধু বাণী নয় ব্যাখ্যা-স্বরূপা। প্রাণমন্ত্ররূপিণী। মধুমধুরা মাতা সারদা।

কলকাতায় ফিরে গিয়ে গিরিশ চিঠি লিখেছে, এবার মা শারদীয়া পূজায় আসতে হবে সশরীরে। আমার দীনালয়ে।

মা'র শরীর অত্যন্ত খারাপ, তবু রাজী হলেন। গিরিশের ডাক। ঠাকুরের বীরভক্ত গিরিশ। কিন্তু মা'র কাছে পাঁচ বছরের ছেলে। গিরিশ যখন প্রণাম করে, মা বলেন, যেন পাঁচ বছরের বালক।

বিষ্ণুপুরে পৌঁছে দেখা গেল মাস্টারমশাই আর ললিত। 'ললিতের আমার লাখ টাকার প্রাণ।' বলছেন মা : 'আমাকে কত টাকা দিয়েছে। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সেবায়, কামারপুকুরে রঘুবীরের সেবায়। তার গাড়িতে করে বেড়াতে নিয়ে গেছে। কত বড়লোক আছে, কিন্তু কৃপণ। ললিত আমার অঢেল।' বলেই বললেন সেই সরস সূক্ত : 'যার আছে সে মাপো, যার নেই সে জপো।'

আপনারা এখানে ?

আমরা তোমাদের নিতে এসেছি এগিয়ে। কলকাতায় মারপিট চলেছে, রাত্রে শহর অন্ধকার। ভয় নেই, ব্যবস্থা হয়ে যাবে ঠিকঠাক। এখন এখানকার এই চটিতে এসো, তোমাদের খাবার বন্দোবস্ত করে রেখেছি।

হাওড়ায় পৌঁছুতে সন্ধে। গণেন এসেছে স্টেশনে, সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে ললিত। গণেন বললে, নৌকো করে একেবারে বাগবাজারের ঘাটে গিয়ে ওঠাই নিরাপদ। শরৎ মহারাজ আর গিরিশেরও মত তাই। কিন্তু মা'র নৌকোতে বড় ভয়। তাই কি করা যায়, ললিতের গাড়িতেই রওনা হল সকলে। ভিতরে মা, রাধু আর রাধুর মা। দু পাদানিতে দুজন—আশু আর ললিত। কোচবাক্সে গণেন। আর জিনিসপত্র নিয়ে ছাদে মাস্টারমশাই। গঙ্গার ধার দিয়ে চলল কুমোরটুলির ঘাটের দিকে। শেষে কুমোরটুলি হয়ে রাজবল্লভপাড়া হয়ে বলরাম বোসের বাড়ি।

সকালবেলা গিরিশ আর তার দিদি দক্ষিণা এসে হাজির। প্রণাম তো বটেই, নিমন্ত্রণও করতে এলাম, মা। কিন্তু মা, তুমি তো প্রণাম বা নিমন্ত্রণ কিছুরই অপেক্ষা করো না। তোমার নামটি নিলেই প্রণাম, তোমার মন্ত্রটি নিলেই নিমন্ত্রণ।

দক্ষিণা বললে, 'গিরিশ তো বেঁকে বসেছিল মা। বলে, মা না এলে পুজো করব কাকে ? করবই না।'

মাটির প্রতিমা অনেক দেখেছি। এবার জীবন্ত প্রতিমা চাই। স্বামীজীর ভাষায়, জ্যান্ত দুর্গা।

মা'র সামনে কল্পারম্ভ হল। সপ্তমীর দিন বলরাম বোসের বাড়িতে সে কি

ভিড়। দলে-দলে লোক আসছে। সব মাকে দেখবে, মা'র পা দুখানি। শুধু তাই নয়, প্রণাম করবে, পূজা করবে। সমস্ত দেহ ঘন বস্ত্রে আবৃত করে শুধু পা দুখানি মুক্ত করে দাঁড়িয়ে আছেন মা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যাচ্ছে, তবু মা ঠায় দাঁড়িয়ে। এক ভাবে। যদি এতটুকু অহং থাকত তবে হয়তো বসতেন পরিপাটি করে। গদি পেতে। এ যেন কত কুণ্ঠা, কত লজ্জা, কত মিনতি। তাই দাঁড়িয়ে আছেন সর্বক্ষণ।

পূজার লগ্ন এসে পেঁছুলে চলে গেলেন গিরিশের বাড়ি। সেখানে যেন আরো ভিড়। একই পূজার দালানে মা আর প্রতিমা। চিন্ময়ী আর মৃন্ময়ী। ভক্তরা দিশেহারার মত হয়ে গিয়েছে। কার পায়ে প্রথম অঞ্জলি দেবে ঠিক করতে পারছে না।

বেলপাতা আর তুলসী, জবা আর পদ্ম, পাহাড় হয়ে রয়েছে। তবু ভক্ত-সমাগমের বিরাম নেই। প্রতিমা যেমন দাঁড়িয়ে তেমনি মাও দাঁড়িয়ে।

প্রতিমার কি, সে অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু মা'র জ্বর এসে গেল। দেহ ধরেছেন তার ট্যাকসো না দিয়ে উপায় কি। তবু মহাষ্টমীতে ভক্তসাধ পূর্ণ করতে দাঁড়ালেন আবার চাদর মুড়ি দিয়ে। কিন্তু আর নয়, সত্যি-সত্যি এবার বিছানা নিলেন মা। একে কৃশকরুণ দেহ তায় এই ক্লান্তি। গভীর রাত্রে সন্ধিপূজা, গিরিশের কাছে খবর গেল, মা'র জ্বর বেড়েছে, আসতে পারবেন না। গিরিশ চোখে অন্ধকার দেখল। উদ্ভ্রান্তের মত ডাকতে লাগল মা-মা বলে।

মধ্যরাতে মা উঠে বসেছেন বিছানায়। ডেকে তুললেন গোলাপ-মাকে। বললেন, 'এখন একটু ভালো বোধ করছি, আমি যাব।'

আশুকে জাগালো গোলাপ-মা। বললে, 'ওঠো। মা যাবেন। তাঁকে নিয়ে যেতে হবে।'

বলরাম বোসের বাড়ির পশ্চিম দিক দিয়ে সরু গলি। সেই গলি দিয়ে এগুতে লাগলেন মা। পা ফেলতে পারছেন না, শরীর টলে-টলে পড়ছে। কিন্তু মনে আশ্চর্য দৃঢ়তা। ঠাকুরের বীরভক্ত গিরিশের মর্যাদা রাখতেই হবে।

গিরিশের বাড়ির খিড়কির দরজা বন্ধ। সদর দিয়ে ঢুকে দরজা খোলাতে হবে কাউকে দিয়ে। ব্যস্ত হয়ে আশু চলে গেল সদরের দিকে। কাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছ দরজার বাইরে তার খবর রাখো ?

মা অস্ফুটস্বরে বললেন, আমি এসেছি।

একটা ঝি শুনতে পেয়েছে সেই নিশ্বাসের মতন কথাটুকু। পলকে খুলে দিল দরজা।

'মা এসেছেন, মা এসেছেন। সমস্বরে সংগীতময় ধ্বনি উঠল। ঝাঁকে-ঝাঁকে উলু দিয়ে উঠল মেয়েরা। মা এসেছেন। দীন-হীন পাপী-তাপী নিঃস্ব-নিরালম্বের মা। সমস্ত বঞ্চনার মধ্যেও যার অঞ্চলের আশ্রয়টুকু অটুট থাকে সেই মা। গৌরব-বহনে আসেননি, গোপনচরণে এসেছেন। ঐশ্বর্যের সদর দিয়ে আসেননি, এসেছেন মাধুর্যের খিড়কি দিয়ে।

গিরিশের আনন্দ তখন দেখে কে।

* পঁচিশ *

এবার পালাই কলকাতা থেকে। এত ভিড়-ভাড় হৈ-চৈ সহ্য হবে না।

দেশে কালীকুমারকে চিঠি লেখা হল যেন দেশড়া গাঁয়ে পাল্কি পাঠানো হয়। একখানি চিঠি নয়, পর-পর দুখানি চিঠি। একখানি অন্তত পাবেই।

বিষ্ণুপুর আর কোতলপুর হয়ে দেশড়া। দেশড়া পেরিয়ে মাঠে পড়েছেন, সন্ধ্যা লেগেছে। কিন্তু চারদিক ধু-ধু করছে, পাল্কি কই?

এবার সঙ্গে করে গোলাপ-মা আর কুসুমকে নিয়ে এসেছেন। তারাই এসেছে জোর করে। ভায়ের সংসারে খেটে-খেটে তুমি শরীর পাত করবে এ হতে দেব না। আমরা তোমার কাজ করে দেব। তোমার পরিচর্যা করব।

এখন এদের নিয়ে যাই কি করে? বিষ্ণুপুর থেকে গরুর গাড়িতে এসেছি, কিন্তু দেশড়া থেকে জয়রামবাটি পায়ে-হাঁটা পথেই কাছে, গরুর গাড়ি করে যেতে হলে যেতে হবে লম্বা ঘুর-পথে, শিওড় হয়ে। আর শিওড়ের রাস্তাও তেমনি, হাড়-মাস আলাদা হয়ে যায়। তারই জন্যে লেখা হয়েছিল পাল্কির কথা। কিন্তু ভায়েদের কাণ্ডজ্ঞান দেখ! পাল্কি না পাঠাতে পারিস, নিজেরা কেউ আয়। তা না হয়, মুনিষ-বাগালে কাউকে পাঠিয়ে দে। এমন অপদার্থ তো কোথাও দেখিনি।

দেশড়ার মাঠটুকু পেরিয়ে নদী। নদী পেরিয়ে আরেকটু মাঠ। তার পরেই জয়রামবাটি। কি করবেন? গরুর গাড়িতে করে শিওড় হয়ে যাবেন, না, পায়ে হেঁটে? পায়ে হেঁটে। শিওড়ের রাস্তায় গরুর গাড়ির ঝাঁকুনি আমি সইতে পারব না।

ঠিক হল গোলাপ-মা আর কুসুম গাড়ি চড়ে যাক শিওড় হয়ে। আর বাকিরা পদব্রজে। এ দল বাড়িতে আগেই পৌঁছুবে, পৌঁছেই চাকর পাঠাবে শিওড়ে। কুসুম আর গোলাপ-মাকে নিয়ে আসবে পথ দেখিয়ে। আমরা হাঁটি।

মা'র কালো রঙের টিনের বাক্সটি হাতছাড়া করা চলবে না। তার মধ্যে সিংহ-বাহিনীর মাটি, জপের মালা, ঠাকুরের খাট। আশুই একমাত্র চলনদার। তার এক হাতে রাধু আরেক হাতে বাক্স। মা চলেছেন আগে, সুরবালা পিছনে।

আলো নেই, রাতের অন্ধকার আসছে ঘনীভূত হয়ে। তবু, ভয় নেই, পথ সকলের মুখস্ত।

কিছুদূর যেতেই সুরবালা হঠাৎ বলে উঠল, 'ওবাগে কুথাকে যাচ্ছ? এ বাগে এস।'

কালীকুমারের ব্যবহারে মা অপ্রসন্ন ছিলেন, ভালো করে ঠাহর করে দেখলেন না দিশপাশ। বললেন, 'সত্যিই তো, এদিকে চলো। ছোট বউয়ের পথ সব জানা। ও তো মাঠে-মাঠেই ঘুরে বেড়ায়।'

আশুরও কি হল, মেনে নিলো। এখন দেখে, নদীর ঘাটে না পেঁছে এক আঘাটায় এসে দাঁড়িয়েছে। কোথায় কুল কোথায় কিনারা কে বলবে।

'আপনারা একটু দাঁড়ান, আমি নদীর ধারে-ধারে গিয়ে ঘাট দেখে আসি।' আশু বললে ভয়ে-ভয়ে।

'কোথায় এই তেপান্তরের মাঠে আমাদের ফেলে রাখবে !' মা ঝলসে উঠলেন : 'যেতে হবে না তোমায় ।'

মা'র মুখের তিরস্কারটিই বা কি মধুর !

নদী প্রায় নির্জলা । বেশ দিব্যি হেঁটে পার হওয়া যাবে দেখছি । অন্ধকার ঠেলে-ঠেলে তাই এগুতে লাগল সকলে । যাচ্ছেন-যাচ্ছেন আর বকছেন আশুকে, 'তুমি বেটাছেলে হয়েছ কেন ? আমাদের কথা শুনলে কেন ? তোমার মেয়েমানুষ হওয়াই উচিত ছিল ।'

দূরে আলো দেখা গেল ।

'কে গা আলো নিয়ে যায় ? এদিকে আমাদের একটু ধরো না । আমরা পথ হারিয়েছি ।'

আলো চলে এল কাছে । দেখল, খানিক আড় হয়ে এসেছে, তাই গাঁয়ের গা ছেড়ে পড়েছে গিয়ে বাইরে ।

বাড়ি পেঁাছেই প্রথম ভাজের কাছে জল চাইলেন মা । তেষ্টায় আকণ্ঠ শুকিয়ে গিয়েছে । এক ঘটি জল দিল এনে । দাওয়ায় বসে তাই খেলেন পুরোপুরি ।

এবার গাড়ির খোঁজে পাঠাও চাকরদের । তারপর কালীকে ডাকো ।

চিঠি পাওয়া স্বীকার করলেন কালীকুমার । তবে পালকি পাঠালে না কেন ? পালকি পাওয়া গেল না । মুনিষ-মাইনদার ? রাখাল-বাগাল ?

এটা-ওটা ওজুহাত দেখায় । কোনোটাই টেঁকসই নয় । আসল কারণ হচ্ছে ঔদাসীন্য । যে এদের সংসারের জন্যে দেহপাত করছে তার মূল্য না বোঝা ।

'আমার ছেলেবেলা থেকেই অভ্যেস আমি কারু দোষ দেখতে পারতুম না ।' বলছেন মা । 'আমার জন্যে যে এতটুকু করে, আমি তাকে তাই দিয়ে মনে রাখতে চেষ্টা করি । তা আবার মানুষের দোষ দেখা ! যদি শান্তি চাও মা, কারু দোষ দেখবে না । দোষ দেখবে নিজের । জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ । কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার ।'

সকালে কলকাতা থেকে কটি ভক্ত এসেছে । খুব সাজগোজ । এক গাদা ফল নিয়ে এসেছে মা'র জন্যে, কিন্তু আদ্ধেক পচে গোবর হয়ে গিয়েছে । এখন সেগুলি কোথায় যে ফেলেন খুঁজে পান না ।

এদিকে ফিটফাট ফুলবাবু, গামছা আনেনি । এখন দাও একটা কিছু দেখে-শুনে । তারপরে আবার বলছে মশারির দড়ি নেই । হরি এখন দড়ি খুঁজে বেড়াক ।

ঠাকুরের উপর অভিমান করে বলছেন : 'ঠাকুর, তোমার সংসার তুমি দেখ গিয়ে । এদিকে রাঁধি আর ওদিকে এই সব ।'

সেদিন একটা বুড়ো মতন লোক এসে হাজির, মাকে প্রণাম করবে । তাকে দূর থেকে দেখেই মা ঘরের মধ্যে কাঠ হয়ে রইলেন । বাইরে থেকেই প্রণাম সেরেছে বটে, কিন্তু বলছে, পায়ের ধুলো চাই । চৌকিতে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছেন মা, না-না করছেন, তবু কিছুতে ছাড়লে না, জোর করে কেড়ে নিল পায়ের ধুলো । সেই থেকে মা'র পায়ের জ্বালা আর পেটের ব্যথা শুরু হল । তিন-চার বার পা ধুলেন তবু উপশম নেই ।

'যে বিষ আমরা ধারণ করতে পারি না তাই পাঠাচ্ছি মা'র কাছে।' বলেছিল প্রেমানন্দ : 'স্বচ্ছন্দে পান করছেন সে-বিষ, হজম করে ফেলছেন।'

কোয়ালপাড়ায় এক ভক্ত এসেছিল মাকে প্রণাম করতে। গভীর সঙ্কোচ, কিছুতেই মা'র পা ছোঁবে না, পাছে মা কষ্ট পান। মা বুঝতে পারলেন তার মনের না-বলা কথাটি। বললেন, 'বাছা, আমরা তো এর জন্যেই এসেছি। আমরা যদি অন্যের পাপ আর দঃখ না নিই, তবে আর কে নেবে ?'

সেদিন পুলিশের এক বড়বাবু এসে হাজির। ইয়া তার গোঁফ। গোঁফ পাকাতে-পাকাতে বললে, পায়ের ধুলো চাই। কি রকম চঞ্চল স্বভাব লোকটার, মা রাজী হলেন না। পরে ভাবলেন, কি জানি, লোকটার পদমর্যাদায় ঘা পড়বে না কি। তাই, পায়ের ধুলো নয়, হালুয়া করে পাঠিয়ে দিলেন সদরে।

পুজো সেরে সবে উঠেছেন, কোত্থেকে এক ভক্ত কতগুলি ফুল নিয়ে এসে হাজির। চেনেন-না-শোনেন-না, সর্বাঙ্গ চাদর মুড়ি দিয়ে বউ-মানুষটির মতন বসে রইলেন তক্তপোশে। শুধু ঝোলানো পা দুখানিই অনাবৃত। পায়ে ফুল দিয়ে প্রণাম করে সামনে আসন পাতল ভক্ত। সেই আসনে দৃঢ় হয়ে বসে ন্যাস আর প্রাণায়াম শুধু করলে।

সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত, কেউ নেই মা'র কাছাকাছি। অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে, গোলাপ-মা কি উপলক্ষে এসেছে এ-ঘরে। এক নজরেই বুঝে নিল ব্যাপারটা। সহসা সেই ভক্তের হাত ধরে তাকে টেনে তুলল আসন থেকে। বললে ধমক দিয়ে, 'এ কি কাঠের ঠাকুর পেয়েছ যে ন্যাস-প্রাণায়াম করে তাকে চেতন করবে ? আক্কেল নেই গা ? মা যে ঘেমে অস্থির হচ্ছেন।'

সেবার কি হয়েছিল জানো না বুঝি ? এক ভক্ত মাকে প্রণাম করতে এসে মা'র বুড়ো আঙুলে খুব জোরে মাথা ঠুকে দিলে। উঃ—কাতর শব্দ করলেন মা। কি হল ? কি করলে ? ভক্ত বললে, 'এমনি তো মনে রাখবেন না, ব্যথা করে দিলে যদি মনে রাখেন।'

সাধ্য কি তাকে ভুলি ? সে যে মা'র পায়ে ব্যথা করে দিয়েছে। কত বার কত জনের কাছে তার কথা বলেছেন মা। বলেছেন আর হেসেছেন। হেসেছেন ব্যথার আনন্দে।

বরিশাল থেকে এক ভক্ত এসেছে, কিন্তু মা'র সেবকেরা তাকে ঢুকতে দেবে না। তর্কাতর্কি শুরু হয়েছে, মহা হৈ-চৈ। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছে ভক্ত, যদি মা'র দেখা না পাই থাকব অনশনে। তাই থাকো না, বাইরে বসে অনশন করো। কিন্তু অনশনে বসবার আগে শেষ চেষ্টা করে যাব। এখনো গলার জোর আছে, গায়ের জোর আছে—

কি ব্যাপার ? মা দাঁড়ালেন এসে দরজার সামনে। সেবকরা বললে, স্বামী সারদানন্দের বারণ, যখন-তখন যে-সে লোককে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

'শরৎ বারণ করবার কে ?' মা যেন ঈষৎ বিরক্ত হয়েছেন। বললেন, 'আমি তবে আর কিসের জন্যে আছি !' পরে সেই ভক্তের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিছু খাও গে আজ। কাল এসো। কাল তোমাকে দীক্ষা দেব।'

'ঠাকুরের শিষ্যদের দেখ। এক-একটা বিরাট পুরুষ। আর তোমার শিষ্যরা ?' যোগেন-মা বললেন পরিহাস করে। 'যত সব চুনোপুঁটি—'

'কি করব !' মা স্নেহবিষণ্ণ মুখে বললেন, 'ঠাকুর সব দেখে-শুনে বাছাই করে নিয়েছেন, আর আমার জন্যে পাঠিয়েছেন যত চুনোপুঁটির ঝাঁক। যত সার-বাঁধা পিঁপড়ে। তাঁর শিষ্যের সঙ্গে আমার শিষ্যের তুলনা কোরো না।'

কি করব ! আমি যে মা। আমি কি কাউকে ফেলতে পারি ? আমার কাছে তো আসবেই সব হেঁজি-পেঁজি, গরিব-গুরবো, কেউকেটার দল। কেষ্ট-বিষ্টু আমি কোথায় পাব ? আমি যে সকলের মা। যারা সামান্য নগণ্য অধম অযোগ্য তারা কোথায় যাবে ? আমিও যদি তাদের ফিরিয়ে দিই, তবে কেন আমি মা হয়েছিলুম ?

শুধু দয়ার মন্ত্র দিই। ছাড়ে না, কাঁদে, দেখে দয়া হয়। নইলে আমার কী লাভ ! মন্ত্র দিলে শিষ্যের পাপ নিতে হয়। ভাবি দেহটা তো যাবেই, তবু এদের হোক।

'জানি কত অযোগ্য লোক আসে।' বলছেন একদিন মা : 'হেন পাপ নেই যা জীবনে করেনি। কিন্তু আমাকে যখন মা বলে ডাকে তখন সব ভুলে যাই। হয়তো পাওয়া উচিত নয় তারও বেশি দিয়ে ফেলি।'

কি করবো, আমি যে মা। আমাকে যে সবাই মা-মা করে ডাকে।

অসুখে কষ্ট পাচ্ছেন মা, এক ভক্ত এসে বললে, 'আপনি এত কষ্ট পাচ্ছেন, কষ্টটা আমায় দিন না।'

মা চমকে উঠলেন। বললেন, 'বলো কি ? ছেলে ! ছেলেকে মা কি কখনো দিতে পারে অসুখ ? ছেলের কষ্ট হলে যে মা'র আরো বেশি কষ্ট। আমি সেরে যাব, ভয় নেই !'

মা'র তখন শেষ অসুখ, দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করছেন। চেহারা ভীষণ শুকিয়ে গিয়েছে, উঠতে পাচ্ছেন না বিছানা ছেড়ে। সন্ন্যাসী-ভক্তরা বলা-বলি করছে, এবার মা সেরে উঠলে আর তাঁকে মন্ত্র দিতে দেওয়া হবে না। মন্ত্র দিয়ে যত লোকের পাপ টেনে নিয়ে মা'র এই ব্যাধি। বিচিত্র লোকের বিচিত্র পাপ।

কথাটা মা'র কানে গেল। রোগশীর্ণ মুখে তিনি একটু হাসলেন। বললেন, 'ও কেন বলছ ? ঠাকুর কি এবার শুধু রসগোল্লা খেতেই এসেছেন ?'

শুধু আরামের জীবন যাপন করতে আসেননি। কণ্টকণ্টকে বিন্ধ হতে এসেছেন। পরের পাপকে নিজের ব্যাধিতে রূপান্তরিত করেছেন। নিজে নাগপাশে বাঁধা পড়ে পরকে বিষমুক্ত করে দিয়েছেন।

আর যে ঠাকুর সেই মা।

এক সাধুকে মুরুব্বি ধরে দুই ভক্ত এসেছে দীক্ষা নিতে। মা বলে দিয়েছেন শরীর ভালো নয়, দীক্ষা হবে না। খবর শুনে ভক্ত দুজন কাঁদতে বসেছে।

'বাবা কিছু বলবে ?' সাধুকে জিগগেস করলেন মা।

'দীক্ষা দেবেন না শুনে ভয়ানক কাঁদছে ছেলে দুটো।'

'কি করে দিই ! শরীরটা ভালো নয় যে।'

'কিন্তু মা, বড় কাঁদছে যে ওরা। আপনি না দিলে কে দেবে ?'

'তুমিও বলছ ?'

'হ্যাঁ, মা—'

'কিন্তু,' মা একটু থেমে বললেন, 'ওদের দেহ যে অশুদ্ধ।'

সাধু চমকে উঠল। ভাবল, পড়ল বুঝি জলের তলে। আশ্রয়হীনের মত তাকাল মা'র মুখের দিকে।

'এখানে ওদের তিন রাত্রি বাস করতে বলো। এখানে তিন রাত্রি বাস করলেই দেহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। এটা যে শিবের পুরী।'

* ছাব্বিশ *

'ঠাকুরঝি মরুক, ঠাকুরঝি মরুক—' পাগলী সুরবালা মাকে গাল দিচ্ছে। মা পূজায় বসেছেন, রইলেন মূক হয়ে।

পূজা শেষে বললেন মা, 'ছোট বউ জানে না যে আমি মৃত্যুঞ্জয় হয়েছি।'

পাগলী আবার কখনো রসিকতাও করে। ঠাকুরের ছবি মা ফুল দিয়ে সাজাচ্ছেন। পাগলী তা দেখে মুচকে-মুচকে হাসছে আর বলছে ভক্তদের, 'দেখ তোমাদের মা'র কাণ্ড। নিজের সোয়ামিকে নিজেই সাজাচ্ছে।'

মন্মথ, রাধুর স্বামী, জলে ডুবেছে—একদিন এমনি শোর তুলল সুরবালা। 'ওগো ঠাকুরঝি গো, আমার জামাই বাঁড়ুয্যে পুকুরে ডুবে গেছে গো। কি হবে গো ?'

মা বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলেন সুরবালা ভিজে কাপড়ে উঠোনে আছাড় খেয়ে পড়েছে। জামাইকে খুঁজতে সে নিজেও জলে নেমেছিল, একগাছা চুলও দেখতে পেল না। ঠাকুরঝি, এ সব তোমার কাজ। আমার সুখ তোমার দু'চোখের বিষ। চালাকি চলবে না, আমার জামাইকে ফিরিয়ে দাও। ব্যস্ত হয়ে মা সবাইকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন।

কে এসে বললে, 'মন্মথ বেনেদের দোকানে তাশ খেলছে। দেখে এলাম এইমাত্র।'

তাকে খবর দিয়ে নিয়ে এস শিগগির। জলজ্যান্ত মন্মথ এসে দাঁড়াল সশরীরে, শুকনো কাপড়ে। অপ্রস্তুত হল পাগলী, কিন্তু ঠাণ্ডা হল না। বিষজিহ্বা সমানই লকলক করতে লাগল।

মাও তাশ খেলেছেন।

এই পাগলীই খেলিয়েছিল। মা কিছুতেই রাজী হন না তখন মা'র পা দুখানি জড়িয়ে ধরল সুরবালা। মা রাজী হলেই তো হল না, আরো দুজন তো চাই, পাবি কোথায় ? কেন ? নলিনীকে আনছি আর আশু আছে।

মা'র ঘরের দাওয়ায় মাদুর পেতে বসেছে চারজনে। আশু আর মা এক দিকে, ও দিকে সুরবালা আর নলিনী। গ্রাবু খেলা হচ্ছে। সেই থাকতে-তুরুপের খেলা। প্রথমেই একখানা ছক্কা পেলেন মা। পাগলী রাগে ফুলতে লাগল। ক্রমে পর-পর পাঁচ বারে একখানি পাঞ্জা। রাগের চোটে হাতের তাশ ফেলে দিল পাগলী। বললে, তোমরা বুঝি খালি-খালি জিতবে ঠাকুরঝি, আর আমরা বারে-বারে হারব, না ? মা

হাসিমুখে বললেন, 'আমরা সৎপথে, সাত্ত্বিক, আমরা জিতবো না তো কি তোরা জিতবি ?'

মা গ্রামোফোন শুনছেন বালিগঞ্জে এক ভক্তের বাড়িতে। শুনে কী খুশি! বালিকার মত আনন্দ করছেন, আর বলছেন, 'কি আশ্চর্য কল করেছে মা।'

বিকেলে রাত্রের কুটনো কুটছেন মা, হঠাৎ পাগলী এসে বললে, 'তুমিই তো আফিং খাইয়ে রাধুকে বশ করে রেখেছ। আমার মেয়েকে, নাতিকে আমার কাছে পর্যন্ত যেতে দাও না।'

'নিয়ে যা না তোর মেয়েকে। ঐ তো পড়ে আছে।'

'দাঁড়াও দেখাচ্ছি।' পাগলী ছুটে বেরিয়ে গেল। বলে গেল, চেলা কাঠ নিয়ে আসছি। তোমারই একদিন কি আমারই একদিন।

ওগো কে আছ গো পাগলী আমায় মেরে ফেললে। মা চেঁচিয়ে উঠলেন।

কাঠ প্রায় মা'র মাথায় পড়ছে এমন সময় একটি ভক্ত মেয়ে এসে রুখে দিলে পাগলীকে। কাঠ ছিনিয়ে নিলে হাত থেকে। ঠেলে বাড়ির বার করে দিলে।

'পাগলী, কি করতে যাচ্ছিলি ?' মা বলে ফেললেন, 'ঐ হাত তোর খসে পড়বে।'

বলেই জিব কাটলেন। ঠাকুরের দিকে চেয়ে করজোড়ে বললেন, 'ঠাকুর এ কি করলাম! আমার মুখ দিয়ে শাপ তো কখনো বেরোয়নি। এ কি হল ? তুমি দেখো। রক্ষা কোরো।'

সামনের কুলি-বস্তিতে এক মজুর তার স্ত্রীকে মারছে। অপরাধ ? সময়মত ভাত রেঁধে রাখেনি। আর যায় কোথা! প্রথমে চড়, ঘুঁষি, শেষে এমন এক লাথি মারলে যে বউটা কোলের ছেলেসুদ্ধ ছিটকে গড়িয়ে পড়ল উঠোনে। পড়েও রেহাই নেই, আবার পদাঘাত। মা জপ করছিলেন, আর্তকণ্ঠের অসহায় কান্নায় জপ বন্ধ হয়ে গেল। উঠে দাঁড়ালেন রেলিঙ ধরে। অমন যে লজ্জাশীলা, অমন যে মৃদুকণ্ঠী, নিচে থেকে উপরে যার কথা শোনা যায় না তীব্রস্বরে তিরস্কার করে উঠলেন : 'বলি ও মিনসে, বউটাকে একেবারে মেরে ফেলবি নাকি ?'

মজুর তাকালো একবার মা'র দিকে। যেন সাপের মাথায় ধুলো পড়ল। অত যে আগুনের মত রাগ, জলের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। রাগারাগির পর চলতে লাগল সাধাসাধি।

বিকেলে রাধু ফিরেছে ইস্কুল থেকে। মা তার চুল বেঁধে দিচ্ছেন। কি খেয়াল হল রাধুর, বললে, আমি নিজেই বাঁধব। মা কেন তবু চুল বাঁধবে, তারই জন্যে চিরুনি ছিনিয়ে নিয়ে চিরুনি দিয়ে মাকে মারতে লাগল।

'সে কি ? আমাদের মাকে রাধু কেন মারবে ?' যোগেন-মা তেড়ে এল। 'আমি ওকে মারব।'

ওরে, আর যে ব্যথা সইতে পারি না। মা কাৎরে উঠলেন, 'এবার শরৎকে ডাকি।'

শরৎ মহারাজকেই যা একটু ভয় করে রাধু। তার আওয়াজ পেতেই ভালো-মানুষটির মত মাথা পেতে দিল। কুসুম তখন বেঁধে দিলে চুল।

'দেখ গো, তোমার কে-ছেলে যেন কি সব নিয়ে এসেছে !' বললে এসে সুরবালা, 'যদি কাপড় এনে থাকে, আমাকে দিও, আমি মশারির চাঁদোয়া করব।'

সত্যি সেই ভক্ত ছেলে কাপড় নিয়ে এসেছে, সংগে মিষ্টি আর ফল। ও গোলাপ, এ-সব তুলে নিয়ে রাখো। ঠাকুর উঠলে ভোগ হবে।

একখানা নয়, দুখানা কাপড়।

সুরবালা একেবারে দু হাত বাড়িয়ে দিলে। বললে, 'দাও না গো কাপড়খানা, আমি মশারির চাঁদোয়া করব।'

মা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তা কি হয় ? তা হয় না। ছেলে মনে দুঃখ পাবে।'

কী সংসারেই মা বাস করছেন, কি-সব আত্মীয়স্বজনের সমাবেশ ! ছোট মন, ছোট আকাঙ্ক্ষা, ছোট ছোট বন্ধনের সংসার। একটা কিছুকে ধরে মায়ায় অবস্থান করা ! জীবজগতের শান্তির জন্যে, উদ্ধারের জন্যে। 'জল খাব,' 'তামাক খাব' বলে ঠাকুর যেমন মনকে নামিয়ে আনতেন বস্তুভূমিতে, মা'রও তেমনি রাধু-রাধু।

'খা, খা, এ গাঁদালের ঝোল, ঠাকুর খেতেন।' রাধুকে সাধছেন মা।

'খাব না।'

'ওরে খা, ভালো জিনিস। তিনি ভালোবাসতেন, গাঁদাল, ডুমুর, কাঁচকলা।'

'খাব না বলছি।' ধমকে উঠল রাধু।

'আচ্ছা, তবে এই দুধটুকু খা।'

'না বলছি—' রাধু আবারঝামটা দিল।

রাধুর একটি ছেলে হয়েছে। চারটের সময় দুধ খাওয়াবার কথা, রাধুর জিদ সময় হবার আগেই তাকে খাওয়াতে হবে। মা বারণ করছেন। তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছে রাধু। গালাগাল শুরু করে দিয়েছে। শেষকালে বলে ফেলেছে, 'তুই মর, তোর মুখে আগুন।'

মা চুপ করে রইলেন। ধৈর্য ধরে রইলেন। কিন্তু রাধু কি থামবার মেয়ে ? আরো সব বলতে লাগল যা-তা, যা তার মুখে আসে।

রোগে ভুগে-ভুগে মা তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছেন। বললেন, 'হ্যাঁ, টের পাবি, আমি মলে তোর কি দশা হয় ! কত লাথি ঝ্যাঁটা তোর অদৃষ্টে আছে কে জানে। তবু তোর ভালোর জন্যে বলছি তুই আগে মর, তারপর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজি।'

সেবিকা মেয়ে কে কাছে ছিল তাকে বললেন উদ্দেশ করে, 'বাতাস করো মা, আমার হাড় জ্বলে গেল ওর জ্বালায়।'

আমি তো জন্মাবধি কোনো পাপ করেছি বলে মনে পড়ে না। মা বলছেন আপন মনে। ঠাকুরকে স্পর্শ করে কত লোক মায়ামুক্ত হয়ে গেল। আর আমারই এত মায়া ! আমিও তো তাঁকে ছুঁয়েছি। সেই পাঁচ বছর বয়সে ছুঁয়েছি। আমি না হয় তখন নিতান্ত অবোধ কিন্তু তিনি তো ছুঁয়েছেন ! তবে আমার কেন এত জ্বালা ? আমি তো আমার মন উঁচুতে তুলে রাখতে পারি, কিন্তু জোর করে নিচে নামিয়ে রাখি কেন ? নামিয়ে রেখে আমার এত যন্ত্রণা ?

মা'র একটি ভক্ত-মেয়ে রাধারাণীর জন্যে একজোড়া শাঁখা কিনে এনেছে। কিন্তু

রাধিকে পরাতে গিয়ে দেখে, শাঁখা ছোট হয়েছে। মোটেই হাতে উঠছে না। রাধি তো কেঁদে আকুল। গালাগাল যে দিচ্ছে না তাই ঢের। শাঁখা হাতে উঠল না তাইতে ভক্ত-মেয়েরও চোখে জল। মা ডেকে শুধোলেন, কি হয়েছে?

রাধি কেঁদে পড়ল, 'এমন সুন্দর শাঁখা এনেছেন দিদিমণি, কিন্তু হাতে উঠছে না কিছুতেই। ছোট হয়েছে।'

'তোদের যেমন কথা! বৌমা শাঁখা এনেছে, আর সে শাঁখা লাগবে না?' মা আশ্চর্য হবার ভঙ্গি করলেন, বললেন, 'শাঁখা নিয়ে আগে আমার কাছে আসতে হয়! আয় তো দেখি কেমন লাগে না!'

মা শাঁখা নিয়ে বসলেন। ধরলেন রাধুর হাত টিপে। সে স্পর্শে রাধুর হাত নম্র, দ্রব হয়ে গেল। সে স্পর্শ গভীর মমতার স্পর্শ। মায়ার স্পর্শ।

দেখতে-দেখতে রাধুর দুটি মণিবন্ধ বলয়িত হয়ে উঠল। চোখের জল নিয়েই হেসে ফেলল রাধু।

'সুন্দর শাঁখা পরেছ', মা বললেন স্নেহস্বরে, 'ঠাকুরকে প্রণাম করো, আমাকে প্রণাম করো, বৌমাকে প্রণাম করো।'

ভক্ত মেয়ে কুণ্ঠিত হয়ে বললে, 'আমি নীচু জাত, আমাকে কেন প্রণাম করবে?'

মা জিভ কাটলেন। বললেন, 'ওসব বলতে নেই। ভক্তের শুধু এক জাত। উঁচু-নিচু বলে কিছু নেই।' রাধিকে লক্ষ্য করলেন, 'যা, তোর দিদিমণিকেও প্রণাম কর।'

ঠাকুর ও মাকে প্রণাম করে রাধু দিদিমণিকে প্রণাম করলে। ফেরা-ফিরতি ভক্ত-মেয়ে রাধুকে প্রণাম করল। মা হাসতে লাগলেন। বললেন, 'প্রণামটা ফিরিয়ে দিলে?'

এদিকে এই, ওদিকে নলিনীর শুচিবাই।

মনের মধ্যে কত পাপ সঞ্চিত থাকলে তবে মন সব অশুদ্ধ দেখে। কৃষ্ণ বোসের বোনের অমনি শুচিবাই ছিল। গঙ্গায় ডুব দিচ্ছে, আর জিগগেস করছে, হ্যাঁ গা, টিকিটা ডুবল কি? বারে-বারে ডুব, বারে-বারে সংশয়, বারে-বারে জিজ্ঞাসা।

নলিনীও তর্ক করতে ছাড়ে না। বললে, 'সেদিন গোলাপ-দিদি ময়লা সাফ করে এসে শুধু কাপড় ছেড়েই ঠাকুরের ফল ছাড়াতে গেল। আমি বললুম, গঙ্গায় ডুব দিয়ে এস। শুনলে না, উলটে বললে, তোর সাধ হয় তুই যা। এ কোন ধরনের শুদ্ধতা?'

'গোলাপের কথা বলিসনে। অমন মন হতে আলাদা দেহ দরকার। ওই দেহে শুচিবাইয়ের ধার ধারতে হয় না।'

জয়রামবাটির রাঁধুনি বামনি রাত নটা-দশটার সময় এসে বললে, 'কুকুর ছুঁয়েছি, স্নান করে আসি।'

মা বললেন, 'এত রাতে স্নান কোরো না। হাত-পা ধুয়ে এসে কাপড় ছাড়ো।'

'তাতে কি হয়?' রাঁধুনি খুঁৎ-খুঁৎ করতে লাগল।

'তবে গঙ্গাজল নাও।'

তাতেও রাঁধুনির মন ওঠে না।

তখন মা বললেন, 'তবে আমাকে ছোঁও।'

নলিনীও তেমন বিশেষ ভালো ঘরে পড়েনি। শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে এসেছে, আর যাবে না কিছুতেই। একদিন রাতে সবাই ঘুমুচ্ছে, নলিনীর স্বামী গরুর গাড়ি নিয়ে উপস্থিত। কি ব্যাপার? নলিনীকে নিয়ে যাবে। নলিনী ঘরে ঢুকে দরজায় খিল চাপিয়ে দিয়েছে। বলছে, আত্মহত্যা করবে।

এই নিয়ে আবার ঝঞ্ঝাট পোয়ানো। এ দরজায় সাধাসাধি, আবার ও-দরজায় বুঝ-প্রবোধ। তোকে পাঠাব না শ্বশুরবাড়ি, কিছুতে না, এ প্রতিজ্ঞা করার পর নলিনী দরজা খুলল। তখন ভোর হয়েছে। সারা রাত সামনে লণ্ঠন জ্বালিয়ে তার দোরগোড়ায় বসে ছিলেন মা। লণ্ঠনটি এখন নেবালেন। বলতে লাগলেন, 'গঙ্গা, গীতা গায়ত্রী। ভাগবত ভক্ত ভগবান।' শেষে গুঞ্জরণ করতে লাগলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ।'

নলিনীরও মেজাজ কম নয়। সেদিন রাগ করে চারবেলা উপোস করে রইল। মা অনেক সাধ্যসাধনা করলেন, কিছুতে নরম হল না নলিনী। তখন মা বললেন, 'আমাকে তোমার পিসিমা মনে কোরো না। মনে করলে এ দেহ আমি এখুনি ছেড়ে দিতে পারি।'

রাধু আবার মল পরেছে! একটা ঘটি-বাটি জোরে ফেললে পর্যন্ত মা বিরক্ত হন, তায় এই ঝমঝম মলের আওয়াজ!

ঝাঁট দিয়ে ঝাঁটাগাছটা ছুঁড়ে একদিকে ফেলে গেল এক ভক্ত-মেয়ে। মা বললেন, 'ও কি গো, কাজটি হয়ে গেল অমনি অশ্রদ্ধা করে ছুঁড়ে ফেললে? ছুঁড়ে রাখতেও যতক্ষণ, ধীর হয়ে আস্তে রাখতেও ততক্ষণ। ছোট জিনিস বলে এত তাচ্ছিল্য? শোনো, যাকে রাখো সেই রাখে।'

ভক্ত-মেয়ে দাঁড়িয়ে রইল অপ্রস্তুত হয়ে।

'যার যা সম্মান তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও রাখতে হয় মান্য করে।'

মল-পায়ে দোতলা থেকে নামছে রাধারানী। জোরে শব্দ করতে-করতে নামছে। মা নিচে। ক্রুদ্ধ চোখে তাকালেন উপরের দিকে। সে চাউনিতে আর সকলের বুকের রক্ত শুকিয়ে যায় কিন্তু রাধি বেপরোয়া। মা তখন ধমকে উঠলেন, 'রাধি, তোর লজ্জা নেই? নিচে সব সন্নেসী ছেলেরা রয়েছে, আর তুই মল পায়ে উপরে থেকে দৌড়ে নামছিস? পায়ের মল এখুনি খুলে ফেল।'

খুলে ফেলে মলগুলি মা'র দিকে ছুঁড়ে মারল রাধু। গায়ে যে মারেনি এই রক্ষে।

সেদিন আবার পরিপাটি করে চুল বাঁধছে। ভিজে গামছার চাপ দিয়ে চুলের পাতা নামাচ্ছে।

'ও সব কি করছিস? ও করলে ভাবিস বুঝি খুব সুন্দর দেখাবে? আমি তো জীবনে চুলই বাঁধিনি। গৌরদাসী এসে কখনো-কখনো বেঁধে দিত, তাও বেশি সময় রাখতে পারতুম না, খুলে ফেলতুম।'

গোলাপ-মা বললে, 'তুমি যে মা মুক্তকেশী।'

আবার এই রাধুই মা'র বেতো পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আর মা সুর করে

তাকে শেখাচ্ছেন, 'বল, ওরে রসনা রে, পুরা বাসনা রে, রাধাগোবিন্দ গোবিন্দ বলে নে রে। জয় রাধাগোবিন্দ, শ্যামসুন্দর, মদনমোহন, বৃন্দাবনচন্দ্র—'

* সাতাশ *

ভোরবেলা উঠে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে আসেন মা—একটু দুধ দিতে পারো? হয়তো কোনো ভক্ত এসে অসুখে পড়েছে, তার জন্যে একটু দুধ চাই। কিংবা কোনো ভক্তের একটু চা না হলে চলে না, তারো তৃষ্ণাবারণ করতে হবে। কি করব বলো, শহুরে ছেলে, অভেস করে ফেলেছে, আমি মা হয়ে কি করে তার মুখখানি শুকনো দেখি? কারু যদি অসুখ হয় মা প্রাণ দিয়ে পড়েন, কে বলবে পেটে-ধরা মা নয়! একবার একজনের হাতে খোস হল, মা তাকে দিনের পর দিন নিজের হাতে খাওয়ালেন। দুপুরে যদি কেউ এসে পড়ে, না খাইয়ে তাকে ছাড়বেন না। অসময়েও যদি কেউ আসে তবে তাকে দেবেন কিছু ফল-মিষ্টি, ফল-মিষ্টি না জুটলে অন্তত দুটি পান। কী বা জিনিস, তুচ্ছের চেয়েও তুচ্ছ, কিন্তু দেওয়ার মধ্যে হৃদয়ের সুঘ্রাণটি এমন মিশে থাকবে, যে নেবে তার করপুট থেকে প্রাণপুট ভরে উঠবে অমৃতে। যখন-তখন যে-সে আসবে আর তার জন্যে তখুনি খাবার যোগাড় করো—গোলাপ-মা ঝাঁজিয়ে ওঠে মাঝে-মাঝে। মুখে একবার মা-মা বললেই হল! তা ছাড়া আবার কি! এমন মধুর ধ্বনি তুমি আর শুনেছ কোথাও? ভোরবেলা পাখির ডাক, মাঝরাতে বৃষ্টি পড়ার শব্দ, শীতের দুপুরে পাতা-ঝরার গান, পাড়ের কাছে নদীর ঢেউয়ের ছলছলানি, কোনো আওয়াজই কি এত মিষ্টি?

মা'র জন্যেও কেউ-কেউ নিয়ে আসে কিছু-কিছু। যদি খাবার জিনিস হয়, মা তা তুলে রাখেন—কখন কোন ছেলে এসে পড়ে তার ঠিক কি। কলকাতা থেকে শরৎ মহারাজ মিষ্টি পাঠান মাকে, মা তা বিলিয়ে দেন অকাতরে। কিছু সিংহ-বাহিনীর মন্দিরে, কিছু বা ধর্মঠাকুরের থানে। বাকি ভাগ আত্মীয়মহলে নয়তো কখন-কে-আসে ভক্তের জন্যে। নিজে এক কণা মুখেও ঠেকান না। করবো কি বলো! আমি যে মা। আমি শুধু দেব, নিজের জন্যে রাখব না কিছুই।

কিছুই রাখব না? তা কি হতে পারে? একটা জিনিস শুধু রেখেছি। সে সন্তানের জন্যে ব্যাকুলতা। সন্তানের জন্যে শুভাকাঙ্ক্ষা।

কাজ আছে, আমি একটু পাশের গাঁয়ে যাচ্ছি, মা। ফিরবে কখন? এই এলুম বলে। ফিরতে-ফিরতে ছেলের সেই বিকেল। এসে দেখে, মা-ও সারাদিন খাননি, পথ চেয়ে বসে আছেন। তোমার রোগা শরীর, আমি কোন-না কোন বিদেশ-বিভুঁয়ের ছেলে, তুমি আমার জন্যে উপোস করে বসে থাকবে? মা আর ছেলের মধ্যে বিদেশ-বিভুঁই নেই বাছা, শুধু আঁতের টান।

বসন্ত হয়েছিল মা'র, এখন সেরে উঠেছেন। অন্নপথ্য হয়নি, কিন্তু বড় ইচ্ছে লুকিয়ে একটু ডাঁটা-চচ্চড়ি খান। একটি ভক্ত-ছেলেকে বললেন তা চুপি-চুপি। দেখো কেউ যেন টের না পায়। ভয় নেই, রাঁধুনি বামুনের থেকে আনছি আমি

লুকিয়ে। শালপাতায় করে চচ্চড়ি আনলে ভক্ত! দু-একটি ডাঁটা শুধু মুখে দিয়েছেন, এমন সময় গোলাপ-মা উপস্থিত। ও কি হচ্ছে, মুখ নড়ছে কেন? দুটো ডাঁটা চিবুচ্ছি। কে এনে দিলে? ভক্ত কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, চিনতে দেরি হল না। ওমা, ও এনে দিলে? ও তো শুদ্দুর, আর এ তো ভাতে-ছোঁয়া জিনিস, তুমি শুদ্দুরের হাতে খাচ্ছ? মা রোগনাশন হাসি হাসলেন। বললেন, 'ছেলে কি কখনো শুদ্দুর হয়?'

'আচ্ছা মা, আপনি মঠের সন্ন্যাসীদের তাঁদের সন্ন্যাস-নাম ধরে ডাকেন না কেন?' মাকে একদিন জিগ্গেস করল এক সন্ন্যাসী ছেলে।

মা বললেন, 'আমি মা কিনা, ছেলের সন্ন্যাস-নাম ধরে ডাকতে আমার প্রাণে লাগে।'

কখন রওনা হয়েছ? কোথায় খেয়েছ রাস্তায়? কী খেয়েছ? চেনা-অচেনা যে ছেলেই আসে জয়রামবাটিতে, মা খোঁজ নেন। রাস্তায় কোনো কষ্ট হয়নি তো? এখানে আসতে বড় কষ্ট, তবু তুমি ছেলেমানুষ, একা-একা এসেছ এতদূর। আর কী কাঠফাটা রোদ, মাঠের দিকে তাকানো যায় না, চোখ ঝিম-ঝিম করে।

কামারপুকুর দেখে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল ভক্ত, মনের মধ্যে একটা কান্না উঠে গেল, মাকে একবার দেখে আসি। হোক দুঃসহ রোদ, চলো জয়রামবাটি। খাড়া রোদের মধ্যে ধু-ধু মাঠ ভেঙে ছুটে আসছে ভক্ত, কতক্ষণে মিলবে মা'র আতপবারণ স্নেহাঞ্চল। পৌঁছুনো মাত্র ওখানকার ভক্তেরা অনুযোগ দিলে, এত রোদে কখনো আসতে হয়? মাকে কী ভীষণ কষ্ট দিলে বলো দেখি। তুমি রোদে-রোদে আসছ আর মা বলছেন, রোদের তাপে জ্বলে যাচ্ছি!

বরং গয়া-কাশী সহজ, ক্লেশকর তীর্থ হচ্ছে জয়রামবাটি। টিকিট কেটে ট্রেনে চড়ো, সোজা গিয়ে হাজির হও দরবারে। কিন্তু এখানে? ট্রেনে উঠেও শান্তি নেই। গরুর গাড়ি, নৌকো, আবার পায়ে হাঁটো। হাজার রকম হ্যাঙ্গামা। কিন্তু, যাই বলো, মা'র জন্যে ছেলে পথে-পথে ঘুরে বেড়াবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না জয়রামবাটিতে গিয়ে ওঠে। মা ফেলে ছেলে স্বর্গেও যেতে চায় না।

যখনই কেউ বিদায় নেয়, সে ক্ষণটি মা'র কাছে একটি পরম বেদনার বিন্দু হয়ে দেখা দেয়। কতটা পথ এগিয়ে দিয়ে যান, স্নেহভারাতুর চোখ দুটি জলে ছলছল করে ওঠে। যতক্ষণ না চোখের আড়াল হয়ে মুছে যায় একান্তে চোখ ফিরিয়ে নেন না। বৃষ্টি হলেও বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকেন। অশ্রুমতী প্রকৃতির মত। স্নেহচ্ছায়া-নিবিড় সিক্ত দৃষ্টিটি প্রসারিত করে।

তারপরে কত জনের কত রকম আবদার, কত রকম বেয়াড়াপনা। কত রকমের বিরক্তিকর ব্যবহার। সব অম্লানমুখে সয়ে যান। মন্ত্র দাও, প্রসাদ দাও, পুজো করব তোমাকে, তোমার পা ছোঁব, মাথা ঠুকে তোমার পায়ে ব্যথা করে দেব, ধুলো-কাদা মেখে এসেছি, ত্রাণ করো।

অসুখের সময় অনুপায় হয়ে শুয়ে আছেন মা, কোত্থেকে এক সাধু এসে ঢুকে পড়ল। ঢুকেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম। ভালো লাগেনি মা'র। সাধুকে কিছু বললেন না, তার চলে যাবার পর বললেন সেবিকা মেয়েদের, 'আমার মাথায় কাপড় দেওয়া নেই, কাপড়টা দিয়ে দাওনি কেন? আমি কি মরে গেছি?'

একজন ভক্ত এসে মাকে ধরলে। 'এত তো জপ-তপ করলুম, কিছুই তো হল না।'

যেন মা'র অপরাধ! বললেন, 'বাবা, একি শাক-মাছ যে দাম দিয়ে কিনলুম? মনের ময়লা কাটাও। চন্দন ঘষে-ঘষে গন্ধ বার করো। ও কি দু-চার দিনে হয়? ঠাকুরের কৃপার জন্যে প্রার্থনা করো।'

সেদিন বুড়ো-মতন কে একজন এসেছে, বলছে, মন্ত্র চাই। রামকৃষ্ণ নামে একজন মস্ত সাধু ছিলেন, তাঁকে দেখিনি, কিন্তু শুনেছি তাঁর স্ত্রীও নাকি কিছু শক্তি পেয়েছেন তাঁর থেকে। তাই তাঁর স্ত্রীর থেকে মন্ত্র নিতে এসেছি।

ঠাকুর শুধু সাধু কি গো? তিনি যে ঠাকুর।

তা যখন দেখিনি, তখন কি করে বলব! যাঁকে দেখছি চোখের সামনে তাঁকে ধরাই বুদ্ধিমানের কাজ।

'ও যোগেন, এ যে ঠাকুরকে মানে না,' মা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, 'কি করি বলো তো?'

'মন্ত্র দাও। ও জানে না তোমার মন্ত্রের ফল কি।' বললে যোগেন-মা।

পাথরও তো মাটিই। কি মন্ত্র পায়, তার গুণে মাটিও পাথর হয়, সাধনায় দৃঢ়ীভূত হয়। মন্ত্র দিলেন মা। মন্ত্রের গুণে সমস্ত জীবনে একটি স্তব গুঞ্জরিত হয়ে উঠল। মঙ্গলকথান্বিত প্রণামপ্রসন্ন স্তব। ধীরে-ধীরে চিনতে পারল রামকৃষ্ণকে। সর্বসংশয়নির্মোক্তাকে। ছিল শুকনো কাঠ, হয়ে দাঁড়াল ফলপুষ্পব্যাপ্ত শাখা।

কী হয় ঈশ্বরকে পেলে? বললেন একদিন মা। দুটো শিঙ বেরোয়, না, ল্যাজ গজায়? মনটা ফুলের মত হয়ে যায়, শিশুর মত হয়ে যায়, জ্যোৎস্নার মত হয়ে যায়। আর মন পবিত্র হয়ে গেলেই তাতে আলো জ্বলে। জ্ঞানের আলো। সেই আলোতেই বিশ্বরূপদর্শন।

অন্নের মত মন্ত্র বিতরণ করছেন মা। সেই মন্ত্রই উপবাসী জীবনের পরমান্ন। জীবজীবনের বধির দেয়ালে কি করে একটি ফোকর ফোটাবেন, যা দিয়ে দেখা যাবে নবপ্রভাতের সূর্যোদয়, পাওয়া যাবে মুক্তিমলয়ের তৃপ্তিস্পর্শ।

যত্র-তত্র মন্ত্র দিয়েছেন। বারান্দায়, ছাঁচতলায়। স্বদেশী আন্দোলনে লিপ্ত থেকে পুলিশের নজরে পড়েছে, তাই সে মা'র বাড়িতে ঢুকতে নারাজ, অথচ তার মন্ত্র চাই এখুনি। সেই বন্দেমাতরং মন্ত্র। যা জননী জন্মভূমি তাই দশপ্রহরণ-ধারিণী রিপুদলবারিণী দুর্গা। মা মাঠে এসেছেন ছেলের সঙ্গে, আসন কোথায়, খড় পেতে বসেছেন দুজনে। মৃত্যুতারণ মন্ত্র দিলেন ছেলেকে। একবার একজনকে মন্ত্র দিলেন বৃষ্টির মধ্যে রেল-কম্পাউণ্ডে—দুজনের মাথার উপর ছাতা ধরা। পাপপাবন জল কোথায়? গোষ্পদে যে জল জমে আছে তাই আঙুলে করে তুলে নিলেন মা। মা'র ছোঁয়া-লাগা সেই জল জহ্নুনন্দিনির মত কাজ করবে।

কিন্তু যাই মন্ত্র দিই, আমার এই মন্ত্রটি নিও, ঠাকুরই সব। প্রধান-পুরুষেশ্বর। সবই তাঁর, সবই তিনি।

তিনিই যদি সব, তবে আপনি কি? জিগগেস করলে একজন। মা বললেন, 'আমি কিছুই না, ঠাকুরই গুরু, ঠাকুরই ইষ্ট।'

'কেমন আছ ?' প্রণাম করছে একজন ভক্ত, তাকে জিগ্‌গেস করলেন মা।

'আপনার আশীর্বাদে ভালোই আছি।'

'তোমাদের ওই বড় দোষ। সব কথায় আমাকে টানো কেন ? ঠাকুরের নাম বলতে পারো না ? যা কিছু দেখছ সব ঠাকুরের।'

কিন্তু যাই বলো, কান্নার মত মন্ত্র কি ! ভালোবাসার মত দীক্ষা কি।

মাঝি-বউ অনেকদিন আসে না এদিকে। কি হলো তার কে জানে। সেদিন মজুরনী সেজে এসেছে মাথায় মোট নিয়ে। চুল রুক্ষ, মুখখানি বড় শুকনো। মাকে প্রণাম করল বিমনার মত। মা জিগ্‌গেস করলেন, কি হয়েছে রে ? মাগো, আমার সেই রোজগারী জোয়ান ছেলেটা মারা গেছে।

বলিস কি ? মা কেঁদে উঠলেন। যে বোবা কান্না গুমরে উঠছিল মাঝি-বউয়ের বুকের মধ্যে তাকে মা মুক্তি দিলেন। তার সমস্ত শোক টেনে নিলেন নিজের মধ্যে। বারান্দার খুঁটিতে মাথা রেখে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগলেন। কি হল, কি হল, লোকজন ছুটে এল চারদিক থেকে। চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে। মাঝি-বউও যেন স্তম্ভিত। সংসারে পুত্রহারা জননীর শোক যেন মা'র অজানা নয়, মর্মের অন্তস্থল থেকে উঠেছে সেই বেদনার উৎসার।

যেন মা'রই ছেলে নেই। যেন মাঝি-বউয়েরই এবার সান্ত্বনা দেবার পালা। মা, কেন কাঁদছ ? কার ছেলে ? যিনি দিয়েছিলেন তিনিই নিয়ে গেছেন। সংসারে সবই তাঁর। আমার-তোমার বলে কেউ নেই।

অক্ষয় সেন সবজি পাঠিয়েছে একটি কুলি-মেয়ের হাত দিয়ে। সন্ধে হয়ে গেছে, এখন কোথায় আর যাবে, মা'র বাড়িতেই থাকো। ম্যালেরিয়ার রুগী, মাঝ রাতে প্রবল জ্বর, সঙ্গে বমি। মা ঠিক টের পেয়েছেন। নিজে গিয়ে সমস্ত বমি পরিষ্কার করে দিলেন, জল দিয়ে ধুয়ে দিলেন আগাগোড়া। এ কাজ করবার লোক ছিল বাড়িতে, সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলেই হত, কিন্তু যে-ই মুক্ত করতে আসবে, মেয়েটাকে নির্ঘাত বকে নেবে একদফা। সেই বকুনি থেকে রেহাই দিলেন মেয়েটাকে।

নবদ্বীপ যাবে বলে কামারপুকুরে এসেছে একটি মেয়ে। নাম হরিদাসী। কি ভাব হল, আর গেল না নবদ্বীপ। শুধু মুঠো-মুঠো ঠাকুরের জন্মস্থানের ধুলো কুড়োতে লাগল। বললে, 'এই তো নবদ্বীপ। গৌরাঙ্গ তো এইখানেই এসেছিলেন। আবার কি করতে যাব ও-পাড়া ?'

তারপরে তুমি আছ। ধারাবারিসমা করুণা। শিবভাবিতা অনন্তমায়া।

একটি স্ত্রী-ভক্ত এসেছে, সঙ্গে একটি পরের ছেলে। এটি আবার কেন ? স্ত্রী-ভক্ত বললে, এটিকে মানুষ করব। বড় মন পড়েছে।

'অমন কাজও কোরো না।' মা বারণ করে উঠলেন : 'এই দেখ না রাধুকে নিয়ে আমার কী দশা ! যার উপর যেমন কর্তব্য তেমনি করে যাবে হাসি-মুখে। ভালো এক ভগবান ছাড়া আর কাউকে বেসো না। ভালোবাসলেই অনেক দুঃখ।'

বিষ্ণুপুর থেকে গরুর গাড়িতে করে আসছেন মা। সঙ্গে রাধু। কোতুলপুরে নামবেন। কাছাকাছি আসতেই রাধু পা দিয়ে মাকে ঠেলতে লাগল। বললে, 'সর্, সর্ বলছি, তুই গাড়ি থেকে নেমে যা।'

গাড়ির পিছন দিকে সরে যেতে-যেতে মা বললেন, 'আমি যদি যাব তবে তোকে নিয়ে তপস্যা করবে কে ?'

একবার তো সরাসরি মাকে লাথিই মেরে ফেলল।

'করলি কি, করলি কি রাধু ?' বলে নিজের পায়ের ধুলো মা রাধুর মাথায় বারে-বারে ঠেকাতে লাগলেন।

সেই রাধুর ছেলে হয়েছে। কোয়ালপাড়ার মত বুনো জায়গায় হয়েছে বলে মা তার নাম রেখেছেন বনবিহারী। রোজ সকালে যখন সেই ছেলের ঘুম ভাঙান মা, গান ধরেন : 'উঠ লালজি, ভোর ভায়, সুর-নর-মুনি-হিতকারী। স্নান করে দান দেহি গো-গজ-কনক-সুপারি। জানো, এ কৌশল্যার গান। এই গান গেয়ে ঘুম ভাঙাতেন রামচন্দ্রের।'

* আটাশ *

আমাকে ঠাকুর রেখে গিয়েছেন। কেন তা বলতে পারো ? তিনি চলে যাবার পরেও চৌত্রিশ বছর বেঁচেছি।

কেন তা তোমাকে বলি। ঈশ্বরের মধ্যে একটি মাতৃরূপ আছে। সেইটিই জগতের সামনে প্রকাশ করে দেখাতে।

রাত্রে এসেছে নিবেদিতা। মা'র জন্যে যে কি করবে ভেবে পায় না। মা'র চোখে আলো পড়ছে, একখানি কাগজ দিয়ে ঘরের আলোটি আড়াল করে দিলে। প্রণাম করলে পায়ে হাত দিয়ে। যেন পায়ে হাত দিতেও তার কত কুণ্ঠা। রুমালে করে সন্তর্পণে কুড়িয়ে নিল পায়ের ধুলো।

সরস্বতী পুজোর দিন খালি পায়ে ঘুরে বেড়াল। কপালে হোমের ফোঁটা। সে কি গৌরগৌরব মূর্তি ! আগুন কি লাল ? লাল তার বাইরের রঙ। তার ভেতরের রঙ শাদা। নিবেদিতা যেন সেই শ্বেতবহ্নি।

খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আছে নিবেদিতা। আকাশে ঝড় উঠেছে। কালির মত কালো করে এসেছে অন্ধকার। ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ফেটে পড়ছে বজ্র। চুল উড়ছে, স্পন্দনহীনের মত দাঁড়িয়ে আছে নিবেদিতা। যুগ্মকর বুকের কাছে যুক্ত করা। জপ করছে অস্ফুটস্বরে : কালী, কালী, কালী।

মা নিবেদিতার জন্যে ছোট একটি উলের পাখা করেছেন। 'তোমার জন্যে আমি এটি করেছি।' হাত বাড়িয়ে নিল সেটি নিবেদিতা।

সেটি নিয়ে কি যে করবে ভেবে পায় না। একবার মাথায় রাখে, একবার বুকে ঠেকায়, একবার মুখের কাছে বাতাস খায়, মৃদু-মৃদু। আর থেকে-থেকে বলে ওঠে, কি সুন্দর, কি চমৎকার। যত লোক আসে, সবাইকে দেখায় আনন্দ করে, 'কি সুন্দর' মা করেছেন দেখ।' পরে কথার সুরে একটু গর্ব মেশায় : 'আর, আমাকে দিয়েছেন !'

সামান্য জিনিস নিয়ে অসামান্য খুশি—এই না হলে ভক্তি।

'কি একটা সামান্য জিনিস পেয়ে ওর আহ্লাদ দেখেছ ! আহা কি সরল বিশ্বাস। যেন সাক্ষাৎ দেবী।'

সেই দেবীমূর্তির বৈভব মা'র রূপেও প্রস্ফুট ছিল। যতদিন পর্যন্ত রাধুকে আঁকড়াননি ততদিন। ঠাকুর অপ্রকট হবার পর যখন প্রেমানন্দের মা প্রথম দেখল মাকে, উল্লাস করে উঠল, বললে, 'মা, এত রূপ এত লাবণ্য তুমি কোথা পেলে ?'

যখনই রাধু এল মায়া এসে ছায়া ফেললে। সেই ছায়ায় রূপ মলিন হয়ে গেল। আগে তপস্যায় দেবী ছিলেন। সর্বসৌন্দর্যনিলয়া সর্বেশ্বরী। এখন মায়ায় মা হয়েছেন। দীনবৎসলা করুণাবরুণালয়া।

কাশীতে যেবার গিয়েছিলেন, কটি স্ত্রীলোক এসেছে মাকে দেখতে। মা আর গোলাপ-মা কাছাকাছি ব'সে, কোন জন যে দর্শনীয় বুঝে উঠতে পারছে না। গোলাপ-মা'রই বেশ ভারিক্কি চেহারা, সবাই ভাবলে এই বুঝি মা-ঠাকরুণ। গোলাপ-মাকে প্রণাম করতে এগুলো সকলে। পোড়া কপাল ! কাকে ধরতে এসে কাকে ধরছে ! ওগো ঐ যে, উনিই মা-ঠাকরুন। দেখিয়ে দিল আঙুল দিয়ে। মাও অমনি দুষ্টুমি করে বললেন, না গো না, তোমরা ঠিকই ধরেছিলে, উনিই মা-ঠাকরুন। মেয়েরা দোটানায় পড়ল। শেষে সাহস করে সাব্যস্ত করলে গোলাপ-মাই আসল মা—বেশ মোটা-সোটা বুড়ো-সুড়ো যখন দেখতে। শেষ পর্যন্ত যখন তার দিকেই এগুচ্ছে, গোলাপ-মা ধমক দিয়ে উঠল, 'তোমাদের কি কারুই বুদ্ধি-বিবেচনা নেই ? ওদিকে তাকিয়ে দেখছ না, ও কি মানুষের মুখ, না, দেবতার মুখ ?'

সবাই তাকাল একদৃষ্টে। সত্যি, আরতির আলোকে প্রতিমার মুখের মত দেখল এবার মা'র মুখ, দেখল হৃদয়ের নির্জনে-জ্বালানো ভক্তির আলোতে। দেখল দেবতার মুখ।

বুড়ো হবেন এ ঠাকুরের একেবারে মনঃপূত ছিল না। বলতেন, 'লোকে ঐ যে বলবে রানি রাসমণির কালীবাড়িতে একটা বুড়ো সাধু থাকে, সে কথা আমি সইতে পারবোনি।'

সারদা বললে, 'ও কথা কি বলতে আছে ? বুড়ো হয়ে থাকলেও লোকে বলবে, রাসমণির কালীবাড়িতে কেমন একজন পিরবীণ সাধু থাকেন।'

'হ্যাঁ,' পরিহাস করলেন ঠাকুর : 'লোকে তোমার অত পিরবীণ-ফিরবীণ বলতে যাচ্ছে আর কি। চণ্ডীদাসের গল্প জানো না ?'

বলে গল্প শুরু করলেন : চণ্ডীদাস লেখাপড়া কিছু করত না। ছেলেবেলায় বড় মুখখু ছিল। বাপ একদিন রেগে-মেগে মাকে বললে, চণ্ডেটাকে আর ভাত দিও না। চাট্টি-চাট্টি ছাই দিও।

চণ্ডীদাস খেতে বসেছে, পাতের একধারে ছাই। মাকে জিগ্‌গেস করলে, একি ? মা বললে, তুমি কিছু পড়-টড় না, তোমার বাবা তোমাকে ছাই খেতে দিতে বলেছেন। আমি মা, শুধু ছাই দিই কি করে, তাই কটি ভাতও দিয়েছি।

অভিমান করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল চণ্ডীদাস। মনের দুঃখে মা-বাশুলীকে ডাকতে লাগল। বাশুলী দেখা দিলেন। বললেন, মুর্খতা ঘুচে যাবে। গান গাইতে পারবে। চমৎকার গান গায় চণ্ডীদাস। যে ঘাটে মেয়েরা চান করে তার কাছে বসে

মিষ্টি গলায় গান গায়। যে শোনে সেই অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। শুধু নিন্দুকের দল বলে চণ্ডীদাস বকে গিয়েছে। রাজার কানে কথা উঠল। চণ্ডীদাসের গানের কথা। সমাদর করে রাজা তাকে রাজবাড়িতে নিয়ে এলেন। তার দুঃখের রাত ভোর হল। নামযশ হল, অপবাদের লেশও রইল না। কিন্তু দুঃখের মধ্যে, বেশি দিন বেঁচে অবশেষে বুড়ো হয়ে গেল। তার মধুর ভাব, মেয়েদেরও বিস্তর আনাগোনা। মেয়েরা আসে কিন্তু বুড়োকে বাপ বলে। তাতে চণ্ডীদাস বড় বেজার। বলছে খেদ করে :

বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে, এ বড় বিষম তাপ,
যুবতী আসিয়ে শিয়রে বসিয়ে আমারে কহিবে বাপ।

'তা আমি বুড়ো-নাম সহ্য করতে পারবোনি বাপু।'

গল্প শুনে সকলের হাসি।

যত ভার আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে দিব্যি চলে গেলেন। সাতষট্টি বছর বাঁচলুম। নিলুম জরা, নিলুম ব্যাধি, সংসারজ্বালায় কালো হয়ে গেলুম। সকলের বিষ নিয়ে-নিয়ে আমার এ জীর্ণদশা। কি করব, আমি যে ব্যথানাশিনী বিশল্যকরণী। আমি যে নিস্তার-দাত্রী।

মাকুর যে ছেলেটি মারা যায় ডিপথিরিয়ায় তার নাম ছিল নেড়া। সংসারীদের ছেলেমেয়ে মরলে কি কষ্ট তাও আমাকে বুঝতে হবে!

যেহেতু মাকুর পিসি সেই সুবাদে নেড়াও পিসি ডাকে। শুধু তাই নয়, ও ছোট ছেলের কি ভাব, সীতা বলে। দাঁত পড়ে গিয়েছে মা'র, সিঁড়িতে বসে পা দুলিয়ে-দুলিয়ে বললে, 'পিসিমা, আমার দাঁত দুটি নাও।'

নিবেদিতাও চলে গেল। তুই বিদেশিনী মেয়ে, তুই আবার কেন কাঁদতে এলি? কেন এত ভালোবাসলি আমাকে? গির্জেয় গিয়ে যীশু-মাতা মেরীকে না দেখে তুই আমায় কেন দেখতে গেলি? আমি তোর কে?

নিবেদিতার জন্যে আক্ষেপ করে মা বলছেন : 'যে হয় সুপ্রাণী, তার জন্যে কাঁদে মহাপ্রাণী।'

যে ভালো লোক হয় তার জন্যে অন্তরাত্মা কাঁদে। আর, ভালো লোক কে? যে ভালোবাসে।

'স্বামী বলো, পুত্র বলো, দেহ বলো, সব মায়া।' বলছেন মা ভক্তদের : 'এই সব মায়ার বন্ধন। কাটাতে না পারলে ত্রাণ নেই। কিসের দেহ মা, দেড় সের ছাই বই তো নয়—তার আবার গরব কিসের! যত বড় দেহখানিই হোক না, পুড়লে ঐ দেড় সের ছাই! তাকে আবার ভালোবাসা!'

দেহের মধ্যে যিনি দেহী আছেন তাঁকে ভালোবাসো।

বলছেন আবার জের টেনে, 'দেহী সব শরীর জুড়ে রয়েছেন। যদি হাঁটু থেকে মন তুলে নিই তা হলে আর হাঁটুতে ব্যথা নেই।'

নিজের হাতে ফুলের মালা গেঁথেছেন। ঠাকুরের ছবিতে পরিয়ে দেবেন। কাপড় কেচে এসে বসলেন বিকেলের ভোগ দিতে। কে এক ব্রহ্মচারী ছেলে রসগোল্লা এনে রেখে গেছে। তার রস গড়িয়ে লেগেছে ফুলের মালায়। ফলে, পিঁপড়ে ধরেছে।

এ কি করেছ ? মা বলে উঠলেন, ঠাকুরকে যে পিঁপড়েয় কামড়াবে। ফুল থেকে পিঁপড়ে ছাড়াতে লাগলেন। নিষ্কীট করে পরিয়ে দিলেন ফুলের মালা। স্বামীকে সাজাচ্ছেন তাই দেখে সুরবালা মুখ টিপে-টিপে হাসতে লাগল।

দু গাছি গড়ে মালা পাঠিয়েছে কে এক সন্ন্যাসী। পুজোর সময় পরিয়ে দিলেন ঠাকুরের গলায়। পরে সেই সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'অত ভারী মালা দিও না ঠাকুরকে, বড্ড লাগবে।'

ঠাকুর কি পট, ছায়া, শূন্য ? ঠাকুর স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, পরিপূর্ণ। সর্বদ্রব্যে মহাদেব। জ্বলজ্বল করছেন চোখের সামনে। চলছেন ফিরছেন খাচ্ছেন ঘুমোচ্ছেন।

তাঁর ছবি দেখ। দেখ তাঁর এই বিশ্বপ্রকৃতি।

ছেলেরা পালা করে ঠাকুরের সেবা করছে কাশীপুরে। গোলাপ এক ফাঁকে ধ্যানে বসেছে। গিরিশ ঘোষ দেখে বলছে, কার ধ্যান করছিস রে চোখ বুজে ? যার ধ্যান করছিস তিনি রোগশয্যায় কষ্ট পাচ্ছেন। ওঠ তাঁর পা টিপে দে গে।

চোখ বুজে যাকে দেখতে চাইছ তাকে যে চোখ মেলেই দেখা যায় অনায়াসে। তাকে তোমার ঘরের চারদিকে দেখ, দেখ তোমার পৃথিবীর দশ দিকে। ছবিতে-ছবিতে ভুবনের হাটে আনন্দমেলা বসিয়ে দাও।

ঠাকুরকে ভোগ দেবার সময় হয়েছে। চুপি-চুপি মা ঢুকলেন ঠাকুর-ঘরে। লাজ-মুখী বধূটির মত বলছেন ঠাকুরের ছবিকে উদ্দেশ করে, এস খেতে এস।

গোপালের বিগ্রহ আছে পাশটিতে। তাকেও বলছেন বাৎসল্যবিহ্বল কণ্ঠে, এস খেতে এস।

কে একটি ভক্ত-মেয়ে দেখছিল এই অন্তরঙ্গ দৃশ্যটি। তার উপরে চোখ পড়তেই মা বলে উঠলেন : 'সকলকে খেতে ডেকে নিয়ে যাচ্ছি।'

ভক্ত-মেয়েটি অনুভব করল মা এমনি ভাব করছেন যেন ঠাকুররা চলেছেন তাঁর পিছনে।

কোয়ালপাড়াতে এসে মা জ্বরে ভুগছেন। সেদিন জ্বর নেই, দুর্বল শরীরে বসে আছেন বারান্দায়। পাশে বসে নলিনী কি সেলাই করছে। বাইরে প্রচণ্ড রোদ, মাঠ-ঘাট খাঁ-খাঁ করছে। হঠাৎ মা দেখতে পেলেন, সদর দরজা দিয়ে ঠাকুর ঢুকে পড়েছেন বাড়িতে। দিব্যি এসে বসলেন বারান্দায়। শুধু তাই নয়, ঠাণ্ডা পেয়ে শুয়ে পড়লেন।

মা তাড়াতাড়ি নিজের আঁচল পেতে দিতে গেলেন। 'ঠাকুর' এই কথাটি বলতে-না-বলতেই টলে পড়লেন মাটিতে। কেদারের মা, আরো লোকজন সব ছুটে এল। চোখে-মাথায় জল দিতে লাগল। সুস্থ হলে পরে নলিনী জিগগেস করলে, 'অমন হল কেন, পিসিমা ?'

মা চেপে গেলেন। বললেন, 'ও কিছু না, ছুঁচে সুতো দিতে গিয়ে মাথাটা কেমন ঘুরে গেল।'

মনের মধ্যেই কেঁদে মরি। আমার হৃদয়ের ঘট ভগবদ্রসে ভরা হয়ে আছে। বাইরে বড় রোদ। এসো আমার হৃদয়কুঞ্জের শ্যামচ্ছায়ায়। তুমি আমাকে সরস করেছ নিজে তুমি স্নিগ্ধ হবে বলে। আমার মানসাঞ্চলে শোও, নাও আমার শ্রদ্ধাপূত সেবা, আমার সত্যপূত বাক্য আমার উন্মেষ-নিমেষশূন্য তন্ময়তা।

আমার পূজার ঘরটিতে এস। জ্ঞানদীপ জ্বেলেছি সেখানে, সত্যধূপের সুগন্ধ উঠেছে। ভক্তিই সেখানে গঙ্গাবারি, সেবাকর্মই পুষ্প। আর বিল্বপত্র প্রেম, অনুরাগই চন্দন। অর্ঘ্য হচ্ছে মন, নৈবেদ্য শরীর। হে সুহৃদন্তরাত্মা, নাও আমার অন্তরের অমিয়।

'হাতখানি দাও তো মা, ধরে উঠি।' কলঘরে যাবেন, রোগশয্যা থেকে হাত বাড়ালেন মা। বললেন, 'প্রায়ই আজকাল জ্বর হয়। শরীরে আর জোর নেই।'

একটি মেয়ে এসে মা'র হাত ধরল। কষ্টে উঠলেন বিছানা থেকে। এগিয়ে দোরগোড়া পর্যন্ত এসেছেন, সহসা খুশি হয়ে বলে উঠলেন, 'এই দেখেছ গো, দোরগোড়ায় কে একগাছি লাঠি রেখে গেছে।'

বহুদিন থেকেই বলেছিলেন, আপন মনে, একটা লাঠি পাই তো ভর দিয়ে একটু হাঁটতে চলতে পারি। কাঁহাতক আর পরের উপরে ভর দিয়ে দাঁড়াব। পা দুখানি তো নিয়েছ, এখন একখানি লাঠি না যোগাতে পারো কিসের তুমি ক্লেশহারী জনার্দন!

ঠাকুর ঠিক যুগিয়ে দিয়েছেন লাঠি। কে ফেলে গেছে গো লাঠি, কখন ফেলে গেল? কার লাঠি এটি? কেউ জানে না। যেন নিজের থেকে চলে এসেছে হাঁটতে-হাঁটতে। নিজেই বা কি কম হেঁটেছি? যখন পা ছিল জয়রামবাটি থেকে দক্ষিণেশ্বর হেঁটে এসেছি। হেঁটে-হেঁটে কত কাশী-বৃন্দাবন দর্শন করেছি। এখন ধরে-ধরে নিতে হয়। দু-হাত যেতে পালকি লাগে। তাই বলি শরীরে শক্তি থাকতে-থাকতে করে নাও সাধন-ভজন। শেষে একদিন দেখবে চোখ মেলে, সবই ঠিক আছে, শুধু তোমারই আর সময় নেই।

ঠাকুরের ছবি একখানি নিজের কাছে রাখবে সব সময়। তাঁর সঙ্গে কথা কইবে। যা কিছু খাবে তাঁকে আগে নিবেদন কবে খাবে। দেহের রক্ত শুদ্ধ হয়ে যাবে।

জয়রামবাটিতে যাচ্ছেন একবার, পথের পাশে রান্না হচ্ছে জ্বালানি কাঠ কুড়িয়ে। মাটির হাঁড়িতে ভাত চেপেছে। নামাতে গিয়ে পড়ে গেল হাঁড়ি, ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। ভাতের থুপ পড়ল মাটির উপর। নিজেরা কি খাবে সেটা ভাবনার কথা নয়। ভাবনার কথা ঠাকুরকে কী ভোগ দেবে! আর-আর মেয়েরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তাতে কি? মা সকলকে নিশ্চিন্ত করলেন। এই ভাতই দিব্যি খাবেন আজ ঠাকুর—যেদিন যেমন জুটবে তেমনি। উপর-উপর পরিষ্কার ভাত তুলে নিলেন মা, সরল স্বচ্ছন্দ মনে ঠাকুরকে নিবেদন করে দিলেন। 'যেমন মেপেছ তেমনি খাবে আজ। নাও, বোসো।'

ঠাকুর যেন ঘরের মানুষ। আত্মভোলা আশুতোষ। একেবারে সহজ-সুলভ শিব। সামান্য মাটিতে শিবের পুজো। একটু গঙ্গাজল আর কটি বেলপাতা। শঙ্খ-ঘণ্টাও লাগে না, সামান্য একটু গালবাদ্য।

আর তুমি? তুমি 'অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।' তুমি সহজের সহযায়ী।

ঠাকুর যেমন তাঁর ছেলেদের ভালোবাসতেন তেমনি করে তুমি কি বাসো আমাদের? তাঁর সে কী ব্যাকুলতা ছিল, তোমার কি তেমনি আছে?

'তা আর হবে না?' মা বললেন, 'ঠাকুর নিয়েছেন সব বাছা-বাছা ছেলে কটি।

তাও, এখানে টিপে, ওখানে খোঁচা মেরে। আর আমার কাছে ঠেলে দিয়েছেন একেবারে পিঁপড়ের সার।'

যত অধম আতুর অনাথ অবল। আমার তো ব্যাকুলতা নয় আমার সহিষ্ণুতা। আমি আবার ডাকব কাকে? সবাই যে আমার অঞ্চলছায়ায় বসে আছে। কার জন্যে অস্থির হব? সবাই যে রয়েছে আমার গণনার মধ্যে।

একটি দুঃখী ছেলে বারান্দায় এসে বসেছে।

'ঘরে এসে বোসো।'

'না মা, বারান্দাতেই বসি। আমি হীনজাত।'

'কে বলেছে হীনজাত? আমার ছেলে কখনো হীনজাত হতে পারে? এসো, ঘরে এসো।'

* উনত্রিশ *

হরীশের বউ হরীশকে ওষুধ করেছে। হরীশ ত্যাগের পথে যাবে এ তার স্ত্রীর মনঃপূত নয়। ওষুধের ফল হল এই, হরীশ পাগল হয়ে গেল।

তার জন্যে তার উপরে মা'র অপার করুণা। সৌভাগ্যামৃতবর্ষী দুটি চোখে মুছে নিতে চান তার সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত কালিমা।

তার অনেক পাগলামি সহ্য করেন মা। কখনো কখনো পাগল মাকে প্রকৃতি-রূপে সম্বোধন করে। বলে, প্রসাদ রেখে গেলাম তোমার জন্যে। ভুক্তাবশিষ্ট ফেলে রাখে খাবার থালায়। তার এই প্রচণ্ড অশিষ্টতাও মা গায়ে মাখেন না। ক্ষমাময় ঔদাসীন্যে নিরস্ত করে রাখেন।

সেবার কামারপুকুরের বাড়িতে মা একা আছেন। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ তাঁর দিকে ছুটে এল হরীশ। এ যে পাগলামির চেয়েও ভয়ানক। মাও ছুটতে লাগলেন। হরীশও পিছু নিল। উপায়? বাড়িতে আর কেউ নেই, কে রক্ষা করে? ধানের মরাই ছিল একটা উঠোনে, তার চারদিকে ঘুরতে লাগলেন। পিছনে সেই হরীশ, তেমনি দুর্দম্য-উদ্যত। সাত-সাত বার ঘুরলেন মা, পাগলের তবু নিবৃত্তি নেই। তখন অন্তরীক্ষের দিকে তাকিয়ে অপ্রত্যক্ষকে না ডেকে নিজের সুপ্তশক্তিকে আহ্বান করলেন। মৌন মাটির আস্তরণ সরিয়ে অভ্যুত্থান হল আগ্নেয়গিরির। ঘুরে দাঁড়ালেন, রুখে দাঁড়ালেন। ধরলেন তাকে সবলে, পেড়ে ফেললেন তাকে মাটিতে, হাঁটু গেড়ে বসলেন তার বুকের উপর। এক হাতে টেনে ধরলেন জিব, অন্য হাতে চড় মারতে লাগলেন অবিরল। হেঁ-হেঁ করে হাঁপাতে লাগল হরীশ।

হয়ে গেল বুঝি। ছেড়ে দিলেন শেষকালে। হয়ে যায়নি, কিন্তু তরে গেছে। কেউ তরে মন্ত্রে, কেউ তরে মারে। প্রহারও মা'র উপহার। মা যখন মারেন তখনও মাকেই আঁকড়ে ধরি, তখনও কান্নার বুলি মা-মা।

মানুষ করে অম্বা, ঘটান জগদম্বা। হরীশের পাগলামি সেরে গেল। পালিয়ে গেল বৃন্দাবন।

'আচ্ছা মা, তখন কি আপনি বগলা-মূর্তি ধরেছিলেন ?' জিগগেস করল ভক্তদল।

'কে জানে বাপু, তখন আমাতে আমি ছিলুমনি।'

তখন আমি সাকারশক্তিস্বরূপা। তখন আমি প্রবলিকা হুঙ্কারঘোরাননা। প্রলয়ঘনঘটা-ঘোররূপা প্রচণ্ডা। কী জানি আমি তখন কে!

কেন ভাবছ? সকল মেয়ের মধ্যেই রয়েছে এই গুহ্যকালী। এই সাট্টহাসা বগলামূর্তি। বাইরে দেখছ লাবণ্যবারিভরিতা মেঘশ্রেণী, কিন্তু অন্তরে আগ্নেয়ী বিদ্যুন্মালা। শুধু মধুমতী লক্ষ্মী নয়, জ্বালামালিনী কালী। শুধু লাস্যের লীলাকমল নয় বৈরিমর্দনের আয়ুধ-বজ্র।

সকলের মা।'বৈরীর মা, বান্ধবের মা। ভক্তের মা. বিমুখেরও মা। সতের মা, অসতেরও মা। বর্তমানের মা, ভবিষ্যতেরও মা।

যে উপেক্ষা করে তারও মা, যে অপেক্ষা করে তারও মা।

একটি মায়ের একটি মাত্র সন্তান। সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করেছে। গৃহ শ্মশান হয়ে গেছে, তাই পুত্রহারা মা এসেছে শ্মশানবাসিনীর কাছে। পায়ের কাছটিতে বসে কাঁদছে নীরবে।

মা'র চোখও অশ্রুতে টলটল করছে। বলছেন, 'আহা, একটিমাত্র ছেলে, মা'র প্রাণের ধন, এমন করে চলে গেল! আহা, এখন মা কী নিয়ে থাকে বলো দেখি।'

কিন্তু আরেকটি মায়ের দু-দুটি ছেলে সন্ন্যাসী হয়েছে। মা'র কাছে এসেছে দুঃখ জানাতে নয়, আনন্দ জানাতে। বলছে সেই মা: 'বিধবা হবার পর ঐ দুটি ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে সংসার করছিলুম। কিন্তু ওরা ভাবলে মানুষের কল্যাণের পথ সংসারে নয়, সন্ন্যাসে। ওরা যদি পরম কল্যাণের পথ তেমনি করে দেখে থাকে, আমি তাতে বাধা দেব কেন? সে তো গৌরবের কথা। সত্যি, কী আছে এই সংসারে?'

মা'র চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। মায়ের আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করলেন। বললেন, 'ঠিক বলেছ মা, সন্তান যদি পরমকল্যাণের পথ খুঁজে পায় তাতে মা'র আনন্দ ছাড়া দুঃখ কোথায়!'

কারণ এক ক্রিয়া বিচিত্র। কারণস্বরূপে আছেন বলে ক্রিয়াও প্রতিবিম্বিত হয়েছেন। জ্যোৎস্না একই আছে কিন্তু কখনো তা সান্ত্বনা কখনো বা বিষশর। অন্ধকার একই আছে, কখনো তা সুনিদ্রা কখনো তা পাষাণ গুরুভার। একই স্তব্ধতা, কখনো তা বিষণ্ণ কখনো বা সুখসমুজ্জ্বল।

একই সন্ন্যাস—যে মা কাঁদে তার সঙ্গেও আছেন, যে মা তৃপ্তি অনুভব করে তার সঙ্গেও আছেন। এবং সর্বক্ষেত্রেই আন্তরিক। প্রসাদেও আছি বিষাদেও আছি। আমি যে কিছু ফেলি না, কাউকে ফেলি না। আমি যে সকলেরটা নিই, সকলেরটা ভাগ করে নিই। আমি যে সকলের। আমি যে সংসারীরও মা, সন্ন্যাসীরও মা।

নানারকম পুতুলখেলা খেলছেন মহামায়া। কতগুলোকে শাদা পোশাক পরিয়েছেন কতগুলোকে গেরুয়া। কিন্তু, আসলে, যারা সংসারী তারা হল কালো কাপড়, যারা সন্ন্যাসী তারা হল সাদা। তাই, ঠাকুর বলতেন, সাধু সাবধান।

'কালো কাপড়ে কালি পড়লে অত ঠাওর হয় না।' বললেন মা, 'কিন্তু শাদা কাপড়ে এক বিন্দু পড়লেই সকলের চোখে পড়ে। তাই সব সময় হুঁশিয়ার।'

সংসারীদের জন্যে ক্ষমা, সন্ন্যাসীদের জন্যে কৃপা। আমি আছি বিশ্বজননী, সর্বদ্বন্দ্বক্ষয়ঙ্করী, সর্বসৌখ্যস্বরূপিনী। সকলে এসে আমার কোলে সমান হবে। যে পথেই যে হাঁটুক কণ্টকে বা কুসুমে, কর্দমে বা কুঙ্কুমে—সব এসে সমাপ্ত হবে আমার অঙ্কাশ্রয়ে। তাই আমি ঘরে আছি মঠেও আছি, কেল্লায়ও আছি, আবার আছি মুক্ত প্রান্তরে।

'সাধুর রাস্তা বড় পিছল।' বললেন আবার মা। 'পিছল পথে সর্বদা পা টিপে-টিপে চলতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয় পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে। মেয়েমানুষের দিকে ফিরেও তাকাবে না। কুকুরের বখলসের মতো গেরুয়া তাকে রক্ষা করবে। গেরুয়া হচ্ছে জ্বলন্ত আগুন। এ আগুন যে গায়ের উপর রাখতে পারে সে কি কম শক্তিমান?'

তাই সাধুর সদর রাস্তা। তার পথ কেউ রুখতে পারে না।

এক ওড়িয়া সাধু এসেছে কামারপুকুরে। তার প্রতি মা'র কী প্রাণঢালা সেবা! চাল-ডাল যা জোটান সব সাধুকে দিয়ে আসেন, আর জিগ্গেস করেন 'সাধুবাবা, কেমন আছ?'

সাধুবাবা ভাবে এ কণ্ঠস্বরটি কার? যার জন্যে সাধনা করছি সে যখন কাছে এসে কথা কইবে, তখন কেমন শোনাবে তার কলকণ্ঠ?

সাধুবাবার মাথা গোঁজবার একটু জায়গা দরকার। কাঠকুটো যোগাড় করে একখানি কুঁড়ে ঘর তুলে দেবে গাঁয়ের লোকেরা। কিন্তু তুলবে কি, যা আকাশ ভরে মেঘ করে রোজ, এই বুঝি বৃষ্টি এসে গেল! হাওয়া উঠে উড়িয়ে নিল বুঝি খড়-পাতার আস্তানাটুকু। ঠাকুর, রাখো গো রাখো, হাতজোড় করে প্রার্থনা করেন মা, ঘরখানি আগে খাড়া হতে দাও। আগে হয়ে যাক কুঁড়েটুকু, তারপর যত পারো ঢেলো।

ঠাকুর শুনলেন মনের কথাটুকু। কুঁড়েঘর তৈরি হল সাধুর। শুধু মাথা গোঁজবার ঠাঁই নয়, দেহ রাখবার ঠাঁই। কদিন পরেই ঐ ঘরে দেহ রাখলেন সাধুবাবা।

সাধুসন্ন্যাসীকে ব্যঙ্গ করছে নলিনী। মা শুনতে পেয়ে তাকে তিরস্কার করে উঠলেন। বললেন, প্রণাম কর, শুচি-শুদ্ধ হয়ে যা। যারা সৎ চিন্তা সৎ কর্মের আশ্রয়ে আছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাবটুকু আনতে পারলেও মন নির্মল হয়।

রাধুকে বলেন, প্রণাম কর সাধু ভক্তদের।

কে এক সংসারী কোন এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে ঝগড়া করেছে। শুনতে পেয়ে মা বললেন সেই সংসারীকে, 'এ রকম কাজও কোরো না। সন্ন্যাসীর একটি কথায়, কথা কেন, একটি দীর্ঘশ্বাসে মহা অনিষ্ট হয়ে যেতে পারে।'

এক সন্ন্যাসী-ছেলে বসে আছে মা'র কাছে। একটি ভক্ত-মেয়ে চলাফেরা করছে পাশ দিয়ে। হঠাৎ সেই মেয়ের আঁচলের ডগাটা লাগল সন্ন্যাসীর পিঠে। 'এ কী করলে?' মা ধমকে উঠলেন: 'আঁচল দিয়ে ছুঁয়ে গেলে সন্ন্যাসীকে? এ কী অন্যায় কথা! শিগগির ওর পায়ের ধুলো নাও বলছি।' মেয়েটি তৎক্ষণাৎ প্রণত

হল। কোথায় আমার আঁচল ? হে তাপসকুমার, যদি দাও তোমার পদধূলি, আঁচলে বেঁধে নিয়ে যাই।

নামজাদা ঘরের ভক্ত-স্ত্রী, উদ্বোধন অফিসে এসে এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া করেছে। যাবার সময় শাসিয়ে গেছে, ঐ ব্রহ্মচারী যদ্দিন আছে ততদিন আর হচ্ছি না এমুখো।

মা'র কানে উঠল। যাচাই করে দেখলেন ভক্তির চেয়েও আভিজাত্যের ভার বেশি স্ত্রীলোকটির। তাই বললেন, 'নাই বা এল ! এ সব আমার সর্বত্যাগী ছেলে, এদের সঙ্গে ঝগড়া ! এরা না হলে আমি কাদের নিয়ে থাকব ?'

ভগবানকে দেখব কোথায় ? সাধুকে দেখি ভক্তকে দেখি। দর্শনেই ভব-বন্ধন ঘুচে যাবে, যেমন সূর্যদর্শনে তমসাবৃত দৃষ্টির বাধা দূর হয়। সাধুর দেহই ব্রহ্মজ্যোতিতে দীপ্যমান। কে জানে, ব্রহ্ম থেকেও হয়তো সাধু সরস, যেমন সমুদ্রের থেকেও গঙ্গা মধুর। সাধুর রুচি রামজপে, রামের রুচি সাধুজপে।

তেমনি, দুটি তরুণী বিধবা এসেছে মা'র কাছে। 'এ কি শাদাপেড়ে কাপড় কেন পরেছ ?' মা বলে উঠলেন, 'তোমরা ছেলেমানুষ, পাড়-দেওয়া কাপড় পরবে। নইলে মন যে বুড়ো হয়ে যাবে। মন যদি বুড়ো হয়ে যায় তবে কাজ করবার উৎসাহ পাবে কি করে ?' শুধু কথা নয়, নিজের বাক্স থেকে দুজনকে দুখানি কাপড় বের করে দিলেন।

ভক্তকল্পলতিকা জনকজননীজননী সবাইকে বেষ্টন করে আছেন।

কিন্তু যে যাই বলুক, সন্ন্যাসী অপেক্ষা সংসারী ছেলেদের প্রতিই মা'র টান বেশি। কেন হবে না ? মা বললেন, 'সন্নেসী ছেলেরা সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে ধ্যান-জপ নিয়ে আছে, নিজের চেষ্টাতেই উঠবে। কিন্তু এদের, সংসারী ছেলেদের দেখবে কে ? কচি অবোলা ছেলের মত সকলে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। আমি ছাড়া ওদের আর কেউ নেই। কাজেই আমাকেই দেখতে হয়।'

চিরদিনের মত সঙ্ঘ ছেড়ে চলে যাচ্ছে এক সন্ন্যাসী-ছেলে। বোধহয় উপর-ওয়ালার হুকুম, কোনো শাস্তির ব্যবস্থা। কিন্তু মাতা-পুত্রের বিচ্ছেদ শাস্তির খবর রাখে না, সান্ত্বনা পায় না আইনের বিচারে।

মা কাঁদছেন, ছেলে কাঁদছে।

কেউ বুঝি চুপি-চুপি এসে দেখে ফেলবে হঠাৎ ! আঁচলে চোখ মুছলেন মা, ছেলেকে বললেন, কলঘরে গিয়ে চোখ ধুয়ে এস।

আবার দেখা হল। এবার আর কান্না নয়। ছেলে প্রণাম করল মাকে। মা বললেন, 'এস বাবা। যেখানে বলেছি সেখানে গিয়ে থাকো গে। জেনো, আমি সব সময় আছি তোমার কাছে-কাছে।'

শাস্তি যার দেবার সে দিক, কিন্তু মা দেন শান্তি।

বললেন, 'কোনো ভয় নেই। ছাড়া পেয়ে গেলে। এবার হেসে নেচে কঁদে লও।' যতদূর দেখা যায় জানলায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলেন ছেলেকে। চোখের আড়াল হলে আবার কাঁদতে বসলেন।

সাঁড়াসাঁড়ির বানে পড়ে একটি ছেলে প্রায় প্রাণ হারাতে বসেছিল। ডাক্তার

কাঞ্জিলাল তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে কোনোক্রমে। জয়রামবাটিতে খবর এসেছে মা'র কাছে। মা তো ভেবে প্রায় দিশেহারা। কোথাকার কে ছেলে, তার জন্যে দুশ্চিন্তা। ঠাকুরকে তুলসী দিলেন : বললেন, আমার ছেলেকে ভালো রাখো। কলকাতায় চিঠি পাঠালেন, ছেলেকে বোলো, সেরে উঠে একবার যেন দেখা দিয়ে যায়।

ভগবান যে আমাকে অহেতুক কৃপা করবেন, তাঁকে আমি কী দেব? শুধু দেব না কেবল নেব এ দীনতা অসহনীয়। তাই আমাকেও দিতে হবে। কিন্তু কী দিতে পারি, আমার সাধ্য কি! আমি দেব তাঁকে অহেতুক ভালোবাসা। অহেতুক ভালোবাসা কার উপর হতে পারে? শুধু মা'র উপর। তাই ভগবানকে মা-রূপে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন ঠাকুর। আর এই মা-ই সারদা, সারভুতা, সংসারৈকসারা।

তাঁর অহেতুক কৃপা আর আমার অহেতুক ভালোবাসা। ফুলের সঙ্গে মিলল এসে সুগন্ধ। সত্যের সঙ্গে মিলল এসে সরলতা। ভাবের সঙ্গে মিলল এসে রূপের সুছন্দ।

আরেক ছেলের মঠের উপর বিরাগ হয়েছে। বললে, 'মা, যদি অনুমতি দেন, কিছুদিন বাইরে থেকে ঘুরে আসি। এখানে থেকে আমার মন বিগড়ে গেছে। বাইরে থেকে কিছুদিন ঘুরে এলে যদি ঠিক হয়।'

'কোথায় যাবে?'

'কাশী।'

'সঙ্গে টাকাকড়ি কিছু আছে?'

'না। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে হাঁটিতে-হাঁটিতে চলে যাব।'

'কার্তিক মাস, লোকে বলে, যমের চার দোর খোলা। আমি মা, আমি কি করে বলি তুমি যাও। আবার বলছ হাতে টাকাকড়ি কিছু নেই। খিদে পেলে কে খেতে দেবে বাবা?'

আর পা উঠল না যেতে। নিজের কি কষ্ট তার কথা কে ভাবে। কিন্তু মা যে কষ্ট পাবেন তাই যেন সহনাতীত!

সংসার থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে এসেছে এক ছেলে। মা বললেন, 'ভগবান তোমাকে কতগুলো পোষ্যের ভার দিয়েছেন—তাদের তুমি ফেলে যাবে কি! তুমি ফেলে গেলে তাদের জন্যে আমাকেই তখন ভেবে মরতে হবে। তোমার সংসার ছাড়বার দরকার নেই। আমার সংসার মনে করে তুমি থাকো।'

কিন্তু সেই যে একটি কাঁচা বউ নিয়ে এল সেদিন অন্নপূর্ণার মা, তাকে মা অন্য কথা বলে দিলেন। অন্নপূর্ণার মা একজন স্ত্রী-ভক্ত, বউটিকে নিয়ে এসেছে তার স্বামীকে যেন মা সন্ন্যাস-সংকল্প থেকে নিরস্ত করেন। আপনি যদি অনুমতি না দেন সাধ্য নেই সে সংসার ছাড়ে। বউটি অনেক কাঁদাকাটা করল, অন্নপূর্ণার মাও ফোড়ন দিল।

মা বললেন, 'আমি কি করে নিষেধ করব মা, ওর যে ভগবানের জন্যে ঠিক-ঠিক অনুরাগ হয়েছে।'

বউটি তাকিয়ে রইল সজল চোখে। তা হলে কি আমার কোনো উপায় নেই?

মা ছেলেকে ডাকিয়ে আনলেন। বললেন, 'শোনো, যাবে তো বাঙলা দেশ ছেড়ে

যেও না। আর, বউ যদি চিঠিপত্র লেখে উত্তর দিও। আর যদি দেখবার জন্যে খুব ব্যাকুল হয়, দেখা দিও মাঝে-মাঝে।' পরে বউয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি ইচ্ছে করলে তো আমার কাছেই থাকতে পারো। থাকবে?'

এক দিকে ঈশ্বরবিরহীর অনুরাগ, আরেক দিকে স্বামীবিরহিণীর কান্না। মা দুয়েরই মা। দুই বিরহের সেতু। একে দেন খাদ্য ওকে দেন পানীয়। একে দেন অভয়, ওকে দেন আশ্রয়। এক হাত থেকে আরেক হাত। ওকে সান্নিধ্য একে সন্ধান।

* ত্রিশ *

আরো কবার তীর্থে গিয়েছেন মা।

প্রথম গয়ায়, বুড়ো গোপালকে সঙ্গে নিয়ে। আমি তো পারলুম না, তুমি আমার হয়ে মা'র পিণ্ড দিয়ে এস। ঠাকুর বলে রেখেছিলেন। সেইটি পূরণ করলেন।

তারপর সে বছরই পুরী গেলেন। কলকাতা থেকে চাঁদবালি বড় জাহাজে, চাঁদবালি থেকে কটক ক্যানাল-স্টিমারে। আর কটক থেকে গরুর গাড়িতে শ্রীক্ষেত্র। সঙ্গে রাখাল, শরৎ, যোগেন, যোগেন-মা।

বলরাম বসুর ভাই হরিবল্লভ বসু সে অঞ্চলের মস্ত উকিল। খুব রবরবা। মন্দিরের পুরোতরা খুব মানে-গোনে। পুরোতদের মধ্যে একজন প্রধান হচ্ছে গোবিন্দ শিঙ্গারী। হরিবল্লভের অতিথি—মাকে খাতির দেখাতে এল গোবিন্দ। বললে, 'মন্দিরে নিয়ে যাবার জন্যে পালকি নিয়ে আসব।'

'না গোবিন্দ, আমি হেঁটে যাব মন্দিরে।' মা বললেন মধুর আর্তির সঙ্গে, 'তুমি শুধু আমাকে আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেও। আমি দীনহীন কাঙালের মত যাব আমার প্রভুর মন্দিরে, জগৎপতি জগন্নাথকে দেখে আসব।'

কিন্তু মন্দিরে ঢুকে মা'র চোখ বোজা। জগন্নাথের দিকে মুখ করে আছেন বটে, কিন্তু দেখছেন না, চোখ বন্ধ করে আছেন।

'ও কি, দেখ,' যোগেন-মা ঠেলা দিলেন, 'তোমার চোখের সামনে জগন্নাথ। ও কি, চোখ বুজে আছ কেন?'

'উনি আগে দেখুন—'

লক্ষ্য করে দেখল যোগেন-মা, আঁচলের তলা থেকে কি-একটা বের করছেন মা। কি ওটা? ওমা একটা ফোটো। কার? ঠাকুর রামকৃষ্ণের।

মা বললেন, 'উনি আগে দেখুন। কোনোদিন আসেননি দক্ষিণে। আসবার সুযোগ হয়নি। উনি না দেখলে আমার দেখায় তৃপ্তি নেই।'

আঁচলের মধ্যে ছবি নিয়ে এসেছেন কিন্তু বুকের মধ্যে কতখানি মমতা! যে চিরদিন দূরে দূরে রেখেছে তাকে নিয়ে এসেছেন বুকের নিবিড়ে। যারা বলে তুমি দূরে আছ, তারা নিজেরাই দূরে আছে। তুমি যে আমার চোখের মধ্যে চোখের মণিটি হয়ে রয়েছ। হায় চোখ নিজেকে দেখে না। দর্পণ পেলে দেখে। জগন্নাথ আমার সেই দর্পণ। সেই দর্পণে আমি আজ আবার তোমাকে দেখব।

ছবিকে আগে দর্শন করালেন। পরে উন্মীলিত করলেন চোখ। দেখলেন জগন্নাথ পুরুষসিংহ হয়ে রত্নবেদীতে বসে রয়েছেন আর মা দাসী হয়ে তাঁর সেবা করছেন। কে এই পুরুষসিংহ ? ভালো করে চেয়ে দেখ দেখি। রত্নবেদীতে বসে আছেন সেই নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসী। সেই দক্ষিণ-ঈশ্বর।

ঠাকুর আর দুবার আসবেন বলেছেন। একবার বাউল সেজে। গায়ে আলখাল্লা, মাথায় ঝুঁটি, দাড়ি এতখানি।

একশো বছর পরে আসবেন। এই একশো বছর থাকবেন ভক্তহৃদয়ে। ঘনীভূত মূর্তিতে। তারপর আবার বিগলিত হবেন।

'আমি আর আসতে পারব না।' বললেন মা।

লক্ষ্মী বললে, 'আমাকে তো তামাককাটা করলেও আর আসব না।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'যাবে কোথা ? সব কলমির দল, এক জায়গায় বসে টানলেই সব এসে পড়বে।' এ সামান্য কথাটুকু বলতেও ঠাকুর একটি উপমার আশ্রয় নিলেন—কলমির দল।

মা'র দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, 'তোমার হাতে থাকবে হুঁকো-কলকে, আমার হাতে ভাঙা পাথরের বাসন। হয়তো ভাঙা কড়ায় রান্না হবে। যাচ্ছি তো যাচ্ছি, খাচ্ছি তো খাচ্ছি—দিকবিদিক খেয়াল নেই।' একটু থেমে বললেন, 'ঐ দিক থেকে আসব।' গোল-বারান্দা থেকে বালি-উত্তরপাড়ার দিক দেখিয়ে দিলেন। হয়তো বা বর্ধমানের দিক।

রত্নবেদীতে পুরুষসিংহ দেখলেন—আবার দেখলেন, লক্ষ শালগ্রামশিলার উপর শিব বসে রয়েছেন। স্বর্গলোকে দেবদেব, মর্তলোকে সদাশিব। ভক্তমধ্যে আশুতোষ, দীনমধ্যে দীননাথ।

পুরী থেকে ফিরে কিছুকাল পরে মা ভাইদের নিয়ে আবার যান কাশী-বৃন্দাবন। কিছুকাল পরে আবার যান পুরী। সঙ্গে যত রাজ্যের আত্মীয় আর ভক্ত-সেবক। দলপতি প্রেমানন্দ।

ধুলোপায়ে রোজ যান জগন্নাথদর্শনে, আবার দর্শনান্তে আঁচলের গ্রন্থিতে বেঁধে নেন রাধুকে। ভিড়ের মধ্যে সে না হারায়। একবার অখণ্ডলোকে মহামায়া, আবার জীবলোকে মায়াবিনী। একবার রাধা, আরেকবার রাধু। মা'র পায়ে ফোড়া হয়েছে। তীব্র যন্ত্রণা। পেকে উঠেছে কিন্তু ফুঁড়তে দেবেন না। অথচ এই পা নিয়ে মন্দিরে যাবেন। ভিড়ের চাপে ব্যথা পাবেন, চীৎকার করে উঠবেন, অথচ চূড়ান্ত ব্যবস্থা করতে দেবেন না।

এও একরকম দুঃসহ কষ্ট, অন্তত প্রেমানন্দের পক্ষে। সে একটি ভক্ত ডাক্তার ডেকে আনল। বললে, 'হাতে করে ছুরি নাও। মাকে প্রণাম করো গিয়ে নুয়ে পড়ে। আর অমনি—'

'যদি দেখতে পান ?'

'পাবেন না। চাঁদরে গা ঢেকে মুখে ঘোমটা টেনে বসবেন।'

যেমনি ষড়যন্ত্র তেমনি শস্ত্র-যন্ত্র। ডাক্তার নুয়ে পড়ে মাকে প্রণাম করলে আর সঙ্গে-সঙ্গে চিঁরে দিলে ফোড়া। 'মা আমার অপরাধ নেবেন না—' বলেই পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

তীক্ষ্ম আর্তনাদ করে উঠলেন মা। প্রেমানন্দ আগে থেকেই সরে রয়েছে, সামনে যাকে পেলেন যন্ত্রণার প্রাবল্যে তাকেই বকতে লাগলেন অনর্গল।

ভক্ত ছেলেটি, যে কাছে থাকার দরুন ধরা পড়ে গেছে, বললে আর্দ্রকণ্ঠে, 'মা, আমারই দোষ। আমি নিজের চোখে দেখলুম এই দুঃখের দৃশ্য। আপনি আমাকে শাপ দিন।'

শাপ দেব? না, এখন যে বেশ আরাম লাগছে। পুঁজ-রক্ত বেরিয়ে গিয়েছে, বেরিয়ে গিয়েছে যন্ত্রণা-ভর্ৎসনা। নিমপাতার জলে ধুয়ে নিয়ে বাঁধা হল ব্যাণ্ডেজ। যন্ত্রণা প্রায় আর নেই বললেই হয়।

যাকে বকেছিলেন তাকে এখন আদর করলেন চিবুক ধরে।

মা'র ক্রোধ এমনি করেই শোধ হয়। তখন মা'র মুখের সেই তিরস্কার পুরস্কারের মত পুণ্যের জিনিস বলে বেঁচে থাকে।

মা'র খুড়োমশাই গিয়েছিলেন সঙ্গে, কলকাতায় ফিরে এসে মারা গেলেন। মা শুধু ঠাকুরের পুজো আর ভোগের সময় ওঠেন, নয়তো মা সব সময় বসে আছেন খুড়োর পাশে। যেদিন যাবেন, দুপুরবেলা, সেদিন মাকে অনেক ভুলিয়ে-ভালিয়ে পাঠানো হল খেতে। আর, মাও গেছেন খুড়োমশাই তিরোভাব করলেন। সবাই চুপ করে রইল, মা'র খাওয়া সমাধা হোক শান্তিতে। মা কিছু বুঝতে পারলেন কিনা কে জানে, কোনোরকমে হাতে-মুখে করেই চলে এলেন। মাথা নিচু করে সব চুপচাপ বসে আছেন দেখে মা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তবে কি খুড়ো নেই?'

'কেন তোমরা আমায় ও ছাইপাঁশ খেতে পাঠালে? একবার শেষ দেখা দেখতে পেলুম না,' বলে উচ্চনাদে কেঁদে উঠলেন। পরে আবার অপূর্ব সৌম্যশীতল অবস্থা ধারণ করলেন। শবদেহের মাথায় ও বুকে করজপ করে দিলেন। মোক্ষদ্বারের কপাট যেন উৎপাটিত হল।

একটি কায়স্থের ছেলে কাঁধ দিয়েছে শবের খাটে। গোলাপ-মা নালিশ করে উঠল: 'শুদ্দুর হয়ে বামুনের মড়া ছুঁলে?'

'শুদ্দুর কে? ছেলে?' করুণার্দ্র চোখে তাকালেন ছেলের দিকে। বললেন, 'ভক্তের কি জাত আছে, গোলাপ?'

ভক্তদের এক জাত, এক জল। তারা সকলেই ছেলে, সকলেরই তাদের চোখের জল।

ঠাকুর বলেছিলেন মাকে, একবার বিষ্ণুপুরে যেও। বিষ্ণুপুর হচ্ছে গুপ্ত বৃন্দাবন। ঠাকুরের কথা রাখতে মা একবার গেলেন বিষ্ণুপুর।

'যেখানে-যেখানে আমি যাইনি, সব জায়গায় তুমি যাবে।'

কত হৃদয়তীর্থেও হয়তো স্পর্শ পড়েনি আমার, তুমি সেখানে রেখো তোমার অমিয়দৃষ্টি। তোমার মর্ম-মন্ত্র। আমার যা মন্ত্র, তারই মর্ম তুমি। আমি বাক্য তুমি ব্যাখ্যা। আমি ভাষা তুমি ভাষ্য। আমি অন্বয় তুমি অর্থ।

সকলকে তুমি নিমগ্ন করো তোমার অপরিচ্ছিন্ন সত্তায়।

পুরী থেকে এসে গরুর গাড়িতে করে গেলেন তারকেশ্বর। তারপর মাহেশে যান মোটরে করে রথরজ্জুতে টান দিয়ে আসেন।

ঠাকুরকে একবার রথে চড়ানো হল। মা বসে-বসে অনিমেষ নয়নে তাঁকে দেখতে

লাগলেন। 'তাঁকে কোনোদিন নিরানন্দে দেখিনি।' এই কথাটিই আবার প্রত্যক্ষ করলেন চোখের সামনে। রাস্তায় নিয়ে গিয়ে গঙ্গা-পর্যন্ত টেনে আনা হল। তারপর রথ উপরে তুললে। রাধু নলিনীকে নিয়ে মা টানলেন, ভক্ত-মেয়েরাও হাত মেলাল। একটি আনন্দচপলা কিশোরীর মত হয়ে গেলেন মা।

যখন রাস্তায় টানা হচ্ছিল, মা বললেন, 'সকলে তো আর জগন্নাথ যেতে পারে না। যারা এখানে থেকে ঠাকুরকে রথে দেখলে তাদেরও হবে।'

যেটুকু হবার তাই হবে। পুরীতে যখন দেখলেন, এত লোক জগন্নাথ দর্শন করছে, তখন মা কাঁদলেন আনন্দে। আহা, এত লোক মুক্ত হয়ে যাবে! শেষে দেখেন, মুক্তি কি এতই সোজা? শুধু যারা বাসনাশূন্য তারাই মুক্তি পাবে। তাদের সংখ্যা আর কটি? কোটিতে গোটিক মেলা ভার। চক্রের মত সৃষ্টি চলছে। যে জন্মে মন বীতকাম সেইটিই তার শেষ জন্ম।

আমি লক্ষ জন্ম চাই—সে এক বলেছিল নরেন। ভয় কিসের? নরেন হল রোদ্দুরের তলোয়ার—সপ্তর্ষি থেকে এসেছে। সে হল প্রজ্বলন্ত জ্ঞানী। জ্ঞানীর আবার জন্ম নিতে ভয় কি? তাদের তো আর পাপ হয় না। তারা তো সমস্ত বন্ধনের বাইরে।

ঠাকুর কি রথে উঠে বসলেন, না, নেমে বসলেন?

পুরীতে প্রথম দিন যখন জগন্নাথ দর্শনে যান, ঠাকুরের পুজো একটু তাড়াতাড়ি সেরে নিয়েছিলেন মা। একটা ঘিয়ের টিনের উপর ঠাকুরের ছবি ঠেসান দিয়ে রেখে পুজো করেছিলেন। ঘর-দোর তালা-দেওয়া। মন্দির থেকে ফিরে এসে ঘর খুলে দেখেন ঠাকুরের ছবি নিচে নেমে বসেছে। সকলে মনে করলে, চোর ঢুকেছিল, জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে গিয়ে উপরের ফোটো নিচে নামিয়ে বসিয়েছে। কিন্তু চোর কোথায়? বাইরে থেকে ঘর বন্ধ, ভিতরের জিনিসের কোথাও এতটুকু নড়চড় হয়নি—চোর ঢুকলেই হল? শেষকালে ঠাহর করে দেখে সকলে, বড়-বড় লাল পিঁপড়ে ধরেছে টিনে, ঘিয়ের টিনে। তারই জন্যে আলগোছে ঠিক নেমে বসেছেন।

কে জানে অভিমান করেছেন কিনা। জগন্নাথদর্শনের তাড়ায় আমার পুজো আজ একটু সংক্ষেপে করলে? বা, তাই বুঝি? তোমাকে অঞ্চলে চেপে নিয়ে গেলাম বুকে করে। ঘিয়ের টিনের উপর না দেখে তোমাকে দেখে এলাম রত্নসিংহাসনে। তোমার কৃপা ছাড়া তো তোমাকেও দেখা যায় না। তোমার আবার অভিমান কি, তোমার শুধু কৃপা।

একটি স্ত্রী-ভক্ত বললেন মাকে, 'মা, ভগবানের যদি কৃপা হয় তখন তো আর সময়ের বাছবিচার করে না। যাকে বলে, আলটপকা এসে পড়ে। অসাধ্যও সুসাধ্য হয়ে যায়।'

'তা বটে। কিন্তু কালের মত কি মিষ্টি হয়?' মা বললেন গম্ভীর মুখে, 'মানুষ অকালে ফলাবার চেষ্টা করছে। আশ্বিন মাসেও তো আম মেলে, কিন্তু জষ্টি মাসের মত কি মিষ্টি হয়? ঈশ্বরলাভের পথও তেমনি। এ জন্মে হয়তো জপ-তপ, পরের জন্মে ভাব, তার পরের জন্মে সমাধি—এই ভাবে আর কি।'

কিন্তু যাই বলো কৃপার পাত্র হওয়া চাই। রস যে ধরবে ভাব চাই। কৃষ্ণরস

ধরতে শ্রীমতীভাব। কৃপার আবার পাত্রাপাত্র কি। সূর্যের আলো তো সকলের উপর সমান।

কিন্তু ঘরে রোদ আনতে হলে জানলাটিকে মেলে ধরতে হবে। কৃপার হাওয়া তো বইছে চারদিকে, কিন্তু পালটি তো খুলে দিতে হবে আকাশে। মাছ তো রয়েইছে সরোবরে, কিন্তু ছিপটি ফেলে তো বসে থাকা চাই।

'তাই বলি,' মা বললেন, 'নদীর কূলে বসে ডাকো, সময়ে তিনি পার করবেন।'

তা হলে কৃপাতেও বিচার আছে? না ডাকলে পার করবেন না?

করতে দেরি হবে। যার যেমন কর্ম তার তেমনি কৃপা।

'এই দেখ না, আমার যখন অসুখ তখন যদি কেউ আসে দেখা পাবে না। তখন সে আসে কেন? বলবে, ভাগ্য। আমি বলব, কর্ম। যার যেমন কর্ম তার তেমনি সুযোগ-সুবিধে। কতবার করে আসছে, যাতায়াতের বহু খরচ, তবু যতবারই আসে, ততবারই আমার অসুখ। আবার কেউ হয়তো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে দেখা পেল না-চাইতেই। যার পারে যাবার সময় হবে সে দড়ি ছিঁড়ে আসবে, সাধ্য নেই, তাকে কেউ বেঁধে রাখে।'

সে-দড়ি ছিঁড়ব কি দিয়ে?

শুধু কর্ম দিয়ে। কর্ম দিয়ে কর্মক্ষয়। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। দড়ির সঙ্গে দড়ি ঘষে-ঘষে আগুন করে বন্ধন পুড়িয়ে ফেলা।

এই দেখ না একটি ভক্ত-ছেলে আমাকে দর্শন করে হৃষীকেশ গেল। আমাকে দেখেছে, এখন ঠাকুরকে দেখাও। আমি বললুম, সময়ে দর্শন পাবে। এখন হৃষীকেশ গিয়েই চিঠি লিখেছে, কই, দর্শন তো পেলুম না এখনো? ভাবখানা এই, যেহেতু সে হৃষীকেশ গিয়েছে, ঠাকুর তার জন্যে সেখানে এগিয়ে থাকবেন। সাধু হলে কি হয়, ভগবানকে ডাকতে হবে তো? সাধু হওয়া তো এই নয় যে সাধন-ভজন আর করব না।

ঈশ্বরকে না ডাকলে কী হয়? কী হবে! কিছুই হয় না। কত লোকই তো তাঁকে ডাকছে-না, তার উপর তুমিও একজন না ডাকলে! তাতে তাঁর কী! তার অনন্ত আছে। মাঝখান থেকে তুমিই একটা আনন্দের স্বাদ পেলে না, জানলে না কাকে বলে অমৃতের পিপাসা! তুমি বেশ আছো তো তাই থাকো। তাঁর এমনি মায়া তোমাকে তিনি ভুলিয়ে রেখেছেন। আশ্চর্য, এমন আপনজনকে তুমি ভুলতে দিলে?

* একত্রিশ *

বালেশ্বর জেলার কোঠারে বলরাম বোসের জমিদারি। রামেশ্বর যাবার পথে মা নামলেন কোঠারে, থাকলেন প্রায় দুমাস।

দেবেন চাটুজ্জে কোঠারের পোস্টমাস্টার। পাকে-চক্রে প'ড়ে খৃস্টান হয়েছিল— এখন আবার মাকে দেখে ইচ্ছে হয়েছে স্ববাসে ফিরে আসতে। মা অনুমতি দিলেন। যথাবিধি কর্মকরণ শেষ করে গায়ত্রীসহ যজ্ঞোপবীত ধারণ করলে। মাকে

এসে প্রণাম করে দাঁড়াল। মা তাকে দীক্ষা দিলেন, প্রসাদরূপে দিলেন একখানি নিজের কাপড়।

মা'র কাছে কারুর কোনো দেরি নেই। যখন হোক চলে এলেই হল। জানবে আমি তোমার জন্মমৃত্যুর সাথী, তোমার সুখদুঃখের সঙ্গিনী, তোমার অনন্তযাত্রার একমাত্র সহচরী। একবার 'মা যাব' বলো, মাতৃ-অন্বেষী শিশুর মত ব্যাকুল হয়ে ওঠো, ঠিক আমাকে পাবে।

খুরদা-রোড পেরিয়ে চিলকা-হ্রদ চোখে পড়ল। সবে ভোর হয়েছে। উড়ে চলেছে বকের পাঁতি। আবার ঝাঁক বেঁধেছে নীলকণ্ঠের দল। পাখি দেখে মা ছোট বালিকার মত উছলে উঠলেন খুশিতে। নীলকণ্ঠ পাখি দেখে প্রণাম করলেন যুক্তকরে।

বহরমপুর হয়ে মাদ্রাজ হয়ে এলেন মাদুরা। মাদুরায় 'সুন্দর' নামে শিব ও মীনাক্ষীর মন্দির। পাশেই শিবগঙ্গা নামে সরোবর। মা স্নান করলেন। স্ত্রীলোকেরা দীপ জেবলে রেখে যায় শিবগঙ্গার পারে। মাও দীপ জেবলে রেখে গেলেন।

চারদিকে সব দেবালয় দেখছেন, আর বলছেন, ঠাকুরের কী লীলা!

রামনাদের রাজা স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য। মন্দিরের কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছেন, আমার গুরুর গুরু পরম গুরু যাচ্ছেন, সব ব্যবস্থা করে দিও।

দুষ্পার জলধির উপর সেতু বেঁধেছেন রামচন্দ্র। লঙ্কা থেকে উদ্ধার পেয়ে অযোধ্যায় ফেরবার পথে স্বামীর কীর্তি দেখে বিস্ময় ও আনন্দে অভিলুপ্ত হলেন সীতা। ভাবলেন এ কীর্তি এখানে শাশ্বত করে রেখে যেতে হবে। এখানে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে শিবমূর্তি।

হনুমানকে বললেন, শিব নিয়ে এস।

জানকীর আদেশ, হনুমান তখুনি মহাবলভরে যাত্রা করল শূন্যপথে। সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে নানা জাতের শিব নিয়ে এল। কিন্তু আসল শিব, কাশীর বিশ্বনাথকেই আনেনি।

'করেছ কি ? আসল শিবই যে নেই।' বললেন সীতা, 'যাও কাশী থেকে বিশ্বনাথকে ধরে নিয়ে এস।'

হনুমান আবার ছুটল বায়ুবেগে। কখন যে গেল আর ফিরছে না। সীতা অস্থির হয়ে উঠলেন। অন্ন-পিণ্ড তৈরি করেছিলেন তাই ঢেলে দিলেন। দেখতে-দেখতে সেই পিণ্ড জমে-জমে পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠল, আর লিঙ্গের আকার নিলে। সীতা তার নাম রাখলেন রামেশ্বর।

এদিকে, কিছু পরেই ফিরেছে হনুমান। ফিরেছে কাশীর বিশ্বনাথকে সঙ্গে নিয়ে, একেবারে ল্যাজে বেঁধে। এসে দেখে, এই অবস্থা। আগে-ভাগেই শিব প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে।

স্বভাবতই, অভিমান হল হনুমানের। অভিমান ক্রমশ ক্রোধে পরিণত হল। সীতার ঐ অন্নপিণ্ডের শিব উৎপাটিত করবার জন্যে তার গায়ে ল্যাজ জড়াল। ল্যাজ দিয়ে টেনেই তাকে সমূলে উপড়ে ফেলবে। বলপ্রয়োগ করবামাত্র উলটো ফল

হল। শিবের জায়গায় শিব রইল অচল হয়ে, হনুমান ছিটকে পড়ল এক মাইল দূরে, রামশ্বরকায়।

ভক্তবৎসল রাম হতাভিমান হনুমানকে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, তোমার আনা শিবও ফেলা হবে না। হনুমান তখন উঠে বসল। আর ভক্তের মান বাড়াবার জন্যে বললেন, আগে হনুমানের শিবের পূজা হবে, পরে রামেশ্বরের।

ভগবান চিরকালই ভক্তের কাছে হেরেছেন। প্রহ্লাদের কাছে যেমন হেরেছিলেন। হিরণ্যকশিপুর হাত দিয়ে কত মারই না মারলেন তাকে, তবু সে টলল না। শেষে স্তম্ভ বিদীর্ণ করে বেরুতে হল। তারপর যখন বর দিতে চাইলেন, তখন আবার তাঁকে হারাল প্রহ্লাদ, বললে, এ তোমার কেমন কথা ? আমি কি বণিক ? আমি কি তোমাকে নিয়ে ব্যবসা করতে বসেছি ?

শশী মহারাজ পুজোর ব্যবস্থা সব করে রেখেছে। গড়িয়ে রেখেছে একশো আটটি সোনার বেলপাতা। বালুকাময় পাষাণের মূর্তি রামেশ্বর কুণ্ডের মধ্যে আছেন। আধ হাতটাক শুধু উঁচুতে, তাও সোনার মুকুটে ঢাকা। মুকুট সরানো হয় সকালবেলা, গঙ্গাজলে স্নান করাবার সময়। গঙ্গাজলের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন অহল্যাবাঈ। তুমি-আমিও গঙ্গাজল ঢালতে পারি শিবের মাথায়, তার জন্যে মন্দিরের অফিসে ফি জমা দিয়ে ছাড়-পত্র আদায় করতে হয়। তবে মা'র জন্যে অন্য কথা। মা হচ্ছেন গুরুর গুরু পরমগুরু।

মা মন্দিরে ঢুকে বসলেন কুণ্ডের পাশে। মুকুট সরিয়ে গঙ্গোত্রীর জল ঢালা হবে, মা বলে উঠলেন অস্ফুটস্বরে, আপন মনে : 'তোমাকে যে ভাবে রেখে গিয়েছিলাম তুমি দেখছি সেই ভাবেই আছ—'

কথাটা বুঝি কানে ঢুকল গোলাপ-মা'র। সমস্ত গা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। উৎসুক হয়ে ঝুঁকে পড়ে জিগগেস করলে, 'কি বললে, মা ?'

আর কী বলে। নিজেরও অলক্ষ্যে কখন বেরিয়ে পড়েছে মুখ থেকে। আর কি দ্বিরুক্তি করেন।

সেই ত্রেতার সীতা নবরূপ ধরেছেন কলিতে। কলিকলুষহরা সেজেছেন। ঠাকুরের যখন সীতাদর্শন হয়েছিল, দেখেছিলেন তাঁর হাতের বালা ডায়মনকাটা। তেমনি গড়িয়ে দিয়েছিলেন সারদাকে। বলেছিলেন, 'ও রূপ ঢেকে এসেছে। কিন্তু সাজতে গুজতে ভালোবাসে।'

হায় সাজ, আমার সাজ দিয়ে কী হবে ? আমি আছি আভরণহীনতায়, অভিমান-হীনতায়। আগে ঘরের মেঝেতে শুতেন, এখন ভক্তেরা পালঙ্কে এনে শোয়াচ্ছে। 'কই আমি তো কোনো তফাত বুঝি না।' তফাত কি জিনিসে ? তফাত মনে। আসলে, ঘুমের মতন বিছানা নেই, খিদের মতন তরকারী নেই। যদি আমার অভাববোধেরই অভাব হয় তবে আমার কিসের দৈন্য ? যদি শত দুঃখেও আমি দুঃখ না পাই তবে দুঃখ নিজেই দুঃখিত হয়ে চলে যাবে।

মনের প্রসন্নতাই বিষ্ণুর পরম পদ। আমার মধ্যে যখনই জাগবে প্রসন্নতা তখনই জানবে আমি পরমপদলীনা। কিসের অভাব আমার ? ভূমিতল থাকতে শয্যার কি দরকার ? কি হবে উপাধানে, আমার বাহুই তো স্বাভাবিক উপাধান। যখন অঞ্জলি

আছে তখন কি হবে ভোজনপাত্রে? বৃক্ষ কি আর ভিক্ষা দেয় না? সরোবর কি শুকিয়ে গেছে? পাহাড়ের গুহা কি রুদ্ধ? আর, ভগবান শ্রীহরি কি শরণাগতকে রক্ষা করা ছেড়ে দিয়েছেন? তা যদি না হয় আমার তবে কিসের অপ্রতুল?

মন্দিরের মণিকোঠা মা'র জন্যে খুলে দিল একদিন। সামান্য একটি দীপ জ্বলছে, তারই ক্ষীণ আলোকে ঝকঝক করছে সমস্ত ঘরখানি।

রামনাদের দেওয়ান বললেন, যদি কোনো অলঙ্কার আপনার পছন্দ হয়, নিতে পারেন অনায়াসে।

আমার কী হবে অলঙ্কারে? আমার হাতে যে হোগলাপাকের বালা আছে, যা ঠাকুর হাত চেপে ধরে খুলতে দেননি, এই তো আমার চরম অলঙ্কার। অলঙ্কার আমার শুচিতা, নির্মলতা, সরলতা। ত্যাগ, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা। সুখে দুঃখে ঔদাসীন্য, ক্লান্তিহীন কর্ম, সর্বজীবে সমপ্রেম। দয়া ক্ষমা ব্রত নিষ্ঠা সত্য আর সাম্য। অলঙ্কারের চূড়ামণি হচ্ছে সন্তোষ। যদৃচ্ছালাভ।

কিন্তু রাধুর প্রতি বড় মায়া। বললেন, 'আচ্ছা, রাধুর যদি কিছু দরকার হয়, নেবে এখন।' বলে রাধুর দিকে ঝুঁকে এলেন। 'দ্যাখ, তোর যদি কিছু দরকার হয় নিতে পারিস।'

কি সর্বনাশ! এ যে সব হীরে-জহরৎ ঝলমল করছে। মা'র বুক দুর-দুর করতে লাগল। রাধু যদি তেমন কিছু একটা চেয়ে বসে! ঠাকুরের কাছে কাতরমনে প্রার্থনা করতে লাগলেন, 'ঠাকুর, রাধুর মনে যেন কোনো আকাঙ্ক্ষা না জাগে।'

রাধুও তেমনি মেয়ে, বললে, 'এ সব আবার কী নেব? আমার পেন্সিলটা হারিয়ে গেছে, আমাকে একটা পেন্সিল কিনে দাও।'

মা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। রাস্তায় বেরিয়ে একটা পেন্সিল কিনিয়ে দিলেন রাধুকে। যত তীর্থ করে আসুন মা'র কাছেও জননী-জন্মভূমি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ তীর্থ।

জয়রামবাটি থেকে কলকাতা যাচ্ছেন মা, তাঁর খুড়ি বললেন, 'সারদা, আবার এস।' মা বললেন, 'আসবো বৈ কি।' ঘরের মেঝেয় হাত দিয়ে বার-বার সেই হাত মাথায় ঠেকাতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'

* বত্রিশ *

সূর্য থাকে আকাশে, আর জল থাকে মাটিতে। উপরে সূর্য নিচে জল। জলকে কি ডেকে বলতে হয়, ওগো সূর্য আমাকে তুমি টেনে তুলে নাও উপরে? সূর্য নিজের স্বভাব থেকেই টেনে নেয়। নিজের স্বভাব থেকেই জলকে বাষ্প করে টেনে নেয়। তেমনি আমি সকলের মা। সকলকে স্বভাব-বলেই টেনে নেব। তোমাদের কাউকে কিছু করতে হবে না।

কত অযোগ্য লোক আসে। দুনিয়ায় না করেছে এমন কাজ নেই, তারাও। যা প্রাপ্য নয় তারও বেশি আদায় করে নিয়ে যায়। শুধু মা বলে ডেকে। শুধু মা

বলে আমাকে ভুলিয়ে দিয়ে। কেউ পায়ে হাত দেয় প্রাণটা ঠান্ডা হয়। আবার কেউ যেন হাতে বোলতা নিয়ে আসে। পায়ে হাত রাখা মাত্রই বোলতা দংশন করে।

'ভালো ছেলের মা তো সকলেই হতে পারে, মন্দটিকে কে নেয় ?' বললেন মা, 'আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তা মার্জনা করে নিতে হবে।'

আমার অঞ্চল বিস্তীর্ণ কেন ? আবর্জনাকে মার্জনা করবার জন্যে।

'যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারি না, চালান দিচ্ছি মা'র কাছে।' বললেন প্রেমানন্দ : 'সকলকেই মা কোলে তুলে নিচ্ছেন। অনন্ত শক্তি, অপার করুণা। সকলকে স্থান দিচ্ছেন সকলের দ্রব্য খাচ্ছেন আর সব বেমালুম হজম হয়ে যাচ্ছে।'

'আমরা না নিলে নেবে কে ?' বললেন মা, 'আমরাই তো পাপ-তাপ হজম করতে পারি। সেই জন্যেই তো এসেছি আমরা।'

খোকা-মহারাজ আর বাবুরাম-মহারাজ খাচ্ছে পাশাপাশি বসে। একটা বেড়াল অতিলোভে মুখ বাড়িয়েছে খোকা-মহারাজের পাতে। খোকা-মহারাজ এক চড় বসিয়ে দিলে।

'মারলি ?' বাবুরাম আঁৎকে উঠল : 'করলি কি ? মা'র বাড়িতে কোন দেবদেবী কি বেশে আছে ঠিক কি।'

খোকা-মহারাজ তো অপ্রস্তুত। ভয়ে মুখ পাংশু হয়ে গেল।

মা সব শুনেছেন। খোকার ম্লান মুখও দেখলেন বোধহয়। বললেন, 'বেড়ালটাকে মেরেছে, বেশ করেছে। বড় দুষ্টু হয়েছে ও আজকাল।'

সামনাসামনি মারও ভালো, কিন্তু কারু নিন্দা কোরো না, ঠাকুর বলেছেন, পিঁপড়েটিরও না। 'খোসা আর চাল, নিন্দা হল খোসা। আমার নরেনকেই লোকে কত নিন্দা করেছে। লোকে কাপড় ময়লা করে, ধোপা সেই কাপড় সাফ করে দেয়। লোকে খারাপ কাজ করে, আর যারা সেই কাজের চর্চা করে তারাই তাদের পাপের ভাগী হয়। কোথায় সাফ করবে, তা না, নিজেরাই কালো হয়ে যায়।'

এ তো হচ্ছে পিছনে থেকে নিন্দা, মুখের উপরও কারু মনে দুঃখ দিয়ে কথা বোলো না ! ঠাকুর বলতেন, 'একজন খোঁড়াকে যদি বলতে হয় তুমি খোঁড়া হলে কি করে, তাহলে বলা উচিত, তোমার পা-টি অমন মোড়া হল কি করে ?'

ঠাকুর বললেন, উপোস করবে না। উপোস করলে মন সর্বক্ষণ পেটের দিকে পড়ে থাকবে, ভগবানের দিকে যাবে না। আর মা বললেন, ভোগ দেবার আগে চেখে দেখবে।

দুটিই সরলতার কথা। অনুরাগের কথা। বৈধী ভক্তিকে নস্যাৎ করলেন দুজনে। সমস্বরে বললেন, বৈধী ভক্তি ভক্তিই নয়। ভক্তি হচ্ছে কিছু-না-মানা কিছু-না-জানা ভালোবাসা। অনিমিত্তা, অহেতুকী।

একটি ছেলে মাকে সরবত করে দিচ্ছে। বললে, 'আমি তো আপনার সরবত চেখে দেখেছি।'

'ঠিক করেছ। ভালোবাসার পাত্রকে ঐ ভাবেই দিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণকে ফল খেতে দেবার আগে চেখে দিত রাখালেরা।'

শ্রীকৃষ্ণকে রুক্মিণী চামর দিয়ে বীজন করছে। তুমি আমাকে বরণ করলে কেন ?

জিগগেস করলেন শ্রীকৃষ্ণ। কত মহাবলী রাজা তোমাকে প্রার্থনা করেছিল, তোমাকে সংকল্পিতা করে দিয়েছিল তোমার বাপ-ভাই। তবু আমাকে তুমি পছন্দ করলে কি দেখে? আমি জরাসন্ধের ভয়ে সমুদ্রোশ্রিত। আমি অকিঞ্চন, শুধু নিষ্কিঞ্চনেরই প্রিয়। আমি স্ত্রী-পুত্রের অভিলাষী নই, দেহে ও গেহে আমি উদাসীন, আত্মলাভে তুষ্ট আর গৃহ-দীপের মত অক্রিয়। হে সুমধ্যমে, আমি তোমার উপযুক্ত নই। অধম আর উত্তমের মৈত্রী প্রশস্ত নয়। তুমি আর কাউকে ভজনা করো যাতে তোমার ইহ-পর দু কালই সার্থক হবে, ফলান্বিত হবে।

রুক্মিণী জানত সে-ই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা। এই দারুণ বাক্যে তার সমস্ত গর্ব ধূলিসাৎ হল। হাত থেকে খসে পড়ল পাখা, অধোমুখে পদাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে হর্ম্যতল বিলেখন করতে লাগল। আর সহ্য করতে পারল না, মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

পরিহাস বুঝতে পারেনি রুক্মিণী। শ্রীকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি তাকে ভুজবন্ধনে তুলে নিলেন। বললেন, 'বৈদর্ভি, তোমার কোপকুটিল বিপাণ্ডুর মুখখানি দেখবার জন্যেই ঐ কথা বলেছিলাম। তুমি যে পরিহাস বুঝবে না তা কে জানত! তুমি তো জানো ঘরে ফিরে এসে প্রিয়ার সঙ্গে নর্মলীলায় কিছুক্ষণ কালহরণ করা গৃহস্থের পরম লাভ।'

আশ্বস্ত হল রুক্মিণী, কিন্তু উত্তর দিল। সেই উক্তিটিই হচ্ছে রাগানুগা ভক্তির চিত্রলেখা!

বললে, 'আপনি যে অসন মৈত্রীব কথা বললেন তা ঠিক। কোথায় আপনি ত্রিগুণাধীশ্বর আর কোথায় আমি গুণাশ্রয়া প্রকৃতি! আপনি শত্রুভয়ে সমুদ্রে শরণ নিয়েছেন তার মানে আপনি বহির্মুখ ইন্দ্রিয়ের থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে অন্তর্হৃদয়ে অচলরূপে বিরাজ করছেন। আপনি নিষ্কিঞ্চন সন্দেহ কি, কিন্তু তা আপনি নির্ধন বলে নয়, আপনি ছাড়া আর অন্য কিছু নেই সেই কারণে। অন্য কোন পুরুষের ভজনা করব? যে একবার আপনার পাদপদ্মের ঘ্রাণ পেয়েছে সে কোন জীবন্ত শবের ভজনা করবে? আপনি উদাসীন যেহেতু আপনি নিরপেক্ষ। তবুও আপনার প্রতি আমার অনুরাগ স্থির। আপনার কৃপাকম্পিত দৃষ্টিপাতই আমার সর্ব আকাঙ্ক্ষার উপশম।'

'অনঘে, আমার প্রতি তোমার অনুরাগ কামশূন্য।' শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে অভিনন্দন করলেন, 'তুমি মায়ামুগ্ধ মন্দভাগ্য নও, তুমি ব্রত-তপস্যার বিনিময়ে বিষয়কামনা করোনি। তুমি উদারকীর্তি তপস্বিনী।'

মা'র প্রেম যেন আরো গাঢ়, আরো পরিপক্ব, আরো শুদ্ধ-শুচি।

'মা, তুমি ঠাকুরকে কি ভাবে দেখ?'

পরিপূর্ণ সমর্পণের সঙ্গে বললেন মা, 'সন্তানের মত দেখি।'

ভক্ত যখন সত্যি-সত্যি শরণাগত তখন সে মা'র কোলে নবজাত শিশু। তার মুখে কান্না ছাড়া ভাষা নেই, আর তার সমস্ত কান্না মা'র জন্যে। যখনই তার মুখে কথা ফুটবে তখন থেকেই সে অভিযোগ করতে শুরু করবে। জানতে চাইবে অথচ মানতে চাইবে না। এখন, তার এই নির্ভাষ-নির্বাক অবস্থায় তার কিছু জানাও নেই

মালাও নেই। তাকে রাখতে চাও তো রাখো, ফেলতে চাও তো ফেল। সে এখন সম্পূর্ণ পরনির্ভর, সর্বতোভাবে সমর্পিত। তার কিছু বলবার নেই কইবার নেই জানবার নেই বোঝবার নেই। আছে শুধু একটি কান্না। এই তার একমাত্র মন্ত্র, মাতৃমন্ত্র।

তুমি অগ্নিরূপে মা, হবিরূপে মা। হোতাও তুমি, অর্পণও তুমি। ভোগেও তুমি অপবর্গেও তুমি। বন্ধনেও তুমি মোচনেও তুমি। সংসারেও তুমি সন্ন্যাসেও তুমি। 'প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্বস্য।'

হলেই বা তুমি চীরবাসা রুক্ষকেশী ভিখারিনী। রোগশীর্ণা রূপহীনা। তবু তুমি আমার মা। যে মুহূর্তে মা বলে তোমার পায়ে নিজেকে অঞ্জলি দেব সেই মুহূর্তেই তুমি রাজ্যেশ্বরী মূর্তিতে সমারূঢ় হবে। তুমি 'পরাপরাণাং পরমা।'

'ঠাকুরের আবির্ভাবের থেকে সত্যযুগ আরম্ভ হয়ে গেছে।' বললেন মা। 'ঠাকুর বলেছেন, আমি ছাঁচ করে গেলুম, তোরা সব ছাঁচে ঢেলে তুলে নে।'

ছাঁচে ঢালা মানে ধ্যান চিন্তা করা। অভ্যাসযোগে ঠাকুরের ভাবকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করা। তাঁকে ভাবো তা হলেই তাঁর ভাব আসবে।

তা কি পারব? তাঁর ভাব কি ধরতে পারব এই ভগ্ন দেহে, রুগ্ন জীবনে? মাগো, আরো সহজ করে দাও।

করুণাময়ী সহজ করে দিলেন।

দীক্ষার পর এক ছেলে জিগ্গেস করল মাকে, 'কতবার জপ করব?'

মা বললেন, 'তোমরা সংসারী তোমরা বেশি করতে পারবে না, একশো আট বার করলেই হবে।'

মোটে? ভক্ত যেন আরো বেশি আশা করেছিল।

মা বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, আমার কাছে ওরকম বোলো না। বেশি পারবে না বলেই তো একশো আট দিয়েছি, এখন দেখ, এই একশো আটই বা হয় কিনা।'

'মা, আমার?' আরেকজন এল এগিয়ে।

'তোমার দ্বাদশ বার।'

একজন এল, তার হাতে বাত। আঙুল নাড়তে পারে না।

'তোমার তো বাবা করজপ হবে না। পঁচিশটে রুদ্রাক্ষ দিয়ে মালা করিয়ে নিও। দিনে শুধু একবার স্পর্শ করে জপ করবে। আর—আর ঠাকুরকে ভক্তি করবে।'

'আমার?'

'তোমার শুধু স্মরণ-মনন!'

'মা, আমি তো কিছুই করতে পারি না।' বললে এসে আরেক ছেলে। 'আমার কী হবে।'

'তুমি কী করবে? তুমি কী করতে পারো? তোমার জন্যে আমিই সব করছি।'

আমি তোমার মা, শুধু এইটুকু জেনে থাকো। তুমি অনাথ অনাশ্রয় নও, মা তোমার সব দেখছেন-শুনছেন রাখো শুধু এইটুকু নির্ভরতা। তোমার যে প্রাণ আছে, জেনো সেই তোমার মা। যদি পরের কাছে কৃপা না চেয়ে নিজের কাছে কৃপা চাও,

সেই আত্মরূপাই জেনো মা'র রূপা। জগন্ময় সমস্ত পদার্থই মা'র প্রাণমূর্তি, মাকে দাও, তোমার প্রার্ণভিক্ষা। তোমার সমস্ত আর্তির অবসান হবে। তোমার মা-ই আর্তিহন্ত্রী পরমা।

শুধু ধরে থাকো, লেগে থাকো, ছেড়ে দিও না। তোমার মাকে ছেড়ে দিও না।

সেই পতুর কথা মনে আছে? সেই পতু আর মণীন্দ্র? দশ-এগারো বছরের দুটি ছেলে। যেন শ্রীদাম-সুদাম। কাশীপুরের বাগানে, আসে ঠাকুরের কাছে। বলে, তোমার সেবা করব।

দোলের দিন সব বাইরে গেছে রঙ খেলতে। ওরা গেল না। ঠাকুরের তখন কাশি, মাথায় বড় যন্ত্রণা। তাই হাওয়া করতে হতো মাথায়। দুটি ছেলে একের পর এক হাওয়া করতে লাগল। একবার এর হাত ব্যথা হয় তো ও, ওর হাত ব্যথা হয় তো এ।

ঠাকুর বলছেন, 'যা-যা তোরা নিচে যা, আবির খেলগে যা।'

পতু বললে, 'না মশাই, আমরা যাব না।'

মণীন্দ্র বললে, 'আমরা এইখানে আছি। এইখানেই থাকব।'

পতু আবার বললে, 'আপনি এখানে রয়েছেন আমরা কি ফেলে যেতে পারি আপনাকে?'

শোনো কথা! দশ-এগারো বছরের ছেলে, কোথায় রঙ খেলে স্ফূর্তি করবে, তা না, ঠাকুরকে আঁকড়ে আছে। ঠাকুরকে সেবা করাই তাদের ফাগ-রাগ, তাদের মাধবোৎসব। কিছুতেই গেল না। শত সাধাসাধিতেও না।

তখন ঠাকুর কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'ওরে, এরাই আমার সেই রামলালা। আমার কে ওরা, তবু আমার সেবা করতে এসেছে। ছেলেমানুষ, তবু আমোদ-আহ্লাদের দিকে মন নেই। আমাকে ফেলে কিছুতেই যাবে না খেলাধুলোয়।' জল পড়তে লাগল চোখ বেয়ে।

এরকম ভাবে পারবে ধরে থাকতে? ঈশ্বরসেবায় লেগে আছ, সংসার ডাকছে তোমাকে তার ক্ষণবসন্তের উৎসবে, আবিরকুঙ্কুম যেখানে অবসিত হবে পঙ্ককর্দমে —সাড়া দিচ্ছ না কিছুতেই—পারবে সেই সাধনা?

তার চেয়ে, সামান্য মানুষ, সহজে চলে এস। ভগবানের মন্ত্র জপ করো। একশো আটবার না পারো দ্বাদশবার করো। দ্বাদশবার নয় তো একবার। একবারও না পারো তাঁতে লেগে থাক, ডুবে থাকো।

'আঙুল দিয়েছেন কেন?' বললেন মা, 'আঙুল দিয়েছেন মন্ত্র জপ করে এর সার্থকতা করতে।'

আর যে ছেলে পারে, যে ছেলে পুকুরপাড়ে বসতে জানে ছিপ ফেলে, সে কত সংখ্যা জপ করবে?

মা বললেন, দশ হাজার, বিশ হাজার—এক লক্ষ। যতক্ষণ না মনের ময়লা কাটে। যখনই সময় পাও তখুনি। শুধু মন্ত্রজপ। শুধু গভীরগুঞ্জন।

মা যত ঠাকুরকে ধরিয়ে দিতে চান, সবাই এসে মাকে ধরে। বলে, 'মা, আমরা তো ঠাকুরকে দেখিনি, আমরা আপনাকে জানি, আপনাকে দেখেছি।'

আমার সেই গুরুর মতন হবে আর কি। এক শিষ্য গুরুনামে বিশ্বাস করে

'জয় গুরু' বলে নদী পার হয়ে গেল চোখের সামনে। গুরু ভাবলেন, আমার নামের এত জোর! তখন তিনি 'আমি' 'আমি' বলতে-বলতে পেরুতে গেলেন নদী। সিধে ডুবে মরলেন। তোমরা কি আমাকে তেমনি ডুবে মরতে বলো?

কিন্তু, আমরা, যারা মাকেও দেখেনি? আমাদের কী হবে? আমরা কাকে ধরব?

মা হাসছেন। দেখনি নাকি? তবে কী দেখছ তোমার চারদিকে? অন্ধকার? নৈরাশ্য? নিষ্ফলতা? মা, যখন তোমার হাসিটুকু দেখতে পাচ্ছি তখন কার নাম বা অন্ধকার, কার নাম বা নৈরাশ্য! আর নিষ্ফলতা তো তখন ফলসিন্ধি।

কুন্তীর প্রার্থনা মনে করো। হে গোবিন্দ, তুমি বার-বার আমাকে ও আমার পুত্রদের বহু বিপদ থেকে উদ্ধার করেছ। তবু, প্রভু, নিয়ত আমাকে বিপদই তুমি দাও যাতে নিয়তই তোমার দর্শন পাই। যে দর্শন পেলে 'অপুনর্ভবদর্শনম্'—আর সংসারদর্শন হবে না।

* তেত্রিশ *

শেফালিকা গাছের তলায় একটি শাদা চাদর বিছিয়ে রাখে। শেষ রাতের দিকে টুপ-টুপ করে ঝরে পড়া শুরু হয়। যে ছেলেটি এমনি করে ফুল কুড়োয়, তার নামও সারদা—উত্তরকালে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। ফুল কুড়িয়ে মাকে পুজো করে।

ছেলে-সারদার সঙ্গে মা-সারদা চলেছেন জয়রামবাটিতে, বর্ধমান হয়ে। দামোদর পেরিয়ে পালকি মিলল না, অগত্যা গরুর গাড়ি। মা গাড়িতে আর ছেলে লাঠি-কাঁধে গাড়ির আগে-আগে। রাত প্রায় তিন প্রহর, মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। হঠাৎ ছেলে দেখতে পেল, বানের জলে রাস্তায় ফাট ধরেছে। আর এ সামান্য ফাটল নয়, দিব্যি একটি খানা। সাধ্য নেই যে গাড়ি যায়। গাড়ির চাকা তো বসে ভেঙে পড়বেই, মা'রও আহত হবার সম্ভাবনা। আর গাড়ি যদি থামিয়ে রাখা হয়, তা হলেও তাল কেটে যাবার দরুন মা'র ঘুম ভেঙে যাবে। এখন উপায়? গাড়িও থামবে না মাও জাগবেন না—কি এর সমাধান? ছেলে-সারদা সে খানার উপরে উপুড় হয়ে পড়ল, গাড়োয়ানকে বললে, আমার পিঠের উপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাও।

গাড়োয়ানের দ্বিধা কাটবার আগেই মা জেগে উঠলেন। চাঁদের আলোয় পলকের মধ্যেই বুঝে নিলেন ব্যাপারটা। চীৎকার করে গাড়ি থামাতে বললেন গাড়োয়ানকে। গাড়ি থামতেই নেমে পড়লেন। ছেলে-সারদাকে উঠে আসতে বললেন, খানা থেকে। 'তুমি কি মরবে আমার জন্যে? তারপর, তুমি না থাকলে এই রাত্রে এই নির্জন জায়গায় আমাকে কে দেখত?' মধুর মমতায় ভর্ৎসনা করলেন: 'তোমার কী বুদ্ধি!'

মা হেঁটে পার হলেন খানা। ছেলে-সারদা আর গাড়োয়ান ঠেলাঠেলি করে খালি গাড়ি পার করে দিলে।

একটি ভক্ত-মেয়ে স্বপ্ন দেখেছে মাকে লালপেড়ে শাড়ি দিতে হবে। মা'র জন্যে কিনে এনেছে শাড়ি। স্বপ্নের কথা বললে সে মেয়ে। মা হেসে হাতে করে নিলেন

কাপড়খানি ও মেয়েকে খুশি করবার জন্যে পরলেন। অল্পক্ষণ পরে ফের ছেড়ে ফেললেন। বললেন, 'কি করে পরে থাকি মা! লোকে বলবে পরমহংসের স্ত্রী লাল পেড়ে কাপড় পরেছে।'

তবু মেয়ের মুখ ম্লান দেখে, আরো কদিন পরেছিলেন। পরে নাইতে যেতেন গঙ্গায়। শেষে দিয়ে দিলেন একজনকে।

এক মহাষ্টমীর দিন বহু মেয়ে মাকে পুজো করছে। প্রায় সকলেই নববস্ত্র দিচ্ছে মাকে। মা'র গায়ে জড়িয়ে দিচ্ছে কাপড়খানা, যেমন কালীকে দেয় কালীঘাটে। সকলের পুজার শেষে আরেকটি মেয়ে এসেছে কাপড় নিয়ে। সকলে কত ভালো কাপড়, দামী কাপড় দিয়েছে, আর এর কাপড়খানা নিরেস। একটু-বা কুণ্ঠিত হয়ে আছে মেয়ে, গরিব মেয়ে। পুজা-অন্তে কাপড়খানি মায়ের গায়ে দিতে যেতেই মা খুশি হয়ে বলে উঠলেন, সুন্দর পাড়টি তো! এই শাড়ি আমি আজ পরব। একখানি তো পরতেই হবে আজ। মেয়েটির দারিদ্র্যলজ্জা হরণ করলেন মা। দারিদ্র্যকে ঐশ্বর্যবান করলেন চিত্তের সন্তুষ্টিতে। সন্তুষ্ট লোকের যে সুখ লোভধাবিত লোকের সে সুখ কোথায়? ঈশ্বরের কাছে দীন হও, তা হলে মানুষের কাছে আর দরিদ্র থাকবে না।

'মা গো, প্রারব্ধের কি ক্ষয় নেই?' আকুল হয়ে প্রশ্ন করল এক ভক্ত: 'ভগবানের নাম করলেও কি হবে না ক্ষয়?'

যা করে এসেছ তার ফল ভোগ করাই প্রারব্ধ। যেমন টিকিটটি কেটে এসেছ তেমনি তোমার আসন। প্রারব্ধের ভোগ না ভুগে তাই উপায় নেই। কিন্তু একেবারে কি জয় করা যায় না প্রাক্তনকে? যায়। সেই জয়ের পথটিই হচ্ছে তপস্যা। প্রাক্তন পুরুষকারকে বর্তমান পুরুষকার দিয়ে জয় করো। কি ভাবে, কোন তপস্যায়? কোন দুঃসাধ্য যোগসাধনে?

অরণ্যগহনে শশিকলাটির মত হাসলেন মা। বললেন, 'শুধু ভগবানের নাম করে। ধরো পূর্বজন্মের কর্মের দরুন, একজনের পা কেটে যাবার কথা। নামের গুণে সেখানে একটা কাঁটা ফুটে ভোগ হল।'

রাধু অসুস্থ, তার পাশে তার মা, 'পাগলী মামী', এসে বসেছে। রাধু বিরক্ত হচ্ছে, চায় না যে তার পাগলী-মা এসে বসে। 'সত্যিই তো, তুমি এখন যাও না'— মা তাকে সরিয়ে দেবার জন্যে তার গায়ে হাত দিলেন। তাড়াতাড়িতে হাত গা থেকে ফস্‌কে পাগলীর পায়ে লাগল। পাগলী তখন আর্তনাদ করে উঠল: 'কেন তুমি আমার পায়ে হাত ঠেকালে? আমার কী হবে গো?'

মা তো হেসে খুন। এদিকে এত গালাগালি করে, জ্বলন্ত চেলাকাঠ নিয়ে মারতে আসে, অথচ পায়ে হাত-লেগেছে বলে ভয়! বাইরে পাগল, অন্তরের গভীরে কোথায় স্থিরজ্ঞান।

তা পায়ে হাত লাগলে কি হয়? পা তো সৃষ্টিছাড়া কিছু নয়, এ সৃষ্টির ভিতরে পা দুটোও তো আছে। আসল হচ্ছে মন। হাত-পা চোখ-মুখ কিছু নয়। মন যদি বলে, তুমি অন্ধকারে, অদৃশ্যলোকেও তুমি। আর মন যদি বলে তুমি নও; শত স্পর্শ-ঘ্রাণ স্বাদ-গন্ধ সত্ত্বেও তুমি নিসাড়, তুমি নির্জীব।

ঈশ্বর, আমার মন রাখব তোমার পাদপদ্মে, বাক্যকে নিযুক্ত করব তোমার গুণকথনে, হাতকে তোমার মন্দিরমার্জনায়, কানকে তোমার সৎ-কথাশ্রবণে, চোখকে তোমার বিগ্রহ দর্শনে, স্পর্শকে তোমার ভক্তগাত্রসংগমে, ঘ্রাণকে তোমার পদকমলের সৌরভভোগে, পদদ্বয়কে তোমার তীর্থভ্রমণে, আর মাথাকে তোমার পদবন্দনায়। আর কোনো কাম্যবস্তুতে আমার আকাঙ্ক্ষা নেই। আমার সমস্ত কামনা তোমার দাস্যেই সহাস্য থাক। তোমার যারা ভক্ত তাদের প্রতি আমার রতিই তোমার প্রতি আমার একমাত্র আরতি।

এক দণ্ডী সন্ন্যাসী এসেছে মা'র কাছে। পশ্চিম ভারতের অধিবাসী, প্রকাণ্ড পণ্ডিত, শাস্ত্র-কাব্য সব মুখস্ত। দণ্ডীরা গুরু ছাড়া আর কারু কাছে প্রণত হয় না, নারী তো কোন ছার। আমি কেউকেটা নই, আমি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, আমি ভগবদ্‌-ভক্তিতে আরূঢ়—চেয়ে দেখ আমার দিকে—এই বিজ্ঞাপনের ধ্বজাই হচ্ছে তাব হাতের ঐ দণ্ড। লোকের মনে ভয় ও সম্ভ্রম উৎপাদনের উদ্যত অস্ত্র। দূরে রহো, নত হও আমার পদতলে, সর্বক্ষণ তাই যেন বলছে লাঠি ঠুকে।

কিন্তু আসল দণ্ডের অর্থ কি ? তাৎপর্য কি দণ্ডধারণের ?

'দণ্ডগ্রহণমাত্রেন নমো নারায়ণো ভবেৎ।' আমি কারু প্রতি দণ্ডবিধান করব না, সকলের দণ্ড আমি মাথা পেতে নেব, তারই সাক্ষীস্বরূপ এই দণ্ড। এই দণ্ডই আমার জাগ্রত, উদ্যত, প্রবুদ্ধ নারায়ণ। কারুর প্রতি দ্রোহ না করে মনোবাকদেহের দণ্ডসাধনেরই এ প্রতীক। শুধু ত্রিখণ্ড যষ্টি হাতে নিলেই ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী হয় না। ত্রিদণ্ড মানে শম দম আর ক্ষমা। ক্ষমাই হচ্ছে সর্বধর্মনমস্কৃত পরমধর্ম। আর শম-দম হচ্ছে তার নিত্য সখা।

মা'র পায়ের কাছে আভুমি প্রণত হয়ে লুটিয়ে পড়ল সন্ন্যাসী। অর্থাৎ সে তার দণ্ড ত্যাগ করলে—অভিমানের দণ্ড, অহংকারের দণ্ড, পাণ্ডিত্য-পিণ্ডের দণ্ড, ক্ষুদ্র সম্প্রদায়বুদ্ধির ধ্বজপট। মা সঙ্কুচিত হলেন। পা দুখানি সরিয়ে নিতে চাইলেন। বললেন, আপনি কেন প্রণাম করবেন ?

কে শোনে ! আহা, কী শান্তি, বৈভবের বোঝা কাঁধ থেকে ফেলে দিতে নামিয়ে দিতে এই গর্বের পর্বতভার। 'চলে গেলে জাগবি যবে, ধন-রতন বোঝা হবে।' তোমাকে চলে যেতে দেব না, তার আগেই সমস্ত সঞ্চয় ক্লান্তির বোঝা তোমার পায়ের তলায় নামিয়ে দেব। আহা কী শান্তি, নিজেকে এমনি সম্পূর্ণভাবে নামিয়ে নিয়ে আসা, নিজেকে নিপাত করে দেওয়া। তারই নাম তো প্রণাম, তারই নাম তো প্রণিপাত।

'সপ্তশতী' থেকে স্তোত্র পাঠ করতে লাগল সন্ন্যাসী।

বললে, 'মা, আশীর্বাদ দাও। শুধু ইহকালের নয়, পরকালেরও।'

একটি ভক্ত ছিল কাছে দাঁড়িয়ে। মা বললেন, 'সন্ন্যাসীকে ফল দাও।'

খুঁজে-পেতে তিনটি আম পেল ভক্ত। তাই উপহার দিল সন্ন্যাসীকে। আম তিনটি মাথায় ঠেকিয়ে ঝুলির মধ্যে পুরল সন্ন্যাসী। সমস্ত হৃদয় অমৃতরসে ভরে নিয়ে চলে গেল।

শূন্য হতে পেরেছিল বলেই পূর্ণ হতে পারল। প্রমাদ থেকে শূন্য করতে পারলেই পূর্ণ হবে প্রসাদে।

সন্ন্যাসী চলে গেলে ভক্তকে মা জিগগেস করলেন, 'আর ফল ছিল না?'

ভক্ত বললে, 'না।'

'দেখ আরো খুঁজে। পাবে।'

সত্যি, আরো একটি আছে। কোথায় লুকিয়ে ছিল বোধহয়, পাওয়া গেল।

মা বললেন, 'সন্নেসীকে দিয়ে এস।'

সন্ন্যাসী তখন রাস্তায় নেমে পড়েছে। ছুটে গিয়ে ভক্ত তার সংগ ধরল। বললে, 'মা আপনাকে আরো একটি আম পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'আরো একটি?' রাস্তার উপরেই সন্ন্যাসী উল্লাসে নৃত্য করে উঠল: 'মা'র কী অসীম করুণা! আমাকে তিনটি ফল দিয়েছিলেন—ধর্ম, অর্থ আর কাম—এখন চতুর্থ ফল, মোক্ষ পাঠিযে দিলেন। স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমস্তুতে—'

কিন্তু কেন মা এই চতুর্থ ফল মোক্ষ দিলেন তাকে, তা কি জানে সেই সন্ন্যাসী? কেন মা যোগক্ষেম বহন করে নিয়ে এলেন? ভক্তকে ছুটিয়ে পেঁাছিয়ে দিলেন রাস্তায়? কেন? কিসের জন্যে?

সন্ন্যাসী তার সেই অহঙ্কারের দণ্ড ত্যাগ করেছিল বলে। নিজেকে সম্যক নত ও নিপাতিত করতে পেরেছিল বলে। আদিভূতা সনাতনীর কাছে ভুলুণ্ঠিত হতে পেরেছিল বলে। যে মুহূর্তে অহঙ্কার থেকে বিমুক্ত হতে পারবে সেই মুহূর্তেই তুমি মোক্ষফলের অধিকারী হবে।

কিন্তু, আরো এক প্রশ্ন, কিসের আকর্ষণে সন্ন্যাসী পড়ল পায়ে লুটিয়ে? কিসের টানে মোচন করল দোর্দণ্ড অহঙ্কারের দণ্ড?

সেই সর্বশুক্লা সারদা, মূর্তিমতী সরলতার কাছে কে অহঙ্কারে স্তূপীভূত হয়ে বসে থাকবে? মা'র ডাক যে নির্ভূষণ হবার ডাক, নিরভিমান নিরভিযোগ হবার ডাক। শুধু আভরণ ছাড়লে হবে না, অভিযোগ ছাড়তে হবে। আর, আমাদের যত অভিযোগ সব এই আভরণের জন্যে।

অঞ্জলি শূন্য করে প্রসাদ নাও মা'র। ঠিক-ঠিক প্রণাম করতে পারলেই ঠিক-ঠিক প্রসাদ পাবে। একটি মেয়ে প্রসাদের জন্যে ডান হাত বাড়াল।

মা বললেন, 'ওরকম করে বুঝি প্রসাদ নেয়? দুই হাত পেতে অঞ্জলি করে প্রসাদ নাও। প্রসাদে আর হরিতে তফাত নেই। হরিকে পেলে কি এক হাতে ধরবে? না, দুহাতে ধরবে?'

অন্তরে দীনতা আনো। দুটি হাত অঞ্জলিবদ্ধ করতে গেলেই অন্তরে দীনতা আসবে। এক হাত নিজের এক্তিয়ারে রেখে আরেক হাত ঈশ্বরের দিকে বাড়িয়ে দিলে সম্পূর্ণ সমর্পণ হল না। দীনতা মানে হীনতা বা দুর্বলতা নয়। ভগবানের সর্বসমর্পণের যজ্ঞে পূর্ণ আহুতির নামই দীনতা। মা'র জন্যে আর্তনাদই দীনতা। সান্দ্রানন্দা মা। আর তাঁর জন্যে পরমামৃতায়মান আর্তনাদ।

'ঠাকুর নানান জনকে নানান ভাবে খেলাচ্ছেন, টাল সামলাতে হয় আমাকে।' মা বলছেন একদিন মেয়েদের, 'কিন্তু সব নিজের জিনিস, ফেলতে পারি না কাউকে—'

আমিই যে সামঞ্জস্যবিধায়িনী। আর, পরিণামপ্রদায়িনীও তো আমিই। 'দ্বিতীয়া কা মমাপরা।'

'আপনি যখন থাকবেন না তখন কী নিয়ে থাকব ?'

মা হাসলেন। বললেন, 'নাম নিয়ে থাকবে, জপ নিয়ে থাকবে।'

জপই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ স্বাধ্যায়। আর নামমন্ত্র হচ্ছে ভেলা। নাম তো করি, কিন্তু আনন্দ পাই কই ? বলো কি ? বেশ তো যদি আনন্দ না পাও, নামের কাছে প্রার্থনা করো। হে নাম, হে চিন্তামণি, আমার হৃদয়ে তোমার প্রসন্নাভা প্রকাশ করো।

'আর, বলে যাই আরেক কথা, বেশি জিগ্‌গেস কোরো না। যেটুকু পেয়েছ তাইতে ডুবে থাকো। সৎসঙ্গে থাকবে, অহঙ্কারকে মাথা তুলতে দেবে না, আর জীবনের সঙ্গিনী করে নেবে লজ্জা আর সরলতাকে—'

আরেক সাধু দেখেছিলাম কাশীতে, নাম চামেলী পুরী। গোলাপ জিগ্‌গেস করলে সাধুকে, 'কে খেতে দেয় ?' সাধু হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'এক দুর্গা মাঈ দেতী হ্যায়, অউর কোন দেতা ?'

বুড়ো সাধুর মুখটি মনে পড়ছে। একেবারে শিশুর মত মুখ। যদি নিরন্তর সৎভাবনায় নিমগ্ন থাকো, মুখে আসবে এই শিশুর লাবণ্য।

কৃষ্ণনাম হচ্ছে পারক, রামনাম হচ্ছে তারক।

দু' অক্ষর নামও যেন আমাদের কাছে কঠিন। দাও আমাদের একের মন্ত্র, একাক্ষর মন্ত্র। সেই মন্ত্র তুমি। তোমাকে ডাকলেই সেই মন্ত্রোচ্চারণ। ন্যাস-প্রাণায়াম বুঝি না, বুঝি না ভক্তি-মুক্তি, না বা ব্রত-তীর্থ, শুধু কাঁদতে পারলেই তোমার মন্ত্র বলা হল। সুখেও মা বলি দুঃখেও মা বলি, ভয়েও বলি জয়েও বলি। তুমি আমাদের সর্বভাবিনী সর্বব্যাপিনী মা।

জানিনা কণ্টকে আছি না কুসুমে আছি, কর্দমে আছি না কুঙ্কুমে আছি—আছি তোমার কোলের মধ্যে।

* চৌত্রিশ *

মা আরো সহজ করে দিলেন।

বললেন, 'কলিতে মনের পাপ পাপ নয়।'

আর কী চাই, আর কত অভয় চাও ? কটা আর কুকার্য করো, কুচিন্তাই পর্বত-প্রমাণ। চিতার আগুন নেভে, চিন্তার আগুন নেভে না। বনের নির্জনে গেলাম সেখানেও কুবাসনা উচ্ছিন্ন হয় না মন থেকে। এই তো পূর্বাপর দ্বন্দ্ব। কি করে সম্ভাবনা মনের মধ্যে রোপণ করব। কি করে তা অঙ্কুরিত, পল্লবিত, মুকুলিত, কুসুমিত, সফলীকৃত হবে ?

ঘর-বন দুই সমান হল, কুবাসনা রইল প্রচ্ছন্ন হয়ে। যদি ঈশ্বরকে না আনতে পারি নিমন্ত্রণ করে, তা হলে আমার ঘরও মরুভূমি, বনও মরুভূমি। বৈরাগী বনের মোহে ঈশ্বরকে দূরে রাখল, গৃহীও দূরে রাখল ঘরের মোহে। ঈশ্বরকে আনব কি করে, হৃদয়ে যে কামনা-কণ্টকের আবর্জনা, সেখানে যে ফেনিল তৃষ্ণার আবিলতা। যদি অমলাম্বুর সরোবরে শতদল না প্রস্ফুটিত করতে পারি শ্রীহরি এসে বসবেন কোথায় ?

শুভাননা মা অভয় দিলেন। বললেন, 'কিছু ভয় কোরো না। আমি বলছি—'

'আমি বলছি'—এইখানেই সমস্ত কথার জোর।

'আমি বলছি, কলিতে মনের পাপ পাপ নয়। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তোমার কোনো ভয় নেই।'

কুকার্য করার কত বাধা। প্রথমত অসাহস, দ্বিতীয়ত অপযশ। একমাত্র শত্রু হচ্ছে কুবাসনা। কিছুতেই পারছি না পরাস্ত করতে। কোথা চরণার্চনচিন্তা করব, তা নয়, পরের সর্বনাশের চিন্তা করছি। যা কামনা করবার নয় তাকেই আরতি করছি, যা স্বপ্নেরও অসিদ্ধ তাকেই বাস্তবরেখায় খুঁজে ফিরছি এখানে-সেখানে। এমন খেলোয়াড় তো নই যে ঢিল পড়লে তলোয়ারে লেগে ঠিকরে যাবে। আর কাঁহাতক লড়াই করব মনের সঙ্গে? এক বাসনা যায় তো আরেক বাসনা ভেসে ওঠে। এক ছায়া মেলায় তো দেখা দেয় আরেক অপচ্ছায়া। কী গতি হবে আমাদের।

'ও সব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না।' সর্বকল্যাণকারিণী মা বললেন, 'যদি ঈশ্বরে আশ্রয় নাও তিনিই রক্ষা করবেন। চিন্তা যখন কু বলে বুঝতে পারছ, তখন আর ভাবনা নেই। যে ভালো হতে চায় তাকে যদি ঈশ্বর রক্ষা না করেন তবে সে পাপ ঈশ্বরের।'

কেমন জগদীশ্বরীর মত কথা! মা যে পঞ্চাশৎবর্ণরূপিণী তাতে আর সন্দেহ কি। বললেন, 'আর কিছু নয়, তাঁকে ডাকো, নির্ভর করে থাকো তাঁর উপর। তিনি ভালো করতে হয় করুন, ডোবাতে হয় ডোবান।'

ভালো হতে চাও—ইচ্ছার এই শুক্লধর্মে, এই নৈর্মল্যশক্তিতেই তুমি জয়ী হবে। ইচ্ছাময়ই চলে আসবেন তোমার সাহায্যে।

সংগ্রামই তো সাধনা। জয়ী হবার ইচ্ছাই তো জয়মাল্য।

এক সন্তান এসে বললে মাকে সরলের মত। 'মা, মন বড় চঞ্চল। কিছুতেই ঠিক হয় না।'

অভয়দা বিজয়দা মা বললেন, 'কি এসে যায় চাঞ্চল্যে? ঝড় যেমন মেঘ উড়িয়ে নেয় তেমনি তাঁর নামে বিষয়মেঘও উড়ে যাবে।'

'কিন্তু মা, কাম কিছুতেই যায় না।'

সকল সন্তানের রোগব্যাধির খবর নেন মা। সেই সরলতার কাছে সকলে অবারিত।

প্রসন্ন গম্ভীর স্নেহে মা বললেন, 'কাম কি একেবারে যায় গা? দেহ থাকলেই কিছু না কিছু থাকে। তবে কি জানো?' মা আরো অন্তরঙ্গ হলেন, 'সাপের মাথায় ধুলোপড়া পড়লে যেমনটি হয় তেমনটি হয়ে যাবে।'

কাম না থাকলে যে ঈশ্বরকামনাও থাকবে না। কাম না থাকলে অকাম হবে কি করে? ক্ষুধা না থাকলে অমৃতভোজের আনন্দ পাবে কি করে? ধুলো না থাকলে সূর্য কি করে প্রতিভাত হয়? থাক না পঙ্ক, পঙ্কের মধ্য থেকে ফোটাও পঙ্কজকে। থাক না কণ্টক, কণ্টকে বিদ্ধ করে ফোটাও আরক্ত গোলাপ।

কামকে প্রেম করো। 'ম' ঠিকই আছে, 'কা'-কে 'প্রে' করো। আমি-কে তুমি করো। 'মি' ঠিকই আছে, 'আ'-কে 'তু' করো। জীবকে শিব করো। 'ব' ঠিকই

আছে, 'জী'-কে 'শি' করো। অর্থাৎ তুমি বা ভিত্তি ঠিকই আছে, নতুন করে সৌধ নির্মাণ করো। সংসারের সঙ, মানে ছলনা বা তামাশাকে ফেলে দিয়ে সারটুকু নাও। যেমন হাঁস জল ফেলে দুধ নেয়। পিঁপড়ে বালি ফেলে চিনি নেয়। আর, সারটুকু দান করি বলেই তো আমি সারদা।

আর কিছু নাম মনে না পড়ে, আমাকে ডাকো। মাকে ডাকো। বলো যে মা সে-ই সন্তান, যে সন্তান সে-ই মা। বলো, মা-ই বন্ধন, মা-ই মুক্তি। যা এখন ভাবছ বন্ধন, দেখবে সে-ই বন্ধনমুক্তির উপায়। বলো, আনন্দ মা, কাতরতা মা; যন্ত্রণা মা, সুস্থতা মা; জ্ঞান মা, অজ্ঞান মা; জীবন মা, মৃত্যু মা। জীবন-মৃত্যু শিব-শক্তি। হরগৌরী। রামসীতা। রাধাকৃষ্ণ।

তবে আর ভয় কি, কুণ্ঠা কিসের? আমাদের মা আছেন।

রাত তিনটের সময় ওঠেন। ভোরের প্রথম আলোটি ফুটে উঠতেই ছবিতে দেখেন ঠাকুরের মুখ। তাঁর সমস্ত আরম্ভের স্থিরভূমি। বিছানায় বসে-বসে ছটা পর্যন্ত মালা ফেরান, জপ করেন। পরে ঠাকুরকে প্রণাম করে বলেন, ওঠো। তারপরে, জয়রামবাটিতে হলে, ঘর ঝাঁট দেন, কাপড় কাচেন, বসেন তরকারি কুটতে। তরকারি কুটতে-কুটতে কত কথা, কত গল্প, কত স্নেহবরিষণ। যতদিন শরীর সুস্থ ছিল, বাসন মেজেছেন, জল টেনেছেন, ধান কুটেছেন। পুজোর ফুল তোলা বা ফল কাটা বরাবর রেখেছেন নিজের হাতে। একশোটি করে পান সাজেন রোজ। আটটা থেকে নটার মধ্যে পুজো করেন। পরে ভক্তসন্তান কেউ এলে দীক্ষা দেন। দীক্ষান্তে খান একটু মিছরির পানা। তারপরে রান্নাঘরে ঢুকে বামুনকে রেহাই দেন।

ঠাকুরের দুপুরে যা ভোগ হবে রাঁধেন নিজের হাতে। ঠাকুর বলেছেন, 'রাঁধলে মেয়েদের মন ভালো থাকে। সীতা রাঁধতেন, পার্বতী রাঁধতেন, দ্রৌপদী রাঁধতেন। রেঁধে সবাইকে খাওয়াতেন স্বয়ং লক্ষ্মী।' যা-যা ঠাকুর ভালোবাসতেন খেতে তাই রান্না হত বেশির ভাগ। ঝালমসলা নেই বললেই হয়।

এগারোটার পরে স্নান সারেন, বারোটার মধ্যে দুপুরের ভোগ হয়ে যায় ঠাকুরের। সবাইকে খাইয়ে নিজে খেতে বসেন। বড্ড দেরি হয়ে যায়, সবাই বলে, এরই জন্যে অসুখ। তাই শেষ দিকে সবাইকে খেতে বসিয়ে তবে নিজে বসেন। দুটো থেকে তিনটে পর্যন্ত একটু শোন। চারটের সময় জাগান ঠাকুরকে। জাগিয়ে কোণের ঘরে গিয়ে জপে বসেন। এবার করজপ। যদি কেউ ভক্ত আসে ওরি মধ্যে কথা কন। বিকেলের শেষে বসেন একটু বারান্দায়। সন্ধ্যায় আরতি হয়ে যাবার পর একটু প্রসাদ খান। তারপর বিছানায় গিয়ে জপে বসেন। রাত নটায় আবার খেতে দেন ঠাকুরকে। সাড়ে নটার মধ্যেই বাড়ির রাতের খাওয়া শেষ হয়। মা খান দু তিনখানা লুচি, একটু তরকারি, আর খানিকটা দুধ। এগারোটা নাগাদ শুতে যান।

কলকাতায়ও প্রায় এমনি। একদিন অন্তর যান গঙ্গাস্নানে, গোলাপ-মাকে সঙ্গে করে। সংসারের খাটুনি এখানে কম, কেননা সব ভার গোলাপ-মা আর যোগেন-মা নিয়েছে। কিন্তু এখানে অন্যরকমের দেহক্লেশ। সময়ে-অসময়ে, সারা

দিনমান ভরে, ভক্তের ভিড়। দীক্ষা দাও ভিক্ষা দাও—এই অশান্ত কোলাহল। দুপুর দুটোর পরও একটু নিরিবিলি হয় না, যেহেতু চারটের মধ্যেই আমাদের বাড়ি ফিরতে হবে, এক্ষুনি দীক্ষা চাই। এমন অবুঝ, এত স্বার্থপর!

সকাল-দুপুর মেয়েরা, বিকেল সাড়ে-পাঁচটার পরে পুরুষ-ভক্তের দল—এমনি বাঁধা আছে সময়। কিন্তু বিকেল হয়ে গেলেও মেয়েরা কি ওঠে! তখন তাদের পাশের একটা ঘরে পুরে রাখে। আসে পুরুষ-ভক্তের শোভাযাত্রা। শুধু পা দুখানি মুক্ত রেখে মা বসেন তক্তপোশের উপর, সর্বাঙ্গ চাদরে ঢেকে। যদি কথা কইতে হয় বলেন অতি মৃদুস্বরে, মধুস্বরে, কখনো বা ছোট্ট একটি মাথা-নাড়া দিয়ে। আর যদি কেউ অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ তুলতে চাও, অপেক্ষা করো, ভিড় কমুক, হোক একটু নিরিবিলি।

একখানি বসনেই মা'র আকাশ-আচ্ছাদ। জামা নেই জুতো নেই, জটা নেই গেরুয়া নেই—এই হচ্ছেন শ্বেতপদ্মাসনা সারদা। ঘামাচি হলে পাউডার মাখেন, আর দিনে চারবার করে দাঁত মাজেন গুল দিয়ে। এই গুল গোলাপ-মা তৈরি করে দেয়। শুকনো তামাক-পাতার সঙ্গে বিচালি পোড়ার ছাই মিশিয়ে। আর সকালবেলা আফিং খান সর্ষে দানার মত।

এই আমাদের মা। রাজরাজেশ্বরী। আমরা সকলে রাজরাজেশ্বরীর সন্তান। আমরুল শাক খেতে ভালোবাসেন। আর মিষ্টি-মিষ্টি টক-টক আমের প্রতি পক্ষপাত। কে এক ভক্ত না চেখে আম কিনে এনেছে। দুপুরবেলা খেতে বসে কেউ মুখে দিতে পারল না। শুধু মা বললেন, 'চমৎকার আম তো! কেমন সুন্দর টক!'

যেখানে যান সঙ্গে ঠাকুরের ছবি তো আছেই, আছে একটি ছোট কৌটো। তাতে সিংহবাহিনীর মাটি। নিত্য পূজার পর একটু-একটু খান সেই মাটি।

বিষ্ণুপুর স্টেশনে গাড়ির অপেক্ষায় বসে আছেন মা, কোত্থেকে এক হিন্দুস্থানী কুলি ছুটে এসে তাঁর পায়ের তলায় বসে পড়ল। বসে কাঁদতে লাগল অঝোরে। তারই মধ্যে বললে, 'তু মেরী জানকী, তুঝে ম্যায় নে কিতনে দিনোঁসে খোঁজা থা। ইতনে রোজ তু কাঁহা থী?' কবে স্বপ্নে দেখেছিল বুঝি জানকীকে। এখন দেখল সেই স্বপ্ন চোখের সামনে মূর্তিমতী। তার শরীরী মনোবাঞ্ছা।

মা বললেন, একটি ফুল নিয়ে এস।

পারলে বুকের হৃৎপিণ্ড উপড়ে দেয়। ছুটে ফুল নিয়ে এল কুলি। এনে মা'র পায়ের উপর রাখলে। মন্ত্র দিলেন মা।

মা মন্ত্রময়ী। সর্বমন্ত্রপ্রণেত্রী।

* পঁয়ত্রিশ *

'রাধু বললে পাঁজিতে লিখেছে এবার নাকি আশ্বিন মাসে খুব মারামারি হবে।' মা মুখ গম্ভীর করে বললেন।

পাশে কে বসেছিল, শুধরে দিল। বললে, 'মারামারি নয়, মহামারী।'

সরলা বালিকার মত হেসে উঠলেন মা। তবু বাধুর মুখের কথা, ভুল হলেও মিষ্টি। ভক্তের আনা আম, টক হলেও চমৎকার।

সবাই বলে কিনা আমি রাধু-রাধু বলে অস্থির। তার উপর আমার ভীষণ আসক্তি। কে জানে হয়তো তাই। কিন্তু কেন এই আসক্তিটুকুকে শিকড় করে আঁকড়ে আছি সংসারের মাটি, তা কে বোঝে!

'যদি এই আসক্তিটুকু না থাকত তাহলে ঠাকুরের শরীর যাবার পর এই দেহটা আর থাকত না।' বললেন মা: 'তাঁর কাজের জন্যেই না বাধুকে দিয়ে বেঁধেছেন এই দেহটাকে। যখন রাধুর উপর থেকে মন চলে যাবে তখন এ দেহ আর থাকবে না।'

রাধুর ছেলে হয়েছে। তারপর থেকে রাধুর নানান রোগ। সব সামাল দিতে হচ্ছে মাকে, জয়রামবাটিতে। ছেলে একটু শক্ত-সমর্থ না হবার আগে কি করে ফেরেন কলকাতা।

এক বছরের উপর রইলেন সেই গাঁ-ঘরে, রাধুর ছেলেকে কোলে-পিঠে করে। শেষ তিন মাস নিজেই রইলেন রোগ নিয়ে। জ্বরের পর জ্বর। শরৎমহারাজ লিখলেন, কলকাতায় চলে আসুন।

রাধুর স্বামী মন্মথ, সে পর্যন্ত মন্ত্র চায়। মা বললেন, 'তোমাকে মেয়ে দিয়েছি, তোমাকে আবার মন্ত্র দিই কি করে? কুলগুরু যে তাহলে চটে যাবেন, আর কুলগুরু চটলে আমার মেয়েরই অকল্যাণ। তুমি আমাকে জ্ঞানগুরু করো।' মন্মথ তা কানেও তোলে না। মন্ত্র চাই, চাই সমাহিত মতি। তোমার এত কাছে এসে আমি ছেড়ে দেব তা ভেবো না। শুধু মেয়ে নিয়ে ভুলব এত মূর্খ আমি নই।

শেষ পর্যন্ত মন্ত্র দিলেন মা। বললেন জনান্তিকে, 'রাধুর কুষ্ঠিতে বৈধব্যযোগ আছে। মন্মথকে মন্ত্র দিলুম—ঠাকুরের নামে বিধির বিধান কাটা যায়। আমার নরেন বলতো অবতার কপালমোচন।'

বিবেকানন্দ চিঠি লিখছেন বেলুড় মঠ থেকে: 'প্রভু মাকে যেরূপ চালান সেই-রূপই চলা উচিত। আমরা শুধু পরামর্শ দিতে পারি, আর সে পরামর্শ একেবারেই বাজে। মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক—আমি তো এইটুকু বুঝি।'

এবার লিখছেন শশী-মহারাজকে, 'শ্রীমা এখানে আছেন। ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান মহিলারা সেদিন তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। ভাবতে পার, মা তাঁদের সঙ্গে বসে খেয়েছিলেন। এ কি অদ্ভুত ব্যাপার নয়? কোনো ভয় নেই, প্রভু আমাদের উপর দৃষ্টি রেখেছেন—সাহস হারিও না, খানিকক্ষণ জোরে দাঁড় টেনে তারপর দম নাও—'

মন্মথর খুড়ো ভোলানাথ চাটুজ্জে কম যায় না। মাকে বেয়ান না বলে মা বলে ডাকে।

ভোলানাথকে চিঠি লেখাচ্ছেন মা। বলছেন, 'লেখ, বাবাজীবন—'

শুনতে পেয়েছে সুরবালা। ঝঙ্কার দিয়ে বললে, 'সে কি গো? সে যে তোমার বেয়াই।'

'হলোই বা। সে আমাকে মা বলে আনন্দ পায়। তার কাছে আমি তাই।'

আমি সর্বানন্দনন্দিতা। সর্বসাম্রাজ্যদায়িনী। সর্বৈশ্বর্যসমস্তবাঞ্ছিতকরী।

'মাগো, আমি পাড়াগাঁয়ের ছেলে, সব সময়ে তোমাকে আপনি বলতে পারি না, মুখ দিয়ে তুমি বেরিয়ে আসে। কত অপরাধ করি কে জানে!'

মা হাসলেন। 'কিসের অপরাধ। তোমার মন যা চায় তাই বলো, তাই ডাকো। মা'র সঙ্গে ছেলে কি হিসেব-কিতেব করে কথা কইবে?'

জ্বর যখন যায় না কিছুতে স্বামী সারদানন্দ মাকে কলকাতায় আনবার ব্যবস্থা করলেন। ওমা, এ কি চেহারা হয়ে গিয়েছে। যোগেন-মা আর গোলাপ-মা আঁৎকে উঠলেন। কঙ্কালের উপর শুধু চামড়ার পোঁচ, গায়ের রঙ রান্নাঘরের ঝুলের মত! এ তুমি কী হয়ে গিয়েছ!

স্মেরাননা হাসলেন। বললেন, 'ভয় নেই, ভালো হয়ে যাব।'

এর আগে গোলাপ-মা'র যখন ভারী-হাতে অসুখ করেছিল মা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন আকুল হয়ে, ঠাকুর, আমার গোলাপকে সারিয়ে দাও। যদি আমার গোলাপ-যোগেন না থাকে তা হলে আমি থাকব কি করে?

জ্বর আর যায় না। কবিরাজ শ্যামদাস বাচস্পতি চিকিৎসা শুরু করলেন। কিছুটা ভালো হয়ে অসুখ আবার বাঁকা পথ ধরল। ডাকো নীলরতন সরকারকে। বললেন কালাজ্বর হয়েছে। ইনজেকশান দিতে হবে।

কিছুতেই কিছু হয় না, সমস্ত গা জ্বলে যাচ্ছে। অহোরাত্র পাখার হাওয়া চলেছে। হাতের তালুতে বরফ ধরে থাকলে কিছুটা ভালো লাগে। যোগেন-মা, আমার গা ঘেঁষে বোসো, তোমায় জড়িয়ে ধরলে কিছুটা ঠাণ্ডা হই। পথ্য চলেছে দুধ-ভাত, কখনো বা তরকারি। দেহে রক্ত নেই তাই যা চান খেতে দিও। য়্যালোপেথিতে কুলোল না বলে এলো এবার হোমিওপ্যাথি। ডাক্তার জ্ঞান কাঞ্জিলাল। এসে দেখেন ভক্ত-সেবিকা মাকে ভাত খাওয়াতে চলেছে। ভাতের পরিমাণ বেশি মনে হল ডাক্তারের। রেগে ধমকে উঠলেন। বেশি খাইয়ে মাকে মেরে ফেলবে দেখছি তোমরা। সেবিকাকে বললেন, কী ছাই তুমি সেবা করছ, বিকেলে আমি দুটো পাশ-করা নার্স নিয়ে আসব।

ডাক্তার চলে গেলে মা তাঁর কাছে ডাকলেন সেবিকাকে। বললেন, 'তুই মনে কিছু দুঃখ করিসনে, সরলা। ও ডাক্তারের বাড়াবাড়ি। ও ভেবেছে আমি ওই বুট-পরা মেয়েগুলোর সেবা নেব? ও কী জানে? ও ভেবেছে ভাত বেশি আনলেই আমি বেশি খেতে পারব?'

সেই থেকে মা'র ভাত-খাওয়া চলে গেল। আর খিদে নেই, রুচি নেই।

'কাঞ্জিলাল কেন আমার ভাত খাওয়া নিয়ে চটে গিয়েছিল সেদিন? তাই তো উঠে গেল আমার ভাত-খাওয়া।'

অসুখে ভুগে-ভুগে আখখুটে শিশুর মতন হয়ে গিয়েছেন মা। রাত বারোটার সময় সরলা এসেছে মাকে খাওয়াতে। মা, একটু খাও।

'আমি খাব না, কিছুতে খাব না।' মা ঝামটা দিয়ে উঠলেন, 'তোর শুধু ঐ এক কথা, মা একটু খাও, আঁর বগলে কাঠি লাগাও। আমি আর পারবোনি বাপু।'

'তবে কি মা, মহারাজকে ডাকব?' সরলা বললে শাসনের সুরে।

'ডাক শরৎকে, ডাক। আমি খাব না তোর হাতে।'

মহারাজ চলে এলো তাড়াতাড়ি। চিরকাল ঘোমটার আড়াল থেকে কথা বলেছেন, আজ স্পষ্ট ইশারা করলেন পাশে বসতে। আশ্চর্য, তার চিবুক ধরে দু আঙুলে চুমু খেলেন, তারপর তার হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, 'ওরা আমাকে কেবল বিরক্ত করে। শুধু খাও-খাও, নয়তো বগলে কাঠি লাগাও। তুমি ওকে বলে দাও ও যেন আমাকে বিরক্ত না করে।'

'না মা, ওরা আর বিরক্ত করবে না।' সান্ত্বনা দিল শরৎ। পরে অল্প কিছুক্ষণ বাদে মমতামাখানো স্বরে বললে, 'মা, এখন কি একটু খাবেন?'

ঠাণ্ডা মেয়েটির মত মা বললেন, 'দাও।' পরক্ষণেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'না, না, সরলা নয়, তুমি আমাকে খাইয়ে দাও। ওর হাতে আমি খাব না।'

ফিডিং কাপে দুধ খাওয়াতে লাগল শরৎ। এক-আধ ফোঁটা দিতে না দিতেই থামল। বললে, 'মা, একটু জিরিয়ে খান।'

'আহা, দেখতো কী সুন্দর কথা! মা, একটু জিরিয়ে খান।' মা স্নেহে দ্রবীভূত হয়ে গেলেন। 'এ কথাটা ওরা একটু বলতে পারে না? ওদের শিখিয়ে দিতে পারো না এমন গলার স্বর?'

দুধ একটু মা খেলেন কি না-খেলেন, বলে উঠলেন, 'যাও বাবা, শোও গিয়ে। বাছাকে এত রাতে কষ্ট দিলে অকারণে।'

যতদিন জ্ঞান ছিল অসুখের মধ্যে, ডাক্তার যারা এসেছে তাদের পর্যন্ত প্রসাদ দেবার ব্যবস্থা করেছেন। বেশিক্ষণ কাউকে এক নাগাড়ে পাখা করতে দেন না। হাত ব্যথা হয়ে যাবে যে। আর, তোমার হাত ব্যথা হচ্ছে এ ভাবনা ধরলে আমার চোখে আর ঘুম কই? জয়রামবাটির মেয়ে রমণী কি-কটা ফল নিয়ে এসেছিল মা'র জন্যে। মা তখন জ্বরে বেহুঁস, টের পাননি। জানাতে পারেননি তাঁর অন্তরের কৃতজ্ঞতা। জ্ঞান হয়ে রমণীকে খবর পাঠালেন, আমাকে ক্ষমা করিস দিদি, তোকে তখন জানাতে পারিনি ধন্যবাদ।

ঠাকুরের ছবি আমার ঘর থেকে পাশের ঘরে সরিয়ে নিয়ে যাও। এর পর আমি তো আর কল-ঘরে যেতে পারব না, তখন এ-ঘর আর ঠাকুরের মন্দির থাকবে কি করে? আর, আমার বিছানা খাট থেকে নামিয়ে দাও মেঝের উপর।

মা'র দিন কি তবে ফুরিয়ে এল?

'মাগো, কবে তুমি ভালো হবে?'

'ঠাকুর জানেন আদৌ ভালো হব কিনা। ঠাকুরের স্রোতে আমি গা ভাসিয়ে দিয়েছি, যেখানে নিয়ে যাবেন সেই আমার কূল, আমার অকূলের কূল।'

আশ্চর্য, কদিন থেকে রাধুর আর কোনো খোঁজ নিচ্ছেন না। রাধুর তো নয়ই, রাধুর ছেলেরও নয়। এ একেবারে অদ্ভুত ব্যাপার মনে হচ্ছে। যারা হচ্ছে মা'র নিশ্বাস আর প্রশ্বাস, দুই নয়নের তারা, তাদের প্রতি এমন উদাসীন!

একদিন রাধুকে ডেকে আনলেন পাশটিতে। বললেন, 'জয়রামবাটিতে চলে যা।'

রাধু তো আকাশ থেকে পড়ল: 'কেন?'

'আমি বলছি, চলে যা। আর এখানে থাকিসনি।'

রাধু বিহ্বলের মত তাকিয়ে রইল। কিন্তু তার এই অসহায় ভাব মা লক্ষ্য করেও করলেন না। কঠোরকণ্ঠে বললেন সরলাকে, 'শরৎকে বল ওদের জয়রামবাটি পাঠিয়ে দিতে।'

সরলাও বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা। অবাক হয়ে বললে, 'সে কি কথা? রাধুকে ছেড়ে থাকতে পারবেন?'

'খুব পারব।' মা বললেন স্পৃহাহীন শুষ্ককণ্ঠে, 'আমি মন তুলে নিয়েছি।'

মায়া কাটিয়ে দিয়েছি। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। ভেঙে দিয়েছি খেলাঘর। যতক্ষণ মায়ায় আছি ততক্ষণই লিপ্ত, আচ্ছন্ন, দ্রবীভূত হয়ে আছি। যেই মায়া কাটিয়ে দিয়েছি অমনি আমি বীততৃষ্ণ, বীতশোক। হৃদিহীন উদাসীন। সরলা যোগেন-মা আর শরৎ-মহারাজকে খবর দিলে।

যোগেন-মা ছুটে এল মা'র কাছে। বললে, 'এ তুমি কী বলছ মা? কেন রাধুদের পাঠিয়ে দেবে?'

'এর পর ওদের সেখানেই থাকতে হবে যে। আমি মন তুলে নিয়েছি। আর নয়, চাইনে।'

রাধুর দু চোখ ছলছল করে উঠল। দাঁড়িয়ে রইল কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত।

'ও কথা বোলো না, মা।' যোগেন-মা কাছে এসে ঝুঁকে পড়ল: 'তুমি মন তুলে নিলে আমরা বাঁচব কি করে?'

'হাতের তাশ এবার জলে গিয়েছে। আর নয়।' কেমন নিষ্ঠুর শোনাল মাকে: 'কি করবে বলো, মায়া কাটিয়ে দিয়েছি সমূলে। রাধু আমার কেউ নয়, ওর ছেলে আমার কেউ নয়।'

যোগেন-মা সব বললে গিয়ে শরৎ-মহারাজকে।

শরৎ-মহারাজের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। বললে, 'তবে আর মাকে রাখা গেল না। কী হবে! রাধুর থেকে মন যখন তুলে নিয়েছেন তখন আর আশা নেই।'

আশা নেই! রাধুর বুকে লাগল যেন হাহাকারের করাঘাত। পিসি আর ভাববে না, ভালোবাসবে না, শত অত্যাচার নীরবে সহ্য করবে না, সহ্য করে ফের পরম ক্ষমায় আশীর্বাদ করবে না। এমন কথা বলতে পারল পিসি? ভাবতে পারল?

সরলাকে শরৎ-মহারাজ ডাকলেন নিভৃতে। বললেন, 'তোমরা সব সময় আছ মা'র কাছে, যে করে পারো রাধুর উপর মা'র মন ফেরাও। যাতে রাধুকে ডাকেন, রাধুকে খোঁজেন, রাধুকে ধরেন হাত বাড়িয়ে। এই এখন মা'র একমাত্র চিকিৎসা। বলো, পারবে?'

'পারবে না।' সরলা কাছে আসতেই বললেন মা, 'যে মন একবার তুলে নিয়েছি তা পারবে না নামাতে।'

দেখি একবার আমি চেষ্টা করে। এই আমার শেষ চেষ্টা। শেষ পাশ।

পাঠিয়ে দিলে ছেলেকে। মা'র বিছানা নিচে, হামাগুড়ি দিতে-দিতে ছেলে প্রায় চলে এল বিছানার কাছাকাছি। রাধু দেখতে লাগল আড়াল থেকে, চৌকাঠের ওপিঠে দাঁড়িয়ে। যা, আরেকটু যা, খোকা ছেলে, ঠাকুমা ঘুমুচ্ছে, ঠাকুমার গলা আঁকড়ে ধর গে যা।

মা ঘুমুচ্ছিলেন, হঠাৎ চোখ চাইলেন। দেখলেন রাধুর ছেলে। মমতাশূন্যের মত বললেন, 'আর এগোসনে। আমি তোর মায়া কাটিয়ে দিয়েছি। আর আমাকে পারবি না জড়াতে।'

ছেলেটা স্তব্ধ হয়ে রইল। একজন ভক্ত-মেয়ে ছিল ঘরে, তাকে মা বললেন, 'ওকে নিয়ে যা। ওকে আর আমি চাই না।'

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল রাধু। ছেলেও কাঁদল। ছেলেকে বুকে ধরল রাধু। কিন্তু রাধুকে কে বুকে ধরে।

অন্নপূর্ণার মা এসেছে দেখতে। ঘরে কারু ঢোকবার অনুমতি নেই বলে দুয়ারের কাছে বসে আছে। মা'র চোখ পড়তেই মা তাকে ডাকলেন ইশারায়। বললেন কাছে বসতে। কাছে বসবে কি, মা'র শরীরের দশা দেখে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

'মা, তুমি যখন থাকবে না তখন আমাদের কী হবে?'

মা'র গলার স্বর বসে গিয়েছে, ভালো শোনা যায় না। তবু বললেন মুখের কাছে ওর কান এনে, 'কোনো ভয় নেই অন্নপূর্ণার মা। একটি কথা শুধু বলে যাই, যদি শান্তি চাও, অন্যের দোষ দেখো না। শুধু নিজের দোষ দেখো। কেউ তোমার পর নয় বাছা, সব তোমার আপনার লোক। সবাইকে আপনার করো।'

দৈবী চিকিৎসাও কম হল না। পাঁচ মহাবিদ্যার অর্চনা হল, পাঁচটি গ্রহপূজো হল। বাগবাজারে সিদ্ধেশ্বরীতলায় শত চণ্ডীপাঠ হল। স্বস্ত্যয়ন হল বারাসতের শ্মশানে।

মা ফিরলেন না। শুধু শরৎ-মহারাজকে বলে গেলেন, 'শরৎ, এরা সব রইল। আমার যোগেন, গোলাপ, আমার সকলে।'

ঐ মা'র শেষ কথা। চৌঠা শ্রাবণ মঙ্গলবার, ১৩২৭ সাল, রাত দেড়টার সময় মা মহাসমাধিতে নিমগ্ন হলেন। মর্ত্যদীপ নির্বাপিত হবার আগে মা'র মরদেহ কালো ও কুঞ্চিত হয়ে ছিল। এখন, আশ্চর্য, দীপাবসানের সঙ্গে-সঙ্গে এল এক অপূর্ব দিব্যজ্যোতি। আড়ষ্ট-কুঞ্চিত দেহ আস্তে-আস্তে নরম হতে-হতে প্রসারিত হল, মুখের ফোলা কমে গেল একদম, আর সমস্ত আননমণ্ডলে এল এক লোহিত লাবণ্য। প্রতিমার মুখে যেমন রক্তদ্যুতি থাকে তেমনি। যারা-যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, যাদের ছিল সেই অমেয় সৌভাগ্য, তারা দেখল, ঠিক আশ্বিন মাসের ভগবতীর মূর্তি, সেই নম্র স্বর্ণাভা, সেই স্থির-নির্মল প্রশান্তি।

সকাল হলে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হল বেলুড় মঠে। তার আগে মা'র কথামত স্নান করানো হল গঙ্গায়। শোভাযাত্রার বাহক সারদানন্দ, শিবানন্দ, মাস্টারমশাই—আরো অগণন মা'র সন্ততি। ধুলো-কাদা মাখা ময়লা-কাপড়-পরা ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলের দল।

বেলুড় মঠের নির্ধারিত স্থানে মা'র চিতানির্মাণ হল। বেলা প্রায় দুটোর সময় জ্বলল প্রথম অগ্নিশিখা।

এই আমাদের দক্ষিণাকালী। দক্ষিণেশ্বরের পাশে দক্ষিণাকালী। দক্ষিণেশ্বর-রামকৃষ্ণ, দক্ষিণাকালী সারদা। একজন দাক্ষিণ্যময়, আরেকজন সুদক্ষিণা।

দক্ষিণেশ্বর তাই শুধু রামকৃষ্ণের পীঠস্থান নয়, সতীসুন্দরী সারদামণির সিদ্ধতীর্থ। এখানে তপস্যা শুধু রামকৃষ্ণই করেননি, সারদামণিও করে গেছেন। পার্বতীর জন্যে ধূর্জটির শিবশঙ্করের জন্যে অপর্ণার।

মাধুর্যময়ী কৃপাসাগরী। লক্ষ্মী লজ্জা, বিদ্যা, শ্রদ্ধা, কান্তি, পুষ্টি বিনিশ্চলা। শুধু কি তাই? সর্বকামদা সুরথরাজ্যসাধিকা? সদাশিবকরী আনম্র মেঘাচ্ছায়া? শুধু তাই নয়। আবার শক্তিসারা, শক্তিসংহসমন্বিতা। ঠাকুর বলেন, 'ও কি যে সে? ও আমার শক্তি।' অসুরসংহন্ত্রী, বৈরিবিমর্দিনী। সর্বভূতভয়ঙ্করী।

অতশত জানি না আমরা। আমরা জানি আমাদের মা। পাতানো মা নয়, সৎ-মা নয়, নকল-ডাকের মা নয়, সত্যিকার মা, জলজীয়ন্ত মা। দয়ার্দ্রহৃদয়া সর্বদুঃখহা সর্বদোষবিঘাতিনী বসুন্ধরা। মারলে মারবেন রাখলে রাখবেন। মারলেও মা ডাকি, ধরলেও মা ডাকি। মা ডেকেই আমাদের সুখ। সম্পদে রেখেছেন না বিপদে রেখেছেন তা জানি না। শুধু জানি মা'র কোলে শুয়ে আছি। কোথায় ফেলবেন? সর্বত্রই মা'র কোল। কোলের বাইরে আর জায়গা কোথায়? কত দৈন্য আর রাখবেন? আমাদের যে মা আছেন এই ঐশ্বর্য তিনি মা হয়ে হরণ করবেন কি করে?

মাকে যে পায় সে আর চায় কী সংসারে?

অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

পঞ্চম খণ্ড

তথ্যপঞ্জী
ও
গ্রন্থ-পরিচয়

নিরঞ্জন চক্রবর্তী
সম্পাদিত
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী

অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

পঞ্চম খণ্ড

ইতিপূর্বে এই রচনাবলীর চারটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। সেই খণ্ডগুলিতে সংযোজিত রচনাসমূহের সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র এই তথ্যপঞ্জীর পরিশিষ্টে দেওয়া হলো। ঐ খণ্ডগুলিতে অচিন্ত্যকুমারের রচনাসমূহের মোটামুটি কালক্রম রক্ষিত হয়েছে। অচিন্ত্যকুমারের অগণিত গুণমুগ্ধ পাঠকের অনুরোধে পঞ্চম খণ্ডে কিছুটা ব্যতিক্রম করা হলো। তাঁর রচিত জীবনী-সাহিত্যের একাংশ এইখণ্ডে সংযোজিত হয়েছে। এই সমস্ত জীবনী-সাহিত্যের প্রথম অমৃতফল : পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। এই গ্রন্থরচনার একটি অপূর্ব ইতিহাস আছে, এবং এই গ্রন্থ প্রকাশের পরে যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল পাঠকমহলে, তার ইতিহাসও দীর্ঘ। এই গ্রন্থটি চার খণ্ডে সমাপ্ত। রচনাবলীর একটি খণ্ডে সম্পূর্ণ চারটি খণ্ড সংযোজন করা সম্ভব নয়। পরবর্তী খণ্ডে অচিন্ত্যকুমার রচিত রামকৃষ্ণ-সাহিত্যের অন্য অংশ সংযোজন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। সেই সঙ্গে এই জীবনী-সাহিত্য-রচনার ইতিহাসও সংযোজিত হবে।

বর্তমান খণ্ডে নিম্নলিখিত গ্রন্থ তিনটি সংযোজিত হয়েছে—

১। পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

২। পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী চারটি পর্বে ভাগ করা যায়—যথা, বাল্যলীলা, সাধনলীলা, প্রচারলীলা এবং লীলাসম্বরণ। উপরি-উক্ত প্রথম দুটি খণ্ডে অচিন্ত্যকুমার শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলার বিভিন্ন ঘটনাবলী সংযোগে, সাধনলীলা শেষে প্রচারলীলার প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত বিবৃত করেছেন। এই সময়েই শ্রীশ্রীসারদামণি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আবির্ভূতা হন এবং তাঁর লীলাপ্রসঙ্গের সহগামিনীও হয়েছিলেন। সেইজন্য শ্রীমায়ের জীবনী গ্রন্থখানিও এই খণ্ডেই সংযোজিত হলো।

ভারতে, বিশেষ করে বাঙলাদেশের ধর্মবিপ্লবের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব এক মহাবিপ্লব, যে আবির্ভাবের ফলশ্রুতি বর্তমানকাল প্রত্যক্ষ করছে এবং পর্যন্তহীন যুগযুগান্ত ধরে তাহা প্রত্যক্ষিত হবে। এ দেশে ধর্মবিপ্লবের পূর্ব ইতিহাস জানা থাকলে শ্রীরামকৃষ্ণ-যুগকে বোঝা সহজ হবে। সেইজন্য সংক্ষিপ্ত ভাবে সেই ইতিহাস তথ্যপঞ্জীতে সম্পৃক্ত হয়েছে। অচিন্ত্যকুমার কথকতার ভঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের জীবনী ব্যক্ত করেছেন। সেইজন্য ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এই দুটি মহাজীবনের মানবলীলার বিবরণও সংযোজিত হয়েছে।

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থখানির প্রথম খণ্ড ৬ই ফাল্গুন, ১৩৫৮ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মদিনে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করে কলকাতার প্রকাশন সংস্থা সিগনেট্ প্রেস। প্রথম বছরেই এই বইটির বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অতঃপর এই গ্রন্থ প্রকাশ করে কলকাতার প্রকাশন সংস্থা মিত্র ও ঘোষ

১৩৬৮ সনের আশ্বিন মাসে। এই 'মিত্র-ঘোষ' সংস্করণেরও বেশ কয়েকবার পুনর্মুদ্রণ হয়। মনে হয়, বাংলা ভাষায় জীবনী সাহিত্যে এইটিই সর্বাধিক মুদ্রিত গ্রন্থ।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণ-পরবর্তী বৎসর, অর্থাৎ ১৩৫৯ সালের ৬ই ফাল্গুন শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মদিনে সিগনেট্ প্রেস প্রকাশ করে। প্রথম খণ্ডের মতো পরবর্তী সংস্করণগুলি প্রকাশ করে মিত্র ও ঘোষ। এই 'মিত্র-ঘোষ' সংস্করণের পাঠই বর্তমান রচনাবলীতে গ্রহণ করা হয়েছে।

পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি জীবনী গ্রন্থখানি সিগনেট্ প্রেস প্রথম প্রকাশ করে—৬ই ফাল্গুন ১৩৬০ সালে। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থখানিরও নয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। শেষতম সংস্করণের পাঠই বর্তমান রচনাবলীতে গ্রহণ করা হয়েছে।

+ + +

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে
ধর্ম ও সামাজিক বিপ্লবের পশ্চাৎপট

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে' স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন :
'শ্রীরামকৃষ্ণ যে ধর্মমধু আজ জগৎকে দান করিলেন, তাহার অমৃত-আস্বাদ জগৎ পূর্বে আর কখনও কি পাইয়াছে? যে মহান্ ধর্মশক্তি তিনি সঞ্চিত করিয়া শিষ্যবর্গে সঞ্চারিত করিয়াছেন, যাহার প্রবল উচ্ছ্বাসে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানালোকেও লোকে ধর্মকে জ্বলন্ত প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া উপলব্ধি করিতেছে এবং সর্ব ধর্মমতের অন্তরে এক অপরিবর্তনীয় জীবন্ত সনাতনধর্ম-স্রোত প্রবাহিত দেখিতেছে—সে শক্তির অভিনয় জগৎ পূর্বে আর কখনও কি অনুভব করিয়াছে? পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বায়ু সঞ্চরণের ন্যায় সত্য হইতে সত্যান্তরে সঞ্চরণ করিয়া মনুষ্যজীবন ক্রমশঃ ধীরপদে এক অপরিবর্তনীয় অদ্বৈত সত্যের দিকে গমন করিতেছে এবং একদিন না একদিন সেই অনন্ত অপার অবাঙ্মানসগোচর সত্যের নিশ্চয় উপলব্ধি করিয়া পূর্ণকাম হইবে—এ অভয়বাণী মনুষ্যলোকে পূর্বে আর কখনও কি উচ্চারিত হইয়াছে? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি ভারতের, এবং ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতি ভারত ভিন্ন দেশের, ধর্মাচার্যেরা ধর্মজগতের যে একদেশী ভাব দূর করিতে সমর্থ হন নাই, নিরক্ষর ব্রাহ্মণবালক নিজ জীবনে সম্পূর্ণরূপে সেই ভাব বিনষ্ট করিয়া বিপরীত ধর্মমতসমূহের প্রকৃত সমন্বয়রূপ অসাধ্যসাধনে সমর্থ হইল—এ চিত্র আর কখনও কেহ কি দেখিয়াছে?'

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী লিখতে গিয়ে রোমাঁ রোলাঁ লিখলেন: '...let us listen to the whole splendid harmony of the present, wherein the past dreams and the future aspirations of all races and all ages are blended. For those who have ears to hear every second contains the song of humanity from the first born to the last to die, unfolding like jasmine round the wheel of the ages. There is no need to decipher papyrus in order to trace the road traversed by the thoughts of men. The thougts of a thousand years are all around us. Nothing is obliterated. Listen ! but listen with your ears. Let books be silent ! They talk too much...And it is because Ramakrishna more fully than any other man not only conceived, but realised in himself the total Unity of this river of God, open to all river and all streams, that I have given him my love ; and I have drawn a little of his sacred water to slake the great thirst of the world."

কয়েক শতাব্দীর অন্ধকার যুগ পার হয়ে এই যুগমানবের আবির্ভাবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানা দরকার। যুগে যুগে ধর্মবিপ্লবের ইতিহাসও যেমন এই আবির্ভাবের সংগে জড়িত, তেমনি অংগাংগীভাবে জড়িত ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেশাঁর ইতিহাস। এই ইতিহাসের পশ্চাৎপটভূমি থেকে বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলো চয়ন করা যাক।

সাক্ষাৎকারে যখনই অচিন্ত্যকুমারের সংগে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসংগ আলোচনা হতো তখনই তিনি বলতেন যে, এক ঐশ্বরিক প্রেরণা থেকে তিনি রামকৃষ্ণ-জীবনী-সাহিত্য রচনা করেছেন। রামকৃষ্ণ-ধর্মের বিশেষ লক্ষণটি উল্লেখ করে তিনি বলতেন, সর্বধর্মে সমদৃষ্টি এবং সমন্বয়ের সাধনাই এই যুগদেবতার ধর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের এই সমন্বয়-সাধনের ব্যবহারিক প্রচেষ্টার উপরে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করবেন বলেও মনস্থ করেছিলেন, যার ভিতরে থাকবে পৃথিবীর বিশেষ ধর্মগুলির সার-সঞ্চয় এবং ভারতে, বিশেষ করে বাঙলাদেশে ধর্ম-বিপ্লবের ইতিহাস। তাঁর সেই ঐকান্তিক আশা তিনি পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। তাঁর জীবিতকালে বর্তমান সম্পাদকের সৌভাগ্য হয়েছিল উক্ত বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করবার। এই বিষয়ে তিনি যে পরিকল্পনা করেছিলেন তা ভারত-কথার মতোই সুবৃহৎ। তাঁর রচনাবলীর তথ্যপঞ্জীর মতো সীমিতস্থানে সে পরিকল্পনা ফলপ্রসূ করা সম্ভব নয়। তবুও অচিন্ত্যকুমারের সংগে আলোচিত ধারা অনুসরণ করে, শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুশীলিত কয়েকটি ধর্মের মূল তত্ত্ব ও বাঙলাদেশে ধর্ম-বিপ্লবের যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নে সংকলিত হলো। মতামত ও ইতিহাসের টীকা, কোনটিই সম্পাদকের নয়। সে শুধু সংকলক মাত্র।

বাঙলাদেশে পালবংশের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের প্রসারলাভ ঘটেছিল। কিন্তু পরবর্তী সেন বংশের, বিশেষ করে বল্লাল সেনের রাজত্বকালে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। তারপরেই মুসলমান রাজত্বের সূত্রপাত। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ ঘোরী ভারতে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। আর ১২০৪ খৃঃ বখ্‌তিয়ার খিলজী লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নদীয়া জয় করে বাঙলাদেশে প্রথম মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। বখ্‌তিয়ারের পূর্ব পর্যন্ত বাঙলাদেশে ইসলাম ধর্মের অনুপ্রবেশ সম্ভব হয়নি। ঐতিহাসিকগণ বলেন, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হলেও এখানে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রকৃত প্রসার লাভ ঘটে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য পত্তনের (১৫৭৬) পর থেকে—সুফী ও দরবেশ নামে পরিচিত পীর ও ফকির সম্প্রদায়ের মাধ্যমে। অবশ্য, বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে যাওয়া এখানে নিতান্তই বাহুল্য হবে।

ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন—'বাঙলার প্রাচীন ও মধ্যযুগে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় থাকিলেও মূলতঃ ইহারা একই ধর্ম হইতে উদ্ভূত এবং ইহাদের মধ্যে প্রভেদ ক্রমশঃ···ঘুচিয়া আসিতেছিল। ···সুতরাং মুসলমানেরা যখন এদেশে আসিয়া বসবাস করিল তখন 'হিন্দু' এই একটি নামেই তাহারা এখানকার জাতি, ধর্ম ও সমাজকে অভিহিত করিল। মুসলমানেরা ধর্ম ও

সমাজ ও সমস্ত মৌলিক বিষয়েই এত স্বতন্ত্র যে তাহারা কোন দিনই হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারে নাই।'

অতএব, রাজন্যধর্ম যেখানে ইসলাম এবং সেই ধর্ম প্রসারের জন্য যেখানে রাজন্যবর্গ নিষ্ঠুরভাবে সক্রিয়, সেখানে পৌরাণিক ধর্ম-সংস্কৃতির অবক্ষয় অনিবার্য। অবশ্য এই বিপর্যয়ের জন্য হিন্দুধর্ম ও 'সমাজের অনেক কদাচার, নিষ্ঠুরতা, অবিচার ও অত্যাচার'-ও কম দায়ী নয়। ফলে এই হলো যে, হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির যেটুকু বাকি রইল তা-ও নগর-গঞ্জ অঞ্চল ছেড়ে দূরবর্তী গ্রামের নিভৃতে আশ্রয় গ্রহণ করল। বলা বাহুল্য, হিন্দু ও মুসলমান সামাজিক ও ধর্মনীতি সমন্বয়কারী কোনও বিশিষ্ট যুগসংস্কারককে সমকালীন ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। অতএব, 'হিন্দুধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক নীতিতে ইসলামীয় ধর্মের ও মুসলমান সমাজের প্রভাবে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। জাতিভেদ জর্জরিত হিন্দু সমাজ মুসলমান সমাজের সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ হইতে অনেক শিক্ষা-লাভ করিতে পারিত, কিন্তু তাহা করে নাই। বহু কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও হিন্দু মূর্তিপূজা ও বহু দেব-দেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস অটুট রাখিয়াছে। হিন্দু আইন-কানুনকে নূতন স্মৃতিকারেরা কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন ; কিন্তু তাহা সামাজিক প্রয়োজনে, ইসলামীয় আইনের কোন প্রভাব তাহাতে নেই।'

ভারতবর্ষের দুই প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের ভিতরে এত বিভেদের মূল কারণ, দুই ধর্মের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে দুই ধর্মের গুরুদের অদ্ভুত ব্যাখ্যা। রামমোহন রায় এই বিভেদ লক্ষ্য করে তাঁর প্রথম ধর্মব্যাখ্যার গ্রন্থ 'তুহ্ফাৎ-উল-মুয়াহ্হিদীন'-এ লিখেছেন : 'ব্রাহ্মণদের একটা বিশ্বাস যে তাঁরা ঈশ্বরের কাছ থেকে অমোঘ আদেশ পেয়েছেন যে তাঁরাই সব ক্রিয়া-কলাপ বরাবর করে যাবেন, এবং তাঁরাই ধর্ম্মকে চিরকাল ধরে রাখবেন। সংস্কৃত ভাষায় এ বিষয় এমন অনেক দৈবী অনুশাসন রয়েছে।...ঐ সব দৈবী নির্দ্দেশে আস্থা রাখার জন্য ইস্‌লাম ধর্ম্মীরা ব্রাহ্মণ জাতির অনেক ক্ষতি করেছে, ও তাদের উপর অনেক নির্য্যাতন করেছে, এমন কি মৃত্যু ভয়ও দেখিয়েছে, তবু তারা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করতে পারেনি। ইস্‌লামানুবর্ত্তীরা কোরাণের পবিত্র শ্লোকের মর্ম্মানুসারে (যথা :—পৌত্তলিকদের যেখানে পাও বধ কর, ও অবিশ্বাসীদের ধর্ম্মযুদ্ধ করে বেঁধে আন, এবং তাদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে মুক্ত করে দাও, বা বশ্যতা স্বীকার করাও) এগুলি ঈশ্বরের নির্দ্দেশ বলে উল্লেখ করে, যেন পৌত্তলিকদের বধ করা ও তাদের নানাভাবে নির্য্যাতন করা ঈশ্বরাদেশে অবশ্য কর্ত্তব্য। মুসলমানদের মতে ঐ পৌত্তলিকদের মধ্যে ব্রাহ্মণরাই সব চেয়ে পৌত্তলিক। সেই জন্যই ইস্‌লামানুবর্ত্তীরা সর্ব্বদাই ধর্ম্মোন্মাদে মত্ত হয়ে, এবং তাদের ঈশ্বরের আদেশ মানবার উৎসাহে "বহু-দেববাদীদের" ও শেষ পয়গম্বরের ধর্ম্মপ্রচারে "অবিশ্বাসীদের" বধ করতে ত্রুটী করেনি।'

পূর্বকথিত মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরে বিভিন্ন মুসলমান রাজা ও সুলতানের পট-পরিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাস-অন্তে ক্লাইভের হাতে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীতে সিরাজদৌল্লার পরাজয়ের পরে বস্তুতপক্ষে বাঙলাদেশে মুসলমান রাজত্বের অবসান হয়। পূর্বোক্ত বিভিন্ন কারণবশতঃ এই দীর্ঘ সাড়ে পাঁচশ বছর

বাঙলাদেশে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতির এক অবক্ষয়ের যুগ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

অবশ্য ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙলাদেশে শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম" হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির মূলে প্রথমে তীব্র আঘাত হানে। এমনকি, কতিপয় মুসলমানদেরও এই নূতন ধর্ম আকৃষ্ট করে। বলা বাহুল্য, যে-সকল মুসলমান এই ধর্মে আকৃষ্ট হয়েছিল তারা প্রায় সকলেই অত্যাচারিত এবং পতিত ধর্মান্তরিত হিন্দু। তথাপি চৈতন্যদেব আকাঙ্ক্ষিত ধর্মসমন্বয় ঘটাতে পারেন নি। তার একটি কারণ বোধহয়, তৎকালে মুসলমান রাজন্যবর্গের পোষিত-ইসলামধর্মের সংগে এই বৈষ্ণব ধর্মের বিরোধ। বিশ্বম্ভর বা নিমাইয়ের জন্ম ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৪৮৬ সনে, নবদ্বীপে। ১৫০৯ সনে পিতার পিণ্ড দিতে গয়াতে গিয়ে শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম দর্শনে তাঁর ভাবান্তর উপস্থিত হয় এবং তিনি হরিভক্তিতে বিভোর হয়ে পড়েন। তীর্থ হতে ফিরে এসে ২২ বছর বয়সে ঈশ্বরপুরীর নিকট দশাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন। এই সময়ে নবদ্বীপে বৎসরকাল তিনি বন্ধু ও ভক্তদের নিয়ে হরিনাম-সংকীর্তন করেন। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে তিমি কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তাঁর নাম হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য। দীক্ষা গ্রহণের পরেই নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্ত ও পার্ষদগণ চৈতন্যদেবকে ঈশ্বরের অবতার বলে ঘোষণা করেন। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের নাম হয় 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম"। এই ধর্মের মূল তত্ত্বকথা : 'শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ঈশ্বর ও আরাধ্য ; কিন্তু তিনি প্রেমময় ; তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে তিনি যে ঈশ্বর, সে-কথা ভুলিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে। এই ভালবাসার প্রাথমিক স্তর ভক্তি, তাহার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট দাস্য প্রেম, তাহার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট সখ্য প্রেম, তাহার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বাৎসল্যপ্রেম এবং সর্বপেক্ষা উৎকৃষ্ট কান্তা প্রেম। কান্তা প্রেমের মধ্যে আবার স্বকীয় প্রেমের তুলনায় পরকীয়া প্রেম শ্রেষ্ঠ······এই কারণে কৃষ্ণের সমস্ত ভক্তদের মধ্যে পরকীয়া প্রেমের নায়িকা গোপীদের স্থান সর্বোচ্চ, গোপীদের মধ্যে আবার রাধাই শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণ তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট। তত্ত্বের দিক দিয়া—রাধা সর্বশক্তিমান কৃষ্ণের হ্লাদিনী, অর্থাৎ আনন্দদায়িনী শক্তি ; শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন, সুতরাং রাধা ও কৃষ্ণও অভিন্ন, কিন্তু লীলারস আস্বাদনের জন্য দুই রূপ ধারণ করিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের লীলা নিত্য, ভক্তেরা এই লীলা শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-বন্দন করিবে, ইহাই তাহাদের সাধনার মুখ্য অংগ।'

চৈতন্যদেব তাঁর ধর্ম বিষয়ে কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি, এবং তাঁর জীবদ্দশায়ও এ-বিষয়ে ঐতিহাসিক কোন গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়নি। সেইজন্য, চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের এটাই মূল তত্ত্ব কিনা সে বিষয়ে কোন কোন ঐতিহাসিকের সংশয় রয়েছে। দেখা যায়, 'চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন চৈতন্যচরিত গ্রন্থে রাধার কোন উল্লেখ নাই। শ্রীচৈতন্য নিজে কোন তত্ত্বমূলক গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাঁহার সমসাময়িক বৃন্দাবনবাসী ছয়জন গোস্বামী—রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট ও গোপাল ভট্ট—শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতকে একটি দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া ইহাকে বিশিষ্ট মর্যাদা দান করিয়াছেন।'

বৃন্দাবনদাস বিরচিত প্রথম চৈতন্য-জীবনী 'চৈতন্যমঙ্গল' কেউ কেউ বলেন ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে লিখিত।

অবশ্য রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মহান আদর্শ চৈতন্যদেবের পূর্বেও এদেশে প্রচলিত ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী এই প্রেমধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর উনিশজন শিষ্যের মধ্যে ঈশ্বরপুরীর নিকটে নিমাই দীক্ষা গ্রহণ করেন, এবং আরেক শিষ্য কেশবভারতীর কাছে নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

এর আগেও রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কাহিনী এদেশে প্রচলিত ছিল ধর্মের সংগে মিশ্রিত কিছু কিছু কিংবদন্তী ও উপাখ্যানের ভিতর দিয়ে। জয়দেবের গীত-গোবিন্দ, চণ্ডীদাসের পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ইত্যাদি এই গোত্রের। এই সকল উপাখ্যান বা গীতকাব্যের ভিতরে যে আদিরসটুকু সম্পৃক্ত ছিল সেইটুকু জনপ্রিয় হলো বটে, কিন্তু এই কান্তাপ্রেম'-এর উৎসধারায় ধর্মের যে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ছিল সেটুকু ক্রমশ হারিয়ে ফেলল তার আপন গরিমা।

এই 'প্রেমধর্ম'-কে কলুষতামুক্ত করলেন শ্রীচৈতন্য। 'চৈতন্যের বলিষ্ঠ পৌরুষ বিশুদ্ধ ভাব ও অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব, রাধাকৃষ্ণের প্রেমমূলক বৈষ্ণবধর্মকে এক অতি উচ্চস্তরে তুলিল। পবিত্র ভক্তির প্রকাশ্য অনুভূতি, প্রাণোম্মাদকারী কীর্তন এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমের যে দিব্য আদর্শ তিনি নিজের জীবনে রূপায়িত করিয়াছিলেন, তাহার প্রবাহ সমস্ত কলুষতা ধুইয়া ফেলিল। বৈষ্ণবধর্মে তখন নূতন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। এই প্রসংগে চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত একটি নিয়ম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁহার আজ্ঞায় বৈষ্ণব ভক্তগণের নারীর সহিত কথাবার্তা নিষিদ্ধ হইল। তাঁহার প্রিয় শিষ্য হরিদাস তাঁহারই ভোজনের জন্য একজন বর্ষীয়সী ভক্তিমতী মহিলার নিকট হইতে উৎকৃষ্ট চাউল চাহিয়া আনিয়াছিলেন। এই নিয়মভংগের অপরাধে তিনি হরিদাসকে ত্যাগ করিলেন।...অন্যান্য ভক্তগণের অনুরোধ-উপরোধেও তিনি বিন্দুমাত্র টলিলেন না। বলিলেন, "মানুষের ইন্দ্রিয় দুর্বার, কাষ্ঠের নারীমূর্তি দেখিলেও মুনির মন চঞ্চল হয়। অসংযত চিত্ত জীব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া স্ত্রী-সম্ভাষণের ফলে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া বেড়াইতেছে।" মনের দুঃখে হরিদাস প্রয়াগে ত্রিবেণীতে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিল।

বৈষ্ণবধর্মের উপরি-উক্ত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও সুদূর বৃন্দাবনে বসে ছয়-গোস্বামীর শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার মধ্যে বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়। যাই হোক, হিন্দুধর্মের তৎকালীন নানা কুসংস্কার বর্জন করে সর্বজনগ্রহণীয় একটি বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক প্রেমধর্ম প্রচারে চৈতন্যদেব নিঃসন্দেহে অগ্রগামী। কিন্তু তথাপি চৈতন্যদেবের 'আদর্শ' ও প্রভাব কোন দিক দিয়েই বেশী দিন স্থায়ী হয় নি, বিশেষ করে বাঙলাদেশে। তার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। তৎকালে মুসলমানদের দ্বারা প্রতিরোধিত হয়েই হোক, সন্ন্যাস গ্রহণের কিছুকালের মধ্যেই চৈতন্যদেব নীলাচলে, অর্থাৎ পুরীধামে চলে গেলেন। এর পরে ছয়বৎসরকাল তিনি দক্ষিণভারতে ও অন্যান্য তীর্থস্থানে ভ্রমণ করেন। তাঁর জীবনের পরবর্তী আঠারো বৎসর তিনি মোটামুটি নীলাচলেই বাস করেন। ১০ই আগষ্ট, ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে পুরীধামে তাঁর তিরোধান হয়। অতএব বাঙলাদেশ তৎকালে তাঁর ব্যক্তিগত উপস্থিতি হতে তেমন অনুপ্রেরণা পায়নি।

পরবর্তীকালে অবশ্য বৈষ্ণবধর্মের বৈদান্তিক ব্যাখ্যাও হয়েছে। কিন্তু, তৎকালে বিরাট প্রতিষ্ঠাপন্ন হিন্দুধর্মের বৈদান্তিক ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কি পরিমাণে চৈতন্য-দেবের লক্ষ্যে ধরা পড়েছিল তার ঐতিহাসিক নিদর্শন তেমন নেই।

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ রচয়িতা ভক্ত-সাহিত্যিকের সঙ্গে বর্তমান সম্পাদকের এক সাক্ষাৎকারে রামকৃষ্ণদেব ও চৈতন্যদেবের ধর্মসংস্কার বিষয়ে মূলগত তত্ত্বটি নিয়ে আলোচনা হয়। সেই আলোচনার সারাংশটুকু এই যে, ধর্মীয় ভাবানুভূতিতে দুজনেরই ভাবসমাধি হয়েছিল—একজনের সর্বজীবে ব্রহ্মানুভূতি, অন্যজনের কৃষ্ণপ্রেমে ব্রহ্মানুভূতি। রামকৃষ্ণ ছিলেন সর্বধর্মসমন্বয়কারী ধর্মসংস্কারক। বিশিষ্ট ধর্মগুলির আনুষ্ঠানিক অনুশীলন করে সকল ধর্মের তাত্ত্বিক ঐক্য তিনি অনু-ধাবন করেছিলেন। চৈতন্যদেব অন্যধর্ম, বিশেষ করে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুধর্ম বর্জন করে, হিন্দু-কাঠামোর উপরেই একটি নবীন প্রেমধর্মের প্রবর্তক।

সুসাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর এক প্রবন্ধেও ('বড়বাবু') এই মত পোষণ করে বলেছেন— '...শ্রীচৈতন্যদেব নাকি ইসলামের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন...কিন্তু চৈতন্যদেব উভয় ধর্মের শাস্ত্রীয় সম্মেলন করার চেষ্টা করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। বস্তুত তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দুধর্মের সংগঠন ও সংস্কার, এবং তাকে ধ্বংসের পথ থেকে নবযৌবনের পথে নিয়ে যাবার...।' ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে পূর্বেই এইরকম অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

'প্রাচীন হিন্দুদর্শন ও বৈষ্ণবদর্শনের মধ্যে বহু প্রভেদ।' একমাত্র সাংখ্যদর্শন ব্যতীত অন্যান্য বিশিষ্ট হিন্দুদর্শনের শেষ কথা, ব্রহ্মই পরাগতি। কিন্তু 'বৈষ্ণব-দর্শনে কৃষ্ণই পরমদেবতা এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তি ভক্তের চরম লক্ষ্য। অবশ্য কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বেদান্ত সূত্রের নিজস্ব ব্যাখ্যা দ্বারা স্বকীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু, বঙ্গীয় বৈষ্ণবদর্শনে 'ভাগবত'-কেই বেদান্তসূত্রের স্বয়ং ব্যাসকর্তৃক রচিত ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করা হয়। এই পুরাণই বাঙালী বৈষ্ণব-গণের শ্রুতি।...সুতরাং, দেখা যায় 'ভাগবতে'-র দৃঢ় ভিত্তির উপরে বঙ্গীয় বৈষ্ণব-দর্শনের সৌধ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু, লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণের মতবাদ হইতে বৃন্দাবনের ষট্-গোস্বামীর মতবাদ বহুল পরিমাণে স্বতন্ত্র। নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণের চিন্তাধারা চৈতন্যকেন্দ্রিক, চৈতন্যই তাঁহাদের কাছে চরম সত্তা ও পরম উপেয়। ইঁহাদের মতে চৈতন্য একাধারে কৃষ্ণ ও রাধা; ইহা তাঁহাদের দৃঢ়মূল বিশ্বাস এবং এই সিদ্ধান্ত কোন যুক্তির অপেক্ষা রাখে না। এই ধারণাকেই বলা হইয়াছে "গৌরপারম্যবাদ"। নরহরি "গৌরনাগরভাব"-এর প্রবর্তক; এই মতবাদ অনুসারে রাগানুগাভক্তির সাহায্যে ভক্ত চৈতন্যকে নাগর এবং নিজেকে নাগরীরূপে কল্পনা করিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া।...চৈতন্যের প্রতি বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের ভক্তি তাঁহাদের চৈতন্যের নমস্ক্রিয়া ও তৎসম্বন্ধে শ্রদ্ধাসূচক উক্তি-সমূহে প্রকাশিত হইলেও তাঁহাদের গ্রন্থসমূহে 'গৌরপারম্যবাদ' বা 'গৌরনাগরভাব' প্রভৃতির কোনও উল্লেখ নাই। প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থাদিতে বর্ণিত কৃষ্ণ ও তদীয় লীলাই তাঁহাদের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। তাঁহাদের মতে কৃষ্ণ অবতার নহেন;

তিনি স্বয়ং ভগবান্ ও ভক্তের চরম লক্ষ্য। চৈতন্যের দেবত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের ভক্তিদর্শনে তাঁহারা সম্পূর্ণ নীরব; তাঁহাদের ভক্তিদর্শনে চৈতন্যলীলার কোন স্থান নাই।'

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' শ্রীরাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে বলেন—'অথর্ব্ববেদের উপনিষদ্ সকলের মধ্যে একখানির নাম গোপালতাপনী। কৃষ্ণের গোপমূর্ত্তির উপাসনা ইহার বিষয়। উহার রচনা দেখিয়া বোধহয় যে, অধিকাংশ উপনিষদ্ অপেক্ষা উহা অনেক আধুনিক। ইহাতে যে কৃষ্ণ গোপগোপী পরিবৃত, তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে গোপগোপীর যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহা প্রচলিত অর্থ হইতে ভিন্ন। গোপী অর্থে অবিদ্যাকলা।...উপনিষদে এইরূপ গোপীর অর্থ আছে, কিন্তু রাসলীলার কোন কথাই নাই। রাধার নামমাত্র নাই। একজন প্রধানা গোপীর কথা আছে, কিন্তু তিনি রাধা নহেন, তাঁহার নাম গান্ধর্ব্বী। তাঁহার প্রাধান্যও কামকেলিতে নহে—তত্ত্বজিজ্ঞাসায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আর জয়দেবের কাব্যে ভিন্ন কোন প্রাচীন গ্রন্থে রাধা নাই। ভাগবতের এই রাসপঞ্চাধ্যায়ের মধ্যে 'রাধা' নাম কোথাও পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের অস্থিমজ্জার ভিতর রাধা নাম প্রবিষ্ট।'

ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে যুক্তিমূলক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা, এই তিনটি সূত্র প্রধান। এদের মধ্যে 'বাদ' (Direct Record) প্রধান। জল্প ও বিতণ্ডার সৃষ্টি হয় যখন কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা হয় প্রবাদ, কিংবদন্তী, প্রবচন ও শ্রুতির (hearsay) উপর নির্ভর করে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' ব্যাখ্যাত অপ্রক্ষিপ্ত যুক্তিপূর্ণ পৌরাণিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে। তাই তিনি কৃষ্ণচরিত্র আলোচনার উপসংহারে বলেছেন—'কৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য, মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচারের জন্য অবতীর্ণ···কিন্তু যদি তিনি ঈশ্বরাবতার হয়েন, তবে তাহার ভক্তির পাত্র কে? তিনি নিজে। নিজের প্রতি যে ভক্তি, সে কেবল আপনাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন হইলেই উপস্থিত হয়। ইহা জ্ঞানমার্গের চরম। ইহাকে আত্মরতি বলে। ছান্দোগ্য উপনিষদে উহা এইরূপ কথিত হইয়াছে—"য এবং পশ্যন্বেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্ ভবতীতি।" —যে ইহা দেখিয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা জানিয়া, আত্মায় রত হয়, আত্মাতেই ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই যাহার মিথুন (সহচর), আত্মাই যাহার আনন্দ, সে স্বরাট্।" ইহাই গীতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কৃষ্ণ আত্মারাম; আত্মা জগন্ময়; তিনি সেই জগতে প্রীতিবিশিষ্ট। পরমাত্মার আত্মরতি আর কোন প্রকার বুঝিতে পারি না। অন্ততঃ আমি বুঝাইতে পারি না।···কৃষ্ণ সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়ে সর্ব্বগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল। তিনি অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, প্রীতিময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে অপরাঙ্মুখ-ধর্ম্মাত্মা, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ, লোকহিতৈষী, ন্যায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, শাস্তা, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, যোগযুক্ত, তপস্বী। তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা অতিমানুষ চরিত্রের বিকাশ হইতে তাঁহার মনুষ্যত্ব বা ঈশ্বরত্ব অনুমিত করা বিধেয় কি না, তাহা পাঠক আপন বুদ্ধিবিবেচনা অনুসারে স্থির করিবেন। যিনি মীমাংসা করিবেন যে, কৃষ্ণ মনুষ্যমাত্র ছিলেন, তিনি অন্ততঃ Rhys Davis শাক্যসিংহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, কৃষ্ণকে তাহাই বলিবেন—

"The Wisest and Greatest of the Hindus." আর যিনি বুঝিবেন যে, এই কৃষ্ণচরিত্রে ঈশ্বরের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যুক্ত করে, বিনীতভাবে ···আমার সঙ্গে বলুন—

নাকারণাৎ কারণাদ্বা কারণকারণান্ন চ।
শরীরগ্রহণং বাপি ধর্ম্মত্রাণায় তে পরম্ ॥'

অর্থাৎ, বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণকে 'অবতার' ভেবেই প্রণাম করলেন। ঈশ্বরের অবতার কি এবং কাকে বলা যেতে পারে তা নিয়ে বহু মতভেদ রয়েছে। মোটকথা, ঈশ্বর, অর্থাৎ ভগবান কোনও মনুষ্য নয় একথা হিন্দুদর্শনে সর্ববাদীসম্মত। সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত না হলেও, পরোক্ষে সাংখ্যদর্শনের 'পুরুষই' ঈশ্বর। সেই ঈশ্বর রূপাতীত শক্তিরূপে অপরাশক্তি। প্রকৃতি দৃশ্য বিশ্ব। ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মের স্পর্শে প্রকৃতি অভিব্যক্ত ও রূপায়িত। প্রকৃতির সান্নিধানে (অর্থাৎ স্বগুণ) ব্রহ্মের গুণাবলী যে মানবের ভিতর প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত তাকেই 'অবতার' রূপে গ্রহণ করা যায়।

এইভাবে দেখা যায়, বৈষ্ণবদের এক সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণকে এবং অন্য সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্যকে অবতার, কোথাও কোথাও বা ঈশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন। এই চেষ্টার দরুণ তাত্ত্বিক তর্ক স্তূপীকৃত হয়েছে গ্রন্থে গ্রন্থে, কিন্তু সর্বধর্মসমন্বয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

'সপ্তদশ শতাব্দীর পব হইতে বৈষ্ণবধর্মের স্রোত মন্থর হইতে থাকে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে প্রেরণার মূল উৎস শুকাইয়া যাইবার জন্যই এই গতিবেগের স্বল্পতা ও উদ্দীপনার অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই সময় বৈষ্ণবসমাজ বৈশিষ্ট্য হারাইয়া হিন্দু সমাজের রীতিনীতি ও জাতিভেদ প্রথার কঠোরতাকে প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ করে। ক্রমে বৈষ্ণবধর্ম যখন সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত জনসাধারণের বৃহৎ অংশে পৌঁছিল, তখন তাহার মধ্যে শাস্ত্রের বন্ধন ও সামাজিক অনুশাসনের কঠোরতা রহিল না।'

যাই হোক, শ্রীচৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব ধর্ম বিষয়ে কথঞ্চিৎ দীর্ঘ আলোচনার কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও এই বৈষ্ণবধর্মের সমন্বয় ঘটেছে, সেইজন্য সংক্ষিপ্ত হলেও এই ইতিহাসটুকুর সঙ্গে পরিচয় দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে বিভিন্ন ধর্মানুশীলনে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব যথাস্থানে আলোচিত হবে।

বাঙলাদেশে ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে বৈষ্ণবধর্মের স্রোত মন্থর হবার কিছু পূর্ব থেকেই তন্ত্রোক্ত শক্তিধর্মের প্রসার বৃদ্ধি পেতে থাকে। বলা বাহুল্য, কয়েক শতাব্দী পূর্ব হতেই বাঙলাদেশে প্রচলিত। অনেকের মতে—'প্রাচীন ধর্ম-শাস্ত্রের ন্যায় তন্ত্র ভারতের সর্বত্র প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। তন্ত্রশাস্ত্র আর্যগণের সৃষ্ট নহে; ইহা অনার্য আদিম অধিবাসীগণের প্রভাবে বঙ্গদেশেই রচিত হইয়াছিল এবং বঙ্গেই ইহার প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে।' কাহারো মতে মহাযান বৌদ্ধধর্মের সূত্র হতেই তন্ত্রধর্মের উৎপত্তি। 'বৌদ্ধধর্ম ও তন্ত্র ধর্মের কতগুলি মৌলিক প্রভেদের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে, বৌদ্ধধর্ম তন্ত্রের জনক হইতে পারে না। বৌদ্ধমতে নিষ্কাম কর্মের উপদেশ আছে, কিন্তু তন্ত্রে

সকাম কর্মের নির্দেশ রহিয়াছে। তন্ত্রে অধিকারিভেদে বিভিন্ন প্রকার ধর্মোপদেশ আছে, কিন্তু বৌদ্ধধর্মে অধিকারিভেদের বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধধর্মে পশুবলি প্রভৃতি হিংসাত্মক কর্ম গর্হিত বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু তন্ত্রে ছাগ ও মহিষাদির বলির ব্যবস্থা আছে। অবশ্য, হিন্দু তন্ত্রধর্ম যে মহাযান বৌদ্ধতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এতে সন্দেহ নেই। বৌদ্ধতন্ত্র-সাধনমালা দৃষ্টে বুঝা যায় যে, হিন্দু-তন্ত্রের দশমহাবিদ্যা ঐ তন্ত্র হতেই গৃহীত। এ ছাড়া, আরও অনেক প্রমাণ হতে দেখা যায় তন্ত্রধর্ম বৈদিক ধর্মের মতো সুপ্রাচীন নয়।' 'তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন যে ঋগ্বেদের দেবীসূক্তের (১০।১২৫) ঋকগুলিতে দুর্গাদেবীরই প্রচ্ছন্ন উল্লেখ রহিয়াছে এবং এই দুর্গা তন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান দেবীশক্তি বা কালীর পূর্ববর্তী রূপ।'

উক্ত সূক্ত উল্লেখ করে শক্তিতন্ত্রের প্রায় প্রত্যেক প্রবক্তাই দাবী করেন যে বৈদিক যুগেও শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল। কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করলেই বুঝা যাবে যে, এ ধারণা একেবারে ভ্রান্ত। বিশিষ্ট বেদ সমীক্ষায় স্থির হয়েছে যে, ঋগ্বেদের দশটি মণ্ডলের মধ্যে প্রথম সাতটি মণ্ডল আদি এবং প্রাচীন। বাকি তিনটি মণ্ডল পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত। উক্ত সূক্তটি ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দশম অনুবাকের ১২৫ সংখ্যক সূক্ত। প্রায় প্রতিটি চণ্ডী-উপাখ্যানের সংগেই উক্ত সূক্তটি বৈদিক দেবীসূক্ত বলে বর্ণিত। কিন্তু, ঋগ্বেদে উক্ত সূক্তটির সংগে এমন কোনও বর্ণনা নেই। মহর্ষি অম্ভৃণ-কন্যা বাক্‌দেবী ব্রহ্মকে স্বীয় আত্মারূপে অনুভব করে ত্রিষ্টুপ ছন্দে এই সূক্তটি রচনা করেন। এই সূক্তটিতে রুদ্র (সূর্য), অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য ইত্যাদি দেবতারূপে বর্ণিত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, ঋগ্বেদের দেবতা-সংখ্যা মাত্র তেত্রিশটি। হিন্দুধর্মে পরবর্তীকালে বিভিন্ন পুরাণের সাহায্যে সেই দেবতাগণের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে তেত্রিশ কোটিতে। তাও ঋগ্বেদের তেত্রিশটি দেবতা (ইন্দ্র, বরুণ, অর্যমা, সবিতা, অনিল, পূষা ইত্যাদি) এখন আর পূজিত হন না। বলা বাহুল্য, ঋগ্বেদ-দেবতা রুদ্র কিন্তু সূর্য, শিব নয়। উপরি-উক্ত সূক্তে যে সকল দেবতার বর্ণনা রয়েছে তাঁরা কিন্তু কেউই পরবর্তীকালের কোনও তন্ত্রের পূজিত দেবতাই নন। প্রতিটি মুদ্রিত শ্রীশ্রীচণ্ডী পুস্তকেই উক্ত সূক্তটির আদিতে 'ওঁ' ব্যবহার করা হয়েছে, যথা—

'ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥' ১

কিন্তু ঋগ্বেদের উক্ত সূক্তে 'ওঁ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। তেমনি এই বেদের দশম মণ্ডলের দশম অনুবাকের ১২৭ সূক্তটিকে শ্রীশ্রীচণ্ডীর 'রাত্রিসূক্ত' বলে প্রচার করা হয়েছে। এই সূক্তটিরও প্রথমে 'ওঁ' শব্দটি প্রক্ষেপ করা হয়েছে, যা বেদের সূক্তে নেই, যথা—

'ওঁ রাত্রী ব্যাখ্যাদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ।
বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত ॥ ১
ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বতঃ।
জ্যোতিষা বাধতে তমঃ ॥ ২

ঋগ্বেদের বহু সূক্ত প্রকৃতির কাছে ছন্দোময় আরাধনা। এই সূক্তে অন্ধকারময়ী রাত্রিকে আরাধনা করা হচ্ছে যে, তার সর্বব্যাপী অন্ধকারের আচ্ছাদনকে মুক্ত করে উষার আগমনের পথ সুগম করে দেওয়া হোক। বিভিন্ন চণ্ডী-পুস্তকে এই সূক্তটির যে প্রক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা পড়তে গেলে বিস্মিত হতে হয়!

তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে আবার কেউ কেউ বলেন, 'অথর্ব-বেদের ইন্দ্রজাল ও অভিচারাদি প্রক্রিয়া পরবর্তী তান্ত্রিক বিদ্যারই অগ্রদূত।' এই মত সমর্থনযোগ্য। অন্যান্য বেদের তুলনায় এই বেদ সর্বাধিক লোকায়ত। উচ্চকোটির দার্শনিক তত্ত্ব, সর্বাত্মবাদ, একেশ্বরবাদ, বহুর পশ্চাতে একের অস্তিত্ব, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ইন্দ্রজাল, অভিচারবিদ্যা, এমনকি, তন্ত্রশাস্ত্রের কিছু কিছু রহস্যময় শব্দ, বর্ণ ও মন্ত্রাদির পূর্বাভাষ এই বেদে লক্ষণীয়। এই বেদের বিষয়বস্তু লক্ষ্য করে অনেকেই এই মত পোষণ করেন যে, এই বেদ খৃষ্ট-পরবর্তীকালে সংকলিত। অবশ্য, এ-ও লক্ষ্য করা যায় যে, এই বেদের প্রায় এক-সপ্তমাংশ ঋগ্বেদের সূক্ত হতে গৃহীত।

বেদের প্রাচীনত্ব নিয়ে এই আলোচনার কারণ, পরবর্তীকালে যে সমস্ত আভিচারিক পদ্ধতি শক্তিতন্ত্রে প্রবিষ্ট হয়েছিল বা এখনও প্রচলিত রয়েছে, সেগুলো হিন্দু-ধর্মের সুপ্রাচীন মূল ধারায় বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না।

যাই হোক, বৌদ্ধতন্ত্র বাদ দিলে হিন্দু-তন্ত্রের উদ্ভব লক্ষিত হয় অষ্টম কি নবম শতাব্দীতে। তন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান দুটি শাখার প্রথমটি 'আগমতন্ত্রশাস্ত্র' (অর্থাৎ শৈবতন্ত্র) প্রাচীনকালেই সম্ভবতঃ কাশ্মীরে প্রথম উদ্ভব হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে, শাক্ত তন্ত্রধর্মের প্রধান উৎসস্থল বঙ্গদেশ, একথা বহুজনস্বীকৃত।

'তন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সমস্তই তন্ত্রকারগণের স্বকপোলকল্পিত ও রহস্যময় এবং বাস্তবজীবনের সহিত ইহাদের কোন যোগ নেই, এইরূপ ধারণা অনেকে পোষণ করেন। কিন্তু তন্ত্রাচার্যগণ তন্ত্রোক্ত সাধনা ও সাধনপ্রক্রিয়াসকল আলোচনা করে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন যে, বেদান্ত ও তন্ত্রের সাধনার উদ্দেশ্য একই, যদিও উপায় বিভিন্ন পথে। এই দুইটির মধ্যে প্রভেদ এই যে, বেদান্তমতে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় সাধনা; আর তন্ত্রমতে সাধনা ও আভিচারিক প্রক্রিয়া। মানসিক বা আধ্যাত্মিক শক্তির সহিত দৈহিক প্রচেষ্টাও তন্ত্রমতে প্রয়োজনীয়। জীবের শিবত্বকে বেদান্ত শাশ্বত সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে; কিন্তু তন্ত্র বলিয়াছে যে, বিশেষ ক্রিয়াসমূহের দ্বারাই শিবত্ব লব্ধ হইতে পারে।'

'কাহারও কাহারও ধারণা, তান্ত্রিক ধর্ম সাংখ্যদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ... 'পুরুষ' ও 'প্রকৃতি' শব্দ দুইটি সাংখ্য ও তন্ত্র এই উভয় শাস্ত্রেই প্রযুক্ত হইয়াছে; ইহাই সম্ভবতঃ উক্ত ধারণার মূল কারণ। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি এবং তন্ত্রের পুরুষ-প্রকৃতির মধ্যে প্রভেদ যথেষ্ট। সাংখ্যের পুরুষ তন্ত্রের শিবের ন্যায় বিশ্বের পরমাত্মা নহেন; তিনি অখণ্ড, অনন্ত ও শাশ্বত ব্রহ্ম নহেন। সাংখ্য মতে, পুরুষ বহু ও জীবভেদে পুরুষের ভেদ স্বীকৃত হয়। প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রীরূপে মূল প্রকৃতির সহিত তিনি অবস্থান করেন বটে, কিন্তু নিজে নিষ্ক্রিয়; কিছুই

সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতি সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করেন ; পুরুষ সেই সৃষ্টিকার্যের স্থির দ্রষ্টা। সাংখ্যের মূল প্রকৃতি হইতে তন্ত্রের শক্তি বা পরাপ্রকৃতি ভিন্ন। তন্ত্রের পরাপ্রকৃতি পরমেশ্বরের ঐশী শক্তি, উপনিষদ ইহাকেই ব্রহ্মের পরমা শক্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে।'

সনাতন হিন্দুধর্মশাস্ত্রের সাধনা ও চিন্তাধারার সঙ্গে তন্ত্রোক্ত সাধনার ভিতরে যে বিভেদ লক্ষ্য করা যায় সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য উপরি-বর্ণিত বিস্তৃত আলোচনা। বাঙলা-তন্ত্রশাস্ত্রে যুগন্ধর তন্ত্রশাস্ত্রীদের কাল নির্ণয় করলেই দেখা যাবে যে চৈতন্যদেবের সমকালীন বা কিঞ্চিৎ পরবর্তী যুগ হতেই তন্ত্রশাস্ত্র ও তান্ত্রিক ধর্ম বিশেষভাবে প্রচারিত হতে থাকে বাঙলা দেশে। এই বিষয়ে অগ্রণী কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। বাঙলাদেশে প্রচলিত কালীমূর্তির কল্পনা ও পূজার প্রবর্তন নাকি কৃষ্ণানন্দেরই কীর্তি। বিশিষ্ট তান্ত্রিক ও তন্ত্রাচার্যগণের মধ্যে যাঁরা অগ্রণী তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অমৃতানন্দ ভৈরব, রামানন্দ তীর্থ, সর্বানন্দ, ব্রহ্মানন্দ গিরি, পূর্ণানন্দ, পরমহংস পরিব্রাজক ইত্যাদি এবং পরবর্তীকালে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব।

বিশেষভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, সনাতন হিন্দুধর্মের মুখ্য বিষয়-গুলি এবং চরম লক্ষ্য তন্ত্রও মেনে নিয়েছে, প্রভেদ শুধু পদ্ধতির। তন্ত্রের পুরুষ ও প্রকৃতি, অর্থাৎ শিব ও শক্তির বিষয়ে পূর্বেই কিছু আলোচনা হয়েছে। 'এই শিব-শক্তি মানুষের মধ্যে মূলাধার ও কুণ্ডলিনীতে অবস্থান করেন। সমস্ত প্রাণীতেই শব্দব্রহ্ম কুণ্ডলিনী আকারে অবস্থান করেন এবং অক্ষরাকারে প্রকাশিত হন। ··· আত্মাকে কল্পনা করিতে হয় দেবীরূপে···দেবী বা শক্তি ব্রহ্মেরই মাতৃরূপে প্রকাশ মাত্র।··· পরব্রহ্মস্বরূপে দেবী রূপাতীত ও গুণাতীত। তন্ত্রে ইঁহাকে ত্রিবিধরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, প্রথম বা 'পরম'-রূপে তিনি অজ্ঞেয়। তাঁহার দ্বিতীয় বা সূক্ষ্মদেহ মন্ত্রাত্মক। এই নিরাকার রূপ মানুষের ধ্যানশক্তির অগম্য বলিয়া শক্তি তৃতীয় বা স্থূলদেহে অধিষ্ঠান করেন, এইরূপে মানুষ সহজে তাঁহাকে ধ্যানের গোচর করিতে সমর্থ হয়।··· শক্তির আকারের অন্ত নাই। তিনি বিশ্বের প্রাণী ও অপ্রাণী সকলের মধ্যেই বিরাজমানা। কিন্তু তিনি বস্তুতঃ এক এবং একটি চন্দ্র যেমন বিভিন্ন জলাধারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনই ইনিও বিভিন্ন বস্তুতে ও প্রাণীতে নিজেকে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। উক্ত শক্তি বা পরাশক্তি অথবা মহাশক্তি সর্বদাই শিবাশ্রিতা। বিশ্ব-বিকাশে শক্তির প্রাথমিক বিকাশ। ইহার পূর্বে শক্তি শিবে স্তিমিতা বা নিমীলিতা। এই যে নিমীলন, এই যে পরমশিবের নির্বিশেষ স্থিতি, ইহাকেই শৈবাগমে সাধারণতঃ 'শূন্য' বলা হয়। এই অবস্থা অতিমানসিক ; ইহা সকল সংজ্ঞা বা জ্ঞানের অতীত বলিয়াই ইহা 'শূন্য' নামে অভিহিত।'

পূর্বেই বলা হয়েছে, তন্ত্রোক্ত সাধনমার্গে কর্ম ও শারীরিক প্রক্রিয়া রয়েছে, যাকে বলা হয় আচার বা অভিচার। এই আচার বা প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা দরকার। 'কুলার্ণবতন্ত্র' মতে সাধনার সাতটি স্তর, যথা—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার। 'বেদাচারে বৈদিক কর্ম-

কাণ্ডের অনুষ্ঠানই অধিক। বৈষ্ণবাচারে অন্ধ বিশ্বাস কাটাইয়া উপাসক ব্রহ্মের রক্ষিণী শক্তির প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসী হন।...তৃতীয় আচারে হয় জ্ঞানমার্গে প্রবেশ... চতুর্থে সাধক ব্রহ্মের ক্রিয়া, ইচ্ছা ও জ্ঞান এই ত্রিবিধ শক্তির ধ্যানধারণা করিতে সমর্থ হন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পূজার যোগ্যতা অর্জন করেন। পঞ্চমে সাধকের প্রবৃত্তিমার্গ হইতে নিবৃত্তিমার্গে গমন হয়। দয়া, মোহ, লজ্জা, কুল, শীল, বর্ণ প্রভৃতি যেসব পাশে পশুভাবাপন্ন মানুষ আবদ্ধ থাকে, এই আচারে সাধক উহাদিগকে ছিন্ন করেন। এই অবস্থায় তিনি শিবত্বপ্রাপ্তির যে পথ পাইলেন তাহারই সমাপ্তি হইল ষষ্ঠ আচারে।'

সপ্তম, বা কৌলাচার গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। কৌলাচার সমাপান্তে সাধক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতঃ পরমহংসত্ব অর্জন করে। ইহাই তান্ত্রিক সাধনার চরম লক্ষ্য। এই সাধনায় পঞ্চ ম-কারের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—এই পাঁচটিকে বলা হয় পঞ্চ ম-কার। 'বীরপ্রকৃতির সাধক এই পাঁচটিকে স্বরূপে ভোগ করিয়া সাধনায় অগ্রসর হইবেন। পশুপ্রকৃতির সাধকের পক্ষে ইহাদের স্বরূপে ভোগ নিষিদ্ধ।...এই পঞ্চ ম-কার সাধনাকে উদ্দেশ্য করিয়াই অনেকে তন্ত্রের তীব্র নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু, তান্ত্রিক দর্শনের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তন্ত্র সাধককে এই পাঁচটি ম-কারের সাধনার অধিকার দিয়ে সাধককে হীন প্রবৃত্তি সমূহের চরিতার্থতার প্রশ্রয় দেয় নাই ; শ্রেয়কে লাভ করিবার জন্যই প্রেয়ের বিধান করিয়াছে। এই ভোগ উপেয় নহে, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মসত্তাকে উপলব্ধি করিবার উপায় মাত্র। সাধক যে কোন অবস্থায় এই ভোগে লিপ্ত হইতে পারেন না। আধ্যাত্মিক জীবনে চরম সীমায় পৌঁছিয়া গুরুর সতর্ক তত্ত্বাবধানে সাধক এই সাধনা অবলম্বন করিতে পারেন।...কেবল সংযত বীরাচারী সাধকের পক্ষেই সাধনা বিধেয়।'

তন্ত্রসাধনা বললে শুধু সাধকের নিজস্ব শিবত্বপ্রাপ্তির জন্য সাধনাই বোঝায় না, তন্ত্রোক্ত দৈবীশক্তির পূজা-উপচারও বোঝায়। দুর্গা, কালী, দশমহাবিদ্যা ইত্যাদি শক্তি-দেবীর পূজা বর্তমানে বাঙলাদেশে এতো ব্যাপক যে, হিন্দুধর্মসাধনার যে অন্যান্য পথও রয়েছে তা যেন লক্ষিতই হয় না। শাক্ত-ধর্মের এই ব্যাপকতার কারণও আছে। 'ব্রাহ্মণ্য ধর্মে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সমূহের নিরোধ সম্বন্ধে অনুশাসন কঠোর। কিন্তু, তন্ত্রে মানুষের স্বাভাবিক জৈবপ্রকৃতিকে স্বীকার করিয়া লইয়াই সাধনার পথ নির্দেশিত হইয়াছে। ইহা তান্ত্রিক ধর্মের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। প্রবৃত্তিমার্গে সাধনার প্রতিই মানুষের প্রবণতা অধিকতর। প্রকৃতিকে বর্জন করিয়া নহে, অর্থাৎ বৈরাগ্য-সাধনে ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া নহে, প্রকৃতির সাহায্যেই সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন—তান্ত্রিক ধর্মের ইহাই আদর্শ।'

কিন্তু সাধনার পথে ভোগ ও সম্ভোগের দ্বার খুলে দিলে সাধারণ মানুষ তত্ত্বজ্ঞানের পথ সহজেই বিস্মৃত হয়ে বাসনা ও কামনা পূরণের দ্বারা আত্মতুষ্টি লাভের পথেই অগ্রসর হয়। ধর্মসাধনায় সংযমের বন্ধন শিথিল হয়ে তামসিক অভিচারগুলি প্রাধান্য লাভ করে। মুসলমান রাজ্য পতনের পরে ইংরেজ রাজত্বের প্রাথমিক পর্যায়ে রাষ্ট্রবন্ধন শিথিল থাকায় এবং বিদেশী ধর্মানুশাসন হতে মুক্তি

পেয়ে বাঙলাদেশে এই শক্তিতন্ত্র সাধনা কোন্ পর্যায়ে অবনত হয়ে গিয়েছিল তার কিছু নিদর্শন পরবর্তী অধ্যায়ে উদ্ধৃত হয়েছে।

এবার অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসকে কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক।

২৩শে জুন, ১৭৫৭ সনে পলাশীর রণাংগনে সিরাজদৌল্লার পরাজয়ের পরে বাঙলাদেশে ইংরেজের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, তথা ইংরেজ শাসনের গোড়াপত্তন হয়। অবশ্য সিরাজকে পরাজিত করবার জন্য তৎপূর্বেই ১লা মে ১৭৫৭ সনে মীরজাফরের সংগে কোম্পানীর কাউন্সিলের এক গোপন সন্ধি হয়। সেই সন্ধির শর্তের কিয়দংশ উল্লেখযোগ্য : 'কলিকাতার সীমানা ৬০০ গজ বাড়ানো হইবে এবং এই বৃহত্তর কলিকাতার অধিবাসীরা সর্ববিষয়ে কোম্পানীর শাসনাধীন হইবে। কলকাতা হইতে দক্ষিণে কুলপি পর্যন্ত ভূখণ্ডে ইংরেজ জমিদার-স্বত্ব লাভ করিবে। ...সুবে বাংলাকে...শত্রুদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোম্পানী উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য নিযুক্ত করিবে এবং তাহার ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত জমি কোম্পানীকে দিতে হইবে।......হুগলীর দক্ষিণে গংগার নিকট নবাব কোন নূতন দুর্গ নির্মাণ করিতে পারিবেন না।...'

এই শর্তাংশ থেকেই বোঝা যায়, বাঙলা তথা ভারতের বুকে ইংরেজের প্রথম পদক্ষেপ কতটা ফলপ্রসূ হয়েছিল। মনে হয়, শুধু মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই সিরাজের পতন হয়েছিল তা নয়। সাড়ে পঁচিশ বছরের নবাবী শাসনে বাঙলার জনগণও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। না হলে ক্লাইভ মাত্র ৩,০০০ সৈন্য নিয়ে নবাবের ৫০,০০০ সৈন্যকে পরাজিত করতে পারতেন না। ২৯শে জুন ক্লাইভ মাত্র ২০০ ইউরোপীয়ান ও ৫০০ দেশীয় সৈন্য নিয়ে বিজয়গর্বে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করেন। ক্লাইভ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—'এই উপলক্ষে বহু লক্ষ দর্শক উপস্থিত ছিল। তাহারা ইচ্ছা করিলে শুধু লাঠি ও ঢিল দিয়াই সৈন্যদের মারিয়া ফেলিতে পারিত।'

যাই হোক, সিরাজের পরেও মীরজাফর, মীরকাশিম ইত্যাদির অধীনে বাঙলায় নবাবী আমল আরো কয়েক বছর চলে। তারপর প্রকৃতপক্ষে নবাবী আমলের আধিপত্য শেষ হয় ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে। ১৭৬৭ সনে ক্লাইভ স্বদেশে ফিরে যান। ক্রমে ভেরেলষ্ট ও কার্টিয়ার ইংরেজ কোম্পানীর গভর্ণর নিযুক্ত হয়। যদিও কোম্পানী নামে দেওয়ান ছিল, প্রকৃতপক্ষে তখন দেওয়ানী করত নায়েব-দেওয়ান রেজা খাঁ। এই সময়ে কু-শাসনের জন্য জনসাধারণ দুঃখ-দুর্দশার চরমে পৌঁছায় এবং শেষ পর্যন্ত ১১৭৬ সালের (১৭৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দ) ইতিহাস-কুখ্যাত মন্বন্তরে বাঙলার এক-তৃতীয়াংশ (প্রায় ১ কোটি) অধিবাসীর অনাহারে ও রোগে জীবনাবসান ঘটে।

এতদিন ইংরেজ বাঙলা শাসন করত কোম্পানীর মারফৎ। কু-শাসনের ফলে এই মন্বন্তরের ইতিহাস বিলেতে কর্তৃপক্ষ অবগত হয়ে উক্ত দ্বৈতশাসন প্রণালীর অবসান ঘটিয়ে সরাসরি ইংরেজ শাসনের অধীনে এনে ১৭৭২ সনে ওয়ারেন হেস্টিংসকে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণর ও দেশের শাসনকর্তা রূপে নিযুক্ত করে এদেশে পাঠিয়ে দেয়। ভারতে বৃটিশ শাসনের আদিতে হেস্টিংসের ভূমিকা

সুদূরপ্রসারী। সেই সংগে একথাও বলা যেতে পারে যে, ঊনবিংশ-শতাব্দীর প্রারম্ভেই বাঙলায় যে নবজাগরণের (রেনেশাঁ) সূত্রপাত হয়েছিল তার বীজ বপন হয় এই সময়েই।

বাঙলায় মুসলমান রাজত্বের অবসানের পর থেকেই বাঙালী তার নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ইত্যাদি সম্প্রসারণের স্বাধীনতা আবার ফিরে পায়। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অতীতে সাংস্কৃতিক নবজাগরণের ইতিহাসের মতো এখানেও অতীতের প্রত্যেকটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবই ছিল ধর্মভিত্তিক। পূর্বেই বলা হয়েছে, বাঙলায় ইস্‌লামধর্ম অনুপ্রবেশ করেছিল, কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাতে পারেনি। মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠার পরে প্রকৃতপক্ষে প্রথম সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হয় চৈতন্যদেবের সময়ে। তাঁর পরবর্তীকালে শাক্ত-ধর্মের সম্প্রসারণের যুগে। এই দুইটি ধর্ম হিন্দুধর্মের সংগে সমান্তরাল নয়, প্রকৃতপক্ষে অংগীভূত। বস্তুত হিন্দুধর্মকে একটি ধর্মমণ্ড বলা যেতে পারে। অন্যান্য ধর্ম-শাসনের নির্দিষ্ট গ্রন্থের মতো (কোরাণ, আভেস্তা, থোরা, ত্রিপিটক, বাইবেল ইত্যাদি) হিন্দু ধর্মের অনুশাসনের কোন নির্দিষ্ট গ্রন্থ নেই। বৈদিক যুগের পরবর্তীকালে যাজ্ঞ্যবল্ক, মনু, বা পুরাণ রচয়িতারা যা করতে চেয়েছিলেন তা সামগ্রিক হিন্দুধর্মের রূপ নেয়নি। সেইজন্য, তাঁদের মারফৎ এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধর্মসংস্কারক মারফৎ প্রখ্যাত হিন্দুধর্মে শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হয়েছে মাত্র। বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেবে। বৌদ্ধধর্মের কথাই ধরা যাক। হিন্দুধর্মমণ্ডে ব্রাহ্মণ্যধর্মশাখার অনুশাসনের ভিত্তিতেই বুদ্ধ সর্বপ্রথম জীবন্মুক্তির পথ খুঁজেছিলেন। সে পথে হতাশ হয়ে পরে অবশ্য তাঁর তপস্যালব্ধ নূতন পথের সন্ধান পেলেন। তিনি ঈশ্বরকে স্বীকারও করলেন না, অস্বীকারও করলেন না। বাস্তব প্রমাণের অভাবে ঈশ্বরকে এড়িয়ে মধ্যপথে এক লোকায়ত ধর্ম প্রবর্তন করলেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী-কালে মহাযান বৌদ্ধধর্মশাখায় তন্ত্রের অনুপ্রবেশের পরে প্রকারান্তরে পরমব্রহ্ম স্বীকৃত হলো। এ ঘটনা ঘটেছে সনাতন বৈদিক ধর্মশাখায়, বৈষ্ণবধর্ম-শাখায় এবং হিন্দুধর্মের আরো শাখা-প্রশাখায়। বর্ণাশ্রম ধর্মের সম্প্রসারণের পরে সার্বিক হিন্দুধর্মে ক্রমশ তথাকথিত যে সকল আচার-ব্যবহারের প্রচলন হতে লাগল তাতে নিম্নবর্ণের জনসাধারণের দুর্দশার আর সীমা রইল না। অতঃপর বর্ণস্তরহীন বৌদ্ধধর্ম এসে সেই জনসাধারণকে সাময়িক মুক্তি দিতে পারল মাত্র। কারণ, এই ধর্মেরও শাখা-প্রশাখা ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে আচার-বন্ধনের শৃংখল ক্রমশ দৃঢ় হতে লাগল। পরবর্তী বৈষ্ণবধর্মেরও সেই একই ইতিহাস। বিশেষ করে রাধাতত্ত্ব অনুপ্রবেশ করবার পরে বৈষ্ণবধর্মও এক ভিন্নপ্রকার শক্তিতন্ত্রের প্লাবন এড়িয়ে যেতে পারেনি। ঐ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ইতিপূর্বেই হয়েছে। তার-পরে হিন্দুধর্মমণ্ডে শাক্ততন্ত্র এলো প্লাবনের মতো। এ বিষয়েও পূর্বেই আলোচনা হয়েছে। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিমকালে হিন্দুধর্ম এবং তার প্রতিটি শাখা আচার এবং অনুষ্ঠানসর্বস্ব হয়ে দাঁড়াল। আধ্যাত্মিকতা এবং নৈতিকতা

ক্রমশই লুপ্ত হতে লাগল ধর্মমণ্ড হতে। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় রাজা রাজ-কৃষ্ণের বাড়িতে অনুষ্ঠিত দুর্গাপুজোর এক বিবরণে পাওয়া যায়—

'দিনের পুজো শেষ হইলে ধনী লোকের বাড়ীতে দেবীর মূর্তির সম্মুখে একদল বেশ্যার নৃত্যগীত আরম্ভ হয়। তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র এত সূক্ষ্ম যে তাহাকে দেহের আবরণ বলা যায় না। গানগুলি অতিশয় অশ্লীল এবং নৃত্যভংগী অতিশয় কুৎসিত। ইহা কোনও ভদ্রসমাজের উচ্চারণ বা বর্ণনার যোগ্য নহে। অথচ দর্শকেরা সকলেই ইহা উপভোগ করেন—কোনরকম লজ্জা বোধ করেন না।' পুজোয় পাঁঠা ও মহিষ বলি সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—'নদীয়ায় বর্তমান মহারাজার পিতা পুজোর প্রথম দিন একটি পাঁঠা বলি দেন। তারপর প্রতিদিন পূর্বদিনের দ্বিগুণ সংখ্যা এবং এইরূপে ১৬ দিনে ৩২,৭৬৮ পাঁঠা বলি দেন!···বলি শেষ হইলে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ নিহত পশুর রক্তলিপ্ত কর্দম গায়ে মাখিয়া উন্মত্তের মত নাচিতে আরম্ভ করে এবং তারপর রাস্তায় বাহির হইয়া অশ্লীল গীত ও নৃত্য করিতে করিতে অন্যান্য পুজো-বাড়ীতে গমন করে।'

এই সকল অনুষ্ঠান, সতীদাহ প্রথা, গঙ্গাসাগরে শিশু বিসর্জন, তন্ত্রসাধনায় নরবলি ইত্যাদি অনেক রকম বীভৎস অনুষ্ঠান ধর্মানুষ্ঠান বলে প্রচারিত হয়ে-এবং বিশেষ করে কলকাতায় "বাবু সংস্কৃতি" নামে এক অপ-সংস্কৃতি যুক্ত হয়ে সমাজের এবং ধর্মের পথে প্রকৃত প্রগতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনকি, তৎকালীন ইংরেজ-শাসনও জনসাধারণের অপ্রীতিকর হবে বলে এই সকল অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়া দূরে থাক, বরং সহযোগীই ছিল। প্রকৃতপক্ষে হেষ্টিংসের সময় থেকে ১৮১৩ সাল পর্যন্ত ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সীমানার মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ ছিল, যে জন্য উইলিয়ম কেরীকে ডাচ্ উপনিবেশ শ্রীরামপুরে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে প্রথম মিশন খুলতে হয়। এমনকি কোনও সরকারী কর্মচারী স্ব-ইচ্ছায় খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও তার চাকরি যেত। ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে কালীঘাটের কালীবাড়িতে পুজো দেওয়া হতো। এই বিষয়ে একটি বিবরণে পাওয়া যায়—'ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে কোম্পানীর লোকেদের এতই ভয় যে দেশীয় কোনো কর্মচারী খ্রীষ্টান হলে তার চাকরি খতম করা হত। ১৮১৯ সালে মিরাটে প্রভুদীন নামে এক পদস্থ সৈনিক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করায় তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। লোকতুষ্টির জন্য কালীঘাটে পুজো দেওয়া হত।' পাদরি ওয়ার্ড তাঁর জার্নালে লিখেছেন—

"Last week, a deputation from the Government went in procession to Kaleeghat, and made a thank-offering to the goddess of the Hindoos, in the name of the Company for the success which the English have already lately obtained in the country. Five thousand rupees were offered. Several thousand natives witnessed the English presenting their offerings to this idol. We have been much grieved at this act, in which the natives exult over us."

১৭৮৫ সনে হেষ্টিংস স্বদেশে ফিরে যাবার পরে বড়লাট হয়ে এলেন লর্ড কর্নওয়ালিস। তারপর ১৭৯৮ সনে এলেন লর্ড ওয়েলেস্‌লী। এই দুই লর্ডের শাসনকাল ইংরেজের রাজ্যবিস্তার ও দৃঢ়ভাবে ইংরেজ শাসন পত্তনের ইতিহাস মাত্র। তবুও ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় স্থাপিত হলো ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। যদিও এই কলেজ প্রতিষ্ঠার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল নবাগত ইউরোপীয় কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষাদান, তথাপি উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের প্রারম্ভে এটি একটি বিশেষ ঘটনা। আর যেটি যুগান্তকারী ঘটনা সেটি হলো, কেরী সাহেবের এদেশে আগমন। খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়েই ১১ই নভেম্বর, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এদেশে পৌঁছান। কিন্তু সরকারী বিধি-নিষেধের জন্য কলকাতায় তাঁর উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হলো না। সাতমাস নানা যায়গায় ঘুরে অবশেষে চাকরি নিলেন মালদহের মদনাবাটীতে, উড্‌নী-সাহেবের নীলকুঠিতে। ইতিমধ্যে তিনি যেটুকু বাঙলা শিখেছিলেন তার উপর নির্ভর করেই খৃষ্টধর্মের 'গসপেল' বা 'সুসমাচার' বাঙলায় অনুবাদ করতে শুরু করেন। এ-দেশের পঞ্চানন কর্মকারের প্রচেষ্টায় প্রথম বাঙলা হরফের ছাঁচ তৈরি হচ্ছে এবং বিলেতে বাঙলা হরফে ছাপা-কাজ শুরু হয়েছে। কেরী কাঠে-লোহায় তৈরি একটি ছাপাখানা কিনে এবং কলকাতায় বাঙলা হরফ সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন মদনা-বাটীতে। ইতিমধ্যে লোকসানের জন্য উড্‌নী-সাহেবের নীলকুঠি উঠে গেলে কেরী সাহেব কাছেই খিদিরপুর গ্রামে এক নীলকুঠি কিনে সংসার ও ছাপাখানা নিয়ে মদনাবাটী ছেড়ে চলে গেলেন। সেখানেই ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম বাঙলা ছাপাখানার কাজ শুরু হলো—নিজেরাই কম্পোজিটর, নিজেরাই মেশিনম্যান।

কেরীর ভারত আগমনের প্রায় ছয় বছর পরে ১৩ই অক্টোবর ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ব্যাপটিষ্ট মার্শম্যান ও ওয়ার্ড প্রমুখ পাদরিরা কোনও প্রকারে শ্রীরামপুর এসে পৌঁছলেন। তাঁরাও বৃটিশ-ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচারে সরকারী বাধা-নিষেধের সম্মুখীন হলেন। নিরুপায় হয়ে কেরী সাহেবের সংগে পরামর্শ করবার জন্য তাঁরা এলেন মালদহের খিদিরপুরে। অনেক বুঝিয়ে কেরী সাহেবকে রাজী করানো গেল। তিনি নীলকুঠি ইত্যাদি বিক্রী করে শ্রীরামপুরে এসে মিলিত হলেন মার্শম্যানদের সংগে এবং ১১ই জানুয়ারি ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রথম ব্যাপটিষ্ট্ মিশনের পত্তন করলেন।

কেরী, জশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়ম ওয়ার্ড সহযোগী হয়ে সেখানে বিদ্যালয় স্থাপন করেন, অবশ্য 'প্রথমে ইংরেজদের জন্য'। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা, বাঙলা ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণ সংকলন এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বই ক্রমশ প্রকাশ করেন।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত খৃষ্টান-ধর্ম ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের পর থেকে ইংরেজ রাজত্বে অনুপ্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছিল। বাধানিষেধ থাকলেও তৎপূর্বেও কলকাতার বাইরে গ্রামে গ্রামে গোপনে খৃষ্টধর্ম-প্রচার ইংরেজ কর্মচারীগণ দেখেও দেখতেন না। কারণ, এদেশের সাধারণ লোকেরা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলে বরং ইংরেজের ভক্ত হয়ে উঠত। তার অবশ্য কারণ ছিল। 'সাধারণ দরিদ্র ও হিন্দুধর্মের ভিত অত্যন্ত কাঁচা। সেখানে পাদরিদের কার্য সফল হতে থাকে ভালোভাবেই। হিন্দুর ধর্মের খুঁটির জোর আচার-পালনে, জাত-মানায়—শাস্ত্র চোখেও দেখে না, পড়তেও

পারে না, কারণ, হিন্দুর শাস্ত্র বলে কোনো একটা গ্রন্থ নেই, যেমন আছে খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের। তাই তাদের আচার-সর্বস্বতা ভাঙলেই ধর্মের ভিত যায় টলে, তখন তারা অন্য ধর্ম গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার-প্রচেষ্টা প্রায় ব্যর্থই হয়েছিল বলতে হবে ; মুসলমানদের ধর্মের ইমারত বেশ পাকা ভিত্তির উপর খাড়া। হিন্দুর 'জাত' গেলেই 'ধর্ম' যায়, তখন তাকে আশ্রয় দিতে পারে ইসলাম অথবা খ্রীষ্টান ধর্ম…।' মুসলমান রাজত্বকালে মোল্লাগণ উক্ত কারণে 'পতিত' হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করতে সমর্থ হয়েছিল। এই সময়ে পাদরিগণও সেই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে পশ্চাৎপদ হলেন না।

১৮১৩ সনে ভারতে পরিবর্তিত ইংরেজ শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হবার পরে ইংরেজ রাজত্বে খৃষ্টধর্ম প্রচারের বাধা-নিষেধ শিথিল হয়। অচিরেই ইংরেজ ও অন্যান্য ব্যাপটিষ্টদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি হতে থাকে। ১৮১৭ সালের মধ্যে একমাত্র শ্রীরামপুর মিশনই প্রায় দশহাজার সন্তান-সন্ততিসহ চারশ থেকে পাঁচশজনকে ধর্মান্তরিত করে।

ব্রহ্মকেন্দ্রিক ও মানবকেন্দ্রিক ধর্মবিষয়ে সামান্য আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক— দ্বিতীয় স্তরের ধর্ম কয়টিই আজ বিশ্বে বিস্ময়কররূপে সম্প্রসারিত কেন তার ইতিহাস একটু জানা দরকার।

বৈদিক ও ইহুদী এই দুটি পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম—এদের ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবজাতির সমাজবন্ধনের সূত্রপাত হতে। প্রকৃতি-বিস্ময়বাদ হতে এই ধর্মদ্বয়ের কল্পিত দেবতাগণের সৃষ্টি। পৃথিবীর অন্য তিনটি প্রখ্যাত ধর্ম বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও ইস্‌লাম। এই তিনটি ধর্মই অবতার-কেন্দ্রিক, এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই তিনটি ধর্মই পরে প্রবর্তিত হয়েও বিশ্বধর্ম হয়ে উঠল। আর, সনাতন ধর্ম দুটি সম্প্রসারিত হওয়া দূরে থাক, সীমাবদ্ধ হয়ে রইল ভারত আর ইস্‌রায়েলের মধ্যে! 'এর সংগত কারণ নিশ্চয়ই আছে। আচার-সর্বস্ব ধর্মে দেহের শুচিতা রক্ষা করতে করতেই মানুষের দিন যায়—'বিশ্বকে' বাদ দিয়েও মানুষকে উপেক্ষা করে তারা 'বিশ্বনাথ'-কে ডাকে…বিশ্বকে আহ্বান করে আত্মীয় করবার অসংখ্য বাধা তাদের। আজ পর্যন্ত 'হিন্দুধর্ম'-এর সংজ্ঞা…খুঁজে পাওয়া যায় নি। …ইহুদীধর্ম ইস্‌রেইলি জাতির মধ্যে সীমিত থেকে গেল, ইহুদীধর্ম প্রচারধর্মী হতে পারে নি। এই দুই ধর্ম অন্যকে…দীক্ষা দিয়ে নিজ ধর্ম মধ্যে গ্রহণ করতে পারে না।…হিন্দু-সমাজের চারপাশে যারা ছিল…তাদের অবস্থা না ঘরকা, না ঘাটকা। তাই এদের মধ্যে বেশির ভাগ পরে ইস্‌লামে আশ্রয় নেয়, অথবা খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করে।'

মানবকেন্দ্রিক ধর্মের আর একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রত্যেকটি ধর্মগুরুই যা বলে গেছেন, অর্থাৎ যে তত্ত্বের উপরে তাঁদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত, সেগুলো সবই কিন্তু ঈশ্বর কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট বলে দাবি করা হয়। আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐ প্রতিটি ধর্মের প্রচুর তত্ত্ব বা আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সামিল! তুলনা করতে গেলে এমন ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে,

মূলগত তত্ত্ব এক—কেবল তাদের বাহ্যিক আচার-অভিচারে পার্থক্য। অবশ্য, ইতিহাসের দিক থেকে সনাতন হিন্দুধর্মের সেই সকল আদি তত্ত্ব সর্বপ্রাচীন। সীমিতস্থান, না হলে অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত করা যেত।

হিন্দুধর্মের মূলগত তত্ত্বগুলি অনুধাবন করা সাধারণের পক্ষে কঠিন। অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সূক্ষ্ম বিভেদ সম্যকরূপে অনুধাবন করা সহজসাধ্য নয়। সেক্ষেত্রে মানবকেন্দ্রিক ধর্মের অনুশাসনগুলো সহজেই সকলের বোধগম্য। বোঝবার জন্য তর্ক, মীমাংসা বা গুরুর দরকার হয় না। খুব সহজেই সাধারণ মানুষের দুর্বল মনে সে সকল স্পর্শ করে। মানবাতীত ধর্মের বহুধা দৈবীশক্তির জটিলতাকে এড়িয়ে তারা পায় মাত্র একটি মানুষ-দেবতা। কঠোর যুক্তির বোঝা বইতে হয় না, আসে তর্কহীন ভক্তির পথ। আব যখন দেখা যায় সেই পথেই ব্যবহারিক জীবন বেশ চলে যায় তখন তার পক্ষে সহজ পথ গ্রহণই সহজসাধ্য হয়।

খৃষ্টধর্মের মূলগত সুর এই সহজ সারল্যের মধ্যে নিহিত। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ যেমন অনেক, তেমনি ইহুদী এবং খৃষ্টধর্মের আদিগ্রন্থও ৩৯-টি বইয়ের সমষ্টি। আবার বাইবেলের দুটি অংশ—পুরাতন অনুশাসন (Old Testament) এবং নূতন অনুশাসন (New Testament)। প্রথমটি ইহুদীদের এবং দ্বিতীয়টি খৃষ্টানদের। কিন্তু নূতন অনুশাসনের প্রায় চার-পঞ্চমাংশই ইহুদীদের হিব্রু বাইবেল থেকে গৃহীত। তোলস্তয় (Tolstoy) এগিয়ে গেছেন আর এক ধাপ। তাঁর মতে New Testament সাধু পল Old Testament-এর পরিপূরক হিসেবে সংযোজিত করেছিলেন। বলা বাহুল্য, 'খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বধর্ম হয়েছে, কিন্তু তার পটভূমে রয়েছে ইহুদীদের ধর্ম ও তার ধর্মগ্রন্থগুলি।' তথাপি খৃষ্টানদের সংগে ইহুদীদের সম্বন্ধ অহি-নকুলের। (তার একমাত্র কারণ বোধহয় জুডাস্ ইস্কেরিয়েট্, ইতিহাসে যে যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হবার জন্য দায়ী।)

'হিব্রু বাইবেলকে আমাদের মহাভারত ও পুরাণাদির সংগে তুলনা করলে ভালো হয়। ইহুদী জাতি বা উপজাতি-সমূহের নানা যুগের ভাবনারাশির সাহিত্যরূপ ওল্ড টেস্টামেণ্টে সঞ্চিত আছে। সৃষ্টিতত্ত্ব, আদিমানবের জন্ম কথা, পৌরাণিক কথা…রাজকাহিনী, বিচিত্র সুরের কবিতা, গান, দেবস্তুতি, জাতির প্রবাদবচন, প্রভৃতির সংগ্রহ-গ্রন্থ এই বাইবেল।'

বাইবেলে-ব্যাখ্যাত ৩৯-খানি বইয়ের মধ্যে এমন কতকগুলি বই স্থান পেয়েছে, যেগুলো আদিতে ধর্মগ্রন্থ বলে স্বীকৃত হয়নি। স্বীকৃত না হবার অনেক কারণও ছিল। যে জন্য গীতগোবিন্দ আদিতে ধর্মগ্রন্থ বলে স্বীকৃত হয়নি, সেই কারণেই বোধহয় Solomon's Songs (The Book of Job) গীতিকাব্য আদিতে ধর্ম-গ্রন্থ বলে স্বীকৃত হয়নি। পরবর্তীকালে উক্ত দুটি গ্রন্থের কাহিনীরই একরকম রূপক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয় এবং দুটিই দুই ধর্মে ধর্মগ্রন্থের আসন লাভ করে। দুইটি বইয়ের উপাখ্যানই কিন্তু একইপ্রকার রসকাব্য। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' সমালোচনায় প্রখ্যাত লেখক প্রমথ চৌধুরী বলেন: 'শুনিতে পাই, গীতগোবিন্দের নাকি একটি আধ্যাত্মিক অর্থ আছে; জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার নিগূঢ় মিলনের বিষয়ই নাকি রাধাকৃষ্ণের প্রেমবর্ণনাচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। আমি

যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে এ কাব্যে আধ্যাত্মিকতার কোনো পরিচয় নেই।···রাধা কৃষ্ণের বিরহে কাতর হইয়া সখীকে বলিলেন—

সখি হে কেশিমথনমুদারম্
রময় ময়া সহ মদনমনোরথভাবিতয়া সবিকারম্।

···কৃষ্ণের সহিত মিলন হইলে কৃষ্ণ কি করিবেন··· রাধা সে-বিষয়ে সখীকে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। সে বক্তৃতাটি ইচ্ছা সত্ত্বেও এ সভায় আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইতে পারিলাম না।'

এখন Solomon's Songs, যাকে Song of Songs-ও বলা হয়, তার থেকে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করা যাক :

'There are threescore queens, and fourscore concubines
And virgins without number.
My love, my undefiled is but one ;
She is the only of her mother,
She is the choice one of her that bare her.
The daughters saw her, and blessed her ;
Yea, the queens and the concubines, and they praised her.'

এই কাব্যসংগীতটির বর্তমান সম্পাদক Louis Untermeyer বলেন : 'No poem has had a more curious or confused history than The Song of Songs. There it is, a divine irrelevance, a passionately living, frankly sexual love poem in the midst of Holy Writ···Never has there been a more magnificently inappropriate setting for a collection of amorous lyric poems.' টীকা নিষ্প্রয়োজন।

এই সকল প্রক্ষিপ্ত ও ধর্মগ্রন্থরূপে কথিত বিক্ষিপ্ত কাব্যকাহিনী চয়ন করে বিভিন্ন ধর্মের মূল তত্ত্বে পেঁছিন খুব দুরূহ। পৃথিবীর বিশিষ্ট ধর্মগুলির তত্ত্বের যেখানে সমম্বয়, দেখা যাক সেখানে পেঁছিন যায় কিনা।

খৃষ্টধর্মের 'সুসমাচার' (Gospel) ম্যাথু, মার্ক, লুক এবং জন নামে খৃষ্টীয় সাধুগণ দ্বারা সংগৃহীত। যীশু-জীবনী সম্বন্ধে তথ্য ও তাঁর বাণী এই চারখানি গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই সমস্তই যীশুর মৃত্যুর অনেক পরে লিখিত বা সংগৃহীত হয়। চারটি গস্‌পেলের মধ্যে, বিশেষ করে জন দ্বারা লিখিত গস্‌পেল ও অন্যান্য তিনটির মধ্যে অনেক বিভেদ লক্ষণীয়। এমনকি, যীশুর বাণী বলে কথিত বাণীগুলোও তাঁর তিরোধানের প্রায় ষাট বছর পরে লোকের মুখে মুখে শোনা কথা থেকে উপরি-উক্ত খৃষ্টীয় সাধুগণ যে যার মতো করে গস্‌পেল সম্পাদনা করেন। সাধু জনের গস্‌পেল যীশুর লীলাভূমিতে বসেও লেখা হয়নি। এইজন্যই বোধহয় চারটি গস্‌পেলের মধ্যে, বিশেষ করে প্রথম তিনটির সঙ্গে জন-লিখিত গস্‌পেলের মধ্যে প্রভেদ অত্যন্ত স্পষ্ট।

যাই হোক, অনেকের মতে মানবদরদী মহান যীশু যে মানবপ্রেমধর্মের

উদ্গাতা, যিনি সেবার আদর্শ, যাঁর আত্মনিবেদনের বাণী প্রত্যেকটি সরল মানুষকে আকৃষ্ট করত, আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর তিরোধানের পরবর্তীকালে সাধু পল ও অন্যান্য খৃষ্টীয় সাধুগণ যে খৃষ্টধর্ম প্রচার করলেন তার মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। তাঁরা যীশুকে বললেন, 'ঈশ্বরের সন্তান, তাঁর অবতার ; ঈশ্বরের কাছ থেকে যে দয়া আমরা পাই, আর তাঁর উদ্দেশে আমাদের যে প্রার্থনা' তাই পবিত্র আত্মা (Holy Ghost).' এই ত্রিতত্ত্ববাদের উপরে খৃষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ, ঈশ্বর তিন ভাগে বিভক্ত। সেই অতীতে, গোঁড়া খৃষ্টানী যুগে, এই মতের তীব্র বিরুদ্ধতা করেন তোলস্তয় তাঁর Four Gospels Harmonized গ্রন্থে, যার জন্য মৃত্যুর পরে কোনও চার্চে তাঁর সমাধির স্থান জোটেনি। অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা, এই ভারতে এই বাঙলাদেশেই তাঁর Precepts of Jesus (যীশুর বাণী) বইয়ে ঐ ত্রিতত্ত্ববাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে রাজা রামমোহন কেবল তৎকালীন বাঙলাদেশে অনুপ্রবিষ্ট খৃষ্টান পাদরিদেরই চক্ষুশূল হননি, সুদূর ইংলণ্ড পর্যন্ত সেই প্রতিবাদের ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠেছিল।

খৃষ্টান পাদরিগণ কিন্তু খৃষ্টতত্ত্বে ঐ ত্রিতত্ত্ববাদের সংগে ইহলোক, পরলোক, স্বর্গ, নরক, পাপপুণ্য ইত্যাদিকে ঈশ্বর-প্রীতি ও ঈশ্বর-উপাসনার সংগে জড়িয়ে দেখেন, এবং সেই সংগে রয়েছে বিবিধ আচার অনুষ্ঠানের বোঝা। এমনি করে একটি সাধারণ প্রেমধর্ম এখন হয়েছে আচারধর্মী !

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই দেখা যায়, ইংরেজি স্কুল স্থাপন, মুদ্রাযন্ত্রের আরম্ভ, সংবাদপত্র প্রকাশ, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন, বাঙলা ভাষায় গদ্য এবং অন্যান্য বই রচনা, বাঙালীদের ব্যবসায়ে প্রবেশ, 'নেটিভ'-দের ভিতরে শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা, ইত্যাদি বিষয়ে ইংরেজদের নজর পড়েছে। যদিও সেটা তাঁদেরই সাম্রাজ্য বিস্তারের সুবিধার জন্য, কিন্তু এ-কথা অনস্বীকার্য যে, এগুলিই বহুলাংশে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সূত্রপাতের বীজ বপন করেছিল। অবশ্য, এই নবজাগরণ এবং ধর্মীয় ও সামাজিক বিপ্লবের সত্যিকারের সূত্রপাত হলো ১৮১৪ সনে, যখন রামমোহন রায় সিভিলিয়ান ডিগবী সাহেবের অধীনে চাকরি ছেড়ে রংপুর হতে কলকাতায় এলেন স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্য।

এখানে রামমোহনের বিস্তৃত জীবনী আলোচনা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে বলা যায়, হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে ১৭৭২ সনে (মতান্তরে ১৭৭৪) এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। তখন এদেশে ইংরেজদের আগমনে মুসলমান রাজত্বের অবসান হলেও পারসী ও আরবী ভাষার সমাদর তখনও চলছে। কোর্ট-কাছারিতেও ঐ ভাষাই সমধিক ব্যবহৃত। এই সকল কারণের জন্যেই বোধহয় পিতা রামকান্ত তাঁকে নয়/দশ বছর বয়সে ঐ ভাষা ভালো করে শিক্ষার জন্য পাটনায় প্রেরণ করেন। রামমোহন সেখানে পাঁচ/ছয় বছর ঐ ভাষা বিশেষরূপে অধ্যয়ন করেন। সেইখানেই প্রথম কোরাণ্ অধ্যয়ন করে হিন্দুদের পৌত্তলিকতার উপরে তাঁর অশ্রদ্ধা জন্মে। কয়েক বছর দেশভ্রমণের পরে তিনি কাশীতে সংস্কৃত অধ্যয়নও করেন। কলকাতায় ফিরে তিনি বিশেষরূপে ইংরেজী পড়াশুনো করে ঐ ভাষার উপরে বিশেষ দখল অর্জন করেন। তখন তাঁর বয়স বাইশ/তেইশ। কোরাণ্ পড়ে ইসলামের একেশ্বর-

বাদে অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দুদের পৌত্তলিকতায় অবিশ্বাসী হওয়াতে পরিবার-পরিজনের সংগে রামমোহনের বিশেষ সদ্‌ভাব ছিল না। এই সময়ের কিছু পরেই পিতা রামকান্ত তাঁর পুত্রদের মধ্যে বিষয়-সম্পত্তি দানপত্র করে ভাগ করে দেন। ১৮০৩ সনে কার্যোপলক্ষে রামমোহন কিছুকাল মুর্শিদাবাদে বাস করেন। এইখানে বসবাসকালেই তিনি তাঁর প্রথম বই 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদীন' ('একেশ্বর-বিশ্বাসীদিগকে উপহার') পারসী ভাষায় রচনা করেন। বস্তুতপক্ষে এই রচনা থেকেই রামমোহন বাঙলাদেশে ধর্মীয় বিপ্লবের সূত্রপাত করেন। অবশ্য রংগমঞ্চে তিনি আসেন আরো কয়েক বছর পরে। ১৮০৫ সনে তিনি সিভিলিয়ান ডিগবী সাহেবের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। তাঁর সংগে নানা জায়গায় ঘুরে অবশেষে ১৮০৯ সনে তিনি ডিগবীর সংগে রংপুরে গমন করেন, এবং সেখানে পাঁচ বছর কাজ-কর্মের পরে ১৮১৪ সনে কাজে ইস্তফা দিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সীমার মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচারের যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা এই সময়ে (১৮১৩ খৃষ্টাব্দ) শিথিল করা হয়। সেই সুযোগে পাদরিগণ খৃষ্টধর্ম প্রচারে এবং ধর্মান্তরিতকরণের ব্যাপারে বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়ে পড়ে।

রামমোহনের কলকাতা আগমনের পূর্বে সেখানকার সামাজিক অবস্থার কিছু নমুনা পাওয়া যায় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বংগসমাজ' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন: 'সহরের স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ ছিল, নীতির অবস্থা তদপেক্ষা উন্নত ছিল না। তখন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরি প্রভৃতির দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া ধনী হওয়া কিছুই লজ্জার বিষয় ছিল না।...যে ধনী পূজার সময় প্রতিমা সাজাইতে যত অধিক ব্যয় করিতেন এবং যত অধিক পরিমাণে ইংরাজের খানা দিতে পারিতেন, সমাজ মধ্যে তাঁহার তত প্রশংসা হইত। ধনী গৃহস্থগণ প্রকাশ্যভাবে বারবিলাসিনীগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না।'

সমভাবে অন্যত্র শাসক ইংরেজ ও তাদের তাঁবেদারদের সমাজচিত্রে পাই: ব্যবসাদার, ঠিকাদার, দালাল, মহাজন, দোকানদার, মুন্সী, কেরাণী প্রভৃতি নতুন নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হলো। রাজনৈতিক পরিবর্তনকালের শিথিলতায় সামাজিক জীবনে দেখা দিয়েছিল নৈতিক শৈথিল্য, স্বৈরাচার এবং অন্ধ-প্রথা ও ধর্মীয় তামসিকতার নাগপাশে বাঁধা তত্ত্বজ্ঞানহীন মূঢ় জীবনযাত্রা। মুষ্টিমেয় ইংরেজ নরনারী দেশের সকল সুখ ও সম্পদ ভোগ করে বিলাস ও প্রমোদের তরল স্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে রাখত। প্রচুর ভোজ, প্রচুর মদ্যপান, সুন্দরী নারী ভজনা, ফিটনে চড়ে তাদের নিয়ে গড়ের মাঠে প্রমোদ ভ্রমণ—এই সকল ভোগবিলাসের ভিতর দিয়ে তাদের দিন কাটত।

তথাকথিত শক্তিসাধনার তামসিকতার প্লাবনে হিন্দুধর্মের কিরূপ বিকৃতি ঘটেছিল তার কিছু নিদর্শন পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে। রামমোহন রায়ের এক প্রিয় শিষ্য পরবর্তীকালে ১৭৮৭ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সেই যুগের যে বিবরণ দিয়েছেন, তার থেকে জানা যায়: 'সে সময়ে সমুদয় বংগভূমি পৌত্তলিকতার

বাহ্যাড়ম্বরে পরিব্যাপ্ত ছিল। বেদের যে সকল কর্মকান্ড, উপনিষদের যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহার আদর এখানে কিছুই ছিল না ; কিন্তু দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্তন, দোলযাত্রার আবীর, রথযাত্রার গোল, এই সকল লইয়াই লোকেরা মহা আমোদে, মনের আনন্দে কালহরণ করিত।'

অবশ্য এই সময়ে একটি আলোর রেখাও ফুটেছিল বাঙলাদেশের তৎকালীন তরুণদের মনে। পেইনের 'রাইটস্ অব্ ম্যান্' ও 'এইজ্ অব্ রিজন্' (১৭৯১-৯৬) তখন জাহাজে-জাহাজে হাজার হাজার কপি এদেশে আসতে লাগল। এই বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় রক্ষণশীল ক্লেদাক্ত হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে তরুণদের মনে বিদ্রোহের শিখা প্রজ্জ্বলিত করল। তারা 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায় বলেও খ্যাত হলো। এই তরুণদের মধ্যে কেউ কেউ খৃষ্টধর্ম পর্যন্ত গ্রহণ করল। বাঙলাদেশে এইরকম যখন অবস্থা তখন আবির্ভাব রামমোহনের। অনেকে মনে করেন, তিনি এই সমাজের বিরুদ্ধে প্রথম আঘাত হানলেন উপরি-উক্ত 'তুহ্‌ফাৎ-উল-মুয়াহ্‌হিদীন' গ্রন্থ রচনা করে। এ-ধারণা বোধহয় ঠিক নয়। 'ইসলাম শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শান্তির মধ্যে আত্মস্থ হওয়া। ইহার তাৎপর্য্য, যে ব্যক্তি ঈশ্বর এবং মনুষ্যের সহিত শান্তির বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিয়াছে সে-ই মুসলিম। ঈশ্বরের সহিত শান্তির বন্ধনের অর্থ তাঁহার নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে পারা এবং মানুষের সহিত শান্তি বলিতে বুঝিতে হইবে, অপরকে আঘাত এবং তাহার অনিষ্টসাধন করিবার প্রবৃত্তি হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকা ও তাহার মঙ্গল কামনা করা। কোরাণে এই দুটি তত্ত্ব ইসলাম-এর সারমর্ম হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। মহম্মদ বলিলেন, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে ঈশ্বরের সম্মুখে সকলেই এক, সকলেই সকলের ভাই। জাতি, বর্ণ, পেশা, বংশমর্যাদা কিছুই মানুষকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। ঈশ্বরের নিকট সকলেই সমান ; যে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে সে-ই মুসলিম। ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য তিনি নামাজ, জাকাত, হজ, জিহাদ প্রভৃতি ধর্মকৃত্যের বিধান দিয়াছিলেন।...' (আবুল হায়াত/ভারতকোষ)।

এই বিষয়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছেন : 'ইসলামের মধ্যে যে-সব মতামত আধুনিক বিজ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা সমর্থিত হতে পারে না, অথবা যে-সব কথা বিশ্বধর্মবোধের বাধা বলে তাঁর (রামমোহনের) মনে হয়েছিল, তারই সমালোচনারূপে এই পুস্তিকা লিখিত হয়েছিল। কোরাণের মধ্যে পৌত্তলিকদের নিধন করবার কথা আছে, "এখন প্রশ্ন এই যে, যিনি স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ ও দয়ালু, অনাসক্ত বদান্য এবং সেই ভগবানের বিরুদ্ধ মতের উপদেশ ও আদেশ দেওয়া কি সম্ভব ?" রামমোহন বলতে চান, "এ-সবই কি ধর্মানুবর্তীদের মনগড়া জিনিস ? আমার তো মনে হয় যে, সুস্থমনের লোক কেউই শেষেরটি মানতে ইতস্তত করবে না।" রামমোহনের ইচ্ছা ছিল, ইসলামের যা শ্রেষ্ঠ বাণী তাই প্রচারিত হোক—সেটাই ইসলামের বিশ্বধর্মচেতনা।'

রামমোহনের উক্ত পুস্তিকা ঐসলামিক বিশ্বধর্মের আদর্শে রচিত হলেও গোঁড়া মুসলমানী মতের প্রতিরোধক। 'আসলে ইসলামের মধ্যে যে উদারপন্থী সম্প্রদায়

দেখা দিয়েছিল তাদেরই আদর্শে এটি রচিত…একটি 'মোতাজল' ও অপরটি 'সুফী'বাদ—একদল যুক্তিবাদী অপরদল ভক্তিবাদী।'

তিনি যে কেবল হিন্দু বা ইসলাম ধর্মের গোঁড়ামির প্রতিবাদেই সোচ্চার হয়েছিলেন এমন নয়। খৃষ্টধর্মের 'সুসমাচার' (Gospel) এবং 'টেস্টামেণ্টের' অবব্যাখ্যার বিরুদ্ধেও তিনি তীব্রভাবে লেখনী ধরলেন। 'রামমোহন বুঝতে পারলেন, সাধারণ খ্রীষ্টান ত্রিত্ত্ববাদী বা ট্রিনিটেরিয়ানরা বাইবেলের ভাষাকে নিজেদের মতের অনুকূলে অনুবাদ করতে চান। রামমোহন খ্রীস্টান সাম্প্রদায়িক মতামতের মধ্যে প্রবেশ না করে যীশুর উপদেশ বাইবেল থেকে সংগ্রহ করে Precepts of Jesus প্রকাশ করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল সংস্কৃতে ও বাংলায় তার অনুবাদও করেন।'

'যীশু সম্বন্ধে রামমোহন যে ব্যাপক ও গভীর আলোচনা করেছেন, কোনো অখ্রীষ্টানকে তাঁর পূর্বে বা পরে তা করতে দেখি না। যীশুখ্রীষ্টের কিংবদন্তীমূলক জীবনের মধ্যে এমন মহত্ত্ব ছিল যা রামমোহনকে আকৃষ্ট করে।…বাইবেলের উপদেশের সংগে মিশে আছে ভক্ত যীশুর কর্মময় জীবন—উপদেশে যা বলেছেন জীবনে তা পালন করেছেন, এ দৃষ্টান্ত তুলনাহীন। তাঁর মানবপ্রেম, আর্তসেবা, দুঃখীর দুঃখ দূর করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা এবং সত্যের জন্য আত্মপ্রাণ উৎসর্গ—প্রত্যেক দরদী হৃদয়কেই আকর্ষণ করে। এই প্রেমের ঠাকুর এই জন্যই তো বিশ্বের প্রণম্য হয়েছেন। কিন্তু অতিভক্তের চোখে তিনি অবতার, ঈশ্বর; মানুষের এ মূঢ়তা রামমোহন সহ্য করতে পারেন নি। যীশুকে তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ সাধক রূপেই শ্রদ্ধা করেছিলেন।' খৃষ্টধর্মে ত্রিত্ত্ববাদের বিরুদ্ধে তাই তিনি উপরিউক্ত পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। 'ত্রিত্ত্ববাদ' সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু আলোচনা হয়েছে।

স্বভাবতই উক্ত পুস্তিকাখানি পড়ে গোঁড়া খৃষ্টানদের ক্ষিপ্ত হবার কারণ ছিল। শ্রীরামপুরের পাদরি মার্শম্যান পণ্ডিত, গোঁড়া খৃষ্টান ও তর্কযুদ্ধে প্রায় অপরাজেয়। তিনি তাঁর সম্পাদিত 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে ১৮২০ সনের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় মন্তব্য করলেন :'…an intelligent Heathen, whose mind is as yet completely opposed to the grand design of the Saviour's becoming incarnate.'

অবশ্য, এই পুঁথি নিয়ে গোঁড়া খৃষ্টানদের সংগে রামমোহনকে বিস্তর বাদানুবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তার বিস্তৃত বিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। খৃষ্টান তোলস্তয় তাঁর Four Gospels Harmonized গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা এখানে উল্লেখযোগ্য : '…the interpretation…that…the revelation of the Holy Ghost…is the only true revelation, and that all the rest are false, produces hatred and the so called sects ..But the proclamation that the expression of a given dogma is divine, of the Holy Spirit, is the highest degree of pride and stupidity…nothing more stupid can be said than…the assertion of a man that God is speaking through his mouth.' এ-সম্বন্ধে আর কোন টীকার প্রয়োজন নেই।

রামমোহন 'ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধী ছিলেন না···তিনি দেখাতে চাইলেন যে, ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৌত্তলিকতার সঙ্গে এই ধর্মের প্রাচীন সাধকদের ধর্মাচরণের কোনো যোগ নেই। বেদান্ততত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মোপলব্ধিই যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের মূল কথা তা তিনি বুঝেছিলেন, সেজন্যই তিনি বেদান্তচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ধর্মের সঙ্গে যেসব অন্ধ কুসংস্কার, অবতারবাদ, অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান সাধারণত জড়িত থাকে, সে সব তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাঁর ধর্ম-চেতনা প্রখর যুক্তিবাদ এবং সংস্কারমুক্ত মননশীলতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের মতই তিনি সব ধর্মের ভিতরেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে সন্ধান করেছিলেন, কিন্তু আনুষ্ঠানিক এবং যুক্তিহীন বিশ্বাসবাধ্য সকল ধর্ম থেকেই দূরে সরে গিয়েছিলেন।'

রামমোহন নিজেও তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'The ground which I took in all my controversies was, not that of opposition to Brahminism but to a perversion of it, and I endeavoured to show that the idolatry of the Brahmins was contrary to the practice of their ancestors, and the principles of the ancient books and authorities which they profess to revere and obey.'

রামমোহন 'নানা ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ থেকে শাশ্বত ধর্মের শ্রেষ্ঠ বাণী সংগ্রহ করে বলতে পেরেছিলেন—সর্বমানবের ধর্ম এক বিশ্বধর্ম। রামমোহন যে সত্য নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে ও যুক্তি এবং বিচার বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তাকে বলেছেন Universal Religion. রবীন্দ্রনাথ তাঁর আন্তর-দৃষ্টি থেকে অনুভবের দ্বারা সেই সত্যের নাম দেন Religion of Man—মানুষের ধর্ম—তা হিন্দুর ধর্ম নয়, মুসলমানের ধর্ম নয়, খ্রীষ্টানের ধর্ম নয়—তা শাশ্বত মানবের ধর্ম। আজ জগতে ভাষা, ভূগোল ও ইতিহাসের স্পর্শে ধর্ম খণ্ডিত হয়েছে।'

'ভারতপথিক রামমোহন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথও বলেছেন: 'তিনি...অনুভব করেছিলেন যে, যে দেবতা সর্বদেশে সর্বকালে সকল মানুষের দেবতা না হইতে পারেন, অর্থাৎ যিনি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করেন, অন্যের কল্পনাকে বাধা দেন, যিনি আমার অভ্যাসকে আকর্ষণ করেন, অন্যের অভ্যাসকে পীড়িত করেন, তিনি আমারও দেবতা হইতে পারেন না, কারণ, সকল মানুষের সঙ্গে যোগ কোনোখানে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষের পক্ষে পূর্ণ সত্য প্রাপ্ত হওয়া একেবারেই সম্ভব হয় না এবং এই পূর্ণ সত্যই ধর্মের সত্য।'

রামমোহন কলকাতায় ফেরবার পরবর্তী বছরে, অর্থাৎ ১৮১৫ সনে তত্ত্বজ্ঞান ও ভারতের সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য 'আত্মীয়সভা' স্থাপন করেন। অবশ্য সন্ধ্যাবেলায় এই সভাতে বেদপাঠ ও ব্রহ্মসংগীত হতো। এইখানেই ব্রহ্মোপাসনারূপ পরম ধর্মের ভিত্তিস্থাপন হয়। পরবর্তীকালে এই সভাই নামান্তরিত হয়ে 'ব্রহ্মসভা বা ব্রাহ্মসমাজ' হয় ১৮২৮-৩০ সনে। রামমোহন বিলেত যাবার পূর্বে ১৮৩০ সনের ৮ই জানুয়ারি এই সভার সকল সম্পত্তির জন্য একটি 'ট্রাষ্ট-ডিড্' সম্পাদন করেন। ব্রহ্মসভা স্থাপনকালে যে 'অনুষ্ঠান' পুস্তিকা

তিনি রচনা করে উপাসনার মূল তত্ত্বগুলি সংকলিত করেন, বস্তুতপক্ষে সেগুলো সংস্কৃত প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে বাংলায় অনূদিত। রামমোহনের 'বিশ্বধর্মের' পরিকল্পনা উক্ত অনুষ্ঠানলিপিতেই ব্যক্ত। ১৮৩০ সনের নভেম্বর মাসে বিলেতে গিয়ে তিনি আর ফিরলেন না। সেখানে তিন বছর বিভিন্ন কর্মে ব্যস্ত থাকবার পরে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল শহরে তিনি পরলোকগমন করেন।

'অধ্যাত্মজীবনের অর্থ তখনই পূর্ণ হয় যখন ধর্ম ও নীতি যুগ্মভাবে মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে। 'ধর্ম' শব্দের ব্যবহার দ্বারা তিনি (রামমোহন) ঈশ্বরে বিশ্বাস, ভক্তি ও নির্ভরশীলতা এবং 'নীতি' শব্দের দ্বারা মানুষের সামাজিক লোকব্যবহার কতখানি সার্থকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই প্রকাশ করতে চেয়েছেন ·· রামমোহন বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্মের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের উপাসনাদির সংগে কর্ম, অর্থাৎ, মানবকল্যাণকর্ম-সাধন অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত, এইটি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। অদ্বৈতবাদী হলেই মানুষকে সংসারবিমুখ ও পরিবারের প্রতি উদাসীন হতে হবে, এমন মত তিনি পোষণ করতেন না।'

রামমোহনের বিলেত যাত্রার পরে অর্থসাহায্যের দ্বারা দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজকে জীবিত রাখেন মাত্র। বিলেতে রামমোহনের মৃত্যুর প্রায় ছ' বছর পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপন করেন, এবং ১৮৪৬ সনে এই সভাই ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করে সঞ্জীবিত করে। কিন্তু 'রামমোহনের দিন' আর ফিরে আসে না, তাঁর 'বিশ্বধর্ম' সাধনাও আর সফল হয় না।

রামমোহন অবশ্যই সামাজিক বিপ্লবের সংগে ধর্মবিপ্লবের মঞ্চটি তৈরী করে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই মঞ্চেই যে সর্বযুগের ইতিহাসে বৃহত্তর একটি বিপ্লব ঘটবে এ-আশা অবশ্য কেউই বোধ হয় সেইদিন করেনি। বৌদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য হতে এ পর্যন্ত যাঁরাই ধর্মগুরু হয়েছেন তাঁরা পুরাতন ধর্মের মধ্যে অবক্ষয় দেখে নূতন ধর্ম প্রবর্তন করে গেছেন। ব্যতিক্রম আনলেন রামমোহন। তিনি সর্বধর্ম সমন্বয় করবার চেষ্টা করতে গিয়ে সর্বধর্মের সার তত্ত্বের সমন্বয় সাধন করে একটি 'বিশ্বধর্ম' প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। সেখানেও গ্রহণ-বর্জনের প্রশ্ন ছিলো। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী যিনি জন্মগ্রহণ করলেন তিনি যথাকালে সর্বধর্মকে অনুশীলন করে গ্রহণ করে সমন্বয় সাধন করলেন বেদন্ত-ধর্মের পুনর্ব্যাখ্যা করে, আর সেইসংগে ভক্তদের মধ্যে বীজ বপন করলেন মানব-কল্যাণকর্মসাধনার। ইনিই পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিতামৃত

বাল্যলীলা ॥

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে এক সৎব্রাহ্মণ বংশে বুধবার ৬ই ফাল্গুন, ১২৪২ সালে (১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৬ সনে) ভোর-রাত্রি ৪টায়, শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম।

পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের আদি নিবাস কামারপুকুর হতে প্রায় একক্রোশ দূরে দেরে গ্রামে। কথিত, তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে সুপণ্ডিত ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রতিদিন গৃহদেবতা রঘুবীরের পূজান্তে তিনি জল গ্রহণ করতেন। যাজনিক কর্মই ছিল সংসারের আয়ের একমাত্র পথ। অল্প বয়সেই ক্ষুদিরামের প্রথম বিবাহ হয়, কিন্তু সেই স্ত্রী অল্পবয়সেই নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়। পিতার মৃত্যুর পরে বাধ্য হয়ে প্রায় পঁচিশ বছর বয়সে তিনি শ্রীমতী চন্দ্রমণি দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁর প্রথম পুত্রসন্তান রামকুমারের জন্ম হয় ১২১১ সালে (?)। তার ছ' বছর পরে ১২১৭ সালে (?) কন্যা কাত্যায়নীর জন্ম।

কথিত, এই সময় মিথ্যা সাক্ষী দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় গাঁয়ের জমিদার রামানন্দ রায় কর্তৃক ক্ষুদিরাম গ্রাম থেকে বিতাড়িত হন এবং বন্ধু সুখলাল গোস্বামীর সাহায্যে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে আনুমানিক ১২২১ সাল থেকে কামার-পুকুরে অতি দীন অবস্থায় বসবাস করতে থাকেন। সুখলাল এবং প্রতিবেশীগণের সশ্রদ্ধ সহযোগিতায় ক্রমে ক্ষুদিরামের অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়। পুত্র রামকুমার স্থানীয় চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, সাহিত্য ও স্মৃতি অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন।

এই অবস্থার মধ্যেই বিবাহযোগ্যা এগার বছরের কন্যার বিবাহ হয় নিকটবর্তী আনুড় গ্রামের কেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে, এবং তাঁর ভগ্নীর সংগে এই সময়েই (১২২৮ সাল ?) বিবাহ হয় রামকুমারের। স্মৃতিতীর্থ হয়ে রামকুমার সংসারের ভার গ্রহণ করলে নিশ্চিন্ত হয়ে ক্ষুদিরাম পদব্রজে দাক্ষিণাত্যের তীর্থসকল পর্যটন করেন। রামেশ্বর সেতুবন্ধ হতে তিনি একটি বাণলিংগ নিয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। তার কিছুকাল পরে ১৩৩২ সালে ক্ষুদিরামের একটি পুত্র সন্তান জন্মায় এবং তিনি তার নাম রাখেন রামেশ্বর।

১২৪১ সালে শীতকালে ক্ষুদিরাম পুনরায় বারাণসী ও গয়াতীর্থে গমন করেন। কথিত, গয়াধামে গমন করে পিতৃপুরুষগণের তৃপ্ত্যর্থে গদাধরপাদপদ্মে পিণ্ডদান করে তিনি পরম তৃপ্তিলাভ করেন। ঐখানেই এক রাত্রিতে তিনি নবদূর্বাদলশ্যাম জ্যোতির্মণ্ডিততনু এক মহাপুরুষকে স্বপ্নে দর্শন করেন। সেই মহাপুরুষ তাঁকে বলেন যে, তিনি তাঁর গৃহে পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর সেবা গ্রহণ করবেন। যাই হোক, ১২৪২ সালের বৈশাখ মাসে গয়াধাম হতে তিনি কামারপুকুরে প্রত্যাবর্তন করেন।

এই তীর্থশেষে ক্ষুদিরামের গৃহে প্রত্যাগমনের পরে চন্দ্রমণি দেবীর পুনরায় গর্ভসঞ্চার হয়। ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন তিনি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রসন্তান প্রসব করেন। দ্বিতীয় বাসযোগ্য কোনও খালি ঘর না থাকায় পাশের ঢেঁকিঘরে গ্রাম্য ধাত্রী ধনীর সাহায্যে প্রসব ব্যবস্থা হয়। কথিত, জন্মাবার পরেই নাকি শিশু গড়িয়ে অদূরে উনানের মধ্যে চলে গিয়ে ভস্মাচ্ছাদিত হয়। গয়ার বিষ্ণুপাদপদ্ম এবং স্বপ্নের কথা স্মরণ করে এবার ক্ষুদিরাম এই পুত্রের নামকরণ করেন গদাধর। ইনিই পরবর্তীকালে যুগাবতার পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

অপরূপ নবজাত শিশু গদাধর অনতিকালের মধ্যেই পরিবার এবং প্রতিবেশীদের অতি প্রিয় হয়ে ওঠে। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসংগে' স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন,

'বয়োবৃদ্ধির সহিত বালক গদাধরের অদ্ভুত মেধা ও প্রতিভার বিকাশ শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম বিস্ময় ও আনন্দে অবলোকন করিয়াছিলেন। কারণ, চঞ্চল বালককে ক্রোড়ে করিয়া তিনি যখন নিজ পূর্বপুরুষদিগের নামাবলী, দেবদেবীর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র স্তোত্র ও প্রণামাদি, অথবা রামায়ণ, মহাভারত হইতে কোনো বিচিত্র উপাখ্যান তাহাকে শুনাইতে বসিতেন, তখন দেখিতেন, একবার মাত্র শুনিয়াই সে উহার অধিকাংশ আয়ত্ত করিয়াছে।'

এই পরিবেশের মধ্যে শিশুর বয়স যখন প্রায় পাঁচ তখন ক্ষুদিরামের শেষ সন্তান একটি কন্যার জন্ম হয়। তিনি তার নামকরণ করেন সর্বমঙ্গলা।

ক্ষুদিরামের বাড়ির অনতিদূরে গাঁয়ের জমিদার লালাবাবুদের নাট্যমণ্ডপে যদুনাথ সরকারের পাঠশালা বসে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালককে ক্ষুদিরাম সেই পাঠশালায় ভর্তি করে দেন। পাঠশালায় যদিও বালকের লেখাপড়ায় সামান্য অগ্রগতি হলো, কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রের উপর তার বিদ্বেষ সমভাবেই রয়ে গেল। পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আত্মকথায় বলেন, 'পাঠশালায় শুভংকর আঁক ধাঁধা লাগত। কিন্তু চিত্র বেশ আঁকতে পারতুম।'

চিরাচরিত পাঠশালার লেখাপড়ায় অবশ্যই গদাধরের তেমন আগ্রহ ছিল না। বরং গাঁয়ের কুমোর বাড়ি গিয়ে দেখে-শুনে তার দেব-দেবীর মূর্তি গড়ায় আগ্রহ দেখা গেল। 'গ্রামের কুম্ভকারগণকে দেবদেবীর মূর্তি গঠন করিতে দেখিয়া বালক তাহাদিগের নিকট…জিজ্ঞাসা করিয়া বাটীতে ঐ বিদ্যা অভ্যাস করিতে লাগিল। পটব্যবসায়ীগণের সহিত মিলিত হইয়া সে ঐরূপে চিত্র অঙ্কন করিতে আরম্ভ করিল।'

গদাধরের আগমন বিষয়ে গয়াধামের স্বপ্নের কথা স্মরণ করে ক্ষুদিরাম এই বালককে কোনরূপ পীড়াপীড়ি না করে তাকে স্বাধীনভাবে নিজের খেয়াল-খুশি মতো বড় হতে দিয়েছিলেন। তার ভিতরে ক্রমশই বিশেষ বিশেষ ভাবের লক্ষণ দেখা যেতে লাগল। উন্মুক্ত বনপ্রান্তর তাকে মুগ্ধ করত। আর একটি বিষয়ে বালকের অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখা গেল, সে তার কণ্ঠের মধুর সঙ্গীত।

এমনি করে সাত বছর বয়সের সময় বালকের জীবনে একটি ঘটনা ঘটল। সঙ্গীদের নিয়ে একদিন গাঁয়ের বাইরের উন্মুক্ত প্রান্তরে বেড়াতে গিয়েছিল গদাধর। উন্মুক্ত প্রান্তরের উপরের আকাশে ঘনকৃষ্ণবর্ণ জলদপুঞ্জের পশ্চাৎপটে বাধা-বন্ধনহীন সঞ্চরমান শ্বেতপক্ষ বলাকাশ্রেণীর অপূর্ব সৌন্দর্য তন্ময় হয়ে দেখতে দেখতে ভাবাবেগে বালক মূর্ছিত হয়ে পড়ে যায়। এই বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আত্মকথায় বলেছেন, 'আমার দশ এগার (?) বছর বয়সে যখন ওদেশে (কামারপুকুর) ছিলুম, সেই সময় ঐ অবস্থাটি হয়েছিল। মাঠ দিয়ে যেতে যেতে যা দর্শন করলুম তাতে বিহ্বল হয়েছিলুম। ওদেশে ছেলেদের ছোট ছোট টেকোয় করে মুড়ি খেতে দেয়। যাদের ঘরে টেকো নেই, তারা কাপড়েই মুড়ি খায়। ছেলেরা কেউ টেকোয়, কেউ কাপড়ে মুড়ি নিয়ে খেতে খেতে মাঠে ঘাটে বেড়িয়ে বেড়ায়। সেটা জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাস হবে। একদিন সকালবেলা টেকোয় মুড়ি নিয়ে মাঠের আলপথ দিয়ে খেতে খেতে যাচ্ছি। আকাশে একখানা সুন্দর জলভরা মেঘ উঠেছে, তাই দেখছি

শ্রীরামকৃষ্ণের বংশপরিচয়
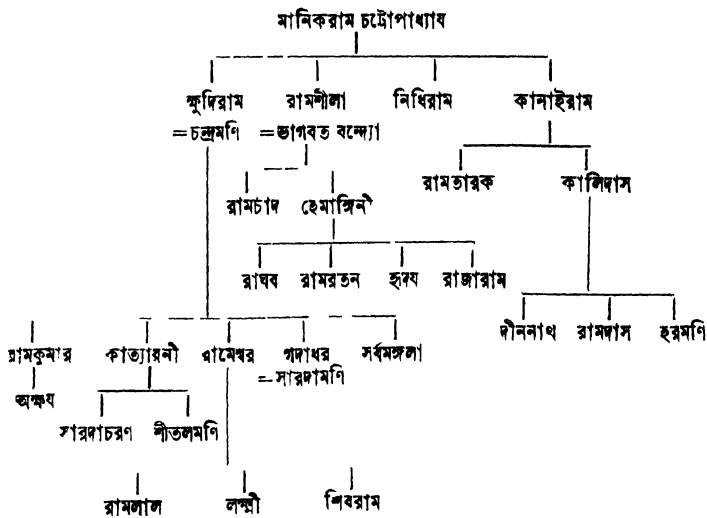
শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মপত্রিকা
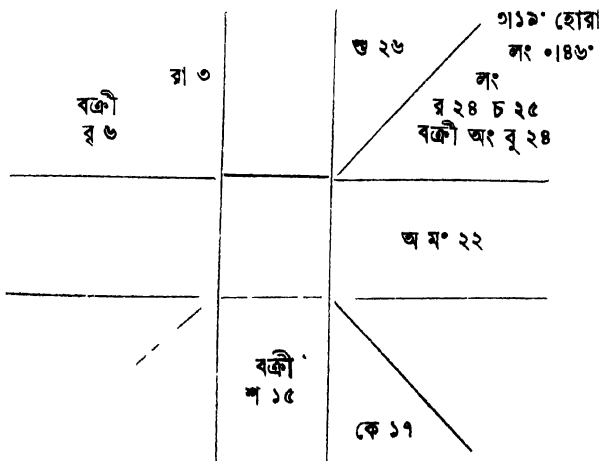
চান্দ্রফাল্গুনস্য শুক্লপক্ষীয়—দ্বিতীয়া জন্মতিথি :
পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র মানং ৬০।১৫।০
৬ই ফাল্গুন, ১২৪২ সাল।

আর খাচ্ছি। দেখতে দেখতে মেঘখানা প্রায় আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, এমন সময় এক ঝাঁক সাদা দুধের মত বক ঐ কাল মেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে লাগল। সে এমন এক বাহার হল। দেখতে দেখতে ভাবে ভোর হয়ে এমন একটা অবস্থা হল যে আর হুঁশ রইল না। পড়ে গেলুম, মুড়িগুলো আলের ধারে ছড়িয়ে পড়ল। কতক্ষণ ঐভাবে পড়েছিলুম, লোকে দেখতে পেয়ে ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে এল। সেই প্রথম ভাবে বেহুঁশ হয়ে যাই।'

ভয় পেয়ে মূর্ছিত গদাধরকে সঙ্গীরা ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে যায়। কিছুক্ষেণ পরে তার সংজ্ঞা ফিরে আসে, এবং তার ভিতরে কোনও অসুস্থতার লক্ষণ দেখা যায় না। যদিও তখন অনেকেরই মনে হয়েছিল যে, সেটা মৃগীরোগের পূর্বলক্ষণ, কিন্তু পরে বালকের স্বাস্থ্যের কোনও অবনতির লক্ষণ না দেখে সকলেই নিশ্চিন্ত হলো।

এই সময়ে ক্ষুদিরামের স্বাস্থ্য মোটেই ভালো যাচ্ছিল না। তাঁর কৃতী ভাগ্নে রামচাঁদের কর্মস্থান মেদিনীপুরে হলেও নিজগ্রাম সেলামপুরে মহাসমারোহে প্রতি বছর দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠান করতেন। এই উপলক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ মাতুল ক্ষুদিরাম প্রতি বছরই আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে যেতেন। এবারেও (১২৪৯ ?) তিনি পুত্র রামকুমারের সঙ্গে পুজো উপলক্ষে সেখানে গেলেন এবং পুজোর মধ্যেই নিদারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সকলেই চিন্তিত হলেন। কিন্তু, পুজো সমাপান্তে প্রতিমা বিসর্জনের পরে ক্ষুদিরামের অবস্থার অবনতি ঘটে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কুলদেবতা রঘুবীরের নাম করে পুত্র রামকুমার, ভাগ্নে রামচাঁদ এবং আত্মীয় পরিজনের মাঝখানে তিনি দেহত্যাগ করেন।

পিতার অভাব গদাধরের জীবনে এক বিশেষ পরিবর্তন এনে দিল। সুখ-দুঃখে চুয়াল্লিশ বছর ঘর সংসার করবার পরে স্বামীর বিয়োগে চন্দ্রাদেবীও ভেঙে পড়লেন। কিন্তু আট বছরের পুত্র গদাধর এবং প্রায় চার বছরের কন্যা সর্বমঙ্গলার কথা ভেবে আবার তাঁকে সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হলো। গদাধর মায়ের কাছে আর তেমন আব্দার করে না, বরং গৃহদেবতার পুজা-আয়োজনে মাকে সাহায্য করে। পাঠশালায় যায় বটে, কিন্তু পুরাণ-কথা, দেব-দেবীর মূর্তি গঠন করা এবং যাত্রা-গান শোনা তার ক্রমশ প্রিয় হয়ে উঠল।

গাঁয়ের একদিক দিয়ে পুরীধামে যাবার পথ চলে গেছে। তীর্থযাত্রী সাধু-বৈরাগীগণ এইপথে প্রায়ই যাতায়াত করেন। যাত্রীদের সুবিধার জন্য গাঁয়ের জমিদার একটি পান্থনিবাস করে দিয়েছেন। মাঝে মাঝে সাধু-যাত্রীগণ তীর্থের পথে সেই পান্থনিবাসে আশ্রয় নেন। সেই সাধুদের সঙ্গ বালক গদাধরকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করে। সুযোগ পেলেই সে সেই সমস্ত সাধুদের ধুনির পাশে বসে তাঁদের মুখে নানা শাস্ত্রালোচনা শোনে, অথবা তাঁদের জন্য কাঠ বা পানীয় সংগ্রহ করে এনে দেয়। এইভাবে ক্রমে বালক গদাধর সন্ন্যাসী-জীবনে এতটা আকৃষ্ট হয় যে, মাঝে মাঝে নিজের পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন করে কৌপীনের মতো পরে সে গৃহে ফিরত।

এই সময়ে গ্রামের লাহাবাড়ির কন্যা প্রসন্নময়ী ও অন্যান্যদের সঙ্গে গদাধর

আনুড় গাঁয়ের বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে পুজো দিতে যাবার পথে আবার সংজ্ঞা-শূন্য হয়ে পড়ে। সঙ্গী পুজার্থী মহিলাগণ ভয় পেয়ে জোরে জোরে বিশালাক্ষী দেবীর নাম উচ্চারণ করতে থাকেন। অচিরেই বালক সংজ্ঞালাভ করে। এবারেও সুস্থ অবস্থা দেখে শেষ পর্যন্ত সকলের ধারণা হয় যে, বালকের এটা মৃগী রোগ নয়, অন্য কিছু।

ন' বছর বয়সে গদাধরের উপনয়ন হয়। এই উপনয়নের সময়ে তৎকালে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যদের কাছ থেকে ব্রতভিক্ষা নেওয়ার প্রথা ছিল না। কিন্তু গদাধর জিদ ধরে বসল যে, তার ধাত্রী ধণী কামারণী তাকে প্রথম ব্রতভিক্ষা দেবে। উপায়ান্তর না দেখে স্মৃতিপণ্ডিত জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার শেষ পর্যন্ত অনুমতি দিলেন, এবং ধণী তাকে প্রথমে ব্রতভিক্ষা প্রদান করে ধন্য হলো। উপবীত ধারণের পরে গদাধর একটি মনোমত কাজ পেল, সে হলো তন্ময় হয়ে গৃহদেবতা রঘুবীরের আরাধনা। এমনকি পুজো-আরাধনার সময়ে মাঝে মাঝে তার ভাব-সমাধির লক্ষণও দেখা দিতে লাগল।

কথিত, সেবার শিবরাত্রি উপলক্ষে উপবাসে থেকে যথারীতি রাত্রির প্রথম প্রহরের শিবপুজো শেষ হলে তার বন্ধুরা এসে খবর দিল যে, প্রতিবেশী সীতানাথ পাইনদের বাড়িতে শিবমহিমাসূচক যাত্রা অভিনয় হবে। কিন্তু যাত্রায় যে শিবের পাঠ অভিনয় করবে সে অসুস্থ। সুতরাং তাকেই শিব সেজে ঐ যাত্রায় অভিনয় করতে হবে। রাত্রে প্রহরে-প্রহরে শিবপুজোর ব্যাঘাত হবে, তাই প্রথমে বালক গদাধর রাজী হলো না। কিন্তু বন্ধুরা তাকে বোঝাল যে, শিবের ভূমিকা অভিনয় করতে গিয়ে তাকে সর্বদা শিবচিন্তাই করতে হবে। সে ভাবনা পুজো করা অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। বন্ধুদের অনুরোধে রাজী হয়ে জটা, রুদ্রাক্ষ ও বিভূতি-ভূষিত গদাধর শিবচিন্তায় মগ্ন হয়ে যাত্রামণ্ডে যখন আবির্ভূত হলো তখন কিন্তু তার কিছুমাত্র বাহ্য সংজ্ঞা রইলো না। বহুক্ষণ পর্যন্ত গদাধরের চেতনা ফিরে এলো না বলে সেই রাত্রির মতো যাত্রা অভিনয় বন্ধ থাকল। সাধন সংগীত শুনতে শুনতে বা পুজো-আরাধনায় ধ্যানের মধ্যেই গদাধরের মাঝে মাঝে এই রকম ভাব-সমাধি হতে লাগল।

এইভাবে গদাধরের জীবনে আরো কিছুকাল কেটে গেল। পড়াশুনায় অবশ্য ক্রমশঃ তার ভিতরে উদাসীনতা লক্ষ্য করা গেল। যদিও সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্র শ্রবণে তার গভীর অনুরাগ ছিল, কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতো টোলে সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাস করে পণ্ডিত হয়ে যজমানদের পুজো-অর্চনা করে জীবিকানির্বাহে তার বিমুখতা সেই সময় থেকেই পরিলক্ষিত হতে লাগল। বরং সদা ঈশ্বরচিন্তা, ঈশ্বরভক্তি, সদাচার, বৈরাগ্য ইত্যাদি বিষয়েই বালক গদাধরের অনুরাগাধিক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেল।

অবশ্য, পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণদেবের কোন কোন জীবনীকার তাঁকে প্রায় 'নিরক্ষর'-এর পর্যায়ে ফেলেছেন। এই ধারণা ভ্রান্ত। ১৩৮১ সালে ফাল্গুন সংখ্যা 'উদ্বোধনে' এ বিষয়ে 'শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাচর্চা' নামে অত্যন্ত মূল্যবান একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধের রচয়িতা স্বামী প্রভানন্দের মূল বক্তব্য হলো : '…এমন কি বিবেকানন্দ, প্রেমানন্দ, রামদত্ত প্রমুখের…শিথিল মন্তব্যের বহুল ও

অনেকক্ষেত্রে যথেচ্ছ ব্যবহারে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাদীক্ষা, বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে একটা ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে।' প্রভানন্দ দেখিয়েছেন, রামকৃষ্ণের 'জন্মভূমি কামারপুকুরের অদূরেই ছিল বাংলার অন্যতম প্রধান কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পীঠস্থান বিষ্ণুপুর···তার প্রভাব···নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলে সুস্পষ্ট।' বাল্যকালে গদাধর যে-সব পুঁথির অনুলিপি করেছিলেন প্রভানন্দ তাদের কয়েকটির পরিচয় দিয়েছেন। তাদের মধ্যে আছে : বার বছর দুই মাস বয়সে গদাধর কর্তৃক অনুলিখিত হরিশ্চন্দ্র পালা (৩৯ পৃষ্ঠা) ; প্রায় সাড়ে বার বছরে অনুলিখিত মহীরাবণের পালা (৩১ পৃষ্ঠা) ; তের বছর চার মাসে লেখা সুবাহুর পালা (২২ পৃষ্ঠা)। ···এইসব পুঁথিতে 'তদানীন্তনকালের রীতি অনুযায়ী স্বভাবকবি শ্রীগদাধর তাঁর কিছু মৌলিক রচনা জুড়ে দিয়েছেন।···প্রত্যেকটি অনুলেখ শ্রীগদাধরের হস্তাক্ষরের মুন্সিয়ানার উজ্জ্বল প্রমাণ। দৃঢ় বলিষ্ঠ গতিতে ছন্দায়িত তাঁর লিখনভঙ্গিমা ও স্বাক্ষর।···এই ধরনের পুঁথি লেখা শুধুমাত্র লেখার কাজ নয়, চারুশিল্পও বটে। আমাদের স্বভাবশিল্পী শ্রীগদাধর তাঁর পুঁথিপাটাকে সজ্জিত করেছিলেন সুরুচিসম্পন্ন ছোটখাট নক্সার সাহায্যে।···রামকৃষ্ণ তাঁর শেষ রোগশয্যায় শুয়ে থাকার সময়েও যখন "নরেন শিক্ষে দেবে", "নরেন্দ্রকে জ্ঞান দাও"—ইত্যাদি কাগজে লিখে দিয়েছেন, তখনও তার উপরে ছবি এঁকে দিয়েছিলেন, প্রভানন্দ তা মাস্টারমহাশয়ের ডায়েরিতে দেখেছেন।'

'···তবে একথা অপরপক্ষে বলতে হবে—পুঁথিপড়া বিদ্যা সম্বন্ধে বিতৃষ্ণার কথা বহুভাবে প্রকাশ করে, এবং নিজেকে মূর্খ ঘোষণা করে, রামকৃষ্ণ নিজেই কিছুটা ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে গেছেন।···সমগ্র ভারতীয় ধর্ম ও শাস্ত্রের মর্মসত্যকে প্রতি মুহূর্তে বাঙ্ময় করেছেন যিনি—সেই রামকৃষ্ণ অপরপক্ষে বিধিবদ্ধ শিক্ষা কত সামান্য গ্রহণ করেছিলেন—এই বিচিত্র ব্যাপারের দিকেই রামকৃষ্ণের শিষ্য ও জীবনীকারেরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন—আমাদের মনে হয়।'

এই বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মকথায় বলেছেন, 'ছেলেবেলায় লাহাদের ওখানে (কামারপুকুরে) সাধুরা যা পড়ত, বুঝতে পারতুম। তবে একটু-আধটু ফাঁক যায়। কোনো পণ্ডিত এসে যদি সংস্কৃতে কথা কয় তো বুঝতে পারি ; কিন্তু নিজে সংস্কৃত কথা কইতে পারি না।'

গদাধরের বয়স যখন এগার বছর তখন তার ছোট বোন সর্বমংগলার বিবাহ হয় কামারপুকুরের নিকটে গৌরহাটি গাঁয়ের রামসদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে, এবং তাঁর ভগ্নীকে বিবাহ করেন মেজদাদা রামেশ্বর। এই বিবাহের বছর দুই পরে রামকুমারের স্ত্রী দীর্ঘকাল পরে ১২৫৫ সালে এক পুত্রসন্তান প্রসবান্তে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

একদিকে স্ত্রীর মৃত্যু, অন্যদিকে পরিজন বৃদ্ধি এবং মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর কৃতবিদ্য হলেও বিশেষ উপার্জনক্ষম না হওয়ায় সংসারের পূর্বসচ্ছলতা আর রইল না। এমন কি মাঝে মাঝে রামকুমারকে ঋণ করেও সংসারের অভাব পূরণ করতে হতো। এই অবস্থায় শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের পরামর্শে তিনি কলকাতায় গিয়ে সংস্কৃত টোল খুলতে মনস্থ করলেন। কনিষ্ঠ ভাই গদাধরকে তিনি অপরিসীম

স্নেহ করতেন। তার ভবিষ্যৎচিন্তাও তাঁকে দ্বিধাগ্রস্থ করল। কিন্তু সংসারের কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত তিনি ভাগ্যান্বেষণের জন্য কলকাতায় গিয়ে ১২৫৬ সালে ঝামাপুকুরে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী খুললেন।

রামকুমারের কলকাতায় গমনের পর গদাধর প্রথমে নিজেকে বড্ড নিঃসহায় মনে করল। কিন্তু অচিরেই তার স্বভাবসিদ্ধ কাজগুলোর মধ্যে নিজেকে লিপ্ত করে ফেলল। প্রায় প্রতিদিনই পূজাদির পরে অবসর সময়ে সে গৃহে আগত রমণীদের সংগীত ও পুরাণ পাঠে মুগ্ধ করত। গাঁয়ে বহু বৈষ্ণব থাকায় অনেক গৃহেই প্রতি সন্ধ্যায় ভাগবতপাঠ ও কীর্তনাদি হতো। গাঁয়ে এই সময়ে তিনদল যাত্রা, একদল বাউল ও দু-একদল কবিয়াল ছিল। স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভায় ঐ সকল কীর্তনের, বাউল, কবি ইত্যাদির পালা-গানাদি গদাধর সহজেই আয়ত্ত করেছিল। তার কণ্ঠে পালাগান ইত্যাদি শোনবার জন্য গাঁয়ের মেয়েরা উদ্গ্রীব হয়ে থাকত। পালাগানের বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকা গদাধর একাই অভিনয় করে দেখাত। এমন কি মাঝে মাঝে রাধারানীর ভূমিকায় রমণীবেশে অভিনয় করেও তাদের তৃপ্ত করত। কথিত, গাঁয়ের বয়স্ক বালকদের নিয়ে গদাধর একটি যাত্রাদল তৈরি করেছিল। গ্রামপ্রান্তে মানিকরাজার আম্রকানন শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক যাত্রাভিনয়ে সে মুখরিত করে তুলত।

এইভাবে গদাধর সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করল। এদিকে তিন বছরের কঠোর পরিশ্রমে কলকাতায় রামকুমারের চতুষ্পাঠীরও শ্রীবৃদ্ধি হলো। এই সময়ে তিনি গদাধরের ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ চিন্তিত হলেন। শেষ পর্যন্ত মাতা ও ভ্রাতার সংগে পরামর্শ করে তিনি গদাধরকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। ঠিক হলো যে, গদাধর চতুষ্পাঠীর গৃহকর্মে রামকুমারকে সাহায্য করবে এবং নিজেও পড়াশুনা করবে। কলকাতায় পিতৃতুল্য অগ্রজকে কাজকর্মে সাহায্য করতে হবে জেনে গদাধর আনন্দিত মনেই কলকাতায় বড়দাদার সংগী হয়ে এলো।

সাধনলীলা ॥

অচিন্ত্যকুমার 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' প্রথম খণ্ড আরম্ভ করেছেন গদাধরের কলকাতা আগমনের সময় থেকে। অর্থাৎ, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনলীলার প্রস্তুতিপর্ব হতে। অবশ্য, সংগে সংগে তিনি গদাধরের বাল্যজীবনেরও কিছু কিছু বিশেষ ঘটনার আলোচনা করেছেন। সুতরাং, ঠাকুরের এই পর্বের বিস্তৃত ইতিহাসের প্রয়োজন নেই। অচিন্ত্যকুমার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী আলোচনা করেছেন অনেকটা কথকতার ভঙ্গিতে। সেইজন্য, পরিপূরক হিসেবে গদাধরের ধারাবাহিক জীবনের কিছুটা তথ্যের প্রয়োজন রয়েছে। সেইটুকুই নিম্নে প্রদত্ত হলো।

পূর্বেই কলকাতায় এসে গদাধরের অগ্রজ রামকুমার ঝামাপুকুরে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য টোল খুলেছেন। সেই সংগে টোলের সমীপে দিগম্বর মিত্রের বাড়িতে এবং

পল্লীর অন্যান্য কয়েকটি বর্ধিষ্ণু বাড়িতে নিত্য দেবসেবাও করতেন। টোলে অধ্যাপনা করবার পরে পল্লীর নানা গৃহে দেবসেবা করবার পরে রামকুমারের হাতে সময় অল্পই থাকত। গদাধর এসেই সেই ভার গ্রহণ করবার পরে তাঁর পরিশ্রমের কিছুটা লাঘব হয়। রামকুমারের ইচ্ছে ছিলো, অনুজ ভ্রাতা সংস্কৃত পাঠ করে তাঁরই মতো পণ্ডিত হয়ে তাঁরই পথের অনুগামী হোক। এই পথে গদাধরের বিশেষ আগ্রহ না দেখে একদিন তাকে তিরস্কারও করলেন। কিন্তু, গদাধবের প্রকৃতি বিষয়ে তখনও তিনি অনভিজ্ঞ। তাই গদাধর যখন বলল, 'দাদা, চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যে শিখে আমার কি হবে ? তা দিয়ে আমি কি করব ?', তখন বিস্মিত হয়ে, অনুজের প্রতি স্নেহবশত তিনি আর তাকে বিশেষ তিরস্কার করলেন না। এইভাবেই দিন চলতে লাগল।

ধর্মপ্রাণা রানী রাসমণির নাম তখন দিকে দিকে। তিনি শ্রীশ্রীকালিকার সেবিকা। তাঁর জমিদারীর শীলমোহরে খোদিত ছিল—'কালীপদ অভিলাষী শ্রীমতী রাসমণি দাসী'। তিনি ১২৫৫ সালে কাশীধামে যাবার উদ্যোগকালে স্বপ্নাদেশ পেলেন যে, তাঁর তীর্থে যাবার প্রয়োজন নেই। ভাগীরথীর তীরে মন্দির নির্মাণ ও মূর্তি স্থাপন করে নিত্য পূজাসেবা করলেই শ্রীশ্রীজগদম্বা তা গ্রহণ করবেন। ভক্তি-পরায়ণা রানী তাই করলেন। দক্ষিণেশ্বরে ভাগীরথীকূলে প্রায় ষাট বিঘা জমি ক্রয় করে বহু অর্থব্যয়ে নবরত্ন পরিশোভিত এক সুবৃহৎ মন্দির তৈরি করলেন। রানী জাতিতে ছিলেন কৈবর্ত। অতএব, মন্দির প্রতিষ্ঠার পূজাদি করতে কোন ব্রাহ্মণই সম্মত হলেন না। রানী স্মৃতিতীর্থ রামকুমার ভট্টাচার্য-চট্টোপাধ্যায়ের নিকট বিধান প্রার্থনা করলে তিনি বিধান দিলেন, মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বে যদি সেই সম্পত্তিটি কোনও ব্রাহ্মণকে দান করা হয় তবে ব্রাহ্মণ দ্বারা কার্যনির্বাহে বাধা নেই। রানী সেই প্রকারই সকল বন্দোবস্ত করলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠা ও পূজাদি সম্পন্নের দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্য রাসমণি রামকুমারকেই অনুরোধ করলেন। শেষ পর্যন্ত দ্বিধাগ্রস্থ রামকুমার অবশ্য ভক্তিমতী রানীর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ স্নানযাত্রার দিনে মহাসমারোহে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতিষ্ঠাকার্য সুসম্পন্ন হলো। গদাধর মনেপ্রাণে অগ্রজের কাজ যেন অনুমোদন করতে পারল না। তখন পর্যন্ত সে সংস্কারমুক্ত হতে পারেনি। তাই মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে সে দক্ষিণেশ্বরে গেলেও সেখানে কৈবর্তের অন্নগ্রহণ করল না। প্রতিষ্ঠা উৎসবের শেষে সে কলকাতায় ফিরে গেল।

ধর্মপ্রাণা রানীর বিশেষ অনুরোধে রামকুমার শ্রীশ্রীজগদম্বার নিত্যপূজকের পদও শেষপর্যন্ত গ্রহণ করে দক্ষিণেশ্বরে চলে আসেন। অবশ্য, শ্রীকালিকাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠার সংগে তৎপার্শ্বে নির্মিত মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই মন্দিরের পূজারী নিযুক্ত হলেন কামারপুকুরের কাছে শিহড় গ্রামের রামকুমারের পূর্ব পরিচিত ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কার্যকারণবশত রামকুমারের কলকাতায় ঝামাপুকুরের টোল বন্ধ হয়ে গেল। গদাধর দক্ষিণেশ্বরে এলো বটে, কিন্তু মন্দির হতে সিধা নিয়ে গঙ্গার কুলে স্বহস্তে রেঁধে আহার করতে লাগল। রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাস তখন

রানীর বৈষয়িক বিষয়ে ভার নিয়েছেন এবং সেই সংগে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের ভারও তাঁর উপরেই। ধর্মপ্রাণ মথুরবাবু প্রথম দর্শনেই গদাধরের উপরে আকৃষ্ট হলেন। তাঁর ইচ্ছা, এই চারুদর্শন বালককে মন্দিরে পূজার কোনও কাজে নিযুক্ত করেন। রামকুমারের কাছে মথুরবাবু এই অভিপ্রায় ব্যক্তও করলেন। কিন্তু অগ্রজ অনুজের মনের ভাব জানেন বলে এ বিষয়ে গদাধরের সংগে কোনও আলোচনায় অগ্রসর হলেন না।

এই সময়ে রামকুমারের ভাগিনেয় হেমাংগিনী দেবীর ষোলবছরের পুত্র হৃদয়নাথ মুখোপাধ্যায় কাজকর্মের খোঁজে দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হয়। সে আসাতে একজন সংগী পেয়ে গদাধর বেশ উৎফুল্ল হয়। হৃদয়নাথের যুক্তিতর্কে এবং অনুরোধে শেষ পর্যন্ত গদাধর কালীমন্দিরে বেশকারীর পদ গ্রহণ করল এবং হৃদয়নাথ হলো পূজারী রামকুমারের সাহায্যকারী। এই সময়েই পূজার প্রসাদ গ্রহণের ভিতর দিয়ে ক্রমশ গদাধর জাতি-বর্ণের সংস্কার হতে মুক্ত হতে লাগল।

সমসাময়িককাল থেকেই গদাধরের ভিতরে কিছু ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায়। গংগাকূল হতে মৃত্তিকা এনে বৃষ-ডমরু-ত্রিশূলসহ শিবমূর্তি স্বহস্তে গঠন করে তিনি পূজা করতে লাগলেন। দুপুরে আহারের পরে, অথবা সন্ধ্যায় কালীমন্দিরে যখন আরাত্রিক হতো তখন প্রায়ই গদাধরকে খুঁজে পাওয়া যেতো না। গদাধর তখন হয়তো নির্জনে পার্শ্বস্থ পঞ্চবটীর বৃক্ষশ্রেণীর আড়ালে ধ্যানমগ্ন। পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন : 'দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে একজন পাগল এসেছিল। পূর্ণজ্ঞানী, ছেঁড়া জুতো, হাতে কঞ্চি, এক হাতে একটি ভাঁড় আবচারা...সন্ধ্যা-আহ্নিক নাই···কালীঘরে গিয়ে স্তব করতে লাগল—ক্ষৌং ক্ষৌং খট্টাংগধারিণীং ইত্যাদি। মন্দির কেঁপে গিয়েছিল।···অতিথিশালায় এরা তাকে ভাত দেয় নাই—ভ্রূক্ষেপ নাই। পাত কুড়িয়ে খেতে লাগল—যেখানে কুকুরগুলো খাচ্ছে।···তুমি কে? তুমি কি পূর্ণজ্ঞানী? তখন সে বলেছিল, "আমি পূর্ণজ্ঞানী! চুপ!" আমি হলধারীর কাছে যখন এসব কথা শুনলুম, আমার বুক গুরগুর করতে লাগল···মাকে বললুম, মা, তবে আমারও কি এই অবস্থা হবে!··· যখন চলে গেল···হলধারীকে বলেছিল,···"এই ডোবার জল আর গংগাজলে যখন কোনো ভেদবুদ্ধি থাকবে না, তখন জানবি পূর্ণজ্ঞান হয়েছে···।" দক্ষিণেশ্বরে একটি সন্ন্যাসী দেখেছিলুম। ন'হাত লম্বা চুল। সন্ন্যাসীটি 'রাধে রাধে' করত। ঢং নাই।···কি অবস্থাই গিয়েছে! এখানে খেতুম না। বরানগরে, কি দক্ষিণেশ্বরে, কি এড়েদায়, কোনো বামুনের বাড়ি গিয়ে পড়তুম··· ।'

১২৬২ সালের ভাদ্রমাসে নন্দোৎসবের দিন একটি ঘটনা ঘটল। ঐদিন মধ্যাহ্নে রাধাগোবিন্দজীর বিশেষ পূজান্তে পূজারী ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গোবিন্দজীকে কক্ষান্তরে শয়ন করাতে নিয়ে যাবার সময়ে হঠাৎ পড়ে যান। তাতে বিগ্রহের একটি পা ভেঙে গেল। বলা বাহুল্য, রানী রাসমণি, মথুরবাবু এবং সকলেই চিন্তিত হলেন। গদাধর মাঝে মাঝে ভাবাবিষ্ট হয়ে যেতেন, একথা তখন প্রচার হয়ে গেছে। মথুরবাবু তাঁর কাছে মতামত চাইলেন। মূর্তিগঠনে গদাধরের পূর্বেই অভিজ্ঞতা

ছিল। নিখুঁতভাবে তিনি আবার গোবিন্দজীর পা জুড়ে দিলেন। অনেকে প্রশ্ন করল, এই বিগ্রহ পূজা করা চলবে? গদাধর জানালেন: নিশ্চয় চলবে। 'রানির জামায়ের যদি ঠ্যাং ভাঙত, তবে কি সে জামাইকে গংগায় ফেলে দিয়ে তিনি নূতন জামাই বসাতেন?'—অতি সহজেই মীমাংসা হয়ে গেল! পূজারী ক্ষেত্রনাথ কিন্তু কর্মচ্যুত হলেন। রাধাগোবিন্দজীর পূজার ভার তখন গদাধরের উপর ন্যস্ত হলো।

গদাধর দক্ষিণেশ্বরে পূজার ভার গ্রহণ করায় অগ্রজ রামকুমাব মনে মনে খুশি হলেন। এতদিনে তাঁর ভাইটি হয়তো নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। তিনি গদাধরকে চণ্ডীপাঠ, শ্রীকালীমাতার এবং অন্যান্য পূজার নিয়মাদি এবং ব্রাহ্মণগণের দশকর্মাদির যা যা শিক্ষা করা কর্তব্য তা শিখিয়ে দিলেন। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত না হলে দেবীপূজা বিধেয় নয় বলে গদাধর প্রবীণ শক্তিসাধক কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। কথিত আছে, এই দীক্ষাগ্রহণ করামাত্রই গদাধর ভাবাবেশে সমাধিস্থ হয়েছিলেন।

এই সময়ে রামকুমারের স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছিল না। গদাধরকে তাই শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজাকার্যে নিযুক্ত করে স্বল্পায়াসসাধ্য রাধাগোবিন্দজীর পূজা তিনি নিজে করতে লাগলেন। এ-খবর পেয়ে মথুরবাবু আনন্দের সংগে গদাধরকেই শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজারীপদে নিযুক্ত করলেন। ১২৬৩ সালের প্রারম্ভে একেবারেই হঠাৎ হৃদরোগে বামকুমার দেহত্যাগ করেন। তারপরে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের পূজাদির সম্পূর্ণ ভার গদাধরের উপরেই ন্যস্ত হয়।

গদাধরের সাধন-ভজনের আকাঙ্ক্ষা এই সময়ে তীব্রতর হতে থাকে। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের পাশে পঞ্চবটী তখন ছিল গভীর জংগলাকীর্ণ। ঐ জায়গাটা এককালে ছিল কবরডাঙা। নানা কারণে ঐ দিকে লোকসমাগম মোটেই ছিল না। গদাধর সবার অলক্ষ্যে দিনে বা রাত্রে ঐ স্থানে গিয়ে নির্জনে ধ্যান-সাধনা করতে লাগলেন। তখনকার মতো ভাগিনেয় হৃদয়ই একমাত্র এই খবরটা জানত। শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজাদির পরে সাশ্রু নেত্রে গদাধর আকুল হয়ে দেবীকে প্রার্থনা জানাতেন, 'মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস্, আমায় কেন তবে দেখা দিবি না? আমি ধন, জন, ভোগসুখ কিছুই চাহি না, আমায় দেখা দে।'

এই সময়ে নিজের অবস্থা বর্ণনা প্রসংগে পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'তাঁকে দর্শন করতে হলে সাধনের দরকার।...বেলতলায় কতরকম সাধন করেছি। গাছতলায় পড়ে থাকতুম, মা দেখা দাও বলে। চক্ষের জলে গা ভেসে যেত। দেহের দিকে একেবারেই মন ছিল না। মাথার চুল লম্বা হয়ে ধুলোমাটি লেগে লেগে আপনি জটা পাকিয়ে গিয়েছিল। ধ্যানে বসলে শরীরটা কাঠের মত হয়ে যেত। পাখি এসে মাথার উপরে বসে থাকত আর ঠোঁট চুলের মধ্যে ডুবিয়ে খাবার খোঁজ করত।...তাঁর বিরহে অস্থির হয়ে মাটিতে এমন করে মুখ ঘষতুম যে কেটে গিয়ে জায়গায় জায়গায় রক্ত বের হত। ঐভাবে কখনো ধ্যান-ভজনে, কখনো প্রার্থনায় সারাদিন কোথা দিয়ে কেটে যেত, হুঁশই থাকত না। পরে সন্ধ্যা হলে যখন চারদিকে শাঁখের আওয়াজ হতে থাকত, তখন মনে পড়ত—দিন শেষ হল, আর

একটা দিন বৃথা কেটে গেল, মার দেখা পেলুম না। তখন দারুণ অনুতাপে··· মাটিতে আছড়ে পরে 'মা এখনও দেখা দিলি না' বলে চিৎকার করে কাঁদতুম··· ।··· মার দেখা পেলুম না বলে তখন প্রাণে অসহ্য যাতনা।···অস্থির হয়ে ভাবলুম, তবে আর এ জীবনে কাজ কি ? মার ঘরে যে খাঁড়া ছিল, হঠাৎ তার উপর চোখ পড়ল। এই দণ্ডেই জীবন শেষ করব ভেবে পাগলের মত ছুটে ধরতে যাচ্ছি, হঠাৎ মার অদ্ভুত দর্শন পেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলুম। তারপরে বাইরে যে কি হয়েছে··· কিছুই জানতে পারি নাই।···সেইদিন থেকে আর একরকম হয়ে গেলুম। নিজের ভিতর আর একজনকে দেখতে লাগলুম। যখন ঠাকুরপুজো করতে যেতুম, হাতটা অনেক সময় ঠাকুরের দিকে না গিয়ে নিজের মাথার উপর আসত, আর ফুল মাথায় দিতুম।'

গদাধরের শ্রীশ্রীজগদম্বার ঐরকম অদ্ভুত পুজার কথা রানী রাসমণির কানেও পেঁছিল। ভক্তিমতী রানী খবর শুনে বরং আনন্দিতই হলেন। ধ্যান ও মাতৃদর্শনের জন্য ঐকান্তিক ব্যাকুলতা গদাধরকে এক ভাবজগতে নিয়ে গেল। এই সময়ের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন, 'ধ্যানে বসেছি কি শুনতে পেতুম, দেহের সন্ধিগুলো সব পায়ের দিক থেকে উপরদিকে একে একে খট্‌খট্‌ করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে···যতক্ষণ ধ্যান করতুম ততক্ষণ দেহটা যে একটু নেড়েচেড়ে অন্যভাবে বসব, বা ধ্যান ছেড়ে গিয়ে অন্যকিছু করব, তার জো ছিল না।· আকুল হয়ে মার কাছে প্রার্থনা জানাতুম, মা আমার কি হচ্ছে কিছুই বুঝি না, তোকে ডাকবার মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানিনা। যেমন করলে তোকে পাওয়া যায়, তুই-ই তা আমায় শিখিয়ে দে।···আমি কাঁদতুম আর ব্যাকুলপ্রাণে বলতুম, মা, এ বলছে এই এই, ও বলছে আর একরকম, কোন্‌টা সত্য তুই আমায় বলে দে। তিনদিন ধরে কেঁদেছি, আর বেদ-পুরাণ-তন্ত্র এসব শাস্ত্রে কি আছে সব দেখিয়ে দিয়েছেন। মাকে কেঁদে কেঁদে বলেছিলুম, মা, বেদ-বেদান্তে কি আছে আমায় জানিয়ে দাও—পুরাণ-তন্ত্রে কি আছে আমায় জানিয়ে দাও। তিনি একে একে আমায় সব জানিয়ে দিয়েছেন—কত সব দেখিয়ে দিয়েছেন।'

এই ভাবাবেগ বেড়ে গিয়ে এমন অবস্থায় দাঁড়াল যে, গদাধরের পক্ষে শ্রীশ্রীজগদম্বার পুজাকার্য চালান অসম্ভব হয়ে পড়ল। মথুরবাবু চিন্তিত হলেন। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছেন, 'যখন এই অবস্থা প্রথম হল, তখন মা কালীকে পুজা করতে বা ভোগ দিতে আর পারলুম না। হলধারী আর হৃদে বললে, খাজাঞ্চি বলেছে, ভট্‌চায্যি ভোগ দেবে না তো কি···করবেন ? আমি কুবাক্য বলেছে শুনে খুব হাসতে লাগলুম। একটুও রাগ হল না। এই অবস্থার পর কেবল ঈশ্বরের কথা শুনবার জন্য ব্যাকুলতা হত। কোথায় ভাগবত, কোথায় অধ্যাত্ম, কোথায় মহাভারত খুঁজে বেড়াতুম। এঁড়েদার কৃষ্ণকিশোরের কাছে অধ্যাত্ম শুনতে যেতুম। বিষয়ী লোক আসতে দেখলে ঘরের দরজা বন্ধ করতুম।'

গদাধরের দেবভাবের উপরে অসীম বিশ্বাসী মথুরবাবু। মনকে সুসংযত রেখে গদাধর যাতে সাধনার পথে নির্বাধায় অগ্রসর হয়ে যেতে পারে তার জন্য সকলপ্রকার বন্দোবস্তেই তিনি আগ্রহী। কলকাতার তৎকালীন বিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ

সেনকে দিয়ে তিনি গদাধরের চিকিৎসা করাতে লাগলেন। মন্দিরের নিত্যনিয়মিত দেবীসেবা গদাধরের দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়া অসম্ভব বুঝে গদাধরের খুল্লতাত-পুত্র রামতারক চট্টোপাধ্যায়কে (হলধারী) ১২৬৫ সালের (১৮৫৮ সন) প্রথম দিকেই দেবীপূজার জন্য নিযুক্ত করলেন।

১২৬২ হতে ১২৬৫ সাল পর্যন্ত পদাধরের সাধনকালের প্রথম ভাগ। এই সময়ে কেনারাম ভট্টের কাছ থেকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ ছাড়া তাঁর আর কোন বিশেষ সাধক-গুরুর দর্শনলাভ হয়নি। স্বামী সারদানন্দ এই সময়ের উল্লেখ করে 'লীলাপ্রসঙ্গে' লিখেছেন, 'ঈশ্বরলাভের ব্যাকুলতাই ঐ কালে তাঁহার একমাত্র সহায় হইয়াছিল।···উপাস্যের প্রতি অসীম ভালবাসা আনয়নপূর্বক উহাই তাঁহাকে বৈধী ভক্তির নিয়মাবলী উল্লঙ্ঘন করাইয়া ক্রমে রাগানুগা ভক্তিপথে অগ্রসর করাইয়াছিল··· ।'

গদাধরের মাতা চন্দ্রমণি দেবী পুত্রের শারীরিক অবস্থার কথা শুনে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রামকুমারের মৃত্যুর সময় থেকে প্রায় দুবছর তিনি কনিষ্ঠ পুত্রের মুখদর্শন করেন নি। এদিকের চিকিৎসায়ও বিশেষ ফল দেখা গেল না। তাই, এই বছর আশ্বিন/কার্তিক মাসে গদাধর কামারপুকুরে চলে গেলেন।

গাঁয়ে এসে ওঝা-বৈদ্য দিয়ে গদাধরের চিকিৎসা করানো হলো। চণ্ড নামানো হলো। কিন্তু কিছুই হলো না। সকলেরই অভিমত, গদাধরের রোগটি মৃগীরোগ নয়। আশ্চর্যের বিষয়, কিছুদিনের মধ্যে গদাধর অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। এইসময়ে গদাধরের বিবাহের জন্য আত্মীয়স্বজন সকলেই সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। পাত্রীর সন্ধানও মিলল : কামারপুকুর হতে দুক্রোশ দূরে জয়রামবাটীতে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা। ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসে সারদামণির সঙ্গে গদাধরের বিবাহ সুসম্পন্ন হলো। পাত্রের বয়স তখন চব্বিশ বছর, এবং কন্যা পদার্পণ করেছে ছয় বছরে।[১]

প্রায় একবছর সাতমাস পরে গদাধর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন। এখন তিনি অনেকটা সুস্থ। এখানে ফিরে এসে কয়েকদিন দেবীপূজাদি করবার পরেই কামারপুকুরের জীবন, মাতা-ভ্রাতা-স্ত্রী-সংসার, সকলই তাঁর মনে চাপা পড়ে গেল। দিবারাত্র স্মরণ, মনন, জপ, ধ্যানে তাঁর বক্ষাংশ সর্বদা আরক্তিম হয়ে থাকত। গায়ে বিষম গাত্রদাহ, চোখে ঘুম নেই। কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনকে এবারও দেখান হলো। শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মকথায় ভক্তদের বলেছেন : 'একদিন ঐরূপে গঙ্গাপ্রসাদের ভবনে উপস্থিত হইলে তিনি চিকিৎসায় আশানুরূপ ফল হইতেছে না দেখিয়া চিন্তিত হইলেন এবং বিশেষ পরীক্ষাপূর্বক নূতন ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। পূর্ববঙ্গীয় অন্য একজন বৈদ্যও তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। রোগের লক্ষণসকল শ্রবণ করিতে করিতে তিনি বলিয়াছিলেন, "ইঁহার দিব্যোন্মাদ অবস্থা বলিয়া বোধ হইতেছে ; উহা যোগজ ব্যাধি, ঔষধে সারিবার

১। গদাধরের বিবাহের বিষয় তথ্যপঞ্জীর পরবর্তী অংশে শ্রীশ্রীসারদামণির চরিতামৃতে আলোচিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীমায়ের লীলাপ্রসঙ্গ ঐ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বলে এই প্রসঙ্গ এখানে ঠাকুরের এই সংক্ষিপ্ত জীবনীতে আলোচিত হলো না।

নহে।' ঐ বৈদ্যই ব্যাধির ন্যায় প্রতীয়মান আমার শারীরিক বিকারসমূহের যথার্থ কারণ প্রথম নির্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহই তখন তাঁহার কথায় আস্থা প্রদান করে নাই।'

এই সময়ে পরপর কয়েকটি ঘটনা ঘটে। ১৮৫৫ সনের ২৯শে আগস্ট রানী রাসমণি দু'লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা দিয়ে দিনাজপুরে এক জমিদারী ক্রয় করেন। উদ্দেশ্য, ঐ জমিদারীর আয় থেকে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির ব্যয় নির্বাহ হবে। কিন্তু নানা কারণে ইতিপূর্বে দানপত্র সম্পাদন করা হয়নি। রানীর স্বাস্থ্যও তখন ভালো যাচ্ছিল না। তাই ১৮৬১ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারি সেই সম্পত্তি শ্রীশ্রীজগদম্বার নামে দানপত্র করে দেন। কিন্তু, তার পরদিনই তিনি ইহলীলা ত্যাগ করেন। রানীর মৃত্যুর আগে থেকেই ভক্তিমান জামাতা মথুরামোহন রানীর হয়ে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির সম্পত্তিসকল দেখাশুনো করতেন। এখন সকল দায়িত্বই তাঁর উপরে ন্যস্ত হলো।

গদাধরের দিব্যোন্মাদ অবস্থার বিষয়ে সাধারণ লোক কিছু বুঝতে পারেনি। তাদের ধারণা, গদাধর বিকৃতমস্তিষ্ক। না হলে কতো লোক রানী ও মথুরবাবুর কৃপা পেয়ে ধন্য হয়ে গেল, সে কিছুই করল না। কেবল সবসময়ে 'মা মা' আর 'কালী কালী' করে ভাবে বিভোর হয়ে রইল। কিন্তু মথুরামোহন চিনেছিলেন তাঁকে। রানীর মৃত্যুর পরে বিপুল সম্পত্তির উপর একাধিপত্য লাভ করেও বিপথগামী না হয়ে তিনি গদাধর এবং পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এই সুযোগ পেয়ে গদাধরও তাঁর আধ্যাত্মজীবনে পরম মোক্ষের দিকে সহজেই অগ্রসর হতে পেরেছিলেন।

এই সময়ে একদিন গৈরিকবস্ত্র-পরিহিতা আলুলায়িত দীর্ঘকেশা ভৈরবী-বেশধারিণী এক ব্রাহ্মণী এসে উপস্থিত হলেন দক্ষিণেশ্বরে। দূর হতেই প্রথম দর্শনেই এই ভৈরবীর উপরে গদাধর আকৃষ্ট হলেন। সাক্ষাৎ দর্শনের অভিলাষে গদাধরের ঘরে প্রবেশ করেই আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূতা হয়ে সজলনয়নে ভৈরবী বললেন : 'বাবা, তুমি এখানে রহিয়াছ! তুমি গঙ্গাতীরে আছ জানিয়া তোমায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম, এতদিনে দেখা পাইলাম!...তোমাদের তিনজনের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে, একথা ৺জগদম্বার কৃপায় পূর্বে জানিতে পারিয়াছিলাম। দুজনের দেখা পূর্ববঙ্গদেশে পাইয়াছি, আজ এখানে তোমার দেখা পাইলাম।'

প্রথমাবস্থায় ছয়/সাতদিন দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করে ভৈরবী তন্ত্রশাস্ত্র থেকে আধ্যাত্মিক দর্শন বিষয়ে গদাধরের বিবিধ প্রশ্নের মীমাংসা করে দিলেন। তারপর ভৈরবী দক্ষিণেশ্বর গ্রামের উত্তর দিকে ভাগীরথীতীরে দেবমণ্ডলের বাড়িতে স্থান পেয়ে সেখানে বাস করে গদাধরের তন্ত্রসাধনার সব বন্দোবস্ত করে দিয়ে নিজেই তান্ত্রিক ভৈরবী হলেন। কথিত আছে, তন্ত্রসাধনা আরম্ভ করবার পূর্বে গদাধর শ্রীশ্রীজগদম্বার ঐশ্বরিক অনুজ্ঞাও পেয়েছিলেন।

এই তন্ত্রসাধনার কথা 'লীলাপ্রসঙ্গে' স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন : 'ঠাকুর এখন সর্বস্ব ভুলিয়া সাধনায় মগ্ন হইলেন এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন কর্মকুশলা ব্রাহ্মণী তান্ত্রিকক্রিয়োপযোগী পদার্থসকলের সংগ্রহপূর্বক উহাদিগের প্রয়োগ সম্বন্ধে

উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাকে সহায়তা করিতে অশেষ আয়াস করিতে লাগিলেন। মনুষ্য প্রভৃতি পঞ্চপ্রাণীর মস্তক-কঙ্কাল গঙ্গাহীন প্রদেশ হইতে সযত্নে সমাহৃত হইয়া ঠাকুরবাটীর উদ্যানের উত্তরসীমান্তে অবস্থিত বিল্বতরুমূলে এবং ঠাকুরের স্বহস্ত-প্রোথিত পঞ্চবটীতলে সাধনানুকূল দুইটি বেদিকা নির্মিত হইল এবং প্রয়োজন মত ঐ মুণ্ডাসনদ্বয়ের অন্যতমের উপরে উপবিষ্ট হইয়া জপ, পুরশ্চরণ ও ধ্যানাদিতে ঠাকুরের কাল কাটিতে লাগিল।'

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ এই তন্ত্রসাধনার বিষয়ে যা বলেছেন তা একস্থানে সংকলন করেছেন সারদানন্দজী। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলতেন : 'ব্রাহ্মণী দিবাভাগে দূরে নানাস্থানে পরিভ্রমণপূর্বক তন্ত্রনির্দিষ্ট দুষ্প্রাপ্য পদার্থসকল সংগ্রহ করিত। রাত্রিকালে বিল্বমূলে বা পঞ্চবটীতলে সমস্ত উদ্যোগ করিয়া আমাকে আহ্বান করিত এবং ঐ সকল পদার্থের সহায়ে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা যথাবিধি সম্পন্ন করাইয়া জপধ্যানে নিমগ্ন হইতে বলিত। কিন্তু পূজান্তে জপ প্রায়ই করিতে পারিতাম না, মন এতদূর তন্ময় হইয়া পড়িত যে, মালা ফিরাইতে যাইয়া সমাধিস্থ হইতাম এবং ঐ ক্রিয়ার শাস্ত্রনির্দিষ্ট ফল যথাযথ প্রত্যক্ষ করিতাম। ঐরূপে এই কালে দর্শনের পর দর্শন, অনুভবের পর অনুভব, অদ্ভুত অদ্ভুত সব কতই যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই! বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত চৌষট্টিখানা তন্ত্রে যত কিছু সাধনের কথা আছে, সকলগুলিই ব্রাহ্মণী একে একে অনুষ্ঠান করাইয়াছিল। কঠিন কঠিন সাধন—যাহা করিতে যাইয়া অধিকাংশ সাধক পথভ্রষ্ট হয়—মার কৃপায় সে সকলে উত্তীর্ণ হইয়াছি।'

এই তন্ত্রসাধনার প্রত্যক্ষফল বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আত্মকথায় বলেছেন, 'এই অবস্থা যখন হল, ঠিক আমার মত একজন এসে ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না নাড়ী সব ঝেড়ে দিয়ে গেল। ষট্চক্রের এক একটি পদ্মে জিহ্বা দিয়ে রমণ করে, আর অধোমুখ পদ্ম ঊর্ধ্বমুখ হয়ে ওঠে। শেষে সহস্রার পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে গেল। কুলকুণ্ডলিনী না জাগলে চৈতন্য হয় না। মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী। চৈতন্য হলে তিনি সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়ে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর এইসব চক্র ভেদ করে শেষে শিরোমধ্যে গিয়ে পড়েন। এরই নাম মহাবায়ুর গতি—তবেই শেষে সমাধি হয়।... এই অবস্থা যখন হল, তার ঠিক আগে আমায় (ভৈরবী) দেখিয়ে দিলে, কিরূপে কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ হয়। ক্রমে ক্রমে সব পদ্মগুলি ফুটে যেতে লাগল আর সমাধি হল। এ অতি গুহ্য কথা। দেখলুম ঠিক আমার মত বাইশ-তেইশ বছরের ছোকরা, সুষুম্না নাড়ীর ভিতর গিয়ে জিহ্বা দিয়ে পদ্মের সঙ্গে রমণ করছে। প্রথমে গুহ্য লিঙ্গ নাভি। চতুর্দ্দল, ষড়দল, দশদল পদ্ম সব অধোমুখ হয়েছিল— ঊর্ধ্বমুখ হল। হৃদয়ে যখন এলো, বেশ মনে পড়ছে—জিহ্বা দিয়ে রমণ করবার পর দ্বাদশদল অধোমুখ পদ্ম ঊর্ধ্বমুখ হল আর প্রস্ফুটিত হল। তারপরে কণ্ঠে ষোড়শদল আর কপালে দ্বিদল। শেষে সহস্রদল পদ্ম প্রস্ফুটিত হল।...আত্মার রমণ প্রত্যক্ষ দেখলুম।'

১২৬৯ সালের শেষভাগ পর্যন্ত গদাধর তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহ অনুষ্ঠান করেছিলেন। ১২৭০ সালে মথুরামোহন 'অন্নমেরু ব্রতানুষ্ঠান' পালন করলেন।

এই অনুষ্ঠানে তিনি বহুস্থান হতে আগত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে বহুবিধ মূল্যবান সামগ্রী প্রদান করেন।

এই সময়ে জটাধারী নামে এক সাধু দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে আসেন। সঙ্গে তাঁর 'শ্রীশ্রীরামলালা' নামক শ্রীরামচন্দ্রের বালবিগ্রহ। ঠাকুর তাঁর কাছে রামমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করেন। ঠাকুরের গৃহদেবতা রঘুবীরজী, যাঁকে তিনি বাল্যলীলায় সযতনে সেবা করেছেন। জটাধারী তাঁর বিগ্রহটি ঠাকুরকে প্রদান করেন। এই ব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আত্মচরিতে বলেন, 'আমি রাম রাম করে পাগল হয়েছিলুম। সন্ন্যাসীর (জটাধারী) ঠাকুর রামলালাকে লয়ে লয়ে বেড়াতুম। তাকে নাওয়াতুম, খাওয়াতুম, শোয়াতুম। যেখানে যাবো সঙ্গে করে লয়ে যেতুম। রামলালা রামলালা করে পাগল হয়ে গেলুম। দক্ষিণেশ্বরে রামমন্ত্র লয়েছিলুম। দীর্ঘ ফোঁটা গলায় হীরা। আবার কদিন পরে সব দূর করে দিলুম।'

তান্ত্রিক সাধনসমূহ অনুষ্ঠানের পর ঠাকুর বৈষ্ণবমতের সাধন সকলে আকৃষ্ট হন। তাঁর জন্ম বৈষ্ণবকুলে, সুতরাং বৈষ্ণবভাবসাধনে তাঁর অনুরাগ থাকা স্বাভাবিক। ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগীশ্বরী বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত পঞ্চভাবমিশ্রিত সাধনসমূহে পারদর্শিনী ছিলেন। নন্দরানী যশোদার ভাবে তন্ময় হয়ে তিনি ঠাকুরকে বালগোপাল জ্ঞানে ভোজন করাতেন। বৈষ্ণবমতসাধনবিষয়ে ঠাকুরকে তিনিই উৎসাহ প্রদান করেন। আরেকটি কারণের কথা সারদানন্দজী তাঁর 'লীলাপ্রসঙ্গে' উল্লেখ করেছেন: 'সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট কারণ—ঠাকুরের ভিতর আজীবন পুরুষ ও স্ত্রী, উভয়বিধ প্রকৃতির অদৃষ্টপূর্ব সম্মিলন দেখা যাইত।···বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত বাৎসল্য ও মধুর-রসাশ্রিত মুখ্য ভাবদ্বয় সাধনেই তিনি এখন মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ এইসময়ের লীলাপ্রসঙ্গে বলেছেন, 'কি অবস্থা গেছে! হরগৌরীভাবে কতদিন ছিলুম, আবার কতদিন রাধাকৃষ্ণভাবে। কখনো সীতারামের ভাবে। রাধার ভাবে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করতুম, সীতার ভাবে 'রাম রাম' করতুম। সীতারামকে রাতদিন চিন্তা করতুম আর সীতারামের রূপ সর্বদা দর্শন হত। আবার কখনো রাধাকৃষ্ণের ভাবে থাকতুম। ঐরূপ সর্বদা দর্শন হত। আবার কখনো গৌরাঙ্গের ভাবে থাকতুম। দুই ভাবের মিলন—পুরুষ ও প্রকৃতিভাবের মিলন। এই অবস্থায় সর্বদাই গৌরাঙ্গের রূপ দর্শন হত। ··আমি মার (শ্রীশ্রীজগদম্বার) দাসীভাবে সখীভাবে দুই বৎসর ছিলুম। সখীভাবে অনেকদিন ছিলুম। বলতুম, আমি আনন্দময়ী, ব্রহ্মময়ীর দাসী। ওগো দাসীরা, তোমরা আমায় দাসী কর। ··তখন মেয়েদের মত কাপড় গয়না ওড়না পরতুম। ওড়না গায়ে দিয়ে আরতি করতুম, তা না হলে পরিবারকে আট মাস কাছে এনে রেখেছিলুম কেমন করে? দুজনেই মার সখী। একদিন ভাবে রয়েছি, পরিবার জিজ্ঞাসা করলে, আমি তোমার কে? আমি বললুম, আনন্দময়ী।···মেয়েদের কাপড় ওড়না এইসব পরতুম, আবার নথ পরতুম। মেয়ের ভাব থাকলে কামজয় হয়। সেই আদ্যাশক্তির পূজা করতে হয়। তিনিই মেয়েদের রূপ ধারণ করে রয়েছেন।···আবার অবস্থা বদলে গেল। তখন লীলা ত্যাগ করে নিত্যতে মন উঠে গেল।···ঘরে যত ঈশ্বরীর পট বা ছবি ছিল সব খুলে ফেললুম। কেবল সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সেই আদি পুরুষকে চিন্তা করতে লাগলুম। নিজে দাসীভাবে রইলুম—পুরুষের দাসী।'

বৈষ্ণবসাধনার রাগাত্মিকা ভক্তি, কামাত্মিকা মধুররস, সম্বন্ধাত্মিকা বাৎসল্য-সখ্য-দাস্য-শান্তরস ইত্যাদি সকলভাবের সাধনাই ঠাকুর করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলেছেন: 'উনিশ প্রকারের ভাব একাধারে প্রকাশিত হইলে তাহাকে মহাভাব বলে, একথা ভক্তিশাস্ত্রে আছে। সাধন করিয়া এক একটা ভাবে সিদ্ধ হইতেই লোকের জীবন কাটিয়া যায়! (নিজ শরীর দেখাইয়া) এখানে একাধারে একত্র ঐপ্রকার উনিশটি ভাবের পূর্ণ প্রকাশ।...শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সর্বস্বহারা সেই নিরুপম পবিত্রোজ্জ্বল মূর্তির মহিমা ও মাধুর্য বর্ণনা করা অসম্ভব। শ্রীমতীর অঙ্গকান্তি নাগকেশরপুষ্পের কেশরসকলের ন্যায় গৌরবর্ণ দেখিয়াছিলাম।'

১২৭০ সালেই ঠাকুরের জননী চন্দ্রমণি দেবী শেষ বয়সে গঙ্গাতীরে বাস করবেন বলে দক্ষিণেশ্বরে আসেন। কামারপুকুরে তাঁর কাছে লোকপরম্পরায় খবর যেত যে, তাঁর প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্র পাগলপ্রায়। বিবাহ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি ঘর-সংসার করলেন না, বা সে-সকলের কোন খবরাখবরও করছেন না। দক্ষিণেশ্বরে পুত্রের কাছে অবস্থান করাও তাঁর আর একটি উদ্দেশ্য। এখানে আসবার পরে নহবত-দালানে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হলো।

১২৭১ সালের শেষভাগে শ্রীমদাচার্য তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য রামতারক চট্টোপাধ্যায় (হলধারী) কালীবাড়ির পূজারীর কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন, এবং ঠাকুরের অগ্রজ রামকুমারের পুত্র অক্ষয় তাঁর জায়গায় নিযুক্ত হলেন।

মধুরভাবসাধনার পরে ঠাকুরের অদ্বৈত ভাবসাধনার অভিলাষ হলো। শ্রীশ্রীজগদম্বাই যেন যোগাযোগসাধন করে দিলেন। মধ্য ভারতের নর্মদাতীরে একান্তবাসপূর্বক সাধনভজনে নিমগ্ন নির্বিকল্পসমাধিপথে আচার্য তোতাপুরীর ব্রহ্মদর্শনলাভ হয়েছিল বলে কথিত। সিদ্ধিলাভের পরে তিনি ভারতভ্রমণে বের হলেন। পূর্বভারতের তীর্থদর্শনের পথে তাঁর দক্ষিণেশ্বরে আগমন। তিনদিনের বেশি তিনি এক জায়গায় বাস করতেন না। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে ঈশ্বরী জগদম্বা অন্যথা করলেন। ঠাকুরকে প্রথম দর্শনেই তোতাপুরী বিস্মিত হয়ে ভাবলেন, ইনি সামান্য পুরুষ নন—বেদান্তসাধনের এরূপ উত্তমাধিকারী বিরল দেখতে পাওয়া যায়। তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'তোমাকে উত্তম অধিকারী বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি বেদান্তসাধন করিবে?'

ঠাকুরের এক উত্তর, মায়ের আদেশ ছাড়া তিনি কিছু করতে পারেন না। যথাকালে ঈশ্বরী জগদম্বা ভাবাদেশ দিলেন: 'যাও শিক্ষা কর, তোমাকে শিখাইবার জন্যই সন্ন্যাসীর এখানে আগমন হইয়াছে।'

বেদান্তসাধনে উপদিষ্ট এবং প্রবৃত্ত হবার পূর্বে শিখা-সূত্র পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হয়। তাঁর শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা মাতা এতে হয়তো বিষম আঘাত পাবেন ভেবে প্রথমে ঠাকুর রাজী হলেন না। অতঃপর ঠিক হলো যে, গোপনে যথাবিহিত সন্ন্যাসগ্রহণ তিনি করবেন। সবদিক ভেবে তোতাপুরীও রাজী হলেন।

এরপর এক শুভদিনে যথাবিধানে বিরজাহোম সম্পন্ন করে ত্রিসুপর্ণমন্ত্র উচ্চারণ করে এক ব্রাহ্মমুহূর্তে তোতাপুরীর কাছে দীক্ষিত হয়ে ঠাকুর সন্ন্যাসগ্রহণ করলেন। হোমযজ্ঞে শিখা, সূত্র ও যজ্ঞোপবীত আহুতি দিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণান্তে দীক্ষাগুরু তোতাপুরী ঠাকুরকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাম প্রদান করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আত্মকথায় বলেছেন, 'আমি এক জ্ঞানীর পাল্লায় পড়েছিলুম। ···এগার মাস বেদান্ত শোনালে। কিন্তু ভক্তির বীজ আর যায় না। ফিরে ঘুরে সেই 'মা মা'।···যতবার মন থেকে সব জিনিস তাড়িয়ে নিরালম্ব হয়ে থাকতে চেষ্টা করি, ততবারই ঐরূপ হয়। শেষে ভেবে চিন্তে মনে খুব জোর এনে, জ্ঞানকে অসি ভেবে সেই অসি দিয়ে ঐ মূর্তিটাকে মনে মনে দুখানা করে কেটে ফেললুম। তখন মনে আর কিছুই রইল না—হু হু করে একেবারে নির্বিকল্প অবস্থায় পৌঁছল।···বেদমন্ত্র সাধনের সময় সন্ন্যাস নিলুম···মাকে (ঈশ্বরী জগদম্বা) বললুম, আমি মুখ্যু, তুমি আমায় জানিয়ে দাও—বেদ পুরাণ তন্ত্রে, নানাশাস্ত্রে কি আছে। মা বললেন, বেদান্তের সার ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের কথা বেদে আছে তাকে তন্ত্র বলে, সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ—আবার তাকেই পুরাণে বলে, সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ। প্রত্যক্ষ দর্শনের পর যা যা অবস্থা হয় শাস্ত্রে আছে, সে সব হয়েছিল। বালকবৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ, জড়বৎ। আর শাস্ত্রে যেরূপ আছে সেরূপ দর্শনও হত।···যে অবস্থায় সাধারণ জীবেরা পৌঁছুলে আর ফিরতে পারে না, একুশ দিনে মাত্র শরীরটা থেকে শুকনো পাতার মত ঝরে পড়ে যায়, সেইখানে ছ'মাস ছিলুম। কখন কোনদিক দিয়ে যে দিন আসত, রাত যেত, তার ঠিকানাই হত না। মরা মানুষের নাকে মুখে যেমন মাছি ঢোকে—তেমনি ঢুকত, কিন্তু সাড় হত না।···তারপর এই অবস্থায় কতদিন পর শুনতে পেলুম মার (ঈশ্বরী জগদম্বা) কথা,—ভাবমুখে থাক্, লোকশিক্ষার জন্য ভাবমুখে থাক্।'

একাদিক্রমে এগার মাস দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করে শ্রীমৎ তোতাপুরী ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণে চলে গেলেন। 'লীলাপ্রসঙ্গে' সারদানন্দজী লিখেছেন: 'অদ্বৈতভাবভূমিতে আরূঢ় হইয়া···তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, অদ্বৈতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ববিধ সাধনভজনের চরম উদ্দেশ্য।··অদ্বৈতভাবের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেইজন্য আমাদিগকে বারংবার বলিতেন, "উহা শেষ কথারে, শেষ কথা ; ঈশ্বর-প্রেমের চরম পরিণতিতে সর্বশেষে উহা সাধকজীবনে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয় ; জানিবি সকল মতেরই উহা শেষ কথা এবং যত মত তত পথ।"

বাহ্যজ্ঞানরহিত হয়ে একাদিক্রমে দীর্ঘদিন অদ্বৈতসাধনার পরে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে। তাঁর দেহ প্রায় অস্থিচর্মসার হয়ে যায়। আত্মকথায় তিনি বলেছেন, 'তখন আমার খুব অসুখ। সরা সরা বাহ্যে যাচ্ছি। মাথায় যেন দু'লাখ পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরীয় কথা রাতদিন চলছে। নাটাগড়ের রাম কবিরাজ দেখতে এলো। সে দেখে, আমি বসে বিচার করছি। তখন সে বললে, এ কি পাগল! দু'খানা হাড় নিয়ে বিচার করছে···!'

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে হিন্দু সন্ন্যাসীগণের মতো মুসলমান ফকিরগণেরও সমাদর ছিল, এবং জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের ত্যাগীদের প্রতি এখানে সমভাবে আতিথ্য প্রদর্শন করা হতো। ক্ষত্রিয় গোবিন্দ রায় নামে এক ব্যক্তি ধর্মসম্বন্ধীয় নানা মতামত আলোচনা ক'রে এবং নানা ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরিশেষে ইসলামধর্মের উদার মতে আকৃষ্ট হয়ে সেই ধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। কালক্রমে তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসে বাস করতে থাকেন। গোবিন্দ প্রেমিক ছিলেন। বোধহয়, ইসলামের সুফী সম্প্রদায়ের ভাবসহায়ে ঈশ্বরের উপাসনাপদ্ধতি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল।

গোবিন্দ রায়ের সঙ্গে আলাপ করে শ্রীরামকৃষ্ণ ইসলামধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভাবতে থাকেন, 'ইহাও তো ঈশ্বর লাভের এক পথ, অনন্ত-লীলাময়ী মা এপথ দিয়াও তো কত লোককে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মলাভে ধন্য করিতেছেন ; কিরূপে তিনি এই পথ দিয়া তাঁহার আশ্রিতদিগকে কৃতার্থ করেন, তাহা দেখিতে হইবে ; গোবিন্দের নিকট দীক্ষিত হইয়া এ ভাবসাধনে নিযুক্ত হইব।'

যেই চিন্তা, সেই কাজ। শ্রীরামকৃষ্ণ গোবিন্দ রায়ের নিকট ইসলামধর্মে দীক্ষিত হলেন। এই দীক্ষার পরের অবস্থা তিনি নিজেই তাঁর আত্মকথায় বলেছেন, 'গোবিন্দরায়ের কাছে আল্লামন্ত্র নিলুম, কুঠিতে প্যাঁজ দিয়ে রান্না ভাত হল। খানিক খেলুম। মণি মল্লিকের বাগানে ব্যন্নুন রান্না খেলুম, কিন্তু কেমন একটা ঘেন্না হল। ঐ সময়ে আল্লামন্ত্র জপ করতুম, মুসলমানদের মত কাছা খুলে কাপড় পড়তুম, ত্রিসন্ধ্যা নামাজ পড়তুম। হিন্দুভাব একেবারেই মন থেকে লোপ পেয়েছিল। হিন্দু দেবদেবীদের প্রণাম তো দূরের কথা, দর্শন করতেও ইচ্ছা হত না। তিন দিন এভাবে কাটাবার পর ঐ মতের সাধনায় সম্পূর্ণ ফললাভ করেছিলুম।'

বেদান্তসাধনে সিদ্ধ হয়ে সর্বধর্মে সমদৃষ্টি হওয়াতেই ইসলাম-ধর্মসাধনা শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তিনি ভক্তদের বলতেন: 'হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যেন একটা পর্বত-ব্যবধান রহিয়াছে—পরস্পরের চিন্তাপ্রণালী, ধর্মবিশ্বাস ও কার্যকলাপ এতকাল একত্রবাসেও পরস্পরের নিকট সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য হইয়া রহিয়াছে।'

অতঃপর, প্রায় ছয়মাসকাল অসুখে ভোগবার পরে ১২৭৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে গমন করেন।

+ + +

পূর্বেই বলা হয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের লীলাপ্রসঙ্গ প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়—বাল্যলীলা, সাধনলীলা, প্রচারলীলা এবং লীলাসম্বরণ। অচিন্ত্য-কুমারের 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের' জীবনী চার খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম দুটি খণ্ড তাঁর রচনাবলীর এই পঞ্চম খণ্ডে সংযোজিত হয়েছে। তিনি তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড শেষ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সাধনলীলার শেষে প্রচারলীলার প্রথমাংশে।—অর্থাৎ, ১৮৮২ সনের আগষ্ট পর্যন্ত ঘটনাবলী সংযোজিত ক'রে। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসম্বরণ করেন ১৮৮৬ সনের আগষ্ট মাসে (৩১শে শ্রাবণ,

১২৯৩ সাল)। পরিপূরক হিসেবে শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত স্থানাভাববশত তাঁর সাধনলীলার প্রায় শেষ পর্যন্ত এই খণ্ডে সংযোজিত হলো। পরবর্তী খণ্ডে এই সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত শেষ করা হবে এবং তাঁর অমৃতবাণী সংকলিত হবে।

অচিন্ত্যকুমারের অমৃত-লেখনীর আর একটি জীবনী গ্রন্থ 'পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি' রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে সংযোজিত হয়েছে। তাঁর সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত পরবর্তী অংশে সংকলিত হয়েছে। অবশ্য, শ্রীমায়ের এই জীবনীতেও শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গ ও লীলাবসানের অনেক ঘটনাই স্থান পেয়েছে।

একটি কথা এখানে বলা দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত অনেক কথাই শ্রীম লিখিত 'কথামৃতে' এবং স্বামী সারদানন্দ লিখিত 'লীলাপ্রসঙ্গে' লিপিবদ্ধ হয়েছে। এগুলির মধ্যে যে সকল কথা ঠাকুরের নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ, সেগুলোকেই মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মকথা বলে উদ্ধৃত হয়েছে। অন্যান্য 'আত্মকথা' ভক্তদের কাছে দেওয়া বিবৃতি থেকে উৎকলিত হয়েছে। এই সকল উদ্ধৃতির ভাষা এবং বানান যথাযথ রাখা হয়েছে। বলা বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পূর্ণ 'আত্মকথা' রচনাবলীর তথ্যপঞ্জীর সীমিত স্থান সংযোজন করা সম্ভব নয়।

\+ \+ \+

পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি

চরিতামৃত

অচিন্ত্যকুমার তাঁর অমৃত লেখনীতে শ্রীসারদামণির জীবনী কথকতা রূপে লিপিবদ্ধ করেছেন। ধারাবাহিক ঘটনা পরম্পরায় শ্রীমায়ের জীবনের ইতিহাস যাতে জানা যায়, সেজন্য এই সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত অচিন্ত্যকুমার রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডের তথ্য-পঞ্জীতে সম্পৃক্ত হলো। অচিন্ত্যকুমারের মূল গ্রন্থ 'পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি' রচনাবলীর এই খণ্ডেই সংযোজিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর মহকুমার অধীনে জয়রামবাটী গ্রাম। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুর হতে এই গ্রামের দূরত্ব প্রায় তিন মাইল। এই গ্রামের মুখোপাধ্যায় পরিবার অতি প্রাচীন। একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হতেই এই পরিবারের বংশতালিকা পাওয়া যায়। এই বংশের রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথম সন্তান শ্রীশ্রীসারদা দেবী। সারদামণির জন্ম ৮ই পৌষ, ১২৬০ সালে (২২শে ডিসেম্বর, ১৮৫৩) বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যারাত্রে।

মাতা শ্যামাসুন্দরী নাম রেখেছিলেন ক্ষেমঙ্করী। জন্মের পূর্বেই তাঁর মাসিমার সারদা নামে এক কন্যা মারা যায়। মাসিমার অনুরোধেই শ্যামাসুন্দরী কন্যার ক্ষেমঙ্করী নাম বদলে সারদা রাখেন। সারদামণিরা দু-বোন এবং পাঁচ ভাই।

অল্পবয়সেই সারদামণির বোন কাদম্বিনীর বিবাহ হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি অল্পবয়সেই বিধবা হন। দ্বিতীয় ভ্রাতা উমেশচন্দ্র অবিবাহিত অবস্থাতে আঠার-উনিশ বছর বয়সে মারা যান। কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভয়চরণ ডাক্তারী শিক্ষার অব্যবহিত পরে স্ত্রী সুরবালা এবং একমাত্র কন্যা রাধারাণীকে রেখে মারা যান। অন্য তিন ভ্রাতা প্রসন্নকুমার, কালীকুমার এবং বরদাপ্রসাদ কালক্রমে উপার্জনক্ষম হয়ে ভিন্ন ভিন্ন সংসার স্থাপন করেন। ভ্রাতারা ভিন্ন হয়ে গেলে সারদামণি প্রসন্নকুমারের সংসারেই বসবাস করেন।

কথিত, ছেলেবেলায় সারদামণির মধ্যে অনেকেই অলৌকিক শক্তির পরিবেষ্টন লক্ষ্য করেছেন। শ্রীমা নিজেই বলেছেন, 'ছেলেবেলায় দেখতুম, আমারই মতো মেয়ে সর্বদা আমার সংগে সংগে থেকে আমার সকল কাজের সহায়তা করত—আমার সংগে আমোদ-আহ্লাদ করত ; কিন্তু অন্য লোক এলেই আর তাকে দেখতে পেতুম না। দশ এগার বছর পর্যন্ত এরকম হয়েছিল।'

শ্রীমায়ের মাতুলালয় নিকটেই শিহড় গ্রামে। আবার ঐ গ্রামেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগিনেয় হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। সেইজন্য ঠাকুরের সেই বাড়িতে যাতায়াত ছিল। তিনি বাল্যাবধি সংগীত ভালোবাসতেন। কোথাও সংগীতানুষ্ঠান, কীর্তন বা যাত্রাভিনয় হচ্ছে জানতে পারলে বালক গদাধর সেখানে যেতেন। হৃদয়ের গৃহে এমনি এক সংগীতানুষ্ঠানে গদাধর উপস্থিত ছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানে সারদামণিও এক মহিলার ক্রোড়ে বসে সংগীত শুনছিলেন। ঐ সংগীতানুষ্ঠান সমাপান্তে কৌতুক করে সেই মহিলা যখন সারদামণিকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এত লোক যে বসে আছে, তাদের মধ্যে কাকে তার বিয়ে করতে সাধ হয়, তখন পাঁচ বছরের বালিকা হাত তুলে গদাধরকে দেখিয়ে দেয়!

গদাধরের তখন বয়স কুড়ি/একুশ।[১] জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার কলকাতার নিকটে রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে পূজারী। গদাধরও জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার কাছে থেকে কালীমাতার পূজাদিতে সহযোগিতা করতেন। রামকুমারের মৃত্যুর পরে গদাধরের জীবনে অনেক কিছু পরিবর্তন এসে যায়। প্রায়ই তার ভাবাবেশে সংজ্ঞা লোপ হয়ে যেত। সবাই ভাবত মৃগীরোগ। মাতা চন্দ্রমণি তাকে দক্ষিণেশ্বর থেকে বাড়িতে নিয়ে এলেন। সেখানে সেবা-যত্নে গদাধর খানিকটা সুস্থ হলেন। মাতা ছেলের ভিতরে বৈরাগ্যদর্শন করে পুত্র রামেশ্বরের সংগে পরামর্শ করে তার বিবাহ দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হতে লাগল। ক্রমে এই বৃত্তান্ত গদাধরের শ্রবণে পৌঁছল। বালকসুলভ আনন্দ প্রকাশ করেই তিনি বললেন, 'জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়িতে দেখগে, বিয়ের কনে সেখানে কুটোবাঁধা আছে।'

এই ইঙ্গিতের পরে পাত্রীনির্বাচনে আর বিলম্ব হলো না এবং ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসে গদাধরের সংগে সারদামণির বিবাহ হয়। বরের বয়স তখন চব্বিশ

১। বিস্তৃত বিবরণের জন্য তথ্যপঞ্জীতে সংযুক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিতামৃত দ্রষ্টব্য।
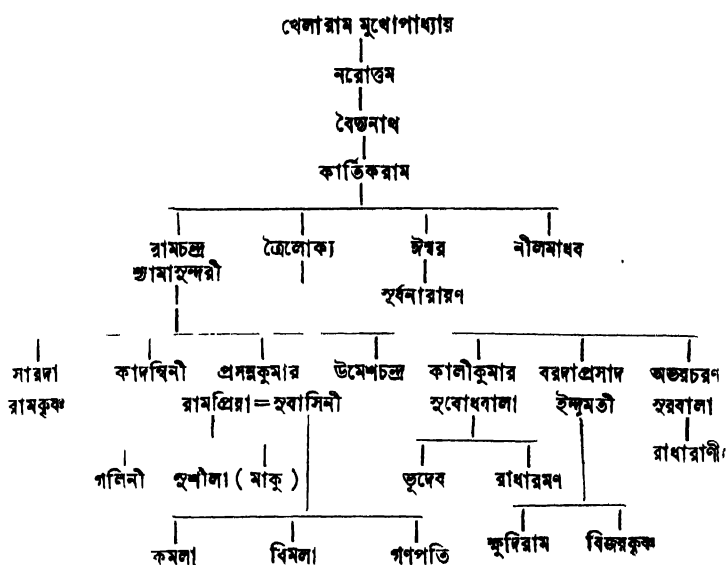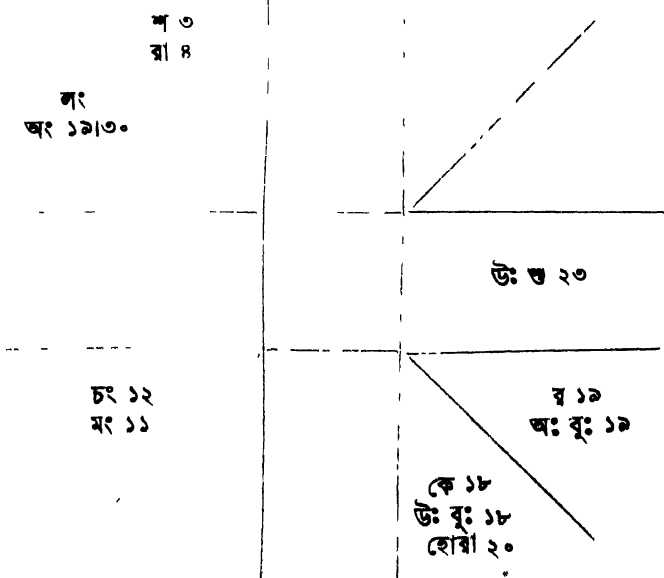
পৌষস্যাষ্টমদিবসে, গুরুবাসরে কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তম্যাং তিথৌ উত্তরফাল্গুনীনক্ষত্রাশ্রিত সিংহরাশিস্থিতে চন্দ্রে, অশেষগুণালংকৃত—শ্রীযুত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহোদয়স্য শুভা প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সারদামণি সমজনি।

এবং কন্যার বয়স ছয়। কথিত, বিবাহ উপলক্ষে বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে তিনশ টাকা পণ দিয়েছিল। সেই উপলক্ষে গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের বাড়ি থেকে গহণা এনে বালিকা বধুকে সাজানো হয়েছিল। বৌভাতের শেষে সারদামণির নিদ্রিতাবস্থায় সেগুলো খুলে নিয়ে যথাস্থানে ফেরৎ দেওয়া হয়। কিন্তু সেইদিনই বালিকা নববধুকে তার খুড়ো দেখতে এসে নিরাভরণা দেখে রাগে স্নেহের পুত্তলি ভ্রাতুষ্পুত্রীকে নিয়ে জয়রামবাটীতে চলে যান।

এই ঘটনার পরে প্রায় দুবছর গদাধর কামারপুকুরে ছিলেন কিন্তু জয়রামবাটীতে তাঁর যাওয়া হয় নি, বা সারদামণিও কামারপুকুরে আসেননি। ১২৬৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে গদাধর একবার শ্বশুরবাড়ি যান। এর অল্পদিন পরেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যান।

এর পরে তের ও চৌদ্দ বছর বয়সে শ্রীমা দুবার জয়রামবাটী থেকে কামারপুকুরে এসেছিলেন। গদাধর তখন দক্ষিণেশ্বরে গভীর সাধনায় নিমগ্ন।

১২৭৪ সালে রামকৃষ্ণ ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও ভাগিনেয় হৃদয়কে নিয়ে কামারপুকুরে আসেন এবং শ্রীমাকেও জয়রামবাটী থেকে সেখানে আনয়ন করেন। এইবারে তিনি সেখানে সাতমাস ছিলেন। তারপর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গিয়ে আবার গভীর সাধনায় ডুবে কামারপুকুরের সব কথা ভুলে যান। দীর্ঘ সাধন-পর্বের শেষে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বাস্থ্যের বিশেষ অবনতি হয়। তাই, ডাক্তারদের পরামর্শে ১২৭৭ সাল পর্যন্ত বর্ষায় কামারপুকুরে গিয়ে চতুর্মাস্য যাপন করতেন। শ্রীমা-ও তখন সেখানে উপস্থিত থাকতেন।

আশ্চর্যের বিষয়, এই সময়ে শ্রীমায়ের বিদ্যাশিক্ষার উপরে শ্রীরামকৃষ্ণের আগ্রহ জন্মে। এই সময়ে শ্রীমায়ের লেখাপড়া শিখবার আগ্রহও লক্ষণীয়। বলা বাহুল্য, সেই সময়ে মেয়েদের ভিতরে লেখাপড়া শেখবার রীতি তেমন ছিল না। এ বিষয়ে শ্রীমা বলেছেন, 'কামারপুকুরে লক্ষ্মী (ভাসুর রামেশ্বরের কন্যা) আর আমি বর্ণ-পরিচয় একটু একটু পড়তুম। ভাগ্নে (হৃদয়) বই কেড়ে নিলে ; বললে, মেয়েমানুষের লেখাপড়া শিখতে নেই ; শেষে কি নাটক-নভেল পড়বে ?—লক্ষ্মী তার বই ছাড়লে না। ঝিয়ারী মানুষ কিনা, জোর করে রাখলে। আমি আবার গোপনে আর একখানি এক আনা দিয়ে কিনে আনালুম। লক্ষ্মী গিয়ে পাঠশালায় পড়ে আসত। সে এসে আবার আমায় পড়াত।...ভাল করে শেখা হয় দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর তখন চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরে। ভব মুখুজোদের একটি মেয়ে আসত নাইতে।...সে রোজ নাইবার সময় পাঠ দিত ও নিত।' অবশ্য, এই বিদ্যাভ্যাসের ফলে তিনি রামায়ণাদি পড়তে পারতেন, কিন্তু বিশেষ লিখতে পারতেন না।

কামারপুকুরে থাকাকালীন শ্রীরামকৃষ্ণও শ্রীমাকে ব্যবহারিক জীবন বিষয়ে নানাভাবে শিক্ষা দিতেন। একদিকে শ্রীমায়ের সম্মুখে যেমন তুলে ধরতেন আপন অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানরাশি, ত্যাগোজ্জ্বল জীবনাদর্শ, উচ্চতর ধর্মীয় জীবন লাভের পথ, অন্যদিকে দৈনন্দিন গৃহস্থালী কর্ম, দেব-দ্বিজ-অতিথিসেবা, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, কনিষ্ঠদের প্রতি স্নেহপরায়ণতা, পরিবারের সেবায় আত্মসমর্পণ ইত্যাদি বহুবিষয়ে তাঁকে উপদেশ দিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ইতিপূর্বেই আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন তোতাপুরীর নিকট। সেই গুরুর কাছেই তিনি শুনেছিলেন, 'স্ত্রী নিকটে থাকিলেও যাহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে, সে ব্যক্তিই ব্রহ্মে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া সর্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষে ভেদসম্পন্ন অপর সকল সাধক হইলেও ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে বহু দূরে রহিয়াছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এ এক পরীক্ষিত সত্য। তিনি স্ত্রী গ্রহণ করলেও সম্ভোগের আসক্তি কখনো তাঁর জীবনে স্পর্শ করেনি। অথচ, আমৃত্যু শ্রীমা তাঁর জীবনে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছেন। সেই অনুসরণের ফলে সারদাদেবী ক্রমে ঠাকুরের সাধকমহিমার ঐশ্বরিক আলোর স্পর্শে মহিমামণ্ডিত হয়ে উত্তরকালে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনার উত্তরাধিকারিনীরূপে জগতে মাতৃত্বের মহিমা প্রচারের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

তারপর দীর্ঘ চার বছর কেটে গেল। ১২৭৮ সাল। শ্রীমায়ের বয়স তখন ১৮ বছর। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কচিৎ কখনো দক্ষিণেশ্বরের দু-একটি উড়ো খবর কামারপুকুরে আসত। ঠাকুরের তখন প্রায়ই ভাবসমাধি হয়। সাধারণ লোকে বলে উম্মাদ অবস্থা। গ্রামেও তাই রটে গেল। স্বাভাবিকভাবেই শ্রীমা বিচলিত হলেন। সেই বছর চৈত্র মাসে পিতা রামচন্দ্র কয়েকজন গ্রাম্য সঙ্গীসহ গঙ্গাস্নানে যাবেন। ফাল্গুনী দোলপূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম উপলক্ষে অনেকেই তখন সুদূর হতে গঙ্গাস্নানে যাত্রা করতেন। সেবারে ১২৭৮ সালে ১৩ই চৈত্র ছিল দোলপূর্ণিমার পুণ্য দিবস। পথ সহজ নয়, যানবাহনেরও সুবিধা তেমন নেই। কামারপুকুর থেকে তারকেশ্বর হয়ে দক্ষিণেশ্বর ষাট মাইল, হেঁটেই যেতে হবে। কন্যার আন্তরিক ইচ্ছা জেনে তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে রামচন্দ্র সঙ্গী-সঙ্গিনীসহ একদা গঙ্গাস্নানের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

শ্রীমা জীবনে কখনই পায়ে হেঁটে এত দীর্ঘপথে যাত্রা করেন নি; তারপর তখন তাঁর স্বাস্থ্য ভালো ছিল না। দু-তিন দিন হাঁটবার পরেই ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন: সঙ্গীদের পথে এগুতে বলে কন্যাকে নিয়ে পিতা পথের এক চটিতে আশ্রয় নিলেন। কথিত, এখানে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। শ্রীমা তীব্র জ্বরে যখন প্রায় সংজ্ঞাহীন তখন লক্ষ্য করলেন, কালো রঙের একটি সুরূপা মেয়ে শয্যাপার্শ্বে বসে তাঁর শরীরে পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সেই মেয়েটি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি।...তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বই কি, ভাল হয়ে সেখানে যাবে, তাঁকে দেখবে।'

পরদিনই শ্রীমার জ্বর সেরে গেল। আবার পথযাত্রা। কিছুদূর যাবার পরে একটি পাল্‌কিও পাওয়া গেল। ক্রমে সুদীর্ঘ পথ শেষ করে, নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে তাঁরা ফাল্গুন মাসের এক রাত্রিতে ন'টার সময়ে দক্ষিণেশ্বর এসে পৌঁছলেন। এইখানে সে-ই মায়ের প্রথম আগমন।

শ্রীমা, তখন দীর্ঘ পথযাত্রায় ক্লান্ত, তার উপরে জ্বরাক্রান্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন। সেবা-শুশ্রূষার দরকার বলে নিজের ঘরের একপাশেই তাঁর শোবার বন্দোবস্ত করে দিলেন। পরদিন ডাক্তার এলো, চিকিৎসা চলল। অচিরেই শ্রীমা ভালো হয়ে গেলেন। তখন ঠাকুরের জননী চন্দ্রমণিও দক্ষিণেশ্বরে নহবত-খানাতে বাস করছিলেন। রোগমুক্ত হবার পরে শ্রীমা শ্বাশুড়ীর কাছে নহবতে চলে গেলেন।

দক্ষিণেশ্বরে এসে স্বচক্ষে ঠাকুরের অবস্থা দেখে শ্রীমা আশ্বস্ত হলেন। গ্রাম-বাসীগণ ঠাকুর সম্বন্ধে যা রটনা করেছিল তা সর্বৈব মিথ্যা। তিনি ঠাকুর-সকাশে এসে নূতন আনন্দ ও উদ্দীপনায় ঠাকুর ও তাঁর জননীর সেবায় নিজেকে ঢেলে দিলেন। ঠাকুর অবসরমত শ্রীমাকে ধ্যান, সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয়ে উপদেশ দিতেন।

নহবতের ঘরটি অতি সংকীর্ণ। সেই অপরিসর স্থানেই জিনিষপত্র নিয়ে প্রায়-আতুর শ্বাশুড়ীকে সেবা-যত্ন করে ঘর-সংসারের কাজকর্ম করে শ্রীমায়ের দিন কেটে যেতে লাগল আনন্দে। শত অসুবিধা হলেও শ্রীমায়ের কাছ থেকে কখনো অভিযোগ শোনা যায় নি। সেই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক ভক্তদের খাবার রান্না ও বন্দোবস্ত করে দিতে হতো শ্রীমাকেই। তিনি অম্লান বদনে সেই সকল কর্তব্য পালন করতেন।

এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে এবং শ্রীমাকেও এক গভীর পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। একাদিক্রমে আটমাস ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীমা এক শয্যায় শয়ন করলেন। তখন ঠাকুরের মন যেমন বাস্তব জগতের ঊর্ধ্বে এক ভাবময় সাধন-জগতে বিচরণ করত, শ্রীমায়ের মনও তেমনি শয়নে-স্বপনে এই আরাধ্য দেবতাতেই ধ্যানিমগ্ন থাকত। সেইজন্য, কারো মনে বা দেহে কখনই ভোগলিপ্সার উদয় হলো না। শ্রীরামকৃষ্ণও এই কঠিন পরীক্ষা শেষে শ্রীমায়ের পবিত্রতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হলেন।

ইতিমধ্যে ১২৭৯ সালের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ (৫ই জুন, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ) অমাবস্যা তিথিতে ফলহারিণী-কালীপূজার দিন এলো। সেই রাত্রে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে তাঁর ষোড়শী শ্রীবিদ্যারূপে আরাধনা করবার বাসনা হলো শ্রীরামকৃষ্ণের। তখন ঠাকুরের ভাগিনেয় কালীমন্দিরের পূজারী। হৃদয়নাথ ও দক্ষিণেশ্বরের রাধাগোবিন্দের পূজারী দীনু ঠাকুর (ইনি জ্ঞাতিসম্পর্কে শ্রীমায়ের ভাসুরপুত্র, বাড়ি মুকুন্দপুর) গোপনে ঠাকুরের ঘরে পূজার সব বন্দোবস্ত করে দিলেন। সেই রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে ষোড়শী শ্রীবিদ্যারূপে সর্বপূজাউপচারে পূজা ও বন্দনা করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক-জীবনীকারগণ বলেন, 'মূর্তিমতী বিদ্যারূপিনী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীয় উপাসনাপূর্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হইল।' শ্রীমায়েরও দেবীমানবীত্বের পূর্ণ বিকাশের দ্বার অর্গলমুক্ত হলো। শ্রীমা ভাবরাজ্যে প্রবেশ করে ঠাকুরের সাধনলব্ধ সকল ফল গ্রহণ করলেন।

ষোড়শী পূজার প্রায় এক বছর পরে ১২৮০ সালে শ্রীমা দেশে ফিরে এলেন। এই সময়ে তাঁর শ্বশুরগৃহে এবং পিত্রালয়ে কয়েকটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। এই বছর ২৭শে অগ্রহায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণের অগ্রজ রামেশ্বরের মৃত্যু হয়। ১৪ই চৈত্র

শ্রীমায়ের পিতৃবিয়োগ হয়। মাতা শ্যামাসুন্দরী পতির মৃত্যুর পরে অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের নিয়ে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে পড়লেন। এমনকি ধান ভেনে তার পারিশ্রমিক দিয়েও তাঁকে কায়ক্লেশে সংসার চালাতে হতো। অবশ্য, পরে ছেলেরা আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে আশ্রয় পেলে তাঁর ক্লেশের কিছু লাঘব হয়। মাতার এই ক্লেশের কথঞ্চিৎ লাঘবান্তে শ্রীমা ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গেলেন।

এখানে এসে এবার শ্রীমায়ের স্বাস্থ্য মোটেই ভালো যাচ্ছিল না। অসুস্থ শরীর হলেও পতি ও শাশুড়ী-মাতার সেবা ছেড়ে তিনি অন্যত্র যেতে চাইলেন না। অবশ্য, তাঁর চিকিৎসাও চলল। অবশেষে একটু ভালো হয়ে ১২৮২ সালের আশ্বিন মাসে আবার পিত্রালয়ে গেলেন। কিন্তু জয়রামবাটীতে এসে তাঁর অসুখ এত বেড়ে গেল যে জীবন-সংশয় হয়ে উঠল। অবশেষে, অস্থিচর্মসার দেহ নিয়ে গাঁয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সিংহবাহিনীর স্থানে এক পূর্ণিমার রাত্রে তিনি হত্যা দিলেন। অসুখের জন্য শ্রীমায়ের চোখ দিয়ে তখন অনবরত জল পড়ে, চোখে ভালো দেখতে পান না। এদিকে পরদিনই বার-তের বছরের একটি মেয়ে শ্যামাসুন্দরীকে এসে হাতে কিছু ওষুধ দিয়ে বলল, 'মেয়েকে তুলে আন গে, এই ওষুধেই ভালো হয়ে যাবে!' সেই মেয়েই শ্রীমাকে এসে বলল, 'লাউফুল নুন দিয়ে রগড়ে চোখে রস দিও ফোঁটা ফোঁটা, ভালো হয়ে যাবে!'

আশ্চর্য! দৈব ওষুধে শ্রীমা একেবারে রোগমুক্ত হলেন। কিন্তু, আমাশয় থেকে এবার তাঁকে আবার ম্যালেরিয়া আক্রমণ করল। ওদিকে ১২৮২ সালের ১৬ই ফাল্গুন শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মদিনে ৮৫ বছর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের মাতৃবিয়োগ হলো। খবর পেয়েও অসুস্থতার জন্য মা সেখানে যেতে পারলেন না।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তৎকালে শ্যামাসুন্দরীর সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তবুও দেবদ্বিজে তাঁর ভক্তি অপরিসীম। এত কষ্টের ভিতরে তিনি কালীপূজার জন্য কিছু চাল সংগ্রহ করেন। নিজের পক্ষে পূজা করা সম্ভব নয় বলে তিনি গাঁয়ের নব মুখুজ্যের বাড়িতে পূজোর ভোগের জন্য সে চাল দিতে যান। গরীব বলে বা অন্য কোনও কারণবশতই হোক, শ্যামাসুন্দরী প্রত্যাখ্যাতা হন। বাড়িতে ফিরে প্রায় সারারাত্রি তিনি মর্মপীড়ায় কেঁদে কাটান। সেইরাত্রে স্বপ্নের মধ্যে এক দেবী তাঁকে দর্শন দিয়ে বলেন, 'আমি জগদম্বা, জগদ্ধাত্রীরূপে তোমার পূজো গ্রহণ করব।'

পরদিন সকালে কন্যাকে শ্যামাসুন্দরী সব বললেন। মাতা ও কন্যা মিলে পূজোর আয়োজন চলল। আশ্চর্য! কোন জিনিসেরই আর অভাব হলো না। শ্যামাসুন্দরীর বাড়িতে লোকজনের অভাব। তাই, শ্রীমাকেই পূজার সকল বাসনাদি মেজে দিতে হলো। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে খবর গেল। তিনি খুব খুশী হয়ে পূজার অনুমতি দিলেন। গাঁয়ের লোক এসে পূজো দেখে প্রসাদ নিয়ে গেল।

তারপর থেকে প্রতি বছরেই জয়রামবাটীতে জগদ্ধাত্রী পূজো হতে লাগল, এবং প্রতি বছর এই পূজার সময়ে শ্রীমা সেখানে এসে মায়ের সঙ্গে পূজার আয়োজনে যোগ দিতেন, এবং পূজার বাসনাদি মাজার কাজটি তিনি নিজেই করতেন।

১২৭৮ সালে ১লা শ্রাবণ রানী রাসমণির জামাতা মথুরনাথের মৃত্যুর পরে শ্রীশম্ভুনাথ মল্লিক শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের সেবার ভার গ্রহণ করেছিলেন। নহবতে অবস্থান করতে অসুবিধা হয় বলে শম্ভুনাথ কালীমন্দিরের কাছেই শ্রীমায়ের জন্য একখানি চালাঘর তৈরি করে দেন। ১৮৭৬ সনের মার্চ মাসে যখন তৃতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসেন তখন সেই ঘরেই শ্রীমা বাস করেন। কিন্তু ঐ চালাঘরে সর্বদিন তাঁর থাকা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন কঠিন আমাশয় রোগে ভুগছিলেন। এই চালাঘর ঠাকুরের বাসস্থান থেকে বেশ দূরে। তাই তাঁকে সেবা করবার জন্য শ্রীমাকে প্রায়ই নহবতে এসে থাকতে হতো। ঠাকুর একটু সুস্থ হলে পুনরায় শ্রীমা জয়রামবাটী ফিরে যান।

১২৮৭ সালে শ্রীমায়ের চতুর্থবার দক্ষিণেশ্বরে আগমনটি একটি দুঃখজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িত। সেবার মাতা শ্যামাসুন্দরী ও লক্ষ্মীকে নিয়ে শ্রীমা পথে তারকেশ্বরে মানত-পূজা দিয়ে, কলকাতায় অনুজ প্রসন্নর বাসায় উঠে পরে দক্ষিণেশ্বরে এলে হৃদয়নাথ কি ভেবে বলল, 'কেন এসেছ ? কিজন্যে এসেছ ? এখানে কি ?' এইপ্রকার অশ্রদ্ধার কথা শুনে শ্যামাসুন্দরী সেইদিনই সেখান থেকে জয়রামবাটীতে ফিরে যান। হৃদয়নাথকে সে সময়ে ঠাকুর একটু ভয়ই করতেন। অসুস্থ ঠাকুরের সেবা যত্নের ভার হৃদয়ের উপরই ছিল। সে না হলে ঠাকুরের চলত না। তাই তিনিও কোন প্রতিবাদ করলেন না। শ্রীমা মর্মান্তিক বেদনা নিয়ে ফিরে গেলেন, কিন্তু স্বামীর উপরে কোন অভিমান, অথবা ভাগিনেয়কেও কোন অভিযোগ করলেন না। শুধু মনে মনে নিবেদন করলেন, 'মা, যদি কোনদিন আনাও তো আসব।'

শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনমার্গে সিদ্ধিলাভের অনুগামী হয়ে পূজা-পাট ত্যাগ করেন। তখন দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের পূজারী হলেন হৃদয়নাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি ঠাকুরের পিসীমা রামশীলা দেবীর কন্যা হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র। সাধকজীবনে ঠাকুরকে দেখাশুনোর ভার রাসমণি-জামাতা মথুরানাথ হৃদয়নাথের উপরেই দিয়েছিলেন। সেই থেকে হৃদয়নাথ শ্রীরামকৃষ্ণের সাংসারিক জীবনের উপরে বেশ খানিকটা আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু শ্রীমায়ের এই অমর্যাদার ফল একদিন তাঁকে ভোগ করতে হলো। দুর্গাপূজার নবমী দিনে কুমারী-পূজার প্রচলন এখনও অনেক জায়গায় বর্তমান। এই কুমারী পূজা বৎসরের অন্যান্য শুভদিনেও অনুষ্ঠিত হতো। সেবার মথুরানাথের পুত্র ত্রৈলোক্যনাথের কন্যাকে কুমারীরূপে পূজা করবার অপরাধে হৃদয়নাথ ১২৮৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির পূজারীর পদ হতে অপসারিত হয়ে নিজগ্রাম শিহড়ে ফিরে যান।

হৃদয়নাথের পরে ঠাকুরের অগ্রজ রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র রামলাল কালীমন্দিরের পূজারী হলেন। ঐ পদে আসীন হয়ে রামলাল ঠাকুরের তেমন দেখাশোনা করতেন না। এই সময়ে তাঁর খুব ঘন ঘন সমাধি হতো। তাঁকে দেখাশোনা করবার লোক মোটেই ছিল না। তাই তিনি কামারপুকুরের লক্ষণ পাইনকে দিয়ে শ্রীমাকে আসবার জন্য খবর পাঠালেন। এইরূপ আহ্বান পেয়ে অবশেষে ১২৮৮ সালের মাঘ-ফাল্গুন মাসে শ্রীমা পঞ্চমবার দক্ষিণেশ্বরে এলেন। এখানে কয়েকমাস কাটাবার পরে

পিত্রালয়ে ফিরে গিয়ে সাত-আট মাস কাটিয়ে আবার তিনি ১২৯০ সালের মাঘ মাসে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসেন।

এই সময়ে ভাবসমাধির ঘোরে পড়ে গিয়ে বাঁ হাতের হাড় স্থানচ্যুত হওয়ায় ঠাকুর খুব কষ্ট পেতে থাকেন। শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলে যখন জানতে পারেন যে তিনি বৃহস্পতিবারের বারবেলায় বাড়ি হতে যাত্রা করেছিলেন, তখন ঠাকুর বললেন, 'এই তুমি বৃহস্পতিবারের বারবেলায় রওনা হয়েছ বলে আমার হাত ভেঙেছে। যাও, যাও, যাত্রা বদলে এস গে।' পরদিনই শ্রীমা যাত্রা বদল করতে দেশে চলে গেলেন। পরবর্তী বছর ১২৯১ সালের ফাল্গুন মাসে শেষবারের মত শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ১২৯৩ সালে দেহলীলা অবসান পর্যন্ত সেখানেই বা অন্যত্র স্বামীর সাহচর্যে অবস্থান করেন। অবশ্য, এ ছাড়াও হয়তো শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। কিন্তু তাঁর সেই আগমনের সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না।

এই তারিখবিহীন যাতায়াতের মধ্যে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল যা এখানে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। শ্রীমা যখন কামারপুকুর বা জয়রামবাটী হতে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন তখন সাধারণত পায়ে হেঁটেই যেতেন। সেবারে কোনও পর্ব উপলক্ষে কয়েকজন পল্লীরমণীসহ শ্রীমা গঙ্গাস্নানার্থে পদব্রজে জয়রামবাটী থেকে যাত্রা করলেন। দুপুরের পরেই দলটি আট মাইল দূরে আরামবাগে পৌঁছে যায়। বেলা আছে দেখে দলটি তখনই তারকেশ্বরের পথে যাত্রা করে। আরামবাগ ও তারকেশ্বরের মধ্যে বিরাট তেলো-ভেলোর মাঠ। এই মাঠ তখন কুখ্যাত ডাকাতদলের দ্বারা অধিকৃত। দিনের বেলাও দলবেঁধে ছাড়া লুণ্ঠনের ভয়ে কোনো যাত্রীদলই ঐ বিশাল প্রান্তর অতিক্রম করতে সাহস করত না। দীর্ঘপথ সারাদিন হেঁটে শ্রীমা সেই ভয়াল মাঠের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েন। তখন সন্ধ্যা নামে নামে। যাত্রীদল তাঁর জন্য কয়েকবার অপেক্ষা করে এগিয়ে যায়। ক্রমে সন্ধ্যা নামল। শ্রীমা ধীরপদে এগিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণের এক বলিষ্ঠ পুরুষ লম্বা লাঠি হাতে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। শ্রীমায়ের বুঝতে বাকি রইল না যে, আগন্তুক তেলো-ভেলোর কুখ্যাত ডাকাতদের একজন। ডাকাত কাছে এসে কর্কশকণ্ঠে পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে শ্রীমা উত্তর দিলেন, 'বাবা, আমার সংগীরা আমাকে ফেলে গেছে, আমি বোধহয় পথ ভুলেছি···তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির কালী-বাড়িতে থাকেন, আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি। তুমি যদি সেখান পর্যন্ত আমায় নিয়ে যাও তাহলে তিনি তোমায় খুব আদর-যত্ন করবেন।' ডাকাতের কি জানি কি হলো, বলল, 'ভয় নেই, আমার সংগে মেয়েলোক আছে, সে পেছিয়ে পড়েছে।' কিছুক্ষণ পরে ডাকাতের স্ত্রী এসে পড়ে সব শুনে শ্রীমাকে মেয়ের মতো আদর-যত্ন করে কাছের এক গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে এক দোকানে সেই রাত্রির মতো থাকবার ও মুড়ি-মুড়কি দিয়ে জলযোগ করবার বন্দোবস্ত করে নিজেরাও সেখানে থেকে গেল। পরদিন ডাকাত দম্পতি শ্রীমাকে নিয়ে সকালবেলাতেই তারকেশ্বরে পেঁছায়। সেখানে বাবা তারকনাথের পুজা দিয়ে সেই ডাকাত দম্পতি কন্যাসম শ্রীমায়ের আহারের বন্দোবস্ত করে। সেই সময়ে দলের সংগীদেরও শ্রীমায়ের সংগে দেখা হয়ে

যায়। তাঁর কাছ থেকে গতরাত্রের ঘটনা শুনে এবং ডাকাত দম্পতিকে দেখে দলের সকলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। যাই হোক, আনন্দ করে সকলে আহারান্তে আবার দক্ষিণেশ্বরের পথে যাত্রা শুরু করে। বিদায়কালে শ্রীমা ও ডাকাত দম্পতির চোখে স্নেহের অশ্রুধারা! কাঁদতে কাঁদতে ডাকাতের স্ত্রী বাগদী-রমণী ক্ষেত থেকে তুলে আনা কিছু কড়াইশুঁটি শ্রীমায়ের আঁচলে বেঁধে দিতে দিতে বলল, 'মা সারদা, রাত্রে যখন মুড়ি খাবি, তখন এইগুলি দিয়ে খাস।'

১৮৮৫ সনের জুন মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের কর্কটরোগের লক্ষণ দেখা দেয়। ভক্তদের অনুরোধে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় এসে সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসাধীনে কিছুকাল রইলেন। তখন কলকাতার শ্যামবাজারে ৫৫ নম্বর, শ্যামাপুকুর স্ট্রীটে ঠাকুরের জন্য একটি বাসা ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। শ্রীমা উদ্বিগ্ন চিত্তে দক্ষিণেশ্বরেই রয়ে গেলেন। তাঁর মনে পড়ল ঠাকুরের ভবিষ্যৎ-বাণী: 'যখন যার-তার হাতে খাব, কলকাতায় রাত কাটাব, আর খাবারের অগ্রভাগ কাউকে দিয়ে বাকিটা নিজে খাব, তখন জানবে দেহরক্ষা করবার বেশী দেরি নেই।' শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে আর একটি লক্ষণের কথাও বলেছিলেন: 'যখন দেখবে অধিক লোকে একে (রামকৃষ্ণকে) দেবজ্ঞানে মানবে, শ্রদ্ধাভক্তি করবে, তখন জানবে এর অন্তর্ধানের সময় হয়ে এসেছে।'

ঠাকুরের কণ্ঠনালী আক্রান্ত হবার কিছুকাল পূর্ব হতে বাস্তবিকই তাঁর ব্যবহারিক জীবনে এইরকম ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল। যাই হোক, শ্যামাপুকুর স্ট্রীটের বাড়িতে শ্রীমায়ের মতো লজ্জাশীলা রমণীর বসবাস করবার অসুবিধা সত্ত্বেও ঠাকুরের ইচ্ছার খবর পেয়েই তিনি দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে এলেন তাঁর সেবার জন্য।

শ্যামাপুকুরে প্রায় আড়াই মাস চিকিৎসার পরেও শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখ বরং বেড়ে গেল। ডাক্তারের পরামর্শে ভক্তগণ তখন কলকাতার উত্তরপ্রান্তে কাশীপুরে গোপালচন্দ্র ঘোষের বাগানবাড়িতে (বর্তমানে ৯০ নম্বর কাশীপুর রোড) নিয়ে যায়। ভক্তদের সঙ্গে শ্রীমা-ও সেখানে ঠাকুরকে সেবার জন্য যান। শ্যামাপুকুর ও কাশীপুরে গোলাপ-মা ভক্তদের জন্য রান্নাদির কাজ করতেন বলে শ্রীমা ঠাকুরের সেবায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিলেন। এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অগ্রজ রামেশ্বরের কন্যা লক্ষ্মীমণি দেবী শ্রীমায়ের সঙ্গিনীরূপে নানাভাবে সাহায্য করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপরের একটি ঘরে থাকবার বন্দোবস্ত হয়েছিল। উপরে উঠবার কাঠের সিঁড়িগুলি বেশ উঁচু বলে শ্রীমায়ের উপরতলায় যেতে একটু অসুবিধা হতো। একদিন ঠাকুরের জন্য বাটিভর্তি দুধ নিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠবার সময়ে পা হড়কে শ্রীমা নিচে পড়ে যান, এবং তাঁর গোড়ালির হাড় স্থানচ্যুত হয়ে চলনশক্তি-হীন হয়ে পড়েন। শ্রীরামকৃষ্ণ মহাচিন্তিত হয়ে ভক্ত বাবুরামকে বলেন, 'তাই তো, বাবুরাম, এখন কি হবে? খাওয়ার উপায় কি হবে? কে আমায় খাওয়াবে?' এই থেকেই বোঝা যায়, নরলীলার শেষ অধ্যায়ে ঠাকুর শ্রীমায়ের উপরে কতটা নির্ভরশীল ছিলেন।

শ্রীমাকে ষোড়শী বিদ্যারূপে পূজা করে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর যোগসাধনার সর্বফল তাঁকে অর্পণ করেছিলেন। তার বোধহয় আর একটি হেতুও ছিল। লীলাসম্বরণের

পূর্বে বিবেকানন্দকে যেমন তিনি তাঁর শক্তি দান করে কর্মযোগে দীক্ষা দিয়ে গেলেন, তেমনি সাধনার ধন অর্পণ করে মাকে দীক্ষা দিলেন ভক্তিযোগে। একবার ঠাকুর মায়ের জিহ্বায় দীক্ষামন্ত্রও লিখে দিয়েছেন। পরবর্তীকালে স্বীয় সাধনার দ্বারা উজ্জীবিত ও অনন্তশক্তিপূর্ণ বহু মন্ত্র শ্রীমাকে শিখিয়ে দিয়ে, এবং সেই মন্ত্র কিরূপ অধিকারীকে কিভাবে প্রদান করতে হবে সেই সাধন পথও তাঁকে জ্ঞাত করেছিলেন। শ্রীমায়ের আধারটি যখন ক্রমে ক্রমে সাধনার আধার হয়ে উঠল তখন ঠাকুর মাঝে মাঝে বলতেন, 'ও (শ্রীমা) সারদা-সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে ·· এ জ্ঞানদায়িনী, মহা বুদ্ধিমতী। ও কি যে সে ! ও আমার শক্তি !' অপ্রকট হবার পূর্বেই শ্রীমাকে ভক্তিমার্গের প্রারব্ধ কাজের আধিকারিক রূপে তিনি তৈরি করে দিয়ে গেলেন। সেই ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণিত হবার জন্যই বোধহয় কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠরোগকে অবলম্বন করে ভাবী শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ গঠিত হতে লাগল, এবং তার কেন্দ্রস্থলে অধিষ্ঠাত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত রইলেন শ্রীশ্রীমা সারদামণি।

শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখের অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যেতে লাগল। বাবা তারকনাথের কাছে হত্যা দেবার জন্য শ্রীমা তারকেশ্বরে গেলেন। ঠাকুর বাধা দিলেন না। দুদিন নিরম্বু উপবাসে কাটিয়েও কিছু হলো না। রাত্রে কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। শ্রীমা জেগে উঠবার পরে সহসা তার মনে হলো, 'এ জগতে কে কার স্বামী ? এ সংসারে কে কার ? কার জন্য আমি এখানে প্রাণহত্যা করতে বসেছি ?'

হঠাৎ ঐ বৈরাগ্যভাব শ্রীমার মনে উদয় হয়ে জাগতিক নিয়মে স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে সংকল্পচ্যুত করে ফিরিয়ে আনল কাশীপুরে। ঠাকুর অন্তর্যামী ! শ্রীমায়ের কাছে সব শুনে তিনি রহস্য করে বললেন, 'কি গো, কিছু হল ?—কিছুই না !'

এদিকে ঠাকুরের তিরোধানকাল অপ্রতিহত বেগে এগিয়ে আসছে। ১২৯৩ সনের শ্রাবণ মাস প্রায় শেষ হয়ে এলো। ৩১শে শ্রাবণ শীর্ণ দেহ নিয়ে বিছানায় কোনওপ্রকারে বালিশে ভর দিয়ে ঠাকুর এলিয়ে আছেন। আশার আলো নির্বাপিত-প্রায়, চারিদিকে স্তব্ধ গভীর বিষাদের ছায়া। সকলেই জানে, ঠাকুরের বাক্‌শক্তি রুদ্ধ। কিন্তু শ্রীমা ও লক্ষ্মীমণি ঘরে আসতেই তিনি বললেন, 'এসেছ ? দেখ, আমি যেন কোথায় যাচ্ছি—জলের ভেতর দিয়ে, অনেকদূর।...তোমাদের ভাবনা কি ? যেমন ছিলে তেমনি থাকবে। আর এরা (নরেন্দ্র প্রমুখ) আমার যেমন করেছে, তোমারও তেমনি করবে। লক্ষ্মীটিকে দেখো, কাছে রেখো।'

সেই মহানিশায় একটা বেজে দুই মিনিটে শয্যাপার্শ্বের সমবেত ভক্তগণ ঠাকুরকে দেখলেন সমাধিমগ্ন ! কিন্তু সে সমাধি আর ভাঙল না, মহানির্বাণে পরিণত হলো।

পরদিন যথারীতি ঠাকুরের শেষকৃত্য সমাপ্ত হলো কাশীপুর শ্মশানে। চিতাভস্ম এনে রাখা হলো কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে, শ্রীরামকৃষ্ণের শয্যায়।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় শ্রীমা দেহ থেকে একে একে অলংকার মোচন করতে লাগলেন। পরিশেষে যখন হাত থেকে শেষ সোনার বালাজোড়াও খুলতে যাচ্ছেন

তখন অকস্মাৎ যেন ঠাকুর আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বললেন, 'আমি কি মরেছি যে, তুমি এয়োস্ত্রীর জিনিস হাত থেকে খুলে ফেলবে ?'

শ্রীমা আর বালা খুললেন না। পরণের শাড়ির লাল পাড় ছিঁড়ে সরু করে নিলেন। তদবধি শ্রীমা লালপাড় শাড়িই পরতেন।

ঠাকুরের পূতাস্থি কোথায় রাখা হবে এ নিয়ে প্রথমে ভক্তদের মধ্যে কিছু মতভেদ দেখা গেল। অর্থাভাবে কাশীপুরের উদ্যানবাটী ভাড়া করে রাখা আর সম্ভব নয়। শ্রীমা কোথায় থাকবেন তা নিয়েও অনেকেই চিন্তিত হলেন। তিনিও কাশীপুর ত্যাগের জন্যই প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। ভক্তপ্রবর বলরাম বসুর সাদর আহ্বানে ৬ই ভাদ্র বিকালে শ্রীমা তাঁর বাগবাজার গৃহে গমন করেন। ভক্তগণ ঠাকুরের রক্ষিত পূতাস্থি ও চিতাভস্মের অধিকাংশই একটি পাত্রে রক্ষা করে বলরামবাবুর গৃহে পাঠিয়ে দেন নিত্য-পূজাদির জন্য। পরবর্তীকালে ভক্তগণ দ্বারা রক্ষিত ঠাকুরের পূতাস্থি ও চিতাভস্মের অন্য অংশ একটি তামার কলসে রক্ষা করে রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কাঁকুড়গাছিস্থ 'যোগোদ্যানে' (বর্তমানে রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলকাতা) ১৮৮৬ সনের ২৩শে আগষ্ট, জন্মাষ্টমীর দিনে সমাহিত করা হয়।

তিরোধানের পর শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যলীলার স্থানে ক্রমান্বয়ে বাস করলে শ্রীমায়ের বিচ্ছেদবেদনা আরও প্রকট হবে, এই ভেবে ভক্তগণ তাঁকে বৃন্দাবনধাম দর্শনার্থে পাঠাবেন বলে ঠিক হলো। শ্রীমাও রাজী হলেন। সেইমত ১৫ই ভাদ্র শ্রীমা বৃন্দাবন যাত্রা করলেন। সংগী হলো গোলাপ-মা, লক্ষ্মীমণি দেবী, মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রী, যোগীন মহারাজ, কালী মহারাজ এবং লাটু মহারাজ। বৃন্দাবনের পথে বৈদ্যনাথধাম, কাশীধাম এবং শ্রীরামচন্দ্রের লীলাভূমি অযোধ্যা দর্শন করে ভাদ্রমাসের শেষে বৃন্দাবনে বলরাম বাবুদের যমুনা পুলিনের ঠাকুরবাড়িতে শ্রীমা পেঁছিলেন।

বৃন্দাবনে শ্রীমা প্রায় এক বছর বাস করবার পরে তাঁর মনে-প্রাণে অনেকটা শান্তি ফিরে আসে। তিনি এই সময়ে সদলবলে একবার বৃন্দাবন পরিক্রমাও করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একাধিকবার শ্রীমাকে নানারূপে দর্শন দিলেন। একবার স্বপ্নে তাঁকে আদেশ করলেন, যোগীন মহারাজকে (স্বামী যোগানন্দ) মন্ত্রদীক্ষা দেবার জন্য, এবং কি মন্ত্র দেবেন তাও বলে দিলেন। শ্রীমা এর আগে কখনও কাউকে মন্ত্রশিষ্য করেননি, তাই দ্বিধা বোধ করলেন। কিন্তু আরও দুদিন একই দৈব আদেশ পাবার পরে তিনি যথারীতি যোগীন মহারাজকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন। তিনিই শ্রীমায়ের প্রথম মন্ত্রশিষ্য।

কলকাতা ফিরবার পথে যোগীন মহারাজ, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, ও লক্ষ্মীদিদি সহ শ্রীমা হরিদ্বারে আসেন। তীর্থজলে বিসর্জনের জন্য শ্রীমা ঠাকুরের কেশ ও নখ সংগে এনেছিলেন। তার কিয়দংশ ব্রহ্মকুণ্ডে বিসর্জন দিলেন। এইবারে নীলগংগার অপর পারে চণ্ডী পাহাড়ে আরোহণ করে দেবী দর্শন করেন।

সেখান থেকে তিনি সদলবলে জয়পুরে গমন করেন। গোবিন্দজীকে দর্শনান্তে শ্রীমা আজমীরে পুষ্করতীর্থে গমন করেন। সেখানে সাবিত্রী পাহাড়ে আরোহণ করে দেবী দর্শন করেন।

তারপর এলেন প্রয়াগে। সেখানে গংগা-যমুনার সংগমস্থলে শ্রীমা ঠাকুরের অবশিষ্ট কেশ বিসর্জন দেন।

এইভাবে নানা তীর্থ পরিক্রমা করে বৎসরান্তে শ্রীমা কলকাতায় বলরামবাবুর বাড়িতে ফিরে এলেন।

কিছুদিন কলকাতা থাকবার পরে ১২৯৪ সালের ভাদ্রমাসে স্বামী যোগানন্দ, গোলাপ-মা প্রভৃতি শ্রীমাকে স্বামীর ভিটা কামারপুকুরে পৌঁছে দিয়ে আসেন। রামেশ্বরের পুত্র রামলাল তখন দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির পূজারী। ঠাকুরের নির্দেশ মতো শ্রীমায়ের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাঁর নেবার কথা। কিন্তু তা তো তিনি করলেনই না, বরং রানী রাসমণির দৌহিত্র ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস শ্রীমায়ের জন্য যে পাঁচ-সাতটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন তাও কালীবাড়ির খাজাঞ্চিকে বলে বন্ধ করে দিলেন। তার অজুহাত, শ্রীমা ঠাকুরের ভক্তদের কাছ থেকে অনেক টাকা পান, অতএব তাঁর আর টাকার প্রয়োজন নেই। ভক্তরা ঠিক করেছিলেন যে গুরু-পত্নীকে তাঁরা মাসিক দশ টাকা করে দেবেন ; কিন্তু কার্যত তাও হলো না। লক্ষ্মী দেবীও এবার শ্রীমায়ের সংগে কামারপুকুরে না গিয়ে ভ্রাতাদের কাছেই কলকাতায় বা দক্ষিণেশ্বরে রয়ে গেলেন। অতএব কামারপুকুরে আত্মীয়-স্বজনহীন ও অর্থ-সামর্থ্যহীন অবস্থায় শ্রীমায়ের অতি দুঃখপূর্ণ জীবন শুরু হলো। শ্রীমায়ের এমন নিঃসম্বল অবস্থা হলো যে, দুটি ভাত সিদ্ধ হলেও লবণ জোটে না। তবুও শ্রীমা কারো কাছে কোনও প্রকার আর্থিক সাহায্যের জন্য হাত পাতলেন না।

আরো একটি ঘটনা শ্রীমাকে ব্যথিত করল। চিরসীমন্তিনী শ্রীমায়ের বসনভূষণে বৈধব্যের চিহ্ন নেই দেখে সমালোচনায় পল্লী ক্রমশই মুখরিত হয়ে উঠল। শ্রীমা হাতের বালা খুলে রাখলেন এবং সরু লালপেড়ে শাড়িও ত্যাগ করলেন। ঠাকুর অলক্ষ্যে তাঁকে বললেন, 'তুমি হাতের বালা ফেলো না। বৈষ্ণবতন্ত্র জান তো ?... আজ বৈকালে গৌরমণি আসবে, তার কাছে শুনবে।'

সেদিন বিকেলেই হঠাৎ গৌরীমা এলেন। ঠাকুরের আদেশের কথা শুনে তিনি শ্রীমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, চিন্ময় যাঁর স্বামী, তাঁর বৈধব্য অসম্ভব। তিনি জগৎলক্ষ্মীরূপা, তিনি ভূষণ ত্যাগ করলে জগৎ শ্রীহীন হয়ে যাবে।

গৌরীমায়ের কথা শুনে শ্রীমায়ের মন থেকে লোকনিন্দার ভয় তিরোহিত হলো এবং তিনি পুনরায় বালা ও সরু লালপেড়ে শাড়ি গ্রহণ করলেন। গাঁয়ের ধর্মদাস লাহার ধর্মশীলা কন্যা প্রসন্নময়ী শ্রীমায়ের দিকে সদাই লক্ষ্য রাখতেন। তিনি গ্রামবাসীদের বললেন, ঠাকুর ও শ্রীমা দেবাংশী। ওঁদের কথা আলাদা। তখন পল্লীবাসীদের সমালোচনা শীঘ্রই দৈববিধানে থেমে গেল।

কিন্তু ইতিমধ্যে আরেকটি পারিবারিক বিপর্যয় ঘটল। দক্ষিণেশ্বর হতে রামলাল পরিবারবর্গসহ একবার কামারপুকুরে এলেন। শ্রীমায়ের অবস্থা শুনে তাঁর দুরবস্থাগ্রস্থ দুঃখিনী মাতা শ্যামাসুন্দরী তাঁকে নিজের কাছে এনে রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু মাতার অবস্থার কথা ভেবেই হয়তো শ্রীমা রাজী হননি। বোধহয় জগদ্ধাত্রী পূজার সময়ে শ্রীমা জয়রামবাটীতে শ্যামাসুন্দরীর কাছে গেলেন। পূজান্তে কামারপুকুরে ফিরে এসে দেখলেন, রামলাল সামান্য ভিটে-বাড়ির অংশ

ভাগ করে দিয়ে সপরিবারে দক্ষিণেশ্বরে চলে গেছেন। ঠাকুরের ঘরখানি মাত্র তাঁর ভাগে পড়েছে। তিনি নিতান্ত বিপর্যয়ের ,ভিতরেও ছিন্নবস্ত্রে ভিখারিণীর বেশে স্বামীর ভিটা আগলাতে লাগলেন।

১২৯৪ সালের শেষের দিকে বলরাম বসু মহাশয়ের গৃহিণী কৃষ্ণভাবিনী ও শ্বশ্রূ মাতঙ্গিনী দেবী সহ ঠাকুরের বাল্য-লীলাভূমি কামারপুকুর দর্শনের অভিপ্রায়ে শ্রীমায়ের কাছে এলেন। এসে গৃহদেবতার ভোগের জন্য শ্রীমায়ের হাতে প্রচুর অর্থ দিলেন। তিনিও তিনদিন যথাসাধ্য ভক্তসেবা করলেন। তারপর তাঁদের জয়রামবাটী নিয়ে গেলেন। সেখানেও তিনরাত্রি বাসের পর কৃষ্ণভাবিনী দেবী কলকাতায় ফিরলেন। নিজের দুরবস্থা ভক্তদের দৃষ্টি থেকে এড়াবার চেষ্টার ত্রুটি শ্রীমা করেননি। কিন্তু ভক্তিমতী কৃষ্ণভাবিনী সকলই বুঝলেন এবং কলকাতায় ফিরে গিয়ে ভক্তদের মধ্যে শ্রীমায়ের অবস্থার বর্ণনা করলেন।

যাই হোক, ১২৯৫ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে, অর্থাৎ প্রায় নয় মাস কামার-পুকুরে বাসের পরে ভক্তগণ শ্রীমাকে কলিকাতায় নিয়ে আসেন এবং বলরামবাবুর গৃহে থাকবার বন্দোবস্ত করে দেন। এই সময়ে প্রায় বৎসরকাল তিনি কলকাতায় বাস করে ১৮৮৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে পুনরায় কামারপুকুরে ফিরে গিয়ে দীর্ঘকাল সেখানে বাস করেন। অবশ্য এই সময়ে শ্রীমায়ের আর্থিক অবস্থার সমধিক উন্নতি হয়। তাঁর অবস্থা জানতে পেরে ভক্তগণ অর্থাদির বন্দোবস্ত করেন। ঠাকুরের দেবোত্তর জমি হতেও যে ধানের অংশ আসতে লাগল তাতে শ্রীমায়ের পক্ষে যথেষ্ট হয়েও উদ্বৃত্ত থাকত। এই সময় কলকাতার সন্তানগণের কাছ থেকেও শ্রীমায়ের কাছে বারে বারে আহ্বান আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ভক্ত ও সন্তান-গণের আহ্বান উপেক্ষা করতে না পেরে তিনি কামারপুকুর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন।

কলকাতায় এসে প্রথমে শ্রীমা বলরামবাবুর গৃহেই উঠলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ভক্তগণ বেলুড়ে ভাড়াটে বাড়ি ঠিক করে তাঁকে বসবাসের বন্দোবস্ত করে দিলেন। সেখানে যোগীন-মা ও গোলাপ-মা তাঁর সংগী হলেন। ত্যাগী ভক্তেরাও শ্রীমায়ের সেবায় নিযুক্ত রইলেন। এই সময়ে অনুকূল অবস্থার মধ্যে এসে শ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক জীবন ক্রমশ প্রকট হতে লাগল। পূর্বেও অবশ্য তিনি বহুবারই সমাধিস্থ হয়েছেন ; এখন যেন ধ্যানে বসলেই তাঁর সমাধি হতো। এক সন্ধ্যায় শ্রীমা বেলুড়ের বাড়ির ছাদে বসে ধ্যানে মগ্ন হলেন। সহচরী দুজনও তাঁর পাশে বসেই ধ্যান করছিলেন। যোগীন-মার ধ্যান ভাঙবার পরে তিনি দেখেন শ্রীমা তখনও স্পন্দনহীন, সমাধিস্থ। বহুক্ষণ পরে যখন ক্রমশ তিনি বাহ্যদশায় ফিরে এলেন তখন বললেন, 'ও যোগেন, আমার হাত কই, পা কই ?' সহচরীদ্বয় তাঁর হাত-পা টিপে বললেন, 'এই যে পা, এই যে হাত।' তবুও সেদিন সমাধিজগত হতে ফিরে দেহবোধ আসতে শ্রীমার বহু সময় লেগেছিল।

১২৯৫ সালের কার্তিক মাসের শেষের দিকে শ্রীমা নীলাচল শ্রীক্ষেত্রের পথে যাত্রা করেন। এবারে সংগী হলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, সারদানন্দ, যোগীন-মা এবং তাঁর জননী, গোলাপ-মা ও লক্ষ্মীদেবী। তখনও পুরীধামে যাবার রেল-

লাইন হয়নি। তাই প্রথমে কলকাতা হতে জাহাজে চাঁদবালিতে পেঁছিলেন সকলে ১৮৮৮ সনের সাতই নভেম্বর। সেখান থেকে ছোট লঞ্চে গেলেন কটক পর্যন্ত। সেখান থেকে গো-যানে জগন্নাথ ক্ষেত্রে।

পুরীধামে পেঁছে সেইদিনই শ্রীমা জগন্নাথ দর্শন করলেন, কারণ, পরদিন অকাল পড়ে যাবে। শ্রীমা এবং যাত্রীদলের মহিলাদের থাকবার বন্দোবস্ত হলো বলরাম বাবুদের 'ক্ষেত্রবাসী মঠে'। অন্যান্য ভক্তদের বাসস্থান অন্যত্র নির্দিষ্ট হলো। জগন্নাথ ক্ষেত্রে দুই মাসাধিক অবস্থানের পর শ্রীমা ২৯শে পৌষ (১২ই জানুয়ারি, ১৮৮৯) কলকাতায় ফিরে এবার অন্য একটি ভক্তের বাড়িতে উঠলেন। পরদিন নিমতলাঘাটে গংগাস্নান করলেন। ২২শে জানুয়ারি কালীঘাটে মা কালীকে দর্শন করলেন। এরপর ৫ই ফেব্রুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ, সারদানন্দ, যোগানন্দ, প্রেমানন্দ, মাষ্টার মহাশয়, সান্যাল মহাশয় প্রভৃতির সংগে স্বামী প্রেমানন্দের জন্মভূমি আঁটপুরে গমন করেন। সেখানে সপ্তাহখানেক থাকবার পরে মাষ্টার মহাশয় এবং আরও অনেকের সংগে তারকেশ্বর হয়ে গো-যানে তিনি কামারপুকুরে গমন করেন।

এইবারে পূর্বের ন্যায় দীর্ঘকাল কামারপুকুরে বসবাস করে ১৮৯০ সনের ৪ঠা মার্চ কলকাতায় এসে কম্বুলিয়াটোলার মাষ্টার মহাশয়ের বাড়িতে অবস্থান করেন। সেখান থেকে ২৫শে মার্চ বৃদ্ধ স্বামী অদ্বৈতানন্দজীর সংগে গয়াধামে যাত্রা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ মত শ্রীমা ঠাকুরের জননীর উদ্দেশে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান করেন। তীর্থ শেষ করে ২রা এপ্রিল কলকাতায় ফিরে আবার তিনি মাষ্টার মহাশয়ের বাড়িতে অবস্থান করেন। তখন বলরামবাবুর শেষ অসুখ। তাই শ্রীমা তাঁর বাটীতে আগমন করেন। ১২৯৭ সালের ১লা বৈশাখ বলরামবাবু দেহত্যাগ করেন।

এই বছর জৈষ্ঠ মাসে বেলুড়ের কাছে ঘুষুড়িতে একটি বাড়ি ভাড়া করে শ্রীমাকে এনে রাখা হয়। বিদেশে যাবার পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ এই বাড়িতে এসেই মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যান। তারপর ১৩০০ সাল পর্যন্ত শ্রীমা কখনো কলকাতায়, কখনো কামারপুকুর বা জয়রামবাটীতে থেকেছেন। দীর্ঘকাল দেশে কাটাবার পরে আষাঢ় মাসে বেলুড়ে গংগাতীরে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে শ্রীমায়ের বাসস্থান ঠিক হলো। এখানে তাঁর অন্যতম সেবক রূপে থাকতেন সারদা মহারাজ (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ)।

ঠাকুরের অপ্রকট হবার পরে বৃন্দাবনের পথে শ্রীমা যখন কাশীধামে তীর্থে গিয়েছিলেন তখন তাঁর মানসিক অবস্থা দেখে এক নেপালী সন্ন্যাসিনী তাঁকে পঞ্চতপাব্রত পালন করতে বলেছিলেন। অবশ্য, এই ব্রত পালনের জন্য তিনি দৈব নির্দেশও পেয়েছিলেন। অবশেষে বেলুড়ে অবস্থানকালে সেই সুযোগ এলো। শ্রীমা এই ব্রত পালন করবেন জেনে যোগীন-মাও সে ব্রত পালন করতে মনস্থ করলেন। ভক্তগণ একতলার ছাদে মাটি ফেলে চারদিকে পাঁচ হাত অন্তর চারটি অগ্নিকুণ্ড জ্বাললেন। মাথার উপরে অগ্নিবর্ষী মার্তণ্ডদেব। শ্রীমা ও যোগীন-মা প্রাতে গংগাস্নান করে সেই চারিটি অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে গিয়ে প্রতিদিন

সূর্যোদয়ে বসতেন এবং সূর্যাস্তে বেরিয়ে আসতেন। এইরূপে সাতদিন পাঁচটি অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে বসে তপস্যা করে শ্রীমা উত্তীর্ণ হলেন। শরীর ঝল্সে অঙ্গারবর্ণ হলো। তখন ঠাকুরের বিরহজনিত শ্রীমায়ের মনের জ্বালা যেন অনেকটা প্রশমিত হলো।

১৩০৩ সালের গোড়ার দিক পর্যন্ত শ্রীমা ভক্তদের আমন্ত্রণে কখনো কলকাতায় এলেন কখনো বা পুনরায় তীর্থ ভ্রমণে গেলেন। ঐ বছর বলরাম বসু মহাশয়ের পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে শ্রীমা কলকাতায় এসে রামকান্ত বসু স্ট্রীটে শরৎ সরকার মশায়ের বাড়িতে মাসাধিককাল থাকেন। সেখানে একদিন মঠের সকলের উদ্দেশে লিখিত স্বামী বিবেকানন্দের একখানি পত্র শ্রীমাকে পড়ে শোনান হয়। পত্রে স্বামিজী সকলকে নরনারায়ণের সেবার্থে উদাত্ত আহ্বান জানান। পত্রের বার্তা শুনে শ্রীমা বললেন, 'নরেন হল ঠাকুরের হাতের যন্ত্র। তিনি তাঁর ছেলেদের ও ভক্তদের দিয়ে তাঁর কাজ করাবেন, জগতের কল্যাণ করাবেন বলে নরেনকে দিযে এসব লেখাচ্ছেন।'

১৮৯৮ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারি মঠের জন্য হাওড়ার বেলুড় গ্রামে গঙ্গার ধারে একখণ্ড জমি কেনা হয়। কাশীপুরের আলমবাজার হতে মঠকে তখন স্থানান্তরিত করে বেলুড়ে মঠের জমির নিকটেই নীলাম্বরবাবুর ভাড়াটে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। মঠের সন্ন্যাসীগণ শ্রীমাকে সেখানে নিয়ে যান। তিনি সেখানে ঠাকুরের পূজা করে সকলকে প্রসাদ বিতরণ করেন। নিকটেই মঠের জমিতে তখন নির্মাণকার্য চলছিল। বিকেলে ভক্তগণ নৌকো করে শ্রীমাকে মঠের জমিতে নিয়ে যান। সেখানে তখন ভগিনী নিবেদিতা, মিসেস্ বুল ও মিস্ ম্যাকলাউড ছিলেন। তাঁরাও খবর পেয়ে এসে শ্রীমাকে অভ্যর্থনা করলেন।

এই বছরই শ্রীমা যখন কলকাতার বাগবাজারে বোস পাড়া লেনে ছিলেন, ভগিনী নিবেদিতা তখন কোনও হিন্দু গৃহে থেকে হিন্দুদের রীতিনীতি শেখবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি তাঁকে সানন্দে স্বগৃহে এনে রাখলেন। অবশ্য, কিছুদিন পরে নিবেদিতা বোস পাড়া লেনেই অপর একটি বাড়িতে উঠে গেলেন। সেই ১৬ নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়িতেই ১৮৯৮ সনের ১২ই নভেম্বর কালী পূজার দিনে ভগিনী নিবেদিতার স্কুল স্থাপিত হয়। ঐ দিন শ্রীমা স্বহস্তে সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করেন এবং তাঁর আশীর্বাদ নিয়েই বিদ্যালয় আরম্ভ হয়।

এই বছর ১৫ই চৈত্র (২৮শে মার্চ, ১৮৯৯) যোগীন মহারাজের মৃত্যু হয়। স্বামী যোগানন্দকে সকলে বলত 'মায়ের ভারী'। বস্তুতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের সময় থেকে দীর্ঘ বার বছর শ্রীমায়ের একান্ত অন্তরঙ্গরূপে মনে প্রাণে তিনি মাতৃসেবা করেছেন। তাঁর তিরোধানে শ্রীমা অত্যন্ত অধীর হয়ে পড়লেন।

১৩০৬ সালের ১৮ই শ্রাবণ (২রা আগষ্ট, ১৮৯৯) শ্রীমায়ের কোলে মাথা রেখে তাঁর সর্বকনিষ্ঠ ভাই অভয়চরণের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে দিদিকে তাঁর শেষ অনুরোধ, 'দিদি, সব রইল—দেখো।' এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে স্ত্রী সুরবালার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে। সেই অবস্থাতেই ১৩ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারি, ১৯০০) সুরবালার এক কন্যা জন্মে। ভ্রাতার কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ—শ্রীমাকে এই

কন্যা রাধারাণীর ভার গ্রহণ করতে হলো। এই সময়ে বিভিন্ন কারণে শ্রীমাকে জয়রামবাটীতে প্রধানত থাকতে হয়েছে। তিনি ক্রমশই সংসারের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছেন দেখে, এ থেকে মুক্তির উপায় ভাবছিলেন। অমনি ধ্যানমার্গে শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন দিয়ে বললেন, 'এই সেই মেয়েটি, একে আশ্রয় করে থাক, এটি যোগমায়া।' শ্রীমা ভাবলেন, 'তাই তো, একে আমি না দেখলে আর কে দেখবে ? বাবা নেই, মা ঐ পাগল।' বুকে জড়িয়ে ধরলেন রাধুকে।

এর পরে অধিকাংশ সময়ই শ্রীমা কলকাতায় বাস করেছেন। এই সময়ে সারদানন্দজী 'মায়ের ভারী'। পূর্বেই শ্রীমায়ের অবস্থানের জন্য তিনি ২।১ নম্বর বাগবাজার স্ট্রীটের বাড়িটি ভাড়া নিয়ে রেখেছিলেন। ১৩১০ সালের মাঘ মাসে শ্রীমা জয়রামবাটী থেকে এখানে আসেন এবং প্রায় দেড় বছর এই বাড়িতে বাস করেন। শ্রীমায়ের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে অনেকেই মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকতেন। লক্ষ্মীদিদি ও রাধারাণী এখানে তাঁর সঙ্গেই থাকত।

এখান থেকে ১৩১১ সালের প্রথমভাগে শ্রীমা নিজের আশ্রিত পরিজন এবং ভক্তমণ্ডলীর অনেককে নিয়ে আবার পুরীধামে যাত্রা করেন। এই সময়ে অবশ্য রেল বসেছে এবং যাতায়াতের সুবিধাও হয়েছে। এবারেও তিনি বলরামবাবুর 'ক্ষেত্রবাসীর মঠে' এসে ওঠেন। এবার পুরীধামে তিনি প্রায় বছরখানেক থাকেন। এর মধ্যে শ্যামাসুন্দরী ও অন্যান্যদেরও অবশ্য দেশ থেকে এনে জগন্নাথ দর্শন করান।

এইবার দেশে আসার পরে কলেরা রোগে ১৩১১ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীমায়ের ভ্রাতা প্রসন্নকুমারের প্রথম পক্ষের স্ত্রী রামপ্রিয়ার মৃত্যু হয়। ফলে তাঁর দুই কন্যা নলিনী ও সুশীলার (মাকু) ভার শ্রীমাকেই নিতে হয়। এই বছরেই মাঘ মাসে শ্রীমায়ের মাতা শ্যামাসুন্দরীর মৃত্যু হয়। মাতৃশোক এবং শ্রাদ্ধের কঠোর পরিশ্রমে শ্রীমায়ের শরীর ভেঙে পড়ে। তিনি মাসাধিক কাল পরে আবার কলকাতায় এসে বাগবাজারের বাড়িতে ওঠেন। গোপালের মা নিবেদিতা বিদ্যালয়ের একটি ঘরে বাস করতেন। শ্রীমায়ের উপস্থিতিতেই ১৩১৩ সালের ২৪শে আষাঢ় অতিবৃদ্ধা বাৎসল্যরতিময়ী গোপালের মায়ের মৃত্যু হয়। ১৯০৭ সনের জগদ্ধাত্রী পূজার পূর্বেই শ্রীমা জয়রামবাটীতে ফিরে গেলেন।

নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে বেশ কয়েক বছর কেটে গেলে শ্রীমা আবার তীর্থভ্রমণে যাবেন ঠিক করলেন। পথে রামকৃষ্ণ বসুর উড়িষ্যার জমিদারী কোঠারে শ্রীমাকে নিয়ে যাবার জন্য তাঁর জননী বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। শ্রীমা ১৩১৭ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ সদলবলে কোঠারে গেলেন। ইতিমধ্যে শ্রীমা অনেককেই দীক্ষা দিয়েছিলেন। এই দলে শ্রীমায়ের দীক্ষিত সন্তানদের মধ্যেও কেউ কেউ ছিলেন। কোঠারে গিয়ে খুব ঘটা করে সরস্বতী পূজা হলো। শ্রীরামকৃষ্ণের মত শ্রীমাও যে জাতিবর্ণ ভেদ বিশেষ মানতেন না তার অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে। কোঠারের পোস্টমাস্টার দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যৌবনে ঘটনাচক্রে খ্রীষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আবার হিন্দুধর্মে ফিরে আসতে চান বলে শ্রীমায়ের কাছে নিবেদন করলেন। শ্রীমা বিধান দিলেন, যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করে গায়ত্রী

ও উপবীত গ্রহণ করলেই তিনি আবার ব্রাহ্মণত্বে প্রতিষ্ঠিত হবেন। দেবেন্দ্রবাবু অতি নিষ্ঠার সংগে সকল অনুষ্ঠান পালন করে শ্রীমায়ের দলের কৃষ্ণলাল মহারাজের নিকট গায়ত্রীমন্ত্র ও যজ্ঞোপবীত পেয়ে শ্রীমাকে এসে প্রণাম করলেন। তিনি তাঁকে প্রতিপ্রণাম করলেন। সরস্বতী পুজার দিনেই শ্রীমা তাঁকে মন্ত্রদীক্ষা ও একখানি প্রসাদী কাপড় দিলেন।

কোঠার থেকে শ্রীমা দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বর দর্শনে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কলকাতা থেকে স্বামী সারদানন্দের অনুমোদন পত্র এলো, এবং মাদ্রাজের স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ শ্রীমায়ের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সর্বপ্রকার দায়িত্ব নিতে স্বীকৃত হলেন। ১৩১৭ সালের মাঘ মাসের এক শুভদিনে শ্রীমা সদলবলে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করলেন।

রামেশ্বরের পথে শ্রীমায়ের দলটি যথাসময়ে মাদ্রাজে এসে পেঁাছল। শশী-মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) তাঁর সংগীদের নিয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। মাদ্রাজে কয়েকদিন অবস্থানের পরে দলটি রামেশ্বর যাত্রা করে। পথে মীনাক্ষী দেবীর এবং অন্যান্য মন্দির দর্শন করে যাবারও বন্দোবস্ত হলো। পাম্বান দ্বীপে রামেশ্বরের মন্দির তখন রামনাদের রাজার অধীনে। রাজা স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য। তিনি তাঁর 'গুরুর গুরু পরমগুরু'র আগমনবার্তা পূর্বেই মন্দিরের কর্মচারীদের জানিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং তীর্থদর্শনে শ্রীমায়ের দলটির কোনই অসুবিধা হলো না। এইরূপে দাক্ষিণাত্যে প্রায় দু'মাস তীর্থদর্শন করে শ্রীমা সদলে ১৯১১ সনের ৩রা এপ্রিল পুরীধামে ফিরলেন। ১১ই এপ্রিল কলকাতায় ফিরে ১৭ই মে শ্রীমা দেশে গেলেন।

এই বছরেই ১০ই জুন তাজপুরের জমিদার-বংশীয় মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সংগে রাধারাণীর বিবাহ হয়। বরের বয়স তখন পনের এবং রাধারাণীর এগার। যেহেতু বরপক্ষ জমিদার-বংশীয় সেহেতু এই বিবাহে স্বামী সারদানন্দ মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করেন।

১৯১১ সনের ২১শে আগষ্ট স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মৃত্যু শ্রীমাকে গভীরভাবে আঘাত করল। মৃত্যুকালে স্বামিজী শ্রীমায়ের দর্শনপ্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও কলকাতায় উদ্বোধনে গিয়ে তাঁর দর্শন দিলেন না। রামকৃষ্ণানন্দের মতো ভক্ত-ছেলের মৃত্যু স্বচক্ষে দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

১৩১৯ সালের ৩০শে আশ্বিন দুর্গাপুজার বোধন দিনে শ্রীমা বেলুড় ম[illegible] এলেন। তাঁর ঘোড়ার গাড়ি আশ্রমের দ্বারে প্রবেশ করলে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে স্বাম[illegible] প্রেমানন্দজী এবং আরো অনেকে শ্রীমায়ের গাড়ি টেনে মঠ-প্রাংগণে নিয়ে আসেন[illegible] পুজার সময়ে মঠে থেকে পুজাদি দেখে সপ্তাহখানেক পরে মা কলকাতায় উদ্বোধ[illegible] ফিরলেন। ২০শে কার্তিক আবার তিনি কাশীধামে যাত্রা করেন। কা[illegible] অবস্থানকালে শ্রীমা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে পদধূলি দেন। ঐ সময়ে ব্র[illegible], শিবানন্দজী, তুরীয়ানন্দজী, ডাক্তার কাঞ্জিলাল এবং আরও অনেকে [illegible] ছিলেন। স্বামী অচলানন্দ শ্রীমাকে পালকিতে নিয়ে সম্পূর্ণ আশ্রমটি [illegible]

দেখালেন। সব দেখেশুনে বিস্মিত হয়ে শ্রীমা বললেন, এখানে ঠাকুর বিরাজ করছেন, আর মা লক্ষ্মী পূর্ণ হয়ে আছেন।' শ্রীমা বাসস্থানে ফিরে গিয়ে একজন ভক্তের দ্বারা দান হিসাবে দশ টাকা আশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন। শ্রীমায়ের প্রদত্ত সেই দশ টাকার নোটখানি অমূল্য রত্নরূপে আজও সেবাশ্রমে সুরক্ষিত আছে।

কলকাতা থেকে জয়রামবাটীর পথে গাঁয়ের নিকটে কোয়ালপাড়ায় একটি আশ্রম হয়েছিল। প্রথমে এটি 'স্বদেশীদের' আশ্রয় বলে পুলিশের নজরে ছিল। পরে সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের পটমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে আশ্রমে পরিণত হয়। শ্রীমা যাতায়াতেব পথে এখানে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করতেন। জয়রামবাটীতে সাংসারিক অশান্তির দরুণ শ্রীমা এই আশ্রমের ভক্তদের একবার বলেন যে, যদি এখানে একখানা ঘব পান তবে জয়বামবাটী ছেড়ে এখানে এসে তিনি শান্তিতে থাকেন। আশ্রমের ভক্তগণ মহা উৎসাহে সেখানে একটি বাড়ি তৈরি করে তার নাম দিলেন 'জগদানন্দ আশ্রম'। ১৩২২ সালের ভাদ্রমাসে এই বাড়িতে গিয়ে শ্রীমা প্রথম দফায় পনের দিন বাস করেছিলেন।

মামাদের সংসার বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং শ্রীমায়ের নিকটে সদাই আগত তাঁর ভক্তদের স্থানাভাবের কথা ভেবে জয়বামবাটীর পুণ্যপুকুরের পশ্চিমপাড়ে একটি নূতন বাড়ি নির্মাণ কবা হয়। ১৩২৩ সালের ২রা জ্যেষ্ঠ (১৫ই মে, ১৯১৬) নূতন বাড়ির গৃহপ্রবেশকার্য সম্পন্ন হল। বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে শ্রীমায়ের নূতন বাড়ি ও জগদ্ধাত্রীদেবীর অর্চনার ব্যয়বহনের জন্য ক্রীত কিছু ধানের জমির অর্পণনামা রেজিস্ট্রি কবে দেন। ১৩২৪ সালের জগদ্ধাত্রী পূজা এই নূতন বাড়িতেই সুসম্পন্ন হয়।

এরপর শ্রীমায়ের শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে জ্বরে ভুগতেন। কখনো সমাধিস্থও হয়ে যেতেন। তারপর যে রাধারাণী শ্রীমায়ের স্নেহপুত্তলী, অন্তঃসত্ত্বা হয়ে তাঁরও শরীর ভাল যাচ্ছে না। সে গোলমাল বা শব্দ সহ্য করতে পাবে না বলে শ্রীমায়ের কলকাতায় থাকা হয় না। এমতাবস্থায় কোয়ালপাড়ার নির্জন আশ্রমে রাধারাণীকে নিয়ে কিছুদিন বসবাস করলেন। সারদানন্দজী মঠের নানাকাজে ব্যস্ত থাকায় বরদা মহারাজকে শ্রীমায়ের সেবা-যত্নের ভার দিলেন। এখন থেকে শ্রীমায়ের লীলাসম্বরণ পর্যন্ত বরদা মহারাজ মায়ের সংগী ছিলেন। অনেক রকম ঝাড়ফুঁক এবং চিকিৎসা করেও রাধুর অসুখ সারল না। তখন শ্রীমা ঠাকুরের উপরে সব নির্ভর করে রইলেন। অবশেষে ১৩২৬ সালের ২৪শে বৈশাখ রাধারাণীর এক পুত্র সন্তান জন্মে। সকলেই আশা করেছিল যে প্রসবের পরে রাধুর শরীর ভালো হবে। কিন্তু তা হলো না। ১৩২৬ সালের ৭ই শ্রাবণ সকলকে নিয়ে শ্রীমা কোয়ালপাড়া হতে জয়রামবাটীতে আসেন। শেষ পর্যন্ত রাধুকে নিয়ে শ্রীমা [illegible]তা বিপর্যস্ত হলেন যে, মাঝে-মাঝেই তিনি দুঃখ করে বলতেন, 'তোর জন্য [illegible] কর্ম, অর্থ সব গেল।'

[illegible] শ্রীমায়ের উপরে নানারকম দুর্ব্যবহার করতে লাগল। শ্রীমায়ের মনও [illegible]র উপরে বিমুখ হয়ে যেতে লাগল। একদিন মা দুঃখ করে বলেই [illegible] এই রাধুর উপরে আমার একটুও মন নেই।'

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের পরে শ্রীমা জীবন-বিমুখ হয়েছিলেন। দিব্যদর্শনে ঠাকুর তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন রাধুকে নিয়ে বেঁচে থাকতে। সেই আদেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। এখন সেই রাধু-বন্ধন থেকে শ্রীমায়ের মন মুক্ত হয়ে যাওয়ায় ভক্তগণ শঙ্কিত হলেন। শ্রীমায়ের লীলাসম্বরণের সময় বোধহয় সমাগত।

১৯১৯ সনের ১৩ই ডিসেম্বর শ্রীমায়ের শেষ জন্মোৎসব হয় জয়রামবাটীতে। তখন তাঁর শরীর অসুস্থ। তবুও তিনি ঈষদুষ্ণ জলে গা মুছে স্বামী সারদানন্দ প্রেরিত কাপড়খানি পরে ঠাকুরের পূজা করলেন। পরে ভক্তরা তাঁকে কপালে সিঁদুর, চন্দন ও গলায় পুষ্পমাল্য দিয়ে প্রণাম করলেন। এই জন্মদিনের বিকেলেই আবার তাঁর জ্বর আসে। স্থানীয় চিকিৎসকদের দ্বারা চিকিৎসা করানো হলো। কিন্তু কিছু হলো না। তখন ভক্তগণ তাকে কলকাতা নিয়ে যাওয়াই ঠিক করলেন। ১৩২৬ সনের ১২ই ফাল্গুন রাধু, রাধুর মা, মাকু, নলিনীদিদি ও নবাসনের বউ সংগী হলো। চলনদার হলেন বরদা মহারাজ। ১৫ই ফাল্গুন (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২০) শ্রীমা উদ্বোধনে উপস্থিত হলেন। রাত্রি নটায় সেখানে পৌঁছলে শ্রীমায়ের অস্থিচর্মসার দেহের অবস্থা দেখে যোগীন-মা ও গোলাপ-মা হায় হায় করতে লাগলেন। পরদিনই স্বামী সারদানন্দজী শ্রীমায়ের চিকিৎসার সর্বপ্রকার বন্দোবস্ত করলেন।

প্রথমে শ্রীমায়ের জন্য ডাক্তার কাঞ্জিলালের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শুরু হলো। বিশেষ উন্নতি না দেখায় শ্যামাদাস বাচস্পতিকে দিয়ে কবিরাজী চিকিৎসা শুরু হয়। প্রথমে কিছু উন্নতি দেখা গেলেও শেষ পর্যন্ত বিপিনবিহারী ঘোষকে দিয়ে ডাক্তারী চিকিৎসা শুরু হলো ৮ই এপ্রিল। কিন্তু তেমন ফল না হওয়ায় পুনরায় কবিরাজী চিকিৎসা শুরু হয়।

এই রোগের মধ্যেই শ্রীমা একে একে বন্ধনমুক্ত হলেন। রাধারাণীর মায়াই ছিল তাঁর কাছে বড়। একদিন ভক্তদের বললেন, ওদের সব দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক, এই অবস্থায় শ্রীমাকে ফেলে তাঁরাই বা দেশে চলে যায় কি করে। শ্রীমা বললেন, তবে ওরা যেন তাঁর কাছে না আসে।

শরীরের এই অবস্থার মধ্যেও তিনি কিন্তু ভক্তদের খবরাখবর নিতেন সবসময়। অবশেষে কথাবার্তা বন্ধ করে তিনি প্রায় আত্মস্থ হয়ে গেলেন। শেষে ধীরে ধীরে বাগ্‌রোধ পর্যন্ত হয়ে গেল। অবশেষে ১৩২৭ সনের ৪ঠা শ্রাবণ মঙ্গলবার (২১শে জুলাই, ১৯২০) রাত্রি দেড়টার সময়ে কয়েকবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শ্রীমা মহাসমাধিতে নিমগ্ন হলেন।

পরদিন উদ্বোধন থেকে শ্রীমায়ের পূত দেহ গন্ধপুষ্প-মাল্যশোভিত করে ভক্তগণ বরানগরের পথে নৌকাযোগে বেলুড় মঠে নিয়ে যান। সেখানে স্বামিজীর মন্দিরের উত্তরের জমিতে ভক্তগণ শ্রীমায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন।

\+ \+ \+

শ্রীমায়ের আধ্যাত্ম লীলাপ্রসংগ অচিন্ত্যকুমার তাঁর গ্রন্থেই অপূর্বরূপে বিশ্লেষণ

করেছেন। তাই এই সংক্ষিপ্ত চরিতামৃতে সে বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করা হলো না। শুধুমাত্র শ্রীমায়ের জীবনের ধারাবাহিক লীলাপ্রসংগ সংক্ষেপে বর্ণিত হলো।

+ + +

পরিশেষে বক্তব্য এই, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদামণির ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত জীবনী সংকলনে নিষ্ঠাসহকারে বিশ্বাসযোগ্য তথ্যগুলিই মাত্র গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্যপঞ্জীর প্রারম্ভে ধর্মবিপ্লবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংকলনেও একই সূত্র অনুসরণ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই সকল বিষয়ে মহাভারত রচনা করা যায়। ধর্মবিপ্লবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটি সম্পাদকের বিস্তৃত গ্রন্থের (যন্ত্রস্থ) সার-সংকলন। এই বিষয়ে বহু আকর-গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রধান—

বাংলাদেশের ইতিহাস	: ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার
সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস	: ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
আত্মচরিত	: শিবনাথ শাস্ত্রী
রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ	: ঐ
রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য	: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ	: ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত
Raja Rammohan Roy	: S. D. Collet
Works of Raja Rammohan	
রামমোহন	: ডঃ অজিতকুমার ঘোষ
Ramkrishna (The Life of)	: Romain Rolland
Ramkrishna & His Disciples	: Christopher Isherwood
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ	: স্বামী সারদানন্দ
শ্রীমা. সারদা দেবী	: স্বামী গম্ভীরানন্দ
তন্ত্রতত্ত্ব	: শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব
Gospels	
কোর্-আন্ সার	: বিনোবা ভাবে (অনুবাদ: চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী)
শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত	: শ্রীম
বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ	: ডঃ শঙ্করীপ্রসাদ বসু

উপরি-উক্ত গ্রন্থাবলী ব্যতীতও অনেক গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এই সকল গ্রন্থ হতে অনেক উদ্ধৃতিও দেওয়া হয়েছে। সকলের কাছ থেকে ব্যক্তিগত অনুমতি নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাঁদের কাছে বিনীত কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং তাঁদের গ্রন্থ হতে উদ্ধৃতির জন্য ঋণ স্বীকার করছি।

বাংলা সাহিত্যের একটি দৃঢ় স্তম্ভস্বরূপ এই জীবনী-সাহিত্য রচনায় সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার কিভাবে অনুপ্রাণিত হলেন তার একটি ইতিহাস আছে। রচনাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে 'রামকৃষ্ণ সাহিত্য' শেষ হবে, সেই খণ্ডে উক্ত ইতিহাস সংযোজিত হবে।

বানান বিষয়ে কিছু বলা দরকার। তথ্যপঞ্জীস্থ উদ্ধৃতিগুলিতে যথাযথ বানান রাখা হয়েছে। অন্যত্র আধুনিক বাংলা ভাষার বানান ব্যবহার করা হয়েছে। সহযোগী অনুজপ্রতিম শুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সক্রিয় সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। সম্পাদনায় এবং প্রুফ্ দেখা হতে নানা বিষয়ে তাঁর সহযোগিতা স্মরণীয়। নানাবিষয়ে সাহায্য করেছেন মীরা চক্রবর্তী, অরূপ সেনগুপ্ত, দুলাল পর্বত, মুরলীধর ঘটক, সমরেশ বসু, শৈলেন শীল ও আনন্দরূপ চক্রবর্তী। তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

নিরঞ্জন চক্রবর্তী

পরিশিষ্ট

অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

রচনাবলীর পূর্ববর্তী চার খণ্ডের সংক্ষিপ্ত সূচী

প্রথম খণ্ড ॥ কবিতা : পূর্ববর্তী কবিতা। অমাবস্যা। সমসাময়িক কবিতা। প্রিয়া ও পৃথিবী ॥ উপন্যাস : বেদে। কাকজ্যোৎস্না ॥ অনূদিত উপন্যাস ও গল্প : প্যান্। দুটি সরাই। বিয়ের মিছিল ॥ গল্পগুচ্ছ : বাদল বাতাস, আলতার দাগ, কারসাজি, কড়া নাড়া, সাগর-দোলা, মাটির ব্যথা, ভুখা, অন্ধকারের কান্না, লগ্ন, মালার জ্বালা, বন্দিনী, তিমির রাত্রি ॥ নাটিকা : মুক্তি, কেয়ার কাঁটা ॥ পরিশিষ্ট : কয়েকটি অগ্রন্থিত পূর্ববর্তী কবিতা, গল্প ও পত্রগুচ্ছ ॥ বিস্তৃত তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থ-পরিচয় ॥

দ্বিতীয় খণ্ড ॥ উপন্যাস : আকস্মিক। বিবাহের চেয়ে বড়ো ॥ গল্পগ্রন্থ : টুটা-ফুটা (টুটা-ফুটা, চোখের চাতক, খাখ্, সন্ধ্যারাগ, অচল টাকা, দুইবার রাজা)। ইতি (অরণ্য, ধন্বন্তরি, যে-কে-সে, দিনের পর দিন, ইতি) ॥ গল্পগুচ্ছ : গুমোট, নায়ক-নায়িকা, "পারে যাবার আর কে আছে ?", কাকের বাসা, সবচেয়ে সে আপনার, ডোরা, সাতখুন মাপ ॥ প্রবন্ধ : কবি সত্যেন্দ্র-নাথ দত্ত ॥ পরিশিষ্ট : পত্রগুচ্ছ ॥ বিস্তৃত তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থ-পরিচয় ॥

তৃতীয় খণ্ড ॥ উপন্যাস : প্রাচীর ও প্রান্তর, প্রথম প্রেম, দিগন্ত, মুখোমুখি ॥ গল্প ও কাহিনী : অধিবাস (অধিবাস, পুনর্মূষিক, অচিরদ্যুতি, তারপর, বটতলা, অসম্পূর্ণ, হোমশিখা, মাঠ ও বাজার) ॥ গল্পগুচ্ছ : জন্ম জন্ম, গান, আট বৎসর, ডাকনাম, অন্ধকূপ, শীতের নিশ্বাস ॥ বিস্তৃত তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থ-পরিচয় ॥

চতুর্থ খণ্ড ॥ উপন্যাস : জননী জন্মভূমিশ্চ, ইন্দ্রাণী, তৃতীয় নয়ন, ছিনিমিনি, তুমি আর আমি ॥ উপন্যাসিকা : ডাউন দিল্লী এক্সপ্রেস্ ॥ সংকলন : বাঁকা-লেখা (উপন্যাস) ॥ পত্রগুচ্ছ ॥ বিস্তৃত তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থ-পরিচয় ॥

—শুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।